তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

দ্বাদশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮১০ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৫। কলিগতাব্দ ৪৯৮৯। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

ব্রাহ্মগণ! এইরূপে জ্ঞান ও প্রীতিকে প্রসারিত কর তাহা হইলেই অনাসক্তিতে তোমার সংসারভোগ হইবে। যতটুকু সংসারে আসক্তি সেই পরিমাণে স্বীয় নামযশের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ইহাতে সংসারের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। আর যে পরিমাণে অনাসক্তি সেই পরিমাণে সাংসারি[illegible] পবিত্র ব্যবহার [illegible] করিতে তোমার মনে বল আইসে। ফলত ই[illegible] ধর্ম্মসাধন। আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল। আমাদের মধ্যে অনেকেরই শ্যাম কেশ শ্বেত হইয়াছে। দন্ত স্খলিত ও তুণ্ড গলিত হইয়াছে। আমাদের এই পার্থিব জীবন তো অবসান হইয়া আসিল। আজ যে বর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল হয় তো ইহাই অনেকের শেষ বর্ষ হইবে। আজ এই কদলীদলমণ্ডিত মণ্ডপের মুক্ত বায়ুতে যাতি যূথি মল্লিকার মনোমুগ্ধকর সৌরভে যাঁহাদের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া নববর্ষের প্রাতঃকাল পবিত্র করিলাম, হায়! হয় তো আগামী বর্ষে তাঁহাদের সহিত এই আনন্দ আর ভোগ করিতে পাইব না। জীবন এইরূপই চঞ্চল। নলিনী-দল-গত-জলবৎ চঞ্চল। সংসারের সমস্তই চঞ্চল। আইস এই সমস্ত চঞ্চল অধ্রুবের বিনিময়ে সেই ধ্রুব পদার্থকে লাভ করিবার জন্য আজ হইতে চেষ্টা করি। এই পৃথিবীতে এখনও যে কএকটা দিন থাকিব যদি তার মধ্যে অন্তত একটী দিনও সেই প্রাণসখারে প্রাণ খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া একবারও ডাকিতে পারি তাহলেও আমাদের জন্ম সফল। অন্তর্যামী! তুমি সকলই জানিতেছ। তোমাকে আর আমরা কি জনাইব। তুমি আমাদের এই সাধু কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সমাজের বিষম সমস্যা।

বিদ্যা-বুদ্ধির বিস্তার সমাজের একটি প্রধান উন্নতির চিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধির ফল যদি হিতে বিপরীত হয়—যদি এরূপ হয় যে, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাবে সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যথেচ্ছাচারের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইতেছে; কোন দুই ব্যক্তির [illegible] ঐক্য নাই—ধর্ম্মের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন; তবে তাহাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, যাহা বিদ্যা-বুদ্ধি বলিয়া গৃহীত হইতেছে তাহা প্রকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি নহে। তবে কি আমরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া পুরাতন কুসংস্কারকেই সার করিব? তাহাই বা কিরূপে করি। যে ব্যক্তি বিদ্যার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছে—সে আর তাহার চরম পর্য্যন্ত না গিয়া কোন ক্রমেই ফিরিতে পারে না; যত কিছু বিভীষিকা সমস্তই মাঝের পথে—একটু বেশী অগ্রসর হইলে আর কোন ভয় নাই। যাঁহারা ঘোরতর স্থিতিশীল তাঁহারা বলেন "দূর কর তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি—ফিরিয়া যাও!" যাঁহারা ঘোরতর গতিশীল তাঁহারা বলেন "পশ্চাৎ পানে ফিরিয়া দেখিও না সম্মুখে অগ্রসর হও।" স্থিতি-শীলও যেমন—গতিশীলও তেমনি; এ বলে আমায় দ্যাখ্—ও-বলে আমায় দ্যাখ্! স্থিতি-শীল ভবিষ্যৎ বাদ দিয়া অতীতে প্রবিষ্ট হন, গতিশীল অতীত বাদ দিয়া ভবিষ্যতে ধাবমান হ'ন; ইহাতে স্থিতিশীল জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যা'ন—গতি-শীল ক্রমাগতই হোঁচট্ খাইতে থাকেন। সমাজের এই এক বিষম সমস্যা। এখন উপায় কি?

উপায় আর কিছুই নয়—প্রকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি; এক কথায় ধর্ম্ম-বুদ্ধি। নীরস বিদ্যা-

বুদ্ধি নহে কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ণ—সৌজন্য-পূর্ণ—সরস বিদ্যা-বুদ্ধি। আশ্চর্য্য এই যে, যে-সকল গতিশীলেরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি-দিগের অত্যাচারের প্রতি খড়্গ-হস্ত তাঁহা-দের মনের ভিতরে যদি তলাইয়া দেখা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহা-দের উদ্দেশ্য অত্যাচার নিবারণ করা নহে কিন্তু অত্যাচার করা। এখনকার কোন শূদ্র যদি ইংরাজি পুঁথিকে সহায় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করে, তবে নিশ্চয় জানিও যে, ব্রাহ্মণদের অত্যা-চার-নিবারণ তাহার উদ্দেশ্য নহে—ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি অত্যাচার করাই তাহার উ-দ্দেশ্য। ব্রাহ্মণেরা কবে কোন্ জন্মে শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল—এখন তাহার নাম-গন্ধও নাই,—এখন-কার রাজ-নিয়মের সমক্ষেই যে, কেবল ব্রাহ্মণ-শূদ্র সমান তাহা নহে; ব্রাহ্মণেরা আপনারাই শুদ্ধাচার ও শাস্ত্র-চর্চার প্রভাবে অনেক দিন হইতে বিশিষ্টরূপে সাত্ত্বিক ভাবের আধার হইয়া আসিতেছেন—তাহারা বিশিষ্ট-রূপে বুদ্ধি-জীবী ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক; তাহা বলিয়া কি দাম্ভিক কুলীন ব্রাহ্মণ নাই? আছে—কিন্তু কে তাহাদিগকে ভাল বলে? শূদ্রের মধ্যেও এমন অনেক দাম্ভিক ব্যক্তি আছে যাহাদের মাটিতে পা পড়ে না; এ সকল অকাল-কুষ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দেও। এখন-কার শূদ্র অনত্যাচারী ব্রাহ্মণদিগের অত্যা-চার নিবারণের জন্য কখনও কখনও যে, অগ্নি-মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহার অর্থ আর কিছু নয়—"আমরা ব্রাহ্মণের দাস হইব কেন—ব্রাহ্মণেরা আমাদের দাস হইবে;" এই রূপ আর একটি কথা এই যে, "স্ত্রী স্বামীকে পূজা করিবে কেন—স্বামী স্ত্রীকে পূজা করিবে;"—ইহাতে দোষের সংশো-ধন হওয়া দূরে থাকুক্—দোষের কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন হয় এই মাত্র; পূর্ব্বে নয় পতি ও ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল—এখন নয় স্ত্রী ও শূদ্রের আধিপত্য হইল; ইহাতে মন্দ বই ভাল কি হইল—তাহা তো বুঝিতে পারা যায় না। ফরাসীস্ বিদ্রোহের সময় সাধারণ লোকেরা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া লাভের মধ্যে আপ-নারা শত সহস্র গুণ অত্যাচারী হইয়া স-মাজকে ছার খার করিয়া ফেলিল। উহারা যদি ধর্ম্ম-ভাবে চালিত হইত তাহা হইলে উপরের লোকদিগের অত্যাচার নিবা-রণ পর্য্যন্তই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইত, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য আর-একরূপ; তাহাদের মনের কথা এই যে, "উহারা আমাদের উপর অত্যাচার করিবে কেন—আমরা উহাদের উপর অত্যাচার করিব;" অত্যাচার-মাত্রই যে, অন্যায়, এ জ্ঞান তাহা-দের নাই; তাহাদের জ্ঞানের দৌড় কেবল এই পর্য্যন্ত যে, "অন্যেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলেই তাহা অন্যায়—আমরা অন্যের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহা খুবই ন্যায্য।" এই সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক যাহারা "অধিকাংশ" বলিয়া পরিগণিত হয় ও যাহাদের মত না লইয়া কোন কার্য্য হয় না—তাহারা কুচক্রী সিন্নার (Cinna) অপ-রাধে সচ্ছন্দে কবি সিন্নাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। আসল কথা এই যে, যাঁহারা অনেক কাল হইতে সমাজের শিরঃ-স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই বিদ্যা-বুদ্ধি এবং রসজ্ঞতায় সমা-জের নিম্ন-শ্রেণী অপেক্ষা উন্নত, আর নিম্ন-শ্রেণীরা বিদ্যা-বুদ্ধি এবং আত্ম-সংযমে যে, কত হীন, তাহা উপরে দেখা গেল। এরূপ অবস্থায়, নিম্ন-শ্রেণীরা যে, উচ্চ শ্রেণী-দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কোন উন্নতি লাভ করিবে তাহা হইতেই পারে

না। সারথী অশ্বকে পীড়ন করিলে, অশ্ব ক্ষেপিয়া উঠিয়া সারথীকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া অশ্ব কখনই সারথী হইতে পারে না। অধিকাংশের মত কেবল একটা কথার কথা মাত্র, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মত শত কোটি যে সে ব্যক্তির মত অপেক্ষা শত গুণে মূল্যবান্। অতএব সমাজের যত কিছু উন্নতি সমস্তই উচ্চ-শ্রেণীদিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে। উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ কুলে শীলে বিদ্যাতে বুদ্ধিতে যাঁহারা উচ্চ।

যাঁহারা সমাজের শিরস্থানীয় তাঁহারা কাজে কাজেই স্থিতি-শীলতার পক্ষপাতী; কেননা সমাজে ভাঙন ধরিলে তাঁহাদের তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। সমাজে যখন স্থিতি-শীলতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয় তখন কাষ্ঠ-হাসি, কাষ্ঠ-কান্না কাষ্ঠ-লৌকিকতা, কাষ্ঠ-সভ্যতা, এমন কি কাষ্ঠ ধর্ম্ম এই সকলের প্রাদুর্ভাবে সমাজ নিতান্তই কাষ্ঠ বনিয়া যায়। এরূপ সমাজের স্বপক্ষে এক যা বলিবার আছে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, অসভ্যতা অপেক্ষা কাষ্ঠ সভ্যতা ভাল—অধর্ম্ম অপেক্ষা কাষ্ঠ ধর্ম্ম ভাল—ইত্যাদি; কিন্তু এরূপ কথায় কাহারো মন ভুলিতে পারে না। অতএব সমাজের স্থিতি-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখা স্থিতি-শীলদিগের নিতান্তই কর্ত্তব্য। তেমনি আবার, যাঁহারা সমাজের পদস্থানীয় তাঁহারা কাজে কাজেই গতি-শীলতার পক্ষপাতী; কেননা সমাজে ভাঙন ধরিলে তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে সুযোগ পা'ন। সমাজে গতি-শীলতার আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি হইলে সমাজ একেবারেই আগুণ মূর্ত্তি ধারণ করে; কিন্তু সে আগুণ খড়ের আগুণ—দেখিতে দেখিতে ধূমে পরিণত হইয়া যায়। অতএব গতি-শীলদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সমাজের স্থিতির কোন প্রকার ব্যাঘাত না করিয়া সাবধানে গম্য পথে অগ্রসর হ'ন।

ভাঙন এবং গড়ন এ দুয়ের সন্ধিস্থলে পৃথিবীতে মহৎ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হয়। সেই সকল মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সমাজের গঠন কার্য্যের মূল প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার পরে যাঁহারা আইসেন তাঁহারা উঁহাদেরই প্রদর্শিত পথের অনুগামী হ'ন,—ইঁহাদের বীজ মন্ত্র এই যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা;" ইঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিতি-শীল; পূর্ব্বোক্ত মহদ্ব্যক্তিরা সৃষ্টি-শীল নামেরই যোগ্য। যাঁহারা সৃষ্টি-শীল তাঁহারা ভাঙন এবং গড়ন দুয়েরই মর্ম্মজ্ঞ। সৃষ্টি-শীল ব্যক্তি ধর্ম্মবুদ্ধিকে—শ্রদ্ধাভক্তি-পূর্ণ সরল শুভবুদ্ধিকে—সহায় করিয়া এমন একটি মধ্য-ভূমিতে দণ্ডায়মান হ'ন—যেখানে বিবাদ-বিসম্বাদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদকে প্রেমাগ্নিতে গালাইয়া নূতন এক উপাদানে পরিণত করেন। তিনি ব্রাহ্মণকেও শূদ্রের পদানত করিতে যা'ন না—শূদ্রকেও ব্রাহ্মণের পদানত করিতে যা'ন না,—পরন্তু ব্রাহ্মণ যাহাতে সদ্‌ব্রাহ্মণ হয় ও শূদ্র যাহাতে সৎশূদ্র হয়—তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। ব্রাহ্মণ সৎ হইলে স্বভাবতই সদ্‌ব্রাহ্মণ হয়—শূদ্র সৎ হইলে স্বভাবতই সৎশূদ্র হয়; পতি সৎ হইলে স্বভাবতই সৎপতি হয়, পত্নী সৎ হইলে স্বভাবতই সৎপত্নী হয়। এইরূপ যখন ব্রাহ্মণ শূদ্র—পতী পত্নী—ধনী দরিদ্র—সবল দুর্ব্বল—সমস্তের মধ্য হইতে সদ্ভাব উদ্গীরিত হইয়া উঠে—যখন দ্বন্দ্ব বিবাদ তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই সমাজ নিম্ন সোপান হইতে উচ্চ সোপানে পদ-নিক্ষেপ করে। এরূপ ঘটনা যখন তখন ঘটিতে পারে না—ইহা সময়ের পরিপক্কতাকে

অপেক্ষা করে। এখনকার কালে কেবল বিবাদ-বিসম্বাদেরই প্রাদুর্ভাব—ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালাই এখনকার কালের ধর্ম্ম; ইহার কুফল সমাজে যতই দেখা দিবে ততই লোকের চক্ষু ফুটিবে—ক্রমে ঈশ্বর-প্রসাদে ধর্ম্ম-সূর্য্য মোহ-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া অমায়িক শোভন মূর্ত্তিতে লোক-সমাজে অভ্যুদিত হইবে।

ঈশ্বর লাভ।

ঈশ্বর যেমন জড়জগতের রাজা, আধ্যাত্মিক জগতের তেমনই তিনি একমাত্র অধীশ্বর। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহ্যজগত একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় যে নিয়ম কার্য্যকরী ছিল, এখনও তাহার সত্ত্বা বর্ত্তমান। এখানকার কোন বস্তুই সেই অক্ষর পুরুষের শাসন অতিক্রম করিয়া চলিতেছে না। তিনি একবার ইহাকে যে সুন্দর নিয়মের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়া স্বয়ং সাক্ষী স্বরূপে তাহা অবলোকন করিতেছেন, যতদিন না তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইবে ততদিন একই ভাবে চলিতে থাকিবে, কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সমন্বিত এই সুবিশাল ভূমণ্ডল ইহার প্রত্যেক পদার্থ রহস্যে বিজড়িত হইয়াও আমারদের বিস্ময়ের উদ্দীপন করিতে পারে না, স্রষ্টার অনুপম কৌশল স্মরণ করিয়া দেয় না, ইহার একমাত্র কারন জড়জগতের নিয়ম সকলের সমতা। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যে সূর্য্য পৃথিবীর অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়াছিল, যৌবনে সেই কালে সেই স্থানে তাহার প্রকাশ দেখিতেছি, বার্দ্ধক্যে আবার তাহাই দেখিব। পূর্ব্বে তমিস্রা ও চন্দ্রালোকের পর্য্যায়ক্রমে যে উদয়াস্ত দেখিয়াছি, কখনই আর তাহার বৈষম্য দেখিতে হইবে না। ঐ প্রকৃতির সাম্যভাব সেই জন্যই অপেক্ষাকৃত স্থূলদর্শীদিগের চিত্তকে বিমোহিত করিতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণে যখন আবার ঝঞ্ঝাতরঙ্গের অভ্যুদয়ে পৃথিবীর মুখচ্ছবি বিকৃত হইয়া যায়, অগ্ন্যুৎপাত বা জলপ্লাবনের ঘোর উৎপাতে গ্রাম ও নগরের বিলয়দশা উপস্থিত হয়, গ্রহণ বা ধূমকেতুর প্রকাশে ধরাপৃষ্ঠে নূতন দৃশ্য সংঘটিত হয়, তখনই মনুষ্যের অন্তরে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। সমতল দেশবাসী মনুষ্যকে হিমালয়ের মহান দৃশ্য দর্শন করাও, সাগরের গম্ভীর নির্ঘোষী তরঙ্গ নিচয়ের মধ্যে অর্ণবযানযোগে লইয়া চল, দেখিবে তাহার হৃদয়ের জড়তা অপসারিত হইয়া গিয়া কার্য্যকারণ পরম্পরার উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। পৃথিবীর উপরে নিমেষে নিমেষে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অনবরত ঘটিতেছে, তাহার এক একটিই মনুষ্যের লৌহ কবাটাচ্ছন্ন হৃদয়কে সজীব করিয়া তুলিতে পারে, অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া দিতে পারে। কেবল মনুষ্য সম্পৃহ ভাবে দেখে না শুনে না সেই জন্যই সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দেখিয়া আপ্তকাম হইতে পারে না। মনুষ্যের সহিত বাহ্য জগতের যতটুকু সম্পর্ক, তাহা হইতে মনুষ্যের মন যে সহজে কার্য্য হইতে কারণের দিকে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, সে কেবল আপনার দোষে। তিনি ত সমুদয় জগতকে ইহার অনুকূল করিয়া দিয়াছেন, কেমন জড়তা আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটে যাইতে দেয় না। তিনি ত প্রতি সূর্য্যের উদয়াস্তে, পক্ষমাস ঋতু সম্বৎসরের আবর্ত্তনে কত রহস্য দেখাইতেছেন, আমরা মূঢ়জীব, একভাব একই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ের সম্পৃহ ভাবকে নির্ব্বান

করিয়া ফেলিয়াছি, এইজন্য তিনি ধরা দিলে আপনার মোহে তাঁহাকে ধরিতে পারি না। তিনিত স্বয়ংপ্রকাশ, তথাপি আমরা তাঁহাকে সৃষ্টির মধ্যে অনুভব করিতে পারি না।

আমরা দেখিতেছি, শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য জগতের যতটুকু যোগ, তাহা হইতে সহজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপস্থিত হইবার একটু গোলযোগ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল উপাদান বুদ্ধির সমক্ষে আনয়ন করে ও বুদ্ধি যাহা কিছু নৈসর্গিক ক্ষমতা প্রভাবে উহাদিগকে যোগসূত্র করে, তাহার মূলে কার্য্যকারণের স্বাভাবিকত্ব অন্যতম। আজকাল ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞানগরিমাপূর্ণ আস্ফালনের মধ্যেও সহজজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই বিশিষ্টরূপে সন্দিহান হইতে পারেন নাই। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব, কার্য্য কারণের অস্তিত্ব এইরূপ কয়েকটি সর্ব্বজনস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তির উপর বিজ্ঞান দর্শনের সুপ্রকাণ্ড অট্টালিকা বিনির্ম্মিত রহিয়াছে। কার্য্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ আছে, এ বিষয়ে আর কার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই একটী সামান্য মূল সত্যের উপর দুর্গম বিজ্ঞান শাস্ত্রের অর্দ্ধেক বা ততোধিক তত্ত্ব নির্ভর করিতেছে। বুদ্ধি যতই আলোচনা করিতে থাকে, সৃষ্টি কৌশলের সূক্ষ্মতত্ত্ব যতই অন্বেষণ করিতে থাকে, আপনাকে ও আপনার নিয়তি যতই তাহার আন্দোলনের বিষয় হয় ততই সে ঈশ্বর হইতে আর দূরে থাকিতে পারে না। সে তাঁহার অস্তিত্বে সকল রহস্যের বিশদ মীমাংসা দেখিতে পায়। সকল কূট প্রশ্নের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে থাকে। সে তখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে যে তাঁহাকে ছাড়িলে পৃথিবী লক্ষ্যশূন্য, অর্থশূন্য, ভ্রম প্রমাদ পরিপূর্ণ এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা।

জ্ঞানের মীমাংসা পরিমিত হইতে পরিমিত পদার্থে (যেমন "মনুষ্য মাত্রেই মরণশীল, শ্যাম মনুষ্য অতএব শ্যাম মরণশীল')। দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে অবশ্যই দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু যখন পরিমিত হইতে অনন্তের তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে তখন আর দর্শন শাস্ত্র কি করিবে? দর্শন শাস্ত্রের সকল [illegible]শ[illegible]ই ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার কি সাধ্য যে তাহাকে অনন্তের সমীপস্থ করে। বরং দর্শন শাস্ত্রের উপর অযথা নির্ভর করিলে, বুদ্ধির বিকৃতি উপস্থিত হয়। দর্শন ও ব্যবহারিক শাস্ত্র এইই প্রতিপন্ন করে যে সেই অমৃতময় অনন্তদেবের রাগও আছে, দ্বেষ ও আছে, পক্ষপাতিতা আছে, তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয়, তাঁহার সঙ্গে একেবারে সাক্ষাৎকার লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে যারপর নাই অসম্ভব। এইরূপে যখনই মনুষ্য আপনার বুদ্ধির উপর অন্যায্য নির্ভর স্থাপন করিতে যায়, তখনই আপনার চক্রে আপনি পতিত হইয়া শোচনীয় অবস্থায়, নিরাশার কূপে এককালে নিমজ্জিত হয়। উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না।

এইরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে শরীর বা ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধি ইহাদের মধ্যে কেহই ঈশ্বরের পথের সুপটু নিয়ামক নহে। ইহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে থাকে। প্রকৃত তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিতে পারে না।

তাঁহাকে জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণকে রিপুকুলকে সুশাসিত করিতে হইবে, মন হইতে পাপচিন্তাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। রাগাদি বিষয় ব্যাপার হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলে, তবে

আত্মার জ্যোতি প্রবল হইবে। সেই নিস্কলঙ্ক পরিশুদ্ধ পবিত্র আত্মাই পরমাত্মার উন্নততম রত্নবেদী। সেই আত্মাতে পবিত্র পরমেশ্বরের মুখজ্যোতি যেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এমন আর কিছুতে নহে। বাহ্যজগত যেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বিষয়জ্ঞান যেমন বুদ্ধির বিষয়, ঈশ্বর তেমনি আত্মার বিষয়। আত্মাদ্বারা তিনি যেমন সুপষ্ট রূপে গ্রাহ্য হয়েন এমন আর কিছুতে নহে। বিষয় ব্যাপারে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় ও মন উন্মত্ত,এমন একটু অবসর নাই যে আত্মা ঈশ্বরচিন্তা করিয়া বল লাভ করে, সেই জন্যই মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রতি উদাসীন। শরীরের স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন ব্যায়াম আবশ্যক, বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্য যেমন চিন্তা ও অধ্যয়ন আবশ্যক, আত্মার জীবন রক্ষা ও উন্নতি লাভের জন্য তেমনই ঈশ্বরের আবশ্যক। ঈশ্বর আত্মার প্রাণ। সূর্য্যের আলোকের অভাবে যেমন ওষধি বনস্পতি হীনবীর্য্য হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ সেই প্রেমসূর্য্যের অভাবে আধ্যাত্মিক বল একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

অসভ্যাবস্থায় বহির্জগতই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যই তাহার সকল তৃপ্তির স্থল। সে অবস্থায় মানসিক বা ঐশ্বরিক চিন্তার সময় তাহার নিকট অতিশয় অল্প। আপনার উদারান্ন সংগ্রহই তাহার একমাত্র উপজীবিকা ও জীবনের লক্ষ্য। ক্রমে যখন জীবিকা নির্ব্বাহের সহজ উপায় অবলম্বিত হয়, যখন কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে তখন হইতেই মনুষ্য চিন্তাপ্রবণ হইতে থাকেন। কিন্তু সে চিন্তা আপনার সুখ ঐশ্বর্য্যলাভের চিন্তা। সে চিন্তা আপনাকে লইয়া, বিষয় ব্যাপারের উপরিতন স্তরে উঠিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে ক্রমে যখন ইন্দ্রিয়ের উপর বুদ্ধির আধিপত্য স্থাপিত হয়, তখন হইতেই নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে মনুষ্য নিস্পৃহ হইতে থাকে। ক্রমে বিজ্ঞান সাহিত্য তাহার তৃপ্তিপ্রদ হইতে থাকে।

কিন্তু এ অবস্থাও মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা নহে। উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভের এখনও বিলম্ব রহিয়াছে। জীবনের অনিত্যতা, কৃষি বিজ্ঞানের অনিত্যতা, ধনজন পরিজনের অস্থিরতা ক্রমে তাহার আত্মার ভাবকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে থাকে। তখন মনুষ্য বুঝিতে থাকে যে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভই মনুষ্যের সকল লাভের চরমসীমা। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে মনুষ্যের আর অন্য কোন অভাব থাকে না।

ঈশ্বর আমারদের আত্মার অন্তরাত্মা। মানবাত্মা তাঁহারই সাদৃশ্যে গঠিত। ঈশ্বরবিষয়ক আস্তিক বুদ্ধি তাঁহার অনুপম পিতৃভাব অসদৃশ মাতৃস্নেহ, আত্মাই বিশদরূপে অনুভব করিতে পারে। "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া" এই মতি তর্ক দ্বারা প্রাপনীয় নহে। তিনি আমারদের প্রত্যেকের আরাধ্য দেবতা প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন। কৃপণের ধনের ন্যায় তাঁহাকে আত্মার অভ্যন্তরে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। তিনি সাধনের ধন। ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তবে আত্মার বলে সাধনার বলে তাঁহার আত্মস্বরূপ আমারদের নিকট প্রতিভাত হয়।

মনুষ্যবিশেষের ন্যায় মনুষ্য সমাজেরও বাল্য, যৌবন ও পরিণতির অবস্থা আছে। মনুষ্য সমাজের ন্যায় মনুষ্য—যখন বাল্যাবস্থায় প্রবিষ্ট হয়, তখন আহার বিহার লইয়াই সে নিকৃষ্ট সুখ চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত থাকে। তখন চিন্তা বা ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা সে কিছুই অবগত নহে। ক্রমে যখন

যৌবন উপস্থিত হয় জনসমাজে শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়, মনুষ্যও উহার চর্চ্চায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। প্রভূত বলবিক্রম লাভ করিয়া বীরবিক্রমে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিতে থাকে। সংসারের অনিত্যতা, সাংসারিক সুখের অস্থিরতা বুঝিতে পারে না। ক্রমে সাধন তপস্যায় তাহার অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হয়। এ অবস্থা মনুষ্য বা সমাজের পরিণতির অবস্থা। যৌবনে যে কিছু সত্য সঞ্চয় করে, যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করে, যৌবন-সুলভ চপলতার অপগমে মনুষ্য তাহা ভোগ করিতে থাকে। যে অক্ষয় ধনে ধনী হইতে পারিলে নির্ভয় হওয়া যায়, মনুষ্য তাহারই অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হয়। আত্মা এই অবসরে নিজ কন্দরে ঈশ্বরের সংমোহন মূর্ত্তি প্রতিফলিত করে। মনুষ্য তাহা দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারে না। সংসারের দিকে আর দীপ্তশিরা হইয়া ধাবিত হয় না। বলিতে থাকে "সংসারের সুখ যাহা জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে"। এই অবস্থা জনসমাজের বা মনুষ্যের পক্ষে পরম সম্পদের অবস্থা। এই অবস্থায় উঠিতে পারিলে আর স্খলিতপদ হইতে হয় না। তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান পুরুষ যিনি সংসার-মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইবার পূর্ব্বে অক্ষয় ব্রহ্মপদ দেখিতে পান। যিনি শরীর মন আত্মার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াও আত্মার অনন্ত ক্ষেত্র ও অনন্ত অধিকার ক্ষণমাত্র বিস্মৃত নহেন।

ব্রহ্মসাধন অতি কঠোর সাধন, শরীর মন আত্মা নিয়োজিত কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা তাঁহার দ্বারের একমাত্র কুঞ্চিকা। তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, মনেরও গ্রাহ্য নহেন। তিনি কেবল আত্মারই গ্রাহ্য। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"। তিনি বাক্য, মন ও চক্ষুর গোচর নহেন। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজে অশান্তি।

(এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মের লেখার উপর আর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মের মন্তব্য প্রকাশ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্ম মহাশয় লিখিয়াছেন যে আধ্যাত্মিকতার অভাবই ব্রাহ্মসমাজের অশান্তির কারণ। ইহা অতি যথার্থ কথা কিন্তু আমাদিগের মতে সকল আধ্যাত্মিক গুণের মধ্যে ঔদার্য্য গুণের অভাবই এই অশান্তির বিশেষ কারণ। আমাদিগের কাহারও সঙ্গে একটু মত বিভেদ হইলেই আমাদিগের মনে তাহার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষের উদয় হয় কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আসল বিষয়ে যদি আমাদিগের মতের ঐক্য থাকে তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের অনৈক্যে কি আইসে যায়? শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গত সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় তিনি ব্রাহ্মদিগকে যে অমূল্য উপদেশ দেন তাহাতে এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। "তোমরা সকলে এক-হৃদয় এক-বাক্য হইয়া চল—বেদবচনে তোমাদিগের প্রতি এই যে আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ ও হিত কামনা প্রকাশ করিলাম, এই বিবাদ কলহের মধ্যে তাহার প্রতি তোমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য যদি তোমরা এই পদ্ধতিটি অবলম্বন কর তবে ইহাতে সিদ্ধকাম হইবে। পদ্ধতিটি এই আমরা আদি ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম বা মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোন রূপ

ব্রাহ্ম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া, আমরা ব্রাহ্ম এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদিগের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটির প্রতি আত্মার সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করি। এই পদ্ধতিই সম্মিলনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তোমাদিগের মধ্য হইতে সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, শান্তির অভ্যুদয় হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।" বাঙ্গালীর দোষ-দর্শনবৃত্তি প্রবল। এই প্রবলতা হেতু এই জাতি উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক ঐক্য আছে। তাহার কারণ এই যে ঐ সকল দেশের লোকের দোষ-দর্শন বৃত্তি এত প্রবল নহে। বঙ্গদেশে এই দোষ দর্শন বৃত্তির প্রবলতা রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন অনৈক্য ও বিবাদের হেতু তেমনি ধর্ম্ম বিষয়েও অনৈক্য ও বিবাদের হেতু। মনুষ্যের দোষের ভাগ অপেক্ষা গুণের ভাগ দেখা কর্ত্তব্য। এই দোষ দর্শন প্রবৃত্তির প্রবলতার কারণ ঔদার্য্যের অভাব। ব্রাহ্মসমাজে অশান্তির আর এক কারণ প্রাধান্যের ইচ্ছা। ব্রাহ্মসমাজের লোক মুষ্টিমেয় লোক। এই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে বিরোধ কলহের প্রবলতা দেখিয়া বাহিরের লোকে অবাক্ হয়। এই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সকলেরই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রাধান্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে, যে প্রাধান্য চায় সে প্রাধান্য পায় না; যে প্রাধান্য চায় না সে প্রাধান্য পায়। যাহাকে ঈশ্বর প্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সে প্রধান হইতে চেষ্টাবান হউক বা না হউক সে প্রধান হইবেই। আর সকলই যদি প্রধান হইবেক তবে নিকৃষ্ট হইবেক কে? ব্রাহ্মসমাজের সকলেরই এক একটি নূতন নূতন মত, একটি একটি নূতন দল, স্থাপন করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা। ইহাতে কেবল বিরোধ কলহই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদিগের সমাজের মহা বাক্য বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য। আসল বিষয় ঐক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অনৈক্য অতএব নূতন দল স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। নূতন দল স্থাপনের একমাত্র মূল প্রাধান্যের ইচ্ছা এবং নম্রতা ও ঔদার্য্যের অভাব। কোন মহাত্মা ঔদার্য্যের গুণ যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম আমরা দিতেছি। "যদ্যপি দেবতার ন্যায় আমার বক্তৃতা-শক্তি থাকে, যদ্যপি আমার ভবিষৎ বিষয়ে দিব্য জ্ঞান থাকে, যদ্যপি গুপ্ত অগুপ্ত সকল বিদ্যা আমার আয়ত্ত থাকে, যদ্যপি ঈশ্বরে আমার খুব বিশ্বাস থাকে, যদ্যপি আমি আমার সর্ব্বস্ব দরিদ্রকে দিই কিন্তু যদি আমার ঔদার্য্য গুণ না থাকে তাহা হইলে তাহাতে কোন উপকারই হইবে না। ঔদার্য্য অনেক সহ্য করে, ঔদার্য্য সদাই সদয়। ঔদার্য্য ঈর্ষা করে না, ঔদার্য্য গর্ব্ব করে না, ঔদার্য্য স্ফীত হয় না, ঔদার্য্য অভদ্র ব্যবহার করে না। ঔদার্য্য স্বার্থ খুজে না, ঔদার্য্য শীঘ্র রুষ্ট হয় না, ঔদার্য্য কু ভাবে না। ঔদার্য্য সকল বহন করে, সকল বিশ্বাস করে, সকল আশা করে, সকল সহ্য করে। ঔদার্য্য কখন অসিদ্ধ হয় না। ভবিষৎ দৃষ্টি অসিদ্ধ হয়, বক্তৃতাশক্তি অসিদ্ধ হয়, বিদ্যা অসিদ্ধ হয়। কিন্তু ঔদার্য্য কখন অসিদ্ধ হয় না।" এই ঔদার্য্য গুণ যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজের এক নূতন শ্রী হইবে।

কোন ইংরাজ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক কাশীর দণ্ডী ও পরমহংসদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাঁহাদিগের মনের শান্তি অত্যন্ত ও তাঁহাদিগের চিত্ত সদাই আত্মপ্রসন্নতা দ্বারা

জ্যোতিষ্মান। "great tranquility of mind and radiant happiness of temper" কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ইহার বিপরীত দেখা যায়। ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সদাই চঞ্চল, সদাই আবেগপূর্ণ, সদাই অসন্তুষ্ট, সদাই দোষানুসন্ধানে তৎপর। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে 'সম্যক প্রশান্ত চিত্তায় সমান্বিতায় প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম বিদ্যাং।' সম্যক প্রশান্তচিত্ত ও সমান্বিত ব্যক্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবে। আমরা তাঁহাদিগের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া কি এই শান্তি ভোগ করিতেছি? ইহা গভীর আলোচনার বিষয়।

শান্তিনিকেতন।

মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে স্থলে অনেকানেক স্থানের ভগবদ্ভক্ত সাধুলোক সকল আসিয়া আশ্রয় লন তাহাই তীর্থ এবং তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণেই তৎতৎ স্থান পবিত্র স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলত তীর্থস্থান থাকাতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য ও উপকার সাধিত হয়। সংসারের অনেক পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা। কিছুদিনের জন্য ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ করিলে মনের নির্বৃতিলাভ হয় এবং সংসার তাপ অনেকটা ঘুচিয়া যায়। এই সাধু উদ্দেশে আজও অনেকে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সাধুসঙ্গে ও সৎ প্রসঙ্গে নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত ব্রাহ্ম সাধারণকে জানাইতেছি যে তাঁহাদের জন্য ঐরূপ একটী পবিত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বীরভুমের অন্তর্গত বোলপুরের সুপ্রসিদ্ধ শান্তিনিকেতন। তিনি ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ ঐস্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রহ্মসন্তান সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে ঐ স্থানে যাইবেন। উহা ব্রহ্মবিৎ সাধু লোকের আশ্রয়-ভূমি হইয়া রহিল। যাঁহারা সাংসারিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া মনের শান্তি হারাইয়াছেন তাঁহারা ঐ শান্তিনিকেতনে যাত্রা করুন। উহা সাধু সমাগমে সততই পবিত্র। তথায় যাইলে জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবলে বলবান হইতে পারিবেন। ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে একটী সাধু সজ্জনের মেলা হইবে। দেশ দেশান্তরের জ্ঞানী ও সাধুর সমাগম হইবে। যিনি সংশয়ী ধর্ম্মবাদ তাঁহার সংশয় দূর করিবে। যিনি আরুরুক্ষু তিনি ধর্ম্মের সোপান পাইবেন। যিনি প্রেমিক তিনি হৃদয়োন্মাদকর অনেক সৎকথা শুনিবেন। যিনি সজ্জনভক্ত তাঁহার আশা চরিতার্থ হইবে। এই স্থানের যেমন পবিত্রতা তেমনি রমণীয়তা। ইহার চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তর। স্বাস্থ্যকর মুক্ত বায়ু সততই বহিতেছে। মধ্যে উদ্যান ভূমি ও প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তথায় ছায়াবৃক্ষ ও নির্ম্মল জলের অভাব নাই। কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুমধুর সঙ্গীতের বিরাম নাই। এই নির্জন স্থান শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সাধনস্থান ছিল। তিনি অনেক সময় ঐ স্থানে কালাতিপাত করিতেন। ফলত তাঁহার অধিষ্ঠানে ঐ স্থান পবিত্র। যিনি যতই মনোবিকার লইয়া যান স্থানমাহাত্ম্যে তাঁহার মনে নির্ম্মল ও পবিত্র শান্তি আসিবে। ব্রাহ্মসমাজের অদ্বিতীয় ও চির বন্ধু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মদিগের উপকারার্থ এই পবিত্র স্থান উৎসর্গ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে সকল কার্য্য তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে ইহাও তন্মধ্যে একটী প্রধান কার্য্য। এখন ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি তিনি যে সৎ

উদ্দেশ্যে ইহা দান করিলেন তাহা যেন সুসিদ্ধ হয়।

আমরা নিম্নে ইহার ট্রষ্টডীড মুদ্রিত করিয়া দিলাম। ইহা পাঠ করিলে ইহার কত উচ্চ ও সৎ উদ্দেশ্য তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ট্রষ্টডীড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাং যোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মাণিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্কষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

স্নেহাপদেষু।

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা যোড়াসাঁকো হাল সাং পার্কষ্ট্রীট্।

কস্য ট্রষ্ট ডিড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতি ডিষ্ট্রীক্ট রেজেষ্টারী বীরভূম সব রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিস ডিবিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনির ডৌল খারিজান মৌজে ভুবন নগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপসিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহদিগরের নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতালা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুত পূর্ব্বক মৌরসী স্বত্বে স্বত্ববান্ ও দখলিকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটী আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্টডিডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতেছি যে তোমরা ট্রষ্টী স্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডিডের স্বর্ত্তমত স্থলাভিষিক্ত গণ ক্রমে চিরকাল এই ডিডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎলিখিত নিয়ম মতে সম্পন্ন করিয়া দখলিকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রষ্টডিডে যেরূপ লিখিত হইল তৎ বিপরীতে কখনো হইতে পারিবে না। এই ট্রষ্টীর কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত অনুসারে কার্য্য হইবেক। কোন ট্রষ্টী কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ট্রষ্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ তাহার স্থানে এই ডিডের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন প্রাপ্তবয়স্ক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রষ্টী সর্ব্বাংশে এই ডিডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত

কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিস ভোজন বা মদ্য পান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যান ধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না। ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্ম-বিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোন রূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ-নির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগন যত্নসহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তি-নিকেতনের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রষ্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রষ্টীগণের লিখিত অনুমতি গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন। কিন্তু ট্রষ্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐ রূপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা আশ্রমধারী তাহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন যদি ট্রষ্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রষ্টীগণের থাকিবে। যদি কেহ কখন এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রষ্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডিডের লিখিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন। এই ডিডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্যয় সঙ্কুলন জন্য দ্বিতীয় তফশীলের লিখিত সম্পত্তি সকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৪৫২ টাকা। ট্রষ্টীগন অদ্য হইতে ঐ সকল সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার বিলিবন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয় আশ্র-

গের গৃহাদি মেরামত ও নির্ম্মাণ এবং এই-ডিডের লিখিত অন্যান্য সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তি সকলের আয়ের দ্বারা ট্রষ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্‌বৃত্ত হয় তবে ট্রষ্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোন রূপ নিরাপদ মালিকি সত্ত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোন রূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রষ্টী-সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই-ডিডের সর্ত্ত মত ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত আয় হইতে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোন কার্য্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রষ্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ এই আশ্রমের আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডিডের লিখিত কার্য্য সমূহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে অর্পিত সম্পত্তির আয় ট্রষ্টীগণ ব্যয় করিতে পারিবেন না ও এই সকল সম্পত্তির কোন রূপ দান বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায় সংযোগ করিতে পারিবেন না। ও ট্রষ্টীগণের নিজের কোন ঋণ দেনার নিমিত্ত এই সকল সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ দায়ি হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহী ও পাবনার অন্তর্গত সালিমপুর ও ভর্ত্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠী আছে কোন কারণ বশত ঐ কুঠীর দ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রষ্টীগণ এই দুই কুঠী বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের টাকা দ্বারায় ট্রষ্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডিডের সর্ত্তমতে কার্য্য হইবেক এতদর্থে তৃতীয় তপশীলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রষ্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রষ্টডিড্ লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভক্ত প্রহ্লাদ।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন কিন্তু উহা তাঁহার ভাল লাগিত না। যে শাস্ত্র তুমি আমি এইরূপ ভেদজ্ঞান শিক্ষা দেয় প্রহ্লাদের বুদ্ধিতে তাহা অসৎশাস্ত্র। এই জন্য তাহাতে তাঁহার মনোনিবেশ হইত না।

একদা দৈত্যপতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস তুমি কি ভাল বুঝিয়াছ তাহা আমাকে বল।

প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ তুমি আমি এই রূপ মিথ্যা বা ভ্রমজ্ঞান বশত যাহাদের বুদ্ধি চঞ্চল হইয়াছে তাহাদের এই অধঃপাতের একমাত্র হেতু অন্ধকূপতুল্য গৃহ এককালে পরিত্যাগ ও হরির পদাশ্রয়কে আমি শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি।

দৈত্যপতি প্রহ্লাদের কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন পরবুদ্ধিতেই বালকের এইরূপ মতিচ্ছন্ন হইতে পারে। যা হোক এখন ইহাকে গুরু গৃহে লইয়া যাও। আর যাহাতে হরিভক্তেরা প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহার এইরূপ বুদ্ধিমোহ না জন্মাইতে পারে সে বিষয়ে সাবধান হও।

অনন্তর প্রহ্লাদের শিক্ষকেরা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া স্নেহ বাক্যে কহিলেন বৎস প্রহ্লাদ তুমি সত্য বল, তোমার এই-

রূপ বুদ্ধিমোহ কেন উপস্থিত হইল। ইহা তোমার পরকৃত, না আপনা হইতেই জন্মিয়াছে। তুমি স্পষ্ট করিয়া বল শুনিতে আমাদের অতিশয় কৌতুহল হইতেছে।

প্রহ্লাদ কহিলেন দেখুন ব্রহ্মেরই মায়াবলে লোকের এইরূপ আত্মপর ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি অনুকূল হইলে এই জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। এবং অভিন্ন আত্মায় নিষ্ঠা আইসে। যখন মুনি ঋষিরা যাঁর দুরবগাহ চরিত্রে বিমুগ্ধ হন তখন অবিবেকীরা সেই একমাত্র আত্মাকে স্বপর ভেদে দর্শন করিবে ইহাতে আর কথা কি। আপনারা আমার যে এই বুদ্ধিভেদের কথা জিজ্ঞাসিলেন, বলিতে কি, ইহা তাঁহারই প্রসাদে ঘটিয়াছে। যেমন লৌহ অয়স্কান্তের সান্নিধ্য পাইলে আপনা হইতেই ভ্রাম্যমান হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া স্বতই আমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। জানি না ইহা আমার কোন্ পুণ্যের ফল।

প্রহ্লাদের এই কথায় রাজসেবক গুরু অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং কহিলেন অরে, এই দৈত্যকুল চন্দন বৃক্ষের তুল্য, ইহাতে একটা কণ্টক বৃক্ষের জন্ম হইয়াছে। হরি চন্দন বনের উন্মূলনের পরশু, এই বালকটী সেই অস্ত্রেরই মুষ্টিদেশ।

শিক্ষকেরা প্রহ্লাদকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া আবার দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ কিয়ৎকাল শিক্ষার পর একদা তাঁহারা দৈত্যপতির নিকট লইয়া গেলেন। দৈত্যরাজ পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপবিষ্ট। প্রহ্লাদ প্রণাম করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন বৎস! এ যাবৎকাল তুমি গুরুগৃহে যাহা শিক্ষা করিয়াছ আমার নিকট তাহার পরিচয় দেও।

প্রহ্লাদ কহিলেন পিতঃ যে শিক্ষায় ব্রহ্মের শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পরিচর্য্যা পূজা বন্দনা দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তি জন্মে আমি তাহাকেই সৎ শিক্ষা বলি।

দৈত্যপতি পুত্র প্রহ্লাদের এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শিক্ষকদিগকে কহিতে লাগিলেন রে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! তোমরা আমার বিদ্বেষের পাত্র হরির আশ্রয় লইয়াছ। এবং আমার অবমাননা করিয়া এই বালককে অসার বিষয় সকল শিক্ষা দিয়াছ। এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে তাহারা ছদ্মবেশী দুর্মিত্র। সুরাপায়ী প্রভৃতি মহাপাতকীদিগের যক্ষ্মাদি রোগ যেমন কালে প্রকাশ পায় সেইরূপ কালেই তাহাদের বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিক্ষক কহিলেন দৈত্যরাজ আপনার পুত্র যাহা কহিতেছেন ইহা আমার বা অপর কাহারও উপদেশে হয় নাই। এই বালকের ইহা নৈসর্গিকী বুদ্ধি। অতএব আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমাদের প্রতি এই রূপ দোষারোপ করিবেন না।

তখন দৈত্যরাজ কহিলেন প্রহ্লাদ, যদি তোমার জ্ঞান গুরুমুখী না হয় তবে তুমি এই অসৎ ও অভদ্র জ্ঞান কোথা হইতে পাইলে।

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! সংসারেই যাহাদের সমস্ত সংকল্প বদ্ধ তাহাদের এই ব্রাহ্মী বুদ্ধি স্বত বা পরত কোন রূপেই উপস্থিত হইতে পারে না। তাহাদের ইন্দ্রিয় অসংযত সেই হেতু তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং কেবলই ভোগ্য ভোজ্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

ঈশ্বর অসীম।

চতুর্দ্দিকে আমাদের নানা বিষয় লালসা ঘিরিয়া রহিয়াছে, প্রতি পদক্ষেপে কণ্টকের আঘাত তবুও আমরা এই সংসারে সুখে বর্দ্ধিত হইতেছি। তাহার কারণ শুধু তিনি। তাঁহার প্রাণে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুপ্রাণিত হইতেছি বলিয়া সেই মহাপ্রাণের ছায়ায় বসিয়া আমরা বাল্য হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থা, প্রৌঢ়দশা হইতে বার্দ্ধক্যে পতিত হইয়া ক্রমশই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাহার বিরাম নাই। এই যে অগ্রসরের ভাব আমাদের প্রত্যেকের জীবনে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ইহার জন্যই আমরা বাঁচিয়া আছি, বিষয় আমাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, আমরা সেই মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইতেছি। সেই লক্ষ্য কি আমাদের বিভীষিকা? সেই লক্ষ্য কি আমাদের সীমাবদ্ধের ভয় দেখাইতেছে? না। যেমন কোন পথের উপর দাঁড়াইয়া যখন তাহার শেষ পর্য্যন্ত দেখি তখন স্বাভাবিক দৃষ্টির গতি অনুসারে মনে হয় বটে যে, পথ বুঝি ঐ স্থানে শেষ হইল আর নাই। কিন্তু পথের সেই সীমাবিন্দুতে যদি একবার গিয়া পঁহুছই তাহা হইলে তখন কি আমাদের যে সীমা মনে হইতেছিল তাহা থাকে? পথের আবার পূর্ব্বের মত সেই বিস্তার দেখিয়া আরও অগ্রসর হইবার ভাব জন্মে—হৃদয়ের আনন্দের প্রসারতা আরও বাড়িয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম আমাদের। সেই ব্রহ্মবিন্দুতে সকলি আসিয়া শেষ হইয়াছে। আমাদের নয়নের সমক্ষে তিনিই এক বিন্দু। সেই পরম বিন্দুকে কোন রূপ সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা ও তাহাতে আপ্তকাম হইবার মানস করা আত্মার উন্নতির মহান ব্যাঘাত। দূর হইতে যত তাঁহাকে আমরা দেখিব আমাদের দৃষ্টির অপূর্ণতা নিবন্ধন ততই তাঁহাকে সীমা আকারে দেখিতে পাইব। যতই কাছে যাইব—সীমা নাই এই বিশ্বাস ভরে যত কাছে যাইব ততই তাঁহার মাধুরী স্পষ্ট বোধগম্য হইতে থাকিবে।

হে পরমাত্মন! তোমারেই প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের জীবন। তোমারই সহবাসে আমাদের আনন্দ। আমরা অদ্য তোমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি, পবিত্রতা প্রেরণ কর যাহাতে তোমার আনন্দ রূপ অমৃতরূপ দেখিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি।

হিতেন্দ্র

নূতন পুস্তক।

সাহিত্য প্রসূন। শ্রীনৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। সংগ্রহকার বঙ্গীয় সাহিত্য ভণ্ডার হইতে কতিপয় রত্ন সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা এই সংগ্রহের বিশেষ আর কি পরিচয় দিব। যে সমস্ত লোক সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ তাঁহাদেরই গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। ফলত ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষার একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।
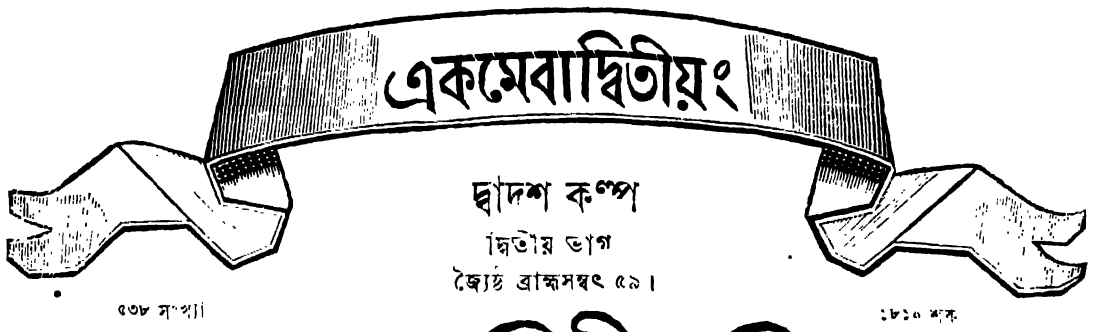
আত্মার অমায়িক সহজ ভাব।

যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা তোমার নিকটতম বস্তু কে? তিনিই তাহার এই প্রত্যুত্তর দিবেন যে আমি আপনি। কেহই বলিবেন না যে আমি আপনা হইতে দূরে আছি; সকলেই বলিবেন যে আমার আপনার নিকট হইতে আমার লেশমাত্রও ব্যবধান নাই। অতএব যদি কোনও সত্য সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় তবে তাহা এই যে, আত্মা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বস্তু।

"আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম বস্তু" ইহা অপেক্ষা সহজ সত্য আর কিছুই নাই; কিন্তু সহজ বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা হইতে পারে না; বীজকে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিলে ফলের প্রত্যাশায় একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সকল সত্যই পরস্পরের সহিত এরূপ অকাট্য সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত যে আমরা যদি একটি সামান্য সত্যকেও স্থিররূপে ধরিতে পারি তবে তাহার মধ্য দিয়া ক্রমশই উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্য অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। উপরি-উক্ত সহজ সত্যটির পথ ধরিয়া চলিলে আমরা নিম্ন-লিখিত গুটি-কতক অমূল্য আধ্যাত্মিক সত্যে সহজেই উপনীত হই।

প্রথমত, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বস্তু তাহাকে হারানো দুষ্কর; দুষ্কর তো বরং পদে আছে—তাহাকে হারানো একবারেই অসম্ভব। এই কাগচের দুইটা পৃষ্ঠা—দুইএর মধ্যে ব্যবধান অবশ্যই আছে, তথাপি মোটামুটি এরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে যে এই কাগচের এক পৃষ্ঠা তাহার আর এক পৃষ্ঠাকে হারাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের আপনার সঙ্গে আপনার সেটুকুও ব্যবধান নাই—মূলেই ব্যবধান নাই; কাজেই বলিতে হয় যে আপনাকে আপনি হারানো একান্ত-পক্ষেই অসম্ভব। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে আত্মা কখনই আমাদের নিকট হইতে যাইবার বস্তু নহে—তাহা আমাদের চিরস্থায়ী পৈতৃক সম্পত্তি।

দ্বিতীয়ত, আত্মা যদি আমাদের এতই নিকটতম বস্তু—এমন কি তাহাকে হারানো

পর্য্যন্ত অসম্ভব—তবে তাহার জন্য সাধনের প্রয়োজন কি? ইংলণ্ড হইতে আমি দূরে আছি এই জন্য ইংলণ্ডে যাইতে হইলে তাহার জন্য আমার সাধনের প্রয়োজন; কিন্তু আমি এখন কলিকাতায় রহিয়াছি, এ অবস্থায় কলিকাতা-প্রাপ্তির জন্য আমার সাধন আবার কিরূপ? তবে কি লোকে আত্মাকে লাভ করিবার জন্য এত যে কষ্টকর সাধনে প্রবৃত্ত হয়—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি? তাহা নহে। মনে কর যেন আমি বিদেশ হইতে নৌকা-যোগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতেছি; একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি যে, সমস্ত দিক্ বিদিক্ ঘন কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন; নাবিককে কোথায় আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করাতে নাবিক বলিল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; কিন্তু আমি কলিকাতার চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাইতেছি না; এইরূপে আমি কলিকাতায় অবস্থিত হইয়াও কলিকাতাকে হারাইয়া বসিয়া আছি। এ অবস্থায় যদি আমি কোনপ্রকার সাধনা দ্বারা কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিতে পারি তবেই আমি কলিকাতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হই। সাধনের যে কি প্রয়োজন—এখন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আত্মাতে পৌঁছিবার জন্য নহে (আত্মার সহিত মূলেই যখন আমাদের কোন প্রকার ব্যবধান নাই, তখন তাহাতে তো আমরা পূর্ব্ব হইতেই পৌঁছিয়া বসিয়া আছি), তবে কি—না মনের ভ্রম-প্রমাদ-মোহ রূপ কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিবার জন্যই সাধনের একমাত্র প্রয়োজন।

এইখানে কেহ বলিতে পারেন যে মনের কুজ্ঝটিকা কি আত্মার কুজ্ঝটিকা নহে—মন কি আত্মা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু? আমাদের দেশের শাস্ত্র-সমূহে অনেক কাল যাবৎ এ বিষয়ের চরম বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই; পরমার্থত আমি রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত কিন্তু ব্যবহারত আমি রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন; ইহারই ভাষান্তর এই যে আত্মা রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত, মন রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন; সঙ্ক্ষেপে পারমার্থিক আমিই আত্মা সাংসারিক আমিই মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মনই বা রোগ শোকাদির অধীন হয় কেন—আত্মাই বা তাহা না হয় কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে মন পরিবর্ত্তন-শীল নশ্বর বিষয়-সকলেতে প্রতিষ্ঠিত—বালির বাঁধের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাই তাহা রোগ শোকাদিতে আক্রান্ত হয়; আত্মা অনাদ্যনন্ত পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত—অটল ভিত্তিমূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাই তাহাকে রোগ শোকাদি কোন প্রকার দুর্ঘটনাই নাগাল পায় না; মেঘমালা পর্ব্বতের কটিদেশেই ঘুরিয়া বেড়ায়, শিখরকে কোন প্রকারেই স্পর্শ করিতে পারে না। এইখানে এইটির প্রতি বিশেষ-রূপে দৃষ্টি করা আবশ্যক যে, আমাদের আত্মা আমাদের আপনাদের সাধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে কিন্তু পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদিগকে যদি আপনার চেষ্টায় নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি নিয়মিত করিতে হইত—অন্ন পরিপাক করিতে হইত—শারীরিক উপাদান সকল নির্ম্মাণ করিতে হইত তাহা হইলে আমাদের শরীরকে এক মুহূর্ত্তও টেঁকিয়া থাকিতে হইত না; তেমনি যদি আমাদের আপনার চেষ্টায় আত্মার স্থিতি রক্ষা করিতে হইত তাহা হইলে আত্মা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইত। বরং প্রদী-

পকে ফাঁকা স্থানে বাঁচাইয়া রাখিলেও রাখা যাইতে পারে—আত্মাকে আপনার চেষ্টায় বাঁচাইয়া রাখা দেবতারও অসাধ্য। কিন্তু যখন আত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—তখন সে মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছে—সেখান হইতে কেহই তাহাকে অপহরণ করিতে পারে না ও সেখানে তাহাকে কোন বিপদই স্পর্শ করিতে পারে না।

সাধন তবে কিসের জন্য? সত্য বটে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটতম বস্তু; কিন্তু আমরা যখন আমাদের মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই যে আমাদের মন সর্ব্বদাই আমাদের আপনাদের নিকট-হইতে দূরে দূরে পরিভ্রমণ করে। বহির্ব্বস্তু যেমন ইতস্তত চালিত হয়—মনও সেইরূপ ইতস্তত চালিত হয়; কখনও বা প্রকৃতির অধীনে চালিত হয় কখনও বা আমাদের আপনাদের অধীনে চালিত হয়; এই মনকে বশীভূত করাই সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু আর এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা বহির্বস্তু সকলকে আপন ইচ্ছায় ইতস্তত চালনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বহির্বস্তু-সকলের মূলস্থানীয় প্রকৃতির উপরে আমাদের কোন হস্ত নাই। তেমনি আবার আমরা আমাদের মনকে আপন ইচ্ছানুসারে যথা তথা চালনা করিতে পারি বটে, কিন্তু মনের মূলস্থানীয় আত্মার উপরে আমাদের আপনাদের কোন হস্ত নাই। সমস্তের মূল স্থান একমাত্র কেবল পরব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত এবং সেখান হইতে তাহা তিলমাত্রও বিচলিত হইতে পারে না। আমরা বহু যত্নে বীজ আনয়ন করিলাম—ক্ষেত্রকর্ষণ করিলাম—বীজকে তাহার সেই সুখের শয্যায় নিহিত করিলাম; তাহার পর বীজ আমাদের নিকট কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনার কার্য্য আপনি করিতে আরম্ভ করিল; কিছু দিন যাইতে না যাইতেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; তাহার আর কিছু দিন পরে শাখাপত্র ফলফুলে সুসজ্জিত হইয়া উঠিল; ইহাতে আমাদের হস্ত কতটুকু? শুদ্ধ কেবল বীজকে আনয়ন করা এবং ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা—এইমাত্র। মনকে সেইরূপ দিগ্দেশ হইতে প্রত্যানয়ন করা এবং আত্মাতে সমাহিত করা অবশ্যই আমাদের সাধন-সাপেক্ষ; কিন্তু তাহার পর ঈশ্বর-প্রসাদে মন আপনার কার্য্য আপনি করিয়া লয়; আমাদের সাধনের কোন অপেক্ষা রাখে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

"যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।"

অর্থাৎ চঞ্চল অস্থির মন যেখানে যেখানে ধাবিত হয় সেই সেই স্থান হইতেই তাহাকে বাগাইয়া আনিয়া আত্মাতে সংযত করিয়া রাখিবে। আরও বলিতেছেন—

"শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।"

অর্থাৎ ধৈর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা মনকে অল্পে অল্পে বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে আত্মাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া কোন চিন্তাই করিবে না। এইরূপ মনকে প্রত্যানয়ন করা এবং তাহাকে আত্মাতে সন্নিবিষ্ট করা ইহাই সাধনের মুখ্য কার্য্য। তাহার পর যাহা কিছু হইবার তাহা ঈশ্বর-প্রসাদে আপনা হইতেই হইবে,—তাহার জন্য আমাদের চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। তাই কথিত হইয়াছে "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"। বীজকে যত্ন পূর্ব্বক বপন করা অবশ্য আমাদের সাধন-সাপেক্ষ,

তাহার পরে আর আমাদের চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তখন বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে পত্রপুষ্প-ফলোদ্গম, ইত্যাদি যাহা কিছু হইবার তাহা আপনা হইতেই হয়। আর এক কথা এই যে, আমাদের অভীষ্ট বিষয় যতক্ষণ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকে ততক্ষণই তাহার জন্য আমাদের ভাবনা চিন্তা শোভা পায়; কিন্তু যখন আমরা তাহাকে মুষ্টির অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই তখন তাহার জন্য আমাদের ভাবনাই বা কি, আর, চিন্তাই বা কি। তখন চিন্তা আনন্দকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে আপনার আসন ছাড়িয়া দিয়া আপনি অন্তর্দ্ধান করে। তেমনি আমাদের মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা হইতে দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায় ততক্ষণই আত্মার জন্য আমাদের যাহা কিছু ভাবনা চিন্তা; কিন্তু যখন আমাদের মন আত্মাতে রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসে—আত্মাকে যখন করতলে প্রাপ্ত হয়—তখন আর ভাবনা চিন্তার আবশ্যকতা থাকে না, তখন বিমল আনন্দ অভ্যুদিত হইয়া সমস্ত ভাবনা চিন্তা গ্রাস করিয়া ফেলে।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা আলোচনা করা হইল তাহা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, মনের গতি-কে বিষয় রাজ্য হইতে আত্মার দিকে ফিরাইয়া আনাই সাধন। বহির্বস্তুর গতি এবং মনের গতি এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গতিশীল বহির্বস্তু হইতে বস্তুটিকে বাদ দিয়া শুদ্ধ যদি তাহার গতিটিকে গ্রহণ করা যায়, তবে সেইরূপ বস্তু-শূন্য গতিই মনের গতির একমাত্র উপমা-স্থল, কেননা মন যখন চলে তখন তাহার সে চলার সঙ্গে কোন বস্তু মিশ্রিত থাকে না। তাহার সেই গতি শূন্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু গতি বস্তুকে চায়—স্থিতিকে চায়, নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিধান করিতে চায়; শূন্যে শূন্যে থাকিতে চায় না; এই জন্য মন আপনার গতি-কে বিষয় ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য—অবস্তুক গতিকে সবস্তুক করিবার জন্য—লালায়িত হয়; মন স্বভাবতই আপনার গতি-কে নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি নৈসর্গিক ক্রিয়াতে এবং চলা-ফেরা, দেখা-শোনা, বলা-কহা, নৃত্য গীত, ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াতে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু বিষয়-ক্ষেত্র পরিমিত, মনের গতি অপরিমিত; বিষয়-ক্ষেত্রে মনের গতি এক আনা মাত্র চরিতার্থ হয়—পোনেরো আনা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সুতরাং মন তাহাতে আশানুরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনা কখনই নিবৃত্ত হয় না—ঘৃত প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। সাধক তাই বিষয়-ক্ষেত্র হইতে মনের গতি ফিরাইয়া আনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম এবং অন্তরতম আত্মাতে সমাহিত করেন—ইহাতে তাঁহার মন স্বস্থানে বসিয়াই সমস্ত কামনার বিষয় হাত বাড়াইয়া পায়; এইরূপ সাধকই "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" ইনি আত্মাতে ক্রীড়া করেন, আত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশালী হয়েন—ইনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবং এইরূপ সাধক উপলক্ষে ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে নদী আসিয়া বিলীন হয় তেমনি কামনা-সকল যাঁহাতে আসিয়া লয় প্রাপ্ত হয়—তিনিই শান্তি লাভ করেন, কামনার জন্য যিনি লালায়িত তিনি নহেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, সাধক অনেক সাধ্য-সাধনা দ্বারা অবশেষে যে আধ্যাত্মিক আনন্দে উপনীত হ'ন—বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহা সাধন-নিরপেক্ষ; তাহা আত্মার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নহে—তাহা আত্মার পৈতৃক সম্পত্তি; পরমাত্মার প্রসাদ এবং করুণাই তাহার মূল; মোহাচ্ছন্ন মনের আবরণে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত ছিল—সাধক সেই ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া ফেলিল, আর, আত্মার সুবিমল আনন্দ আপন মহিমায় জাগ্রত হইয়া উঠিল। যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের সাধনের উপর নির্ভর করে তাহাতে বিশ্বাস নাই; কেননা বিপরীত সাধন দ্বারা তাহার ধ্বংস হইলেও হইতে পারে। আমরা যদি অনেক সাধ্য-সাধনায় একটা বৃহৎ উপলখণ্ডকে পর্ব্বতের উপর উত্তোলন করি, তবে তাহার বিপরীত সাধন দ্বারা অতীব সহজে তাহাকে আমরা পর্ব্বত হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারি। কিন্তু আত্মার স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার হস্তে গচ্ছিত রহিয়াছে—সেখান হইতে তাহা কোন ক্রমেই বিচ্যুত হইবার নহে; তাহা বিষয়-মোহ দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে অপহরণ করে। মনের মোহাবরণ অপসারিত হইলেই আত্মার স্বকীয় পারমার্থিক ভাব—জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান—অমায়িক প্রেম ও অপর্য্যাপ্ত শান্তিসুধা—মনের উপর কার্য্য করিতে পথ পায়; তখন, আত্মারূপ স্পর্শমণি সংসারকে পারমার্থিক রাজ্য করিয়া তুলে—লৌহকে সুবর্ণ করিয়া তুলে। ঈশ্বরের মহিমা যেমন অনন্ত তাঁহার করুণা তেমনি অপার; যেমন তিনি—তেমনি তাঁহার দান—সকলই আশ্চর্য্য, কিন্তু তাঁহার অপরাজিত করুণার নিকটে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। অতএব পাপরাশিতে ভারাক্রান্ত কলুষিত মন যে তাঁহার প্রসাদে পুনর্ নবোদিত দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল বদনে দীপ্তি পাইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

"সদ্গুরু পাওয়ে, ভেদ বতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকি ময়লা ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥"

আত্মার অন্তরতম আনন্দ যে আত্মার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহা যে কখনই আত্মা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না—তাহার প্রমাণ এই যে, আত্মাতে সত্য এবং জ্ঞান একীভূত হইয়া স্বভাবতই আনন্দে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞান দুইরূপ—বস্তু হইতে পৃথক থাকিয়া বস্তুকে জানা—এবং বস্তু হইয়া বস্তুকে জানা। বহির্বস্তুকে জানিবার সময় আমরা বস্তু হইতে পৃথক্ থাকিয়া বস্তুকে জানি: আত্মাকে জানিবার সময় আমরা আত্মা হইয়া আত্মাকে জানি। যখন আমরা ঘটি বাটীকে সত্য বলিয়া জানি, তখন সত্য আমাদের বাহিরে—জ্ঞান আমাদের অন্তরে—সত্য এবং জ্ঞান পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত; কিন্তু যখন আমরা আত্মাকে সত্য বলিয়া জানি, তখন সত্যও আমাদের অন্তরে—জ্ঞানও আমাদের অন্তরে—দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও ব্যবধান নাই। আত্মা যখন আপনাতে আপনি গলিয়া একীভূত হইয়া আপনাকে জানে তখন তাহার সেরূপ জানাকে জ্ঞান বলিলেও বলা যায়—প্রেম বলিলেও বলা

যায়; বাস্তবিক তাহা জ্ঞান এবং প্রেম দুয়েরই পরাকাষ্ঠা। আত্মা আপনাকে আপনি চায়, অথচ তাহার আপনার সহিত আপনার ব্যবধান নাই; অভিলষিত বস্তুর সহিত ব্যবধান না থাকা কত না আনন্দের প্রস্রবণ। এইরূপে আত্মাতে সত্য এবং জ্ঞান মিলিয়া মিশিয়া স্বভাবতই আনন্দে পরিণত হইয়া রহিয়াছে; তাহাকে মোহমুক্ত করিয়া আলোকে আবিষ্কৃত করা এবং কার্য্যে ফলিত করা—ইহাই সাধনের সার সংকল্প।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আত্মার সহজ আনন্দ বীজ-স্বরূপ; তাহার মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার প্রতি প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সকলেই দেখিয়াছেন—ছোলার বীজের দুই দল ভেদ করিয়া কেমন অল্পে অল্পে অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে; সত্য এবং জ্ঞান সেইরূপ আত্মার দুইটি দল; তাহার মধ্য হইতে আনন্দ-রূপ অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া পরমাত্মার প্রতি প্রসারিত হয়। এইরূপে যখন বিজ্ঞান-ময় কোষ হইতে আনন্দ-ময় কোষ উন্মেষিত হইয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন পরমাত্মার প্রসাদ-বারি এবং শান্তি-সুধা অবতীর্ণ হইয়া আত্মাতে নূতন জীবন সঞ্চার করে। এই যে একটি কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মার সহজ আনন্দ আমাদের সাধনের উপর নির্ভর করে না, ইহার অর্থই এই যে, তাহা জগতের মূলতম এবং অন্তরতম প্রদেশ হইতে—সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে—আসিতেছে; সাধক পরমাত্মার এই অপার করুণা দৃষ্টে এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হ'ন যে, তিনি তাঁহার ভক্ত সেবক এবং প্রেমিক না হইয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। পরমাত্মাই আত্মার পরম প্রতিষ্ঠা এবং চরম পর্য্যাপ্তি।

বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষের আগমন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া অদ্যকার প্রাচীন সূর্য্য গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিল—বর্ষবিম্ব অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইতে চলিল। সুখ দুঃখময় বর্ত্তমানের ঘটনাবলী চিরকালের জন্য স্মৃতির পুরাতন কক্ষে নিহিত হইল। পৃথিবীর গণনা ক্রমে আমরা জীবন পথে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ঈশ্বরের দিকে—অমৃতের দিকে একপদ অগ্রসর হইতে চলিলাম। অদ্যকার রজনীর সঙ্গে সঙ্গে আমারদের জীবনের এক অঙ্কের পরিসমাপ্তি হইল। যাঁহার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া নানা ঝঞ্ঝাতরঙ্গের মধ্যেও তাঁহার অভয় হস্ত দেখিতে পাইয়া হৃদয়ের বলকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি, শোক-তাপে ভয় বিপদে প্রপীড়িত হইয়াও যাঁহার প্রসন্ন-মূর্ত্তি সন্দর্শনে ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইয়াছি, পাপের পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়াও যাঁহার বজ্রনির্ঘোষী কঠোর আদেশ শ্রবণে কম্পিত কলেবরে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিক্ষা করিয়াছি, আজ বৎসরের শেষ রজনীতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সকলে সমাগত হইয়াছি। আমরা ভূত ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সম্মুখে দিগন্ত বিশ্রান্ত অনন্তপথ, প্রাণবিহঙ্গ অনন্ত আকাশে উড্ডীন হইবার জন্য বর্ষকালের পর বর্ষকাল অতিক্রম করিয়া সেই মহা-রজনীর অবসান প্রতীক্ষা করিতেছে। যেখানে দেশ কালের ব্যবধান নাই, পক্ষ-মাস ঋতু সম্বৎসরের পর্য্যাবর্ত্তন নাই, যেখানে প্রেম-সূর্য্যের সুবিমল আলোকে দিক্ বিদিক্ জ্যোতিষ্মান রহিয়া রহিয়াছে,

সেই পুণ্যভূমির পবিত্র জ্যোতি সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সংসারবন্ধন আমাদিগকে শত বন্ধনে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীপুত্র পরিবারের দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন, ভোগ ঐশ্বর্য্যের তীব্র আকর্ষণ আত্মার ভাবকে নির্জীব করিয়া ফেলিতেছে। শমীতরুর ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমারদের অন্তরে, অথচ আমরা ইতর প্রাণীদিগের প্রাকৃতিক নিয়মের একমাত্র বশবর্ত্তী। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের পদছায়ায় সঞ্চরণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সাধন তপস্যাবলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। একদিকে আমরা ভৌতিক জীব, আর একদিকে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র, স্নেহের ধন আধ্যাত্মিক জীব। সংসারের তীব্র ঘূর্ণায় পতিত হইয়া আপনার উচ্চ অধিকার, বিমল আনন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকিয়া দিনযামিনী বৃথায় ক্ষেপণ করিতেছিলাম তাই বর্ষের শেষ মুহূর্ত্ত প্রাণে আঘাত দিয়া মর্ম্মস্থলকে প্রকম্পিত করিয়া আমাদিগকে জাগ্রত ও সচকিত করিয়া তুলিল।

আজ বর্ষের শেষ রাত্রি! এইকথা স্মরণ হইবা মাত্র যেন কি এক ভয়ানক তরঙ্গ হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। বর্ষচক্র নিঃস্তব্ধে ঘূর্ণিত হইয়া যেমন পূর্ণ এক বৎসরের শেষ নিশাকে আমারদের সম্মুখে আনয়ন করিল এমনই করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মহা নিশাকে আমারদের সমীপস্থ করিবে তখন চিরজন্মের মত পৃথিবীর ধনঐশ্বর্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, রোরুদ্যমান হৃদয়-বন্ধু সকলকে মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে, শোভা সৌন্দর্য্য হইতে চিরকালের মত নয়নকে মুদ্রিত করিতে হইবে, প্রাণের সহচর অনুচর জানিয়া যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার গঠন করিতেছি, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সকলের নিকট হইতে পলায়ন করিতে হইবে। আমার এ শরীরসম্বন্ধ বালুকণা ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত হইবে। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে ধমনীর রক্ত ধমনীতে রহিয়া যায়, হৃৎপিণ্ড অবসন্ন হইয়া পড়ে, রক্ত জলে পরিণত হয়, মস্তিষ্কের ভিতরে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, দণ্ডায়মান হইবার আর সাধ্য থাকে না। মনে হয় বাস্তবিকই কি আমার অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয়, সত্যই কি শরীর ধূলায় ধূসরিত হইবে অথবা আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে কোন এক অজানিত দেশে পলায়ন করিতে পারিলে যেন সে ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি হয়।

সম্বৎসরকাল পরে যে আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সকলে আগমন করিয়াছি, এখনই আমারদের শূন্য হৃদয়ে ঈদৃশ উদাস ভাবের অভিনয় হইতেছে। চঞ্চল কালস্রোত আমাদিগের হৃদয়ের জড়তা অপসারিত করিয়া দিয়া এককালে পৃথিবীর আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। আমরা যেন সমুদ্রগামী ভগ্ননৌকা নাবিকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপবেশন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া নিজ নিজ নিয়তির বিষয় চিন্তা করিতেছি। আজ নিরাশার পবন চতুর্দ্দিকে বহমান হইয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিতেছে।

সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ে সুন্দররূপে প্রতিভাত না হইলে, বৈরাগ্যের ভাব অন্তরে সন্ধুক্ষিত করিতে না পারিলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে স্থায়ীরূপে হৃদয়মন্দিরে রক্ষা ক-

রিবার জন্য মনুষ্যের ব্যাকুলতা জন্মে না। সংসারকে লইয়া যদি আমরা হৃদয়কে পূর্ণ করি, অথচ তাহার মধ্যে আবার ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হই, তবে কেমন করিয়া তাঁহার প্রীতি-পীযূষপানে কৃতার্থ হইতে পারি? আলোক অন্ধকার কেমন করিয়া এক সময়ে একস্থান অধিকার করিতে পারে। আত্মার পিপাসা অনুভব করিয়া তাহাতেই নীয়মান হইয়া লোকে ঈশ্বরের দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান হয় না, সেই জন্য সংসার ও ঈশ্বরকে এককালে সম্ভোগ করিতে গিয়া ধর্ম্ম হইতে ও ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হয়। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হন, যিনি হৃদয়ের স্পর্শমণি বোধে তাঁহাকে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে অতি যত্নে রক্ষা করেন, তিনিই সংসারে থাকিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। সংসারের ক্ষতি বৃদ্ধি তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে পারে না। তিনি এখানে থাকিয়াই প্রতিকূল স্রোতের মধ্যেও পরম শান্তিলাভ করেন।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তো মৃতো ভবতি।

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

আয়ুক্ষয়কর বর্ষকাল মৃত্যুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে চলিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে মৃত্যু। অপোগণ্ড শিশু বালক যুবা, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেই মৃত্যুর অভিমুখীন। কে জানে কবে কাহার এই দেহের বিলোপ হইবে। মৃত্যুর করাল গ্রাসে কবে কাহাকে নিষ্পেশিত হইতে হয়। মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই ভয়াবহ সংসারের চারিদিকেই মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি। দাবানলপরিবেষ্টিত এই বধ্যভূমির মধ্যে থাকিয়াও আমরা সকল সময়ে নিজ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নিজ নিজ আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। কেবল শোক দুঃখ ও বহির্জগতের নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে। তাই আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া দুঃখ দুর্দ্দৈবের পরপারে সহজে উপনীত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বিপদবারণ পরমেশ্বরকে দীনভাবে আহ্বান করিতেছি, পোতকে নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া তাঁহার দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি।

করুণানিধান! তুমি আমাদিগকে দুর্ব্বল জানিয়া কেন এই ভয়ানক পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলে, আমরা যে প্রতিপদে পরাজিত হইয়া তোমা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। আমারদের এমন বল কোথায় যে সংসারের তীব্র আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারি, "স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি" যিনি তোমাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণহীন হন না, এই যে উজ্জ্বল সত্য আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছ কই তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করিতেছি। যাহা সম্মুখে পাই তাহাতেই প্রীতি স্থাপন করিয়া যে সহস্র বৃশ্চিকদংশনে দংশিত হইতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া নশ্বর পদার্থ লইয়া হতসর্ব্বস্ব হইতেছি। আপনারও হৃদয়কে তাহাতে আহুতি দিতেছি। তোমাকে ত দেখিলাম না, তোমাকে ত প্রিয়রূপে উপাসনা করিলাম না! তোমার দিকে একপাদ অগ্রসর হইয়া পরক্ষণই যে আবার সহস্রপদ পশ্চাতে বিষ-

য়ের কূপে পতিত হইতেছি। আমারদের কি শোকতাপ বিলাপ ক্রন্দনের অবসান হইবে না। তোমার প্রীতিনীরে কি প্রাণ-ভরিয়া সঞ্চরণ করিতে পারিব না। সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, সকল আশা সকল ভরসা মনুষ্যে স্থাপন করিয়া যে পরক্ষণে গগনভেদী আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত দেখি, আমারদের কি এ মোহের শান্তি হইবে না। বিষজর্জ্জরিত দেহের ন্যায় যে আমারদের সকল চেতনার বিলোপ হইয়াছে। তোমার মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে সকলকে জাগ্রত কর, তোমার বিমল জ্যোতি আমারদের সম্মুখে প্রকাশিত কর।

সম্বৎসরকাল চলিয়া গেল। কেবল এই রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে। সম্বৎ-সরকাল তোমার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া, রোগের ঔষধ শোকের সান্ত্বনা লাভ করিয়া আজ কোন্ প্রাণে তোমাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ প্রদান না ক-রিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি। সহস্র প্র-কার সুখে পরিবেষ্টিত হইয়া কেমন করিয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকি। তোমার সুশী-তল ক্রোড়ে সঞ্চরণ করিয়া কেমন করিয়া তোমার অতুলন পিতৃস্নেহ বিস্মৃত হই। যিনি এক পল বিস্মৃত হইলে পৃথিবীর বিলয় দশা উপস্থিত হয় তাঁহাকে ভুলিয়া কেমন করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করি। সম্বৎসরকাল তোমার দিকে আহ্বান করিবার জন্য আমাদিগকে কত না অবসর প্রদান করিয়াছ। পাপমোহের হস্ত হ-ইতে পরিত্রাণ করিবার কত না উপায় বিধান করিয়াছ। অসাড় আত্মাকে সচ-কিত করিবার জন্য কত না দুঃখ ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছ। হা জগদীশ! তোমার দয়ার কথা স্মরণ হইলে বাক্য স্তব্ধ হয়, কৃতজ্ঞতা অশ্রুজলে পরিণত হয়। আমরা মোহান্ধ জীব, সংসারের কীট, সৃষ্টিরাজ্যের বালুকণা। আমারদের উপরও এত দয়া! অধমসন্তানদিগের প্রতি এত বাৎসাল্য ভাব! পাপে কলঙ্কিত জীব, আমারদের উপরও এত মাতৃস্নেহ! আমরা পতিত জীব উদ্ধার করিবার জন্য এত যত্ন চেষ্টা! আমারদের কি সাধ্য যে তোমার অতুলন স্নেহ করুণা স্মরণ রাখিতে পারি। তো-মার করুণা নিমেষে নিমেষে আমারদের উপর অজস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে। তুমি এখনই আমারদের প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিলে তাহারই গুরুত্ব মনে ধারণ করিতে পারি না। আমরা সাশ্রু নয়নে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রা-র্থনা করিতেছি, তুমি আমারদের পাপ মলা সকল মার্জ্জনা করিয়া দিয়া এ কলু-ষিত হৃদয়কে ধৌত বিধৌত করিয়া দাও, অভিনব জীবন দান কর যে সরল হৃদয়ে কাতর প্রাণে তোমার মহিমা মহীয়ান করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। তোমার মোহন মূর্ত্তি আমারদের সম্মুখে প্রকাশিত কর, হৃদয়-সিংহাসনে অবতীর্ণ হও, যে সেরূপ দেখিয়া সংসার ভুলিয়া যাই—ইহকাল পরকালকে একসূত্রে আবদ্ধ করি, শোকতাপের মোহ কোলা-হলের উপরিতন স্তরে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকি। অকিঞ্চন গুরু! আমরা আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি না, তুমি আমারদের আশা ভরসা সকলই। অকৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় তোমা হইতে বহু-দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে দীপ্তশিরা হইয়া আবার তোমার পদতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পাপের গ্লানিতে অনু-তাপের নরকাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাই-তেছে। তোমার অমৃতবারি সিঞ্চনে

তাহাকে নির্ব্বাণ করিয়া দাও। আর যেন তোমাকে ছাড়িয়া ঈদৃশ ঘোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা।

(উদ্বোধন)

গত রাত্রিতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই জন্য তিনি দীপ্ত ভানুকে নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন জগতের কোলাহল থামাইয়া দিলেন। চারিদিক নিঃস্তব্ধ হইল। বিশ্ব-চরাচর নিদ্রায় মগ্ন হইল। কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বজননী, শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেশ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। দিবসের কঠোর পরিশ্রমে জীব-শরীরের যে কোন অঙ্গ ব্যথিত হইয়াছিল তাঁহার কোমল কর সঞ্চালনে সে ব্যথা দূর করিলেন, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় যে মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে অল্পে অল্পে সতেজ করিয়া তুলিলেন— যে আত্মা সংসারের মোহ প্রলোভনে মুহ্যমান হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। জগৎ নব-বলে নব-উদ্যমে আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত—দিবা রাত্রিই তাঁহার কার্য্য অবিরামে চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্বযন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন—তাঁহার এই সংস্কার কার্য্য কেমন গোপনে বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভাল বাসেন। যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখ সৌন্দর্য্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না। সেই মহা-শিল্পী সেই মহা-রহস্যের আবরণ ক্রমশঃ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অভিনব বিচিত্র জীবন-সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছেন। তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানব শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষী-শাবকের শরীর গঠন করেন—তিনি বীজ কোষে থাকিয়া বৃক্ষ-লতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন—তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন। আর সেই মহারাত্রিকে একবার কল্পনার চক্ষে আনয়ন কর—যখন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না—যখন সেই স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রময় আবরণের মধ্যে বিলীন থাকিয়া আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি সৃষ্টি আরম্ভ হইল—প্রাণের স্রোত বহিতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইল। সেই মহা-প্রাণের বিরাম নাই—জগতের মৃত্যু নাই।—তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র—তাহা প্রাণের লীন অবস্থা—তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জা-গৃহ মাত্র। ইহ লোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে

প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্ব্বার নব-সাজে সজ্জিত হইয়া জীবন-রঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

বলিতে বলিতে ঐ দেখ পূর্ব্বদিকের যবনিকা অল্পে অল্পে উদ্ঘাটিত করিয়া শুভ্র-ভূষা-অকলুষা উষা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতেছেন। সুকুমার শিশুর পবিত্র হাসির রেখা দিগন্তের রক্তিম অধরে দেখা দিয়াছে। সুখস্পর্শ প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। উষার চুম্বনে কুসুম-রাশি জাগ্রত হইয়া কেমন পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে আকাশ ছাইয়া গেল। জগৎ জীবন সুখে পুনর্ব্বার পূর্ণ হইল। এ সেই পবিত্র স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপেরই মহিমা। আইস এই নব-বর্ষের উৎসবে, আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি—এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্য্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন।

ইতি পূর্ব্বে বেদান্ত দর্শনের নূতন প্রকাশ নামক আমার রচিত যে একটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া "আত্মা ও অহং বৃত্তি" নামক একটী প্রবন্ধ নব্য ভারতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের স্বপক্ষের যাহা বলিবার কথা তাহা আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ভারতীতে এতবার এত রকমে বলিয়াছি যে আবার সেই সকল পুরাতন কথা এখানে নূতন করিয়া বলা এক প্রকার যন্ত্রণা-বিশেষ। সামগ্রী রসালো হইলে কি হয়—একই সামগ্রীকে বারংবার ক্রমাগত কচলাইলে অমৃত ও তিক্ত হইয়া উঠে। এ জন্য এখানে আমরা আবশ্যক মত তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ করিয়া শুদ্ধ কেবল এইটি দেখাইব যে, বিপিন বাবু আমাদের কথা খণ্ডন করিতে গিয়া তাঁহার আপনার কথাই আপনি খণ্ডন করিয়াছেন ও আমাদের কথাই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-সার গ্রন্থে বলিয়াছেন

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহং ইতি ধীবলাৎ।"

অর্থাৎ "সামান্যতঃ আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার (অর্থাৎ আত্মার) অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। ফরাসীস্ দেশীয় তত্ত্ববিৎ দেকর্ত্তা বলিয়াছেন "I think therefore I am" অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এই দুইটি প্রসিদ্ধ বচনের পরস্পর তুলনা-প্রসঙ্গে, আমি সাংখ্য-সারের উপরি-উক্ত বচনটির মধ্য হইতে "সামান্যত" এই শব্দটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; এতদুপলক্ষে বিপিন বাবু বলিতেছেন যে, "দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার এই মত অর্থ করেন, যথা, আমি জানি এইরূপ বুদ্ধি-বলেই (এক কথায় অহংবৃত্তি বলেই) আত্মা সিদ্ধ হয়েন; উপরোক্ত বচনের মধ্যে যে সামান্যতঃ পদ আছে, তাহা তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেন নাই।" বিপিন বাবুর মতে "সামান্য" এ কথাটি সামান্য কথা.

নহে—তাহা এমনি-একটি অসামান্য গুরু-তর কথা যে, তাহার উল্লেখ না করিলেই নয়। বিপিন বাবু হয় তো মনে করিয়াছেন যে "সামান্যত" এই শব্দটি আমার পক্ষের হানিজনক হওয়াতে আমি তাহা চুপে চুপে সরাইয়াছি; তাহা যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন—তবে সেটি তাঁহার বড়ই ভুল। বচনটি এই—

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ"

অর্থাৎ সামান্যত আমি জানি এইরূপ বুদ্ধিবলেই দ্রষ্টা সিদ্ধ হয়, কি না আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখানে "সামান্যত" এই শব্দটি উল্লেখ না করিলেও ঐ বচনটির প্রকৃত তাৎপর্য্যের যে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না—এক্ষণে তাহা আমরা দেখাইতেছি। ফরাসীস্ দেশীয় দেকর্ত্তার এই যে একটি বচন যে "আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ" ইহার অর্থই এই যে সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ; অর্থাৎ আমি ইহা চিন্তা করিতেছি বা উহা চিন্তা করিতেছি—আমি ঘট চিন্তা করিতেছি বা পট চিন্তা করিতেছি—এরূপ বিশেষ বিশেষ চিন্তার কথা এখানে হইতেছে না, কিন্তু সামান্যত আমি চিন্তা করিতেছি ইহা দ্বারাই আমার আপনার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। এরূপ স্থলে 'সামান্যত' এ শব্দটি উল্লেখ না করিলেও উহা ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না; এই জন্যই আমরা উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম। যেখানে এক কথা বলিলেই মূল বচনের ভাবার্থ বুঝা যায় সেখানে আমরা দুই কথা বলিতে নারাজ। দেকর্ত্তা "সামান্যত" এ শব্দটিকে উহ্য রাখিয়াছেন—বিজ্ঞানভিক্ষু তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছেন—এই যা প্রভেদ, কিন্তু ফলে দুই কথার তাৎপর্য্য একই প্রকার। মনে কর গঙ্গার পরপারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে—এপার হইতে আমি তাহা দেখিতেছি; সামান্যত আমি যাহা দেখিতেছি তাহা এই যে, প্রদীপ আলো দিতেছে; কিন্তু বিশেষত তাহা যে কুটীরের মধ্যস্থিত ঘটী বাটীতে আলোক দিতেছে তাহার প্রতি আমার লক্ষ নাই; ফলে, তাহা প্রদীপ কিনা ইহা জানিতে হইলে তাহা ঘটিতে আলোক দিতেছে বা বাটীতে আলোক দিতেছে এসকল বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার কোন প্রয়োজন করে না; সামান্যত তাহা আলোক দিতেছে ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে তাহা প্রদীপই বটে। 'আমি ঘটি জানিতেছি' ইহা ঘটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'আমি বাটি জানিতেছি' ইহা বাটির অস্তিত্বের প্রমাণ, 'সামান্যত আমি জানিতেছি' ইহা আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এখানে "সামান্যত" এ কথাটি ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ যদি কেবল এইরূপ বলা যায় যে, "আমি জানিতেছি ইহাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ" তবে তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না। কিন্তু বিপিন বাবু 'সামান্যত' এই সহজ শব্দটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার সঙ্গে 'অনুমান' এই আর একটি শব্দ যুড়িয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন 'দ্রষ্টা সামান্য অনুমান বলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন'। তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে 'অনুমান' কথাটী তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন—মূল বচনটিতে তো তাহার নামগন্ধও দৃষ্ট হয় না। বিপিন বাবু বলিতেছেন "সামান্য অনুমান বলে." আর এক জন বলিতে পারে "সামান্য জনশ্রুতির বলে", তৃতীয় ব্যক্তি বলিতে

পারে "সামান্য বিশ্বাসের বলে;" মূলের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা বলিতে পারে সুতরাং সেরূপ বলা'র কোন মূল্য নাই। যদি এরূপ হইত যে 'সামান্য' এই কথাটির উল্লেখ মাত্রেই অনুমান ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, তবে বিপিন বাবুর স্বপক্ষে সেই যা এক বলিবার কথা ছিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা তো আর নহে। মনে কর, প্রথমত আমি প্রদীপ দেখিতেছি, দ্বিতীয়ত আমি রঙ্‌মশাল দেখিতেছি এবং তাহার সঙ্গে ইহাও দেখিতেছি যে উভয়েরই সামান্য লক্ষণ ঔজ্জ্বল্য—রঙ্‌মশালের বিশেষ লক্ষণ শ্বেতবর্ণের আলোক; এখানে অনুমান কোন্‌খানটায়? আমি ঘটি জানিতেছি—বাটি জানিতেছি—ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সামান্যত ইহাও জানিতেছি যে 'আমি জানিতেছি;' অনুমান ইহার কোনখানটায়? 'আমি জানিতেছি' ইহা কি অনুমান—না সাক্ষাৎ জ্ঞান?

বিপিন বাবু এখানে বলিতে পারেন যে যেমন ধূমদৃষ্টে বহ্নি অনুমিত হয়, তেমনি 'আমি জানিতেছি' এই জ্ঞান দ্বারা আমার আপনার অস্তিত্ব অনুমিত হয়; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একথা যুক্তিতে স্থান পাইতে পারে না; কারণ, যখন অগ্নি দৃষ্ট হইতেছে না—শুদ্ধ কেবল ধূমই দৃষ্ট হইতেছে, তখনই ধূম দৃষ্টে অগ্নির অনুমান সম্ভবে; কিন্তু যখন ধূমের সঙ্গে অগ্নিও দৃষ্ট হইতেছে তখন অগ্নিও প্রত্যক্ষে বিরাজমান, ধূমও প্রত্যক্ষ বিরাজমান, এবং দুএর যোগও প্রত্যক্ষে বিরাজমান। যখন আমি একটা ঘট দেখিতেছি, তখন ঘটপদার্থ আমার বাহিরে বর্ত্তমান ঘটজ্ঞান আমার অন্তরে বর্ত্তমান; কিন্তু যখন আমি আপনাকে জানিতেছি তখন অহং পদার্থও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, অহংজ্ঞানও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, এবং দুয়ের মধ্যবর্ত্তী অভেদ-সম্বন্ধও আমার অন্তরে বর্ত্তমান। বিষয়-জ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞান এ দুএর মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের বেলা—জ্ঞানের বিষয় (আমি) এবং জ্ঞান (আমি জানিতেছি) দুএর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানের বেলায়—জ্ঞানও যা, জ্ঞাতাও তা, জ্ঞেয় বিষয়ও তা, তিনিই এক। এই জন্য আত্মজ্ঞানের বেলায় এ কথা শোভা পায় না যে, আমি জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি—আত্মাকে অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি; কেন না এখানে জ্ঞানও যা—আত্মাও তা—একই,—সুতরাং এককে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলে দুইকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা হয়। অতএব 'আমি জানিতেছি' ইহা আত্মার অস্তিত্বের আনুমানিক প্রমাণ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ। এরূপ সাক্ষাৎ প্রমাণের উপর বিপিন বাবুর কেন যে এত বিরাগ, তাহা বুঝিতে পারি না। বিপিন বাবু বলেন যে "এখনও কি শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু 'আমি জানি' এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন।" বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি আমাদিগকে "আমি জানি না" এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে বলেন? মনে কর একজন আসিয়া বলিলেন "বিন্ধ্যগিরিতে একটা আশ্চর্য্য দেবালয় আছে" ও তাহার প্রমাণ তিনি এই দিলেন যে তিনি নিজেও তাহা দেখেন নাই এবং আর কেহও তাহা দেখে নাই। বিপিন বাবু কি ইঁহার এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে পারেন? 'আমি জানি' এভিন্ন—জ্ঞান ভিন্ন—সত্যের প্রমাণ আর যে কি

জগতে আছে, আমরা তো তাহা জানি না। বিপিন বাবু নিজে কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জালময় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক-মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন;" তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি —জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি হয় তাহাই তো অনুভবাত্মক? না আর কিছু? যাহা জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না তাহাকে অবশ্য তিনি অনুভবাত্মক বলিতে পারেন না। ইহা সত্ত্বেও বিপিন বাবু বলিতেছেন যে "অহং বৃত্তি লোপ হয় হউক, এরূপ বাদ দিলে যে অজ্ঞেয় শূন্যাকার অথচ সত্তামাত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা।" 'অজ্ঞেয়' অর্থাৎ কেহই তাহাকে জানে না—জানিবে না—জানিতে পারে না; সুতরাং সেরূপ আত্মাকে বিপিন বাবুও জানেন না এবং অন্য কাহারও তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ না জানা কথার যিনি উপদেশ দেন তিনিই বা কিরূপ উপদেষ্টা, এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন তিনিই বা কিরূপ শিষ্য, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। গুরু মদ্দা-ছাগল দোহন করিতেছেন এবং শিষ্য দুগ্ধ গ্রহণ করিবার জন্য চালুনী ধরিয়াছেন;—কৌতুকের চূড়ান্ত! ইহারই নাম "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—এক অন্ধ আরএক অন্ধের পথ-প্রদর্শক। যিনি আত্মাকে জানেন তিনি কখনই আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিতে পারেন না, কেননা জ্ঞাত বিষয় কখনই অজ্ঞেয় শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; তবেই হইতেছে যে, অজ্ঞেয়-বাদী আত্মাকে জানেন না; যদি তিনি আত্মাকে না জানেন, তবে তিনি আত্মার সম্বন্ধে যতই বড় বড় শব্দ প্রয়োগ করুন্ না কেন, সমস্তই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ।

কিন্তু বিপিন বাবু তাঁহার স্বপক্ষের প্রমাণার্থে একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মাকে—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে—সহায় ডাকিতেছেন; তিনি শঙ্করাচার্য্যের নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।

এবং তিনি ইহার অর্থ করিতেছেন "আত্মার সচ্চিদংশ ও বুদ্ধিবৃত্তি এই দুই পদার্থকে জীব অবিবেক হেতু সংযোগ করিয়া 'আমি জানি' এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়"। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, এখানকার এই যে 'আমি জানি' ইহা স্বতন্ত্র, এবং আমরা যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা স্বতন্ত্র। 'আমি জানি' বলিতে দুই প্রকার 'আমি জানি' বুঝায়,—প্রথম, লৌকিক ব্যবহারের "আমি জানি" এবং, দ্বিতীয়, তত্ত্বজ্ঞানের "আমি জানি"। লৌকিক ব্যবহারকালে আমি যখন বলি যে, আমি গৌরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, তখন আমার শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই "আমি" শব্দ প্রয়োগ করি, সুতরাং তখন আমি আমার শরীরকে 'আমি' বলিয়া জানি; শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে এইরূপ অবিবেকাত্মক "আমি জানি"ই সচরাচর লোকে প্রচলিত—"সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে।" লৌকিক ব্যবহার কালে আমরা এরূপ করি বটে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা-কালে আমরা আত্মাকেই 'আমি' বলিয়া জানি—শরীরাদিকে নহে। পূর্ব্বোক্ত লৌকিক "আমি জানি" অবিবেক-জনিত; শেষোক্ত আধ্যাত্মিক "আমি জানি" বিবেক-জনিত। শঙ্করাচার্য্যের মতে অবিবেক-জনিত লৌকিক "আমি জানি"ই দূষ্য; বিবেক-জনিত আধ্যাত্মিক

'আমি জানি' সাধকের পরম শ্রেয়স্কর। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যের গোড়াতেই আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর (অর্থাৎ 'আমি' এইরূপ জ্ঞানের গোচর) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ নহে; কি তবে তাঁহার মত-বিরুদ্ধ? দেহাদিকে আমি বলিয়া জানাই তাহার মত-বিরুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহার অবিকল অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

"তুমি (অথবা "ইহা" "উহা") এবং "আমি" এই দুইরূপ প্রত্যয়ের গোচর, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব যে, বিষয় এবং বিষয়ী, এ দুয়ের মধ্যে যখন পরস্পার ঐক্য হইতে পারে না তখন তাহাদের পরস্পারের ধর্ম্মের মধ্যেও যে ঐক্য হইতে পারে না ইহা স্পাস্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর চিদাত্মক বিষয়ীতে যুস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, অথবা বিষয়েতে বিষয়ীর এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, তাহা মিথ্যা হওয়াই যুক্ত। তথাপি একের সত্তা ও ধর্ম্মেতে অন্যের সত্তা ও ধর্ম্ম আরোপ করত পরস্পরকে পৃথক্‌রূপে অবধারণ না করাতে —অত্যন্ত পৃথক্ যে উল্লিখিত ধর্ম্মদ্বয় ও ধর্ম্মিদ্বয় তদ্বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সত্য এবং মিথ্যা দুয়ে জড়িত এইরূপ লোক-ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায় যে, আমি এই (শরীর বা মস্তিষ্ক ইত্যাদি), আমার এই (গৃহ বা ভূমি ইত্যাদি)।"

এইরূপ দেখা যইতেছে যে, শরীরাদিকে আমি বলিয়া জানাই শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ—আত্মাকে আমি বলিয়া জানা শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী। শঙ্করাচার্য্যের মতে অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা, এবং যুস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি, এই দুইকে একত্র মিশাইয়া খিচুড়ি পাকানো'র নামই অবিবেক, এবং উভয়ের পার্থক্য রক্ষা করা'র নামই বিবেক। এ উপলক্ষে স্কটলাণ্ড দেশীয় তত্ত্ববিৎ হামিল্টন যাহা বলিতেছেন পাঠক তাহা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, সকল শৃগালেরই এক রায়; হামিলটন বলিতেছেন—

"But the something of which we are conscious, and of which we predicate existence, in the primary judgement, is two fold,—the ego and the nonego, we are conscious of both and affirm existence of both. But we do more, we do not merely affirm the existence of each out of relation to the other, but, in affirming their existence we affirm their existence in duality, in difference, in mutual contrast (ইহার নাম বিবেক); that is, we not only affirm this ego to exist, but deny it existing as the nonego; we not only affirm the non-ego to exist, but deny it existing as the ego.

শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত মত এই যে, যুস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি এবং অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা এই দুইকে জড়াইয়া এক করিয়া ফেলাই অবিদ্যা। আমার প্রতিবাদীরা বলিতেছেন—আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন চা'লে ডা'লে খিচুড়ি হয়; ইঁহারা বলিতেছেন ডা'ল ব্যতিরেকেও শুধু চা'লে খিচুড়ি হয়। এটা ইঁহারা দেখিতেছেন না যে, আত্মাকে অস্মৎ-প্রত্যয়ের গোচর বলিয়া

নির্দ্দেশ করিলে উল্টা আরও যুস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদি হইতে তাহার পার্থক্য রক্ষা করা হয় এবং ইহারই নাম বিবেক; আত্মাকে দেহাদির সহিত জড়াইয়া ফেলার নামই অবিবেক। আমরা তাই বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে "আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয়" শঙ্করাচার্য্যের এই গোড়ার কথাটীকে অবিদ্যাজনিত বলিলে তাঁহার অধ্যাস-বাদের পাকা ভিত্তিমূল কাঁচিয়া যায়। আমার প্রতিবাদিরা বলিতেছেন "না—তাহা কাঁচিয়া যায় না; আত্মাকে অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় বলিলেই যথেষ্ট খিচুড়ি পাকানো হয়—যুস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় দেহাদির সহিত তাহাকে জড়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই (শুধু চা'লেই খিচুড়ি পাকানো হইতে পারে ডা'লের কোন প্রয়োজন নাই)," অথচ শঙ্করাচার্য্য চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন যে আত্মা এবং দেহাদি এ দুইকে জড়াইয়া একীভূত করিবার নামই খিচুড়ি পাকানো। এখন, শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিব—না ইঁহাদের কথা শুনিব?

বিপিন বাবু শঙ্করাচার্য্যের নিম্ন-লিখিত প্রসিদ্ধ বচনটিও উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং।
ন মন্ত্রঃ ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা।
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং।

এই শ্লোকটির অর্থ প্রকৃত-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রভেদই বা কোন্‌খানে এবং অভেদই বা কোন্‌খানে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। বিষয়টি অতি গুরুতর, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার স্থান-সঙ্কুলন হওয়া সুকঠিন, এ জন্য বারান্তরে তাহার রীতিমত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে কেবল আমাদের বক্তব্যের স্বল্প মাত্র আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছি।

লোকে কথায় বলে যে "তেলে জলে কিছুতেই মিশ খায় না"—তেলে জলে এত যে প্রভেদ, তথাপি, একটা কাচের পাত্রে তেল ও জল রাখিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটী চক্রাকৃতি অভেদ-স্থান লক্ষিত হয়; সেই অভেদ-স্থানটিকে তৈল-রেখাও বলা যাইতে পারে—জল-রেখাও বলা যাইতে পারে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মধ্যে এত যে প্রভেদ, তথাপি উভয়ের অভেদ-স্থান আছে—যেমন সুষুপ্তি। সুষুপ্তির যদি জ্ঞানের সহিত আদবেই কোন সংস্রব না থাকিত—সুষুপ্তি যদি একেবারেই অজ্ঞেয় হইত—তবে তাহার সম্বন্ধে আমরা এ কথাও বলিতে পারিতাম না যে 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম'। সুষুপ্তির সহিত যে-অংশে জ্ঞানের সংস্রব আছে সেই অংশে সুষুপ্তির অভ্যন্তরে অহংবৃত্তিও আছে এবং সেই অংশেই আমরা বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; সুষুপ্তি যে-অংশে অজ্ঞানাবস্থা সে অংশে আমরা তাহা বলি না—বলিতে পারিও না; কেননা একেবারেই যাহা জ্ঞান-বহির্ভূত তাহার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহা অনর্থক বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রার সময় আমি সত্যসত্যই জ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, তাই আমি স্মরণ করিয়া বলি যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; তাহা যদি না হইত, তবে "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এ কথার কোন অর্থই থাকিত না। এই জন্য বিপিন বাবুর এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না যে, সুষুপ্তি-কালে আমাদের অহম্বৃত্তি বিলুপ্ত হয়।

উপরি-উক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে এই-রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, যেখানেই প্রভেদ সেইখানেই প্রভিন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটা না একটা অভেদ-স্থান আছেই আছে। তেমনি আবার দেখানো যাইতে পারে যে, যেখানেই অভেদ-স্থান সেইখানেই তাহা প্রভিন্ন বস্তু-দ্বয়ের অভেদ স্থান। তেল আর জলের মধ্যে যদি প্রভেদ বিলুপ্ত হয়—তেলটুকু যদি কোন মহাপুরুষের মন্ত্রবলে জল হ-ইয়া যায়—তবে উভয়ের সেই অভেদ-রেখাটিও দৃষ্টি হইতে পলায়ন করে। কঠোপনিষদে আছে

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি"

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ছায়াতপের ন্যায় বিভিন্ন। তথাপি উভয়ের অভেদ স্থান এই যে, উভয়ই আত্মা। ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা এই অভেদ-স্থানটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "শিবোহং শি-বোহং।" এই অভেদ-স্থানটিতে পরমাত্মার সংস্পর্শে জীবাত্মার পাপ-রাশি ভস্মীভূত হইবারই কথা এবং পুণ্যের খদ্যোত-জ্যোতি ব্রহ্মানন্দের সূর্য্যালোকে কবলিত হইয়া যাইবারই কথা। কিন্তু সেই যে অভেদ স্থান—তাহা তো আর অজ্ঞেয় শূন্যাকার নহে; তাহা জ্ঞান-জ্যোতি ও আনন্দ-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। সেই অভেদ স্থানে যখন আত্মা বিরাজমান তখন কাজে-কাজেই বলিতে হইতেছে যে, সেখানে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; কেননা আত্মা-মাত্রেরই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহা জ্ঞানও বটে জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞেয়ও বটে—আত্মা মাত্রই আপনাকে আপনি জানে; যে—আপনাকে আপনি জানে না, তাহাকে আত্মা বলাও যা—দেয়াল বলাও তা'—এ-কই। তবে আর উপরি-উক্ত অভেদ-স্থানীয় পরম পরিশুদ্ধ আত্মাকে অজ্ঞেয় বলি কিরূপে? তিনি কি আপনার নিকটে এবং সাধকের নিকটে জ্ঞেয় নহেন। শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তবুও কি বলিতে হইবে যে, তাঁহার নিকটে আত্মা অজ্ঞেয় শূন্যাকার ছিল? শঙ্করাচার্য্যের নিকট যদি পরব্রহ্ম অজ্ঞেয় শূন্যাকার হইতেন, তবে তিনি অন্য ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ দিবার অধিকারীই হইতেন না; কেন না, তাঁহার নিজের নিকটে যাহা অজ্ঞেয়—তিনি নিজে যাহা জানেন না—তাহা তিনি অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে যা'ন—ইহা কত না লজ্জার কথা!

অতএব বিপিন বাবু পঞ্চদশীর এই যে, একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

"স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা জ্ঞাতৃ জ্ঞানান্তরাভাবাৎ"

অর্থাৎ জ্ঞানান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয়—ইহার আদবেই কোন অর্থ নাই। প্রদীপান্তরের অভাব-প্রযুক্ত প্রদীপ কি কখনও অদৃশ্য হয়? তবে জ্ঞা-নান্তরের অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞেয় হইবে কেন? প্রদীপ প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি প্রদীপকে অদৃশ্য বলিতে হইবে? জ্ঞান প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না—তাই বলিয়াই কি জ্ঞানকে অজ্ঞেয় বলিতে হইবে? প্রদীপ যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, জ্ঞান তেমনি আপনার আলোকে আপনি জ্ঞাত—তবে আর জ্ঞান অজ্ঞেয় কি রূপে? জ্ঞাত বস্তুকে অজ্ঞেয় বলা কি রূপ কথা?

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আত্ম-জ্ঞানের উপদেষ্টা আত্মাকে স্বীয় অন্তরে অনুভব করেন কি না? যদি করেন—তবে তিনি বলিতে পারেন না যে, "বিদ্যতে নানুভাব্যতা" আত্মা অনুভব-যোগ্য নহে; যদি না করেন—তবে তাঁহার উপদেশ মূলেই অনুভবাত্মক নহে, তাহা শুদ্ধ কেবল বিতণ্ডা ও শব্দাড়ম্বর মাত্র। তবে আর বিপিন বাবুর এ কথা কোথায় রহিল যে "আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসা মাত্র গ্রহণ করিবেন?" তিনি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছেন—সমস্তই তো তর্কের জঞ্জাল-ময় পথ—তাহার ত্রিসীমার মধ্যেও তো অনুভবাত্মক কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মনে কর যেন ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ এক পয়সাও নাই—তাহা নিতান্তই অজ্ঞেয় শূন্যাকার, অথচ ব্যাঙ্ক হইতে হাজার হাজার টাকার ব্যাঙ্ক নোট বাহির হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; এরূপ ব্যাঙ্ক নোটের কি কোন মূল্য আছে? যিনিই ব্যাঙ্কে নোট ভাঙাইতে যাইবেন তিনিই অজ্ঞেয় শূন্যাকার দেখিবেন—অন্ধকার দেখিবেন, ও শূন্যহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিবেন। প্রদীপ যদি আপনাকে আপনি প্রকাশ না করে, নিজেই যদি অপ্রকাশ হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? জ্ঞান যদি আপনাকে আপনি না জানে, আপনার নিকট আপনি অজ্ঞেয় হয়, তবে তাহা অন্য বস্তুকে কিরূপে জানিবে? এই জন্যই আমরা বলি যে, যিনি 'অনুভবাত্মক' সত্যের প্রয়াসী, অথচ 'আমি জানি' এমন একটি সুনিশ্চিত অপরোক্ষ অনুভূতিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অনুভবাতীত অজ্ঞেয় অন্ধকারে ইচ্ছা করিয়া নিপতিত হন, তাঁহার সেরূপ পতনের কারণ আর কিছু নয়—যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদ—অনুভবাত্মক সত্য সংস্থাপন করিতে গিয়া অনুভবের মূলোচ্ছেদ।

শিক্ষা।

আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, ইত্যাদি রূপ আমি-তত্ত্বের জন্য আমরা জগতে মহান ভিক্ষুক হইয়া রহিয়াছি। এই সকল ভিক্ষার তরে আমরা জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জগত এই সকল ভিক্ষা দিয়া কি আমাদের তৃপ্তি সাধন করিবে? করিতে পারিবে? পারিবে, যদি জগত ধনী হয়, তাহার এত ধন থাকে যে আমাদের দিয়া তাহার প্রচুর থাকিতে পারে। কিন্তু জগত এত ধনী নয় তাই আমাদের ভিক্ষার কাছে জগত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—কহে "আমার তোমাদের ভিক্ষা যোগাইবার সামর্থ্য নাই।" তখন জগতের দারিদ্র্য বুঝা যায়, আমাদের ভিক্ষার কাছে তাহার হীনতা উপলব্ধ করা যায়, তখন তাড়াতাড়ি ক্ষুৎপিপাসু পথিকের ন্যায় ছট ফট করিতে করিতে জগতের নিকট হইতে ফিরিয়া আসি এবং জগতের অতীত দেশে যাইতে চেষ্টা করি কিন্তু সহসা পারি না। সেখানে অমূল্য অসীম ধনাগার স্থাপিত আছে; বিশুদ্ধবেশে অনবরতঃ জাগরূক রহিয়া পাহারা দিতেছে। এই নিয়মকে করায়ত্ত করিতে না পারিলে জগতের অতীত দেশে আমরা পঁহুছিতে পারিব না সুতরাং সেথায় জ্যোতিষ্মান ধনীর জ্যোতি-

স্মান ধনাগারও দেখিতে পাইব না,—আমাদের দারিদ্র্য দুঃখও ঘুচিবে না। অতএব যদি সেই নিয়ম প্রহরীকে আমরা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারি তাহা হইলে অসীম ধনাগারও আমাদের আয়ত্ত হইবে। সেই অসীম ধনাগারের অসীম অনন্ত ধন পাইলে আমাদের কোন্ ভিক্ষা না পূর্ণ হইবে? সমুদয় ভিক্ষাই পূর্ণ হইবে এই জন্য বলি নিয়মকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে করায়ত্ত করাকর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের প্রথম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহা হইতে সমুদয় শিক্ষা প্রাদুর্ভূত হয়। শিক্ষা যদি থাকে তবে সে ইহাই। ইহা ভিন্ন শিখিবার তো আর কিছুই নাই। ইহাই আমাদের চরম পরম উন্নত শিক্ষা। এই শিক্ষা বজায় রাখিবার জন্য আমাদের বাজে কত শিক্ষা আবশ্যক হয়। মূল শিক্ষা এই। ইহা ভিন্ন আর কাহাকে প্রকৃত শিক্ষার নামে উপযুক্ত বোধ করা যাইতে পারে? বিজ্ঞান জ্যোতিষ যাহাই শিখিতেছি সব ইহাকে অবলম্বন করিয়া। ইহা তখন অগ্নি শিখাস্বরূপ। সকলের উপরে। যেমন আলোক বজায় রাখিবার জন্য তৈল সূতা প্রভৃতি দ্রব্যের সাহার্য্য আবশ্যক হয় সেইরূপ নিয়মায়ত্তের শিক্ষা আমাদের আলোকের স্বরূপ। ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য আমাদের চারিধার হ'তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষার সংগ্রহ করিতে হয়। না হইলে ইহা প্রকাশ পাইবে কিরূপে? ইহার প্রকাশ যত যেখানে তত সেখানে বল তেজ হাসি খেলা! ইহার অপ্রকাশে সমুদয় বিশৃঙ্খল ভগ্ন চূর্ণ। অতএব নিয়মায়ত্তই জগতের প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষায় হিত প্রস্ফুটিত।

হিতেন্দ্র

আলোচনা।

(গত আষাঢ় মাসের পত্রিকার ৪৮-পৃষ্ঠার পর।)

ভৌতিক জগতের উপর মানুষের নিয়ন্তৃত্ব।

আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ, অতি স্বল্প বলিয়া অনেক সময়ে আমরাই যাহার কারণ, আমরা ঈশ্বরকে তাহার কারণ, নির্দ্দেশ করি এবং তাহা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকি। যতই মানবজাতির জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে,ততই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ পূর্ব্বে যাহা একমাত্র ঈশ্বরের সাধ্যায়ত্ত মনে করিত, তাহা মানুষেরও সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। মারীভয় হইলে পূর্ব্বে ভগবানই তাহার প্রেরক লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মারীভয়ের কারণ ঈশ্বর নহেন, মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণই তাহার কারণ এবং মনুষ্যের জ্ঞান-প্রভাবেই তাহা দূর করা যায়। বিজ্ঞান এইরূপ কত অলৌকিক কার্য্য করিতেছে যাহা মনুষ্যের সাধ্যের অতীত বলিয়া লোকে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিত। এইরূপ ক্রমেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ভৌতিক জগতের উপর ঈশ্বর মানুষকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছেন, মানুষ সে ক্ষমতা সেই পরম পিতার প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে স্ফুরিত ও সমন্নত করিতে পারিলে সে ঈশ্বরের সাহায্যে ও অনুশাসনে ভৌতিক মঙ্গলামঙ্গলের অনেক পরিমাণে নিয়ন্তা হইতে পারে। এই নিয়ন্তৃত্ব মানুষের কতদূর হওয়া সম্ভব তৎসম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই জানি না; যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে ততই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন আমাদের

দোষে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা অসতর্কতা-পূর্ব্বক ঈশ্বরে আরোপ না করি।

আয় ব্যয়।

পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৪৭৭৸/ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৯৫৭।৵১০
সমষ্টি	৪৪৩৫৶১৫
ব্যয় ...	১৫৫৬॥০
স্থিত	২৮৭৮॥৶১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২১৩॥৶০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ২৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮০৯ শকের আষাঢ় হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮০৮ শকের ফাল্গুন হইতে ১৮০৯ শকের মাঘ পর্য্যন্ত ২৪৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৫৲
তাঁহার স্ত্রী		১০৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৭৲
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ধর		৪৲
,, ,, মণিলাল মল্লিক		৪৲
,, ,, দিননাথ অধ্যেতা		২৲
,, ,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলী	২৲
,, ,, কেদারনাথ মিত্র		২৲
,, ,, লালবিহারী বড়াল		২৲
,, ,, রাজকৃষ্ণ আঢ্য		২৲
,, ,, কাশীনাথ দত্ত		২৲
,, ,, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়		১৲
,, ,, মহানন্দ মুখোপাধ্যায়		১৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন ধর		১৲
,, ,, রাধামোহন সিংহ	আঁদুল	১৲
,, ,, বনমালী চন্দ্র		১৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী		৫৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণি দাসী		৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		২৲
,, ,, নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৩৪
,, ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪৲
,, ,, জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল		৪৲
,, ,, ভবদেব নাথ	গোয়াড়ী	৫৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়		৫৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	১৲

এককালীন দান।

শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী		১।০
,, কামিনীসুন্দরী দেবী		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
,, ,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৲
পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী		১৲
ডাক্তার চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়		২৪।৶০
		২১৩॥৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭৮ ৶০
পুস্তকালয় ...	১০৬৸৶১০
যন্ত্রালয় ..	৫০৯ ৵৫
গচ্ছিত ...	২১৭॥৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৬২।০
দাতব্য ...	৯০৲
সমষ্টি	১৪৭৭৸/৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫০৪॥০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৬১৸৶১০
পুস্তকালয়	৮৩॥৴১৫
যন্ত্রালয়	৫৮৫৸৵১০
গচ্ছিত	৫৩।৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৫৸১০
দাতব্য	৬১৲
সমষ্টি	১৫৫৬॥০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫০৯ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মা এবং পরমাত্মা।

আমাদের আত্মা স্বয়ং পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্যের প্রতিকৃতি। পরিমণ্ডল (globe) যেমন মহাকাশের প্রতিকৃতি, আত্মা সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিকৃতি। পরিমণ্ডলের কেন্দ্র হইতে কিরণাবলীর ন্যায় রেখা-সকল যতদূর ইচ্ছা ততদূর প্রসারিত হইয়া পরিমণ্ডলের অবয়ব যতই বর্দ্ধিত হউক্ না কেন, তাহা কখনই অসীম আকাশে পরিণত হইতে পারিবে না; সেইরূপ আত্মা আপনার ধীশক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি প্রসারণ করিয়া যতই জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিবর্দ্ধিত হউক্ না কেন, তাহা কখনই পরমাত্মার সহিত একীভূত হইতে পারিবে না। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় প্রভেদ সর্ব্বকালেই বলবৎ থাকিবে। পরিমণ্ডলকে যেমন মহাকাশ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, পরমাত্মা সেইরূপ জীবাত্মাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতেছেন; আর, পরিমণ্ডল যেমন স্বীয় পরিধির সীমা-পর্য্যন্তই মহাকাশকে স্পর্শ করিয়া আছে, জীবত্মা সেইরূপ পরমাত্মাকে কিয়ৎ পরিমাণেই জানিতেছে। যাঁহার জ্ঞান-ধর্ম্মের যতটুকু পরিধি পরমাত্মা তাঁহার নিকট সেই অংশে প্রকাশিত হ'ন। পরমাত্মা জ্ঞানবান্ মনুষ্য মাত্রেরই নিকট প্রকাশিত আছেন, কিন্তু কাহারো নিকট সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং—যদি মনে কর যে আমি পরব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জানি তবে নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের স্বরূপ তুমি অল্পই জানো।"

কোন প্রতিবাদী এখানে বলিতে পারেন যে, পরমাত্মা জ্ঞানবান্ মনুষ্য মাত্রেরই নিকট প্রকাশিত আছেন—এ কথাটা কি সত্য? জ্ঞানবান্ লোকের মধ্যে সকলেই কি আস্তিক? ইহার উত্তর আমরা এইরূপ দিই—

আমরা যাহা কিছু দেখি—সমস্তই দৃশ্য আবির্ভাবমাত্র—তাহার কোনটিই মূল-বস্তু নহে—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। দৃশ্য-আদি আবির্ভাবের মূলে আধার-বস্তু আছে—ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত। সমস্ত জগতের একই মূলাধার, ইহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত;

কেবল সেই মূলাধার কিরূপ ইহা লইয়াই যত কিছু বিবাদ বিসম্বাদ। এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? অবশ্য—জ্ঞান, তা ভিন্ন আর কে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর—জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান যখন বলিতেছে যে, দৃশ্য আবির্ভাব-সকলের মূলাধার আছেই আছে" তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সেই মূলাধার জ্ঞানের নিকটে অপ্রকাশ নাই; কেননা, মূলাধার জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়াতেই জ্ঞান বলিতেছে "মূলাধার আছেই আছে" নতুবা আর কিসের জোরে জ্ঞান ওরূপ কথা বলিতে সাহসী হইবে? ঈশ্বর তাঁহার আপনারই প্রদত্ত মনুষ্য-জ্ঞানে আপনি আবির্ভূত হ'ন; রাজা যেমন তাঁহার আপনার প্রদত্ত প্রিয়-জনের ভবনে আপনি আতিথ্য গ্রহণ করেন—সেইরূপ। সমস্তের মূলাধার—মনুষ্যের জ্ঞানে প্রকাশিত আছেন ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই,—জিজ্ঞাস্য শুধু কেবল এই যে, তিনি জ্ঞানে কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? যদি বল যে, মূলাধার দৃশ্য বস্তুরূপে জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন, তবে সে কথার কোন অর্থ নাই; কেননা যাহা চক্ষে দৃষ্ট হয় তাহা দৃশ্য আবির্ভাব-মাত্র, তাহা মূল বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূত হয়, তাহা স্বয়ং মূল-বস্তু নহে। যদি বল যে, মূলাধার শূন্য-রূপে জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন, তবে সেরূপ কথারও কোন অর্থ নাই; কেননা শূন্য কিছুই নহে—যাহা কিছুই নহে তাহার প্রকাশ অসম্ভব। অতএব জগতের যিনি মূলাধার তিনি স্বয়ম্ভু আত্মা রূপেই জ্ঞানে প্রকাশিত আছেন—এ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। স্বয়ম্ভু আত্মা—অর্থাৎ তিনি আমাদের ন্যায় অপূর্ণ আত্মা নহেন, কেননা অপূর্ণ আত্মা অনেক অংশে অন্যের উপর নির্ভর করে; যিনি মূলাধার পুরুষ তিনি অন্য কাহারো উপর নির্ভর করেন না—তাঁহারই উপর সমস্ত জগৎ নির্ভর করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জগতের যিনি মূলাধার তিনি পরিপূর্ণ নিরবলম্ব স্বয়ম্ভু পরমাত্মা-রূপে আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে নিরন্তর প্রকাশিত আছেন; অথচ অনেক সময়ে আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে এইরূপ মনে করি—যেন আমাদের নিকটে তিনি অপ্রকাশ রহিয়াছেন। আমরা আমাদের অভ্যাস-দোষে চক্ষের উপলব্ধি বা হস্তের উপলব্ধিকেই উপলব্ধি মনে করি, জ্ঞানের উপলব্ধিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরি না; আমরা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াও মনে করি—যেন আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছি না। পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে এরূপ নিগূঢ় ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন যে, আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখি না; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ বলিতে আমরা অধিকারী নহি যে, তিনি আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছেন না। বণিক্ যেমন টাকা দিয়া টাকা উপার্জ্জন করে, শিষ্য যেমন বুদ্ধি দিয়া বুদ্ধি উপার্জ্জন করে—আপনার অপরিস্ফুট বুদ্ধি দিয়া গুরুর পরিপক্ক বুদ্ধি উপার্জ্জন করে; মনুষ্য সেইরূপ জ্ঞান দিয়া জ্ঞান-স্বরূপের দর্শন লাভ করে—ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানের দর্শন লাভ করে। পরমাত্মার দর্শন-লাভের এরূপ সহজ উপায় সত্ত্বেও শুষ্ক বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞান দিয়া অজ্ঞান ক্রয় করেন—আলোক দিয়া অন্ধকার ক্রয় করেন; তাঁহাদের জ্ঞানের ফল এই যে, পরমাশ্চর্য্য বিচিত্র জগতের মধ্যে তাঁহারা কেবল অজ্ঞান-অন্ধকারই দর্শন করেন। তাঁহারা বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি ব্যয় করিয়া

শেষে পা'ন এই যে, তাড়িত-পদার্থে সকলই হয়—তাহারই শক্তি-মাহাত্ম্যে অন্ধকার হইতে আলোক পরিস্ফুট হয়, জড় হইতে প্রাণ পরিস্ফুট হয়, অজ্ঞান হইতে জ্ঞান পরিস্ফুট হয়; জগতে এমন কোন অসাধ্য ব্যাপার নাই যাহা তাহার কর্তৃত্বের সীমা-বহির্ভূত;—বাস্তবিকই যেন তাঁহারা তাড়িত পদার্থের সর্ব্ব-কর্তৃত্ব দিব্য-চক্ষে অবলোকন করিয়াছেন! এই অন্ধ শক্তিটিই জড়বাদী প্রভৃতি শুষ্ক বৈজ্ঞানিকদিগের স্পর্শমণি; এবং ইহার উপার্জ্জনে তাঁহারা অশেষ বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু জ্ঞান এমন যে দুর্লভ ধন, তাহা কি অন্ধ-শক্তি ক্রয় করিবার জন্যই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? তবে হীরক দিয়া কাচ ক্রয় করা কি দোষ করিল? যাঁহারা জ্ঞান দিয়া জ্ঞান-স্বরূপকে ক্রয় করেন, তাঁহারাই জ্ঞানের যথার্থ সদ্ব্যয় করেন; তাঁহারা

"সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।"

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত কৃতাত্মা বীত-রাগ এবং প্রশান্ত হ'ন।

জীবাত্মা প্রকৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা জীবাত্মা এবং প্রকৃতি সমস্ত ব্যাপিয়া সকলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। জীবাত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; পরমাত্মা দ্বন্দ্বাতীত অটল প্রশান্ত নিরঞ্জন। সংসার, সত্য এবং মিথ্যার, আলোক এবং অন্ধকারের, জীবন এবং মৃত্যুর, দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্র; জীবাত্মা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সকল দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে,—ক্রমে অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হয়, অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হয়, মৃত্যু হইতে অমৃতে উপনীত হয়, এইরূপে শান্তি হইতে শান্তিতে পদনিক্ষেপ করে। জীবাত্মা পৃথিবীর গর্ভ-নিহিত বীজ-স্বরূপ, পরমাত্মা সূর্য্য স্বরূপ; সেই সূর্য্যেরই প্রভাবে সেই বীজ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আকাশে পর্য্যুত্থান করে—এবং সেই সূর্য্যেরই আলোক আত্মসাৎ করিয়া নবজীবন হইতে নবতর জীবন লাভ করিতে থাকে। এরূপ জীবন-লাভের অন্ত নাই, যেহেতু পরমাত্মা-রূপ সূর্য্য অনন্ত জীবনের অক্ষয় ভাণ্ডার।

জীবাত্মা যখন আপনার জন্য কার্য্য করে, তখন তাহার সেরূপ কার্য্যকে স্বার্থ কহে; আর,যখন সে পরমাত্মার জন্য কার্য্য করে তখন তাহার সেরূপ কার্য্যকে পরমার্থ কহে। আমাদের মন নানা প্রকার কামনার আশ্রয়; কোনটি বা প্রসুপ্ত, কোনটি বা জাগ্রত,—যেমন শত্রুর দর্শনমাত্রে মনোমধ্যে তাহার অনিষ্ট-কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে, শত্রুর অদর্শনে তাহা প্রসুপ্ত থাকে; কোনটি বা মুখ্য, কোনটি বা গৌণ,—যেমন ভূমি-কামনা উপস্বত্ব লাভের জন্য, সুতরাং উপস্বত্ব-কামনা মুখ্য —ভূমি-কামনা গৌণ; আবার, উপস্বত্ব-কামনা সুখ-সাধনের জন্য, সুতরাং সুখ-কামনা মুখ্য—উপস্বত্ব-কামনা গৌণ; কোনটি বা বৈধ কোনটি বা অবৈধ—কামনা-সকল এইরূপ বিচিত্র ভাবাপন্ন; সেই সকল কামনা উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিবার জন্যই মনুষ্য প্রথমতঃ বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। বুদ্ধি উপস্থিত কামনাকে কিয়ৎপরিমাণে দমন করিয়া কামনা-চরিতার্থতার সাধারণ নিয়ম-সকল অবধারণ করে; ইহাতে বুদ্ধির কর্তৃত্ব অভিমান জন্মে—অহংকার জন্মে; অতঃপর বুদ্ধির অহঙ্কার এবং মনের বিষয়-কামনা দুয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। যেই-

অহংকার মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়, অমনি বিষয়-কামনা আসিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া দেয়। অহংকার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে নিতান্তই অসমর্থ। শুদ্ধ কেবল আপনার কামনার চরিতার্থতা-তেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের লক্ষ্য আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কামনা-সকল বিপথে ধাবিত হইয়া বৈধ চরিতা-র্থতা হইতে বঞ্চিত হয়—ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব-অভিমানকে বৃথা করিয়া দেয়। সাধারণ জন-সমাজের বৈধ কামনা-সকল যথোচিত চরিতার্থ হইলে আমারও বৈধ কামনা-সকল যথোচিত চরিতার্থ হইবে—অতএব তাহারই প্রতি যত্ন নিয়োগ করা কর্ত্তব্য, এইটিই শুভ বুদ্ধি। লোক-সমাজের বৈধ কামনা-সকলের চরিতার্থতায় সহায়তা করিতে হইলে আপনার বুদ্ধির অহংকার দমনে রাখিয়া সকলের নিকট হইতে সুবুদ্ধি গ্রহণ করা আবশ্যক—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নিকট হইতে, বর্ত্তমান সাধু মণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সাধা-রণতঃ সকল ব্যক্তির নিকট হইতেই সুবুদ্ধি ও সুপরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক; এবং সকলের সকল প্রকার শুভবুদ্ধি যাঁ-হাতে একাধারে বর্ত্তমান—সকল শুভ বুদ্ধির যিনি একমাত্র প্রেরয়িতা – সেই সর্ব্বমূলাধার পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা এবং তাঁহার অভিপ্রায় শিরোধার্য্য করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ইহারই নাম পরমাত্মার জন্য কার্য্য করা—ইহাই পর-মার্থ। পরমার্থ-পথেই মনুষ্যের বৈধ কামনা-সকল উপযুক্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে—স্বার্থ-পথে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবে না।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টো-পাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

অতি মূঢ় ব্যক্তিরই নিকট এসংসার রমণীয় ভাবে প্রতিভাত হয় কিন্তু স্থির চিত্তে অল্পক্ষণ মাত্র জ্ঞানশক্তির চালনা করিলে মনুষ্য মাত্রেরই বোধ জন্মে যে এই আপাতমধুর সংসার বস্তুত বহু শোক-সমাচ্ছন্ন। জরা মৃত্যু হইতে ভয়, ব্যাধি বৈকল্য হইতে ভয়, হিংস্র জন্তু ও ততো-ধিক হিংস্র মনুষ্য হইতে ভয়, এবং সাধা-রণত প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়যোগে ভয়—এইরূপ নানাভয়ে মনুষ্য সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছে। সংসারে যে সুখ দেখা যায় তাহাও বস্তুত সুখ নহে সুখের আভাস মাত্র। মনুষ্যের দেহ এরূপে গঠিত যে কোন অনুকূল বিষয়ের উপস্থিতিতেও যখন সুখের উদয় হয় তৎক্ষণাৎ দেহে স্নায়বীয় বিপ্লব ঘটে, তাহার গর্ব্ভে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজ নিহিত রহি-য়াছে। ইহা যথার্থ যে—"দুঃখ যেন দুদিন সুখ খদ্যোতিকা হেন মনরে নিশ্চিত জেন সংসারকান্তারে"। দুঃখের প্রতি বিধান করিতে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সংসারের ক্লেশ আলোচনা করিয়া যখন মনুষ্য উক্ত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তখন তাহাকে কে আশ্বাস দিতে পারে? পৃথিবীতে এমন এক দল মনুষ্য আছেন তাহারা দুঃখের অন্ত জিজ্ঞা-সুকে দুঃখের কখনই শেষ নাই এরূপ বলিয়া দুঃখের প্রতিবিধিৎসা ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন। অনেক সাংসারিক জ্ঞানে মহা জ্ঞানী ব্যক্তি এই দলের অন্ত-র্ভূত এবং তাহাদের কথায় শ্রাদ্ধাবান লোক

ও অনেক। কিন্তু ইহা অতি সহজেই বোধগম্য হয় যে যাহা যে জানে না তাহাকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করা বৃথা। যাহার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা তাহার পক্ষে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ নাই এরূপ উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, "কেহ কি দুঃখ নাশের উপায় দেখাইতে প্রস্তুত আছেন" এবং এরূপ কাহাকে দেখিলে প্রথমতঃ তাঁহার বাক্য অনাস্থেয় ইহা সপ্রমাণ না হইলে "দুঃখের অন্ত নাই" এই সর্ব্বহারক তামসিক জ্ঞানকে কখনই বরণ করিবেন না। ইহার বিপরীত সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য। যিনি দুঃখের অন্ত না দেখিয়া এরূপ স্থির করিয়াছেন যে দুঃখের অন্ত হইতেই পারে না দুঃখের অন্তপ্রত্যাশীর পক্ষে তাঁহার বাক্যের উপযোগিতা নাই। আর, যিনি বলেন যে দুঃখের অন্ত আছে তাঁহার কথার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে বিবাদ উঠিতে পারে কিন্তু তাঁহার বাক্য যে জিজ্ঞাসুর পক্ষে উপযোগী তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহের অবসর নাই। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বভাষায় শুনা যায়—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি।
অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।"
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

অতএব শ্রেয়ার্থীর দ্রষ্টব্য যে এই সকল বাক্য শ্রদ্ধেয় কি বন্ধ্যাপুত্র খপ্নাদিবৎ অর্থশূন্য। স্বেচ্ছায় এই দৃষ্টি রোধ করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে এই সকল বাক্য সন্দেহস্পৃষ্ট নহে। ইহাদের মধ্যে "হইতে পারে" "বোধ হয়" এরূপ কোন ভাব নাই, ইহারা নিশ্চয়রূপে অবধারিত। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে কিরূপে এই সন্দেহসঙ্কুল জগতে এ প্রকার সুমেরুতুল্য অচল বাক্যরাশির প্রচার হইয়াছে। সমুদায় জগৎ যাহাকে অপ্রমাণ করিতে যত্নশীল জগতে তাহার বক্তাই বা কিরূপ সম্ভব হয় আর তাহাতে লোকের বিশ্বাসই বা কিরূপে হয়! আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যাহারা উক্ত বাক্যে শ্রদ্ধাশীল এবং তদুচিত সাধন করিতে যত্নবান দিন দিন তাঁহাদের দুঃখ শমিত হয়। ইহাও প্রত্যক্ষ যে যাহারা উল্লিখিত পথ অবলম্বন করিয়া অভীপ্সিত দেশাভিমুখে অগ্রসর হন তাঁহাদের অনেকের মধ্যে তদ্দেশ লাভের প্রমাণ তাঁহাদের বাক্যে ও তদনুযায়ী লিঙ্গ দ্বারা প্রদর্শিত হয়; অন্যেরা উক্তরূপে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও প্রতিদিন তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও পরিণামে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে দৃঢ় বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, আর অনেকে বিশেষরূপ লব্ধকাম না হইলে তাহা নিজের দোষ নিবন্ধন এইরূপ স্থির বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প সংখ্যক যাত্রীই উদ্দেশ্যকে দোষ দিয়া যাত্রা হইতে বিরত হ'ন। ইহাতে অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি কোন ব্যভিচার লক্ষিত হয় না।

সুবোধ লোক মাত্রই ইহাতে স্থির করেন যে দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা স্বকর্ম্মসাধনে সক্ষম। এরূপ আস্তিক্য বুদ্ধি সত্ত্বেও নানা সংশয় উপস্থিত হয়। কেন না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দুঃখ নাশের উপায় প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং নিজ নিজ মত সমর্থনের নিমিত্ত নরহত্যাদি

মহা পাপাচরণে কুণ্ঠিত হন না। এইরূপ ধর্ম্মঘটিত বাক্‌যুদ্ধ ও অস্ত্রযুদ্ধ নাস্তিকতার একটি প্রধান উদ্দীপক। কিন্তু সমরধূলি স্থিত হইলে যখন অন্ধকার দূর ও দৃষ্টি বাধা-শূন্য হয় তখন প্রকাশিত হয় যে যেমন মহা বাত্যায় সমুদ্রের উপরিভাগ মাত্র আলোড়িত হয় কিন্তু তাহার অভ্যন্তর দেশ অবিচলিত ভাবে স্থির থাকে সেইরূপ এসকল অশান্তির মধ্যে যথার্থ যে সুখস্বরূপ প্রাপ্তির উপায় (যাহা ধর্ম্মের নামান্তর) তাহা অক্ষুণ্ণ একই ভাবে বিরাজমান। ধর্ম্মের যে অংশ লইয়া বিবাদ তাহা অকিঞ্চিৎকর, দেশকালপরিচ্ছিন্ন ও সাধকদিগের প্রকৃতিবৈচিত্র্যজাত। আর যে অংশ নির্ব্বিবাদ তাহা সার, নিত্য ও সত্যের স্বভাব হইতে উৎপন্ন। ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে যে সকল অমঙ্গল ধর্ম্মকে কলুষিত করে তাহা একেবারে নিঃশেষিত হয়।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে তাহাদের চরম লক্ষ্য একই। সত্য প্রাপ্তিকে সকল ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ। অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ বিদিত করাই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। যেরূপ সাগর সমুদায় নদীরই শেষ গতি তদ্রূপ পরমেশ্বরই ধর্ম্মনদী সমূহের একমাত্র সাগর। সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে বিদিত হইলেই মনুষ্য মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হয় ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মেরই উক্তি।

> সর্ব্বে বেদাঃ যৎপদমামনন্তি—
> তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি,
> যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।”

তাহা সেই একাক্ষর প্রণবের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর, সত্যই যাঁহার স্বরূপ। ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মেরই শাসন যে পরমেশ্বর স্বরূপতঃ (কার্য্যতঃ নহে) যে কি বা কেমন তাহা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর বাক্যের অগোচর ও মনের অগোচর। হে দম্ভিন্‌, হে অশান্ত মনুষ্য, তুমি চিন্তা করিয়া এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ যে কি ও কেমন তাহা স্থির কর। যখন তুমি ইহাতে অক্ষম তখন জগতাতীত জগদীশ্বর যে কি ও কেমন তুমি কি উপায়ে স্থির করিবে? সুবোধ ব্যক্তি মাত্রেই দর্শন করেন যে পরমেশ্বর-তত্ত্ব সর্ব্ব ধর্ম্মে একই রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়ও সর্ব্বত্র একই। যে বৈষাদৃশ্য তাহা কেবল মাত্র বাহ্যিক। সর্ব্বত্রই শ্রুত হওয়া যায়,

> “সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক জ্ঞানেন।”

এই যে আত্মা তিনি সত্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা লভ্য হয়েন।

‘সত্য’ শব্দের অর্থে যে কেবল স্বীয় অনুভূত বিষয়কে যথাতথভাবে পর বুদ্ধি সংক্রমণ করা তাহা নহে। যে যথার্থ বাক্য নৈষ্ঠুর্য্য বা পৈশুন্যদোষাশ্রিত তাহা ধর্ম্ম্য নহে ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী। যেরূপ বাক্য ধর্ম্ম্য তাহা এই,

> অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

যে বাক্য শ্রোতার উদ্বেগ করে না যে বাক্য যথানুভূত যাহা শ্রোতার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক হিতকর তাহাই ধর্ম্ম্য তাহাই যথার্থ সত্য। এবং এই সত্যই পরম ধর্ম্ম, ইহাই পরম সম্পৎ। “তপঃ” শব্দের অর্থে শরীরপীড়ন নহে, “মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।” মনঃ ও ইন্দ্রিয়-বর্গের একাগ্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। মন অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়া-শক্তি ইহাদের পরমেশ্বরের অভিমুখী হও-

নের নাম তপস্যা। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ক্রিয়াশক্তির আরম্ভ হয় বলিয়া ইহা প্রথমে উক্ত হইল। সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরে প্রীতি স্থাপন করা বিধেয় কেননা ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তির অধীন। যাহার পরমেশ্বরে প্রীতি নাই তাহার পুণ্য ক্রিয়াও সাধন পক্ষে নিষ্ফল। অতএব ঈশ্বরে প্রীতিরূপ সম্পত্তি নিঃসংশয় অমূল্য।

যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

হে পরমেশ্বর বিবেকহীন ব্যক্তিগণের নশ্বর বিষয়ে যেরূপ প্রীতি তাহা তোমাকে যথা নিয়ম চিন্তা করি যে আমি আমার হৃদয় হইতে যেন প্রস্থান না করে। অর্থাৎ অবিবেকির যেরূপ শব্দাদি বিষয়ে অনুরাগ সাধকের পরমেশ্বরের প্রতি তদ্রূপ প্রীতি হয়। যাঁহাদের পরমেশ্বরে এইরূপ প্রীতি হয় তাঁহারা ধন্য। একেবারে ঈশ্বরে অব্যভিচারিণী প্রীতি লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে দুর্ঘট। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ, বিষয়ের প্রলোভনবশতঃ, সাংসারিক দুঃখের তীব্র পীড়ন বশতঃ আমরা সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ি। মনকে অন্তর্ম্মুখ করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত পুণ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন যে অনুষ্ঠানের ফল ঈশ্বরে প্রীতি কেন না স্বভাবতই ঈশ্বর পরপ্রেমাস্পদ। ক্রিয়া দ্বারা সেই প্রীতির বিরোধী যে সকল ভাব তাহারই নিষ্কাশন হয়। ঊর্দ্ধদেশ হইতে পড়িতেছে যে বস্তু বাধাবশতঃ তাহার পতন রোধ হয় এবং পরে সেই বাধার অভাব হইলে তাহা পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহা বলিয়া বাধা নিষ্কাশন কখন উক্ত বস্তুর পতনের কারণ হইতে পারে না। ইহাও তদ্বৎ। ক্রিয়ার দ্বারা দৃশ্য বিষয় হইতে মন প্রত্যাহৃত হইলে ঈশ্বরে প্রীতির বর্দ্ধন হয় অর্থাৎ অন্য বিষয়ে প্রীতি পরিত্যাগ করিলে স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতি প্রস্ফুটিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাহাতে প্রীতি হয় আমাদের ক্রিয়াহেতুক নহে। সেই প্রীতিকে অন্য বিষয়ে স্থাপন করিয়া স্বীয় অবনতি করা কিম্বা তদ্বিপরীত আচরণে স্বীয় উন্নতি করা আমাদের ইচ্ছাধীন।

কিরূপ ক্রিয়া দ্বারা উক্ত অর্থ সাধিত হইতে পারে? ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন মত কিন্তু এক বিষয়ে কাহার মতভেদ নাই। সর্ব্ব ধর্ম্মেরই শাসন যে সর্ব্বলোকের হিতকামনা করিবে, শুভানুষ্ঠায়িকে উৎসাহিত করিবে, বিপন্নকে করুণা করিবে এবং দুরাচারিকে উপেক্ষা করিবে। যে সকল ক্রিয়া ইহার অনুকূল তাহাই আচরণীয়, তদ্বিপরীত হেয়।

এই সাধনগুলির সঙ্গে অপর একটী সাধন প্রয়োজন তাহা "সম্যকজ্ঞান" অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ। যে সকল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিশ্বাস আপাততঃ মধুর হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা সর্ব্বতোভাবে হেয়। সাধক তাঁহাকে স্বরূপতঃ

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং"

এবং কার্য্যতঃ জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের এক মাত্র চেতন কারণ বলিয়া জানেন। নতুবা তাহার সাধন বৃথা হইয়া যায় কেননা তাহার প্রীতি যথার্থ পাত্রে স্থাপিত হয় না। জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গের দ্বারা যাঁহার সত্তার উপলব্ধি হয়, যাঁহার স্বরূপ বাক্য ও মনের অতীত অথচ যিনি অচিন্ত্য শক্তিযোগে

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসং শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজ মব্যয়ং॥

তিনিই এক মাত্র পরম প্রীতির আস্পদ অপর কেহ নহে। অতএব বিশেষ সাবধানতার সহিত কুসংস্কার হাতব্য।

যাঁহারা এই সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা ধন্য। সর্ব্ব জগতের একমাত্র ঈশ্বর, সর্ব্ব মনুষ্যের একমাত্র পিতা মাতা আমাদের হৃদয়কে নিজাভিমুখে আকর্ষণ করুন যাহাতে আমরা সর্ব্ব বাসনাত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ চির শান্তি ও অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে পারি ইহাই একাগ্রচিত্তের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং॥

বৈদান্তিক-ব্রহ্মজ্ঞান।

বেদান্তীরা প্রথমে শিষ্যদিগকে নৈত্যিক (যাহা প্রতিক্ষণে হইতেছে) বৈষয়িক-জ্ঞানের প্রণালী উপদেশ করেন, বুঝান, পশ্চাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন বা বুঝান। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, স্বতঃসিদ্ধ মানবীয় জ্ঞান কিম্বিধ প্রণালীতে উৎপন্ন হয়, তাহার অবস্থা বা বিভাগ কতপ্রকার, এ সকল না জানিলে, না বুঝিলে, বিচারোৎপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত ও উৎপাদন করা যায় না। যে ব্যক্তি স্বতঃসিদ্ধ নৈত্যিক বিষয়িক জ্ঞানের প্রণালী ও গতি বুঝে না, জানে না, সে ব্যক্তি বিচারোৎপাদ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের অনধিকারী। বেদান্তীদিগের এই অভিপ্রায় বজায় রাখিয়া, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ আমরা বেদান্তমতের নৈত্যিক জ্ঞানের বা নিত্যানুভূত বিষয়িক-জ্ঞানের প্রণালী ও বিভাগ বর্ণন করিব।

বেদান্ত মতে মানবীয় জ্ঞানের প্রথমতঃ দুই মুখ্য বিভাগ প্রদর্শিত আছে। অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি ও অনুভব তুল্য কথা। এবং স্মৃতি ও স্মরণ তুল্য কথা। এই দুই মুখ্য বিভাগের অবান্তর বিভাগ ভ্রম ও প্রমা। এই দুই মুখ্য বিভাগ লৌকিক ভাষায় ক্রমান্বয়ে মিথ্যা ও সত্য নামে ব্যবহৃত বা উল্লিখিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মানবগণের ভ্রমাত্মক অনুভব, প্রমাত্মক অনুভব, ভ্রমাত্মক স্মৃতি ও প্রমাত্মক স্মৃতি হইতে দেখা যায়। এই দুই বিভাগ সমান সমালোচ্য ও সমান অনুসন্ধেয় হইলেও বেদান্তীরা প্রথমে প্রমা জ্ঞানেরই স্বরূপ অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রমা কি? কিম্বিধ জ্ঞানের নাম প্রমা? এতথ্য নিশ্চিত হইলে তৎসঙ্গে অপ্রমা বা ভ্রম আপনা হইতেই নিশ্চিত বা স্থির হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে প্রমাজ্ঞানই বিবেচ্য।

স্মৃতি বিভাগ বাদ রাখিয়া, কেবল মাত্র অনুভব বিভাগীয় প্রমা বুঝিতে হইলে, এইরূপে বুঝিবে।—"যে জ্ঞান অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহন করে, বা অবগাহন পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই অনুভব বিভাগীয় প্রমা।" আর স্মৃতি ও অনুভব, উভয় সাধারণ। প্রমা বুঝিতে হইলে, "যে জ্ঞান অবাধিত বস্তু অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা," এইরূপে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "অনধিগত" বিশেষণটী ত্যাগ করিলেই প্রমাসামান্যের আকার স্থির হইবে।

বিবরণ—উপরোক্ত সূত্রভূত কথার বিবরণ এইরূপ—জ্ঞান-নির্দোষ-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বস্তু যৎস্বরূপ, ঠিক তৎস্বরূপ বা তদাকার মনোবৃত্তি (মনে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বস্তুর ছবি হওয়া) অনধিগত-যাহা পূর্ব্বানুভূত

নহে। অবাধিত—যাহার বাধ হয় না, অর্থাৎ পরীক্ষা কালে যাহার অন্যথা হয় না। সমুদয় কথার নিষ্কর্ষ বা নির্গলিতার্থ এই যে, যে জ্ঞানের বা যে মনোবৃত্তির (বস্তু ছবির) বিষয় বা বস্তু জ্ঞানোত্তরকালেও থাকে, পরীক্ষা করিলেও অন্যথা হয় না, তিরোহিত হয় না, সেই জ্ঞান বা সেই মনোবৃত্তি প্রমা-শব্দের বাচ্য। বাহ্যিক দূরত্বাদি দোষ নাই, আন্তরিক ইন্দ্রিয়-বৈকল্যাদি দোষ নাই, এমন অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক প্রভাবে যদ্রূপ বস্তু ঠিক তদ্রূপ মনোবৃত্তি (ছবি) জন্মিয়া থাকে, অন্যথা হইলে অন্যরূপ হয়, অর্থাৎ প্রমা হয় না, ভ্রমই হয়। জ্ঞানগোচরিত বস্তুর স্বরূপ ঠিক থাকিলেই, অন্যথা না হইলেই অর্থাৎ পরীক্ষায় টিকিলেই তাহা অবাধিত বলিয়া গণ্য। কখন কখন রজ্জু-চক্ষুঃ-সংযোগের পর রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্প জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানের সে সর্প পরীক্ষায় টিকে না, অন্যথা হয়, অর্থাৎ ইহা সর্প নহে, এরূপ পুনঃপ্রতীতি হয়, সুতরাং সে সর্প বাধিত। এরূপ অন্যথা জ্ঞান, বা একে আর জ্ঞান, কোন রূপ দোষ থাকিলেই হয়, দোষ না থাকিলে হয় না।

পেচকগণ স্ফীতালোক সূর্য্যমণ্ডলে অন্ধকার অনুভব করে, তাহা তাহাদের নেত্রদোষ। কেহ কেহ রক্ত বর্ণকে কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেত বর্ণকে পীত বর্ণ মনে করে, সে সমস্তই তাঁহাদের চক্ষুর দোষ। আমরা সকলেই বহু যোজন বিস্তৃত সূর্য্যকে হস্তপ্রমাণ দেখি, সুতরাং তাহা আমাদের দোষ নহে, বাহ্যিক দূরত্ব-দোষই আমাদিগকে উহাকে ঐরূপে প্রদর্শন করায়। অতএব বাহ্যিক বা আন্তরিক কোন প্রকার দোষ (প্রতিবন্ধক) বিদ্যমান থাকিলে প্রমোৎপত্তি হয় না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যে জ্ঞান দোষাভাব সহকারে উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানেরই বিষয় অবাধিত ও অব্যভিচরিত হয়। অন্যথা বা অন্যরূপ হয় না। বাধিত শব্দের পরিবর্ত্তে মিথ্যা শব্দের ব্যবহার করিতেও পার। বাধিত—মিথ্যা। অবাধিত—সত্য। অতএব যে জ্ঞান অবাধিত পদার্থ অর্থাৎ সত্য বস্তু অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান। ইহাও মনে রাখিতে হইবেক, এ সত্য ব্যবহারিক সত্য। স্মৃতিজ্ঞান প্রমা বটে, কিন্তু ইহার বিষয় সে সময়ে উপস্থিত বা বিদ্যমান থাকে না। চিত্তে পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানের সংস্কার থাকে, উদ্বোধক উপস্থিত হইলে, সেই সংস্কারই তদাকারে (তদ্বস্তুর আকারে) অভিব্যক্ত হয়। কাযেই এই জ্ঞান বিদ্যমান-বিষয়-নিরপেক্ষ। বিষয় বিদ্যমান থাকে না, কেবল মাত্র পূর্ব্বানুভব-জনিত-সংস্কার-বলে উদিত হয় বলিয়া, স্মৃতিজ্ঞানটী স্বপ্নসদৃশ অস্পষ্ট। অনুভবের সহিত স্মৃতির এই মাত্র প্রভেদ দেখিয়া যাঁহারা স্মৃতি জ্ঞানকে পৃথক্ শ্রেণী করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনধিগত বা অননুভূত এই শব্দটীকে বিষয়বিশেষণ দিবেন। অর্থাৎ অনধিগত (অননুভূত) ও অবাধিত বস্তু অবগাহী জ্ঞানই প্রমা, এইরূপ বলিবেন। যে বস্তু অননুভূত, পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই অথচ অবাধিত অর্থাৎ মিথ্যা নহে, এমন বস্তু যে-জ্ঞানের বিষয়, সেই জ্ঞানই প্রমা। ইহাই প্রমা লক্ষণ, এই লক্ষণই মনে রাখিবেন।

যখন কোন ধারাবাহী জ্ঞান জন্মে তখনও তদন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় (আলম্বন বস্তু) নিম্নলিখিত প্রকারে অনধিগত বলিয়া গণ্য, তদনুসারে, স্মৃতিঘটিত প্রমাজ্ঞানের লক্ষণও তাদৃশস্থলে অব্যাপ্ত নহে। অর্থাৎ ধারাবাহী জ্ঞানের দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে এ প্রমা লক্ষণ বজায় থাকে।

প্রণালী যথা—কালের কোন রূপ (রং) না থাকিলেও কাল ইন্দ্রিয়বেদ্য, ইহা অনেক পণ্ডিতের স্বীকার আছে। সেই স্বীকার অনুসারে, ইন্দ্রিয়-জনিত-মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞান যখন যে-বস্তু অবগাহন করে বা গ্রহণ করে, তখনই সে তদবচ্ছিন্ন বা তদ্বিশিষ্ট (তৎ-সঙ্গে) ক্ষণাদিরূপ সূক্ষ্ম কালকেও অবগাহন করে, গ্রহণ করে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধারাবাহী জ্ঞানের প্রথম জ্ঞানটী প্রথম-ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটকে অবগাহন করিয়াছিল এবং দ্বিতীয়াদি জ্ঞানগুলি দ্বিতীয়াদিক্ষণবিশিষ্ট ঘট গ্রহণ করিয়াছিল। ঘট এক হইলেও যেমন শ্বেত ঘট, রক্ত ঘট, পীত ঘট, এইরূপে ভিন্ন, তেমনি, প্রথমক্ষণান্বিত ঘট, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, তৃতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, ঐরূপে বিভিন্ন। যদি বিভিন্নই হইল, তাহা হইলে আর দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় (অবগাহ্য ঘট) অধিগত বা পূর্ব্বানুভূত বলিয়া গণ্য হইল না, সুতরাং প্রথমোক্ত প্রমালক্ষণের অ-ব্যাপ্তি দোষও (লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া) হইল না।

বিস্তার—উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তার এইরূপ—কখন কখন এমন হয়, কোন এক জ্ঞান দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিরা-জিত থাকে। সে দীর্ঘ জ্ঞান কখন আপনা আপনি কখন বা ইচ্ছাবলে সেরূপ স্থায়ী হয়। দেবচিন্তক, ঈশ্বরোপাসক, ভাবুক, শোকমগ্ন, প্রেমমগ্ন, এইরূপ এইরূপ লোককে প্রায়ই ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় ভাব্য বিষয়ক জ্ঞানকে দীর্ঘ বা স্থায়ী করিয়া রাখিতে দেখা যায়। এইরূপ দীর্ঘ জ্ঞান সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, তাদৃশ দীর্ঘ (লম্বা) বা স্থায়ী জ্ঞান এক জ্ঞান নহে, তাহা জ্ঞানধারা। অর্থাৎ তাহা উত্তরোত্তর সংলগ্ন বহু জ্ঞান। ইহারই অন্য নাম ধারাবাহী জ্ঞান। ঘট বিষ-য়ক ধারাবাহিক জ্ঞানের আকার এই-রূপ "ঘট ঘট ঘট ঘট—।" এক প্রযত্নে অনেকগুলি ঘটজ্ঞান শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র সংলগ্ন হইয়া যায় বলিয়াই উহাদের মধ্যবর্ত্তি চ্ছেদ অনুভূত হয় না, সুতরাং এক-টীর ন্যায় দেখায় অর্থাৎ এক বলিয়া বোধ হয়। অতএব ধারাবাহি জ্ঞানের মধ্যে যে জ্ঞানটী প্রথম, সেইটী ভিন্ন অন্য সমস্ত গুলিই প্রমালক্ষণে অব্যাপ্ত অর্থাৎ প্রমা লক্ষণে লক্ষিত হয় না। ভাবিয়া দেখ, প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান যে ঘট অবগাহন করি-য়াছে, পুনর্ব্বার সেই ঘটই দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় হইতেছে সুতরাং দ্বিতীয়াদি জ্ঞান অধিগত বিষয়-বিষয়ক হইল, অনধি-গত বিষয়-বিষয়ক হইল না। অনধিগত-বিষয় বিষয়ক না হওয়াতেই অনধিগতত্ব-ঘটিত প্রমালক্ষণ দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে থাকিল না। অথচ সে সকল জ্ঞান প্রমা মধ্যে গণ্য। এ সম্বন্ধে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় সে প্রণালী এই—ধারাবাহি জ্ঞান পরপর সংলগ্ন বহুজ্ঞান হইলেও তদ-ন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে নিম্নলিখিত প্র-কারে প্রথমোক্ত প্রমালক্ষণের সমন্বয় আছে। যথা—প্রথমতঃ কালের ইন্দ্রিয়-বেদ্যতা স্বীকার কর। কোনরূপ রূপ না থাকিলেও কাল ইন্দ্রিয়-বেদ্য। ছয় ইন্দ্রি-য়ের দ্বারাই কালজ্ঞান হইয়া থাকে। কেমন করিয়া? তাহা বিবেচনা কর। অনুস্বার ও বিসর্গ যেমন পৃথক্ উচ্চারিত হয় না, কোন একটা বর্ণের যোগ ব্যতীত উচ্চারিত হয় না তেমনি, কালও ইন্দ্রিয়-বেদ্য বস্তুর যোগ ব্যতীত পৃথক্ অনুভূত হয় না। যখন যে ইন্দ্রিয় যে-বস্তু গ্রহণ করে, তখন সেই ইন্দ্রিয় সেই বস্তুর সঙ্গে

স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেও গ্রহণ করে। "এখন ঘট আছে" ইত্যাকার জ্ঞানের "এখন" অংশটুকু কালবিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যখনই তুমি চক্ষুঃ দ্বারা ঘট দেখিয়াছ, তখনই তৎসঙ্গে স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেও দেখিয়াছ। যে পর্য্যন্ত ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত কাল স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন নামে খ্যাত। চক্ষুঃ যদি ঘটের সঙ্গে স্বক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকে না দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে, "এখন" এতদ্রূপ কালবোধক অংশ বা জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কে উৎপাদন করিয়া দিল? অতএব, বিবেচনা করা উচিত, ঐ স্থলে চক্ষুই ঐ জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, অন্য কেহ করে নাই। কালের রূপ নাই, রস নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, তজ্জন্য কাল দেখা যায় না, শুনা যায় না, এ সকল প্রবাদ বা এ সকল নির্ণয় অস্বাতন্ত্র্যমূলক ভিন্ন অন্যমূলক নহে। অর্থাৎ কাল অনুস্বার বিসর্গের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপে বা পৃথক রূপে অনুভবগম্য হয় না। ইন্দ্রিয়গৃহীত কালের উক্তপ্রকার ইন্দ্রিয়বেদ্যতা অঙ্গীকার করিলে অবশ্যই ধারাবাহী জ্ঞানের অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় গুলিকে অর্থাৎ বিভিন্ন-ক্ষণ-বিশিষ্ট বিভিন্ন ঘট পর পর গুলিকে অনধিগত বলিয়া গণ্য বা অঙ্গীকার করিতে পার। কেন না, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানেরই বিষয়, তাহা প্রথমে জ্ঞানে অধিগত হয় নাই। যে ঘট প্রথম জ্ঞানে অধিগত হইয়াছে, সে ঘট প্রথমক্ষণান্বিত ঘট, সুতরাং সে ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানের অধিগত নহে। ঘট বস্তু এক হইলেও যেমন শ্বেতঘট পীতঘট এবম্প্রকারে রূপে ভিন্ন, তেমনি ঘট বস্তু এক হইলেও প্রথমাক্ষণান্বিত ঘট, দ্বিতীয়ক্ষণান্বিত ঘট, এবম্প্রকারে বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়াই প্রদর্শিত-প্রকারে লক্ষণদোষ নিবারণ করা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে বেদান্ত সিদ্ধান্ত, ধারাবাহিক জ্ঞান একই জ্ঞান; পর পর সংলগ্ন বহুজ্ঞান নহে। যে পর্য্যন্ত ঘটরূপ বিষয়ের স্ফুরণ থাকে সেই পর্য্যন্ত ঘটাকারা মনোবৃত্তি একই বৃত্তি; নানা বা বহু নহে। উৎপন্ন মনোবৃত্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যে পর্য্যন্ত স্ববিরোধ বৃত্তি অর্থাৎ অন্যরূপ বৃত্তি উৎপন্ন না হয়, সে বৃত্তি সেই পর্য্যন্ত বিরাজিত থাকে। ঘটাকারে মনোবৃত্তি জন্মিল, সে বৃত্তি, পটাকার অথবা অন্য কোন প্রকার মনোবৃত্তি উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে না। এই নিয়ম অনুসারে ঘটধারাবাহি বুদ্ধি স্থলে যে সুদীর্ঘ ঘটাকারাবৃত্তি বিরাজিত থাকে, তাহা একই বৃত্তি; বহু নহে। যেমন বৃত্তি এক, তেমনি, তাবৎকালস্থায়ী তৎপ্রতিফলিত (ঘটাকার মনোবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত) চৈতন্য রূপ জ্ঞানও এক, অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞান এক জ্ঞান; বহুজ্ঞান নহে। এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত, এসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ধারাবাহিক জ্ঞানে অবশ্যই প্রমালক্ষণ লক্ষিত হইবেক সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত থাকিবেক।*

বলিতে পার, বেদান্ত মতে এসকল কিছুই সত্য নহে, ঘট পট, সমস্তই মিথ্যা। ঘট যদি মিথ্যাই হয়, তবে অবশ্যই তাহা বাধিত; বাধিত হইলে, "যে জ্ঞান অবাধিত পদার্থ অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই প্রমা"

* লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলে ন্যায় ভাষায় তাহাকে অব্যাপ্তি বলে। স্থূল কথা এই যে লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যব্যাপক হওয়া চাই। ধারাবাহী জ্ঞান প্রমামধ্যে গণ্য তজ্জন্য তাহা লক্ষ্য, লক্ষণ তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল না, কাযেই অব্যাপ্তি দোষ হইতেছিল।

এলক্ষণ একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং ঘটজ্ঞান প্রমা না হইয়া অপ্রমামধ্যে নিবিষ্ট হইল। ঘট জ্ঞান কেন, কোনও জ্ঞান প্রমা হইল না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ সকল বাধিত সত্য; ঘটও বাধিত সত্য; কিন্তু সংসার দশায় বাধিত নহে। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, এ সমস্তই অবাধিত বলিয়া গণ্য। যখন ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে তখন এ সকল বাধিত বা মিথ্যা হইবে। ঐন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় অসত্য বলিয়া স্থির হইবে। ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে বেদান্ত-বাক্য যথা—"যখন এ সকল আত্মপর্য্য-বসিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শীর আত্মভূত হয়, তখন সে কি দিয়া কি দেখিবে?" "যখন দ্বৈততুল্য হয় অর্থাৎ আমি, আমার, ইত্যাদিবিধ কল্পিত ভেদবুদ্ধি থাকে, তখনই জীব অন্য হইয়া পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বা অনুভব করে।" এই দুই শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মযাথার্থ্য সাক্ষাৎ-অনুভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার দশায় সমস্ত ব্যবহার্য্য অবাধিত। অতএব সংসারী জীবের সংসার-দশার প্রমা কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য যে, প্রমা লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদ্গত অবাধিত শব্দের বিবক্ষিত অর্থ সংসারদশায় অবাধিত। ফলিতার্থ অর্থ এই যে, সংসার দশায় যে-জ্ঞান, সংসারদশায় অবাধিত পদার্থ অবগাহন করে, সেই জ্ঞানই সংসার-দশায় প্রমা। এই লক্ষণই সম্পূর্ণ লক্ষণ। এ লক্ষণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; কোথাও অব্যাপ্ত নহে। যতকাল আত্মসাক্ষাৎকার না হইবে, ততকালই এইরূপ প্রমা, প্রমার উৎপাদক প্রমাণ, তন্নিষ্ঠ প্রামাণ্য, এইরূপ এইরূপ সমস্তই ব্যবহার অলুপ্ত থাকিবেক, সত্য বলিয়া গৃহীত হইবেক, কোনও ব্যবহার মিথ্যা বা লোপপ্রাপ্ত হইবেক না। অর্থাৎ ইহা মিথ্যা হইলেও কেহ ঐ সকলকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিবেক না। এ সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী আচার্য্য বলিয়াছেন, যতকাল আত্মনিশ্চয় না হয়, আমি কি, কিংস্বরূপ, তাহা স্থির না হয়; ততকাল দেহাত্ম জ্ঞানের ন্যায় এ সকল জ্ঞান প্রমাণ অর্থাৎ লৌকিক ঘট পটাদি জ্ঞান প্রমা বলিয়া গণ্য।* প্রমা বা সত্যজ্ঞান নির্ণীত হইল। এক্ষণে তাহার জনক বা উৎপাদক কে ইহা বলিতে হইবেক। কিরূপে উক্ত লক্ষণ প্রমা উৎপন্ন হয়, কে উৎপাদন করে? উৎপাদক অনুসারে উহার কত প্রকার বিভাগ বা শ্রেণী নির্ব্বাচিত হইতে পারে? এক্ষণে এই সকল বর্ণিত হইবেক।

ক্রম প্রকাশ্য।

ব্রাহ্মের আদর্শ।

প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীগণের আদর্শ কোন না কোন মানুষ বা কাল্পনিক জীব, কিন্তু ব্রাহ্মের আদর্শ ব্রহ্ম। যদিও বাইবেলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে চেষ্টা কর, তথাপি কার্য্যতঃ খ্রীষ্টীয়ানগণ খ্রীষ্টকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ মহম্মদকে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মালম্বীগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম কোন মানুষকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন না, ঈশ্বরই তাঁহার আদর্শ। পরকালে

---

* এখন অর্থাৎ সংসার দশায় দেহকে আমি বলিয়া জানিতেছি। ইহা আমাদের ভ্রম সত্য; কিন্তু তাহা জানিয়াও জানিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। সুতরাং এ অবস্থায় দেহাত্মজ্ঞান আমাদের নিকট অপ্রমা বলিয়া গণ্য নহে; প্রত্যুত প্রমা বলিয়া গণ্য। ঘটাদি জ্ঞানকে ও ঐরূপ জানিবে।

অনন্তকাল যিনি মানুষের আদর্শ থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে ইহলোক হইতেই আদর্শ-রূপে বরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। এই সার উপদেশের দ্বারা অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

দ্বৈতাদ্বৈত বাদ।

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম্।

অর্থাৎ "কেহ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেহ কেহ দ্বৈতপক্ষ প্রতিপন্ন করেন; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, কারণ যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহা সম্পূর্ণ দ্বৈত অথবা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় বিবর্জ্জিত।"

এই মত সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত ভাবে ও উপাসনা করেন না, আবার সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈত ভাবেও উপাসনা করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে ভগবদ্গীতার ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে দেখিয়া থাকেন। ঈশ্বর দ্বৈতভাবসমন্বিত, কারণ সৃষ্টি হইতে তিনি বিভিন্ন—সৃষ্টির জড়ত্ব ও অন্যান্য গুণ বিবর্জ্জিত, আবার তিনি অদ্বৈতভাব সমন্বিত, কারণ সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাঁহার গাঢ় যোগ—অনন্তকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; এমনি সম্বন্ধ যে তাঁহার গাঢ় আলিঙ্গন হইতে সৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত হইলে তাহা লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ঈশ্বর এই দৃষ্টিতে সৃষ্টির সঙ্গে অভেদ বলিতে হয়। এই দ্বৈতাদ্বৈত মতই সত্য মত।

ঐশ্বরিক প্রেম।

পৃথিবীর ঘটনা দেখিয়া ঈশ্বর মানবকে প্রীতি করেন কি না তদ্বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম পূর্ণ ও অনন্ত। পূর্ণ ও অনন্ত প্রেমের গতি ও কার্য্য অপূর্ণ ও অন্তবৎ জীবের নিকট সহজবোধ্য নহে। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের আদর্শ অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ সুতরাং মানবীয় প্রেমের নিয়মে ঐশ্বরিক প্রেম নিয়মিত হইবে এরূপ হইতে পারে না। যখন ঐশ্বরিক প্রেমের কার্য্য বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, তখন সেই প্রেমে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই জ্ঞানীর কার্য্য। ঈশ্বর এই চরাচর অনন্ত জগতের অনন্ত ক্ষেত্রে শান্তভাবে চিরকাল আপনার মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কাহারও হাস্য ক্রন্দন দ্বারা বিচলিত হয়েন না।

সাধু পার্কারের ধর্ম্ম।

মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার পৃথিবীর এক জন প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার ন্যায় সাধু লোক বর্ত্তমান কালে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। আজীবন তিনি ধর্ম্মের সেবা করিয়াছিলেন। কেবল ঈশ্বরোপাসনাকে তিনি ধর্ম্ম বলিতেন না। ব্রাহ্মদিগের ন্যায় শরীর মন ও আত্মার সমান উৎকর্ষ সাধনকেই তিনি ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই উচ্চ ধর্ম্মে মতি রক্ষা জন্য তিনি যে কয়েকটী নিয়ম সদাসর্ব্বদা পালন করিতেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন জন্য ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। এই নিমিত্ত প্রকৃ-

তির কার্য্য-পর্য্যালোচনা করিবে, ঈশ্বরের চিন্তা করিবে, তাঁহার উপর আমরা কতদূর নির্ভর করি তাহা উপলব্ধি করিবে, দুই সন্ধ্যা প্রার্থনা করিবে এবং যখনই ভক্তি-ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে তখনই তাঁহার উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের নিকট আমরা সুখ চাহি না তথাপি তিনি আমাদিগকে সুখ প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনি আমাদিগের হৃদয়গত নির্ম্মল নিঃস্বার্থ প্রার্থনা সকল পূর্ণ করিতেছেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কল্পনা হইতে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সম্বন্ধীয় অপবিত্র চিন্তা সকল দূর করিবে। দ্বিতীয়তঃ, মানসিক উন্নতি সাধন নিমিত্ত এই নিয়ম পালন করিবে যে যখন যে বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল হইবে তখনই সেই বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ব জানিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিবে। ইহার জন্য কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে না, নিজে গাঢ় রূপে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। তৃতীয়তঃ শারীরিক উন্নতি সাধন জন্য আহার ও পানে অপরিমিতাচার বর্জ্জন করিবে, প্রত্যহ অন্ততঃ তিন ঘণ্টা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও শারীরিক পরিশ্রম করিবে, প্রত্যহ ছয় ঘণ্টাকাল বা যতক্ষণ তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে। এইরূপে শরীর মন ও আত্মার এককালীন উন্নতি সাধন করিবে। এই উন্নতি সাধনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

প্রার্থনা।

সংসারের পাপ তাপ মোহে জরজর হইয়া—হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া—প্রাণের ক্রন্দন জানাইবার জন্য আমরা তোমার চির-উদ্‌ঘাটিত দুয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি; একবিন্দু শান্তিবারি দিয়া শোকে বিহ্বল, পাপে মলিন, দীন হীন সন্তানকে তোমার মহাসিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইবার উপযুক্ত কর। আমাদের বল নাই, আশা নাই, ভরসা নাই। তুমি যে বল দিয়াছিলে সংসারের ছলনা-অন্ধকারে মুগ্ধ হইয়া সে বল কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন অবসন্নহৃদয়ে কাতর প্রাণে করুণামৃত লাভ করিবার জন্য ভিখারী-বেশে তোমার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছি। অবনত মস্তক উন্নত করিয়া তুলিবার আর সামর্থ্য নাই—পঙ্কিল কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে জীবনের শান্তির সমাধি রচনা করিয়াছি। এখন ক্রন্দন মাত্র সম্বল। মৃত্যু ধীরে ধীরে আমাদিগকে সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিথ্যার পাষাণ স্তূপে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই চির-ধ্রুব অটল আশ্রয় ছাড়িয়া—ভূলোক দ্যুলোকের প্রতিষ্ঠাভূমি ছাড়িয়া—সেই ভূমানন্দ পরিপূর্ণপ্রেম ছাড়িয়া—বালক আমরা বুঝিবার দোষে হলাহল-সাগরে ডুবিয়াছি; দয়াময়! আমাদের কি উদ্ধার নাই? হৃদয়ে সত্যের আলোক নিভাইয়া দিয়া আমরা এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—প্রাণের মধ্যে, আত্মার মধ্যে সতত যে মহান্ আশ্রয় রহিয়াছে অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাই না। হতাশ-চিত্তে মৃত্যুকে আশ্রয় বলিয়া আলিঙ্গন করি—তাহার অধরোষ্ঠের সাদর-সম্ভাষণী হাসিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। তখন পাপকেই সুখ বলিয়া ভ্রম হয়—মিথ্যার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মনে করি, তোমারই প্রিয় কার্য্য সাধিত হইল। এখন দেখিতেছি মৃত্যু আমাদিগকে তাহার পদসেবায় নিযুক্ত করিয়াছে—হিম মৃত্যুর স্পর্শে আমরা জরজর।

এখন আর প্রাণে উৎসাহ নাই—হৃদয়ে আশা নাই। মিথ্যার উপাসনা আমাদিগকে নরকের পথে টানিয়াছে। আমাদের পানে বিভীষিকা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। তোমার প্রসন্ন মুখ পাপমলিন হৃদয় আর অনুভব করিতে পারে না। তোমার নামে সে অন্ধকারে লুকাইতে চায়—জানে না যে অন্ধকারের মধ্যেও মাতার স্নেহ-আঁখি জাগিয়া থাকে। এই যে মুক্ত আকাশ—এই যে প্রাণপূর্ণ বিশ্ব ইহা তাহার নিকট বিভীষিকা। আমরা এতদূর নামিয়াছি যে মাতার নামে শিহরিয়া উঠি। কানাকানি, দ্বেষ, হিংসা ও পরনিন্দার মধ্য দিয়া আমরা পাপের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু তোমার সন্তান হইয়া পাপের পদসেবায় জীবন অতিবাহিত করিব কিরূপে? আমাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তুমি আমাদিগকে পাপের মধ্যে পুণ্য, বিষাদের মধ্যে শান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সংযম শিক্ষা দিয়াছ। আমাদের মঙ্গলের জন্যই পাপের রাজ্যে কণ্টক বন সৃষ্টি করিয়াছ। সেই কণ্টক বনে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এখন তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি—নাথ! রোগীকে তোমার পুণ্য স্পর্শে পবিত্র কর।

সন্তান আজ ভিখারীবেশে মাতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া—মায়ের সম্মুখেও জড়সড় সঙ্কুচিত ভাব। প্রসন্নমুখে তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছ—মলিন হৃদয় লইয়া তোমার ক্রোড়ে যাইতে সাহস হইতেছে না। তুমি মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে সাধু শিক্ষা দিবে জানি—জানি, কঠোর পীড়ন তোমার উদ্দেশ্য নহে—অমঙ্গলের ছায়ার মধ্য দিয়া তুমি মঙ্গলের পথে লইয়া যাও, কিন্তু ছদ্মবেশী মোহের ছলনায় এখনও ভুলিয়া আছি—এখনও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সন্নিধানে মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। পদে পদে দুর্ব্বল হৃদয় চমকিয়া উঠে। তোমার শান্তিনিকেতনেও সে পৃথিবীর ধূলি বহিয়া আনে। দয়াময়! রক্ষা কর—নহিলে মোহ বন্ধনে জীবন অবসান হয়।

পাপে মোহে আমরা ডুবিয়াছি। আমাদের উদ্ধার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তোমার করুণাই আমাদের জীবন। আমরা তোমার আদেশ শতবার লঙ্ঘন করিয়াছি—মার্জ্জনা করিয়া তুমি আমাদিগকে উন্নত শিক্ষা দিয়াছ। তুমিই আমাদিগকে রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে চিরদিন রক্ষা করিতেছ। তাই আজ দিনান্তে পাপতাপে জরজর হইয়া তোমারই দুয়ারে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি—তুমি আমাদের কল্যাণ বিধান করিতেছ—তুমি আমাদের কল্যাণ বিধান কর।

ভক্ত প্রহ্লাদ।

আত্মাতেই যাঁহাদের পুরুষার্থ ব্রহ্ম তাঁহাদেরই প্রাপ্য, যাহারা বহির্বিষয়ে নিমগ্ন সেই সমস্ত দুরাশয় তাঁহাকে কখন জানিতে পারে না। প্রত্যুত এক অন্ধ অন্য অন্ধ দ্বারা নীয়মান হইয়া যেমন গর্ত্তে পতিত হয় সেইরূপ এই সকল লোক বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া অন্ধকারে গমন করে। যাবৎ বিষয়াভিলাষশূন্য মহত্তম ব্যক্তিদিগের শরণাপন্ন না হয় তাবৎ এই সকল লোকের বুদ্ধি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেও কখনও অসম্ভাবনা ও কখন বা বিপরীত ভাবনা দ্বারা বিহত হয় এবং ইহা কদাচ তাঁহার

চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। ফলত মহত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান ও তজ্জনিত মোক্ষও হয় না। এই বলিয়া প্রহ্লাদ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া তাঁহাকে ক্রোড় দেশ হইতে ভূতলে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিলেন এবং রোষরক্ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, ঘাতকগণ শীঘ্র ইহাকে বাহিরে লইয়া যাও এবং শীঘ্রই ইহার প্রাণসংহার কর। যখন এই দুরাত্মা আত্মীয় স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া দাসবৎ বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে তখন এ অবশ্যই আমার বধ্য। যদি একজন পরও ঔষধের ন্যায় হিতকারী হয় তবে সেইই পুত্র, আর ঔরস পুত্রও যদি ব্যাধির ন্যায় অহিতকারী হয় তবে তাহাকে পরই বলিয়া জানিবে। ইহাও তো দূরের কথা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটী যদি আপনার অনিষ্টকর হয় তবে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিবে, কারণ উহা ছিন্ন হইলে অপর গুলি সুখে জীবিত থাকিতে পারে। মুনির পক্ষে দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন শত্রু সেইরূপ এই দুর্বৃত্ত আমার ছদ্মবেশী শত্রু, অতএব যে কোনও উপায়ে হউক ইহাকে বধ কর।

দৈত্যপতির আদেশমাত্র তাম্রশ্মশ্রু তাম্রকেশ বিকটদণ্ড বিকটমুখ ঘাতকেরা মার মার রবে শূলহস্তে উপস্থিত হইল। এবং প্রহ্লাদের মর্ম্মস্থলে সুতীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তাঁহার চিত্ত-নির্ব্বিকার অনির্দ্দেশ্য বিশ্বাত্মা ব্রহ্মে সমাহিত। ব্রহ্মতেজে শূলপ্রহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

তখন দৈত্যপতি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং অন্যান্য উপায়ে প্রহ্লাদকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রযত্নই বিফল হইল। এইরূপে যখন তিনি সেই নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণবধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমি ইহাকে অনেক অসাধু বাক্যে ভৎর্সনা করিয়াছি, বিবিধ উপায়ে বধের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এ স্বতেজে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এই বালক আমার অদূরে দণ্ডায়মান কিন্তু নির্ভয়। কিছুতেই ইহার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আশ্চর্য্য, মৃত্যুও ইহার ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী নয়। ইহার প্রভাব নিতান্ত অপরিমেয়। এই বালকের সহিত বিরোধ করিয়া নিশ্চয় আমাকেই মরিতে হইবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তিনি অধোমুখে যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দৈত্যগুরু শুক্রের পুত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন দানবরাজ, তুমি সর্ব্ববিজয়ী, তোমার ভ্রূভঙ্গীতে ভয় না করে এমন কেহই নাই। সুতরাং তোমার এইরূপ দুশ্চিন্তার বিষয় আমরা কিছুই দেখি না। আর দেখুন বালকদিগের কার্য্যে গুণ দোষ গ্রহণ করা উচিত নয়। এক্ষণে তুমি প্রহ্লাদকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখ। যেন কোনরূপে কোথাও পলাইয়া না যায়। দেখ পুরুষের বুদ্ধি বয়সে ও সাধুসঙ্গে সমীচীন হইয়া থাকে।

তখন দৈত্যপতি গুরুপুত্রের কথায় সম্মত হইয়া কহিলেন ভালই; তবে তোমরাও ইহাকে গৃহী রাজার ধর্ম্ম শিক্ষা দেও। অনন্তর প্রহ্লাদ ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গে উপদিষ্ট হইতে লাগিলেন কিন্তু যাঁহারা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন ঐ সমস্ত শিক্ষা তাঁহাদের

মুখনির্গত, প্রহ্লাদের কিছুতেই তাহা ভাল বোধ হইল না।

অনন্তর একদা শুক্রাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বয়স্য বালকদিগের সহিত প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলেন।

ঐ সময় পরম কারুণিক প্রহ্লাদ সহচর দৈত্যবালকদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ একেতো এই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, পরজন্মে এই যোনিলাভ হইবে কিনা সন্দেহ। অতএব ইহজন্মে কৌমার অবস্থাতেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। বিষ্ণু সর্ব্বভূতের প্রিয় আত্মা প্রভু ও সুহৃৎ, অতএব তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। দেহীদিগের দেহযোগ বশত দৈবাৎ ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইয়া থাকে কিন্তু দুঃখ অযত্নসম্ভূত। সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রয়াস অকর্ত্তব্য, ইহাতে কেবল আয়ুক্ষয় হয়। আর বিষ্ণুকে ভজনা করিলে যে কল্যাণলাভ হয় ইহা দ্বারা কোনও মতে তাহা হইতে পারে না। অতএব এই জন্মে যাবৎ শরীর না নষ্ট হয় তাবৎ কল্যাণ লাভার্থ যত্ন করিবে। একে তো আয়ু শতবর্ষমাত্র, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস তাহাদের ইহারও অর্দ্ধেক, রাত্রিকালে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যতক্ষণ নিদ্রিত থাকি সে কালটুকু তো নিস্ফল, বাল্য ও কৈশোরে অনর্থক ক্রীড়া কৌতুকে বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, আর জরা দেহে প্রবেশ করিলে আবার ঐরূপ বিংশতি বর্ষ নিরর্থক যায়। আয়ুর অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাও গৃহাসক্ত প্রমত্ত গৃহীর দুঃখপূর্ণ কামনা ও বলীয়ান মোহে ব্যয়িত হয়। বল দেখি কোন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সুদৃঢ় স্নেহপাশবদ্ধ সংসারাসক্ত আপনাকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিতে উৎসাহী হয়। বলদেখি তস্কর সেবক ও বণিক প্রিয়তর প্রাণ অপেক্ষাও অভীষ্ট যে অর্থ প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও ক্রয় করে কোন্ পুরুষ সহজে সেই অর্থতৃষ্ণা ছাড়িতে পারে। যে ব্যক্তি দয়া স্নেহে পালিত প্রিয়তমার নির্জনসঙ্গ ও মনোহর আলাপে আত্মবিস্মৃত, যে আত্মীয় স্বজনের স্নেহে বদ্ধ, যাহার মন মধুরাস্ফুটভাষী শিশুতে অনুরক্ত, যে মনোজ্ঞ উপকরণে সজ্জিত গৃহসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ যে কুলক্রমাগত জীবিকা উপার্জ্জনে ব্যস্ত, এবং যাহার চিত্তে এই সমস্ত সততই জাগরূক তাহার কিরূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে। কোষকারী কীট যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার নির্গমন দ্বার পর্য্যন্ত রাখে না সেইরূপ কর্ম্মবাসনা এই সমস্ত লোককে বদ্ধ করিতেছে, ইহাদের বাহির হইবার পথ নাই। ইহাদের লোভ অতিমাত্র প্রবল সুতরাং কিছুতেই কামনার শান্তি নাই, ইন্দ্রিয়সুখ সর্ব্বাপেক্ষা ইহাদের বহুমত এবং সংসারমোহ যার পর নাই দুর্দ্দম, বল দেখি এই সকল লোকের মনে কিরূপে বৈরাগ্য আসিবে। এইরূপ ভোগবিলাসে যে নিজের আয়ু ও পুরুষার্থ নষ্ট হইতেছে এইরূপ প্রমাদী চিত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। ইহারা ত্রিতাপে তাপিত কিন্তু স্ত্রী পুত্রের প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ নিবন্ধন ইহাদের মনে কিছুতেই বৈরাগ্য আইসে না। প্রত্যুত এই সকল লোকই ক্রমশ দুরাচার অসৎ হইয়া উঠে। এই স্ত্রীপুত্রানুরাগবশত কেবল অর্থেতেই ইহাদের তৃষ্ণা বলবতী হইতে থাকে। পরস্বাপহারীর ঐহিক ও পারত্রিক দণ্ডের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের দুর্জয়তা ও কামনার অশান্ততা হেতু ইহারা পরস্বাপহরণ করে;

বিবিধ।

বৈশেষিক দর্শন কণাদ ঋষিকৃত। এই মহর্ষি কাশ্যপ গোত্রে জন্মিয়া ছিলেন। ইহাঁর অপর নাম উলূক। এই জন্য বৈশেষিক দর্শনকে ঔলূক্য দর্শন বলে। উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ ধান্যের এক এক কণা সংগ্রহ করিরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এ জন্য এই ঋষির নাম কণাদ।

এই ঋষি অতি প্রাচীন। মহাভারতে ইহাঁর উল্লেখ আছে। সাংখ্য-দর্শনের একটী সূত্রে বৈশেষিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় সুতরাং ইহা সাংখ্য অপেক্ষা প্রাচীন। বেদান্তের অণুবাদখণ্ডন দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহা তদপেক্ষা প্রাচীন। শব্দের উৎপত্তি বিনাশবত্ত্বা এই দর্শনের সিদ্ধান্ত কিন্তু জৈমিনি অতি যত্নে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন সুতরাং ইহা তদপেক্ষা যে প্রাচীন যে বিষয়েও সন্দেহ নাই। আর ইহা ন্যায় দর্শন অপেক্ষা যে প্রাচীন তাহারও প্রমাণ আছে। বৈশেষিকে অনুমান প্রণালী সংক্ষেপে কিন্তু ন্যায়ে সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। আর একটী প্রমাণ এই বৈশেষিকে তিনটী হেত্বাভাস গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়ে পাঁচটী স্বীকৃত দেখা যায়। এস্থলে অনুমান করিতে হইবে যদি ন্যায় দর্শনের পরে ইহা রচিত হইত তাহা হইলে পঞ্চ হেত্বাভাস স্থলে কেন যে তিনটী মাত্র স্বীকৃত হইতেছে তাহার হেতু প্রদর্শন অবশ্যই ইহাতে থাকা সম্ভব। কিন্তু তাহা নাই। ইহাতেও বুঝা যায় বৈশেষিক ন্যায়েরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ফলত ইহা অতি প্রাচীন দর্শন। ইহার প্রাচীনতার আরও একটু প্রমাণ এই যে অন্যান্য দর্শনের সূত্র সকল যেরূপ দুর্বোধ ইহা সেরূপ নহে। ইহার সূত্র সকল অতি সরল। পাঠ মাত্রেই তাহার অর্থগ্রহ হইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ যাহা অপর দর্শনে স্বীকার করে না ইহা তাহা স্বীকার করে বলিয়া ইহার নাম বৈশেষিক।

ভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম।

(১) আত্মার সাংসারিক সুখ দুঃখ বোধ ম্লান করা কর্ত্তব্য। যত আত্মার সাংসারিক সাড় কমিবে তত আধ্যাত্মিক সাড় (ব্রহ্মানন্দ) বাড়িবে।

"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"।

"ব্রহ্ম সংস্পর্শং অত্যন্ত সুখমশ্নুতে"।

(২) বাহ্য জগৎ, শরীর ও মনকে অনাত্মীয় বলিয়া ঝেড়ে ফেলা এবং আমি কেবল আত্মা মনে করা এবং আত্মাতে ও আত্মার আত্মাতে সংস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই ঝেড়ে ফেলা প্রণালী গীতা হইতে বিলক্ষণ শিক্ষা করা যায়। বৌদ্ধ যোগীরা কেবল আত্মাতে সংস্থিত হইতেন। ঋষিরা আত্মার আত্মাতে সংস্থিত হইতেন। "উপাস্যং তৎপরং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"। এই সর্ব্বোত্তম যোগ।

(৩) কর্ম্ম ও যোগের সামঞ্জস্য। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করার প্রধান লক্ষণ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ন ফলেষু কদাচন"।

(৪) জ্ঞান ও ভক্তি ওকর্ম্মের সামঞ্জস্য।

পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমেতৎ

বিগত ১৬ই ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীমন্মহর্ষি মহাশয়ের ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যে পত্র বাহির হয় তৎপাঠে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ক মত যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম—তদতিরিক্ত অনেক মত

তাঁহার সহিত বিশেষ আলাপে জানিতে পারিয়াছি এবং তাঁহার প্রচারকার্য্য বা দীক্ষাপ্রণালী স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি "জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার" করিতেছেন কি কি করিতেছেন আপনারা তাহার বিচার করুন এবং তাঁহার অবলম্বিত প্রচারপ্রণালীই যদ্যপি প্রকৃত 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার' হয়, তবে আপনারাও সেই "ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ" অবলম্বন করুন।

১। গোস্বামী মহাশয় কাহার বুদ্ধিভেদ ঘটান না। তিনি বলেন একজন লোক যদ্যপি অশ্বকে ঈশ্বরবোধে, আবার তাহার সেই ঈশ্বর নরবলিতে সন্তুষ্ট হয় এই জ্ঞানে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে নরবলি দিয়া পূজা করে, তবে তাহাকেও তিনি প্রথমে সেই অশ্বরূপেই দর্শন দিয়া ক্রমে অজ্ঞানতা দূর করিয়া প্রকৃত রূপ দর্শন দিবেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপের অন্যথা করিয়া ভক্তের কল্পিত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ ধ্বংসও স্বীকার করিয়া থাকেন।

২। সমস্ত দেব দেবীর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন- তাহাদের আবার স্বতন্ত্র বাসস্থান বা লোক আছে, তাহাও বলেন, ইহাও বলেন যে, যে যাহার উপাসক, তিনি তাহাকে সেই রূপে দর্শন দিয়া ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবেন, তাহার পরমার্থ পথে সহায় হইবেন। তিনি স্বয়ং নৃসিংহ অবতার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রকাশ করেন।

৩। তিনি অতি গোপনে লোককে দীক্ষিত করেন--যে তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত নহে, সে সেস্থানে থাকিতে পারে না--দীক্ষিত করার সময় তাহাকে তাঁহার গুরুদেবের অনুমতি লইতে হয়--গুরুদেব সেই সময় স্থূলদেহে বা সুক্ষ্মদেহে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি করেন। কোন্ নাম বা বীজ মন্ত্রের কে অধিকারী তাহাও তিনিই বলিয়াদেন। গুরুদেবই গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারায় মন্ত্র দেন। তাঁহার নিজের মন্ত্র দেওয়ার শক্তি এখনও জন্মে নাই। তাঁহার শরীর ভগ্ন সেই জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহার শরীর হইতে আত্মাকে (সুক্ষ্মদেহকে) বাহির করাইয়া তাহার দ্বারায় মন্ত্র দেওয়ান। ঈশ্বরবিশ্বাসী হইলেই তাঁহার অবলম্বিত সাধনের অধিকারী স্বাব্যস্ত হয়।

৪। গোস্বামী মহাশয়ের সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহাকে স্বধর্ম্ম ছাড়িতে হয় না। একজন শাক্ত তাহার পূর্ব্ব পূজাপদ্ধতি ঠিক রাখিয়া তাঁহার মতে সাধন ভজন করিতে পারে। কাহাকেও তিনি স্বধর্ম্ম ছাড়িতে উপদেশও করেন না। সাধন প্রভাবে মন্ত্রশক্তিতে কালে তাহার ভ্রম দূর হইবে এই কথা বলেন।

৫। তাঁহার একজন লেখা পড়া না জানা শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি তাহাকে মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। সে মন্ত্রের বা নামের অর্থও জানে না।

৬। মন্ত্র প্রদান কালে শিষ্যকে কতকগুলি নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হয়--কাহাকে এই এই কর্ম্ম করিও না উপদেশ দেওয়া হয়--কাহাকেও বা যখন যে কার্য্যে পাপ বোধ হইবে, তখ সেই কার্য্য করিতে বিরত হইও বলা হয়। উপদেশের মধ্যে সাধনের বিঘ্ন হইতে দেখিলে গুরুচিন্তা করার উপদেশও দেওয়া হয়। গুরুচিন্তা করিলে গুরু যেখানে থাকুন উপস্থিত হইয়া সাধনে সহায়তা করিয়া থাকেন।

৭। তাঁহার মন্ত্রশিষ্যগণের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য তিনি নিজে দায়ী। যতটি লোককে তিনি দীক্ষিত করিবেন যে কাল পর্য্যন্ত তাহাদের সকলের সদ্গতি না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহারও উদ্ধার নাই। শিষ্যদের মুক্তির জন্য তাঁহাকে পুনর্জ্জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে যে কেহ যে দণ্ডে যে পাপ কার্য্য করিবে, সেই দণ্ডেই সেই পাপের ছবি (ফটোগ্রাফের ন্যায়) গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া যে কোন পাপকর কার্য্য করিবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা জানিতে পারেন।

৯। মন্ত্রপ্রদানকালে যে শক্তি প্রদান করা হয় শিষ্য কোন প্রকার পাপকর কার্য্য করিলে তিনি বা তাহার গুরুদেব বা অন্যান্য মহাপুরুষ সেই শক্তি অলক্ষিত ভাবে হরণ করিয়া লয়েন। শিষ্য সে প্রাণায়াম প্রক্রিয়াটি ভুলে না বা মন্ত্রটিও বিস্মৃত হয় না--অথচ সাধনের যে ফল তাহা লাভ করিতে পারে না। সে যদি পাপানুষ্ঠান ছাড়েও, তথাপি সেই শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে সে মন্ত্রজপে বা প্রাণায়ামে কিছুই ফল পাইতে পারে না।

১০। তিনি কোন সমাজ বিশেষের অধীনতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন তিনি হিন্দুর তিনি মুসলমানের তিনি খৃষ্টানের তিনি ব্রাহ্মের; তিনি ছাগশোণিতপ্লাবিত দেবীমন্দিরকে যে চক্ষুতে দেখেন ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরকেও সেই সেই চক্ষুতে দেখেন। তিনি আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন না। তাঁহার অবলম্বিত পথই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এই তো কতকগুলি তাঁহার প্রধান মত বা প্রচার-

প্রণালী। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত আছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগাবলম্বনে যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি মনুষ্যের জন্মে তাহারই কয়েকটি নূতন নূতন বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

এই যোগপথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরদর্শনতো হইবেই তাহা ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞতা ভূত ভবিষ্যত ঘটনার জ্ঞান প্রাপ্তি—এখান হইতে অতিদূর দেশের নিভৃত কক্ষে কি হইতেছে, তাহা জানা, সূক্ষ্ম বা স্থূলদেহে দূর প্রদেশে গমন,এমন কি চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে গমন শক্তিও জন্মে। ইহলোকস্থিত দূরদেশবাসী মহাপুরুষদের স্থূলদেহেই পলকের মধ্যে একত্রিত হওয়া, পরলোকগত আত্মার সন্দর্শন, মৃত শরীরে যোগীর আত্মার প্রবেশ ও শবকে জাগ্রত করা এবং এক কথায় বহু বৎসরের কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য করা ইত্যাদি কত কি অদ্ভুত শক্তি লাভ।

শ্রীঅনাথবন্ধু রায়।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৯ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনা-মূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৶১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাকমাশুলসহ নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাই-বেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

আগামী ৯ই আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইবে।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ। ১লা আষাঢ় ১৮১০ শক। } শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদক।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর ষটত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় শুক্রবার ১৮১০ শক।

উদ্বোধন।

আমরা ক্ষুদ্র—পৃথিবীর ধূলিকণা হইয়া কি প্রকারে সেই মহান্ অসীম জগতের স্থষ্টিকর্ত্তা পিতা পাতা অনুপমমহিম ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই? কি প্রকারে আমরা আত্মাতে তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার প্রতি মনঃপ্রাণ সমাধান করিতে সমর্থ হই? ইহার কারণ কি ইহাই নয়, যে যেমন মধুমক্ষিকারা কোথায় মকরন্দ আছে সংস্কারবশতঃ তাহা জানিতে পারিয়া তদ্‌যুক্ত পুষ্পের প্রতি ধাবিত হয়, আমরাও সেইরূপ আত্মনিহিত সংস্কার ও বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করি ও তাঁহাকে আত্মাতে পাইয়া ভক্তি ও প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করি। "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" তিনিই দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার, সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন; তিনি আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার, তাঁহাকে ভজন সাধন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। যে আত্মা প্রকৃতিস্থ, সে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সতত উন্মুখ থাকে। বিষয়-সুখ ধন মান পৃথিবীর মহোচ্চ সম্পদ্ আত্মাকে কদাচ পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, বৃহৎকায় তিমি মৎস্য কি ক্ষুদ্র তড়াগে বিচরণ করিতে পারে? পরমেশ্বরই আমাদিগের পরম ধন, পরম আনন্দ ও পরম সম্পদ্। তাঁহাকে লাভ করিলে যে তৃপ্তি যে আনন্দ যে শান্তি লাভ করা যায়, তাহা পৃথিবীর কোন বস্তুই প্রদান করিতে পারে না। যে সকল প্রশান্তচেতা সাধুরা ঈশ্বরকে জীবনের মধ্য বিন্দু করিয়া তাঁহার উদ্দেশে আপনাদিগের চিন্তা ও কার্য্য নিয়োগ করেন, তাঁহারাই ধন্য। ভাগবতে* আছে যে, যে সকল মুনি আত্মারাম, অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরেতে নিরন্তর রমণ করেন, তত্ত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হওয়াতে যাঁহারা গ্রন্থের বহির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের মধুময় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অহেতুকী

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ॥১।৭।১০

ভক্তি করেন, যেহেতু তাঁহার প্রতি ভক্তি-যোগ "অনর্থোপশমম্," সকল অনর্থের প্রশমন, সে ভক্তি থাকিলে আর সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। অতএব যাঁহা-দিগের গতি মতি ঈশ্বরে দৃঢ় হয় নাই, বিষয়-কামনা হইতে পাপ প্রলোভন হইতে যাঁহারদিগের চিত্ত এখনও বিমুক্ত হয় নাই, তাঁহারা একান্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে, তাঁহার পথের পথিক হইতে, কায়-মনে উদ্‌যুক্ত হউন, তদ্‌ভিন্ন শ্রেয়ো-লাভের আর সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর এমনি দয়াময় যে পাপ তাপে তাপিত ব্যক্তি যদি পাপ জন্য অনুতাপ করিয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করে, তিনি তাহার পাপ-ভার হরণ করেন, তাহাকে শুভমতি প্রদান করেন, তাহাকে নব জীবন দিয়া কৃতার্থ করেন। তিনি সাধু অসাধু সকলকেই আপনার মঙ্গল ছায়া দান করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। অতএব আইস, মঙ্গল যাঁহার নাম, মঙ্গল যাঁহার কার্য্য, যাঁহার উপাসনা অশেষ মঙ্গলের নিদান, সেই উপাসনাতে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হই।

উপদেশ।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

ঈশ্বর ইন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদি বহি-র্বিষয় প্রকাশের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য ইন্দ্রিয় সকল অনাত্মা শব্দাদি বিষয়ই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।

এই কাঠশ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের স্বাভা-বিক প্রবৃত্তি ও ঈশ্বরে নিবৃত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক ইন্দ্রিয়ের এই দুই প্রকার প্রবৃত্তিকে রূপকচ্ছলে দে-বতা ও অসুররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাক্ চক্ষু মন প্রভৃতির শাস্ত্রনিয়মিত কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহা দেবতা এবং উহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে প্রবৃত্তি তাহা অসুর। এই দেবাসুর যুদ্ধে অসুরেরা দেবতাকে পরাভব করে, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদ্ভবে অসুরের জয়লাভ হয়। অসুরের জয়ে জীবের পাপে প্রবৃত্তি ও নরকাদি দুর্গতি হইয়া থাকে। আবার যখন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় তখন স্বাভাবিক আসুরী বৃত্তির অভিভবে দেবতার জয় হইয়া থাকে। ইহাতে জীবের শুভ কর্ম্মের বাহুল্য ও সদ্গতি হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটী অযত্নসিদ্ধ ও অপরটী যত্নসিদ্ধ, সুতরাং অসুরেরই জয় অবশ্যভাবী হইয়া উঠিল।

পরে দেবতারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞে তাঁহারা পক্ষপাত ও অভিমানাদি শূন্য উদ্গাতা ও ঋত্বিককে আশ্রয় করিয়া অসুরগণকে পরাভব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ঐ ইন্দ্রিয় উদ্গাতৃকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাক্যকথনরূপ কার্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ উপকার নিষ্পন্ন করিল বটে কিন্তু যাহা তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণো-চ্চারণ তাহা স্বপক্ষে সম্পন্ন হওয়াতে সে তদ্বিষয়ে অভিমানী ও আসক্ত হইল। ফলত এই অভিমান ও আসক্তি দ্বারা অসু-রেরা তাহাকে জানিতে পারিয়া তাহাকে নষ্ট করিল। এইরূপে অভিমান ও আ-সক্তি-দোষে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হইয়া গেল। পরিশেষে সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ মন আসিয়া ঋত্বিকের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কিন্তু তাঁহারও

স্বপক্ষে শোভন সঙ্কল্পে অভিমান উপস্থিত হইল। তিনিও ঐরূপে নষ্ট হইলেন।

বৃহদারণ্যকের এই রূপক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে অভিমান ও আসক্তিই জীবের বিনাশের নিদান। যতকাল এই দুইটী থাকিবে তাবৎ জীবের বৈরাগ্য ও তন্নিবন্ধন ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না। এবং তদভাবে তাহার মুক্তিও দুর্লভ হইয়া থাকে। কিন্তু পরম কারুণিক ঋষিরা এই অভিমান ও আসক্তি ত্যাগ হইবার জন্য অধিকারভেদে নানা উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধানত দর্শনের অভিপ্রায় কিরূপ তাহার আলোচনা আবশ্যক। বেদান্ত দর্শন কহিলেন এই সংসার ভ্রমকল্পিত, ইহার বাস্তবিক সত্তা নাই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সমস্তই ব্রহ্ম, পারমার্থিক সত্তা কেবল তাঁহারই। যাহা সত্য প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই সত্তা, তিনিই ব্রহ্ম। আর এই নামরূপাত্মক বিকার অসত্য, ইহার সমস্ত ব্যবহার যথাযথ নিষ্পত্তি হইলেও জ্ঞানোদয়ে অর্থাৎ অবিদ্যার নাশে ইহার সত্তা তোমার নিকট লোপ পাইবে। বেদান্তের এই যে সংসার সম্বন্ধে পারমার্থিক সত্তার লোপ ও ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার ইহার হেতু এই যে জীবের ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এত প্রবল যে সংসারের অণুমাত্র বীজ থাকিলে তাহার ভোক্তৃভোগ্য ব্যবহার অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে সংসারী করিয়া ফেলিবে এবং তাহার বৈরাগ্য দুর্ঘট হইয়া পড়িবে। ফলত বৈরাগ্য সহজ হইবার নিমিত্তই সংসারের পারমার্থিক সত্তার লোপ স্বীকৃত হইয়াছে। নতুবা আমার অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞানোদয় হইলে সংসারের যথাযথ ব্যবহার সম্পন্ন হইবে কিন্তু ইহার বাস্তবিক সত্তা আমার চক্ষে আর নাই এ কথার কোন আর অর্থ থাকে না। কঠ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়কে বহির্বিষয় প্রকাশের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং বিষয়ে বিচরণ তাহার স্বভাব কিন্তু এই স্বভাবই তাহার তত্ত্বদৃষ্টির ব্যাঘাতক, অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টি তাহার পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিষয়ের গুরুতর আকর্ষণ বিনা আয়াসে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইতে দেয় না। সুতরাং যাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য তাহাতে জীবের সহজে মতি হইবে না। অথচ তাহার মুক্তি চাই। আবার মুক্তি বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করে। এই জন্য বৈদান্তিক বলিলেন এই যে সম্মুখে বিশাল সংসার দেখিতেছ ইহা মায়া মরীচিকা। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোন পদার্থ নাই। যাই এই জ্ঞানাগ্নি জীবে প্রবেশ করে তখন সে সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মেরই স্ফূর্ত্তি দেখিতে পায়। বিষয় তো তখন তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছে আর তাহার আকর্ষণ কোথায়? তখন সে পরম বৈরাগ্যে বিভোর হইয়া বলিয়া উঠে

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

বেদান্তজ্ঞান আবার কহিলেন যখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই তখন কি তুমি জ্ঞানে আর তোমার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতে পার? এই স্থানে জীবের অহঙ্কার এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। তখন সে, যে কোন কার্য্য করে রূপকে প্রদর্শিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সেই সকল কার্য্যে আর তাহার অভিমান ও আসক্তি থাকে না। বাস্তবিকই সে তখন জ্ঞানে আপনার অনস্তিত্ব অনুভব করে। এ অনস্তিত্ব কিরূপ? যেমন জ্যোতিঃ

পুঞ্জ সূর্য্যের নিকট একটা খদ্যোতের অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব একপ্রকার অনস্তিত্বই বলিতে হইবে। ফলত যত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা যায় ততই বোধ হয় যে জীবের বিষয়ে অনাসক্তি ও অভিমান ত্যাগের জন্যই এই বৈদান্তিক মায়াবাদের সৃষ্টি। বাস্তবিক পক্ষে এই জীব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মও হন না এবং এই সংসারও একটা অলীক পদার্থ নয়। অভিমান নষ্ট করিয়া পর বৈরাগ্যে আনয়ন এই পরম জ্ঞানের গূঢ় উদ্দেশ্য। বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত ব্রহ্মে ভক্তি হয় না, আবার ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই সুতরাং জ্ঞানই মুক্তির নিদান। বেদান্ত সেই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন।

আবার গীতার আলোচনায় এই কথারই প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা কহিলেন কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্ম্মে তোমার অধিকার ফলে অধিকার নাই। এইটী গীতার নিস্কাম কর্ম্মের উপদেশ। যে ঘোর সংসারী তাহারই কামনা হয় কিন্তু যে ত্রিবিধ তাপে উত্তপ্ত হইয়া তত্ত্বালোচনায় সংসারের অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহার আর সংসার ভোগের কামনা থাকে না। ফলত নিস্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারাই জীবের বৈরাগ্য সিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিই কামনার অধিষ্ঠান। যতক্ষণ অভিমান থাকে তাবৎ কামনাও থাকে। এই অভিমান নাশের উপায় ইন্দ্রিয়দমন অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সঞ্চরণ। এই অনাসক্তি বৈরাগ্য ব্যতীত সম্ভবে না।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং।
তস্মাত্ত্বং ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং।

এই সমস্ত ও অন্যান্য শ্লোকে জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক কামনা ত্যাগের কথা গীতায় পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। গীতার মুখ্য কথা এই তোমার ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিচরণ করুক কিন্তু বিষয়ে আসক্তি যাহা তোমার তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ ব্যাঘাতক সেই টুকু তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ তুমি যদি নিস্কাম হইয়া কর্ম্ম কর তাহা হইলে তুমি আসক্তিশূন্য হইলে। এই আসক্তিশূন্যতাই বৈরাগ্য। দর্শনকার সংসারের নাস্তিত্ব দেখাইয়া এবং জীবের অহঙ্কার বা আমি ও আমার বুদ্ধি লোপ করাইয়া মনে একটী প্রবল বৈরাগ্যের উদয় করিয়া দিতেছেন। স্মৃতিকার এক নিস্কাম কর্ম্মের উপদেশে তাহাই করিতেছেন। ফলত ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ে অনাসক্ত করাই ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বসোপান। উপনিষদ, দর্শন ও গীতা বেদান্তের এই ত্রিবিধ প্রস্থানই ব্রহ্মলাভের জন্য এক বাক্যে ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়ে অনাসক্তি বা বৈরাগ্যের উপদেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মলাভ আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের অন্তরে নিরন্তর দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শাস্ত্রালোচনায় আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে এই অসুর নিপাত করিতে না পারিলে আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধি হইবে না। যতক্ষণ অভিমান ও আসক্তি না যায় তাবৎ অসুরের জয়। ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও তাহার বিষয় দিয়াছেন। অভিমানশূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয়ে বিচরণ কর অসুর নিপাত হইবে। দেখ আমরা স্বাধীন নহি। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশে কার্য্য করে সেই রূপ আমরা ঈশ্বরের আদেশে তাঁর সংসারে তাঁহারই কার্য্য করিতে আসিয়াছি। তবে প্রত্যেক কার্য্যে আমরা আপনাকে কেন

প্রতিবিম্বিত দেখি। ব্রহ্মের কার্য্য করিতে আসিয়াছ তাঁহার কার্য্য কর। ফলের প্রতি লক্ষ্য করিও না। ফল ফলদাতার হস্তে। ফলত কামনাই সর্ব্বনাশের মূল। সকল শাস্ত্র একবাক্যে তাহাই কহিয়াছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বাক্যামৃতকণা।

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি।
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নরাণাং।
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাং॥

* * *

পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম
নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য॥
আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানাং
অন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়াদ্য॥
মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং।
ন জায়তে বৈ পরমাত্মসঙ্গি॥

* * *

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ॥

বিষ্ণু পুরাণং।

অযুত বৎসরেই হউক আর লক্ষ বৎসরেই হউক বাসনারাশির সমাপ্তি নাই। বার বার পূর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার মনুষ্যগণের বাসনারাশির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপত্তি হয়। * * *

যে স্থানে এক বাসনার পরিপূরণ সেই স্থানেই যে অপর বাসনার জন্ম তাহা কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে? ইহা মৎকর্ত্তৃক অদ্য বিদিত হইল যে দেহের অন্ত হইলেও বাসনার অন্ত নাই এবং বাসনা বিষয়াসক্তির বশ যে পুরুষ তাহার চিত্ত কখন পরমাত্মায় অভিনিবিষ্ট হয় না।

* * *

নিঃসঙ্গতাই যতিদিগের মুক্তিপদ এবং সঙ্গ হইতে অশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। সঙ্গ হেতু যোগারূঢ় যোগীও অধঃপতিত হয়েন, অল্প মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে যে পুরুষের তাহার আর কি কথা।*

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ভগবদ্গীতা।

শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কে মনে মনে আলোচনা করে যে পুরুষ তাহার সেই বিষয়ে প্রীতি জন্মায়, প্রীতি হইতে সেই বিষয়কে পাইবার ইচ্ছাস্বরূপ যে কাম তাহার উৎপত্তি হয়। কাম হইতে (তাহার প্রতিঘাত হেতুক) ক্রোধ সমুৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে বিভ্রম জন্মায়। উক্ত বিভ্রম হইতে পূর্ব্বোদিত-শুভবুদ্ধির সংস্কারজনিত যে স্মৃতি তাহা ভ্রষ্ট হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইতে অন্তঃকরণের কার্য্যাকার্য্য বিবিক্ত করিবার শক্তি নষ্ট হয় এবং এইরূপ বুদ্ধিনাশ হইতে পুরুষ পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুতিরূপ যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু তাহাকে প্রাপ্ত হয়।

কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ ত্বং হি জায়সে।
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি॥

মহাভারতং।

হে কাম তোমার মূল আমি অবগত হইয়াছি; তুমি সঙ্কল্প হইতে জন্মগ্রহণ কর ইহা নিশ্চিত। তোমাকে সঙ্কল্প ক-

---

* অনুপস্থিত অনুকূল বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছা বাসনার্থ। এবং উপস্থিত অনুকূল বিষয়কে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছার নাম আসক্তি। অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নাই এই রূপ নিঃসংশয় জ্ঞানের নাম নিঃসঙ্গতা। পরমেশ্বরকে ক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেননা তিনি নিজের স্বভাবেই অযত্নে আমাদের হৃদয়ে চির উদিত। এই জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে তিনি যোগারূঢ় যোগী।

রিব না সেই নিমিত্ত তুমি আমার সম্বন্ধে ঘটিবে না।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥
মণ্ডূকাদি শ্রুতিঃ।

আমার ও সর্ব্বজগতের অন্তর্যামী যিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে জীবের সমুদায় কর্ম্মরাশি ক্ষয় হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং হৃদয়ের গ্রন্থি স্বরূপ যে কাম তাহাও ভিন্ন হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

আমি ডাকি হে কাতরে বড় ব্যাকুল আছে মন
কেমনে তোমারে পাই বল পিতা বল তাই
আর কিছু নাহি চাই তোমারি ভিখারী যে
যে তোমারে চায় তুমি রাখ তারে পায়
আমি আসিয়াছি দীনহীন লইতে শরণ
সদা অজ্ঞান তিমিরে কেন আছি প'ড়ে
তোমার করুণা হিল্লোলে বিতর চেতন
এস পিতা এস কাছে প্রাণ কাঁদে তোমায় যাচে
আমার মরমবেদনা যত করি নিবেদন
আত্মবন্ধু প্রিয়জনে তুমি লইয়াছ সঙ্গোপনে
তবে কেন তোমা হ'তে করহে বঞ্চন
এখন তোমারে দাও সঙ্গে ক'রে লও
এখন দয়াময় বন্ধু পেলে জুড়াবে জীবন।

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

যখন জান্‌তে পেয়েছি হে তোমায় ছাড়িব না
তুমি দয়াময় তোমায় দিয়ে হৃদয়
আমি পূর্ণ করিব সব কামনা।
তোমাতে যখন হই হে মগন
কি আনন্দ পাই হৃদয়ে তখন
ভুলে যাই তাপ, দূরে যায় পাপ
কোথা চ'লে যায় অন্য বাসনা।
তোমারি আশাতে র'য়েছি বাঁচিয়ে
থাকিব তোমারি চরণ ধরিয়ে
দাও প্রেম তব হৃদয় ভরিয়ে
পাইব সান্ত্বনা।
ঘুচাও সকল ভব কোলাহল
তোমারি ভাবেতে করহে বিহ্বল
দূর ক'রে দাও হৃদয় গরল
তাহে অমৃত কর সিঞ্চন।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

জড়বস্তুর গুণ স্বতঃ কিরূপ।

জড়বস্তুর সমস্ত গুণ স্বতঃ (অর্থাৎ আশ-য়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে) একান্ত-পক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

প্রমাণ।

জড় বস্তুর ন্যায় জড়বস্তুর গুণ-সকল স্বতঃ আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আশ-য়কে না জানিয়া কোন বিষয়কেই জানা যাইতে পারে না,—প্রতীচ্য জ্ঞান ব্যতি-রেকে পরাচ্য জ্ঞান সম্ভবে না। অতএব জড়বস্তুর সমস্ত গুণ স্বতঃ একান্তপক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রয়োজন ॥ ১ ॥

ভৌতিক বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান কি-প্র-কার জ্ঞান—এই প্রশ্নের আন্দোলন-কালে মনোবিজ্ঞান দুইটি বিভিন্ন মতের মধ্যে দোলায়িত হয়। কখন বা মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তার দলে মিশিয়া সপ্তম প্রতি-পক্ষ সিদ্ধান্তের এই মত-টি অনুমোদন

করে যে, জড়বস্তু স্বতঃ জ্ঞান-গম্য; কখন বা এরূপ একটি মত ব্যক্ত করে—লৌকিক চিন্তা যাহার কোন ধারই ধারে না; সেটি এই যে, জড়বস্তু নিজে না হউক্ তাহার গুণ-সকল স্বতঃ জ্ঞান-গম্য। প্রথম মতটির সম্বন্ধে সপ্তম সিদ্ধান্ত যাহা বলিবার তাহা বলিয়া চুকিয়াছে; উক্ত সিদ্ধান্তে যা'র পর নাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জড়বস্তু স্বতঃ (অর্থাৎ জ্ঞাতার সঙ্গাশ্রয় ব্যতিরেকে) কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। দ্বিতীয় মতটি যাহা নিম্ন-লিখিত প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট-রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহার খণ্ডনার্থেই বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণা। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত সপ্তমটিরই ন্যায় স্ববিরোধ-গর্ত্ত।

অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

যদিচ জড়বস্তু স্বতঃ উপলব্ধি-গম্য নহে, তথাপি জড়বস্তুর বিশেষ একজাতীয় গুণ স্বতঃ উপলব্ধি-গম্য।

জড়বস্তুর মৌলিক গুণ এবং বৈকারিক-গুণ দুয়ের প্রভেদ ॥ ৩ ॥

উপরি-উক্ত "বিশেষ এক জাতীয় গুণ" আর কিছু নয়—যে গুণ-গুলিকে মনোবিজ্ঞানীরা জড়বস্তুর মৌলিক গুণ Primary qualities বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সেই-গুলি। এই স্থানটিতেই জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই প্রকার গুণের প্রভেদ আলোচিতব্য। ঐ প্রভেদটি তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে এক সময়ে খুবই ধূমধাম করিয়াছে—কিন্তু সমস্তই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। যাহাই হো'ক্—উহা যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের ইতিবৃত্তে একটি সুব্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে, এজন্য উহার অসারতা এবং ভ্রমাত্মকতা প্রকাশ্যে বাহির করিয়া দেখানো আবশ্যক।

জড়বস্তুর বৈকারিক গুণের পরিচয়-চিহ্ন ॥ ৪ ॥

জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক গুণসকল সবিস্তরে প্রদর্শন করা অথবা তাহাদের কাহার কিরূপ প্রকৃতি তাহা বিবৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। ঐ দুই জাতীয় গুণের কাহার কিরূপ পরিচয়-চিহ্ন তাহার একটি সাধারণ আদর্শ প্রদর্শন করাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট: তাহা হইলেই পাঠক উভয়ের প্রভেদই বা কি এবং সে প্রভেদের তাৎপর্য্যই বা কি তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শৈত্য ঔষ্ণ্য বর্ণ শব্দ আস্বাদ গন্ধ—এই গুলিই বৈকারিক গুণ। এই প্রকার গুণ-বাচক শব্দগুলির অর্থ দুইরূপ। উহাদের এক অর্থ আমাদের অভ্যন্তর-স্থিত বিশেষ বিশেষ ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি, এবং উহার আর-এক অর্থ সেই সকল অনুভূতির উত্তেজক বিশেষ বিশেষ জড়বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ। উত্তাপ অথবা বর্ণ বলিতে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত অনুভূতি-বিশেষও বুঝায় আর সেই অনুভূতির উৎপাদক ভৌতিক কারণ বিশেষও বুঝায়। উত্তাপ আমাদের শরীরে এবং উত্তাপ অগ্নিতে, এ দুই কথার অর্থ দুই প্রকার। শরীরের বেলায় তাহার অর্থ এক প্রকার স্পর্শানুভব—অগ্নির বেলায় তাহার অর্থ এক প্রকার ভৌতিক গুণ যাহা সেই স্পর্শানুভবের কারণ। এইরূপ, বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দ যত আছে, সমস্তই দ্ব্যর্থ-সূচক। সেই শব্দ-গুলি কিরূপ স্থলে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহা দেখিয়া তবে আমরা তাহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি, অর্থাৎ সে গুলি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত—ঐন্দ্রিয়ক অর্থে অথবা ভৌতিক অর্থে—তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এখানে বিশেষ যেটি দ্রষ্টব্য তাহা এই যে, বৈকারিক গুণ

গুলি স্বতঃ যে কি সে-বিষয়ে আমরা স্থির কিছুই বলিতে পারি না, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে তাহারা যেরূপ শব্দ-স্পর্শাদির অনুভব উৎপাদন করে, তাহা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জড়বস্তুর বৈকারিক গুণ আমরা আমাদের জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি করি, তাহা ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কাজেই, শুদ্ধ যদি কেবল সেই ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতিই জড়বস্তুর একমাত্র পরিচায়ক হইত, তবে জড়বস্তুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নিতান্তই সংশয়-স্থলে নিপতিত হইত।

মৌলিকগুণের পরিচয় চিহ্ন ॥ ৫ ॥

মনোবিজ্ঞান বলে যে, জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি স্বতন্ত্র প্রকার; তাহারা জড়বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে। আকার বিস্তৃতি এবং সংঘাত (Solidity)—এইগুলিই প্রধানত জড়বস্তুর মৌলিক গুণ। শৈত্য ঔষ্ণ্যের ন্যায় এগুলিকে আমরা শুদ্ধ কেবল ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করি না, তা ছাড়া এগুলিকে আমরা বহির্বস্তু-সমাশ্রিত বলিয়া উপলব্ধি করি। শৈত্য ঔষ্ণ্য, বর্ণ, শব্দ, এই সকল গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র—এবং ইহাদের মাত্রাতিশয্য হইলে ইহারা আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু ভৌতিক বস্তু-সকলের আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতের ওরূপ মাত্রাতিশয্য সম্ভবে না। এই ব্যাপারটি ঐন্দ্রিয়ক অনুভব এবং প্রত্যক্ষ এ দুয়ের প্রভেদ জ্ঞাপন করিতেছে।

ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত হইতে পারে—এবং কতক-না-কতক মাত্রা শারীরিক সুখ দুঃখ তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-নামক মনোবৃত্তি, যাহা আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত লইয়া ব্যাপৃত হয়, তাহা সেরূপ নহে; তাহার মাত্রা সর্ব্বদাই সমান, এবং তাহা শারীরিক সুখ-দুঃখে জড়িত নহে। প্রত্যক্ষ দ্বারাই আমরা জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি (অর্থাৎ আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত) অবগত হই—ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি দ্বারা নহে। মনোবিজ্ঞান আরো এই বলে যে, মৌলিক গুণ-বাচক শব্দ-গুলি বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দগুলির ন্যায় দ্ব্যর্থ-সূচক নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা একটি গুরুতর বিষয় যাহা মনোবিজ্ঞান আমাদের লক্ষ্যে আনয়ন করে তাহা এই যে, মৌলিক গুণ-গুলির সাহায্যে আমরা যে-সকল বস্তু উপলব্ধি করি—মৌলিক গুণ-গুলি সেই সকল বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে—আমাদের মনকে আশ্রয় করিয়া নহে; এ সকল গুণ আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহিরে উপলব্ধি করি—আমাদের মনের অভ্যন্তরে নহে। আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতের বাহ্য অস্তিত্ব আমরা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করি—সুতরাং তাহারা যে, বহির্ব্বস্তুরই গুণ, এ বিষয়ে আর আমাদের সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদি বৈকারিক গুণ-সকলের বাহ্য-সত্তা বিষয়ে আমরা স্থির কিছুই বলিতে পারি না,—কাজেই ইহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত।

জড়বস্তুর মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই জাতীয় গুণের মধ্যে—প্রত্যক্ষ এবং ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির মধ্যে—মনোবিজ্ঞান যেরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করেন তাহা ঐ। ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি বলিয়া যে একটি মনোবৃত্তি—তাহা বৈকারিক গুণ-সকলের বাহ্য-সত্তা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তাহা অন্তর্বাহ্যের মধ্যে ক্রমাগতই ইতস্ততঃ করে; আর, প্রত্যক্ষ বলিয়া যে একটি মনোবৃত্তি তাহা মৌলিক গুণ সকলের বাহ্য সত্তা অতীব স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করে।

মনোবিজ্ঞানের মতানুসারে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি মানসিক অবস্থার পরিচায়ক এবং প্রত্যক্ষ-বৃত্তি বহির্জগতের পরিচায়ক।

এই প্রকার প্রভেদের দোষ ॥ ৬ ॥

প্রভেদটি নিজে তত দোষের নহে। যদিচ ওরূপ প্রভেদ নিরূপণে বিশেষ কোন ফল দর্শে না, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই যে, জড়বস্তুর মৌলিক গুণগুলি এক শ্রেণীভুক্ত ও তাহার বৈকারিক গুণ-গুলি আর এক শ্রেণী-ভুক্ত; শেষোক্ত গুণগুলি অস্পষ্ট এবং আনুভূতিক, পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। ফলে, মনোবিজ্ঞান এই যে একটি কথা বলিতেছেন যে বৈকারিক গুণগুলি দ্ব্যর্থ-সূচক, ইহার উত্তর এই যে, দ্ব্যর্থসূচকতার কথা যদি বল—তবে সে বিষয়ে বৈকারিক গুণও যেমন—মৌলিক গুণও তেমনি—দুইই সমান। আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত বলিতে শুদ্ধ কি কেবল বহির্ব্বিষয়েরই গুণ বুঝায়—আমাদের প্রত্যক্ষ-বৃত্তির পরিণাম বুঝায় না? প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত যে, কি, তাহা কি মনোবিজ্ঞান বলিতে পারেন, না কোন মনুষ্য তাহা বলিতে পারে? মৌলিক গুণের প্রত্যক্ষই কেবল আমাদের মানসক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—মৌলিক-গুণ স্বতন্ত্ররূপে তথায় উপস্থিত হয় না। তেমনি আবার,বৈকারিক গুণের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতিই কেবল আমাদের মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, বৈকারিক গুণ স্বতন্ত্ররূপে তথায় উপস্থিত হয় না। ইহাও যেমন উহাও তেমনি; উভয়েই একদিকে যেমন বহির্বস্তুর গুণ, আর একদিকে তেমনি মনোবৃত্তির পরিণাম। অতএব বৈকারিক গুণ-বাচক শব্দগুলিও যেমন—মৌলিক গুণবাচক শব্দগুলিও তেমনি—দ্ব্যর্থ-সূচকতা-বিষয়ে কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন নহে। কাজেই, দুয়ের প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা মৌলিক গুণের দ্ব্যর্থ-সূচকতা দোষ ঘুচাইতে গেলে, সে দোষ কিছু আর সত্য সত্যই ঘুচানো হয় না—শুদ্ধ কেবল গোপন করা হয় মাত্র। আর ঐ দুই জাতীয় গুণের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইতে গেলে—চক্ষে ধূলি দেওয়া রকমের একটা গোঁজামেলে সিদ্ধান্ত গড়িয়া তোলা হয় মাত্র।

উহা স্ববিরোধিতায় প্রধাবিত হয় ॥ ৭ ॥

কিন্তু এখানকার ভ্রম যেটি, তাহা উক্ত প্রভেদ-নিবন্ধন তত নহে—যত সেই প্রভেদের প্রয়োগ-নিবন্ধন। মনোবিজ্ঞানের হস্তে পড়িয়া ঐ প্রভেদটি স্পষ্ট একটি স্ববিরোধিতায় প্রধাবিত হয়। সে স্ববিরোধিতা অষ্টম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে মূর্ত্তিমান—তাহা এই যে, জ্ঞাতা আপনাকে না জানিয়া জড়বস্তুর বিশেষ এক জাতীয় গুণ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারে। কোথা হইতে এই স্ববিরোধের সূত্র উত্থাপিত হয় তাহা অতঃপর দেখা যাইতেছে।

মনোবিজ্ঞানের মতে মায়াবাদ কিরূপ ॥ ৮ ॥

মনোবিজ্ঞান যাহাকে মায়াবাদ বলিয়া ভয় পা'ন, তাহার প্রতিবিধান-মানসেই তিনি ঐরূপ প্রভেদ নিরূপণে প্রবৃত্ত হ'ন। মনোবিজ্ঞানের মতে ঐরূপ প্রভেদের অস্বীকারের উপরেই মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভাবেন যে, মায়াবাদ ঐ দুই জাতীয় গুণকে মিসাইয়া এক করিয়া ফেলে—বৈকারিক গুণের ধর্ম্ম মৌলিক গুণে আরোপ করে—শৈত্য ঔষ্ণ্য প্রভৃতির ন্যায় আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাতকে অন্তঃকরণের বিকার মাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করে। তাঁহার মতে, মায়াবাদ জড়বস্তুর বৈকারিক গুণ-সকলের ন্যায় তাহার মৌলিক গুণ-সকলকেও অ-

স্পষ্ট এবং দুর্ভেদ্য মনে করে। মায়াবাদ মনে করে যে, জড়জগতের আন্দোলন-কালে আমরা জড়-বস্তুর গুণ-সকল জ্ঞানে উপলব্ধি করি না; উপলব্ধি করিবার মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের কতক গুলি মানসিক বিকারই উপলব্ধি করি। মনোবিজ্ঞানী ভাবেন যে, এইরূপে মায়াবাদ জড়বস্তুর অস্তিত্ব হয় একেবারেই উড়াইয়া দে'ন—নয় বিষম ভর্জকটে ফেলিয়া দেন; কারণ, বৈকারিক গুণের যে দশা—মৌলিক গুণেরও যদি সেই দশা হয়, যদি দুই জাতীয় গুণের কাহাকেও আমরা স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতে না পারি, আর যদি আমরা সমস্ত জড়-জগৎকে ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি পরম্পরায় পরিণত করিতে বাস্তবিকই সমর্থ হই, তবে তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির উত্তেজক কারণ—জড় জগৎ না হইয়া আর-কোন কিছু হইলেও হইতে পারে, কাজেই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা সংশয় স্থলে নিপতিত হয়; তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, অনুভবিতা'র বিলোপ হইলেই সমস্ত জড় জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেননা সমস্ত জড়জগৎ অনুভূতি-পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মনোবিজ্ঞানের মতে—ইহাই মায়াবাদ। মনোবিজ্ঞান ভাবেন যে, জড়জগতের মূলোচ্ছেদ করা—মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই জাতীয় গুণের প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তাকে জ্ঞান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া—ইহাই মায়াবাদের চরম উদ্দেশ্য। মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে মায়াবাদ নিম্ন-প্রকার অতি ব্যাপ্তি দোষে দূষিত;—জড়বস্তুর কোন কোন গুণ (যেমন উত্তাপ শব্দ বর্ণ) পরীক্ষাতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, তাহারা আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি-মাত্র, অতএব জড়-বস্তুর সমস্ত গুণই আমাদের মনোবৃত্তির পরিণাম।

মনোবিজ্ঞান-কর্তৃক মায়াবাদের খণ্ডন ॥ ৯ ॥

"মায়াবাদের ভুল এইবার ধরা পড়িয়াছে—মায়াবাদ মৌলিক এবং বৈকারিক এই দুই বিভিন্ন জাতীয় গুণকে এক সঙ্গে মিসাইয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছেন" এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া, মনোবিজ্ঞান মায়াবাদের খণ্ডন-কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত হ'ন,—জড়জগতের নিকট হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা যাহা অবৈধ-রূপে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি ঐ প্রভেদটিকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতারণ করেন। ইহা তিনি স্বীকার করেন যে, জড়বস্তুর কোন কোন গুণ আমাদের মনোবৃত্তির পরিণাম-মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া জড়বস্তুর সকল গুণই যে সেইরূপ, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জড়বস্তুর আকৃতি আছে—বিস্তৃতি আছে—সংঘাত আছে, ইহারা ও-রূপে বাগ মানিবার পাত্র নহে; ইহারা শৈত্য ঔষ্ণ্য প্রভৃতির দলে মিশিয়া ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি সাজিতে কিছুতেই সম্মত হয় না। তবুও যদি ও-দুই শ্রেণীর গুণকে বল-পূর্ব্বক একত্র মিসাইতে যাও, তবে তেলে জলে মিসানোই সার হইবে। মৌলিক-গুণ সকল লুকাচুরি জানে না, তাহাদের ভিতর-বাহির সমান; তাহাদের সত্তা অতীব সুস্পষ্ট সত্তা, তাহার মধ্যে দুর্ভেদ্য কিছুই নাই। বৈকারিক গুণসকলই মূলবস্তুতে একরূপ এবং আমাদের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে আর-একরূপ, কিন্তু মৌলিক গুণ-সকল সেরূপ নহে। তাহারা পষ্টাপষ্টি মায়াবাদীর সম্মুখে দণ্ডায়-

মান হইয়া বলে যে, "তুমি তোমার সমস্ত গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর—পারিবে না।" আমাদের ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি-বিষয়ে স্পষ্ট কোন কথাই বলে না, এমন কি জড়বস্তুর অস্তিত্বেরও সমুচিত প্রমাণ প্রদর্শন করে না; সে তাহা না করুক্—প্রত্যক্ষ বলিয়া আর-একটি মনোবৃত্তি যাহা আমাদের আছে, যাহা জড়বস্তুর আকৃতি বিস্তৃতি এবং সংঘাত লইয়া ব্যাপৃত হয়, সেই প্রত্যক্ষ-বৃত্তি আমাদিগকে জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি এবং সত্তাতে সহজেই পোঁছাইয়া দেয়; আর, এই মৌলিক গুণ-সকলের সুব্যক্ত সত্তার বলেই আমরা জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিপাদন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই না।

উহা স্ববিরোধী এই জন্য গ্রাহ্য নহে ॥ ১০ ॥

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, উপরি-উক্ত যুক্তিটি নিতান্ত বল-হীন নহে, কিন্তু উহার বলবত্তা শিরোধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সামান্য গুটি-দুই কথা বিবেচ্য। এ শুধু বলিলে চলিবে না যে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইতে বিভিন্ন, অথবা মৌলিক গুণ-সকল বৈকারিক গুণ-সকল হইতে বিভিন্ন; তা ছাড়া, এইটি দেখানো চাই যে, মৌলিক গুণ-সকল স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; মনোবিজ্ঞানী যতক্ষণ না এইটি দেখাইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ যুক্তিটিতে কোন ফল দর্শিতেছে না। জড়বস্তুর জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা প্রমাণ করাই মনোবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য। মনে কর যেন জড়বস্তুর ঐরূপ সত্তা আছে; কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? মনোবিজ্ঞানী বলিবেন যে, মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তাই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার একমাত্র প্রমাণ। উত্তম কথা,—মৌলিক গুণ-সকলের জ্ঞান-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তার প্রমাণ প্রদর্শন কর, তাহা হইলেই বিবাদ মিটিয়া যাইবে; কিন্তু তাহা তুমি করিতেছ না—তুমি কেবল বলিতেছ যে, বৈকারিক গুণ (শব্দ-স্পর্শাদি) একজাতীয় গুণ এবং মৌলিক গুণ (আকৃতি বিস্তৃতি সংঘাত) আর-এক জাতীয় গুণ; হইলই বা আর একজাতীয় গুণ, তাহাতে কাহার কি আইসে যায়? মৌলিক গুণ কি জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র রূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য? তাহা হইলেই বলিতে পারি যে, মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা যখন আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য—তখন কাজেই তাহা আমাদের শিরোধার্য্য; কেননা জ্ঞানই সত্তার একমাত্র প্রমাণ। অতএব মনোবিজ্ঞানীর প্রকৃত অভিপ্রায়টিকে জঞ্জালমুক্ত করিয়া স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় যে, জড়বস্তুর বিশেষ এক-জাতীয় গুণ (মৌলিক গুণ) স্বতন্ত্র-রূপে (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহির্ভূত রূপে) জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, অতএব মৌলিক গুণ এবং তাহার আশ্রয়ীভূত জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে। ওরূপ স্বতন্ত্র সত্তা বাস্তবিকই আছে কি নাই এ বিষয়ে এখানে আমরা কোন কথাই বলিতে চাহি না, এখানে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, উপরি উক্ত যুক্তির গোড়ার কথাটি (অর্থাৎ "মৌলিক গুণের স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য" এই কথাটি) ভ্রমাত্মক ও স্ববিরোধী। ইহা একটি যুক্তিযুক্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী—অষ্টম সিদ্ধান্তের বিরোধী। যে-কোন জ্ঞাতা হউন্ না কেন,

তিনি আপনাকে উপলব্ধি না করিয়া জড়-বস্তুর কোন গুণই উপলব্ধি করিতে পারেন না। অতএব জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তার সপক্ষে মনোবিজ্ঞানী যত কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেন সমস্তই জ্ঞানের নিয়ম-বিরুদ্ধ ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সব যুক্তি একে তো আপন অভীষ্ট সাধনে অসমর্থ তাহাতে আবার জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম উল্টাইয়া দিয়া তত্ত্বজ্ঞানের মূল উৎস পর্য্যন্ত বিষায়িত করে।

দুই জাতীয় গুণের ভেদ-নিরূপণ অকিঞ্চিৎকর ॥ ১১ ॥

মৌলিক এবং বৈকারিক গুণের প্রভেদের বিষয় এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। এই প্রভেদটি মনোবিজ্ঞানের বিশেষ একটি নির্ভর-স্থল—ইহা হইতে তিনি বিস্তর ফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ প্রভেদটি কোন কার্য্যেরই নহে। ইহার বহ্বারম্ভ, দেখিতে দেখিতে, লঘু-ক্রিয়ায় পরিণত হয়। প্রকৃত মায়াবাদের কথা দূরে থাকুক্—মনোবিজ্ঞানী যাহাকে মায়াবাদ বলেন সেই কৃত্রিম মায়াবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়াও উহা আপনার অসারতা এবং অকিঞ্চিৎকরতা সপ্রমাণ করে। উহাকে উহার নিজ মূর্ত্তিতে দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জ্ঞানের নিয়ম সকলের বিরোধী ও তত্ত্বজ্ঞানকে বিপথে লইয়া যাইবার একটি প্রধান গুরু। তত্ত্বালোচনার সমুদ্র-বক্ষে উহা একটি বুদ্‌বুদ্ বই আর কিছুই নহে—এখন উহাকে চুপে চাপে ভগ্ন এবং বিলীন হইয়া যাইতে দেও। উহার যাহা কৃত্য উহা তাহা সাধ্যমতে করিয়া চুকিয়াছে—তাহাও ভাল করিয়া নহে।

আত্মা ও পরমাত্মা।

আত্মা ও পরমাত্মা এক নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই নিগূঢ় সম্বন্ধের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই উহারদের নৈকট্য প্রতিভাত হয়। উভয়ে উভয়ের সখা সযুজা না বুঝিলে কেমন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলনের গাঢ়তা হইবে। পৃথিবীতে দুইজনের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন পরস্পরের প্রকৃতি ভাব লক্ষ্য অবগত হওয়া চাই, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনন্তকালভোগ্য মিলনের পূর্ব্বে পরমাত্মার পিতৃভাব, আত্মার অমরত্ব, উহার অনন্ত গতি, অনন্ত উন্নতি, উহার অপূর্ণতা পরমাত্মার উপর একান্ত নির্ভরের ভাব অগ্রে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত।

আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যখনই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত, তিনি আমারদের পিতা; যখন তাঁহার স্নেহদৃষ্টি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল সময়ে সমান রূপে আমারদের উপরে নিপতিত দেখি তিনি আমারদের মাতা; যখন তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শুভবুদ্ধি কর্ত্তব্যজ্ঞান আমারদের অন্তরে নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন ও নানা রূপ বিপদাপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তিনি আমারদের বন্ধু, যখন তাঁহার অনুগত ও সেবক হইয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা ও ধ্যান ধারণা আমারদের জীবনের লক্ষ্য দেখি তখনই তিনি আমাদের প্রভু, যখন তাঁহাকে গতি মুক্তির নিদানভূত জানিয়া হৃদয়মন্দির হইতে সকল প্রকার নীচকামনা নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সেই সংমোহন মূর্ত্তিকে সংস্থাপিত

করি এবং তাঁহার প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়া বিমল শান্তি উপভোগ করিতে থাকি তখনই তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্যের স্বামী না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। তাঁহার সঙ্গে আমারদের সম্বন্ধ-বৈচিত্র এত অধিক যে যতই তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে থাকি ততই মনে নূতন ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। এই জন্য ঈশ্বর-চিন্তা কোন কালেই আমারদের নিকট পুরাতন হয় না। বাস্তবিক উহার মধ্যে এতই মাধুরী বিদ্যমান রহিয়াছে, যে, পৃথিবীর সকল প্রকার প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া সাধক কেবল তাঁহাতেই শান্তি পান, এবং বলিতে থাকেন "নাল্পে সুখমস্তি"।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই আত্মা। ইহাই উভয়ের ঐক্যস্থল। যে আপনাকে জানে সেই আত্মা। জীবাত্মা বলিতে পারে "আমি আছি"। শোণিত-মাংস-অস্থি-সমন্বিত জড় শরীর আপনাকে আমি বলিতে পারে না। মৃত্যুর সময়ে এ দেহ পড়িয়া থাকিবে, আমি বা আত্মা এ দেহ-পিঞ্জর হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবে। "আমি আছি" ইহাই জীবাত্মার নির্দ্দেশ, সুতরাং আমি কালে বদ্ধ। আত্মা নিরাকার সুতরাং দেশে ইহাকে বদ্ধ করা যায় না। পরমাত্মা অর্থাৎ "আমি আছি চিরকাল" ইহা দেশেও বদ্ধ নহে কালেও বদ্ধ নহে। এমন এক সময় ছিল যখন "আমি ছিলাম না।" ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ, সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আলোচনা করিলেন এবং এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। আত্মাকে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। তিনি "অজ আত্মা" তাঁহার জন্ম নাই বিকার নাই সুতরাং তিনি দেশ কালের অতীত। কিন্তু জীবাত্মার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না যে তিনি অজ আত্মা। ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ।

জীবাত্মা পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যতদিন তাঁহার ইচ্ছার বিরাম না হইবে ততকাল তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে। কিন্তু পরমাত্মা স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভূ নিত্য পরিপূর্ণ ও নির্ব্বিকার। যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন পরমাত্মা নিদ্রিত থাকেন না। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ যিনি অন্ধকার রজনীর সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নিৰ্ম্মাণ করিতে থাকেন তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু মনুষ্যের চঞ্চলতা আছে, অজ্ঞানতা আছে, মোহ আছে, ভ্রম প্রমাদ আছে, বিকার আছে সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, জীবাত্মারও সজীবতা নির্জীবতা আছে। জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়েই আত্মা হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অধিক।

জীবাত্মা পরমাত্মার সাদৃশ্যে গঠিত হইয়া স্বয়ম্প্রকাশ পরমেশ্বরের প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। তিনিই ইহার আলোক তিনিই ইহার জীবন জ্যোতি সকলই। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি। যখনই মোহমেঘ অন্তরাকাশে উদিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তখনই আত্মা নির্জীব মৃতপ্রায় অসাড় হইয়া পড়ে।

পরক্ষণে যখন আত্মপ্রভাব ও ঈশ্বরকৃপায় রিপুকুল প্রশমিত হয়, হৃদয়রাজ্যে আশ্রমের চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সাধন তপস্যাবলে আত্মার বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঈশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি আত্মফলকে সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। যেমন স্বচ্ছ সরোবরে শশাঙ্কের মূর্ত্তি সহজে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ আপনার আপনার সাধনের গুণে ও দৈববলে অভ্যন্তরে বিভিন্নমুখী বৃত্তি প্রবৃত্তির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে শান্তস্বরূপ পরমেশ্বর দেখা দেন। ঈশ্বরের দিকেত আত্মার স্বাভাবিক গতি। আত্মার সে স্বাভাবিক গতির যাহাতে ব্যত্যয় না হয় সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর সুখের বিনিময়ে যদি সেই অক্ষয় ধন লাভ করা যায় তবে ইহা অপেক্ষা আমারদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা।

অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অথবা শুনিতে উৎসাহী হইতে পারেন, উৎসবে মাতিতে পারেন অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া দ্রবীভূত হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক হওয়া বড় সুকঠিন। রিপুদমনের বেলা প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অথবা শুনিতে উৎসাহী হইতে পারেন, উৎসবে মাতিতে পারেন অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া দ্রবীভূত হইতে পারেন কিন্তু সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অন্যায় কামাচরণের সুবিধা থাকিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা নিজ বিষয়ে কেহ বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে তাহাকে জব্দ করিবার বিশেষ সুযোগ হইলেও বিমুখ হওয়া কিম্বা অন্যায় রূপে এককালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা থাকিলেও সে সুবিধা পরিত্যাগ করা কিম্বা বিষয় রক্ষা এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কার্য্যে কিঞ্চিৎমাত্র অন্যায় ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হওয়া কিম্বা মিথ্যারূপে যে ব্যক্তি নিন্দা করিতেছে তাহাকে মনের সহিত ক্ষমা করা বড়ই সুকঠিন। এই সকল সময়ে ধার্ম্মিকতার পরীক্ষা হয়। বাহিরে লোকে ধার্ম্মিকতার ভান করিতে পারে কিন্তু গৃহে অন্য আকার ধারণ করিতে পারে। ইংরাজীতে একটি জনসাধারণ বাক্য আছে "No one is a hero to his valet-de chamber"। "কেহই আপনার ভৃত্যের নিকট সুরবীর বলিয়া গণ্য হয়েন না।" ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। অজ্ঞ অশিক্ষিত ভৃত্যকে কথা শুনাইতে হইবে অথচ তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হইবে না ইহা বড় কঠিন কার্য্য। কাজের হানি না করিয়া কেবল ভাল কথা দ্বারা ভৃত্যদিগকে চালানোতে কোন ব্যক্তি প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক কিনা বুঝিতে পারা যায়। রোগের সময় সহিষ্ণুতা গুণে ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। জর্ম্মেনির সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডরিক যাঁহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার দীর্ঘকাল স্থায়ী নিদান পীড়ার সময় আপনাকে ঈশ্বরের একটি শিশু সন্তানের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর ও সহিষ্ণুতাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কত সময় পরিবার ও ভৃত্যদিগকে যতদূর সম্ভব উদ্বেজিত করিতেন না। আপনার হস্তে যতদূর পারেন কর্ম্ম করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের

মধ্যে প্রায় দেখা যায় অন্য সকল বিষয়ে ভাল হইলেও তাঁহাদিগের ক্রোধবৃত্তি কিছু প্রবল হয় এবং তাহা ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি বিশেষ রূপে পরিচালিত হয়। এইরূপ অনৌদার্য্য হইতে যিনি মুক্ত তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক। সমদম তিতিক্ষা, সদা সন্তোষ, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণা, এই সকল গুণ দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এই জন্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয় ইহা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন। জে গোল্ড (Jay Gould) ন্যায় লোকে পঞ্চান্ন কোটী টাকার অধীশ্বর হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া বড়ই কঠিন। আমরা অনেক সময় ধর্ম্ম কি কঠিন মনে করি না। আমরা অনেক সময় মনে করি কেবল বক্তৃতা অথবা উৎসবে মাতা অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া গলিয়া যাওয়া অথবা ঈশ্বরের নামশ্রবণে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভক্তি ধর্ম্মের প্রধান উপাদান বটে কিন্তু কোন মনুষ্যে যথার্থ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে কিনা তাহা সমদম তিতিক্ষাদি গুণের বর্ত্তমানতা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

মৃত্যু।

মৃত্যু কি ভয়াবহ শব্দ। মৃত্যু শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে সকলেই ত্রস্ত ও বিকম্পিত হয়। মৃত্যু এতাদৃশ ভয়াবহ হইবার কারণ কি? আমাদিগের অমরাত্মার বাস-গৃহ এই শরীরের নাশই মৃত্যু। ইহাতে আমরা এত ভয় পাই কেন? কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের কি প্রত্যয় হয় না যে, যে প্রেমময় পুরুষ আমাদিগের শরীরকে অতুল স্নেহে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন তিনি কি শরীরের প্রাণরূপী আমাদিগের জীবনের জীবন জীবাত্মাকে কখনই বিনাশ করিবেন না। জীবাত্মা অনন্তের আশ্রয়ে অনন্ত কাল থাকিয়া তাঁহার যশোঘোষণা করিবেক, তাঁহার প্রদত্ত প্রেমান্ন গ্রহণে দিন দিন পরিপুষ্ট হইবে, উন্নতির এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমানন্দ যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ ক্রমশঃ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়াও আমরা কি জীবাত্মার লোকান্তরিত হইবার সময় মুহ্যমান্ হইব? জীবাত্মা শরীর পরিত্যাগ সময়ে বিলাপ ও ক্রন্দন করে কেন? সংসারের প্রতি মোহ স্নেহাদির আধিক্যই ইহার কারণ। কিসে এই মোহাদির নিবারণ হয়? ঈশ্বর-প্রীতিই সেই মোহাদি নিরসনের এক মাত্র উপায়। কিন্তু ঈশ্বরেতে প্রীতি সংস্থাপন কালে আমরা কি জগৎকে উপেক্ষা করিব? না ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও প্রীতি করিব? ঈশ্বর-তত্ত্ব-রসপানার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরকেই প্রীতি করিবে এবং জগৎকে প্রীতি করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া তাহাকে প্রীতি করিবে। কিন্তু অনেকে কার্য্যকালে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন ও জগৎকে উপেক্ষা করেন।

ঈশ্বর-প্রীতির লক্ষণ কি? ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরধ্যান, ঈশ্বর গুণগান, তাঁহার অনুগত থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, পাপচিন্তা পাপালাপ পাপ কার্য্য পরিত্যাগ, তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন, ধর্ম্ম-বল প্রার্থনা ইত্যাদি। আর সংসারের প্রতি

প্রীতি কি প্রকারে প্রকাশ পায়? প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা পরদুঃখ বিমোচন, পরসুখোন্নতি সাধন, পিতা মাতা সন্তান ভ্রাতা ভগিনী বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে সর্ব্বদা প্রীতি-নয়নে সন্দর্শন, তাঁহাদিগের অভাব নিবারণ, তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক পীড়া নিবারণ, এক কথায় কাহারো প্রেমে বিমুগ্ধ না হইয়া সাধ্যমতে লোকের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন, এই সকল কার্য্য দ্বারাই আমরা সংসারে প্রীতি করিয়া থাকি। এ দুই প্রকার প্রীতির কি সমন্বয় হয় না? অবশ্যই হয়। যেহেতু যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরপ্রীতিতে নিমগ্ন তিনি সহজেই আপন শরীর আত্মা পরার্থে উৎসৃষ্ট করিয়া থাকেন।

> শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
> য উত্তমশ্লোকপরায়ণা জনাঃ।
> জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
> মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরং॥
>
> ভাগবত ১। ৪। ১২

ভগবদ্ভক্ত জনগণ লোকের হিত ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য তৎপর থাকেন, তাঁহারা কেবল আত্মার্থ প্রাণ ধারণ করেন না।

অনেক ভক্তিমান্ লোকে ঈশ্বর-প্রীতিতে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণাতেই তৎপর কিন্তু পরদুঃখবিমোচনাদিতে তাদৃশ অগ্রসর হয়েন না। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণের দুঃখজনক হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন ধ্বনির প্রতি কি আমরা বধির হইয়া থাকিব? আমাদিগের ভ্রাতৃগণ জ্ঞান, অর্থ, শারীরিক বল ও ধর্ম্মবল অভাবে পীড়া অকালমৃত্যু পাপ তাপ দারিদ্র্য প্রভৃতি কত নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেছে, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না? তৎপ্রশমন জন্য একটী অঙ্গুলীও কি উত্তোলন করিব না? ঈশ্বর করুন যেন আমাদিগের এ প্রকার ঔদাসীন্য না হয়, যেন আমরা সংসারকে তাঁহার অভিমতানুসারে যথার্থ প্রীতি করিতে পারি।

যিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও সংসারের প্রতি প্রীতি এ দুই প্রীতি দ্বারা আপন জীবনকে নিয়মিত করেন, মৃত্যু তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন। প্রীতি-সুধা-পানে সবল হইয়া তিনি সংসারের আকর্ষণ শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করেন। এখানে চিরকালের জন্য আসি নাই, কিছু দিন পরে এখান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইবেক, যতদিন এখানে থাকিব ততদিন পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় জনগণের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি ও স্নেহ সহকারে সন্তোষ সাধন করিব, সাধ্যানুসারে দেশের উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার ও লোকের দুঃখ দূর করিতে যত্নশীল থাকিব, দিন দিন তাঁহারই প্রেমে আবদ্ধ হইব যিনি আমাদিগের চিরকালের পিতা মাতা ও সুহৃৎ। এ প্রকার ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ও অমৃত নিত্য প্রেমদাতার প্রেম-নয়নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থির ভাবে নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করেন। ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের জীবন এই বাক্য সমর্থন করিতেছে।

ধর্ম্মপরায়ণা এলিজেবেথ ফ্রাই নয়টী সন্তানের প্রসূতী হইয়াও সংসারাসক্ত হয়েন নাই। অথচ তাহাদিগের লালন পালন জন্য জননী-সুলভ স্নেহ ও যত্ন করি-

তেন। তিনি লোকহিতৈষণাপরায়ণা হইয়া প্রাণপণে লোকহিত সাধন করিতেন। তিনি পিতৃবিয়োগ ও প্রাণাধিক প্রিয়তর সন্তান বিয়োগে শোকে অভিভূত হইয়া অচিরে তৎশোক সম্বরণে সমর্থা হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়িতা হইয়া নির্ভয়ে ইহলোক হইতে অবসৃতা হয়েন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে "যে অবধি আমার অন্তরে ঈশ্বর-অনুরাগ প্রবেশ করিয়াছে সেই অবধি কি সুস্থ কি রুগ্ন শরীরে এইটী মনে না করিয়া আমি প্রতি দিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি নাই যে অদ্য কি প্রকারে আমি প্রভুর অনুমোদিত কার্য্য করিব" তৎপরে তিনি তাঁহার কোন পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার দেহে যাতনা কিন্তু আমার আত্মাতে ভয় নাই। তৎপরে "হে প্রভো! তোমার দাসীকে সাহায্য ও রক্ষা কর" এই বলিয়া চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যিনি আমরণ ঈশ্বরের সেবক হয়েন, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার মৃত্যুভয় কোথায়? সংসারের প্রতি মোহান্ধ হওয়াই মৃত্যু-ভয়ের কারণ। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিই সেই মোহ ভঞ্জনের মহৌষধ। সেই প্রীতিই যেন আমাদের আত্মার একমাত্র উপজীব্য হয়।

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান।

তিনি প্রাণদাতা, তিনি পিতা পাতা, তিনি প্রভু সবাকার।
তিনিই সৃজন, পালন কারণ, সকলের মূলাধার॥

যাঁহার রচনা—শশি দিবাকর,
অযুত তারকা, ভূধর সাগর,
পতঙ্গ বিহঙ্গ যত জীবগণ,
ফলে ফুলে ধরা অতুল শোভন,
তিনিই সবার হয়েন কারণ,
তাঁর কার্য্যে ফেরে চরাচরগণ॥
তাঁহার নিয়মে ভ্রমে গ্রহ তারা।
অসীম আকাশে নহে পথহারা॥
রবি শশী করে কর বিতরণ।
মেঘ বর্ষে বারি, বহিছে পবন॥
তাঁহার শাসনে ঋতু আসে যায়।
গিরি হ'তে নদ নদী বেগে ধায়॥
তাঁহার ইচ্ছায় সবে ভ্রাম্যমাণ।
সে ইচ্ছা এখনো আছে বিদ্যমান॥
সে ইচ্ছার স্রোতে চলিছে ভুবন।
কতই মঙ্গল করিছে সাধন॥
তিনিই জাগ্রৎ জীবন্ত ঈশ্বর।
অসীম জগৎ ঘোষে নিরন্তর॥
"তাহার মহিমা অসীম অপার।
তাঁর দয়া প্রেম—অন্ত নাহি তার"॥

জগৎ যাঁহার আজ্ঞাধীনে রয়।
হে নর! তিনিই তোমার আশ্রয়॥
কি সৌভাগ্য তব ভেবে দেখ মনে।
রবে চির দিন তুমি যাঁর সনে॥
তিনিই তোমারে দেন অধিকার।
তাঁরে ভজিবার—তাঁরে সাধিবার॥
দেখ—অমৃতের পথের সোপান।
তিনি দয়া করি তোমারে দেখান॥
করিছেন কত অমৃত বর্ষণ।
বলিছেন কত অমিয় বচন॥
দেখ কৃপা তাঁর—কাতরে যে জন।
হৃদয়ে তাঁহারে ডাকে অনুক্ষণ॥
তাঁরে ছাড়া যবে চাহে না সে আর।
করয়ে তাঁহারে জীবনের সার॥
তবে তিনি তার বুঝিয়া হৃদয়।
আপনারে দান করেন নিশ্চয়॥
দাও তাঁরে সব হৃদয় তোমার।
পাবে প্রতিদান সহবাস তাঁর॥
প্রেমময় রূপে দিয়া দরশন।
করিবেন তব হৃদয় পূরণ॥

করিছেন তিনি তোমারে আহ্বান।
তাঁর পথে তুমি হও আগুয়ান॥
দেখিবে তাঁহার উৎসাহ জনন।
বরাভয়প্রদ প্রসন্ন বদন॥
তোমার যতন করিতে বর্দ্ধন।
পথের কণ্টক করি বিমোচন॥
দিবেন তোমারে আপন সুছায়।
অমৃতের বারি—স্বরগের বায়॥

এক মনে লও তাঁহার শরণ।
ঘুচাবেন তিনি ভবের বন্ধন॥
দেখ তিনি হ'ন অতুল বিভব।
তাঁর তুলনায় তুচ্ছ আর সব॥

ধন ধান্য আদি যা কিছু সংসারে।
তিনি ছাড়া তৃপ্তি কেবা দিতে পারে?
দেখ দেখ তাঁর প্রীতির নয়ন।
ভজ তাঁরে হবে সফল জীবন॥
কর তাঁর নাম হৃদয়ে সাধন।
হইবেন তিনি—হৃদি প্রিয়ধন॥
নয়ন-রঞ্জন—পরশ রতন।
পাপের দমন—দুঃখের হরণ॥

ভেবে দেখ কি সম্বন্ধ হয় তাঁর সনে।
মনুষ্য হইয়া তাহা পাল সযতনে।
তাঁরে করি শিরোধার্য্য, কর জীবনের কার্য্য,
টলোনা টলোনা আর মোহের ছলনে॥

খুলে দাও দাও তাঁরে হৃদয় দুয়ার।
প্রেম সত্য রূপ তাঁর ভাব অনিবার॥
আপনার আপনার, রেখোনা করোনা আর,
তাঁহার অধীন হও, ছাড় স্বেচ্ছাচার॥

স্বেচ্ছাচারে হয় নর প্রবৃত্তি অধীন।
পশুর সমান বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম হীন।
আপনার প্রভু নয়, প্রবৃত্তির দাস হয়,
তার চেয়ে হতভাগ্য আছে কে বা দীন?

ঝটিকা যেমন করে নৌকারে মগন।
ইন্দ্রিয়ের পরবশ হয় যদি মন।
সেই মন প্রজ্ঞা হরে, সংসার তরঙ্গে নরে
ডোবাইয়া করে তার মৃত্যুর সাধন॥

পাপের দাসত্বে নর যে যাতনা পায়।
এক মুখে কভু তাহা বলা নাহি যায়।
পাপে দেহ ম্রিয়মাণ, কলুষিত মনঃ প্রাণ,
পাপ তেয়াগিতে সবে করহ উপায়॥

একা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হয় পাপ প্রশমন।
পাপের ঔষধ ইহা হয় অতুলন।
এ ধর্ম্মের যিনি প্রাণ পাপহারী ভগবান্,
শুভ মতি সাধকেরে দেন অনুক্ষণ॥

এ ধর্ম্মে স্বাধীন মোরা অবশ্য হইব।
প্রবৃত্তির দাস হয়ে আর না থাকিব।
আপনার প্রভু হয়ে, আপন জীবন লয়ে,
জীবন দাতার পদে উপহার দিব॥

রিপুর দাসত্ব হ'তে যে চাও নিস্তার।
চিত্তের সন্তোষ যেবা চাহ আপনার।
এ ধর্ম্ম আশ্রয় লও, স্বাধীন পবিত্র হও,
মিলিবে সে ধন যার তুল নাহি আর।

পূর্ব্বদিকে উদি যথা নবীন তপন।
চারিদিকে ক্রমে করে কর বিতরণ।
বঙ্গাচলে তথা আজি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সুবিরাজি,
ধরাময় প্রকাশিবে কিরণ আপন।

বঙ্গভূমি সহে দুঃখ পর্ব্বত প্রমাণ।
হেট মুখে রহে সদা বঙ্গের বয়ান।
ঘুচিবে বঙ্গের দুখ, হইবে বিপুল সুখ,
ব্রহ্ম নামে সবে যবে হবে এক প্রাণ॥

এদেশের দীন দশা দেখি দয়াময়,
বিনাশিতে নিদারুণ এর দুঃখ চয়।
দিলেন এ ধর্ম্ম ধন, কর তাহে সুরক্ষণ
এই ধর্ম্ম দিয়া বাঁধ সবার হৃদয়॥

এ ধর্ম্ম হৃদয়ে রাখ করিয়া যতন।
তাঁর কাছে শুভমতি করহ যাচন।
চাও তাঁরে দিব্য জ্ঞান, নূতন জীবন প্রাণ,
চাও তাঁর প্রেম মুখ করিতে দর্শন॥

তাঁহার প্রসাদ তিনি করিবেন দান।
তাঁর বলে করিবেন তোমা বলীয়ান।

তাঁহার কবচ পরি, বিঘ্ন ভয় পরিহরি,
তাঁর কার্য্য সাধিবারে দাও মন প্রাণ ॥

রক্ষ এই ধর্ম্মে, ইহা তোমারে রক্ষিবে।
দেহে বল মনে শান্তি ইহ মুক্তি দিবে।
কপটতা মলিনতা, যাবে পাপ কুটিলতা,
ধর্ম্মের পবিত্র মঞ্চে ক্রমে আরোহিবে।

শুধু নরতের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়।
দেবতারা এই ধর্ম্ম সেবেন নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মেতে মগন হয়ে, তাঁর প্রেম কার্য্য লয়ে
থাকেন স্বরগে দেব পুণ্যাত্মা নিচয়।

প্রার্থনা।

কবে নাথ! ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে বিস্তার।
কবে দ্বেষ মলিনতা যাবে হাহাকার।
তোমা পেয়ে সবে হবে আনন্দ মগন।
তব প্রেমে পাবে সবে নূতন জীবন।
কবে সবে মিলে নাথ! তোমারে ঘোষিবে।
ভক্তি প্রেম দিয়া তব চরণ পূজিবে।
প্রেম সত্য রূপে হৃদি তুমি দেখা দাও।
তোমার অরূপ রূপ মধুর দেখাও।
দাও তব সহবাস, তোমার স্মরণ।
আপনি আসিয়া কর হৃদয় পূরণ।

ইতি ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

গত আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতামত সম্বন্ধে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছে। আমরা স্থানাভাব বশতঃ তৎসম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই। ফলত ঐ পত্রে এমন সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে যে গুলি শাস্ত্র ও যুক্তির এককালে অধিকার বহির্ভূত। সুতরাং সে সকল কথার আলোচনা করা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করি না। তবে এইটুকু বলা সঙ্গত যে যখন গোস্বামী বহুদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং তিনি স্বয়ং নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তখন তাঁহাকে আর কি বলিয়া ব্রাহ্ম বলিতে পারি। আর তিনি যে স্বমুখে ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম এ কথাই বা কিরূপে সঙ্গত হয়। ফলত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা নিত্য নির্ব্বিকার নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যাঁহার বিশ্বাস তিনিই ব্রাহ্ম। আর যিনি বহুদেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করেন তিনি ব্রাহ্ম নামেরই যোগ্য নহেন। ঈশ্বরের মূর্ত্তি নাই। তিনি অকায়মব্রণং। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে সেই নিষ্কল অক্ষর ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হয়। তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য নহেন। মন বুদ্ধিও তাঁহার নিকট পরাস্ত। আমাদের এই আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি। নিজের কঠোর সাধনা ও ব্রহ্মকৃপায় এই আত্মাতে এক একবার সেই বিদ্যুৎপুরুষের স্ফূর্ত্তি অনুভব করা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এত কাল এই কথাই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। যিনি ইহার বিরুদ্ধ বলেন এবং বিরুদ্ধ আচরণ করেন তিনি ব্রাহ্ম হইতে পারেন না। নৃসিংহ একটী পৌরাণিক অবতার। ব্রাহ্মধর্ম্মে অবতারবাদ নাই। এই অব-

তারবাদে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি ঘোর পৌত্তলিক। তিনি স্বমুখে ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রচার করিলেও লোকে আর তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কোনও যোগ আছে ইহাও কেহই স্বীকার করিবেন না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৯ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৵১০ সামান্য ডাকমাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাক মাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪১ সংখ্যা　　　　　　　　　　১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥ ৯ ॥

অহম্পদার্থ বা আত্মা স্বতঃ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। স্বতঃ—অর্থাৎ বিশেষ কোন-কিছুর সহিত—বাহিরের কোন বস্তুর সহিত কিম্বা অন্তরের কোন ভাবনার সহিত—সম্পর্ক না রাখিয়া একাকী। উহা বিশেষ কোন-না-কোন আন্তরিক অবস্থার সহিত অথবা বিশেষ কোন না কোন বহির্বস্তুর সহিত—আত্মেতর কোন-না-কোন-কিছুর সহিত—সম্পৃক্ত ভাবেই আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে।

প্রমাণ।

অহম্পদার্থ সকল-জ্ঞানেরই সার্ব্বভৌমিক অবয়ব (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। কিন্তু জ্ঞান-মাত্রেরই একদিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক অবয়ব থাকা চাই, আর একদিকে তেমনি বিশেষ-অবয়বও থাকা চাই; তা ভিন্ন—বিশেষ হইতে পৃথক্কৃত সার্ব্বভৌমিক অবয়বের অথবা সার্ব্বভৌমিক হইতে পৃথক্কৃত বিশেষ অবয়বের কোন জ্ঞানই সম্ভবে না (৩ সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব অহম্পদার্থ বা আত্মা স্বতঃ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। অন্তরের বিশেষ কোন অবস্থার সহিতই হউক্, আর, বাহিরের বিশেষ কোন বস্তুর সহিতই হউক্, বিশেষ কোন-না-কিছুর সহিত সম্পৃক্ত ভাবেই জ্ঞাতা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের তুলনা ॥ ১ ॥

প্রথম সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আত্ম-জ্ঞান-ব্যতিরেকে আত্মেতর-জ্ঞান সম্ভবে না; বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, আত্মেতর-জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্ম-জ্ঞান সম্ভবে না। ইহার প্রতি অনেকে অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, অতএব ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা আবশ্যক।

প্রথম আপত্তি ॥ ২ ॥

"আত্মজ্ঞান আত্মেতর জ্ঞানের সম্বন্ধসাপেক্ষ" এ কথা বলিলে তাহাতে কি এইরূপ বুঝায় না যে, প্রথম সিদ্ধান্তে·

যাহা জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা—বাস্তবিক—জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম নহে? কেননা প্রথম সিদ্ধান্তে যেমন দেখা গিয়াছে যে, "আত্মেতর-জ্ঞান আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গ-সাপেক্ষ" এইটিই জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম—বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে তেমনি পাওয়া যাইতেছে যে, ঐটিই যে জ্ঞানের একমাত্র মূল নিয়ম তাহা নহে; তদ্ভিন্ন জ্ঞানের আর একটি মূল নিয়ম এই যে, আত্ম-জ্ঞান আত্মেতর-জ্ঞানের সঙ্গ-সাপেক্ষ। আত্মেতর-জ্ঞান যেমন আত্মজ্ঞানের সঙ্গাধীন, আত্মজ্ঞানও যদি তেমনি আত্মেতর-জ্ঞানের সঙ্গাধীন হয়, তবে দুইটি নিয়মের একটিই বা বড় কিসে—অন্যটিই বা ছোট কিসে? দুয়েরই তো পদবী অবিকল সমান। তবে আর কেমন করিয়া বলি যে, প্রথম নিয়মটিই শিরঃস্থানীয় ও দ্বিতীয় নিয়মটি তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয়।

আপত্তি-খণ্ডন ॥ ৩ ॥

তাহাতে কোন দোষ নাই; আপাততঃ যাহা গোলোযোগের মতো দেখাইতেছে—অনতি-পরেই তাহা দিব্য পরিষ্কার বেশে দেখা দিবে। প্রথম সিদ্ধান্তে যে নিয়মটি স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রধান পদবীর উপযুক্ত; কেননা তাহা এমনি একটি অবশ্য-জ্ঞেয় বস্তুর নাম নির্দ্দেশ করিতেছে—যাহাকে না জানিয়া অন্য কোন-কিছুকেই জানা সম্ভবে না; কি? না অহম্পদার্থ। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বলিতেছে বটে যে, আপনাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে অন্য কোন-না-কোন-কিছু জানা আবশ্যক, কিন্তু সেই যে "কোন-না-কোন-কিছু" তাহা যে, কি, তাহার নাম নির্দ্দেশ করিতেছে না—কেমন করিয়াই বা করিবে? জ্ঞানের বিশেষাত্মক অবয়ব-সকল দেশ-ভেদে বিভিন্ন, কাল-ভেদে বিভিন্ন, পাত্র-ভেদে বিভিন্ন, তাহা নিতান্তই অনির্দ্দেশ্য। অতএব প্রথম সিদ্ধান্ত এবং বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত, দুইই যদিচ সুনিশ্চিত সত্য, তথাপি প্রথম সিদ্ধান্তের প্রদর্শিত জ্ঞানের নিয়মটি প্রধান পদবীর উপযুক্ত, তাহাতে আর ভুল নাই। বস্তু অসংখ্য—তাহার মধ্যে যে-কোনটিকেই হউক্ আর যতগুলিকেই হউক্ জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে যখন একই অদ্বিতীয় বস্তুকে—আপনাকে—জানা আবশ্যক, তখন এই নিয়ম অগ্রে,না আপনাকে জানিতে হইলে সেই অসংখ্য বস্তুর যে-টি হউক্ একটিকে জানা আবশ্যক—এই নিয়ম অগ্রে? অবশ্য—দুইই সমান সত্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মটিই প্রধান আসন পাইবার যোগ্য ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম প্রশ্ন এই যে, জ্ঞানের অদ্বিতীয় এমন একটি মূল উপাদান কি, যাহাকে না জানিয়া অন্য কোন বস্তুকেই জানা যাইতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে অহম্পদার্থ। কিন্তু যদি প্রশ্নটি ওরূপ না হইয়া এইরূপ হইত যে, জ্ঞানের অদ্বিতীয় এমন একটি মূল উপাদান কি যাহাকে না জানিয়া আপনাকে জানা যাইতে পারে না? তবে এরূপ প্রশ্ন নিতান্তই অর্থ-শূন্য; কেননা আত্মেতর বস্তু-সকলের একটিও এরূপ অবশ্য-জ্ঞেয় নহে যে, আপনাকে জানিতে হইলে সেইটিকে না জানিলেই নয়। প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যে কিরূপ সম্বন্ধ, আর, কি-সেই বা প্রথম সিদ্ধান্ত প্রধান পদবীর উপযুক্ত, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে; তাহা এই যে, প্রথম সিদ্ধান্ত যাহাকে জ্ঞানের মূল উপাদান বলিয়া প্র-

তিপাদন করিতেছে, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট এ-কটি-মাত্র বস্তু—আত্মা; আর, বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত যাহাকে জ্ঞানের অপর উপাদান বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা অ-নির্দ্দিষ্ট কোন-না-কোন বস্তু—অনাত্মা; অনাত্মা বলিতে সুনির্দ্দিষ্ট একটি-মাত্র কোন বস্তু বুঝায় না।

দ্বিতীয় আপত্তি এবং তাহার খণ্ডন ॥ ৩ ॥

এ যেমন সত্য যে, জড়-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-মাত্রই, সংক্ষেপে—ভৌতিক-জ্ঞান মাত্রই, আত্মজ্ঞান-সাপেক্ষ; এটাও কি তে-মনি সত্য যে, আত্মজ্ঞান-মাত্রই ভৌতিক জ্ঞান-সাপেক্ষ? না, সেরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। আপনাকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গে বিশেষ কোন-না-কোন কিছু জানা নিতান্তই আবশ্যক—এইমাত্র; কিন্তু সেই যে "বিশেষ কোন-না-কোন কিছু" তাহা ভৌতিক বস্তু না হইয়া আর কোন-কিছু হইলেও হইতে পারে—মানসিক ভাব-বিশেষ বা অবস্থা-বিশেষ হইতে পারে। পাছে কেহ মনে করেন যে, "ভৌতিক জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্ম-জ্ঞান সম্ভবে না" এইটি প্রতিপাদন করাই আ-মাদের মনোগত অভিপ্রায়, এইজন্য আ-মরা চতুর্থ সিদ্ধান্তেও বলিয়াছি এবং এখানেও বলিতেছি যে, তাহা নহে; আত্ম-জ্ঞানের পক্ষে যাহা নিতান্ত নহিলে নয় তাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের কোন-না কোন প্রকার বিশেষ অবয়বের উপলব্ধি; এ নিয়মটি সাধারণতঃ সকল জ্ঞানের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু জ্ঞানের সেই যে বিশেষ অবয়ব তাহা ভৌতিক বস্তু না হইয়া একটা মানসিক কল্পনা (যেমন পক্ষীরাজ ঘোড়া) অথবা একটা মানসিক অবস্থা (যেমন ম-নের স্ফূর্ত্তি, আলস্য, ইত্যাদি) অথবা একটা মানসিক অনুভূতি (যেমন সুখ দুঃখ) হইতে না পারে এমন নহে। অতএব এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই যে, আপনাকে জা-নিতে হইলে তাহার সঙ্গে কোন-না-কোন ভৌতিক বস্তুকে না জানিলেই নয়। আ-মরা যখন একটিও-কোন ভৌতিক বস্তুকে জানিতেছি না, তখনও আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা-বিশেষের জ্ঞাতা বলিয়া সচ্ছন্দে আপনাকে আপনি উপলব্ধি ক-রিতে পারি।

ডেবিড্ হিউমের মত ॥ ৫ ॥

ডেবিড্ হিউম্ তাঁহার মানব-প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, "আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে যখনই আমি আপনার অভ্যন্তরে তদ্‌গত ভাবে অভিনি-বিষ্ট হই, তখনই আমি বিশেষ কোন-না কোন প্রকার অনুভূতিতে সহসা আটক পড়িয়া যাই—যেমন শীতোষ্ণ—আলোক অন্ধকার—রাগ-দ্বেষ—সুখ দুঃখ—ইত্যাদি! বৃত্তি-হীন অবিকৃত অবস্থায় একবারও আমি আপনি আপনার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দিই না।" হিউম্ এ যাহা বলিয়া-ছেন—ঠিক্‌ই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সি-দ্ধান্ত ঐ কথাই বলিতেছে! কিন্তু হিউম্ আর একটি কথা যাহা বলেন—সেটি বড় গোলোযোগের কথা। তিনি ব-লেন যে, তাঁহার প্রত্যক্ষ এবং অনু-ভূতি প্রভৃতি বৃত্তি-সকল যাহা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা অহং-ব-র্জ্জিতরূপেই—আত্ম-বর্জ্জিতরূপেই—প্রতি-ভাত হয়। তিনি বলেন যে, "প্রত্যক্ষাদি বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই আমি আপনার অভ্যন্তরে দেখিতে পাই না।" তবেই হইতেছে যে, প্রত্যক্ষাদি মনোবৃত্তি আমারও নহে এবং আর কা-হারো নহে। ইহার ন্যায় দ্বিতীয় এমন একটি গায়ের জোরের কথা তত্ত্বজ্ঞান-

ক্ষেত্রে মেলা ভার। মনুষ্য আপনাকে অবিশিষ্ট অবস্থায়—অর্থাৎ বিশেষ কোন কিছু দ্বারা অনুপরক্ত অবস্থায়—উপলব্ধি করিতে পারে না, এই যথার্থ কথাটির উদ্গীরণে ক্ষান্ত না থাকিয়া হিউম্ আরো এই বলেন যে, মনুষ্য আদবেই আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারে না। এটা বৈশিষ্ট্যবাদের আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি। হিউমের দার্শনিক আলোচনা অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষের বিষ; অথচ হিউমের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁহারা হিউমের ঐ কথাটিই উল্টিয়া পাল্টিয়া বলিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতিবাদ আর কিছু নয়—হিউম্ যাহা স্পষ্ট-বাক্যে বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা অতীব অস্পষ্ট এবং সন্দিগ্ধ বচনে ঘোর-ফের করিয়া বলিয়াছেন—এই মাত্র।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥ ৬ ॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল এই যে, আপনাকে জানিতে হইলে আপনাকে বিশেষ কোন-একটা অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া জানা চাই; তা সে—যে অবস্থাই হউক্ না, আর, যে কোন-প্রকারেই তাহা সংঘটিত হউক্ না—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, একটা কোন অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া জানিলেই হইল। এ সিদ্ধান্তটি জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য। জ্ঞাতা কোন একটিও বিশেষ অবস্থায় দণ্ডায়মান না হইয়া আপনাকে আপনি জানিতে পারে—এরূপ মনে করাই ভ্রম। কেননা, জ্ঞাতা আপনার কোন অবস্থাতেই আপনাকে উপলব্ধি করিতেছে না অথচ আপনাকে উপলব্ধি করিতেছে, উপলব্ধি করিতেছে না অথচ উপলব্ধি করিতেছে, ইহা কত বড় একটা স্ববিরোধী কথা!

জ্ঞাতা আপনার কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থাতে আপনাকে উপলব্ধি করে বটে, কিন্তু সেই বিশেষ অবস্থা বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করে না ॥ ৭ ॥

"জ্ঞাতা আপনার কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থাতেই, বা কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই, আপনাকে উপলব্ধি করে" এ কথার অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, জ্ঞাতা আপনাকে আপনার কোন-একটি বিশেষ অবস্থা বলিয়া উপলব্ধি করে। এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেরই ন্যায় স্ববিরোধী। "আত্মাকে তাহার কোন অবস্থাতেই জানিতেছি না, অথচ আত্মাকে জানিতেছি" এটা যেমন অসঙ্গত, "আত্মাকে তাহার কোন-একটি অবস্থা-বিশেষ বলিয়া জানিতেছি" এটাও তেমনি অসঙ্গত। কেননা, আত্মা যদি আপনাকে আপনার বিশেষ কোন-একটি অবস্থা বলিয়া জানিতে বাধ্য হইত, তবে সে অবস্থা-ব্যতিরেকে আর-কোন অবস্থাতেই আত্মা আপনাকে আপনি জানিতে সমর্থ হইত না; কাজেই আত্মার জ্ঞান-বৈচিত্র্য ও ধ্যান-বৈচিত্র্যের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, এবং বৈচিত্র্য-বিরহে তাহার জ্ঞান সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহা হইলে ফলে এইরূপ দাঁড়াইত যে, অহম্পদার্থ আপনার সকল অবস্থার সাধারণ কেন্দ্র নহে—অহম্পদার্থ বিশেষ-একটি অবস্থা মাত্রেই পর্য্যবসিত; তবেই হইল যে, সামান্যের সহিত সম্পর্ক-রহিত বিশেষ—জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; কিন্তু ইহা যে, কত বড় একটা স্ববিরোধী কথা তাহা তৃতীয় সিদ্ধান্তের অকাট্য যুক্তির বলে এখন আর কাহারো জানিতে বাকি নাই। এটা যদিও সুনিশ্চিত যে, আত্মা আপনার কোন-না-কোন প্রকার বিশেষ অবস্থাতেই আপ-

নাকে আপনি উপলব্ধি করে; কিন্তু তাহা বলিয়া এটা ঠিক্ নহে যে, আত্মা আপনাকে আপনার সেই বিশেষ অবস্থা বলিয়া, অথবা, বিশেষ বিশেষ নানা অবস্থার সমষ্টি বলিয়া, উপলব্ধি করে। জ্ঞাতা আপনাকে আপনার সমস্ত অবস্থা হইতে ভিন্ন বলিয়াই উপলব্ধি করে—এমনি একটি সার্ব্বভৌমিক পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করে যাহা—কি সম্মুখ-স্থিত পরিবর্ত্তনশীল বস্তু-সমূহ—কি অন্তরস্থিত পরিবর্ত্তন-শীল ভাবনা-সমূহ, সমস্তেরই মধ্যে, স্বয়ং অটল এবং অবিচ্যুত-রূপে দণ্ডায়মান। আত্মাকে তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থার অভ্যন্তরে জানা স্বতন্ত্র, আর, আত্মাকে তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা বলিয়া জানা স্বতন্ত্র; এ দুই কথার প্রভেদের প্রতি দৃষ্টি না করাতেই হিউম্ উপরি-উক্ত ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন; আর, অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞেরাও (বিশেষতঃ ব্রাউন্) আপনাদের দার্শনিক নৌকাকে ঐ প্রকার অনবধানতার গুপ্তশৈলে নিপাতিত করিয়া ভ্রান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের একটি সর্ব্বোচ্চ ভ্রম-সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা শুদ্ধ কেবল আপনার পরিবর্ত্তনশীল বিশেষাত্মক বৃত্তিগুলিই জ্ঞানে উপলব্ধি করে; আর, আপনাকে আপনার সেই সকল বৃত্তির প্রবাহ-রূপেই উপলব্ধি করে।

নবম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

অহম্পদার্থ স্বতঃ—সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বসাধারণতঃ জ্ঞানের অগম্য নহে। আমরা যে, আমাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ কৈবল্য অবস্থায় উপলব্ধি করি না, সে কেবল আমাদের মনোবৃত্তির অপূর্ণতা-নিবন্ধন; কিন্তু যোগী মহাপুরুষেরা—যাঁহাদের জ্ঞান আমাদের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে তাঁহারা—স্ব স্ব আত্মাকে সর্ব্বাবস্থা-বিনির্মুক্তরূপে উপলব্ধি করিলেও করিতে পারেন।

দ্বিবিধ ভ্রম ॥ ৯ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের এই মতটি যদিচ লৌকিক চিন্তায় তেমন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয় নাই, কিন্তু মনোবিজ্ঞান ঐ মতটিকে প্রশ্রয় দান করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে একটুও ত্রুটি করেন নাই; এমন কি—অনেক স্থলে উহাকে অবশ্য-গ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়ই বলো, আর, অবস্থা-ভ্রষ্ট আত্মাই বলো—তাহা যে, কি কারণে আমাদের জ্ঞানাতীত, মনোবিজ্ঞান তাহার প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝিতে না পারিয়া তাহার একটা কৃত্রিম সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন—এইটিই তাঁহার ভ্রমের মূল। মনোবিজ্ঞানের ভ্রম দ্বিবিধ। প্রথম; জ্ঞানের প্রধান যে-একটি নিয়ম—যাহা সকল জ্ঞানের পক্ষেই সমান বলবৎ—মনোবিজ্ঞান তাহা দেখিয়াও দেখেন না; তাহা এই যে, কোন জ্ঞাতাই আপনাকে সর্ব্বাবস্থা-বিনির্মুক্তরূপে জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারে না। দ্বিতীয়; ঐরূপ অসাধ্য-সাধনে কেন যে আমরা অপারগ তাহার কারণ তিনি এই দেখান্ যে, আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা তাহা পারিয়া উঠি না, এ নহে যে, উপরি উক্তি নিয়মটি সকল-জ্ঞানের পক্ষেই অনতিক্রমণীয় বলিয়া আমরা তাহা পারিয়া উঠি না। আমাদের জ্ঞান খুবই অপূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া—জ্ঞান আপনার মূল নিয়ম আপনি উল্টাইতে পারে না—আপনি আপনার মূলোচ্ছেদ করিতে পারে না—এটা কিছু আর জ্ঞানের অপূর্ণতার লক্ষণ নহে; যে নিয়মটির উপরে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব নির্ভর করিতেছে তাহার অপরি-

হার্য্যতাকে জ্ঞানের অপূর্ণতা বলিয়া দোষ দেওয়া কোন-প্রকারেই বিধেয় নহে। জ্ঞানের এটা একটা অখণ্ডনীয় নিয়ম যে, যে-কোন জ্ঞান হউক্ না কেন তাহার সার্ব্বভৌমিক অবয়বটি স্বতঃ (অর্থাৎ কোন না কোন বিশেষ অবয়বের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে) কোন প্রকারেই কাহারো উপলব্ধি-গম্য নহে (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। এ নিয়মটি জ্ঞানের একটি অবশ্য-স্থায়ী সত্য, এবং বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত ইহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

তত্ত্ব-শব্দের ঐতিহাসিক বিবরণ ॥ ১০ ॥

আত্মার "নিগূঢ় তত্ত্ব" সম্বন্ধে নানা প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি যাহা তত্ত্বালোচনার ইতিবৃত্তে সময়ে সময়ে দেখা দিয়াছে, এই স্থানটি তাহার পর্য্যালোচনার সবিশেষ উপযোগী। তত্ত্ব-শব্দের অর্থ পুরাকালে একরূপ ছিল, এখন আর-একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে, কোন বস্তুর তত্ত্ব বলিতে বস্তুটির মর্ম্মস্থানীয় এমনি একটি অবয়ব বুঝাইত যাহা তাহার অপরাপর সমস্ত অবয়বের উপর জ্ঞানালোক ছটকাইবার মূলাধার। পূর্ব্বে উহা ছিল—আলোকের বীজ, জ্ঞাতব্য বস্তুর প্রকৃত অভিজ্ঞান। তত্ত্ব—কিনা যে বস্তু যাহা সেই বস্তুর তাহাত্ব, অর্থাৎ যাহা দৃষ্টে নানা বস্তুর মধ্য-হইতে সেই বস্তুটিকে ঠিক্‌ঠাক্ চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং তখনকার মতানুসারে, যে বস্তুর যে অবয়বটি বিশিষ্ট-রূপে জ্ঞানাস্পদ এবং ধ্যানাস্পদ, তাহাই সেই বস্তুর তত্ত্ব। এখনকার মতানুসারে, তত্ত্বশব্দের অর্থ ঠিক্ তাহার বিপরীত। এখন কার কালে "নিগূঢ় তত্ত্ব" বলিতে বস্তুর এমনি একটি অবয়ব বুঝায়, যাহার নিজেরও কোন আলোক নাই এবং যাহার উপর অন্যত্র-হইতেও আলোক নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এখনকার কালের "নিগূঢ়তত্ত্ব" অন্ধকারের আড্ডা; উহা বস্তু সকলের এমনি একটি কাল্পনিক অবয়ব যেখানে জ্ঞানেরও প্রবেশ নিষেধ—ধ্যানেরও প্রবেশ নিষেধ। এখনকার মতানুসারে যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগোচর এবং ধ্যানের অগোচর তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। পরে প্রকাশ পাইবে যে, পূর্ব্বতন কালের আরো অনেকগুলি শব্দের অর্থ এইরূপ ঘাঁটিয়া খুঁটিয়া লণ্ড ভণ্ড করা হইয়াছে।

অর্থ-বিপর্য্যয়ের ফল ॥ ১১ ॥

কোন-একটি দার্শনিক শব্দকে নূতন অর্থে প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহার অর্থ পূর্ব্বে কি ছিল তাহা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া এবং তাহার সেই পূর্ব্বতন অর্থের সহিত তাহার আধুনিক অর্থের প্রভেদ কিরূপ তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া—আধুনিক অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু "তত্ত্ব"এ শব্দটির সম্বন্ধে সেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, তত্ত্ব-শব্দের অর্থ তাঁহারা যেরূপ বোঝেন, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরাও সেইরূপ বুঝিতেন; এই কারণ-বশত পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নামে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য তমসাচ্ছন্ন বিষয়-সকলেরই আলোচনায় অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকিতেন। এরূপ অমূলক অপবাদ দ্বিতীয় একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধানেই বৃথা কাল-ক্ষেপ করিতেন; আর, সে কাল অপেক্ষা এ কাল নাকি বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য—তাই নব্য দার্শনিকেরা স্থির-স্থায় করিয়া বসিয়া আ-

ছেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের তত্ত্বানুশীলন—আগা গোড়া সমস্তই পাগলামি, কেননা নিগূঢ় তত্ত্ব মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। তোমরা যাহাকে তত্ত্ব বলিতেছ তাহা ঐরূপই বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যাহাকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহা আর-এক প্রকার। তাঁহাদের মতানুসারে, বস্তুর সেই অংশটিই তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য যাহা সুস্পষ্ট-রূপে মনোমধ্যে ধারণা-যোগ্য; তোমাদের নব্য মতানুসারে বস্তুর সেই অংশটিই কেবল তত্ত্বশব্দের বাচ্য, যাহার কোন ভাবই কাহারো জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের শব্দের অর্থ তুমিই উল্টাইয়া দিয়া একটা বিপরীত কাণ্ড করিয়া তুলিতেছ—তাঁহাদের পরিষ্কার আলোক নিভাইয়া দিয়া দিক্‌ বিদিক্‌ অন্ধকার করিয়া দিতেছ, আবার তুমিই বলিতেছ যে, তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন বোধাতীত বিষয় সকলের আলোচনায় সময় নষ্ট করিতেন। অপরাধ—তোমার না তাঁহাদের? তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় তোমার স্বকপোল-কল্পিত উল্টা অর্থেই তমসাচ্ছন্ন ও বোধাতীত, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রেত সোজা অর্থে তাহা তমসাচ্ছন্নও নহে—বোধাতীতও নহে।

উল্টা অর্থের ফল ॥ ১২ ॥

উল্টা অর্থটিকে শুদ্ধ যদি কেবল একটা নূতন নামকরণ বলিয়া ধরা যায়, তবুও সেরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তন করা—কাজটা ভাল হয় নাই। একটা গোলমেলে এবং অলীক দার্শনিক মতের প্রচার ভিন্ন উহাতে করিয়া আর কোন ফলই লভ্য হইতে পারে না। এখনকার কালে বিষয়-ভ্রষ্ট, অবস্থা-ভ্রষ্ট, জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা, এবং আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব, এ দুই কথা একই অর্থে পরিগৃহীত হইয়া থাকে; আত্মার অব্যক্ত ভিত্তিমূল জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে মনোবিজ্ঞান ঐ দুই কথা নির্ব্বিশেষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিষয়ভ্রষ্ট আত্মা যে একান্তপক্ষেই জ্ঞান-বহির্ভূত এবং অচিন্তনীয়, এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই; যদিচ মনোবিজ্ঞানী যে কারণে তাহাকে অচিন্তনীয় বলেন, আমরা তাহাকে সে কারণে অচিন্তনীয় বলি না—আমরা তাহাকে আর এক কারণে অচিন্তনীয় বলি। মনোবিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ—এই জন্য জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; আমরা বলি যে, জ্ঞানের নিয়মই এই যে, জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা কাহারো জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে—কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে; বক্র ঋজুরেখা যেমন কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে—জ্ঞান-বহির্ভূত আত্মা সেইরূপ কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে। আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানবহির্ভূতও নহে অচিন্তনীয়ও নহে—তাহা খুবই চিন্তনীয়। আত্মা যাহা কিছু জানে তাহারই সঙ্গে আত্মজ্ঞান অবিচ্ছেদে স্ফূর্ত্তি পায়, এবং সেই আত্মজ্ঞানই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব; কেন না আত্মজ্ঞানেই আত্মার আত্মত্ব। আত্মজ্ঞান চলিয়া গেলে আত্মাও চলিয়া যায়, আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আত্মাও ফিরিয়া আসে। অতএব আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান-বহির্ভূত হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা আত্মজ্ঞান স্বয়ং; তাহা অচিন্তনীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহা চিন্তার ধ্রুব তারা।

বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মা স্ববিরোধী ॥ ১৩ ॥

ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, সপ্তম সিদ্ধান্তে যেমন আশয়-ভ্রষ্ট জড়-বস্তু, বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে সেইরূপ বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মা—দুইই স্ববিরোধীর কোটায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; দুয়ের কোন-টিই

কাহারো জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। দুইই যদিচ স্ববিরোধী, কিন্তু দুয়ের মধ্যে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে—তাহা এই যে, আপনার বিরোধ ভঞ্জনের শক্তি, অর্থাৎ স্ববিরোধের অন্ধকূপ হইতে আপনাকে জ্ঞান-রাজ্যে উত্তোলন করিবার শক্তি, আত্মার আপনার অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। আত্মা আপনার ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা আপনাকে বিশেষিত করিতে পারে অর্থাৎ আপন ইচ্ছায় বিশেষ কোন-না-কোন বিষয় মানস-ক্ষেত্রে উদ্ভাবন করিতে পারে। কিন্তু জড়বস্তু স্ববিরোধের ঘুমের ঘোরে এরূপ মন্ত্রাহত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা ভঞ্জন করা তাহার নিজের সাধ্যাতীত; তাহার ভঞ্জনের জন্য তাহাকে আত্মার দ্বারস্থ হইতে হয়। এ প্রভেদটি সামান্য প্রভেদ নহে,—ইহাতে করিয়া আশয়-ভ্রষ্ট জড় বস্তু অপেক্ষা বিষয়-ভ্রষ্ট আত্মার অসীম শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে—যদিচ দুইই স্ববিরোধী।

ব্যক্তিত্ব ॥ ১৪ ॥

অহম্পদার্থ (যাহা জ্ঞানের সর্ব্বসাধারণ অবয়ব) এবং বহির্বস্তু বা মানসিক অবস্থা বা আর কোন-কিছু (যাহা জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব) এই দুয়ের সঙ্ঘাতেই ব্যক্তির-ব্যক্তিত্ব। জর্ম্মান দেশীয় তত্ত্ববিৎ লাইব্‌নিট্‌জ ইহাকেই অণুক (Monad) নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন; অণুক—অর্থাৎ অখণ্ড মৌলিক বস্তু। এইরূপ মৌলিক বস্তু সার্ব্বভৌমিকত্ব এবং বিশেষত্ব এই দুয়ের সংঘাত। আত্মা এবং তাহার বৃত্তি-প্রবাহ দুয়ে মিলিয়া জ্ঞান-সমক্ষে যে একটি সমগ্র বস্তু দাঁড়ায়—তাহাই ব্যক্তি-শব্দের বাচ্য। কেননা জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ব্যক্তি-যোগ্য (অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য) নহে; আবার, জ্ঞানের বিশেষ বৃত্তি-সকলকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াও জ্ঞাতা ব্যক্তি-যোগ্য নহে; সুতরাং আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় এবং বিষয়-ভ্রষ্ট আশয় দুইই অব্যক্তি; দুয়ের সঙ্ঘাতই ব্যক্তি।

আপত্তি-খণ্ডন ॥ ১৬ ॥

পরিশেষে, নিম্ন-লিখিত দুইটি বিষয়ে পাছে কাহারো মনে কোন-প্রকার ধোঁকা থাকিয়া যায়, এ জন্য মন্তব্য-চ্ছলে গুটি দুই কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ কেহ বলিতে পারেন যে, তোমার মতে অহং-পদার্থ জ্ঞানের শুদ্ধ কেবল একটি অবয়ব-মাত্র বলিয়াই উপলব্ধি-গম্য—জ্ঞানের অভৌতিক অবয়ব বলিয়া উপলব্ধি-গম্য, সমগ্র একটি অভৌতিক বস্তু বলিয়া নহে; তবে আর হইল কি? ইহার উত্তর এই যে, আত্মা তাহার সমস্ত জ্ঞানের সার্ব্ব-ভৌমিক এবং অভৌতিক অবয়ব বলিয়া আপনাকে আপনি জানে ইহা একটি সুনিশ্চিত সত্য; আর, ভৌতিক বস্তু প্রমাণে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, তাহা অনেক সময় যদিচ জ্ঞানের বিশেষ অবয়বের স্থলাভিষিক্ত হয় কিন্তু তাহা যে জ্ঞানাভ্যন্তরে না থাকিলেই নয় এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই—তাহার পরিবর্ত্তে মানসিক কোন-একটা-কিছু থাকিলেও জ্ঞানের কার্য্য চলিতে পারে; আর, সেই যে মানসিক বস্তু তাহা আত্মার নিজের শক্তি-সম্ভূতই হউক্, আর,ঈশ্বর-দত্তই হউক্ উভয় পক্ষেই তাহা অভৌতিক। আমাদের বক্তব্য শুদ্ধ কেবল এই যে, জ্ঞানের সার্ব্ব-ভৌমিক অবয়ব এবং তাহার বিশেষ অবয়ব—এই দুই অবয়বের কোনটিই অপরটির সঙ্গ ছাড়িয়া, একাকী, জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; এ নহে যে, বিশেষ অবয়বটি ভৌতিক না হইলেই নয়। অতএব, পাঠক যদি আমাদের নিকট

হইতে এরূপ একটা অসঙ্গত আত্মসত্তার প্রমাণ প্রত্যাশা করেন—যাহা ভৌতিক বা অভৌতিক একটিও কোন বিশেষাত্মক সত্তার সহিত আদবেই কোন সম্পর্ক রাখে না, তবে আমরা স্পষ্টই বলিতেছি যে, তাঁহার সে আশা নিতান্তই দুরাশা; তাঁহার মনোরথ পূরণ করা তত্ত্ব-জ্ঞানের সাধ্যাতীত।

ঐ ॥ ১৭ ॥

অপর কেহ বলিতে পারেন যে, এই যে একটি কথা তুমি বলিতেছ যে, আত্মা স্বতঃ একেবারেই জ্ঞান-বহির্ভূত এবং স্ববিরোধী, ইহা আত্মার বাস্তবিক সত্তার পক্ষে হানি-জনক; ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, আত্মা ঐকান্তিক নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অবস্তুরই সামিল। ইহার উত্তর এই যে, হইলই বা—তাহাতে ক্ষতি কি? আমি যদি বিশেষ কোন ভাবে বা বিশেষ কোন অবস্থায় বা বিশেষ কোন-কিছুর সংস্রবে না থাকিলাম, তবে সেরূপ থাকিয়া ফল কি? এমন একটা স্ববিরোধী সত্তা যাহা কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পাইবার নহে তাহার মূল্য যে কি—তাহা মনোবিজ্ঞানীরা ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয় করুন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের নিকট তাহার কোন মূল্যই নাই। এক দিকে আত্মা এবং আর এক দিকে বিশেষ কোন মানসিক ভাবনা অথবা বিশেষ কোন ভৌতিক বিষয়, এই দুয়ের সঙ্ঘাতেই আত্মার বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানে প্রকাশিত হয়; এই সত্য বৃত্তান্তটিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া—আত্মা যে অংশে একেবারেই জ্ঞান-বহির্ভূত—যে অংশে তাহা বিষয়-বর্জ্জিত, ভাবনা-বর্জ্জিত, অবস্থা-বর্জ্জিত, তাহার জন্য কাহার যে কি এত মাথাব্যথা তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে হয় তো ঐ লোক-প্রচলিত ভ্রান্তি-টি—জ্ঞান-বহির্ভূত সত্তার জন্য বৃথা আঁকুবাঁকু—সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে। আমাদের এই তন্ত্র আত্মার ভাবী গতির পক্ষে যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং যেরূপ দৃঢ় ভিত্তি-মূলের উপরে আত্মার অমরত্ব সংস্থাপন করে, কোন মনো-বিজ্ঞানই সেরূপ পারে না।

ইহার ফল ॥ ১৯ ॥

এ যখন হইল—আশয়-ভ্রষ্ট জড় বস্তুর স্ববিরোধিতা যখন স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য একটি কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ইহাতে করিয়া প্রতিপক্ষের সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গিয়া তত্ত্বজ্ঞানের পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইল। তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য একটি প্রশ্নে নূতন আলোক নিপতিত হইল। সে প্রশ্ন এই যে, জ্ঞানের অপরিহার্য্য উপকরণ—অপরিহার্য্য অবয়ব—কি? ইহারই আর-এক পৃষ্ঠা এই যে, সেই অপরিহার্য্য অবয়বটি অপসারিত হইলে জ্ঞেয় বিষয়ের কি অবশিষ্ট থাকে? ইহার উত্তর এই যে স্ববিরোধীই কেবল অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধির জন্য নিতান্তই যাহা নহিলে নয়, তাহা যদি তাহা হইতে অপসারিত করা যায়, তবে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা একান্ত পক্ষেই অজ্ঞেয় এবং অচিন্তনীয়, এক কথায়—স্ববিরোধী, এভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার পরেই আসিতেছে যে, সেই যে স্ববিরোধী—তাহা কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু; আরো ব্যাপক-রকমের উত্তর এই যে, তাহা আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়—কেননা জড়-বস্তু ভিন্ন আরো অনেক প্রকার বিষয় আছে (যেমন মানসিক ভাবনা-বিশেষ)। এইটিই (আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়ই) সমস্ত জ্ঞানের

স্ববিরোধী অবয়ব, এইটিকে জয় করা, এই গহন অরণ্য প্রদেশটিকে আবাদ করিয়া অবিদ্যাকে বিদ্যায় পরিণত করা, জ্ঞানের একমাত্র কার্য্য।

স্ববিরোধীকে হস্তে পাওয়ার ফল ॥ ২০ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ববিরোধীকে জ্ঞানে উত্তোলন করা কিরূপে হইতে পারে? স্ববিরোধীর স্ববিরোধিতা কিরূপে ঘুচানো যাইতে পারে? অচিন্তনীয়কে কিরূপে চিন্তনীয় করিয়া তোলা যাইতে পারে? যাহা একন্ত-পক্ষেই অবিজ্ঞেয় তাহাকে কিরূপে জ্ঞানায়ত্ত করা যাইতে পারে? পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট তত্ত্বজ্ঞানের মীমাংস্য প্রশ্ন এই আকারেই দেখা দিয়াছিল, দেখা দিয়াছিল মাত্র—খুব যে স্পষ্টরূপে দেখাদিয়াছিল তাহা নহে। তাহার সাক্ষী—প্লেটো এইরূপ বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান আর কিছু নয়—মানব আত্মাকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে উত্তোলন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। প্রকৃত কথা এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী শুধু নয়—সকল মনুষ্যই ঐ স্ববিরোধী অবয়বটিকে জয় করিয়া অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করিয়া থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী তাহার প্রণালী জানিয়া তাহা করে, অপর লোকে তাহার প্রণালী না জানিয়া তাহা করে। স্ববিরোধীর বিরোধ-ভঞ্জন যে-কোন উপায়েই হউক্ না কেন—প্লেটোর মতানুযায়ী মৌলিক ভাব সকলের সাহায্যেই হউক্, আর, আমাদের মতানুযায়ী অহম্পদার্থের কর্ত্তৃত্বেই হউক্—এটা স্থির যে, আমরা যাহাকে স্ববিরোধী অচিন্তনীয় এবং অজ্ঞেয় বলিতেছি তাহা যে, কি বস্তু, তাহা যে পর্য্যন্ত না খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে সে পর্য্যন্ত তাহার বিরোধ-ভঞ্জন সম্বন্ধে একটিও কথা উচ্চারণ করা কাহারো মুখে শোভা পায় না। আমরা তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি; তাহা কি? না স্বতন্ত্র-রূপী জড়-বস্তু। তাই অজ্ঞান কিরূপে জ্ঞানে উদ্ধৃত হয়—এখন আমরা তাহা দেখাইতে পারি।

স্ববিরোধী কি ভাবে চিন্তনীয় ॥ ২১ ॥

আমরা বলিতেছি বটে যে, আমরা স্ববিরোধীকে মুষ্টি-মধ্যে পাইয়াছি; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, স্ববিরোধী কখনও কাহারো জ্ঞান-গোচর অথবা ধ্যান-গোচর হইতে পারে। স্ববিরোধী একান্ত-পক্ষেই অচিন্তনীয়—এইরূপেই তাহা চিন্তনীয়। স্ববিরোধীর অচিন্তনীয়তা-লক্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। স্ববিরোধীর ভাবনা এক হিসাবে খুবই সহজ। মনে ভাবো যে, পুস্তকের এই পাতাটির এ-পৃষ্ঠা আছে—ও-পৃষ্ঠা নাই, তাহা হইলেই একটা স্ববিরোধী বিষয় তোমার ভাবনাতে আরূঢ় হইবে। পাঠক বলিবেন যে, "কোনক্রমেই তাহা আমি ভাবিতে পারি না।" সত্য, এক হিসাবে কোন-ক্রমেই তাহা তুমি ভাবিতে পার না; কিন্তু আর-এক হিসাবে তাহা তুমি অতীব স্পষ্টরূপে ভাবিতে পার—এইরূপে তাহা তুমি ভাবিতে পার যে, তাহা কেহই ভাবিতে পারে না; তাহাকে তুমি একান্তই ধ্যানের অগোচর বলিয়া ভাবিতে পার। স্বতন্ত্র-রূপী জড় বস্তুর চিন্তনীয়তার দৌড় এই পর্য্যন্ত—ইহার অধিক নহে।

স্বতন্ত্ররূপী জড় বস্তু একেবারেই অসৎ নহে ॥ ২২ ॥

এই অনির্বাচ্য পদার্থটির কি অস্তিত্ব আছে? এ প্রশ্নটিকে আর একটু পাকিতে দেও—অস্তি-তত্ত্ব ইহার সমুচিত মীমাংসা

করিবে। তত্ত্বজ্ঞানীরা উহার অপক্ব অবস্থায় উহাকে করায়ত্ত করিতে গিয়া বারম্বার বিপদে পড়িয়াছেন। একটি বিষয়ে পাঠক নিশ্চিন্ত থাকুন্;—স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু যে, আদবেই কিছু নহে—একেবারেই শূন্য, এরূপ কথা আমরা বলি না। সত্তাও যত প্রকার অসত্তাও তত প্রকার,—যেমন আলোক অন্ধকার—শব্দ নিস্তব্ধতা—জড়বস্তু শূন্য-আকাশ ইত্যাদি। আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে উপস্থিত হইতে হইলে—সত্তাই যে কেবল অহংসাপেক্ষ তাহা নহে, অসত্তাও অহংসাপেক্ষ। জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে হইলে আলোকও যেমন—অন্ধকারও তেমনি, শব্দও যেমন নিস্তব্ধতাও তেমনি, সকলই, অহংসাপেক্ষ। কিন্তু "স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু" শূন্য-আকাশাদির ন্যায় অসত্তা নহে, কেননা শূন্য আকাশাদি জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য—স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু একেবারেই জ্ঞানের অগম্য। মায়াবাদ যদি এ কথা বলে যে, স্বতন্ত্র-রূপী জড়বস্তু কিছুই নহে, তবে আমরা এই দণ্ডেই মায়াবাদের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। * প্রকৃত মায়াবাদ ওরূপ কথা বলে না। কিন্তু প্রকৃত মায়াবাদ কি জগতের সমস্ত বস্তুকেই জ্ঞানের প্রতিভাস-মাত্র বলে না? মনে কর যেন তাহাই সে বলে,—তেমনি, প্রকৃত মায়াবাদ জগতের সমস্ত অসত্তাকে (শূন্য-আকাশাদিকে) কি জ্ঞানের প্রতিভাস-মাত্র বলে না? জড়-বাদী মনে করেন যে মায়াবাদীর বুঝি এইরূপ মত যে, যখন একখানি বস্ত্রকে দৃষ্টির অগোচরে সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া রাখা যায় তখন বস্ত্র-খানি একেবারেই নাস্তি হইয়া যায়। তিনি তবে বলুন্ না কেন যে, মায়াবাদীর মতানুসারে বস্ত্র-খানি তখন রুটি হইয়া যায়! বস্ত্র-খানি যদি শূন্য হইয়া যাইতে পারিল, তবে রুটি হইয়া যাইতে না পারিবে কেন? শূন্যও যেমন—রুটিও তেমনি—দুইই তো অবস্ত্র; বস্ত্রও যেমন জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়, অবস্ত্রও তো তেমনি জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়; কোনটিই তো আর জ্ঞান-ছাড়া নহে। পূর্ব্বে নয় বস্ত্রখানি দৃশ্য বস্তু-রূপে প্রতিভাসিত হইয়াছিল—এখন নয় শূন্য আকাশ-রূপে প্রতিভাসিত হইল—উভয়-পক্ষেই উহা জ্ঞানের প্রতিভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। মায়াবাদ এরূপ কথা বলে না যে, কোন-একটি বস্তু যখন জ্ঞানের প্রতিভাস-রাজ্য হইতে একেবারেই বহিষ্কৃত হয়, তখন তাহা জ্ঞানের এক প্রকার প্রতিভাস হইতে আর-এক-প্রকার প্রতিভাসে পরিণত হয়। না, বস্ত্র বা আর কোন কিছু জ্ঞান-বহির্ভূত হইলে তাহা নিখিল প্রতিভাস-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়া ঐকান্তিক স্ববিরোধী অবস্থায়—ঐকান্তিক অচিন্তনীয় অবস্থায়—নিপতিত হয়; সে অবস্থা-হইতে উদ্ধারের এক উপায় কেবল—কোন-না-কোন জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন-বস্তুকে নিখিল জ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া জানা না যায়—না যা'ক্, ভাবা যাইতে পারে তো? সে বিষয়ে

---

* প্রকৃত মায়াবাদ এমন বলে না যে, অবিদ্যা কিছুই নহে; তাহা এই বলে যে, অবিদ্যা সৎ এবং অসৎ (কিছু এবং কিছু না) উভয়াত্মক; অথবা যাহা একই কথা, সৎও নহে অসৎও নহে—দুয়ের বা'র। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেমন—যেই আছে সেই নাই, আছে অথচ নাই, তাহাকে জ্ঞানে ধরিতে-ছুঁইতে পাওয়া যায় না—অবিদ্যা সেইরূপ একটি জ্ঞান-বিরোধী ব্যাপার। অবিদ্যাকে জ্ঞানে যেই তুমি ধরিবে—সেই তাহা বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইবে, অবিদ্যা যে-কে-সেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। অবিদ্যা যে-দণ্ডে যাহা—সেই দণ্ডে তাহা নহে—এইরূপ একটি স্ববিরোধী ব্যাপার।

বড়ই সন্দেহ। দশম সিদ্ধান্ত পার হইয়া একাদশ সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ওরূপ জ্ঞান-বহির্ভূত বস্তু জ্ঞানের যেমন অগোচর, ধ্যানেরও তেমনি অগোচর।

অধিকার।

আজকাল বড় একটা অনধিকার চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার গতিবিধির আকর্ষণে দেশ আজকাল এমনি আকৃষ্ট হইয়া আছে যে, যেমন সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে বিষশোষক প্রস্তর প্রযুক্ত হইলে তাহা সমুদয় বিষ টুকু টানিয়া লইয়া পড়িয়া যায় সেইরূপ এই দেশ অনধিকার-চর্চ্চারূপ হলাহল টানিয়া টানিয়া বিচ্ছেদ পতনোন্মুখী হইতেছে।

বাস্তবিক অনধিকার চর্চ্চা কিছুই নাই। তবে ইহা বলি কেন? শুদ্ধ বোধের তারতম্য অনুসারে। অধিকারটা কি! অধিকারের মূলস্থান কোথায়? ইত্যাদিরূপ, অধিকারের মর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অধিকারের চর্চ্চা করাই অনধিকার-চর্চ্চা। কোন্ বিষয়ে কাহার না অধিকার আছে সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? তাহা বোঝে অতি অল্প জন। এই বোঝা না বোঝার দরুণ অধিকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে—বৈষম্য জাগিয়া ওঠে। এই বৈষম্য হইতে কত শত ক্ষুদ্রভাব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া মনুষ্যকে তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্বকীয় ক্ষুদ্রায়তন কৃত্রিম অধিকার নির্ম্মাণ করিবার জন্য মত্ত করিয়া তুলিতেছে। মহান অধিকারের মাঝে মগ্ন হইতে দেয় না—কত কুটিলতা কত মলিনতা কত বাধাই হায় তাহার সম্মুখে জড় করে। এই কৃত্রিমতার স্পর্শে অধিকারের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। অকৃত্রিম অন্তরের মধ্যে অধিকার শোভা পায়। পাশব শক্তির অধিকার বেশী না প্রেমের অধিকার বেশী? প্রেমের মত অকৃত্রিম আর কি আছে? ইহার অধিকারে কেমন জীবন্ত ভাব কেমন ব্যাপকতা জাগে। ইহার সম্মুখে সহস্র বাধা উপস্থিত হউক ইহার সহজ ভাব অবাধে গতি। চৈতন্য যখন প্রথমে মহান প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সমুদয় জগতকে আপনার বলিয়া ভাবিয়াছিলেন তখন অনেকে তাঁহার নিন্দাবাদ তাঁহাকে বিদ্রূপাদি করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তিনি প্রেমের শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিশুদ্ধ অধিকারের মধ্যে বাস করিতেন। উপহাস নিন্দাবাদাদির জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া কেমন প্রশান্তভাবে পরিমলপূর্ণচিত্তে কহিতেন

"পরিবদতু যথা তথায়ং ননু মুখরো নবয়ং বিচারয়ামঃ।"

যথায় তথায় লোকে পরিবাদ দিউক মুখর বলিয়া আমরা তাহাদের বিচার করি না। প্রেমের অধিকারে দ্বেষ হিংসা সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহারি স্পর্শে আমাদের পবিত্রতা জন্মে। ইহাই আমাদের বাস্তবিক অধিকার। এই প্রেম হইতে আমরা যতটা দূরে পড়িব ততটা আমাদের অন্ধতা ততটা আমাদের দারিদ্র্য বিপত্তি। ইহার বাতাস যখনি হৃদয়ে আসিয়া লাগে তখনি আমরা কেমন সহজ প্রাণে "ওঁ শান্তিঃ" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি? এই প্রেমের অধিকার ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া শত আত্মা ভ্রমপ্রমাদে অন্ধীভূত—মৃতকল্প—অশাসনে দিকভ্রষ্ট তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে মৃত্যুকে প্রধান সম্বল করিতে প্রস্তুত। তাহারা মৃত্যুর কুটিল গতি পর্য্যবেক্ষণ না

করিয়া তদ্বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিলাষ সঞ্চালন করিতে সক্ষম হয় না—দিন দিন কপট বিকট হইয়া উঠে। তাহাদের চক্ষে অধিকারের সরল জ্যোতি কিরূপে প-ড়িবে? অধিকারের বিশুদ্ধ মর্ম্মগ্রাহী তা-হারা কিরূপে হইবে? যাহারা মৃত্যুর বক্রভাব বুঝিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে চাহে; যাহারা অনন্তের মধ্যে জীবন্ত ভাবে বিচরণ করিতে চাহে তাহাদিগকেই প্রেম আসিয়া জাগ্রতরূপে অধিকার করে। তাহারাই অধিকারের সৌন্দর্য্যটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। চরাচরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাহাদিগেরই জন্মে।

একটী সুন্দর পদার্থ কখনই তাহার সৌ-ন্দর্য্য-বিরহিত হইবে না যদিও অন্যে তাহা-কে মলিন অসুন্দর করিয়া দেখে। অনতি-দূরস্থ কোন বাড়ীর সৌন্দর্য্য যখনি আমরা উন্মুক্তভাবে নিজ ঘরের মধ্যে বসিয়া দেখি তখনি সেই সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অবয়ব আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু ঘরের সা-রসি বন্ধ করিয়া তাহার মাঝখান দিয়া দেখিলে সারসির অন্তরস্থ গতি অনুসারে সেই সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইব। সার-সির কাচের অন্তরটী যদি আঁকা বাঁকা ঢেউ খেলানো হয় তবে সম্মুখস্থ বাড়ীর সরল রেখাগুলি তন্মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিলে আঁকাবাঁকা ঢেউখেলানোই দেখিতে পা-ইব। সেইরূপ আমরা আমাদের নিজের স্বচ্ছ বিমল স্বরূপের মধ্য না দিয়া মোহ-মলিনতার বক্র আবরণের ভিতর দিয়া অধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সরল বিমল আকৃতি কিরূপে বুঝিতে পা-রিব? জড়বৎ হইয়া শিরানাড়ির মধ্যে অষ্টপ্রহর মরণ-সম্বন্ধ রচনা করিতেছি, কিরূপে অধিকারের নিগূঢ় তত্ত্ব ধ্যান ক-রিতে সমর্থ হইব? একমাত্র প্রাণই অধিকারের নিয়ামক। আবার এই প্রাণ প্রেমের আশ্রয়েই লাভ করা যায়। আ-মরা যদি প্রেমের বলে বলীয়ান হইয়া তাহার প্রতি অসঙ্কোচে নির্ব্বিবাদে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি তাহা হইলে আমা-দিগের অন্তঃকরণ হইতে "অনধিকার চর্চ্চা" এ কথাটী উঠিয়া যাইবে। তাহার স্থানে অধিকার বিমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবে, তখন ইহার সৌগন্ধে কেনা মোহিত হইবে? এই প্রেমো-ন্মুখী অধিকারের রাজ্যে যদি সকলে বাস করি তবে আমাদের চতুর্দ্দিকে এই যে কলহ বিবাদ দেখা যায় ইহা কি তিষ্ঠিতে পারে? অকৃত্রিম প্রেমের সহজভাবে ডুবিতে পারিলে যে কতখানি প্রাণ পাওয়া যায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ইহার মধুময় আভাস না দেখিয়া সকলে কলুষিত হস্তে ইহার কাছে আসে—পূজা করে। সে পূজাতো ভাল নয় ক্রমে তাহা অপূজাতে গিয়া দাঁড়ায়। যতটা সাধ্য ইহার ভ্রমময় পূজা দূর করিতে হইবে তাহা হইলে এমনি শক্তি লাভ হয় যে তদ্দ্বারা দুঃখ শোক সমুদয় তিরোহিত হইয়া যায়। এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে ইহার সুন্দর ছবি জ্বলন্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছে বুঝিয়া লইতে পারিলেই হয়। ইহার আনন্দ কল্পনা করিতে গিয়া কবি উথলিয়া ওঠেন, প্রতিকটাক্ষে অভ্রান্তির সুখময় হাস্য উপলব্ধি করিয়া পরম উপকৃত হয়েন—উপকারে ব্যস্ত হইয়া যান। ঔৎকর্ষ্য উৎসাহ আসিয়া তাঁহাকে সত্বর ঘিরিয়া ফেলে।

যে জাতি যতখানি প্রেমের আশ্রয়ে থাকিয়া অধিকারের বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ করিতে পারিয়াছে ততখানি সেই জাতির উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

এই অনন্ত অকৃত্রিম প্রেমের আশ্রয় হইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা দূরে পড়িয়া যাই। ইহাকে চিরদিন আমাদের অধিকারে রাখিতে গেলে চিরদিন সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। ক্রমিকই সাধনা করিয়া যাওয়া চাই, নিমেষের তরে বিরাম যেন না হয়, তবে আমরা ক্রমিকই ইহার মধুর রহস্য উপলব্ধি করিতে থাকিব। সাধনার প্রারম্ভাবস্থায় প্রেমকে তাকে তাকে রাখিতে হইবে—প্রেমপিপাসু হইয়া প্রেমের অন্বেষণে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়াবস্থায় প্রেম থেকে থেকে আয়ত্ত হইবে। তাহা ব্যবধানযুক্ত প্রেম। তৃতীয়াবস্থায় পরে প্রেমের আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। তাহাতে অব্যবধান বর্ত্তমান।

"সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডূক প্লুতিরেবচ।
গঙ্গাস্রোত ইব খ্যাতা অধিকারা স্বয়োগতাঃ॥"

এই শ্লোক অনুযায়ী প্রারম্ভাবস্থার প্রেমাধিকারকে সিংহাবলোকিত সদৃশ, দ্বিতীয়াবস্থার প্রেমাধিকারকে মণ্ডূকপ্লুতি সদৃশ, তৃতীয়াবস্থার প্রেমাধিকারকে গঙ্গা স্রোতসদৃশ কহিতে পারি। এই গঙ্গাস্রোতসদৃশ প্রেমাধিকারে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া ওঠে।

মরুভূমির আরবেরা বিদুইন নামক আরব জাতি বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল সেই এক ধাঁচে চলিতেছে। এই অবসরে কত জাতি উন্নতি অবনতির মধ্য দিয়া মহা উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে, অধিকারের সুন্দর রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে কিন্তু মরুভূমির আরবদের সে মহোন্নতি নাই। মরুর নীরস একত্বের তুল্য তাহাদের একত্ব জাগিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকাল হইতে এখনো পর্য্যন্ত প্রায় সেই এক প্রকার ভাব। একরূপ হওয়াতো খুব ভালই কারণ জগতের মাঝে একত্বই বিরাজ করিতেছে, এই বৈচিত্রের মধ্যে একত্বেরই ধ্বনি বিকাশিত। সে একত্ব সরস সরল। কিন্তু মরুভূমির আরবদের একত্ব প্রশংসাযোগ্য নয়, তাহা নীরস তাহা বাস্তবিক ধরিতে গেলে একত্বহীন অনেকত্ব। নীরস একত্ব হইতে অনধিকার চর্চ্চা জন্মায়। এই নীরস একত্বময় মরুভূমির আরবেরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধ করে কিছু মাত্র ব্যথিত হয় না। এ শুধু তাহাদের অধিকারের বিশুদ্ধ দিকে দৃষ্টি না রাখার দরুন। আধুনিক ইউরোপের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি দেখিতে পাই তাহারা অধুনাকালে অন্যাপেক্ষা অধিকারের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছে। তাই তাহাদের নিকটে স্বর্গের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হইতেছে। তাহার স্পর্শে অন্য কত জাতি আবার জাঁকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ রূপে আত্মার মহান অধিকার বুঝিয়া পার্থিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারের উপর রাজত্ব করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন—পরমেশ্বরকে করতলস্থিত আমলকবৎ লাভ করিয়া আপ্তকাম হইয়াছিলেন। প্রেমাধিকার তাঁহারদের কেমন সুন্দর রূপে ঘটিয়াছিল। আমরা মহান উন্নত হইতে চাহিলে আমাদিগকে সতত প্রেমের অধিকারের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। ইহা বিনা আমাদের অন্য গতি নাই। ইহার দ্বারা সমুদয় কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে অথচ নীরবে সম্পন্ন হইয়া যায়। এই প্রেমেরই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গ্রহের পশ্চাতে গ্রহ ঘুরিতেছে অথচ কিছু মাত্র কোলাহল বিশৃঙ্খলতা নাই; কেমন নিঃশব্দে নীরবে কার্য্য সমাধা হইয়া যাই-

তেছে। যদি সমাজে আসিয়া পরমেশ্বরকেই লাভ করিবার সাধ থাকে তবে আমাদের ব্যক্তিগত দোষ গুণ ব্যক্তিগত ত্রুটী লইয়া মনে মনে কোলাহল না করিয়া নীরবতা অভ্যাস করা শ্রেয়। এই নীরবতা ছাড়িয়া হট্টগোল হুজুকে মাতিয়া থাকিলে প্রেমের মাধুর্য্য আমরা হারাইয়া ফেলি সঙ্গে সঙ্গে সেই মহান অনন্ত হইতে দূরে পড়িয়া যাই। একটী হিন্দুস্থানি গানে আছে "পরম পদ গোঙাহো য়্যাসে পাওয়ে। কর নহি চাল পগনহি হাল বিনে রসনা গুণ গাওয়ে। যদি পরম পদ পাইতে অভিলাষ হয় তবে মূক হও। হাত চলিবে না পা চলিবে না বিনা রসনায় তাঁহার গুণ গাও। অসীমের মহিমা বুঝিতে গেলে এইরূপ নীরব পথ অবলম্বন করিয়া মৌনী হইয়া প্রেমের সূক্ষ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে।

"সংত্যজ্য বাসনাং মৌনাদৃতে নাস্ত্যত্তমং পদম্।

বাসনা ত্যাগ করিয়া মৌনভাব অবলম্বন না করিলে কখনো উত্তম পদ লাভ হয় না। মৌনী হইয়া ক্রমিকই আমাদের প্রেমের অধিকারের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে তবে আমাদের রক্ষা। আমাদের ঝঞ্ঝাট ভয়ের কারণ কিছুই রহিবে না। আমরা নির্ভীক সাহসী হইতে পারিব। আমরা এমনি পরাধীন এমনি দুর্ব্বল যে, আমাদের স্বদেশ আমাদের জন্মভূমি অথচ তবু আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। ইহা হইতে দারিদ্র্য দুর্দশা আর কি হইতে পারে? এ দারিদ্র্য এ দুর্দশাও ঘুচিবে যদি আমরা একবার প্রেম অধিকার করিয়া দীপ্তিমান হই। প্রেমের পথ দিয়া ত্রিকালজ্ঞের আনন্দ ঘোষণা করিয়া বেড়াই। ইহাই আমাদের কাজ। ইহাই আমাদের সাজ।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের অন্তরে তোমার প্রেম তোমার সহবাসের যে মহান অধিকার দিয়া আমাদের প্রতি তোমার অসীম করুণার পরিচয় দিয়াছ তাহা ভুলিয়া কেন আমরা এই সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে জড়িত হইয়া পড়ি, রাশি রাশি হীনতা ক্ষীণতা আসিয়া আমাদের ধ্বংস করিবার উপক্রম করে। ইহা হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর। তুমিই মুক্তিদাতা অদ্বিতীয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রী হিতেন্দ্র

নীতি।

ধর্ম্মের দুইটি দিক, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক। মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ লৌকিক; মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ আধ্যাত্মিক। মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের এই সম্বন্ধের অপর নাম নৈতিক যোগ। এবং যে নিয়ম অনুসারে মনুষ্যেরা আপনারদের মধ্যে ব্যবহার নিয়মিত করে তাহার নাম নীতি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপাসনার স্বাভাবিকত্ব সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হইলেও যেমন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট যোগে আবদ্ধ হওয়া মনুষ্যের নিজ নিজ যত্ন চেষ্টা সাধন তপস্যা সাপেক্ষ, তেমনি সত্য দয়া ক্ষমা মৈত্রী প্রভৃতি মানসিক সুকোমল ভাব হৃদয়-ক্ষেত্রের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস হইলেও উহারদের উৎকর্ষ বিধান মনুষ্যের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফল। মনুষ্য এখানে আসিয়া যাহা কিছু সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও ইহাই ধর্ম্ম সাধনের তাবৎ নহে। আমারদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা অনুষ্ঠানে তৎপরতা চাই। একদিকে আমরা সামাজিক জীব

আর এক দিকে আধ্যাত্মিক জীব। আমরা যতদূর সামাজিক ততদূর আমাদিগকে ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া পাত্র বিশেষে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া মৈত্রী ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে, অপরের সুখশান্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইবে, অসত্য পরদ্রোহ পরপীড়ন, চৌর্য্য নিষ্ঠুরতা ইন্দ্রিয়লৌল্য, ক্রোধ প্রতিহিংসা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার যতদূর আধ্যাত্মিক জীব সংসারের অনিত্যতা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া ঈশ্বরকে গতি মুক্তির নিদানভূত জানিয়া ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভের জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কাতর প্রাণে বিমল হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, সম্পদে বিপদে স্থির থাকিয়া সেই ধ্রুবতারার উপর অনিমেষ আঁখি স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে অক্ষয় যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। জীবনকে গৃহী সন্ন্যাসীর অভিনয়ক্ষেত্র করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের পক্ষে যার পর নাই উচ্চ লক্ষ্য, উন্নততম আদর্শ। এই আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল লক্ষ্য অভাবে সহজেই উদ্দাম হইয়া মনুষ্যকে বিপথগামী করে। আবার বিশ্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানের এমনই গূঢ়তম সম্বন্ধ যে কার্য্যক্ষেত্রে বিলক্ষণ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অগ্রসর হইতে না পারিলে বিপদপাতের সমধিক সম্ভাবনা। এই জন্যই ধর্ম্মগতপ্রাণ মহানুভব প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া মনুষ্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াও স্বার্থপরতা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা অযথা ক্রোধের নিকট ধর্ম্মকে বলিদান দিতে সময় বিশেষে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। একদিকে ঈশ্বরসাধন যেমনই কঠোর, নীতিসাধন তেমনই দৃঢ়তা তিতিক্ষা ও স্থৈর্য্যসাপেক্ষ। সংক্ষেপতঃ নৈতিক উন্নতিই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি, এবং ইহাই আধ্যাত্মিক বললাভের পরিচায়ক। চরিত্র সংগঠনের উপরেই ঈশ্বরলাভের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

ন্যায় অন্যায় জ্ঞান মনুষ্যের সহজ জ্ঞান সম্ভূত হইলেও কাল ও দেশ বিশেষে কেন যে কোন এক গর্হিত কর্ম্ম আদরের চক্ষে পরিলক্ষিত হয়, আবার কোন এক শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ঘৃণার সহিত সমালোচিত হয়, এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে; নীতির মূলমন্ত্রে সকলে সমান ভাবে দীক্ষিত হইয়াও কেন যে বিসদৃশ ভাবের পরিচয় দেয়, ইহার রহস্য উদ্ভেদ বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমারদের বিবেচ্য বিষয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে অনেকটা বিশদ হইবার সম্ভাবনা (১) নীতিজ্ঞানের মূল কোথায় (২) সকল জাতির নীতি-জ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর ঐক্য আছে (৩) কার্য্য ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় বিবেচনার বিভিন্নতা কোথা হইতে আইসে।

১। নীতি জ্ঞানের মূল কোথায়। সদসৎ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই সহজ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। লোকে কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায় আপনা হইতেই বুঝিতে পারেন। ন্যায় অন্যায় বুঝিতে কোনরূপ শিক্ষার আবশ্যক করে না। বালকের জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে কার্য্যের হিতাহিতত্ব বুঝিতে থাকে। বিনা কারণে পিতামাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে বা অন্যায় কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইলে অমনি তাহার অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হয়। অন্যায় রূপে প্রহার করিলে অমনি সে বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। মিথ্যা কথন

তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সরলতা পবিত্রতা তাহার প্রকৃতির মাধুর্য্য। নরহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা চৌর্য্য অপহরণ প্রবঞ্চনা এই সকল কার্য্য চিরকালই ঘৃণার চক্ষে পরিলক্ষিত হয়। নীতিবিরোধী কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানে তাহার চিরঘৃণা। তবে যে স্থলবিশেষে তাদৃশ ঘৃণা উৎপাদিত হয় না তাহার যে অন্য কারণ আছে তাহা পরে দর্শিত হইবে। আমরা যদি বাল্যকাল হইতে কাহাকে শিখাইতে থাকি যে চৌর্য্য প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা দস্যুবৃত্তি বাস্তবিক হিতকর, আর দরিদ্রকে দান, অসহায়কে সাহায্যকরণ, যারপর নাই নীতিবিরুদ্ধ, তবে এরূপ শিক্ষা কোন রূপেই অন্তরের ভিতর হইতে সায় প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্য এরূপ শিক্ষায় কখনই আপনাকে নিয়মিত করিতে পারেন না। এরূপ শিক্ষায় না তিনি ভিতরের অনুমোদন পান, না বহির্জগতের সহানুভূতি পান। প্রতি অহিতাচরণে তাঁহাকে অন্তরে কোন এক অজানিত প্রভুর কশাঘাত সহ্য করিতে হইবেই হইবে। অনুতাপের গ্লানি সেই নরকাগ্নি হইতে কোন মতেই তাঁহার পরিত্রাণ নাই। এই প্রভুর নাম হিতাহিত জ্ঞান, ইহাই জড় প্রকৃতির রাজা; হস্তপদাদি ইহার সৈন্যদল, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ইহার একান্ত সেবক ও অধীন। এই হিতাহিত জ্ঞানই মনুষ্যহৃদয়ে সারবান ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস যার পর নাই ধর্ম্মানুগত ও ঈশ্বরানুগত বিশ্বাস।

উপরে যেমন হিতাহিত জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইল কিন্তু ইহাই যে একমাত্র অবিসম্বাদী মত তাহা নহে। ন্যায় অন্যায় জ্ঞানবিরোধী দলের মতে সহজ স্বাভাবিক আশৈশব ঈশ্বরদত্ত কোন এক মানসিক ক্ষমতা প্রসূত নহে। তাঁহারদের মতে এরূপ কোন রূঢ় বৃত্তি নাই; হিতাহিত জ্ঞান কয়েকটি মানসিক ভাবের সংঘাতে উৎপন্ন। কেহ বলেন ঈদৃশ জ্ঞানের ভিত্তিমূলে মনুষ্যের ভয়, কুসংস্কার, দেশীয় প্রচলিত রীতি, ইত্যাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ বলেন ইহা ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি, প্রচলিত মতামত ও রাজদণ্ড দ্বারা নিয়মিত সহানুভূতি ও অন্যান্য ভাবের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন সাধারণের সুখবৃদ্ধির ইচ্ছা ও মানসিক কোমল ভাবের উত্তেজনায় মনুষ্য ন্যায্য কর্ম্মে অগ্রসর হয়। কেহ বা বলেন যাহা সুখ বৃদ্ধি করে তাহাই নীতি তাহার বিপরীত দুর্নীতি, কেহ বা আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলেন যাহা আমার পক্ষে সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে যাহা তোমার সুখকর তাহাও ন্যায্য নহে, কিন্তু যাহা বহু সংখ্যক লোকের বহু কল্যাণপ্রদ তাহাই নীতি তদ্বিপরীত দুর্নীতি। এক হিতাহিত জ্ঞানাত্মক স্বতন্ত্র মানসিক বৃত্তির সত্ত্বা অস্বীকার করিতে গিয়া এরূপ নানা মতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যতই কেন যৌগিক উপাদানে ইহার কলেবর গঠিত করিবার প্রয়াস পাওয়া হউক না, প্রভূতমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের তর্কতরঙ্গের মধ্যে তাঁহারদের যুক্তিতেও প্রকৃত বিষয়ে এরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হয় যে তাহাতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। শেষোক্ত মতের এক একটিকে লইয়া তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে তাহারদের বিরুদ্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে উপরিউক্ত মতের কোনটিই মনুষ্যের দায়িত্ব ও বাধ্যতা প্রমাণ করিতে পারে না। যদি ন্যায় অন্যায় বিবেচনা

আমার উপর নির্ভর করে তবে কেন ন্যায়ের ব্যভিচারে ভিতরের তাড়না সহ্য করিতে হয়। পিতামাতাকে ভক্তি করিতে তুমি বাধ্য, আর্ত্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে তুমি বাধ্য, সময় বিশেষে আপনার জীবনের উপর কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া অপরকে রক্ষা করিবার জন্য ভিতর হইতে যে দুর্দ্দম্য বল আইসে, কই আমরাত ইচ্ছা করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। অন্যায় কার্য্য করিলে কোথা হইতে বা অনুতাপ আইসে?

(খ) যদি সুখ ন্যায় কার্য্যের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে সুখ আমাকে আকর্ষণ করিতে পারে, আমাদিগকে বাধ্য করিতে পারে না, আমাদিগকে শাসন করিতে পারে না। সুখ আমাদিগকে কেন ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি করে ইহারও সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বিশেষতঃ সুখও নানা প্রকারের, কতকগুলি বা উচ্চ অঙ্গের কতকগুলি বা নিম্ন অঙ্গের। কার্য্যক্ষেত্রে কোন্ প্রকার সুখ কখন বা গ্রাহ্য কখন বা ত্যজ্য তাহা কে নির্ণয় করিয়া দিবে। আবার সুখের মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাই যে কতকগুলি সুখ মনুষ্যের সচেষ্ট অবস্থার কতকগুলি নিশ্চেষ্ট অবস্থার। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিচালনায় যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা সচেষ্ট অবস্থার সুখ। স্নিগ্ধ বায়ু সেবন মূল্যবান পদার্থ ও ধন ঐশ্বর্য্যের উপভোগে যে সুখ হয় তাহা আবার অন্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে সুখ মাত্রেই আমারদের ন্যায় কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারে না। প্রত্যুত তাহারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির চালনা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা শক্তি পরিচালনার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যায় না, কিন্তু সহচর অনুচর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে।

(গ) মনে কর সুখই যেন ন্যায্য কর্ম্মের নিয়ামক হইল, কিন্তু আমি ত সংসারী জীব, আমি কাহার সুখ দেখিব, আমার না পরের। কখন্ বা আমার সুখ দেখিব কখন বা পরের সুখ দেখিব এ সন্ধান আমাকে কে বলিয়া দিবে। যদি বহুল অংশ লোকের বহুল পরিমাণে সুখ দীপশলাকা হস্তে আমার পুরোবর্ত্তী হয়, তবে অন্ধকার বিদ্ধস্ত না হইয়া বরং তাহার গাঢ়তা শত গুণ বর্দ্ধিত হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিকর্ম্মের প্রারম্ভে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে "বহুল সংখ্যক লোকের বহুল পরিমাণে সুখ" তর্ক শাস্ত্রের এ জটিলতম প্রশ্নের কে মীমাংসা করিয়া দিবে। আমরা ত কার্য্য করিবার সময় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় আশৈশব ন্যায় অন্যায় আপনা হইতে বুঝিতেছি; বাল্যে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে যে বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, যৌবনে তর্কশাস্ত্রের সমূহ আলোচনার পর ত আপনাকে ভ্রান্ত বুঝিতেছি না। ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে করুক, কিন্তু সদসৎ জ্ঞান যে জ্বলন্ত অক্ষরে আমারদের অন্তরে চিহ্নিত রহিয়াছে, কখনই তাহার ক্ষয় দেখিতেছি না।

(ঘ) আমরা দেখিতেছি নীতি-অনুমোদিত কার্য্য সকলেরই অনুষ্ঠানে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়; কিন্তু যাহাতে সুখ হয় তাহাই ন্যায্য নহে। সুতরাং সুখ ও ন্যায় পরস্পরের প্রকাশক নহে। সুখের ক্ষেত্র ন্যায়ের অপেক্ষা প্রশস্ততর, সুতরাং সুখ ন্যায় কর্ম্মের পরিমাপক হইতে পারে না। সুখের কষ্টি-

প্রস্তরে ন্যায়ের পরীক্ষা চলিতে পারে না। আবার যাহাতে দুঃখ জন্মে তাহাই অন্যায্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এমন কোন কার্য্য নাই দুঃখ যাহার উদ্দেশ্য। দুঃখ পাইব এই মানসে কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। মনুষ্যের অবিবেকিতা দোষে দুঃখ জন্মে। ইচ্ছা করিয়া কেহ আপনার মস্তকে দুঃখ আনয়ন করে না। আবার এমন কতকগুলি দুঃখ আছে, সুখ যাহার মর্ম্মে রহিয়াছে। শরীরে ব্রণ হইল, চিকিৎসক আসিয়া তাহাতে অস্ত্র-প্রয়োগ করিলেন, রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এই দুঃখের মধ্যে অন্যায় কোথায়। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সুখও ন্যায়ের নিয়ামক নহে, দুঃখও অন্যায়ের প্রতিরূপ নহে।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ৵১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাক মাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

আগামী ৪ঠা ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রীলালবেহারি দে।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫২৪৸/০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৮৭৮॥৶১৫
সমষ্টি	৩৪০৩॥ ১৫
ব্যয় ...	৭৫১ ৵০
স্থিত	২৬৫২।৵১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫৪।৵০
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
" " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৩১।৵০
	৫৪।৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯২॥/০
পুস্তকালয় ...	১২৸/০
যন্ত্রালয় ..	১৬৬।৵১০
গচ্ছিত ...	৮৮৸৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৯৸০
সমষ্টি	৫২৪৸/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৬০৸ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৯৸৶০
পুস্তকালয়	৩৮৸/০
যন্ত্রালয় ...	২০৩৸/১৫
গচ্ছিত	৯১॥/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৵১০
দাতব্য	১৬৲
সমষ্টি ...	৭৫১৵০,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত মাসের "আত্মা ও পরমাত্মা" শিরস্ক প্রবন্ধে তৃতীয় পারাগ্রাফ নবম পংক্তিতে "আমি আছি" এবং "আমি সৃষ্ট" ইহাই জীবাত্মার নির্দ্দেশ, এইরূপ হইবে; ত্রয়োবিংশ পংক্তি "আত্মাকে" ইহার স্থানে "জীবাত্মাকে" হইবে; পঞ্চবিংশ পংক্তি "তিনি" ইহার স্থানে "যিনি" হইবে।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

আত্মশক্তি।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজি পণ্ডিত বলিয়াছেন—জ্ঞানই শক্তি;—কিন্তু কার্য্যতঃ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলের পক্ষে নহে; যাহারা জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে জানেন তাঁহাদেরই জ্ঞান বিশিষ্টরূপে শক্তি নামের যোগ্য। মনে কর—দুই ব্যক্তিই রসায়ণ বিদ্যায় সুপণ্ডিত; তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি উক্ত বিদ্যার সাহায্যে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে জানেন, আর এক ব্যক্তি সে বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ; রসায়ণ-জ্ঞান দুই ব্যক্তিরই সমান—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রসায়ণ-জ্ঞান শক্তি-নামের যোগ্য, শেষোক্ত ব্যক্তির রসায়ণ-জ্ঞান শুদ্ধ কেবল জ্ঞান মাত্রই সার। অতএব, সাধারণতঃ সকল জ্ঞানই যে, শক্তি, তাহা নহে; বিশেষ এক-জাতীয় জ্ঞান আছে—তাহাই শক্তি নামের যোগ্য, কি? না উপায়-জ্ঞান; উপায়-জ্ঞান—অর্থাৎ জ্ঞানকে কিরূপে কার্য্যে খাটাইতে হয় তদ্বিষয়ক জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞানই শক্তি।

জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে হইলে জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। বিদ্যা-শিক্ষার সময় জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানদাতা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা দুয়ের মধ্যে এ-পিঠ ও-পিঠ সম্বন্ধ। বিদ্যার্থীর নিকটে গুরুই জ্ঞান মূর্ত্তিমান্। কিন্তু গুরু কেবল জ্ঞানের গুণেই গুরু—এই জন্য জ্ঞান গুরু অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধেয়। তবে, বালকের পাঠ্যদশায়—জ্ঞান যে কি বস্তু—সে তাহা জানে না; সুতরাং তখন জ্ঞান তাহার নিকটে কিছুই নহে—গুরুই তাহার নিকটে জীবন্ত জ্ঞান। বিদ্যার্থী ব্যক্তি যতই জ্ঞান-লাভে কৃতকার্য্য হইতে থাকেন, ততই তাঁহার গুরু-ভক্তি বাহিরের গুরু হইতে অন্তরের গুরুর প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইতে থাকে; ইতিপূর্ব্বে গুরুর প্রতি তাঁহার যতখানি শ্রদ্ধা ছিল, জ্ঞানোপার্জ্জনের পর জ্ঞানের প্রতি তাঁহার ততোধিক শ্রদ্ধা জন্মে। জ্ঞানের প্রতি যাঁহার যত শ্রদ্ধা বেশী—জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে তাঁহার তত উৎসাহ বেশী। কলম্বস্, নিউটন, প্রভৃতি মহাত্মাদিগের একদিকে যেমন জ্ঞানের প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল, আর এক দিকে তেমনি জ্ঞানকে কার্য্যে খাটা-

ইবার জন্য অসামান্য উৎসাহ ছিল। এই-রূপ শ্রদ্ধাবান্ উৎসাহী পুরুষেরা জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়া যা'ন, তাহার পরে তাঁহাদের অনুপন্থীরা তদনুসারে পুনঃপুনঃ কার্য্য করিয়া অভীষ্ট কার্য্যে অসাধারণ নিপুণতা লাভ করেন। এইরূপে জ্ঞানের সহিত যখন কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হয়, তখনই জ্ঞান বিশিষ্টরূপে শক্তি-নামের যোগ্য হয়।

অধুনাতন কালের প্রধান একটি ভ্রম এই যে, বিজ্ঞানই কেবল জ্ঞান-নামের যোগ্য, বিশুদ্ধ-জ্ঞান-রূপী যে আত্মা, তাহা কিছুই নহে। ইহাঁদের মুখের কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, ইহাঁরা বিজ্ঞানের সবিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু পক্ষপাতকে আমরা অত্যন্ত ডরাই—এজন্য পারৎপক্ষে আমরা তাহার ত্রিসীমা মাড়াই না। বিজ্ঞানের পক্ষে হইয়া আত্মাকে নীচু করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না—আত্মার পক্ষে হইয়া বিজ্ঞানকে নীচু করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এখানে এই সত্যটি সংস্থাপন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, বিজ্ঞানের সহিত কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হইয়া যেমন সাংসারিক শক্তি পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত, অথবা যাহা একই কথা—আত্মার সহিত, কার্য্য-দক্ষতা মিলিত হইয়া আত্ম-শক্তি পরিস্ফুট হয়।

ফরাসীস্ বিজ্ঞান-বেত্তা কম্‌টি মনুষ্যত্ব-নামক একটা আব্‌ছায়া মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সে মনুষ্যত্ব কতকগুলা মৃত মনুষ্যের সমষ্টি—তাহার শক্তি কি আর থাকিবে? কিন্তু যদি জাগ্রত জীবন্ত মনুষ্যত্ব দেখিতে চাও তবে তাহা তোমার অন্তরে বিরাজমান; প্রতি জনের বিশুদ্ধ জ্ঞানই—প্রতি জনের আত্মাই—জীবন্ত মনুষ্যত্ব; কম্‌টির ও-মনুষ্যত্ব এবং আমাদের এ-মনুষ্যত্ব দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কম্‌টির মনুষ্যত্ব কি রূপ? না যেমন সেনার সেনাত্ব; সেনারাই যুদ্ধ করে—সেনাত্ব কিছুই করে না। আমাদের মনুষ্যত্ব কি রূপ? না, যেমন সেনার সেনাপতি; সেনাপতির অধ্যক্ষতা ব্যতীত সেনা যুদ্ধ করিতে পারে না—আত্মার অধ্যক্ষতা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে পারে না। আমাদের অভ্যন্তরস্থিত বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই আমরা বলি—আত্মা; আত্মাই জীবন্ত মনুষ্যত্ব—আত্মাই পরমাত্মার অনুকৃতি। ইহা যেমন সুনিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইতে পারেন তিনি তত সাংসারিক শক্তি উপার্জ্জন করেন, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান-রূপী আত্মাকে যিনি যত কার্য্যে খাটাইতে পারেন তিনি তত আধ্যাত্মিক শক্তি উপার্জ্জন করেন।

জাহাজ চালাইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে সমুদ্র-পথের একটি সমীচীন আদর্শ-লিপি প্রস্তুত করা আবশ্যক। সেইরূপ বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে সমীচীন একটি আদর্শ অবলম্বন করা আবশ্যক। পরমাত্মাই আত্মার সমীচীন আদর্শ। সমুদ্র-পথও যেমন নির্জীব; তাহার আদর্শ-লিপিও তেমনি নির্জীব, কিন্তু পরমাত্মা জীবন্ত আত্মার জাগ্রত জীবন্ত আদর্শ। জীবন্ত শরীরের অভ্যন্তরেই আমরা জীবন্ত মনুষ্যকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, সেইরূপ জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরেই আমরা জীবন্ত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। একজন মনুষ্যকে চিন্তা করা স্বতন্ত্র এবং তাহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা স্বতন্ত্র,—তাহাকে

সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে তাহার জীবন্ত শরীরের অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়; তেমনি, পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহাকে জীবন্ত আত্মার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়। সকলেই আমরা পরমাত্মাকে আত্মার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাকি; কেবল সে বৃত্তান্তটির প্রতি আমরা যথোচিত মনোনিবেশ করি না বলিয়া অভীষ্ট ফল-লাভে বঞ্চিত হই। পিঞ্জরস্থিত পক্ষী আহারান্তে চাহিয়া দেখে যে, তাহার চতুর্দিকে আকাশ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাই সে পিঞ্জরের যন্ত্রণা অনুভব করে; কিন্তু সে যদি অষ্ট প্রহর কেবল আহার পানেই নিযুক্ত থাকিত তবে পিঞ্জরে থাকিয়াই সে স্বর্গভোগ করিত। সেইরূপ পরম আনন্দধামের প্রতি আমাদের লক্ষ রহিয়াছে বলিয়াই আমরা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করি; জ্বালা-যন্ত্রণার অর্থই এই যে, যে আনন্দের প্রতি আমাদের লক্ষ রহিয়াছে, সে আনন্দকে আমরা সমুচিত পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা যদি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে উন্মেষিত না হইতেন, তবে আমরা পশুদিগের ন্যায় যাহাতে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। আমাদের একদিকে দুঃখ-ক্লেশময় সংসার, আর-এক দিকে পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। সংসারের এই যে, দুঃখ শোক জরা ব্যাধি, ইহার একটা উল্টা পিট রহিয়াছে—তাহাতে আর ভুল নাই; তাহা কি? না আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা আমাদের সমস্ত দুঃখ-শোক জরা-ব্যাধি পাপতাপের শান্তিসুধা; তিনি আমাদের আত্মার সমগ্র অভাবের পরিপূর্ত্তি এবং পরিশান্তি। কিন্তু সেই আনন্দধামে মনকে নিবিষ্ট করিতে শিক্ষা করা প্রয়োজন। সারথী যেমন অশ্বের গ্রীবা থাবড়াইয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে শীতল করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে অশ্বশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়, সেইরূপ অবসর-ক্রমে মনকে প্রবোধ-বাক্যে শীতল করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে অন্তরতর অন্তরতম আনন্দ-ধামে ফিরাইয়া আনা সাধকের পক্ষে অ[illegible]শ্যক। ইহাতে আত্মার মালিন্য ঘুচিয়া যায়, আত্মাতে শান্তির উদ্রেক হয়, ও আত্মার কার্য্য-শক্তি দ্বিগুণিত হয়।

এইরূপে পরমাত্মার আনন্দ-রস-পানে মন সুপ্রসন্ন প্রশান্ত এবং সবল হইলে অতঃপর তাহাকে সাংসারিক কর্ত্তব্য-সাধনে নিযুক্ত করা আবশ্যক। যাঁহারা এইরূপে কার্য্য করেন তাঁহারা ঈশ্বরের হইয়াই কার্য্য করেন—এইজন্য তাঁহাদের মন অল্প কিছুতে বিচলিত হয় না। এইরূপ করিয়া সাধকের যখন কর্ত্তব্য-সাধনে যথোচিত নিপুণতা জন্মে, তখনই তাঁহার বিশুদ্ধ ধীশক্তি কার্য্য-শক্তিতে পরিণত হয়, তখন তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান জ্ঞান-মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—তাহা একটা প্রবল-পরাক্রম শক্তি হইয়া উঠে। এইরূপ শক্তিসমন্বিত বিশুদ্ধ জ্ঞানই সমগ্র আত্মা।

নিবৃত্তি।

আত্মার তৃপ্তি-সাধন নিজের দ্বারা যেমন হয় বাহ্যবস্তুর সাহায্যে তেমন হয় না। কিন্তু আমাদের এমনি থেকে থেকে ভুল হয় যে নিজের সুখানুসন্ধান করিতে বাহিরেই ঘুরি, বাহিরের সংস্পর্শজনিত মোহে মনকে কতরূপে তৃপ্তি উপভোগ করাইবার জন্য ব্যস্ত হই, চেষ্টা পদে পদে বিফল হইয়া যায় কারণ জ্ঞান-স্বরূপের সুশীতল

ছায়া ভিন্ন আত্মার আর কোথাও শান্তি নাই; সেইখানে বসিয়া সে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে চায়। সেই বলেই আত্মা মলিন মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মায় নিলীন রাখিতে চায়।

অগ্নিকণা নীরস দ্রব্যরাশিতে পতিত হইলে চকিতের মধ্যে মহাঅগ্নিরূপ ধারণ করত শেষে ভস্মাকারে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আমাদের প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া ক্ষণস্থায়ী মহাচমকে মাতিয়া ওঠে শেষে একেবারে অধঃপতন—কাজেই নিবৃত্তি। এরূপ নিবৃত্তি নিবৃত্তিই নহে। যেহেতু অবস্থা আমাদিগকে ঘাড় ধরিয়া নিবৃত্তিতে আনিল, আমরা স্বাধীন ভাবে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। স্বাধীন ভাবে যে নিবৃত্তি তাহাই প্রকৃত নিবৃত্তি, তাহাই বাস্তবিক জ্ঞানের লক্ষণ। আত্মা ইহাতেই ভাল থাকে। ইহাতেই আত্মার ধৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য, নিবৃত্তিকে আমরা ভালরূপ অভ্যাস করিতে সমর্থ হইলে জগতের কি না উপকার আমাদের কর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে? সকল দেশেরই ধর্ম্মের মধ্যে ইহার পবিত্র মাধুর্য্য গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা সহজে কাহারো চক্ষে পতিত হয় না। যাঁহারা সাধনপ্রিয় সজ্জন তাঁহাদেরই জ্ঞানে নিবৃত্তির সূক্ষ্ম মাধুর্য্য ধরা দেয়। নিবৃত্তিরেবতু গরীয়সী নিবৃত্তিই গরীয়সী। ইহুদী গ্রীক আরবী পারসী প্রভৃতি কত জাতির মধ্যে নিবৃত্তির চর্চ্চা হইয়াছে। ইহুদীধর্ম্মে একটী অতি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই "মিম্না ডুমা মাস্‌সা" 'মিস্‌না'র অর্থ শ্রবণ 'ডুমা'র অর্থ নীরব 'মাস্মা'র অর্থ ধৈর্য্য। অর্থাৎ নীরব হইয়া সব শ্রবণ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি যেন না হয়। ইহাতে কতখানি নিবৃত্তির চর্চ্চা হইল! গ্রীসে জেনোইষ্টেরা কহিত "সহ্য কর এবং সংযত থাক।" কিন্তু আমাদের দেশে যেমন নিবৃত্তির চর্চ্চা হইয়া গিয়াছে এমন কোথাও হয় নাই। সংস্কৃত কাব্য নাটক বেদ বেদান্ত সমুদয়ের মধ্যে কেবল নিবৃত্তিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আমাদের এক মহাভারতে এক রামায়ণে কেমন নিবৃত্তির চরম শিক্ষা লাভ করা যায়। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎসুখং। কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোহর্থেহয়া দিশঃ॥" যিনি সন্তুষ্টচিত্ত নিরীহ এবং স্বীয় আত্মাতে রমণ করেন তাঁহার যে সুখ সে সুখ যাহারা কামলোভের বশে বিষয়-রাজ্যে ধাবমান হইতেছে তাহাদের কোথায়? সনৎকুমার ঋষিমণ্ডলীকে উপদেশ দিবার সময় কহিয়াছিলেন "নাস্তিরাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখং" বিষয়াশক্তি তুল্য দুঃখ নাই ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। এইরূপ আমরা নিবৃত্তিপূর্ণ ঋষিদের দেখিলে কি আরাম পাই! এই এমন নিবৃত্তি-সম্পন্ন দেশে থাকিয়া যদি আমরা বিষয়-মোহ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে না সক্ষম হইলাম—নিবৃত্ত থাকিয়া পরমাত্মার পবিত্র সহবাস না পাইলাম তবে আমরা অতিশয় মন্দভাগ্য। আমাদের অতিশয় লজ্জার বিষয়।

হে পরমাত্মন্। তুমি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া এই পবিত্র নিবৃত্তি অহরহঃ শিক্ষা দাও তাহাহইলেই আমরা তোমার আদেশ পালনে কৃতকার্য্য হইব, তোমার পথের পথিক হইতে পারিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীহিতেন্দ্র

নীতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬) পরিশেষে যদি রাজনিয়ম অথবা জনসাধারণের নিন্দাবাদ ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে সভ্য সমাজের সামাজিক নিয়মাবলী (etiquette) নীতি অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু কই সামাজিক নিয়মভঙ্গের জন্য মনের মধ্যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের ন্যায় অনুতাপ আইসে না। নীতি মনুষ্যের সৃষ্ট হইলে সামাজিক নিয়মাবলীর সহিত ন্যায্য কর্ম্মের ঐক্য অনুভূত হইত। লোকে কাহা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইয়া আপনা হইতে ন্যায্য কর্ম্মে রত হয়। নীতি মনুষ্যের সৃষ্টি হইলে, সুখ ইহার প্রবর্ত্তক হইলে অথবা অন্যান্য উপাদানে নীতিজ্ঞান সংগঠিত হইলে পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নীতির শ্রীবৃদ্ধি ও তারতম্য হইত, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে আপনাকে নীতির হস্ত হইতে অব্যাহতি দিতে পারিতেন। উল্লিখিত যুক্তি পরম্পরার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক হিতাহিতজ্ঞানপ্রসূত। বালকের জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে ইহার উদ্দীপন হয়। সকল দেশের সকল মনুষ্যের অন্তরে এই জ্ঞান জাগরূক রহিয়াছে।

২। সকল দেশের সকল মনুষ্যেরই নীতির মূল সত্যে সমান বিশ্বাস রহিয়াছে। যে দেশের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা কর পরস্বাপহরণ উচিত কি না, অবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে এক বাক্যে বলিবে কখনই না। সত্য কথা কহা উচিত কি না, উত্তরে বলিবে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরত্ন আর কি আছে। কিন্তু এই মূল সত্যে সমান বিশ্বাস থাকিলেও যদি আবার পরক্ষণে জিজ্ঞাসা কর, শত্রুর ধন অপহরণ করা উচিত কি না, কেহ বা মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া বলিবেন "উচিত" কেহ বলিবে "না"। উত্তরের বৈষম্যে ইহা বলা যাইতে পারে যে স্বার্থের নির্ম্মোক ধারণ করিয়া উত্তর দুইটি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মূল সত্যে অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উহাতে মানসিক দুষ্প্রবৃত্তির ছায়া পতিত হইয়া উহাকে ম্লান করিয়া ফেলে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ণসত্যের মর্য্যাদার কোনরূপ হানি হয় না। এই জন্য পূর্ণ সত্যে ও ব্যবহারে, বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে চিরকাল সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, এবং এরূপ সংগ্রাম যার পর নাই দুর্নিবার। মনুষ্য একে অপূর্ণ দুর্ব্বল জীব, যাহারদের সঙ্গে ব্যবহার করিবে তাহারাও ঐরূপ। অপূর্ণ বৃত্তের মধ্যগত হইয়া অপূর্ণ দুর্ব্বল জীব কেমন করিয়া পূর্ণসত্য সকল সময়ে জীবনে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবে।

অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যগণ আপনার আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, এমন একটু অবসর নাই, এমন অনুকূল ক্ষেত্র নাই যে তাহারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সকলের পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। ক্রমে সভ্যতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের পরিবর্ত্তে অর্থের ব্যবহার সমাজে প্রবেশ লাভ করে, তখন স্বচ্ছন্দে শরীর রক্ষা করিয়াও অন্যান্য শক্তি পরিচালনার যথেষ্ট সময় থাকে। সুতরাং ষোড়শকল চন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরপ্রদত্ত বৃত্তি সকল পূর্ণভাব ধারণ করিতে থাকে। এই জন্য অসভ্যজাতি অপেক্ষা সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে নীতিসম্মত কার্য্যের বহুলতম বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ অন্তর্দ্দেশ অন্বেষণ করিলে সুসভ্য অসভ্য

উভয়ের মধ্যেই নীতির মূল মন্ত্রে সমান বিশ্বাস দেখা যায়।

৩। কার্য্যক্ষেত্রে নীতির বিলক্ষণ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও যদি তাহার কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তবে দেখিতে পাই যে মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে নীতির মূল-মন্ত্রের সত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন এক কার্য্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে আমরা সেই আদর্শের সহিত কার্য্য বিশেষ মিলাইয়া লই। এই মিলনের জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। আমারদের প্রত্যেক বিশেষ কার্য্য সেই মূল আদর্শের অন্তর্ভূত হইয়া প্রকাশ পায়। "রামকে মারিব কি না" এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই নীতির মূলমন্ত্র অন্তর্দ্দেশ হইতে বলেন যে "নিরপরাধে কাহাকে প্রহার করা উচিত নয়।"

মনুষ্যের কার্য্যমাত্রই যে নৈতিক কর্ম্ম তাহা নহে। তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা শারীরিক মানসিক ও নৈতিক। ব্যায়াম ভ্রমণ সন্তরণ শারীরিক; মনোযোগ তর্ক স্মৃতি ইত্যাদি মানসিক কর্ম্মের অন্তর্ভূত। আবার শারীরিক ও মানসিক কার্য্য অবস্থাভেদে নৈতিক কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। পোত নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া যদি সন্তরণ করিয়া পোতারোহিদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাই তবে তাহা নৈতিক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমারদের নীতি সম্বন্ধীয় কার্য্যগুলিকে ভাল বা মন্দ না বলিয়া যৌক্তিক বা অযৌক্তিক, ন্যায্য বা অন্যায্য বলাই উচিত। কেন না যৌক্তিকতা অযৌক্তিতা নিরূপণ জ্ঞান-প্রসূত ভাব-প্রসূত নহে। যৌক্তিকতা জ্ঞানে অথবা মূল আদর্শের সহিত মিলাইয়া জানিতে পারা যায়। ভাবে (feeling) জানা যায় না। কার্য্যের যৌক্তিকতা যেমন আমরা আপনা হইতে বুঝি, তেমনি আবার ইহার যাথার্থ্য পরীক্ষার অন্যতম উপায় আছে। যাহা আমার নিকট ন্যায্য তাহা জনসমাজের নিকটও ন্যায্য। যাহা আমার নিকট হেয় তাহা সকলেরই নিকট হেয়। রাজা অন্যায্য কর্ম্মের জন্য দণ্ডবিধান করেন; জনসমাজ তাদৃশ কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে। তবে অন্যায্য কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারতম্য আছে। যাহা বিশেষ হানিজনক তাহার জন্য রাজদণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে, যাহা সমাজের পক্ষে তাদৃশ ভয়াবহ নহে তাহাই ঘৃণার কটাক্ষে পরিলক্ষিত হয়।

নীতিশিক্ষা ও হিতাহিত জ্ঞান-শক্তির শিক্ষা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ, হিতাহিত জ্ঞান শক্তি আশৈশব মনুষ্যে রহিয়াছে। নীতিশিক্ষা অর্থে নীতির মূল মন্ত্রগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা বুঝায়, ইহাই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। নীচ প্রকৃতি গুলিকে দমন করিয়া উহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানের অধীনে আনয়ন করা। হিতাহিত বিবেচনা অর্থে আদর্শের সহিত বিশেষ কার্য্য বা অভিপ্রায় মিলাইয়া দেখা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। মনুষ্য নানা প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির মিলন ক্ষেত্র ইহা স্বর্গ ও নরকের একাধার। সুপ্রবৃত্তি আমাদিগকে এক পদ অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছে, আবার দুষ্প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ শত পদ পশ্চাতে লইয়া যাইবার অবসর অন্বেষণ করিতেছে। মনুষ্যের মন দেবাসুরের যুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে। মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যই এরূপ বিভিন্নমুখী ক্ষমতার ফল। সুপ্রবৃত্তি দ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে পারিলে মনুষ্য

আপনার দেবভাবে পরিচালিত হইতে পারেন। দুষ্প্রবৃত্তি সকল যদি আমারদের উপর প্রভুত্ব খাটাইতে না পারিত তবেইত হিতাহিত জ্ঞানের রাজত্ব অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। সেই জন্য মনুষ্য একরূপ বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তির কুচক্রে অন্যরূপ করিয়া বসে।

হিতাহিত-জ্ঞান ও হিতাহিত বিবেচনা এই দুই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যাহা প্রকৃতরূপে ন্যায্য কেহই তাহাকে অন্যায়ের শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন না। বরং লোকের মধ্যে কোনটি ন্যায় তাহা অপেক্ষা কোনটি অন্যায় তাহা লইয়া বহুল পরিমাণে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্য প্রবঞ্চনাকে ক্ষমা করিতে পারে কিন্তু ন্যায়পরতাকে ঘৃণা করিতে পারে না! নিষ্ঠুর প্রতিশোধকে প্রশংসা করিতে পারে কিন্তু ক্ষমা ও মহত্বকে তাহা অপেক্ষা অধিক আদরের সামগ্রী মনে করে। নীতির মূল সত্যে মনুষ্যের মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু কার্য্যে তাহার প্রয়োগের বিভিন্নতা আছে। তাহার কারণ এক প্রকার পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে মনুষ্যের অন্তরে এরূপ কয়েকটি দুষ্প্রবৃত্তি আছে যাহারা হিতাহিত জ্ঞানের সহিত সৌহার্দ্দে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে। স্বার্থপরতা, হিংসা ইহাদের অগ্রণী। ইহারা মনুষ্যকে ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আনয়ন করে। পৃথিবীতে এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল, যাঁহারা হৃদয়তন্ত্রী গুলিকে হিতাহিত জ্ঞানানুমত করিয়া বাঁধিয়া লইতে পারেন। আবার নীতির মূল মন্ত্র সম্বন্ধে মতদ্বৈধ না থাকিলেও বর্ত্তমানে আমার কর্ত্তব্য কি তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। যেমন কোন বলিষ্ঠ ভিক্ষুক ভিক্ষার্থ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে আমরা কখন বা তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করি, কখন বা আলস্যের আশ্রয় দান বিবেচনায় তাহাকে শূন্যহস্তে ফিরাইয়া দিই অথচ দানকে ঘৃণা করি না।

আমারদের এমন দুর্ব্বলতা আছে, যাহা আমাদিগকে সহিষ্ণুভাবে বিবেচনা করিতে দেয় না, বিশেষ বিবেচনার পূর্ব্বেই আমরা আপনা হইতে একদিকে নীয়মান হই। এ ভ্রম কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন। স্বাধীন ভাবে যুক্তি অবলম্বন না করিয়া ভ্রমে পতিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সমাজের মধ্যে যে সকল ভ্রম ও কুসংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আপনাপন যুক্তি তর্ক সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অমূলক বিশ্বাস আমারদের হৃদয়কে এরূপ বিমোহিত করিয়া রাখে যে তাহার কোন সারবত্তা না থাকিলেও আমরা সহজে তাহাদিগকে বিদায় দিতে পারি না। পূর্ব্বে যখন নরবলি প্রচলিত ছিল তখন যদি সেই দুর্ভাগ্য নর দেবতার সম্মুখে ঘাতকের হস্ত হইতে কোনরূপে পলায়ন করিতে পারিত, তবে ঘাতক পূজক ও দর্শকবৃন্দের ক্ষোভের সীমা থাকিত না। বর্ত্তমানেও ঈদৃশ অযথা অসত্য হাস্যাস্পদ ধর্ম্মবিশ্বাসের অপ্রাচুর্য্য নাই।

এই সকল কারণে নীতির মূলসত্যে ও আচরণে এত প্রভেদ ও হিতাহিত জ্ঞানের স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে এতদূর সন্দেহ। দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন ভিন্ন সুনীতির অপরাজিত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন না মনুষ্যগণ একমাত্র হিতাহিত জ্ঞানের আদেশে পরিচালিত হইতে শিক্ষা করিবে ততদিন শান্তির রাজ্য সংস্থাপনের কালবিলম্ব হইবে। মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান-বিশিষ্ট জীব—

মনুষ্যের কার্য্যই কেবল হিতাহিত বিবেচনার ফল। মনুষ্য যতদূর স্বাধীন জীব ততদূর তাহার দায়ীত্ব আছে। যতদূর তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে সে প্রাণীজগতের রাজা। কার্য্যাকার্য্যের উপর তাহার স্বাধীনতা না থাকিলে হিতাহিত জ্ঞান একথা আসিত না। ইতর প্রাণীরা আহার বিহার লইয়া ব্যতিব্যস্ত এবং উহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অধীন। কিন্তু ব্যক্তিগত কার্য্য জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রসূত। নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিগত কার্য্য লইয়া আলোচনা করে। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ব্যবহার নীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইলেও ইহা পশু পক্ষীর প্রতি সঙ্গত ব্যবহারের প্রতি উদাসীন নহে। বরং ক্রমশঃ এই বিষয় লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে।

আমরা মর্ত্ত্যের জীব। পদে পদে আমারদের বাধা পদে পদে বিঘ্ন। চারিদিকে আমারদের শত্রু। অন্তরে শত্রুদল বাহিরে শত্রুদল আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। সংসার পথের প্রতি পদবিক্ষেপে আমারদের বিপদের সম্ভাবনা। এরূপ ভয়ানক অবস্থায় পতিত হইয়া কি আমরা কোন ধ্রুবতারার উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইব না? অবস্থার দাস হইয়া কি রসাতলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব? আমারদের কি এখানে কোন সঙ্গী নাই, কোন হৃদয়বন্ধু নাই, যিনি বিপদের কাণ্ডারী হইয়া এই প্রবল তরঙ্গের মধ্যে মন-তরির হাল ধরিতে পারেন? যিনি কর্ত্তব্য পথে ন্যায় পথে আমাদিগকে বিচরণ করিবার উপদেশ দেন? ঐ যে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কে আমাদিগের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া আমাদিগকে সচকিত করেন? কে ন্যায় অন্যায়ের তৌলদণ্ড আমারদের সম্মুখে ধারণ করিয়া কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিতেছেন? কে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়া নির্জীব হৃদয়ে উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছেন? আমরা যেন এমন ইষ্টদাতা সদ্‌গুরুর পরামর্শ অবহেলা করিয়া উদ্দাম ভাবে সংসারে বিচরণ না করি। সকল অবস্থাতে সকল বিষয়ে সকল কার্য্যে এমন হিতৈষী বন্ধুর আদেশ পালনে দৃঢ়ব্রত হই। নীচ প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া একমাত্র হিতাহিত জ্ঞানের পরিচালনায় আপনাকে স্থাপন করি। অতুল প্রভাব নরপতি যেমন আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া দূরস্থ প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তেমনই সকল জগতের রাজা মনুষ্যদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানকে অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়া সকলকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা ন্যায়ের রাজ্যে পদচারণা করিতে গিয়া যেন সেই ন্যায়রাজ্যের রাজাকে বিস্মৃত না হই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ন্যায় স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে। ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিলে ন্যায়ের অর্থ থাকে। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

জগতের কর্ত্তাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে প্রীতি করিবার বিভিন্ন পথ থাকিলেও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই! পৃথিবীতে নানা প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত থাকিলেও তাঁহার অনুমোদিত প্রিয়কার্য্য সম্পাদন লইয়াই মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে এবং এই প্রিয়কার্য্য লইয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা পরস্পরকে প্রীতির আহ্বানে সম্ভাষণ করিতে

পারেন, প্রীতির বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করিতে পারেন, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন নীতি পথে পদচারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥১০॥

কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয়, একাকী জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানাভ্যন্তরে যাহাই কেন অবস্থিতি করুক না, তাহারই মধ্যে এমন একটি অবয়ব বর্ত্তমান থাকা চাই যাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কোন-ক্রমেই স্থান পাইতে পারে না। ইন্দ্রিয় স্বতঃ (অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন-কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে) কোন জ্ঞেয় বিষয়কে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় —অর্থের নহে—কেবল অনর্থেরই গ্রহণ-কর্ত্তা। যাহা অর্থ-শূন্য এবং স্ববিরোধী—ইন্দ্রিয় কেবল তাহাই আনিয়া জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করে।

প্রমাণ।

জ্ঞানের বিষয় যাহাই হউক না কেন —অহম্পদার্থ তাহারই একতম অবয়ব (সিদ্ধান্ত ॥১॥২॥৬॥ দেখ); কিন্তু অহম্পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে; অথবা যাহা একই কথা—অহম্পদার্থ ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া—উপলব্ধি-গম্য নহে (৮ সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

প্রমাণের গোড়া বাঁধুনি ॥ ১ ॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য যদিচ ইহার পূর্ব্বে উচ্চ অঙ্গের দার্শনিকদিগের মনে অস্ফুট-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, এমন কি তাহা লইয়া তাঁহারা বিরোধী পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পর্য্যন্ত পারৎপক্ষে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই উহার প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। উহা প্রমাণ করিতে হইলে অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি তত্ত্বের সংস্থাপন দ্বারা প্রমাণের গোড়া বাঁধুনি করা চাই;—প্রথমে এইটি সংস্থাপন করা চাই যে, যাবতীয় দ্রব্যক অবভাসের সঙ্গে সঙ্গে অনন্য একই কোন বস্তু, অথবা যাহা আরো ঠিক—অনন্য একই কোন জ্ঞানের অবয়ব, জ্ঞাত হওয়া চাই; তাহার পরে এইটি দেখানো চাই যে, সেই যে অনন্য একই অবয়ব তাহা ভৌতিক বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারে না। বর্ত্তমান স্থলে এই দুইটি তত্ত্বের অবলম্বন ব্যতিরেকে প্রমাণ এক পদও চলিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের সেই অনন্য একই অবয়বটি যে কি—একাল পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক তন্ত্রই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলে নাই; এ তো দূরের কথা—জ্ঞানের ওরূপ একটি ধ্রুব অবয়ব যে, আছে, এ বিষয়েও কেহ কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; এরূপ যখন—তখন জ্ঞানের সেই ধ্রুব অবয়বটি যে, ভৌতিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে, এ তো আরো দূরের কথা—এ কথাটির প্রমাণ পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রের নিকট হইতে প্রত্যাশা করাই ভুল। বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রমাণের যে দুইটি অলঙ্ঘনীয় সোপান-পংক্তি আমরা উপরে প্রদর্শন করিলাম, তাহা পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রেই নাই; পূর্ব্বতন কোন তন্ত্রে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যে, উল্লেখ মাত্রও নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না—তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ থাকিতে পারে—কিন্তু ঐ দুইটি অলঙ্ঘনীয় সোপান পংক্তি বিরহে প্রমাণের যে, বিন্দু-বিসর্গও তথায় থাকিতে পারে না, ইহা দেখিতেই

পাওয়া যাইতেছে। আবার, প্রমাণের ঐ দুইটি সোপান-পংক্তির একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি কোন কার্য্যেরই নহে ; প্রমাণের পক্ষে দুইটিই সমান অপরিহার্য্য। মনে কর যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইলাম যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-মাত্রেরই সঙ্গে আত্মাকে জানা চাই ; কিন্তু আত্মা নিজেই যদি ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া—জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য হয়, তবে এ কথার কোন আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না যে, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তেমনি আবার মনে কর যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইলাম যে, আত্মা ভৌতিক বলিয়া—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে ; কিন্তু তাহার সঙ্গে এটাও যদি না সত্য হয় যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলের সঙ্গে আত্মাকে না জানিলেই নয়—তাহা হইলেও এ কথার কোন অর্থ থাকে না যে, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু ঐ দুইটি অধিকরণই (অর্থাৎ প্রমাণের অলঙ্ঘনীয় সোপান-পংক্তি premise) আমাদের এখানকার ধ্রুব সিদ্ধান্ত —এখানে দুইটিই রীতি-মত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ধ্রুব-রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে ; এ-জন্যই বলি যে, দুয়ে মিলিয়া বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের একটি অকাট্য প্রমাণ—তদ্ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ নাই।

দশম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

"শুদ্ধ কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে—তদ্ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। যাহা কোন-না-কোন সময়ে ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাহাই কেবল জ্ঞানের অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে। একা কেবল ইন্দ্রিয়ই জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞানাভ্যন্তরে উপস্থিত করিতে পারে।" আমাদের চিরাভ্যস্ত আপামর-সাধারণ-সুলভ অশাস্ত্রীয় চিন্তার সহিত এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির খুবই মিল খায়।

লাইব্‌নিট্‌জের প্রতিষেধ-বাক্য ॥ ৬ ॥

লক্ নামক দর্শন-কারের একটি প্রসিদ্ধ বচন এই যে, "পূর্ব্বে যাহা ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে ছিল না—এরূপ কোন কিছুই জ্ঞানের অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না।" তাহার প্রত্যুত্তরে লাইব্‌নিট্‌জ্ বলিলেন—"জ্ঞান আপনি ব্যতীত" অর্থাৎ জ্ঞান নিজে ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। লাইব্‌নিট্‌জের এই কথাটির টীকা আবশ্যক। লাইব্‌নিট্‌জ্ যদি আমাদের ন্যায় বলিতেন যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সকলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আপনাকে আপনি জানিতেই চায়, আর যদি তিনি দেখাইতেন যে, জ্ঞান আপনাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, তবে তাহার উপর আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারিত না—হয় তো তাহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ; কিন্তু বাস্তবিকই যদি তাহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় হয়, তবে তাঁহার ভিতরের ভাবটি যেমন—তাঁহার কথাটি তাহার ঠিক্ উপযুক্ত হয় নাই। তিনি কেবল বলিতেছেন যে, জ্ঞান আপনি ভিন্ন আর-কোন-কিছুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ না হইয়া জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। এ কথাটিতে কিছু আর এরূপ বুঝায় না যে, জ্ঞান আপনাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, আর, এমনও বুঝায় না যে, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় একাকী জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। "জ্ঞান আপনার অভ্যন্তরে আপনি আছে" শুদ্ধ এই কথাটিতেই আমাদের

আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না; তাহার সম্বন্ধে আরো এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞান আপনার অভ্যন্তরে আপনি জ্ঞাত-সারে আছে কি অজ্ঞাত-সারে আছে? যদি বল যে, কখন বা জ্ঞাতসারে আছে—কখনও বা অজ্ঞাত-সারে আছে; তবে তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, বাহ্য-বস্তু-বিশেষ যখন আমার জ্ঞাত-সারে আমার জ্ঞানাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে তখন আমি আমার অজ্ঞাত-সারে আমার জ্ঞানাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছি—এরূপ হইবারও কোন বাধা নাই; এক কথায়—আপনাকে না জানিয়াও বাহ্য বস্তুকে জানিতে পারিবার কোন বাধা নাই; লাইব্‌নিট্‌জের কথার ফল তবে আর কি হইল?

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের আকার সম্বন্ধে টীকা ॥ ৪ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি সচরাচর যে আকারে প্রদর্শিত হয় তাহার ভাষা বড়ই গোলমেলে। আমরা উহাকে যেরূপ তীব্র আকারে প্রদর্শন করিয়াছি—তাহা আমরা বুঝিয়া সুঝিয়াই করিয়াছি; পাছে অর্থের কোন ইতস্ততঃ হয়—এ জন্যই আমরা তাহা করিয়াছি। আমাদের কথার সঙ্গে এবং তাহার অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। পরে প্রকাশ পাইবে যে, প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি এখানে যে আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহা আগা গোড়া সুসঙ্গত; কিন্তু সচরাচর তাহা যে আকারে প্রদর্শিত হয় তাহার আগা'র সহিত গোড়া'র মিল নাই। এ যাবৎকাল প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির তীব্রতা ঘুচাইয়া তাহাকে শোধন করিবার যত প্রকার চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে, তাহাতে লাভের মধ্যে কেবল—এক গুণ গোলমালকে দশ-গুণ করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে কতক-মতক সংশোধন করিয়া তাহাকে দোষ-মুক্ত করিবার কোন উপায় নাই—তাহাকে সমূলে নিপাত করা আবশ্যক; আর, তাহা যদি করিতে হয় তবে বর্ত্তমান দশম সিদ্ধান্তই তাহার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি শোধিত এবং অশোধিত উভয় অবস্থাতেই স্ববিরোধী ॥ ৫ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের দোষ শুদ্ধ কেবল তাহার এই কথাটিতেই আবদ্ধ নহে যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান; তদ্ব্যতীত, তাহার এ কথাটিও ভ্রমাত্মক যে, আমাদের একটিও-কোন জ্ঞান কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত কথাটি যেমন অসত্য এবং স্ববিরোধী, শেষোক্ত কথাটিও তেমনি অসত্য এবং স্ববিরোধী। কেন না এটি এখানকার স্থির-সিদ্ধান্ত যে, আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানেই এমন একটি উপাদান বর্ত্তমান থাকা চাই যাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আসিতে পারে না—কি? না অহম্পদার্থ। অতএব প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণই হউক্ আর সঙ্কীর্ণই হউক্—উভয়-স্থলেই তাহা স্ববিরোধী;—সমস্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে যদি তাহাকে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও তাহা স্ববিরোধী, আর, বিশেষ কোন-জাতীয় জ্ঞানের সম্বন্ধে যদি তাহাকে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেও তাহা স্ববিরোধী।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটিই ইন্দ্রিয়-বাদের বীজ-মন্ত্র ॥ ৬ ॥

এই যে একটি কথা যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার না মাড়াইয়া কোন কিছুই জ্ঞানাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাই ইন্দ্রিয়বাদের বীজ-মন্ত্র। "ইন্দ্রিয়-বাদ" এ শব্দটি প্রয়োগ করাতে ইন্দ্রিয়-বাদীর উপরে প্রকারান্তরে এরূপ দোষারোপ করা হইতেছে না যে, ইন্দ্রিয়-বাদী অন্যান্য ব্যক্তি

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়াসক্ত; "ইন্দ্রিয়-বাদী" বলিতে শুদ্ধ কেবল এই পর্য্যন্তই বুঝায় যে, তাঁহার মতানুসারে মনুষ্যের সমস্ত জ্ঞানই আপাদ মস্তক ইন্দ্রিয়-মূলক। ইন্দ্রিয়-বাদীরা কখনো কখনো এই একটি অসাধারণ গুণের জন্য আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করেন—এবং লোকের নিকটেও প্রতিপত্তি লাভ করেন যে, দার্শনিকদিগের মধ্যে তাঁহারাই কেবল পরীক্ষা-লব্ধ সত্যের উপরে জ্ঞানের মূল-পত্তন করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে,সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাই তাহাই করেন; তবে যদি কাণ্ট্‌কে ব্যতিরিক্তের কোটায় গণ্য করা যায়—সেই যা এক। কাণ্টের মতানুসারে, এক জাতীয় জ্ঞান বাহির হইতে আসিতেছে এবং আর-এক জাতীয় জ্ঞান ভিতর হইতে আসিতেছে; আর, এই দুই জাতীয় জ্ঞানের ভেদ নিরূপণ করিতে গিয়া কাণ্ট পূর্ব্বোক্তকেই (বহির্মূলক জ্ঞানকেই) কেবল পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান (experience) বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষা শব্দের এরূপ অর্থ-সংকোচ নিতান্তই স্বকপোল-কল্পিত ও অযৌক্তিক। যদি আমাদের মনোমধ্যে বাস্তবিকই কোন-প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান থাকে, তবে অবশ্য তাহার স্বতঃসিদ্ধতা আমরা পরীক্ষাতেই উপলব্ধি করি—তাহা কিছু-আর আমরা গায়ের জোরে মানিয়া লই না। প্রকৃত কথা এই যে, কি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—কি পরতঃসিদ্ধ জ্ঞান—সকল জ্ঞানই পরীক্ষা-লব্ধ। জ্ঞানকেই পরীক্ষা বলে, আর, পরীক্ষাকেই জ্ঞান বলে। বস্তু যাহা—তাহা একই; তবে কি না—তাহার একটি নাম "পরীক্ষা," আর-একটি নাম জ্ঞান, এই যা কেবল প্রভেদ। "সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষা-লব্ধ" এ কথার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে,সমস্ত জ্ঞানই জ্ঞান; এ তো ধরা কথা, ইহার উপরে আর কাহারো কোন বাদানুবাদ চলিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা যায় যে, সমস্ত জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা হইতে সমুদ্ভূত, তবে দাঁড়ায় এই যে, সমস্ত জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান,—এ কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এ কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়া গিয়াছে এবং এখনো চলিতেছে। এটি আমাদের প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তেরই কথা। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই—বর্ত্তমান দশম সিদ্ধান্ত উহাকে জ্ঞানের দুইটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী বলিয়া অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে—সুতরাং আর যে, কখনও উহা মাথা তুলিবে, সে পথ জন্মের মত বন্ধ হইয়া গেল।

অতীন্দ্রিয়-বাদী মনোবিজ্ঞান প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তি কমাইয়া দেয়—এই মাত্র, কিন্তু তাহার স্ববিরোধ অব্যাহত রাখিয়া দেয় ॥ ॥

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির স্ববক্তার বিরুদ্ধে মনোবিজ্ঞান অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সমস্ত চেষ্টা শুদ্ধ কেবল ঐ সিদ্ধান্তটির ব্যাপ্তি-সংকোচেই নিয়োজিত হইয়াছে; উহার ব্যাপ্তি—মনে কর যেন—অতীব সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল,তাহাতেই বা কি? তাহাতে তো আর উহার স্ববিরোধিতা ঘুচে না; কেন না ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, উহার ব্যাপক অর্থেও উহা যেমন স্ববিরোধী—উহার সঙ্কীর্ণ অর্থেও উহা তেমনি স্ববিরোধী; আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কেবল মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান—ইহা যেমন স্ববিরোধী, আমাদের কোন কোন জ্ঞান কেবল-মাত্র ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান—ইহাও তেমনি স্ববিরোধী। মনোবিজ্ঞানের কৃত ব্যাপ্তি-সংকোচ এইরূপ, যথা;—মনো-

বিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই যে, ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া আসে, এ কথা সত্য নহে; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, বিশেষ এক জাতীয় জ্ঞান শুদ্ধ কেবল ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইঁহাদের অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ উক্ত "বিশেষ এক জাতীয় জ্ঞানের" আংশিক উপাদান—ইঁহাদের মতে ঐ-জাতীয় জ্ঞানের সর্ব্বাংশই ঐন্দ্রিয়ক উপাদানে পরিগঠিত। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটির ব্যাপ্তিকে এইরূপে সীমাবদ্ধ করিলে কতক অংশে উহার প্রতিবাদ করা হয় বটে কিন্তু তেমনি আবার কতক অংশে উহাকে অনুমোদনও করা হয়; ইহাতে তাহার স্ববিরোধিতার তিলমাত্রও উপশম হয় না।

সকল রোগের মূল ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয় এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুব্যবস্থা এবং সুগতির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়; এখনকার দর্শনকারেরা সেই প্রভেদটিকে একেবারেই উড়াইয়া দেন—ইহাই সমস্ত রোগের মূল। তত্ত্ব-জ্ঞানক্ষেত্রে দ্বিতীয় এমন একটি গুরুতর প্রভেদ নিরূপিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই জন্য প্রভেদটির কালে কালে যেরূপ ভাল মন্দ গতি ঘটিয়াছে ও তাহাকে গোলে ফেলা'তে যেরূপ নানা প্রকার জটিল তর্কবিতর্কের তুমুল কোলাহল দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি ইতিবৃত্ত এখানকার স্থানোচিত; বিশেষত যখন—সমস্ত দার্শনিক টীকা ও ভায্যের মূল-সূত্র বাহির করিয়া দেখানো বর্ত্তমান সংহিতার প্রধান একটি সংকল্প।

গ্রীস্ দেশীয় দর্শনকারদিগের উদ্দেশ্য এবং তাহার সাধন প্রণালী ॥ ৯ ॥

ইতি পূর্ব্বে আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে, গ্রীস্ দেশীয় প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্র যে অংশে জ্ঞান-তত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত সে অংশে এইটি বুঝানোই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, অবিদ্যা কিরূপে বিদ্যাতে পরিণত হয়—অজ্ঞেয় কি প্রণালীতে জ্ঞেয়ত্ব প্রাপ্ত হয়—যাহা কোনক্রমেই বোধায়ত্ত হইবার নহে তাহা কিরূপ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া বোধগম্য পদবীতে সমুত্থান করে। এইজন্য যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগম্য—বুদ্ধির অতীত—তাহাই উক্ত দর্শন-শাস্ত্রের যাত্রারম্ভের প্রথম পইটা ছিল, তাহা কি? না অবিদ্যা—স্ববিরোধী অর্থ-শূন্য অবিদ্যা। এরূপ যদি মনে করা যায় যে, যাহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞেয় হইয়া বসিয়া আছে তাহা কিরূপে জ্ঞেয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ইহারই প্রণালী প্রদর্শন করা উক্ত দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, তবে নিতান্তই ভুল মনে করা হয়; কেননা, শুধু শুধু ওরূপ একটা বৃথা কর্ম্ম-ভোগে ব্যাপৃত হওয়া এখনকার কালেরই ধর্ম্ম। প্রাচীন-দর্শন-শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আর কিছু নয়—স্ববিরোধী কেমন করিয়া—অর্থাৎ কিরূপ পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া—জ্ঞানের গম্য হয়, সংক্ষেপে—অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া তাহা কিরূপে বিদ্যাতে পরিণত হয়, এইটি বুঝানো; আর, তাহার কার্য্য-পদ্ধতি ছিল এইরূপ, যথা;—উক্ত দর্শন-শাস্ত্র বলে যে, ইন্দ্রিয় কেবল অবিদ্যারই গ্রহণ-কর্ত্তা—ইন্দ্রিয়ের অর্থই হ'চ্চে অনর্থ। অবিদ্যা, অর্থাৎ একটা স্ববিরোধী ব্যাপার, সহজ কথায়—একটা পাগ্‌লামি কাণ্ড। ইন্দ্রিয়—জ্ঞান-বহির্ভূত জড়-জগৎকে আঁকড়িয়া ধরে; এরূপ অঙ্গহীন জড়জগৎ একটা স্ববিরোধী অর্থ-শূন্য পাগ্‌লামি কাণ্ড বই আর কিছুই নহে—উহা কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-

গম্য নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সেই যে, অনর্থ-জগৎ—পাগলামি কাণ্ড—অবিদ্যা, তাহা কিরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত সত্যে—বিদ্যাতে—পরিণত হয়? প্রাচীন দর্শনকারেরা ইহার মীমাংসা এইরূপ করেন যে, জ্ঞান তাহার আপনার ভাণ্ডার হইতে অঙ্গহীন জড়-জগতের অভাব পূরণ করিয়া অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে; জ্ঞানের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য লাভ করিয়াই—জড়জগৎ অবিদ্যার নিশা হইতে বিদ্যার (অর্থাৎ সমীচীন জ্ঞানের) দিবালোকে সমুত্থান করে। কিন্তু যাহা দিয়া জ্ঞান অঙ্গহীন জড়জগতের অঙ্গ-পূরণ করে তাহা যে, কি, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা তাহা স্থির করিয়া ওঠা তেমন সহজ পা'ন নাই।

ইতিহাস লেখকের অবলম্বনীয় একটি নিয়ম ॥ ১০ ॥

দার্শনিক মতামতের ইতিহাসের আন্দোলন-কালে, সুস্পষ্ট এবং সন্তোষ-জনক ফল-লাভ করিবার এক যাহা উপায় তাহা এই;—প্রথমে, দর্শনকারের সমুদায় কথাগুলির মোট তাৎপর্য্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাই তাঁহার আয়ের কোটায় নিক্ষেপ করা, এবং তাহার পরে তাঁহার দ্ব্যর্থ-সূচক অস্পষ্ট উক্তি সকলকে ব্যয়ের কোটায় নিক্ষেপ করা। ফলে, প্রথমে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়টিকে এই-ভাবে দেখা উচিত যে, যেন তিনি তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন; এবং তাহার পরে তখন বিবেচ্য যে, বিভ্রান্তির গতিকে তিনি তাঁহার অভীষ্ট ফল-লাভে কতদূর বঞ্চিত হইয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রের সুবিচার-সঙ্গত ইতিহাস লিখিতে হইলে এইরূপ প্রণালীর অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেননা, দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্যমে তাহা অতীব অপক্ক এবং অস্পষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ হইবারই কথা; কাজেই, শুদ্ধ কেবল তাহা দৃষ্টে দর্শন-কারের প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা অসম্ভব। দার্শনিক মতামতের ইতিহাস-লেখকেরা সচরাচর যেরূপ অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থসূচক মত-সকলকে তথৈব অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থসূচক বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন তাহাতে কোন ফলই দর্শে না।

বর্ত্তমান সংহিতায় এই প্রণালীটি অবলম্বিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

এটুকু যখন আমরা বুঝিয়াছি, তখন আমাদের কর্ত্তব্য এখন এই যে, এখানকার আলোচ্য দার্শনিক মতটিকে আমরা অতীব সুস্পষ্ট আকারে প্রদর্শন করি, আর, আপাতত এইরূপ মনে করি—যেন সেইরূপ আকারেই তাহা গ্রীস্ দেশীয় প্রাচীন দার্শনিকদিগের লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছিল; কেননা, ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ মতটি বাস্তবিকই তাঁহাদেরই মত—তবে কি না—উহাতে তাঁহারা স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দ্ব্যর্থ-ভাব এবং সেই দ্ব্যর্থ-ভাবের ফল যাহা পরপরবর্ত্তী দার্শনিক আলোচনা-ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ফলিত হইয়াছে, তাহা যখন আমরা বাহির করিয়া দেখাইব, তখন কোন্ বিষয়ে উঁহাদের ন্যূনতা ছিল তাহা ধরা পড়িতে বাকি থাকিবে না।

ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের প্রভেদের ইতিহাসে প্রত্যাবর্ত্তন ॥ ১২ ॥

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা প্রভেদের পরাকাষ্ঠা। এ নহে যে,

তাঁহারা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান এ দুইটি ব্যাপারকে অন্তঃকরণের দুইটি সহোদর বৃত্তি ঠাহরিয়াছিলেন; তাঁহাদের অবধারিত প্রভেদ আরো ব্যাপক এবং তল-স্পর্শী। বরং তাঁহারা ও দুইটি ব্যাপারকে একই মনোবৃত্তির দুইটি বিপরীত পৃষ্ঠ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় অবিদ্যাকে ধরিয়া আনিয়া জ্ঞানের সমক্ষে উপস্থিত করে, আর, জ্ঞান সেই অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে। ঐন্দ্রিয়ক উপাদান-গুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান-কর্তৃক শোধিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে-গুলি অবিদ্যাবস্থায় (অর্থাৎ স্ববিরোধী অবস্থায়) বর্ত্তমান থাকে। সে অবস্থায় সে-গুলি একান্ত পক্ষেই জ্ঞানের অগম্য। পরে যখন জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়া আপনার ভিতর হইতে আর-একটি উপাদান বাহির করিয়া সে-গুলির গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেয় তখনই সে-গুলি জ্ঞানের গম্য হয়। এই অতিরিক্ত উপাদানটির সাহায্যেই জ্ঞানের বিষয়-সকল জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রদত্ত অবিদ্যা-উপাদান, এবং জ্ঞানের প্রদত্ত অতিরিক্ত আর-একটি উপাদান, এ দুই উপাদান এক সঙ্গে জানার গতিকেই জ্ঞান আপনার বিষয়-রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই প্রণালী অনুসারেই ইন্দ্রিয়ের স্ববিরোধী বস্তু-সকল জ্ঞানের বিজ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত হয়; এই প্রণালীটির কার্য্য যতক্ষণ না পরিসমাপ্তি হয় ততক্ষণ তাহা জ্ঞানে ধরা পড়ে না বটে—কিন্তু পরে তাহা দার্শনিক চিন্তাতে সুব্যক্ত আকারে প্রতিভাত হয়। মনুষ্যের জ্ঞান-সমক্ষে জড়জগতের যেরূপ চাঁচা-চোঁচা পরিষ্কার মূর্ত্তি সুপরিস্ফুট হয়, তাহা ঐ প্রণালী-অনুসারেই হইয়া থাকে। জড়জগৎ যে অংশে জ্ঞানগম্য এবং ধ্যান-গম্য সে অংশে তাহাতে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নাই, কেবল যে অংশে তাহা জ্ঞানের অগম্য এবং স্ববিরোধী সেই অংশেই ইন্দ্রিয় তাহা লইয়া ব্যাপৃত হয়। এইটিই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম-নিহিত অভিপ্রায় ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জ্ঞানের যাহা কার্য্য তাহা জ্ঞানই করিতে পারে—ইন্দ্রিয় তাহা কোন অংশেই পারে না: ইন্দ্রিয় নিছক স্ববিরোধী ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকে। কাজেই—স্ববিরোধিতার ভঞ্জন-কার্য্যেও ইন্দ্রিয়ের কোন হস্ত নাই, আর, স্ববিরোধিতা অপগত হইলেও বিরোধ-মুক্ত বিষয়ের উপলব্ধি কার্য্যেও তাহার কোন হস্ত নাই। স্ববিরোধী বিষয়-সকলকে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করাই ইন্দ্রিয়ের একমাত্র কার্য্য; আর, তাহা জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হইলেও জ্ঞান যতক্ষণ না আপনাকে তাহার সঙ্গে একত্র উপলব্ধি করে ততক্ষণ তাহার বিরোধ-ভঞ্জন হয় না সুতরাং ততক্ষণ তাহা জ্ঞানের উপলব্ধি-যোগ্য হয় না।

প্রাচীন মত-সম্বন্ধে একটি উপমা॥ ১১॥

এখানকার এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তাহা নিম্ন-লিখিত উপমা-দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে:—মনে কর যেন স্ববিরোধী অবিদ্যা কিছু-না অপেক্ষা (০ অপেক্ষা) অধিক, কিন্তু একটা-না-একটা কিছু অপেক্ষা (১ অপেক্ষা) কম। কিন্তু সেই যে অবিদ্যা—যাহা শূন্যও নয়, একও নয়, তাহা কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে; কেননা জ্ঞানে যাহা উপলব্ধি-গম্য, হয়—তাহা একটা-না-একটা কিছু, (যেমন আলোক); নয়—তাহা একটা-না-একটা কিছুর অভাব (যেমন অন্ধকার—নিস্তব্ধতা ইত্যাদি), সাঙ্কেতিক ভাষায়—হয় তাহা ১, নয় তাহা ০, ইহার অন্যথায় কোন-কিছুই জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে

না। এইটিই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞদিগের মন্তব্য কথা ; কি ? না, জড়জগৎকে যদি জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত বলিয়া ভাবা যায়, তবে সমস্ত জড়জগৎই এইরূপ দাঁড়ায় যে, তাহা শূন্যও নয়, একও নয়, কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি একটা অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার। জড়বস্তুর স্বরূপ (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-চ্যুত জড়বস্তু স্বয়ং) শূন্য অপেক্ষা অধিক অথচ এক-অপেক্ষা (অর্থাৎ একটা-কোন-কিছু অপেক্ষা) কম। কিন্তু এ তো একটা অর্থ-শূন্য স্ববিরোধী ব্যাপার। বটেই তো ;—উহা যদি অর্থশূন্য না হইবে, তবে প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা উহাকে অর্থবত্তায় উত্তোলন করিবার জন্য এত যে আয়াস পাইয়াছেন—তাহা কি শুদ্ধ কেবল তেলা-মাথায় তেল দিবার জন্য ! কেননা, অগ্রে অর্থ-শূন্য সামগ্রী হস্ত-গত হইলে তবে তো তাহাকে অর্থবান্ করিয়া গড়িয়া তোলা—একটা কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। মৃত্তিকা হইতে ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে মৃত্তিকার যোগাড় করা চাই তো। এইজন্য প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সমস্ত জড়জগৎ—অর্থশূন্য এবং স্ববিরোধী। কিন্তু অর্থ-শূন্য সামগ্রী জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, ঠিক্ই বটে—তাহা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই এই যে, তাহা সেই অর্থ-শূন্য অবিদ্যাকে গ্রহণ করে—এবং তাহাকে জ্ঞানের হস্তে সঁপিয়া দেয় ; জ্ঞান তখন আপনার মাল্ মস্লা তাহাতে সংযোগ করিয়া তাহাকে অর্থ-বিশিষ্ট জ্ঞেয়-বস্তু করিয়া গড়িয়া তোলে—অবিদ্যাকে বিদ্যাতে পরিণত করে, যাহা এক অপেক্ষা কম (মনে কর যেন অর্দ্ধাংশ) তাহাতে অবশিষ্ট অংশ সংযোগ করিয়া তাহাকে একে পরিণত করে। ঐন্দ্রিয়ক জগৎকে জ্ঞান-গম্য করিয়া তুলিবার জন্য যাহা আবশ্যক—জ্ঞান তাহা নিজের ভাণ্ডার হইতেই যোগাইয়া দেয় ; এইরূপে জ্ঞান স্ববিরোধী অবিদ্যাকে আপন অধিকারাভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া বিদ্যাতে পরিণত করে।

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা এ যাহা করিয়াছেন তাহা ঠিক্ই করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

প্রাচীন দর্শন-কারেরা যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত প্রশ্নটির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে, প্রকৃত প্রণালী অনুসারে তাহার মীমাংসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অবোধ্যকে বোধ্য করিয়া গড়িয়া তোলা—এইটি কিরূপে হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের অন্বেষণের বিষয় ছিল ; তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য প্রশ্নটিকে নানা আকারে দাঁড় করানো যাইতে পারে কিন্তু তাঁহারা তাহাকে খুব একটি ভাল আকারে দাড় করাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের কার্য্য ছিল এই যে, সেই যে, একটা অবোধ্য এবং স্ববিরোধী ব্যাপার—তাহা যে, বস্তুটা কি, তাহা স্থির করা ; কারণ, যদি অবোধ্য না থাকে, অথবা তাহাকে যদি খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তবে সেই খানেই উক্ত প্রশ্ন এবং মীমাংসা উভয়েরই প্রাণ ত্যাগ হয়। এইরূপ বিবেচনায় তাঁহারা জড়বস্তুর স্বরূপকে স্ববিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি এই স্ববিরোধীকে অবিরোধী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে তাহাকে কোন-না-কোন প্রকারে জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক। এই জন্য অতঃপর তাঁহাদের কার্য্য ছিল এই—কি উপায়ে সেইটি সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহা অবধারণ

করা। তাঁহাদের মতে সে উপায়—ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই হ'চ্চে—ঐকান্তিক অবোধ্য ব্যাপারকে—অবিদ্যাকে—আনিয়া জ্ঞানের হস্তে সঁপিয়া দেওয়া। এইরূপ, জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভেদের পুরারম্ভ অনুসন্ধান করিয়া আমরা পাইতেছি যে, প্রাচীন দর্শনের মীমাংস্য প্রশ্নের আকার প্রকার এবং তাহার মীমাংসা কার্য্যের প্রণালী-পদ্ধতি দুইই এ বিষয়ে একবাক্য যে,'ইন্দ্রিয় ঐকান্তিক অবোধ্য-রূপী অবিদ্যারই গ্রাহক; আর, এ মতটির সহিত বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন দর্শনকারেরা ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ নির্দেশ করিয়াছেন—তাহা যেমন-তেমন প্রভেদ নহে, তাহা স্বরূপ-গত এবং মূল-গত প্রভেদ।

কেন যে এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সহসা প্রতীয়মান হয় না তাহার কারণ নির্দেশ। ১৫॥

কেন যে, এই সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য বলিবামাত্রই লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহার কারণ আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল এই যে, বাস্তবিক ধরিতে গেলে যদিচ আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করি,কিন্তু আমরা মনে করি—যেন আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া অপর কোন-কিছুই উপলব্ধি করিতেছি না; অন্ততঃ আমাদের আটপহুরিয়া মনের দশা ঐরূপ। এই জন্য আমরা মনে করি যে ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞান-সমক্ষে অবোধ্য সামগ্রী উপস্থিত করে না—বোধ্য সামগ্রীই উপস্থিত করে। এটা তখন আমাদের মনে থাকে না যে, জ্ঞানের গুণেই বস্তু-সকল বোধ্য হয়—ইন্দ্রিয়ের গুণে নহে। বোধ্য বস্তু হইতে যদি জ্ঞানকে টানিয়া লওয়া যায় তবে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে ঐকান্তিক অবোধ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কেননা জ্ঞানের প্রকৃতিই এই—শুদ্ধ কেবল আমার জ্ঞানের বা তোমার জ্ঞানের নহে কিন্তু জ্ঞান-মাত্রেরই প্রকৃতি এই—যে, তাহা আপনাকে না জানিয়া কোন বস্তুকেই জানিতে পারে না। এ কথা যদি সত্য হয় যে, নিকৃষ্ট জীবেরা আপনাকে আপনি জানে না (ইহা খুবই সম্ভব যদিচ এ বিষয়ে এখানে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাই না) তাহা হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও তাহারা অর্থশূন্যতা মূর্ত্তিমান, আর, নিছক্ অবিদ্যার প্রতিই তাহারা অষ্ট প্রহর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহে।

জ্ঞান কি দিয়া অবোধ্যকে বোধ্য করিয়া তুলে এইটিই কঠিন প্রশ্ন॥ ১৬॥

প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞানের ঐন্দ্রিয়ক অবয়বটির সম্বন্ধে এইরূপ তো স্থির করিলেন যে, তাহা স্ববিরোধী অর্থশূন্য অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু জ্ঞানের অপর অবয়বটি যে, কি, অতীন্দ্রিয় অবয়বটি যে, কি—যাহার সংস্পর্শ-মাত্রে অবিদ্যার আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান স্ববিরোধী এবং অর্থশূন্য জগৎ সৌন্দর্য্য সুশৃঙ্খলা এবং জ্ঞানের আলোকে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে তাহাই বা কি, আর, তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ, তাহা স্থির করিতে তাঁহাদিগকে অধিকতর আয়াস পাইতে হইয়াছিল। পিথাগোরাসের মত এই যে, সংখ্যা—যাহা জ্ঞানের একটি নিজের প্রদত্ত সামগ্রী, তাহারই প্রসাদে ঐরূপ সুপরিণাম সংঘটিত হয়। প্লেটো বলেন—মৌলিক ভাব-সকলের গুণেই ঐরূপ হয়। বর্ত্তমান সংহিতার মতানুসারে, বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের স্ফুরণ বশতই ঐরূপ হয়।

আত্মজ্ঞানই অন্ধকারের আলোক—স্ববিরোধী বিবাদ-বিসম্বাদের প্রশামক,বিভ্রান্তকারী অব্যবস্থার ব্যবস্থাপক—একত্ব এবং অনেকত্ব উভয়েরই মূল; এইটিই সেই অমূল্য স্পর্শমণি যাহার গুণে অবিদ্যা বিদ্যাতে পরিণত হয়। উপরে যে তিনটি মতের উল্লেখ করা হইল পিথাগোরাসের মত—প্লেটোর মত—ও আমাদের এখানকার মত, তিনই এই বিষয়টিতে একবাক্য যে,উক্ত অতীন্দ্রিয় অবয়বটি জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক বৃত্তি—ঐন্দ্রিয়ক অবয়ব-গুলি জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি; কেবল সেই সার্ব্বভৌমিক বৃত্তিটি যে, কি, ইহা লইয়াই তিনের মধ্যে যত কিছু মত-ভেদ; পিথাগোরাসের মতে তাহা সংখ্যা,প্লেটোর মতে তাহা মৌলিক ভাব, আমাদের মতে তাহা আত্মজ্ঞান।

মৌন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রে আছে

"মৌনান্নস মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
স্বলক্ষণন্তু যোবেদ স মুনিশ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

মৌন প্রযুক্তও লোকে মুনি হয় না, অরণ্যবাস প্রযুক্তও লোকে মুনি হয় না; যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই মুনিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে এই যে, মৌনব্রত শুদ্ধ কেবল একটি উপলক্ষ মাত্র; আপনার লক্ষণ জ্ঞাত হওয়াই তাহার প্রকৃত লক্ষ। আপনার লক্ষণ আপনার নিকট হইতেই জানিবার কথা, অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া শিখিবার কথা নহে। যাহা অন্যের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, তাহারই জন্য ভাষা-ব্যবহার আবশ্যক; কিন্তু যাহা আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, তাহার জন্য ভাষা ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাক্য এমনি আমাদের মুখস্থ যে, যখন আমরা মনোমধ্যে কোন একটি বিষয়ের তোলা পাড়া করি, তখনও আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা করিতে পারি না। অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকি না, আমরা আপনার সঙ্গেও বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা যখন আপনার সঙ্গে আপনি পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন তাহার মধ্যেও আবার বাক্যের আড়াল কেন? আপনার মনের ভাব অন্যকে বুঝাইতে হইলে অথবা অন্যের মনের ভাব আপনি বুঝিতে হইলে, বাক্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হইতে পারে না—ইহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু আপনার নিকট হইতে আপনার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে বাক্য উচ্চারণে কি লাভ? লাভ দূরে থাকুক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে—শেষোক্ত স্থলে বাক্য অভীষ্ট সাধনের অনুকূল তত নহে যত প্রতিকূল। অনেক সময়ে আমরা বাক্যের মোহিনী শক্তিতে এমনি অথর্ব্ব বনিয়া যাই যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্মের ভিতরে যে, একটু স্থির চিত্তে তলাইয়া দেখিব, সে শক্তি আমাদের ত্রিসীমা হইতে পলায়ন করে। মনে কর যে, আমাকে লক্ষ করিয়া চতুর্দ্দিকের সংবাদ পত্র হইতে এই একটি মোহিনী বাণী উত্থিত হইল যে, অমুক ব্যক্তি অসামান্য জ্ঞানী; অমনি, আমার মনোমধ্যে "আমি জ্ঞানী আমি জ্ঞানী" এই কথাটিই ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল;শুদ্ধ কেবল ঐকথাটি মনোমধ্যে চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়া আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি—তাহার অর্থ

যে, কি, সে দিকে আমার ভ্রুক্ষেপ মাত্রও নাই; তখন আমি সেই ধ্বনি-টা'র তোড়ের মুখে এমনি সবেগে ভাসিয়া চলিয়াছি যে, একটু যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিব যে "লোকে আমার অসামান্য জ্ঞান ঘোষণা করিতেছে বটে, কিন্তু আমার নিজের জ্ঞান তো আমার নিজের অগোচর নহে—আমার জ্ঞান যে, কতটুকু, তাহা আমি নিজেই কেন একবার অন্তরে চক্ষু মেলিয়া দেখি না?" এ কথা যে, বলিব, এ বোধ তখন আমার মূলেই নাই। তখন "জ্ঞানী" এই শব্দটাতেই আমার জ্ঞান-স্পৃহা সম্যক্ চরিতার্থ হইতেছে - জ্ঞান অন্বেষণের আবশ্যকতাই মনে হইতেছে না। "জ্ঞান" এই শব্দটিকে ছাড়িয়া দিয়া আমার জ্ঞান যে, বাস্তবিক কি প্রকার, তাহার প্রতি যদি আমি প্রণিধান করি, তাহা হইলে আমি আপনার লক্ষণের পরিচয় লাভ করি—কিন্তু তাহা করিতে আমার অবকাশও নাই—রুচিও নাই—প্রবৃত্তিও নাই; "আমার জ্ঞানের তুলনা নাই" এই অর্থহীন শব্দ-মাত্রেই আমি স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইতেছি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আত্ম-লক্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে আপাততঃ বাক্যকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া যথার্থ সত্যের প্রতি তদ্গত ভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বাইবেলের একটি প্রসিদ্ধ বচন এই যে, "Letter killeth but spirit giveth life" বাক্য বধ করে (অর্থাৎ কার্য্য নষ্ট করে), কিন্তু ভাব জীবন দান করে (অর্থাৎ কার্য্য-সামর্থ্য প্রদান করে)। সুবিখ্যাত ইংরাজি সাহিত্যকার গোল্ড্স্মিথ্ একস্থানে বলিয়াছেন যে, বাক্যের ব্যবহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তত নহে—যত মনের ভাব গোপন করিবার জন্য। মিথ্যা নহে—একজন নিতান্ত মূর্খ চাসাও ভদ্র সমাজে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া সাধুভাষাকে মুচড়াইয়া কত না বিকলাঙ্গ করিয়া তুলে। আমাদের দেশের একজন অতীব সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী সংবাদ পত্রের সম্পাদক স্বকার্য্যে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া এমন একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন—যাহার তিনি ক অক্ষরও জানেন না; তিনি কাণ্টের দর্শন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অনভিজ্ঞ লোকের নিকটে আপনার দার্শনিকতার পরিচয় না দিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। ভদ্রসমাজে আমরা এইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা কহি যে, আমরা যাহার কিছুই জানি না—তাহা যেন আমাদের বিলক্ষণই জানা আছে। এইরূপে অন্যের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে করিতে অবশেষে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি দিয়া বসি; আমরা যাহা মূলেই জানি না—আমরা মনে করি যেন সত্য-সত্যই আমরা তাহা জানি। এই সকল বাক্য-দোষ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই আমাদের দেশের বিশেষ এক শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌন ব্রতের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, বোবা হইয়া বসিয়া থাকাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। নিদ্রা যাওয়াই কিছু আর নিদ্রার উদ্দেশ্য নহে—জাগ্রৎকালের শারীরিক স্ফূর্ত্তি-বর্দ্ধনই নিদ্রার চরম উদ্দেশ্য; মৌন ব্রতই কিছু আর মৌনব্রতের উদ্দেশ্য নহে—মনের সহিত বাক্যের ঐক্য সংস্থাপনই মৌনব্রতের চরম উদ্দেশ্য। কথায় বলে যে, "আটেপিটে দড় তো ঘোড়ার উপর চড়," ঘোড়ায় চড়িতে গেলে তাহার পূর্ব্বে আটে পিটে দড় হওয়া চাই। বাক্য অশ্ব, আর, মন অশ্বারোহী; এই অশ্বকে

রীতিমত চালনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে মনকে কতককাল ধরিয়া সত্যের হস্তে পরিগঠিত হওয়া আবশ্যক।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

সেই পরমাত্মাকেই জানো, অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর, ইনিই অমৃতের সেতু। সমস্ত বাক্য পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে মনকে তদ্গত ভাবে নিবিষ্ট করিতে শিক্ষা করাই মৌন ব্রতের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আমরা আমাদের আপনার লক্ষণ অন্যের নিকটে শিক্ষা করিতে যাই। কাহারো নিকটে শুনি যে, তোমার মস্তকের ভিতরে যে মস্তিষ্ক আছে—সেই মস্তিষ্কই তুমি; ইহাতে হয় কেবল এই যে, কতক কাল ধরিয়া "মস্তিষ্ক—মস্তিষ্ক—মস্তিষ্ক" এই একটা শব্দ আমাদের মনোমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে; ক্রমে আমরা আমাদের মনকে গড়িয়া পিটিয়া এইরূপ করিয়া দাঁড় করাই যে, মস্তিষ্ক এই শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের মনে হয় যে, এই তো আমি—এ ছাড়া আর তো কিছুই দেখি না; ইহাতে আমরা আপনার লক্ষণেরও পরিচয় পাই না, মস্তিষ্কের লক্ষণেরও পরিচয় পাই না, শুদ্ধ কেবল "মস্তিষ্ক" এই শব্দটিকে অহং-শব্দের স্থলাভিষিক্ত করি—এই পর্য্যন্তই সার। কাহারো নিকট শুনি যে, তোমার শরীরের সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া যে একটি সাধারণ অবস্থা—তাহাই তুমি। কিন্তু সাধারণ অবস্থা একটা শব্দ-মাত্র—তাহা যে, কি, তাহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইত্যাদি। আমরা এটা বুঝি না যে, আমাদের গোড়াতেই ভুল—অন্যের নিকটে আপনার লক্ষণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে যাওয়াটাই ভুল। আপনার লক্ষণের পরিচয় পাইতে হইলে মন হইতে মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমস্ত বাক্য সমূলে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলাই উচিত—বাক্য হইতে মনকে একেবারেই অবসৃত করিয়া তাহাকে আপনার অভ্যন্তরে তদ্গত ভাবে নিবিষ্ট করাই উচিত; কেন না, Letter killeth but spirit giveth life বাক্য হানি-জনক—আত্মা জীবন-প্রদ। এই প্রণালী অনুসারেই আমরা আপনার লক্ষণ অবগত হইতে পারি; ইহাতে করিয়া—আমরা যে, বস্তুটা কি, তাহা আমাদের অন্তশ্চক্ষে ধরা পড়ে; আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমরা চৈতন্যরূপী আত্মা। আমাদের লক্ষ যে, কি, তাহাও আমাদের অন্তশ্চক্ষে ধরা পড়ে; আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানের প্রয়াসী—প্রেমের প্রয়াসী—মঙ্গলের প্রয়াসী। আমাদের অপূর্ণতাও আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে;—আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যতটা জ্ঞান প্রেম এবং মঙ্গল প্রয়োজন তাহার কিছুই আমাদের নাই বলিলেই হয়—যাহা আছে তাহা অতীব যৎসামান্য। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের লক্ষ পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রতি—পরিপূর্ণ আনন্দের প্রতি—পরিপূর্ণ মঙ্গলের প্রতি নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাই অল্প কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। পরাধীন ব্যক্তি যেমন স্বাধীন ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, সেইরূপ অপূর্ণ সত্য পূর্ণ সত্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে; সাবলম্ব সত্য নিরালম্ব সত্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। অপূর্ণ সত্য সত্যের প্রতিরূপ মাত্র পূর্ণ সত্যই সত্যের স্বরূপ। কিন্তু প্রতিরূপ বলিবা-মাত্রই বুঝায় যে, তাহা স্বরূপেরই প্রতিরূপ; প্রতিরূপের মূলে—প্রতিরূপের অন্তরে—প্রতিরূপের সঙ্গে সঙ্গে—স্বরূপের বিদ্যমানতা একান্তপক্ষেই অপরিহার্য্য। এই সূত্রেই আমরা আমাদের জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞান-স্বরূপকে—প্রেমের অভ্যন্তরে আনন্দ-স্বরূপকে—মঙ্গল ইচ্ছার অভ্যন্তরে মঙ্গল স্বরূপকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি; এই নিগূঢ় বন্ধন-সূত্রেই আমরা অপূর্ণ আত্মার অভ্যন্তরে পরাৎপর পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া—আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার অটল আশ্রয়কে প্রাপ্ত হইয়া—অপার তৃপ্তিসাগরে নিমগ্ন হই।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৩ সংখ্যা　　১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সঙ্গীত।

বেহাগ—তাল একতালা।

১

এ ঘোর আঁধারে, বিজন কন্দরে, এ-
কাকী এ কোন্ যোগী।
নীরব প্রকৃতি, না হেরি আকৃতি, নাহি
জাগে রোগী ভোগী।
গভীরতা যেন পেয়েছে চেতন, ঘো-
ষিছে চৌদিকে নিশান আপন,
আকার ছাড়িয়া, রয়েছে বসিয়া, মহা-
শূন্যে প্রাণ জাগি।
কি তপ প্রভাবে জ্বলে দীপ শিখা!
অসীম সুন্দর আছে তায় লেখা,
মুগধ পরাণ, যতি এক-ধ্যান, এক
প্রেমে অনুরাগী।

২

কীর্ত্তন ভাঙ্গা যাত্রার সুর।

দেশের ছেলে দেশে যাব এই আনন্দ
আস্‌ছে মনে,
(সে দেশ স্বদেশ আমার—বাপের বাড়ী)
সেই বাপের বাড়ী নৃত্য করি বেড়াইব
বাপের সনে।
এ দেশের কাজ হলো সারা ভাঙ্গলো
এ ঘর কাল-তুফানে,
(এদেশ কালে গড়ে, কালে ভাঙ্গে, কালের
অধীন এ)
স্বদেশ সে নহে এ ভব,
নিত্য সেথাকার বিভব,
মৃত্যু সেথা পরাভব অমৃত সত্য শাসনে;
সেথা চাইলে আমি সকল পাব,
পিতার প্রেমে পুলোকিত রব,
এখন এ ভাঙ্গায় আর নাই প্রয়োজন
করবো রতি উন্নবীনে।

মানবীকরণই বটে।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা অতি দীর্ঘকাল পরে আমাদের প্রতিশ্রুত প্রস্তাব লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি। এত বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণও ছিল। আমরা বিষয় কার্য্য এবং পারিবারিক পীড়া নিবন্ধন এত ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ইতিপূর্ব্বে আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের প্রতিবাদগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারি

নাই। সম্প্রতি কিছু অবকাশ হওয়াতে আমাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের আলোচনা করিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু সর্ব্ব প্রথমেই বলেন যে, "যাঁহারা বাস্তবিক মনে করেন যে, ঈশ্বর চেতন পদার্থও নহেন—অচেতন পদার্থও নহেন, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ তাঁহাদের মনের কথা তাঁহারাই জানেন। ইত্যাদি।" এই স্থলে দ্বিজেন্দ্র বাবু যে, কেবল "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন"—এই কথার অর্থ "ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ" করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, তিনি ডাঃ ড্রিস্‌ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দ্বিজেন্দ্র বাবু এই স্থলে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া ঝগড়া করিয়াছেন! আমরা জিজ্ঞাসা করি "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন"—এই কথার অর্থ কি "ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?" যদি আমি বলি যে, আমার হস্তের কলমটী উষ্ণও নহে এবং শীতলও নহে তাহা হইলে কি দ্বিজেন্দ্র বাবু এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে, আমার হস্তে একটী উষ্ণ শীতল কলম আছে?

[প্রভাত বাবুর হস্তের কলম যদি শীতল না হয় তবে তাহা অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু অশীতল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) উষ্ণ এবং (২) না শীতল না উষ্ণ। অতএব এই পর্য্যন্তই বলিতে পারা যায় যে, কলমটি প্রথম শ্রেণীর অশীতল নহে—উষ্ণ নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে মূলেই অশীতল নহে, তাহা নহে; কলমটি যখন—না শীতল না উষ্ণ—তখন তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অশীতল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কলমটিকে চাই দুই শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,

কলম
(১) শীতল (২) অশীতল

চাই তিন শ্রেণীতে বিভাগ কর, যথা,

কলম
(১) শীতল অশীতল
(২) উষ্ণ (৩) না শীতল না উষ্ণ
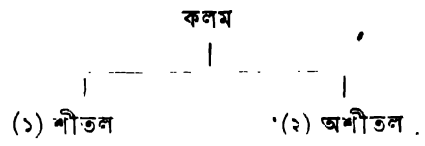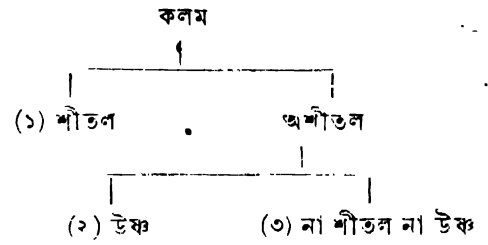
তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। প্রভাত বাবুর এইটি কেবল জানা উচিত যে, কলম পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্, আর শেষোক্ত তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্—উভয়-পক্ষেই এটা স্থির যে, কলমটি যদি শীতল না হয় তবে নিশ্চয়ই তাহা অশীতল। এটাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয় তবে তাহা অনুষ্ণ; কিন্তু অনুষ্ণও দুইটি অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা,—
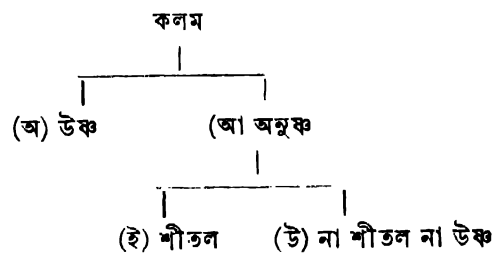
স্পৃশ্য বস্তু অ আ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক, আর, অ ই উ এই তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; উভয় পক্ষেই এ কথাটির এক চুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না যে, কলমটি যদি উষ্ণ না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা অনুষ্ণ। এ যেমন, তেমনিই সচেতন কিম্বা অচেতন যতই অবান্তর শ্রেণীতে

বিভক্ত হউক্ না কেন—এ কথাটি কিছুতেই টলিবার নহে যে, যাহা সচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই অচেতন ও যাহা অচেতন নহে তাহা নিশ্চয়ই সচেতন।

পদার্থ
(ক) সচেতন (খ) অচেতন
(চ) তাড়িতাদি সূক্ষ্ম ভূত (ট) স্থূল ভূত
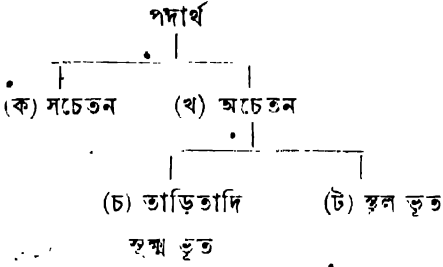
পদার্থ সমূহ ক খ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও যেমন, আর, ক চ ট এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তেমনি, উভয়-পক্ষেই এ কথাটি যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত যে, যে কোন পদার্থই হউক না কেন তাহা যদি সচেতন না হয় তবে তাহা অচেতন। এত কথায় কাজ কি—প্রভাত বাবুর ন্যায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি অবশ্য বীজগণিত জানেন তাহাতে আর ভুল নাই। বীজগণিতের নিয়মানুসারে এইরূপ ধার্য্য করা হউক্ যে, চেতন-পদার্থ=চে, অচেতন পদার্থ=অচে, এবং নিখিল সমস্ত—যাহার বাহিরে অন্য কোন সামগ্রী নাই—সেই নিখিল সমস্ত=নিখি; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতনকে বাদ দিলে কি অবশিষ্ট থাকে? একজন পাঠশালার বালকও ইহার এইরূপ উত্তর দিবে যে, নিখিল সমস্ত হইতে চেতন অপহৃত হইলে অচেতনই অবশিষ্ট থাকে; বীজ-গণিতের ভাষায়—

নিখি—চে=অচে;

অতএব, অচে+চে=(নিখি—চে)+চে=নিখি

(১) কিন্তু নিখিল সমস্তের বাহিরে অন্য কোন সামগ্রীই নাই।

(২) উপরে পাওয়া গেল যে, চে+অচে=নিখি।

(৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, চে+অচে, ইহার বাহিরে অন্য কোন পদার্থই নাই; কাজেই, যে-কোন পদার্থই হউক্ না কেন—তাহা হয় চেতন পদার্থ—নয় অচেতন পদার্থ—তা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রভাত বাবুর একটি কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; তিনি অম্লান-বদনে বলিতেছেন যে, "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই কথার অর্থ কি ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ?" হায়! এটাও কি প্রভাত বাবুকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে যে, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন—এ কথাও যা, আর, অচেতনও বটেন চেতনও বটেন (এক কথায়—অচেতন চেতন) এ কথাও তা, দুইই অবিকল সমান? প্রভাত বাবু তবে নিম্নে একটু প্রণিধান করুন;—এই মাত্র আমরা বীজগণিতের নিয়মানুসারে প্রমাণ করিলাম যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন এবং যাহা অচেতন নহে তাহা চেতন; অতএব—

চেতনও নহেন=অচেতন

অচেতনও নহেন=চেতন

অতএব, চেতনও নহেন অচেতনও নহেন=অচেতন চেতন।

অথবা

না চেতন=অচেতন (যেহেতু না=অ)

না অচেতন=চেতন(যেহেতু দুই না=এক হাঁ)

অতএব প্রমাণ হইল যে, না চেতন না অচেতন=অচেতন চেতন। শ্রীদ্বি]

বাস্তবিক আমরা কোথায়ও ঈশ্বরকে অচেতন চেতন পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করি নাই। আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে, এক প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসী মনুষ্য আছেন

যাঁহারা ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই বলেন না কিন্তু এমত গুণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন যাহার কোনও রূপ জ্ঞান জগৎ দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

[জগৎ যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এ কথাটিও স্বীকার্য্য যে, জগৎ ঈশ্বর হইতেই আসিয়াছে—সুতরাং জগৎ ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। "মানবী করণ" প্রবন্ধে আমরা স্পষ্টই বলিয়াছি যে, জড়জগৎ সত্যমাত্র, মনুষ্য—সত্য এবং জ্ঞান দুইই একাধারে, ঈশ্বর—সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত তিনই একাধারে। অতএব জগৎও সত্য, ঈশ্বরও সত্য—প্রভেদ কেবল এই যে, জগৎ অপূর্ণ সত্য ঈশ্বর পরিপূর্ণ সত্য। তেমনি, মনুষ্যও চেতন পদার্থ,ঈশ্বরও চেতন পদার্থ—প্রভেদ কেবল এই যে, মনুষ্য অপূর্ণ চৈতন্য, ঈশ্বর পরিপূর্ণ চৈতন্য। কিন্তু প্রভাত বাবু ইহার বিপরীতে এইরূপ বলেন যে, জগতের মধ্যে এমন একটিও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা ঈশ্বরেতেও আছে; প্রভাত বাবুর এ কথাটি যদি সত্য হয়, তবে ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, অস্তিত্ব বলিয়া যে একটি লক্ষণ—যাহা জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না—ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না;—যেহেতু জগতের মধ্যস্থিত কোন লক্ষণই ঈশ্বরেতে স্থান পাইতে পারে না! এ কিরূপ কথা! স্বয়ং ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব নাই তবে জগতের অস্তিত্ব কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছে? জগতের সকলই তো আপেক্ষিক; আপেক্ষিক সত্তা কি আপনার উপর আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? তাহা যদি সে পারে—তবে আর তাহা আপেক্ষিক কিসে? তবে তাহাই তো পূর্ণ সত্তা। আপেক্ষিক সত্তা যদি আপনার উপরে দাঁড়াইয়া নাই তবে কিসের উপরে দাঁড়াইয়া আছে? পূর্ণ সত্তার উপরে—তাহাতে আর ভুল কি? অতএব, জগতের সত্তা আছে বলিয়া এরূপ প্রমাণ হয় না যে, ঈশ্বরের সত্তা নাই—তাহাতে উল্টা আরো এইরূপ প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা। কিন্তু জগৎ দুইভাগে বিভক্ত—চেতন এবং অচেতন; অচেতনের সত্তাকে যদি একগুণ সত্তা বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, চেতনের সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। কেননা অচেতনের আপনার সত্তা তাহার আপনার নিকটে প্রকাশ পায় না—তাহার আপনার সত্তা তাহার আপনার ভোগে আসে না; অচেতনের সত্তা পরভোগ্য। চেতনের সত্তা নিজ-ভোগ্য, কেন না চেতনের আপনার সত্তা আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। অতএব সত্তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা

সত্তা
- নিজ-ভোগ্য সত্তা
- পরভোগ্য সত্তা
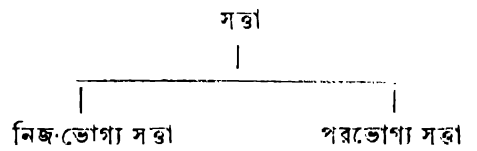
পরভোগ্য সত্তাতে সত্তার শুদ্ধ কেবল ভোগ্য অবয়বটিই—জ্ঞেয় অবয়বটিই—দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভোক্তৃ-অবয়বের বা জ্ঞাতৃ-অবয়বের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না; এই জন্য বলি যে, তাহা একগুণ-মাত্র সত্তা। নিজভোগ্য সত্তা আপনিই আপনার ভোগ্য এবং আপনিই আপনার ভোক্তা—অতএব নিজভোগ্য সত্তাতে সত্তার ভোগ্য অবয়ব এবং ভোক্তৃ-অবয়ব দুইই একাধারে বর্ত্তমান; এইজন্য আমরা বলি যে, নিজভোগ্য সত্তা দ্বিগুণ সত্তা। পূর্ব্বোক্তরূপ একগুণ সত্তাকেই আমরা বলি অচেতন সত্তা, আর, শেষোক্ত

রূপ দ্বিগুণ সত্তাকেই আমরা বলি চেতন সত্তা। ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা, সুতরাং তাঁহাতে শুধু যে কেবল একগুণ সত্তাই আছে—দ্বিগুণ সত্তা নাই—ইহা অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরের সত্তা যখন পরিপূর্ণ সত্তা, তখন তিনি অবশ্য জ্ঞান-স্বরূপ। মনুষ্যেরও জ্ঞান আছে—কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ নহে, মনুষ্যের জ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। অপূর্ণ জ্ঞানের দ্বিগুণ সত্তা অবশ্য জড়পদার্থের একগুণ সত্তা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্, তথাপি তাহাতেও সত্তার অভাব আছে; কেবল, যিনি পূর্ণ-জ্ঞান তিনিই পূর্ণ সত্য, যেহেতু তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই। সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে; জগতে আমরা দুইরূপ সত্তা অবলোকন করি নিজ-ভোগ্য এবং পরভোগ্য। জগতের মধ্যস্থিত এই উভয়-প্রকার সত্তাই আপেক্ষিক সুতরাং উভয়ই পূর্ণ সত্তার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ণসত্তাতে কোন সত্তারই অভাব নাই সুতরাং তাহা একগুণ-মাত্র সত্তা নহে, তাহা পরভোগ্য অচেতন সত্তা নহে;—তাহা নিজভোগ্য চেতন-সত্তা। আবার ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন-সত্তা নহে, তাহা পরিপূর্ণ চেতন-সত্তা; কেননা পরিপূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, পূর্ণ সত্তাই চেতনাচেতন সমস্ত আপেক্ষিক সত্তার মূলাধার, আর, পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সত্তার পূর্ণতা হইতে পারে না; অতএব যিনি সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বর তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ। শ্রী দ্বি]

যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু নাস্তিকতা রক্ষা করিয়া বলিতেন যে তিনি জগতে চেতন ও অচেতন এই দুই পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিটীর মূলে যে কোনও দোষ আছে ইহা আমরা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতাম না। কারণ নাস্তিকগণ পার্থিব পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না। সেই পার্থিব পদার্থ সকল হয় চেতন, না হয় অচেতন এই দুয়ের এক হইবে।

[অনতিপূর্ব্বে আমরা কঠোর গণিত-শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, কি পার্থিব পদার্থ কি অপার্থিব পদার্থ—সকলই—সে-এক নিখিল সমস্তের অন্তর্ভূত, সেই নিখিল সমস্ত হইতে চেতন পদার্থ অপহৃত হইলে শুদ্ধ কেবল অচেতন পদার্থই অবশিষ্ট থাকে; অতএব ইহা যেমন সুনিশ্চিত যে, যাহা চতুষ্কোণ নহে তাহা অচতুষ্কোণ, ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন। শ্রী দ্বি]

পরন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন আপনাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী আস্তিক বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন তখন অন্যবিধ আস্তিকগণ যে বাস্তবিক ঈশ্বরকে কি বলিয়া মনে করেন তাহা তাঁহার পক্ষে অনুসন্ধান না করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

[সাধারণতঃ সকল আস্তিকই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ; তবে যদি এক আধ জন আস্তিক উহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন তবে তাহার উত্তর আমাদের যাহা দিবার তাহা আমরা যথেষ্টই দিয়াছি। আমরা বারম্বার প্রতিবাদীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি যে, পূর্ণ জ্ঞান ভিন্ন সত্যের পূর্ণতা হয় না, আর, পূর্ণ সত্যের আশ্রয় ব্যতীত আপেক্ষিক সত্যের দাঁড়াইবার স্থান নাই। শ্রী দ্বি]

এখন ডাঃ ড্রিস্‌ডেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উক্তরূপ বিশ্বাসের কোনও যুক্তি আছে কি না তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পাঠক! বোধ করি তোমার পাঁচটী ইন্দ্রিয়

সমুদয়ই আছে। যদি তোমাকে ইন্দ্রিয় কয়টী—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তুমি দর্শন, শ্রবণ আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিবে। কিন্তু জোঁক বা শকুনি যদি কথা কহিতে এবং আমার কথা বুঝিতে পারিত এবং আমি যদি উহাদিগকে কয়টী ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে তাহার কি উত্তর প্রাপ্ত হইতাম? জোঁক সম্ভবতঃ বলিত যে, ইন্দ্রিয় তিনটী এবং শকুনি বলিত যে তাহা ৪ টী মাত্র! জোঁক ও শকুনির এমত উত্তর দিবার কারণ কি? বাস্তবিক সীমাবদ্ধ জ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। জোঁকের জ্ঞানে ৩টী এবং শকুনির জ্ঞানে ৪টী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে। তদ্রূপ মনুষ্যের মতেও ৫টী মাত্র ইন্দ্রিয়। কিন্তু ইহাই কি অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত? পাঠক! তুমি পাঁচের অধিক ইন্দ্রিয় দেখ না বলিয়াই কি নিশ্চয় বলিতে পারে যে কোন ষষ্ঠ বা সপ্তম ইন্দ্রিয় নাই? এখন মনে কর চেতন এবং অচেতন এই দুই প্রকার পদার্থ মাত্র তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা হইলেই কি তোমার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসা উচিত যে এই দুয়ের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ হইতে পারে না? কোন অতিরিক্ত পদার্থ যে নাই তাহা তুমি কিরূপে অবগত হইয়াছ? তোমার নিজের জ্ঞানই কি জগতের সীমা?

[আমার না হয় পাঁচটা ইন্দ্রিয় আর এক জনের না হয় দশটা ইন্দ্রিয়; আমার না হয় হিমবিন্দু-পরিমাণ জ্ঞান, আর এক জনের না হয় সাগর-পরিমাণ জ্ঞান; সে কথা এখানে হইতেছে না। এখানে কথা হইতেছে কেবল এই যে, অচেতন চেতন পদার্থ কেবল যে, আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, তাহা নহে, তাহা সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য। যেমন, দু-কুড়ি পঞ্চাশ, মাথা নাই মাথা ব্যথা, পরিধি-বিহীন চক্র, সকল জ্ঞানেরই অগ্রাহ্য, অচেতন চেতন সেইরূপ একটা নিতান্তই অর্থশূন্য অসঙ্গত কথা। কোন এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি একটা কথা বলে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটি আমারই বুদ্ধির দোষ; কিন্তু এক জন পাগল যদি একটা প্রলাপোক্তি করে, আর, তাহা যদি আমি বুঝিতে না পারি, তবে সেটা কিছু আর আমার বুদ্ধির দোষ নহে, তাহার সে প্রলাপোক্তির ভিতর বুঝিবার কিছুই নাই বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি না। একজন দেবতা আসিয়া যদি আমাকে বলেন যে, "আমার পঞ্চাশ ইন্দ্রিয় এবং তাহাতে আমি এত বিচিত্র বিষয় অবলোকন করি যে, তাহা তোমার স্বপ্নের অগোচর; তুমি যদি চাও, তবে তোমাকেও আমি সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রদান করিতে পারি"; তবে আমি তাঁহাকে বলি যে, তাহা হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হই। কিন্তু যদি আর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলে যে, আমার ধ্যান-চক্ষু এমনি প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে, তদ্দারা আমি তমোময় আলোক, অচেতন চেতন, জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকার প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে তাঁহাকে আমি বলি যে "এই বই নয়? এ তো অতি সামান্য বিষয়; আমি এক ব্যক্তিকে জানি—তিনি সোণার পাথরে ভাত খা'ন; তিনি হস্ত-পদ-বিহীন অথচ অসিযুদ্ধে এমনি সুনিপুণ যে, বড় বড় যোদ্ধারা তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না; তিনি একেবারেই মূক ও বধির, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত যদি একবার শোনো তবে সেই দণ্ডেই মোহিত হইয়া যাও।" এ সকল কথার কি কোন মাথা

আছে, না মুণ্ড আছে? অচেতন চেতন পদার্থ এইরূপ একটা অসঙ্গত কথা! আগে একটা কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাহার পরে তবে তো তাহার সত্য-মিথ্যার বিচার হইবে—কিন্তু "অচেতন চেতন" এ কথাটির মূলেই কোন অর্থ নাই;—অতএব মিছা-মিছি আর কেন! যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন—এই সহজ সত্যটি একজন বাল-কেও বুঝিতে পারে; আর যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন নহে—ইহা স্বয়ং বৃহ-স্পতিও বুঝিতে পারেন না—যেহেতু ইহা অর্থশূন্য প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রী দ্বি]

তবে তুমি বলিতে পার যে, চেতন ও অচেতন এই দুইভিন্ন যে কোন তিন হইতে পারে তাহা আমি চিন্তাই করিতে পারি না। তাহা হইলে শকুনিও তো বলিতে পারে যে, চারির অধিক যে ইন্দ্রিয় হইতে পারে তাহা সে চিন্তা করিতেও পারে না। শকুনির এই উক্তি কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

[শকুনি যদি মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবান জীব হইত তবে সে এইরূপ বলিত—"আমার পক্ষ আছে বলিয়াই যে, সকল জীবেরই পক্ষ থাকিতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই; তেমনি আমার চারিটির অধিক ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া যে, সকল জী-বেরই সেইরূপ হইতেই হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই; কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, কোন জীবেরই অনিন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এরূপ একটা অবয়ব থা-কিতে পারে না—যাহা ইন্দ্রিয়ও নয়—অনিন্দ্রিয়ও নয়। শ্রী দ্বি]

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবগত আছে বলি-য়াই শকুনির কথা স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এমন কি কেহ আছে যে, সে চেতন ও অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে?

[যে ব্যক্তি বলে যে, আমি শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া অনুভব করিয়াছি আর যে ব্যক্তি বলে যে, আমি চেতন এবং অচে-তনের অতিরিক্ত পদার্থ—অচেতন চেতন পদার্থ—দেখিয়াছি, উভয়েরই কথা সমান বিশ্বাস-যোগ্য। যাঁহারা শব্দের কাঙ্গালী কিন্তু অর্থের কোন ধারই ধারেন না, তাঁহা-দের মুখেই ঐ সকল অর্থ-শূন্য প্রলাপোক্তি শোভা পায়। শ্রী দ্বি]

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্য অনেকই আছে। বাস্তবিক আস্তিকগণই এরূপ মনুষ্য। দ্বি-জেন্দ্র বাবু নিজেই এরূপ অতিরিক্ত পদার্থ বিশ্বাসকারী আস্তিক। যদি আমি একটী আম্র-অস্থি হস্তে লইয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইহা চেতন না অচেতন? তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন যে ইহা অচেতন বস্তু। কিন্তু যদি আবার জিজ্ঞাসা করি যে, এই আম্র-অস্থি ভূমিতে রোপণ করিলে যে, তাহা হইতে আম্র-বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা কে উৎপাদন করে? চেতনে? না, অচেতনে? দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার কি উত্তর দিবেন তাহা না জানা পর্য্যন্ত আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।

[আমরা তো গত বারেই ইহার উত্তর দিয়া চুকিয়াছি, যথা; বৃক্ষোৎপত্তির মূল কারণ পরমাত্মা—তিনি সচেতন; বৃক্ষোৎ-পত্তির সাক্ষাৎ কারণ প্রকৃতি—তাহা অচে-তন। যিনি চেতন তিনি চেতন—যাহা অচেতন তাহা অচেতন; চেতনও অচেতন নহে—অচেতনও চেতন নহে। শ্রীদ্বি]

তবে এইস্থলে আমরা রামানুজ দর্শ-নের পদার্থ বিভাগের কথা উল্লেখ করি-

তেছি। রামানুজ মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর। দ্বিজেন্দ্র বাবু রামানুজের এইরূপ পদার্থ বিভাগের কি অর্থ করিবেন? যদি তিনি বলেন যে এইরূপ পদার্থ বিভাগের কোনও ভিত্তি নাই, তাহা হইলে ভরসা করি তিনি এরূপ উত্তরের যুক্তি প্রদর্শন করিবেন।

[রামানুজের ঐ কথাটি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করি; চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর ইহার অর্থ আস্তিক মাত্রেই এইরূপ বুঝেন যে, চিৎ কিনা অল্পজ্ঞ জীব-চৈতন্য, অচিৎ কিনা অচেতন জড়-পদার্থ, ঈশ্বর কিনা সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ চৈতন্য। মানবকরণ প্রবন্ধে এ তিনের প্রভেদ আমরা অতীব সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি, যথা;—অচিৎ শুদ্ধ কেবল সত্যং; চিৎ—সত্যং জ্ঞানং; ঈশ্বর—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শ্রীদ্বি]

এই তো গেল আস্তিকের কথা। নাস্তিকের মতে চেতন এবং অচেতনের অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে কি না? নাস্তিক বাস্তবিক অচেতন অতিরিক্ত কোনও পদার্থই স্বীকার করে না তাহার মতে চেতনা কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। কিন্তু চেতন ও অচেতন জড়পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। একই মানবদেহ এক সময়ে চেতন এবং আর এক সময়ে অচেতন পদার্থ বলিয়া গণ্য। এই দ্বিবিধ অবস্থা যে কেবল জীবন থাকিতে এবং মৃত্যু হইলেই হয় এমত নহে, জীবিত কালের ভিন্ন ভিন্ন সময়েও হইয়া থাকে।

[এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেহ মূলেই চেতন পদার্থ নহে—দেহীই চেতন পদার্থ—আত্মাই চেতন-পদার্থ। আর, দেহের যে কোন অবস্থাই হউক্ না কেন—সেই অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ যে, আত্মা, সেই আত্মাই চেতন পদার্থ, সে অবস্থা নিজে চেতন পদার্থ নহে; কেননা অবস্থার সাক্ষী অবস্থাহইতে ভিন্ন। শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু অন্য এক স্থলে "ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন" এই বাক্যকে আলঙ্কারিক ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তদুপলক্ষে বলেন যে, "প্রতিবাদীর জানা উচিত যে, এরূপ আলঙ্কারিক ভাষা এক শোভা পায় কবিতাতে—আর শোভা পায় ঘরাও কথা বার্ত্তায়—এ ভিন্ন বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে তাহা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।"

[শুধু যে উল্লেখ করিয়াছি তাহা নহে, উহার প্রমাণও দেখাইয়াছি; যথা; যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বর অচেতনও নহেন এবং আমাদের ন্যায় অপূর্ণ চেতনও নহেন; কিন্তু ঈশ্বর যে, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যে, পরিপূর্ণ চেতন, ইহা তাঁহারা নিজ মুখেই স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার ব্যক্ত করিয়াছেন। তবেই হইতেছে যে, "ঈশ্বর অচেতনও নহেন চেতনও নহেন" এটা কঠোর বৈজ্ঞানিক ভাষা নহে কিন্তু ভাবে বুঝিয়া লইবার ভাষা—আলঙ্কারিক ভাষা। শ্রী দ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই বাক্য হইতে আমরা এই ভাব গ্রহণ করিতেছি যে, ডাঃ ড্রিস্‌ডেল ও মেং প্রকটারের ভাষা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আর যদি আমরা তাহা সত্য সত্যই বুঝিয়া থাকি তবে এরূপ ভাষা বিজ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞানের অনুমোদিত নহে। আমরা বিজ্ঞানের কথা কিছু কিছু বুঝি এবং তত্ত্বজ্ঞান এমন কঠিন বিষয় যে তাহাতে আমাদের বুদ্ধি প্রবেশই করিতে পারে না। অতএব এতদ্রূপ ভাষা বিজ্ঞানের অনুগত কি না তাহা আমরা সত্বরেই

প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বলিব না।

আমরা ডাক্তর ড্রিস্‌ডেল এবং মেং প্রক্‌টারের ভাষা বুঝিতে পারিয়াছি কি না প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। ডাঃ ড্রিস্‌ডেল "প্রোটোপ্লাজ্‌মিক থিওরী অব্ লাইফ" নামক গ্রন্থের ২৭৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ;—"I am content to believe in no God, angel, or spirit, or the immortal soul of man except as made known to us through the miraculous specific revelation contained in our scriptures. At the same time these beings are of a nature to us wholly incomprehensible and inconceivable. The cardinal doctrines of revealed religion are thus dogmas, not resting on any proofs derived from observation or science at all. These dogmas are also mysteries, not only incapable of scientific proof or disproof, but also above and beyond the comprehension of the human intellect."

এই বাক্যের অবিকল অনুবাদ অতি কঠিন বোধ হওয়াতে আমরা এস্থলে স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। বাইবলের প্রকাশিত ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর, অথবা প্রেত, বা অমর মানবাত্মা ভিন্ন আমি আর কোনও ঈশ্বর, ঈশ্বরানুচর আদিতে বিশ্বাস করি না। আবার এই সমস্ত ব্যক্তির প্রকৃতি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অবোধ্য এবং অননুভবনীয়। আর বাইবল প্রকাশিত ধর্ম্মের মূল সত্য সকল এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ বা বিজ্ঞান কর্তৃক নির্দ্ধারিত কোনও প্রমাণের উপর সংস্থিত নহে। এই সমস্ত মত প্রকৃত রূপে এমন রহস্য যাহা যে, কেবল বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত বা অপ্রমাণ হইতে পারে না এমত নহে, তাহা আবার মানব বুদ্ধির অগম্য।

মেং প্রক্‌টার ১৮৮৭ সালের জুলাই সংখ্যা "নলেজ" নামক পত্রিকার ১৯৩ পৃষ্ঠায় আপনাকে এক প্রকার অজ্ঞেয়তাবাদী বলিয়া স্বীকার করেন এবং আরো বলেন যে, "A God understood is no God at all" পরিজ্ঞাত ঈশ্বর ঈশ্বরই নহে। এরূপ ভাষাকে সরল ভাব ব্যঞ্জকই বলা যাইবে, না অলঙ্কারযুক্তই বলা যাইবে তাহা পাঠকবর্গই বিচার করুন।

[ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যাসদেব কি বলিয়াছেন—শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন—রামানুজ কি বলিয়াছেন—প্রক্টর তাহার বিন্দু বিসর্গেরও উল্লেখ করেন নাই ;—কেনই বা করিবেন! আমরাও প্রক্টর কি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করি নাই—করিতে চাহিও না। কোন্ আস্তিক কি বলিয়াছেন না বলিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া বলা মানবীকরণের উদ্দেশ্যই নহে ; শুদ্ধ কেবল এইটি প্রমাণ করাই মানবীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য যে, ঈশ্বরকে জ্ঞান-স্বরূপ বা সর্ব্বজ্ঞ বলিলে মানবীকরণের দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, আর, ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ চেতন বলা মানবীকরণই বটে ; ড্রিস্‌ডেল-সম্মত বাইবেল শাস্ত্র অনেক স্থানে এইরূপ মানবীকরণ দোষে লিপ্ত হইয়াছে। মানবীকরণ প্রবন্ধের একটিও কোন কথায় প্রভাত বাবু যদি কোন প্রকার যুক্তি-দোষ দেখিয়া থাকেন তবে তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন্—তাহার আমরা উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি এ'র ও'র তা'র দোহাই দে'ন কেন? আমরা বীজ-গণিতের নিয়মানুসারে—অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি-অনুসারে—দেখাইয়াছি যে, চেতনও নহে অচেতনও নহে=অচেতন চেতন—যাহার কোন অর্থই হয় না। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে Reductio ad

absurdum অর্থাৎ অর্থ-শূন্য প্রলাপ বাক্যে পরিসমাপ্তি! প্রক্টর বা অন্য কেহ যদি আমাদের এই অকাট্য যুক্তির কোন প্রকার প্রতিযুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন তবে সেই প্রতিযুক্তিটি যে, কি, প্রভাত বাবু নিজেই তাহা আমাদিগকে বলুন না কেন, তাহা হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদেরও যাহা বলিবার আছে আমরা তাহা বলিতে পারি—তাহা হইলেই গোল মিটিয়া যায়; কিন্তু প্রভাত বাবু সেরূপ কোন প্রতিযুক্তির কথাই উল্লেখ করিতেছেন না—কেবল বলিতেছেন যে, প্রক্টরের মতানুসারে অচেতন চেতন থাকিলেও থাকিতে পারে। গণিত শাস্ত্রীয় অকাট্য যুক্তি আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—প্রক্টর প্রভৃতির শুদ্ধ কেবল একটি মুখের কথা প্রভাত বাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে—এখন জিজ্ঞাসা করি যে, অকাট্য যুক্তি বড় না মুখের কথা বড়? পাঠক কি বলেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো এইটিই বিচার-সঙ্গত মনে হয় যে, যুক্তিহীন মুখের কথা অপেক্ষা অকাট্য যুক্তির মূল্য শত সহস্র গুণ অধিক। তবে, প্রক্টর সাহেবের এই যে একটি কথা যে, "A God understood is no God at all" ইহার অর্থ স্বতন্ত্র; ইহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বরকে আমরা রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না—এ নহে যে, ঈশ্বরকে আমরা সচেতন বলিয়াও জানি না। ক্ষুদ্র বালক অবশ্য পিতার মনের ভাব রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু পিতা যে সচেতন ইহা সে খুবই জানে—ইহাও জানে যে, তাহার পিতার জ্ঞান তাহার নিজের জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। এইরূপ, আস্তিক মাত্রই জানেন যে, ঈশ্বর সচেতন এবং তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন্ আস্তিক এত বড় একটা স্পর্দ্ধার কথা মুখে উচ্চারণ করিতে—এমন কি মনের এক কোণেও স্থান দিতে—আপনাকে পাপ-ভারে প্রপীড়িত মনে না করেন যে, ঈশ্বরকে আমি রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিয়াছি? আর-একদিকে এইরূপ দেখা যায় যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে এইরূপ উপদেশ দে'ন যে, "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, Seek and ye shall find, অন্বেষণ কর—পাইবে; ইত্যাদি। ইহা দৃষ্টে কি মনে হয়? ইহাই মনে হয় যে, পিতার মনের ভাব আমি সমস্তই বুঝি—ইহাই বালকের অনুচিত স্পর্দ্ধাবাক্য; কিন্তু পিতার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা উল্টা আরো বালকের কর্ত্তব্য; এবং যত সে চেষ্টা করিবে ততই তাহার চক্ষু ফুটিবে। এইরূপ, ঈশ্বরকে যতই আমরা জানিতে চেষ্টা করিব ততই আমাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে; এ ভিন্ন, অনন্ত পরব্রহ্মের অন্ত কেহ কখন পায়ও নাই পাইবেও না। অতএব ঈশ্বরকে রীতিমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানা স্বতন্ত্র; উহা কেহ করেও নাই করিবেও না—ইহা আস্তিক মাত্রেই করিয়া থাকেন। অতএব ইহা যেমন সত্য যে, A God understood is no God at all, ইহাও তেমনি সত্য যে, A God without knowledge is no God at all.

শ্রীদ্বি]

এখন মনে করা যাউক যে ডাঃ ড্রিস্ডেল এবং মেং প্রকটারের ভাষা আলঙ্কারিকই বটে। তাহা হইলে আমরা যে, ঈশ্বরকে চেতন এবং অচেতন ইহার কিছুই নহে বলিয়াছি তাহা বিজ্ঞান অনু-

গত কি না সে বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। এই কথা হইতে দুইটী প্রশ্ন হইতে পারে। ১। বিশিষ্ট জ্ঞান কাহাকে বলে? এবং ২। কি বিষয়ের জ্ঞান? হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের মতে "সামান্য জ্ঞানের উচ্চতর বিকাশের নাম বিজ্ঞান।" এই সংজ্ঞাও পরিস্কার রূপে বুঝিতে হইলে "সামান্য জ্ঞান" এবং "উচ্চতর বিকাশ" এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। সামান্য জ্ঞান বলিতে এমত জ্ঞান বুঝা যায়, যাহা কোন বস্তু দর্শনে সহসাই উদিত হয়। যথা, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দর্শন করিলে সহসা এই প্রতীতি জন্মে যে, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাই সামান্য জ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞান নহে। কারণ ইহা প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে বিজ্ঞানে উন্নীত হইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবী এত বৃহৎ এবং সূর্য্য এত দূরবর্ত্তী যে উহাদিগকে পরীক্ষার অধীন করিয়া উক্ত সামান্য জ্ঞানকে বিকসিত করা সহজ কার্য্য নহে। এজন্য এস্থলে কেবল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রথমে কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই এই সামান্য জ্ঞানকে বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছিলেন। সেই প্রমাণ এই:—গ্রহ ও নক্ষত্রগণও সূর্য্যের ন্যায় প্রত্যহ উদিত এবং অস্তগত হয়। এই হেতু গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ সূর্য্যের পর্য্যটনের প্রমাণ মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। যদি গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যে, কেবল পৃথিবীকে দৈনিক প্রদক্ষিণ করে এমত নহে উহারা বাস্তবিক বার্ষিকও পরিবেষ্টন এবং তদতিরিক্ত গ্রহগণ আবার স্থির নক্ষত্র মধ্যে নানা রূপ বিশৃঙ্খল ভাবে পর্যটন করিয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের এতদ্রূপ গতির সহিত সূর্য্যের পরিভ্রমণের তুলনা করিলে আর পৃথিবীকে সূর্য্যের দৈনিক প্রদক্ষিণ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির থাকিতে পারে না। তখন ইহা পরিশোধিত হইয়া এইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে, পৃথিবীই ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে। ইহারই নাম বিশিষ্ট অর্থাৎ উচ্চতর বিকাশ প্রাপ্ত জ্ঞান, সুতরাং তখন উহা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া দাঁড়ায়।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কোন্ বিষয়ের জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান? যখন সামান্য জ্ঞান পরীক্ষা ও প্রমাণ দ্বারা পরিশোধিত হইলে বিজ্ঞানে উন্নীত হয়, তখন তাহা এমত বিষয়ের হওয়া চাই, যাহার উপর পরীক্ষা ও প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থই পরীক্ষণীয় ও প্রমেয় বস্তু। অতএব জড় পদার্থের জ্ঞানই বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য। বাস্তবিক এক মাত্র জড় পদার্থই জগতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা কিছু জ্ঞান আমরা উপলব্ধ করি তাহা জড় পদার্থের মাত্র। এজন্য আমরা কোনও কথাই চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি না যাহা এ জড় জগতে কদাপি দর্শন আদি করিতে পারি নাই।

[আমি স্বচ্ছন্দে চিন্তা করিতে পারি যে, প্রভাত বাবু আমার লিখিত এই কথাটি বুঝিতেছেন; অথচ, জড় জগতের কোন স্থানেই আমি বোধক্রিয়ার চিহ্ন মাত্রও দেখি নাই—চেতন রাজ্যেই আমি বুদ্ধি ক্রিয়া উপলব্ধি

করিয়া থাকি। সভ্য মনুষ্য-মাত্রেই বারো আনা অংশ চেতন লইয়াই ব্যাপৃত থাকে—কেননা তাহার পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেই চেতন-পদার্থ। জন-শূন্য উপদ্বীপের রবিন্সন্ ক্রুসো—যাঁহার ত্রিসংসারে কেহই ছিল না, তিনিও মানব-চেতনের জন্য হাহাকার করিয়া কাল-যাপন করিতেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, মনুষ্যের চিন্তা শুদ্ধ কেবল জড়জগতেই আবদ্ধ। প্রভাত বাবু বলিতে পারেন যে, লোকের কথাবার্ত্তা শুনিলে এবং কার্য্যাদি দর্শন করিলে তবেই আমরা তাহাদের বুদ্ধি-ক্রিয়ার পরিচয়-প্রাপ্ত হই ;—কিন্তু কথাবার্ত্তা মুখের বায়ু-মাত্র ও আচার ব্যবহার অঙ্গ-চালনা মাত্র, সুতরাং দুইই জড়জগতের অন্তর্গত। ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমাদের নিজের নিজের বুদ্ধি-ক্রিয়াকে চেতন-রাজ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি না করিতাম তবে অন্যের বুদ্ধি-ক্রিয়া আমাদের ধ্যানের অগোচর হইত। অতএব বুদ্ধি-ক্রিয়াকে যখন আমরা আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি, তখন চেতনরাজ্যেই তাহাকে আমরা উপলব্ধি করি। বুদ্ধি-ক্রিয়া তো দূরের কথা—সামান্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াও চেতন-জগতের অন্তর্গত ; ধর যেন—উত্তাপ ; উত্তাপ অবশ্য জড়জগতেরই অন্তর্গত ; তাহা এক প্রকার আণব (Molicular) গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে—সুতরাং তাহা ভৌতিক ক্রিয়া ; কিন্তু উত্তাপ যেমন ভৌতিক ক্রিয়া উত্তাপের অনুভবও কি সেইরূপ ভৌতিক ক্রিয়া ? কখনই না—উত্তাপের অনুভব এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া সুতরাং তাহা চেতন-জগতেরই অন্তর্গত। শ্রীদ্বি]

যদি সেই উপার্জ্জিত জ্ঞান কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধ শূন্য হয়, তবে তাহা সামান্য জ্ঞান এবং কার্য্য কারণ আদি সম্বন্ধযুক্ত হইলেই বিজ্ঞান নামে অভিহিত।

এখন ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন—এই বাক্যটী বিজ্ঞানের অনুগত কি না আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে জগতে চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ পদার্থ মাত্র বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি চেতনের স্বাধীন বিদ্যমানতা কে দর্শন করিয়াছে ? তাহা কি অচেতন জড় পদার্থের আশ্রয় ভিন্ন স্বাধীন অবস্থায় দর্শন করিতে পারা যায় ? যদি উহা জড় পদার্থে ভিন্ন স্বাধীন ভাবেই দৃষ্টিগোচর না হয় তবে তাহা যে জড় পদার্থেরই গুণ নহে ইহা কে প্রতিপাদন করিতে পারে ? বস্তুত্বের লক্ষণ কি ? যাহা এখন আছে, পরক্ষণে নাই, পরে আবার দেখা দেয় এবং পুনরায় অন্তর্হিত হয় তাহাকে কি বস্তু বলা যাইতে পারে ? যথা, বীণা যন্ত্রের ধ্বনি। তাহা এই উৎপন্ন হইল, এই রহিত হইয়া গেল, আবার উৎপন্ন হইল এবং পুনরায় বিলয় প্রাপ্ত হইল। এরূপ ধ্বনি কি বাস্তবিক কোন বস্তু, না তাহা ক্রিয়াবিশেষের প্রকাশিত ফল। বিজ্ঞান মতে ইহা ক্রিয়াবিশেষের ফলই বটে। পাঠক ! এখন চিন্তা করিয়া দেখ দেখি বীণাধ্বনির সহিত চৈতন্যের তুলনা হইতে পারে কি না ? চৈতন্য এই আছে, এই নাই, আবার আসিল এবং পুনরায় অন্তর্হিত হইল ; এতদ্রূপ পুনঃ পুন বিনাশশীল চৈতন্য কি স্বাধীন বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? ইহা কি ধ্বনির ন্যায় ক্রিয়া বিশেষের ফল নহে।

[কালিকের বীণা ধ্বনি ভিন্ন, এবং আ-

জিকের বীণাধ্বনি ভিন্ন; কিন্তু যে প্রভাত বাবু প্রথম সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক, সেই প্রভাত বাবুই তৃতীয় সংখ্যক প্রতিবাদের লেখক—প্রভাত বাবু একই প্রভাত বাবু; পাঠক কি বলিবেন যে, না তাহা নহে—কাল্লিকের তোপধ্বনি যেমন আজিকের তোপধ্বনি নহে, তেমনি কালিকের সে প্রভাত বাবু আজিকের এ প্রভাত বাবু নহে? কল্যও আমি সুখে ছিলাম—অদ্যও আমি সুখে আছি; অদ্যকার সুখের অবস্থা কল্যকার সুখের অবস্থা হইতে ভিন্ন, কেননা, কল্যকার সে সুখ অদ্যকার এ সুখ নহে; কিন্তু অদ্যকার আমি কল্যকার আমি হইতে ভিন্ন নহি, কেননা কল্যকার সেই আমিই অদ্যকার এই আমি। "আমার বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষী-স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহা কি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন? না ধ্রুব পদার্থের ন্যায় সকল মুহূর্ত্তেই একই অভিন্ন?" এ কথা পাঠককে জিজ্ঞাসা করাও যা', আর, এ কথাও তা, যে"আমার কি জিহ্বা আছে—না মূলেই আমার জিহ্বা নাই?—একবার দেখ তো হে বাপু!" যদি আমার জিহ্বা না থাকিত তবে আমি ও-কথাটি উচ্চারণ করিতেই পারিতাম না। প্রভাত বাবুর সাক্ষী চৈতন্য যদি ধ্বনির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন হইত, তবে কে-ই বা পাঠককে প্রশ্ন করিতেছে—কাহাকেই বা পাঠক উত্তর প্রদান করিবেন? পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের প্রভাত বাবুই প্রশ্ন করিয়াছেন; পর-মুহূর্ত্তের আর-এক প্রভাত বাবুকে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া ফল কি? যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহাকে উত্তর প্রদান করাই তো বিধেয়! ইহাকেই বলে Reductio ad absurdum! আর একটি কথা এই যে, জ্ঞানের মূল প্রদেশে এরূপ কতকগুলি সত্য রহিয়াছে যাহা একেবারেই অকাট্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়—যেমন পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে—পরিপূর্ণ সত্য অপূর্ণ সত্যের আশ্রয়—ইত্যাদি; সুতরাং জ্ঞানের সেই বিশুদ্ধ মূল প্রদেশটি পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে তাহা জানে না। জ্ঞানের প্রান্ত-স্থানীয় শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাই পরিবর্ত্তনশীল—কিন্তু জ্ঞানের কেন্দ্র-স্থানীয় আত্মা অটল এবং অপরিবর্ত্তনীয়; যেমন ঘূর্ণায়মান চক্রের কেন্দ্র যেখানকার সেইখানেই থাকে, কিন্তু তাহার পরিধির প্রত্যেক অংশ ক্রমাগতই স্থান পরিবর্ত্তন করে—উহাও সেইরূপ। প্রভাত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জীব-চৈতন্য স্বাধীন কি না? ইহার উত্তর এই যে, জীব-চৈতন্য কোন্ অংশে স্বাধীন কোন্ অংশে পরাধীন—ইহা প্রতি মনুষ্যেরই আপনি বুঝিবার কথা—অন্যকে বুঝাইবার কথা নহে; লোহার সিন্ধুকের মধ্য হইতে টাকা বাহির করিয়া দর্শনার্থী ব্যক্তিকে তাহা দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু আত্মার স্বাধীনতাকে বক্ষ চিরিয়া বাহির করিয়া কেহ কাহাকেও দেখাইতে পারে না; তবুও যদি বল যে, আত্মার স্বাধীনতার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এইরূপ যথা;—আপনার অধীনতাই স্বাধীনতা, অন্যের অধীনতাই পরাধীনতা; পরাধীনতা জড়জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাধীনতা জড়জগতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না;—তবে "স্বাধীনতা" এ কথা আমরা পাইলাম কোথা হইতে? অবশ্য আমরা আপনার অভ্যন্তরে কোন না-কোন-প্রকার স্বাধীনতার ভাব উপলব্ধি করি, তাই সেই ভাবটি অন্যের নিকটে জ্ঞাপন করিবার জন্য "স্বাধীনতা" এই শ-

ব্দটি ব্যবহার করি। "আমি আপনি যাহা বুঝি—তাহা আমি প্রভাত বাবুকে বুঝাইব" আমি আপনিই এইরূপ একটি নিয়ম স্থির করিয়াছি এবং আমার আপনার সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমি অদ্যকার এই প্রস্তাবটি লিখিতেছি;—তাই আমি বলি যে, আমি স্বাধীনভাবে লিখিতেছি। কিন্তু এক অংশে যেমন আমি স্বাধীন—আর এক অংশে তেমনি আমি পরাধীন; দোয়াত কলম না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—আমার শরীর সুস্থ না থাকিলে আমি লিখিতে পারিতাম না—ইত্যাদি। অতএব, স্বাধীনতার ভাব আমি আপনার অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমি জানিতেছি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহি;—কোন আপেক্ষিক সত্যই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে সুতরাং সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন নহে; পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। শ্রী দ্বি]

ধ্বনির সহিত চৈতন্যের সাদৃশ্য যে এই স্থলেই শেষ হইয়াছে এমত নহে। ধ্বনির উৎপত্তি জন্য যেরূপ বীণা এবং বাদক আবশ্যক, চৈতন্যের উদ্রেক জন্যও মস্তিষ্ক এবং আলোক আদি উত্তেজন আবশ্যক। ইহা বাস্তবিক বিজ্ঞানেরই কথা, কল্পনার কথা নহে। মস্তিষ্কই যে বাস্তবিক চৈতন্যের যন্ত্র ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা না করিয়া আমরা ডাং ফেরিয়ার কৃত "মস্তিষ্কের ক্রিয়া" নামক গ্রন্থের ৪২৪ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। "মস্তিষ্কই যে মনের যন্ত্র ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত স্বতঃসিদ্ধ। দ্ব্যর্দ্ধ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে যে চৈতন্যের কোনও অবস্থার স্বাতন্ত্র্য আছে এমত প্রমাণ নাই। পরন্তু কোন কিছু যে (মস্তিষ্কে) অতিরিক্ত সংযুক্ত আছে অথবা সরলতম স্নায়বিক যন্ত্রের ক্রিয়া হইতে যে বাল্কল (cortical) কেন্দ্র সকলের ক্রিয়ার কোন পার্থক্য ভাব আছে তাহাও বিশ্বাস করিবার কারণ নাই; কিন্তু সরলতম প্রতিক্ষেপিকা ক্রিয়া এবং জটিলতম মানসিক কার্য্য মধ্যে যে ধারাবাহিক অচ্ছিন্ন প্রকার (gradation) আছে তাহারই বরং প্রমাণ পাওয়া যায়।"

[মস্তিষ্ক যে একটা যন্ত্র, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু মস্তিষ্ক কাহার যন্ত্র? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন—যন্ত্রী যন্ত্র হইতে ভিন্ন। আলোক কাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে? সাক্ষী চৈতন্যের—আত্মার। সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য আলোক এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন। সরলতম স্নায়বিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা, আর, জটিলতম কৈন্দ্রিক ক্রিয়ারই বা কে ফলভোক্তা? না! সাক্ষী-চৈতন্য; সুতরাং সাক্ষী চৈতন্য স্নায়বিক এবং কৈন্দ্রিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। অতএব প্রভাত বাবু ঐ সকল বিভিন্ন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষী চৈতন্যকে জড়াইয়া ঝোলে অম্বলে মিশাইবেন না। শ্রী দ্বি]

আলোক আদির উত্তেজন ব্যতীত যে চৈতন্য উৎপন্ন হয় না এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। আমাদের শারীরিক প্রকৃতি এরূপ দেখা যায় যে, কিছু কাল পরিশ্রম করিলে শ্রমশক্তি ক্রমে লাঘব হইতে থাকে, অবশেষে এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, আর পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। তখন সমুচিত কাল বিশ্রাম না করিলে আর শ্রমক্ষম হইতে পারা যায় না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, বিশ্রাম দ্বারা স্নায়ু ও মাংসপেশীতে

এক প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত শক্তির বিকাশ প্রভাবেই পরিশ্রম করিতে পারা যায় এবং পরিশ্রম সহকারে তাহার ক্ষয় হইলে পুনরায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। (শারীর বিধান বিদ্যা মতে পরিশ্রম দ্বারা এক প্রকার ক্লান্তিজনক পদার্থও মাংসপেশীতে উৎপন্ন হইয়া পরিশ্রম-শক্তি লাঘব হয়। সুতরাং ক্লান্তিজনক পদার্থের উৎপত্তিও পরিশ্রম-শক্তি লাঘবের এক উপাদান।) চিন্তাশক্তি এবং চৈতন্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। চেতনা থাকিলে চিন্তা শক্তির কিছু কিছু চালনা হয়ই হয়। তদ্ধেতু সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, নিদ্রিত হইয়া সমুচিত বিশ্রাম না করিলে সুবিধা ও শৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করা দূরে থাকুক দীর্ঘকাল জাগ্রৎ থাকিতেও পারা যায় না। এই হেতু চিন্তা করিবার এবং চেতন থাকিবার জন্যেও মস্তিষ্ক মধ্যে বিশেষ প্রকার শক্তি সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ পেশী মধ্যে ক্লান্তিজনক পদার্থ জন্মে মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সেইরূপ কোন পদার্থ মস্তিষ্ক মধ্যে উৎপন্ন হয় এমত প্রমাণ নাই। অতএব কেবল মস্তিষ্কের শক্তি ক্ষয়ই চিন্তা ও চেতনা শক্তি লাঘবের একমাত্র কারণ।

[অত কথা না বলিয়া এক কথায় বলিলেই হয় যে, শরীর ভাল থাকিলেই চিন্তাশক্তি রীতিমত স্ফর্ত্তি পাইতে পারে। কিন্তু বাহ্য বস্তুও যেমন—মানসিক চিন্তাও তেমনি—উভয়ের কোনটিই সাক্ষী চৈতন্য নহে; হস্তীও আমি নহি—হস্তিচিন্তাও আমি নহি; শরীরও আমি নাহি—শরীরচিন্তাও আমি নহি, তবে কি? না সেই সকল বস্তুর এবং সেই সকল চিন্তার সাক্ষী পুরুষই আমি-শব্দের বাচ্য। সাক্ষী চৈতন্য সাদা বস্তু দেখিবার সময় সাদা হয় না—কালো বস্তু দেখিবার সময় কালো হয় না; দুই বস্তু দেখিবার সময় দুই হয় না—তিন বস্তু দেখিবার সময় তিন হয় না; সাক্ষী চৈতন্য হস্তি-চিন্তার সময়েও হস্তী হয় না—অশ্ব-চিন্তার সময়েও অশ্ব হয় না; বস্তু-বৈচিত্র্যে সাক্ষী-চৈতন্যের বৈচিত্র্য হয় না; সুতরাং চিন্তার হ্রাস বৃদ্ধিতে সাক্ষী চৈতন্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সাক্ষী চৈতন্য আপনার সতেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী—নিস্তেজ চিন্তা-শক্তিরও সাক্ষী। নিদ্রাকর্ষণের সময় তো চিন্তাশক্তি খুবই নিস্তেজ হয়, কিন্তু তখনও সাক্ষী চৈতন্য এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থায় প্রবেশ করিয়া পরম সুখ উপলব্ধি করে; এই জন্যই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মুখে এ কথা শোভা পায় যে, "কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"; কারণ, নিদ্রাকালে যদি সে ব্যক্তি পরম সুখের অবস্থা উপলব্ধি না করিত, তবে পরবর্ত্তী কালে সে বৃত্তান্তটি কখনই তাহার স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইতে পারিত না; কেননা পূর্ব্বে যে-বিষয় সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছে, সেই বিষয়ই কেবল পশ্চাতে স্মরণে উপস্থিত হইতে পারে; অতএব নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির যখন দিব্য স্মরণ হইতেছে যে, কল্যরাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন নিদ্রাকালে সে সুখ অবশ্যই তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল। আমার বেস্ স্মরণ হইতেছে যে, অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি প্রভাত বাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছি—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে উক্ত সময়ে (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) বাস্তবিকই আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এইরূপ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই যে একটি

বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে যে, কল্য রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে নিদ্রাকালে সে ব্যক্তি (স্মরণে নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানে) পরম সুখ অনুভব করিয়াছিল। অতএব নিদ্রাবস্থায় যখন চিন্তা-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে—সাক্ষী চৈতন্য তখনকারও সুখাবস্থার সাক্ষী—সুতরাং সে আপনি সে-অবস্থা হইতে ভিন্ন। সাক্ষী চৈতন্য নিজে জাগ্রদবস্থাও নহে, স্বপ্নাবস্থাও নহে, সুযুপ্তি অবস্থাও নহে—পরন্তু তিন অবস্থারই সাধারণ সাক্ষী। শ্রীদ্বি]

মাংসপেশী ও মস্তিস্কে যে শক্তি সঞ্চয়ের উল্লেখ করা গেল সেই সঞ্চিত শক্তি বাস্তবিক কিরূপ তাহারও আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা অণুক্ষণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ কারতেছি। এই দ্বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিঃশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরস্থ নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থ পরিত্যক্ত এবং প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু হইতে অম্লযান গৃহীত হয়। * পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিদ্রাকালে যে পরিমাণ (মুক্ত ও মিশ্রিত) অম্লজান নিঃশ্বাস যোগে বহির্গত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ প্রশ্বাস যোগে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ গৃহীত অতিরিক্ত অম্লজান শোণিত আদিতে সঞ্চিত থাকে। সেই সঞ্চিত অম্লজান শারীর পদার্থের সহিত রাসায়নিক আদিরূপে মিশ্রিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। সেই উৎপন্ন তাপই বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকার শারীর শক্তির মূল। এ জন্য যদি কোন কারণবশতঃ অম্লজান গ্রহণের ব্যাঘাত হয় তবে শারীর ক্রিয়া এবং মানসিক কার্য্য সমুদয়েরই ব্যত্যয় জন্মে। এই হেতুই পীড়া বিশেষে মানসিক বিকার এবং প্রলাপ আদিও হইতে দেখা যায়।

[নিশ্বাস প্রশ্বাসজ উত্তাপ ব্যতিরেকে শরীর কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া সে উত্তাপকে সাক্ষী চৈতন্য বলা যাইতে পারে না; কে তবে সাক্ষী চৈতন্য? না সেই উত্তাপের ফলভোক্তা—সেই উত্তাপের উপলব্ধিকর্ত্তা—সেই উত্তাপের জ্ঞাতা। শ্রী দ্বি]

জীব-শরীরে দুই প্রকার পদার্থ আছে। মৃত এবং জীবিত। যথা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থ শ্বেত ও ধূসর পদার্থ। শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শারীর মৃত এবং জীবিত পদার্থের সহিত এক দিকে কাষ্ঠ ও দহনোৎপন্ন জল আদি এবং অন্য দিকে অনলের তুলনা হইতে পারে। যখন কাষ্ঠস্থিত ইন্ধন বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত রাসায়নিক রূপে মিশ্রিত হইতে থাকে, তখন সেই মিশ্রণশীল অবস্থার নাম অনল। উক্ত মিশ্রণ সমাপ্ত হইয়া যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহা জল আদি। এস্থলে কাষ্ঠ ও জলকে মৃত এবং অনলকে জীবিত বলা যাইতে পারে। কারণ শারীর মৃত পদার্থ সকল কাষ্ঠ বা জলের ন্যায় শরীরান্তর্গত বিশেষ প্রকার মিশ্রণ কার্য্যের পূর্ব্ব এবং শেষ এবং দৈহিক জীবিত পদার্থ অনলের ন্যায় সেই বিশেষ প্রকার মিশ্রণশীল অবস্থা। আর

* প্রভাত বাবু এখানে একটি শব্দের ভুল করিয়াছেন; নিশ্বাস না লিখিয়া তিনি নিঃশ্বাস লিখিয়াছেন, এবং তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই নিঃশ্বাস। কিন্তু আমাদের দেশীয় ভাষায় নিঃশ্বাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। নির্ব্বাসের নি বিসর্গ যুক্ত বটে কিন্তু নিবাসের নি বিসর্গ-যুক্ত নহে। সংস্কৃত ভাষার নিঃ = লাটিন ভাষার ex; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার নি = লাটিন ভাষার in। নিশ্বাস-কিনা inbreathing। সংস্কৃত ভাষার প্র = Latin ভাষার pro = ইংরাজি ভাষার forth; প্রশ্বাসকিনা প্রক্ষিপ্ত propelled শ্বাস — breathing forth; অতএব, যে শ্বাস নির্গত হয় তাহাই প্রশ্বাস। শ্রী দ্বি]

যেরূপ দহন হইতে তাপ উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন কাষ্ঠকেও দগ্ধ অর্থাৎ দহনে পরিবর্ত্তিত করে, সেইরূপ জৈবনিক মিশ্রণ হইতেও বিশেষ প্রকার বল উৎপন্ন হইয়া সংলগ্ন মৃত পদার্থকে জীবিত পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। অর্থাৎ অনলে যেরূপ সদৃশ অনল উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করে, শারীর জীবিত পদার্থেও সেইরূপ সদৃশ জীবিত পদার্থ উৎপাদন করিবার বল উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব অনল এবং জীবিত পদার্থ উভয়েই বিশেষ বিশেষ বলের আকর। কিন্তু কাষ্ঠ এবং মৃত পদার্থে বিশেষ বিশেষ প্রকার বল আবদ্ধ থাকিলেও উহারা অনল ও জীবিত পদার্থের ন্যায় বলশালী নহে।

[প্রভাত বাবু এতগুলা কথা কি উদ্দেশে বলিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার অভিপ্রায় যদি এইরূপ হয় যে, ধূসর পদার্থই সাক্ষী চৈতন্য বা আত্মা, তবে তাঁহার সে কথায় আমরা কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না। আমরা বলি যে সেই ধূসর পদার্থের জৈবনিক কার্য্যের ফলভোক্তাই আত্মা; কেননা ধূসর পদার্থ নিজে কিছু আর তাহার নিজের কার্য্যের ফল-ভোগ করে না। শ্রীদ্বি]

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলির শ্বেত পদার্থ মৃত এবং ধূসর পদার্থ জীবিত। শ্বেত পদার্থ আবার সূত্রাকৃতি। সূত্র সকল স্নায়বীয় কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত হইতে হইতে পারিধ (peripheral) প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত আছে। স্নায়বীয় সূত্র সকল আবার অল্প অল্প দূর অন্তর জীবিত ধূসর পদার্থের পুঞ্জ সম্বলিত। ইহাতে স্নায়বীয় বল চালনার এই সুবিধা হয়ঃ—কোন স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইলে তাহা প্রবাহমান হইতে থাকে আর বাহক সূত্রের মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থ পুঞ্জ সকল হইতে বল গ্রহণ করিয়া ক্রমে পোষিত হইতে হইতে চলিতে আরম্ভ করে। এখন মনে কর তোমার হস্তাঙ্গুলিতে আমি চিমটি কাটিলাম। ইহাতে চিমটির স্থানে একটী বল উৎপন্ন হইল। সেই বল স্নায়ুযোগে প্রবাহিত হইয়া বোধ-গ্রাহক স্নায়ুকেন্দ্রে যাইয়া কার্য্য করিল তাহাতে তথায় আর একটী বল উৎপন্ন এবং অঙ্গুলিতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে চিমটির উত্তেজনা হইতে অপসারিত করিল। এস্থলে যদি তুমি জাগরিত থাক তবে সেই বোধ-গ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার। কিন্তু যদি তুমি নিদ্রিত থাক তবে উক্ত বল তোমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই অঙ্গুলীকে চিমটি হইতে অপসৃত করিবে। যদি ভেকের মস্তিষ্ক ফেলিয়া দিয়া এই পরীক্ষাটী করা যায়, তবে আমাদের এই উক্তি আরো বিশদ রূপে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ, পরিচালনা ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য চেতনা আবশ্যক নহে।

[প্রভাত বাবু এইমাত্র বলিলেন যে "যদি তুমি জাগরিত থাক তবে তোমার বোধ-গ্রাহক কেন্দ্রের উৎপন্ন বল তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়াতে তাহাকে প্রবাহিত হইতেও দিতে পার এবং না হইতেও দিতে পার।" তাই আমরা বলি যে, স্নায়বিক কার্য্যের উপর তোমাদের ঐ যে কর্ত্তৃত্ব—উহা স্নায়ু যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক যন্ত্রেরও নহে, কিন্তু স্বয়ং সাক্ষী চৈতন্যের। নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই করিতে

পারে; এ ভিন্ন, স্বকার্য্য করা না করা কোন যন্ত্রেরই কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব যাহার আছে, তাহা স্নায়বীয় যন্ত্র নহে কিন্তু স্নায়বীয় যন্ত্রের যন্ত্রী—সাক্ষী চৈতন্য আত্মা। শ্রীদ্বি]

যে চৈতন্য স্নায়বীয় উত্তেজনা গ্রহণ করে তাহা বাস্তবিক কিরূপ দ্রব্য এখন সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। বিজ্ঞান মতে বলের (তাহা তাপাদির আকারেই হউক, বা সামান্য জড় কণিকার গতিরূপেই হউক) কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কোন বস্তুর গতি জন্মিতে পারে না। এবং কোন গতি উৎপন্ন হইলে তাহা আপনা হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে চিমটি কাটার দরুণ যে বল উৎপন্ন হইয়া স্নায়ু যোগে মস্তিষ্কে নীত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবেই জড়ীয় গতি।

[এইরূপ জড়ীয় গতি ভৌতিক রাজ্যেই দেখা গিয়া থাকে—আধ্যাত্মিক রাজ্যে নহে। ঘড়ির নিজের চলা-ফেরা'র উপরে যেমন তাহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, প্রকৃতির নিজের জড়ীয় গতির উপরে তেমনি প্রকৃতির নিজের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না; আত্মাই কেবল প্রকৃতির গতি'কে অভীষ্ট পথে নিয়মিত করিতে পারে। শ্রী দ্বি]

ক্রমশঃ

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

শ্রেয় প্রেয় নাম, পুণ্য পাপ ধাম, দুটী পথ বিদ্যমান।
প্রেয় পরিহরি, শ্রেয় পথ ধরি, সাধুজন তা'তে যান॥

এ ঘোর সংসারে, মোহের পাথারে,
যবে তুমি দিশাহারা।
বিষম তুফানে, যাইতে উজানে,
হয়েছিলে প্রায় সারা॥

হেন দুরদিনে, তোমা দীন হীনে,
কে চাহিল দয়া করি।
পদতরী দিল, কূল দেখাইল,
উদ্ধারিল দয়া করি॥

পাপীর শরণ, অধম তারণ,
দয়াময় তিনি হ'ন।
পাপীরে তারিতে, শুভ মতি দিতে,
কত তাঁর আকিঞ্চন॥

প্রেয় বিনা সার, না ছিল তোমার,
মাতিলে বিষয় রসে।
জীবন ধারণ, কর কি কারণ,
ভুলিলে মায়ার বশে॥

অমৃতের কথা, সে পথ বারতা,
না শুনিলে তুমি কানে।
যিনি প্রেমদাতা, পিতা মাতা পাতা,
চাহিলে না তাঁর পানে॥

শ্রেয়ের সোপান, মঙ্গল নিদান,
কে তবে দেখায়ে দিল।
"পাপেতে মগন, আত্মার নিধন,"
কানে কানে কে বলিল॥

"কেন এলে ভবে, কোথা যে'তে হবে"
কে তোমারে সুধাইল।
"লইয়া জঞ্জাল, কেন হর কাল"
কে তোমারে প্রবোধিল॥

যে চাহেনা তাঁরে, ভোলে আপনারে,
পাপেতে অসাড় হিয়া।
তারেও ফেরান, হৃদয় গলান,
অনুতাপ অশ্রু দিয়া॥

তিনি অনুক্ষণ, করেন চেতন,
পাপীর হৃদয়ে আসি।

তিনি না শোধিলে, কৃপা না করিলে,
বাড়িত পাপের রাশি ॥

মোরা অভাজন, তবু কদাচন,
ত্যজ্য পুত্র নহি তাঁর।
কাছেতে ডাকিয়া, মলা মুছি দিয়া,
কোল দেন আপনার ॥

পাপেরে রোধিতে, সুমতি পালিতে,
কর দেখি তুমি পণ।
অমনি সে পণ, করিতে রক্ষণ,
তিনি দেন সুঘটন ॥

শ্রেয়েতে চলিতে, পর্ব্বত লঙ্ঘিতে,
প্রয়োজন যদি হয়।
তাহাও পারিবে, অসাধ্য সাধিবে,
ঘুচাবেন তিনি ভয় ॥

তাঁহারে ছাড়িলে, সংসারে সেবিলে,
ফাঁপরে পড়িবে হায়।
মৃগ তৃষ্ণিকায়, বল কে কোথায়,
অমৃতের কণা পায় ॥

ক্রমশঃ।

—০—

সমালোচন।

Philosophy of the Bhagavadgita. A Lecture by Baboo Radhanath Basak B. A.

গীতা-তত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা শ্রীযুক্ত রাধানাথ বসাক বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত। গ্রন্থকার এই বক্তৃতাটীতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের সারার্থ বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া গীতার ভাব সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও তৎসঙ্গে spiritual culture অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী প্রকটিত আছে তাহাতে তাঁহার ভক্তি প্রবণতা, সহৃদয়তা, ও পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে গাঢ়াভিনিবেশ দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইলাম। পাঠকদিগের তৃপ্তিসাধন জন্য আমরা ঐ প্রবন্ধ হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

From the commencement of spiritual culture, with the first glimpse of faith, to the state of constant communion with God, there are clearly two peculiar phases; to external appearance the first is a busy life; the second a comparatively secluded life. In regard to the internal state, the first shows the state of war with passions, their subjugation, the predominance of the highest motives in the performance of works tending to the welfare of men in general, a view of all mankind with an equal eye in regard to the relationship of God as Father, and a state of increasing happiness in consequence of internal peace. The second shows constant equanimity of mind and entire devotion to God. During the whole period of these stages, there is only one force at work—that of faith, holding God always in view. Man has to do nothing more than to leave himself to God, and then God does the rest in drawing man towards Himself.

ইহার মর্ম্মার্থ এই। সাধনের প্রথমাবস্থায় আত্মাতে নিকৃষ্ট রিপুদিগের সহিত সংগ্রাম—দেবাসুরের যুদ্ধ ক্রমে রিপুগণের উপর প্রভুত্ব, ঈশ্বরে একান্ত মতি, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন অনুরাগ তৎপরে শান্তি ও আনন্দ ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর। নির্ভরের অবস্থায় সাধক আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি একান্তে সমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁহাকে অলক্ষিতরূপে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন ও আপনার অমৃত ধামে স্থান দেন।

সুরাপান বা বিষপান। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক প্রণীত।

গ্রন্থকার সুরাপানের বিষময় ফল বিস্তারিতরূপে বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া বঙ্গীয় জনসমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। সুরাপান দ্বারা মানুষের কাইক মানসিক আধ্যাত্মিক প্রভৃতি কত প্রকার বিজাতীয় ঘোরতর অনিষ্ট হয়, মানুষ কিরূপ মনুষ্যত্ব হীন পশুবৎ হইয়া যায়, দেশ বিদেশ উৎপন্ন অনেক বাস্তব ঘটনা উদাহরণ দিয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুরাপান যে বাস্তবিক বিষপান তাহা তিনি বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাকে সাধুবাদ। তাঁহার গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে সমাদরে রক্ষিত হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

———

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রথম কল্প

অর্থাৎ ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে ১৮৭৬ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত চারি বৎসরের পত্রিকা অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য অগ্রিম ১২৲ টাকা; পশ্চাদ্দেয় ১৬৲ টাকা।

১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার সুপ্রসিদ্ধ সভ্যগণ ৪ বৎসর ধরিয়া যে সকল তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলেন সেই সকল, এবং তাহার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইলে দেশ দেশান্তরবাসী মহামহোপাধ্যায় বিদ্বন্মণ্ডলী অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে যে সকল তত্ত্বের বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এই প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের মর্ম্ম এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বিচার সহকারে বিবৃত হইয়াছে। এদেশের আধুনিক অভ্যুদয়ের প্রথম সময়ের সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্মের যে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পে আছে।

এই কল্প এক্ষণে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে অনেক ব্যক্তি এতদন্তর্গত কোন কোন মূল্যবান প্রবন্ধ পৃথক্ মুদ্রিত করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের অভীষ্টমত ফল হইবে না ভাবিয়া আমরা সমুদায় কল্পটী পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কল্পের কয়েক খণ্ড ৫০ টাকা করিয়া মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই নূতনমুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের উপরোক্ত মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ইহাতে অনেক চিত্র, মানচিত্র এবং পারসী প্রভৃতি অক্ষরের আবশ্যক হওয়াতে ইহার মূল্য এতদপেক্ষা আর কমাইতে পারা গেল না। কলিকাতার গ্রাহকেরা মাসিক এক টাকা কিম্বা ত্রৈমাসিক তিন টাকা করিয়া দিলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে এতদতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে এইরূপে অগ্রিম মূল্য ৫৲- দান করিয়া গ্রাহকেরা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। যাঁহারা ১২ টাকা একবারে দিবেন, তাহা[illegible] সাহায্যকারী স্বরূপ গণ্য করা যাইবে। তাঁহাদিগকে সমস্ত পুস্তক একত্রে বাঁধাইয়া দেওয়া যাইবে।

আমার নামে পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ	শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।	কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।
৫৪৪ সংখ্যা
১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মানবীকরণই বটে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি চৈতন্য না থাকে তবে সেই গতি নিবন্ধন মস্তিষ্কের সঞ্চার-বিশেস হইতেই আর একটী গতি উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি চৈতন্য থাকে তবে উক্ত দ্বিতীয় গতি মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে এবং না হইতেও পারে।

[অতএব প্রমাণ হইল যে, এরূপ কর্ত্তৃত্ব চৈতন্যেরই কর্ত্তৃত্ব—স্নায়ু-যন্ত্রেরও নহে—মস্তিষ্ক যন্ত্রেরও নহে। কেননা, কোন যন্ত্রই আপনার গতিকে আপনি নিয়মিত করিতে পারে না; এক কেবল চৈতন্যই তাহা পারে। শ্রীদ্বি]

গতি যদি উৎপন্ন হয় তবে কিসে তাহা উৎপন্ন হয়? প্রথম গতিতে? না, চৈতন্যে? যদি প্রথম গতিতেই দ্বিতীয় গতি উৎপন্ন হয়, তবে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হয়। আর যদি চৈতন্যের প্রভাবে গতি উৎপন্ন হয়, তবে তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ? বিজ্ঞান মতে কোন জড় পদার্থ একবার গতিবিশিষ্ট হইলে যে পর্য্যন্ত অন্য কোন জড় বস্তু আসিয়া তাহা গ্রহণ না করিবে সেই পর্য্যন্ত তাহা গমনই করিতে থাকিবে এবং কোন গতির কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কোন জড়ের গতি উৎপন্ন হইতেও পারে না। সুতরাং চৈতন্য যদি কোন জড়াতীত ব্যক্তিই হয়, তবে তাহা যে কিরূপে প্রথম গতি রহিত করিয়া দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করে ইহা চৈতন্যবাদীরাই বলিতে পারেন, বিজ্ঞানে বলিতে পারে না।

[প্রভাত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি কিরূপে আরএকটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হয়—এই সোজা বৃত্তান্তটিও বিজ্ঞানে বলিতে পারে কি? আর, বিজ্ঞানে তাহা বলিতে পারে না বলিয়াই কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, একটা মৃৎপিণ্ডের গতি আরেকটা মৃৎপিণ্ডে সঞ্চারিত হইতে পারে না? আশ্চর্য্য ব্যাপার! বৈজ্ঞানিক চূড়ামণি স্পেন্সর কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হৌক্;—

"It is an established mechanical truth that if a body moving at a given velocity

strikes an equal body at rest in such wise that the two move on together, their joint velocity will be but half that of the striking body. Now it is a law of which the negative is inconceivable that in passing from any one degree of magnitude to another all intermediate degrees must be passed through, or in the case before us, a body moving at velocity 4 cannot by collision, be reduced to velocity 2, without passing through all velocities between 4 and 2. But were matter truly solid—were its units absolutely incompressible and in unbroken contact—this "law of continuity" would be broken in every case of collision. For when of two such units, one moving at velocity 4 strikes another at rest, the striking unit must have its velocity 4 instantaneously reduced to velocity 2; must pass from velocity 4 to velocity 2 without any lapse of time, and without passing through intermediate velocities; must be moving with velocities 4 and 2 at the same instant, which is impossible." ইহার ভাবার্থ এই;

বিজ্ঞানের একটি স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, একই ওজনের দুইটি গোলা যদি ঐকান্তিক নিরেট হয় অর্থাৎ যদি কোন অংশেই স্থিতিস্থাপক না হয়, আর, একটির স্থির অবস্থায় আর একটি যদি তাহাকে চারি-মাত্রা বেগে আঘাত করে তবে তৎক্ষণাৎ আঘাতকারী গোলাটির চারিমাত্রা বেগ ঘুচিয়া গিয়া দুইটি গোলাই দুই মাত্রা বেগে চলিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু চারিমাত্রা বেগ ক্রমে ক্রমে না কমিয়া এক মুহূর্ত্তেই কেমন করিয়া দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় ইহা কোন বিজ্ঞানেই বলিতে পারে না। এই তো গেল স্পেন্সরের কথা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান যাহা বলিতে পারে তাহা সে বলিতে পারে, যাহা সে বলিতে পারে না তাহা সে বলিতে পারে না; কিন্তু যাহা সে বলিতে পারে না, তাহা বলিতে না পারিবার অপরাধে যাহা সে বলিতে পারে তাহা কাঁচিয়া যায় না। বিজ্ঞান এটা যদিও বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া আঘাতকারী গোলার চারিমাত্রা বেগ এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা হইয়া দাঁড়ায় অথবা কেমন করিয়া স্থির গোলাটিতে এক মুহূর্ত্তেই দুই মাত্রা বেগ সঞ্চারিত হয়, তথাপি. বিজ্ঞানের এটা একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে, গোলাদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থায় তাহাদের গতি ঐরূপ হইতেই হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাটি বিজ্ঞান বলিতে পারে না বলিয়া বিজ্ঞানের শেষোক্ত স্থির সিদ্ধান্তটিও কি কিছুই নহে? অতএব, এ কথা যদি সত্যও হয় যে, চৈতন্য নিজে গতি-শূন্য হইয়া কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে—ইহা আমরাও বলিতে পারি না—বিজ্ঞানও বলিতে পারে না, তথাপি, চৈতন্য বাস্তবিকই যে ঐরূপ করে—ইহা স্বীকার করিতে আমাদেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, বিজ্ঞানেরও কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। সূর্য্য লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়াও কেমন করিয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করে—বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না, অথচ বিজ্ঞান বলে যে, সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে; তেমনি চৈতন্য গতিহীন হইয়াও কেমন করিয়া হস্তপদাদির গতি পরিবর্ত্তন করে—তাহা আমরা বলিতে পারি না, অথচ এটি আমরা ধ্রুব রূপে উপলব্ধি করি যে, চৈতন্য বাস্তবিকই তাহা করে। কেন না, যিনিই যখন আপনার হস্তপদ চালনা করেন, তিনিই তখন অন্তঃকরণে ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করেন যে, আমিই আমার হস্তপদ চালনা করিতেছি। আমি যখন এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি তখন স্বয়ং বৃহস্পতি আসিয়াও যদি আমাকে বলেন যে, তোমার লেখনীটিকে তুমি চালাইতেছ না—আর কেহ চালাইতেছে,

তবে তাঁহার কথা আমি প্রাণান্তেও বিশ্বাস করিব না। আমার আপনার কর্ত্তৃত্ব-মূলক কার্য্যে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করি; অন্যের কর্ত্তৃত্ব-মূলক কার্য্যে আমি অনুমান-বলে চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করি। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, জড়বস্তুর আপনার গতির উপর তাহার আপনার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, তখন কাজেই ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব-কার্য্য দেখিবামাত্রই আমরা তাহাতে চৈতন্যেরই হস্ত উপলব্ধি করি। চৈতন্য কোন রূপ গতি দ্বারা নহে—শুদ্ধ কেবল ইচ্ছা দ্বারা—হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তিত করে। প্রভাত বাবুর এই যে, একটি যুক্তি যে, চৈতন্য কেমন করিয়া হস্তপদাদি চালনা করে তাহা যখন আমরা বলিতে পারি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, চৈতন্য হস্তপদাদি চালনা করে না, এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। কালিদাসকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কেমন করিয়া শকুন্তলার ন্যায় এমন একটা নিরুপম কাব্য-মাধুরী উদ্ভাবন করিলে? কালিদাস হয় তো তাহা বলিতে পারিবেন না; তাহা হইলেই কি প্রমাণ হইল যে, তাহা যখন তিনি বলিতে পারেন না, তখন তিনি শকুন্তলার রচয়িতা নহেন? আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, কেমন করিয়া তুমি লেখ? আমি বলিব "লেখনী চালনা দ্বারা। কেমন করিয়া তুমি লেখনী চালনা কর? অঙ্গুলি চালনা-দ্বারা। কেমন করিয়া তুমি অঙ্গুলি চালনা কর? স্নায়ু বলের উত্তেজনা-দ্বারা। কেমন করিয়া স্নায়ুবলের উত্তেজনা কর? ইচ্ছা দ্বারা। কেমন করিয়া ইচ্ছা কর? এই স্থানটিতে "কেমন করিয়া" এ কথাটি জিজ্ঞাসা করা নির্ব্বোধের কার্য্য; কেন না, কেমন করিয়া ইচ্ছা-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা পর'কে বুঝাইবার কথা নহে, আপনি বুঝিবারই কথা। শ্রীদ্বি]

পরন্তু উহাঁরা যদি এই কথা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলেন তবে তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আর যদি বিজ্ঞান-মূলক বলেন তবে আমরা সেই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

এখন মনে কর যে, চৈতন্য জড়াতীত ব্যক্তি নহে, কিন্তু জড় শক্তি বিকাশের ফল মাত্র। এই অভ্যুপগম অনুসারে বিচার করিলে জানা যাইবে যে চিমটি কাটিলে যে প্রথম গতি উৎপন্ন হয় তাহা মস্তিষ্কে যাইয়া বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু তথায় এমত ভাবে ক্রিয়া করে যাহাতে সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইয়া চৈতন্য উৎপন্ন হয় অথবা চৈতন্য বিদ্যমান থাকিলে বিশেষ বেদনা জন্মিয়া থাকে।

[আমরা তো জানি—বিজ্ঞান শুধু বলে যে, গতি হইতে (সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয়) গতিই কেবল উৎপন্ন হয় (যেমন, সামান্য গতি হইতে সামান্য গতিও উৎপন্ন হইতে পারে, আর, বৈদ্যুতিক, ঔত্তাপিক, প্রভৃতি আণবিক (molicular) গতিও উৎপন্ন হইতে পারে) এ ভিন্ন কোন্ বিজ্ঞানে এরূপ কথা বলে জানি না যে, গতি হইতে গতির ফলভোক্তা, বা গতির নিয়ামক, বা গতির উপলব্ধি-কর্ত্তা, উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান-বেত্তা পণ্ডিতেরা যদি গতি-সম্বন্ধীয় অমন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব সত্য সত্যই আবিষ্কার করিয়া থাকেন—তবে এত দিনে তাহা গতি বিজ্ঞানে (Dynamics) স্থান পাইত—তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই। কিন্তু কই? কোথাও তো তাহা দেখিতে পাই না। কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা বিজ্ঞানের ক-অক্ষরও

জানেন না—তাঁহাদের মুখেই ঐ সকল অমূলক কথা শোভা পায়, প্রভাত বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য লোকের মুখে তাহা কোনক্রমেই শোভা পায় না। শ্রীদ্বি]

অতএব চৈতন্য এবং বেদনা বোধ যখন সঞ্চিত জড় শক্তির বিকাশ মাত্র, তখন তাহাতে যে একটী দ্বিতীয় গতি উৎপাদন করিবে ইহা সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞান বহির্ভূত নহে।

[পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, একটা ধাবমান গোলাতে তো যথেষ্ট জড়-শক্তির বিকাশ আছে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তো বিজ্ঞান বলিতে পারে না যে, কেমন করিয়া তাহা একটা স্থির গোলাতে গতির সঞ্চার করে। অতএব কেমন করিয়া গতি সঞ্চারিত হয়—ইহা বিজ্ঞানও বলিতে পারে না—আমরাও বলিতে পারি না; কিন্তু বিজ্ঞানেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশীল বস্তু হইতে স্থির বস্তুতে গতি সঞ্চারিত হয়, আমাদেরও এ কথা সত্য যে, বাস্তবিকই গতিশূন্য চৈতন্য কর্ত্তৃক হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা যদি বলিতাম যে গতিশূন্য চৈতন্য হইতে গতির সৃষ্টি হয়; তাহা হইলে অবশ্য প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, ও কথাটি নিতান্তই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেননা বিজ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, সমস্ত জড়জগতের মোট গতির হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না। আমরা কেবল বলিতেছি এই যে, চৈতন্য শুদ্ধ কেবল গতির পরিবর্ত্তন কর্ত্তা—গতির নিয়ামক। আমরা যদি বলিতাম যে, গতিশূন্য চৈতন্য বহির্জগতে গতি প্রদান করে তাহা হইলেই প্রভাত বাবু বলিতে পারিতেন যে, চৈতন্যের নিজেরই যখন গতি নাই তখন সে কিরূপে গতি প্রদান করিবে? যাহার ধন নাই সে কিরূপে ধন-দান করিবে? কিন্তু আমরা আদবেই তাহা বলি না; আমরা বলি এই যে, সমস্ত জড় জগতের মোট গতি যাহা আছে—তাহার ইয়ত্তা (Quantity) চিরকালই সমান; কোন-কালেই তাহার ন্যূনাধিক হয়ও না হইতে পারিবেও না। ইহা সত্ত্বেও গতির পরিবর্ত্তন দুইরূপে সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যথা;—(১) এক জড়বস্তুর গতি অন্য জড়বস্তুর গতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; (২) চৈতন্য দ্বারা জড়বস্তু বিশেষের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। গতির পরিবর্ত্তন বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে—গতির নূতন-সৃষ্টিই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। চৈতন্য নিজে বর্ণহীন হইয়াও যদি শ্বেতাদি বর্ণ দর্শন করিতে পারিল তবে সে নিজে গতিহীন হইয়াও হস্ত পদাদির গতি পরিবর্ত্তন করিবে—ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? শ্রীদ্বি]

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চৈতন্য স্থির পদার্থ নহে। তাহা কখন কখন বিদ্যমান থাকে ও কখন কখন অন্তর্হিত হইয়া যায়। এবং কিছু কাল বিদ্যমান থাকিলে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে আর বিদ্যমান থাকিতে পারে না; তখনই নিদ্রা আবশ্যক হয়। সেই নিদ্রা নিবন্ধন বিশেষ শক্তি সঞ্চিত হইলে চৈতন্যের পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে।

[নিদ্রাবস্থাতেও যে সাক্ষী চৈতন্য অন্তর্হিত হন না, তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রার সময়ে এক প্রকার সূক্ষ্ম আরামের অবস্থা জ্ঞানে অনুভূত হয় তাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্মরণ হয় যে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। নিদ্রাকালে যদি আমার জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইত, তবে জাগিয়া উঠিবার সময় আমি নিছক অজ্ঞানের গর্ত্ত হইতে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই-

তাম,—সুতরাং তাহা হইলে আবার আমাকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতে হইত। শ্রীদ্বি]

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি চৈতন্য জড় শক্তিরই বিকাশ হয়, তবে তাহা কিরূপে আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? বাস্তবিক আলোক আদির উত্তেজনাই চৈতন্য বিকাশের কারণ। প্রাণিগণ সর্ব্বদাই আলোক তাপ আদিতে পরিবেষ্টিত। সেই পরিবেষ্টক আলোক আদি নিয়তই প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ক্রিয়া করে। সেই ক্রিয়া নিবন্ধন মস্তিষ্কের কার্য্য হইতে থাকে আর তথাকার সঞ্চিত শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তাহা অবশেষে এরূপ লাঘব হইয়া পড়ে যে আলোক আদির সামান্য উত্তেজনায় চেতনা রক্ষা করিতে পারে না। এই হেতুই শীত কালের দুর্ব্বল তাপে মর্ম্মট প্রভৃতি শীতাসহ জন্তুগণকে জাগরিত রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমুচিত নিদ্রা হইয়া শক্তির পুনঃ সঞ্চয়ের সহিত মস্তিষ্ক সতেজ হইয়া উঠিলে উক্ত সামান্য উত্তেজনেই আবার চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারে। এই হেতুই সুস্থ ব্যক্তিগণ দিবালোক প্রকাশিত হইলে আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না।

[বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, জড় শক্তির বিকাশ দ্বারা গতি উৎপন্ন হয়; যেমন, সূর্য্যের আকর্ষণশক্তির বিকাশ হয় কোথায়—ফল ফলে কোথায়? না পৃথিবীর বাৎসরিক গতিতে; জড়-শক্তি যদিও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা;—যান্ত্রিক রাসায়নিক এবং জৈবনিক; তথাপি, সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া—শুদ্ধ যদি কেবল জড়-বস্তুর প্রতিই লক্ষ নিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যান্ত্রিক (Mechanical) শক্তিই কেবল জড় বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি; কেননা, যান্ত্রিক শক্তিদ্বারাই জড়বস্তু-সকল পরস্পরের গতি-পরিবর্ত্তন করে; আর এই যে গতি-পরিবর্ত্তন—ইহা শুদ্ধ কেবল জড়-বস্তুরই গতি-পরিবর্ত্তন—চেতনের নহে। কিন্তু রাসায়নিক অথবা জৈবনিক শক্তি দ্বারা জড়-বস্তুর গুণ-পরিবর্ত্তন যাহা [illegible] হয়—সমস্তই ইন্দ্রিয়-মূলক; সুতরাং তাহা জড়বস্তুর নিজের গতি-পরিবর্ত্তন নহে, কিন্তু জীব চৈতন্যের অবস্থা-পরিবর্ত্তন। উদজন এবং অম্লজন বাষ্প যথা-পরিমাণে মিশ্রিত হইলে আমাদের নেত্র-সমক্ষেই তাহা জলরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু উক্ত বস্তু দ্বয়ের নিজের অভ্যন্তরে শুদ্ধ কেবল যান্ত্রিক শক্তিই কার্য্য করে, এবং তাহার ফল শুদ্ধ কেবল আণবিক গতি-পরিবর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হয়। এ যাহা বলিলাম—মোটামুটি বলিলাম। কিন্তু সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে—সাক্ষী-চৈতন্যকে পৃথক্ রাখিয়া জড়-বস্তুকে স্বতন্ত্ররূপে ভাবা—মনুষ্যের শুধু নয়—দেবতারও সাধ্যাতীত। যখন আমি আলোক ভাবি, তখন আমি চক্ষে দেখা আলোক ভাবি; যাহা কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই ও দেখিতে পারে না—এরূপ আলোক আলোকই নহে। শূন্য আকাশকে আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখি না বটে—কিন্তু তথাপি তাহাকে আমরা মনশ্চক্ষে দেখি। গতি কাহাকে বলে? না সেই মনশ্চক্ষে দেখা আকাশের স্থান-পরিবর্ত্তন। কিন্তু মোটামুটি এরূপ বলিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না যে, যান্ত্রিক শক্তি-প্রবর্ত্তিত গতিই কেবল জড়-বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি তা ভিন্ন জড়-বস্তুর আর যত প্রকার গুণ আছে, সমস্তই ঐন্দ্রিয়ক গুণ—সুতরাং চেতন-সা-

পেক্ষ। অতএব শুদ্ধ কেবল জড়-শক্তি দ্বারা—যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা—গতি ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না; আলোকাদির উত্তেজনা চেতন-সাপেক্ষ। অগ্রে প্রাণী এবং তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকিলে তবে তো আলোক দ্বারা তাহার দৃষ্টি-শক্তি উত্তেজিত হইবে! অতএব আলোকাদি-জনিত উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণীর বিদ্যমানতা আবশ্যক; কেন না, অগ্রে প্রাণী না থাকিলে আলোকাদি দ্বারা কাহার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবে? তবেই হইতেছে যে, প্রাণী আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে—প্রত্যুত তাহা উক্ত উত্তেজনার আধার-স্বরূপ। যদি বল যে, আলোকাদির উত্তেজনার পূর্ব্বে প্রাণী ছিল বটে কিন্তু তখন সে জড় পদার্থ মাত্র ছিল, তবে তাহার উত্তর এই যে, যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে না—সে বস্তু আলোকাদি-দ্বারা উত্তেজিত হইতেও পারে না; এক কথায়, জড়বস্তু আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে না; কেবল যে বস্তু আলোকাদির উত্তেজনা অনুভব করে সেই বস্তুই (এক কথায় সচেতন বস্তুই) আলোকাদি দ্বারা উত্তেজিত হইতে পারে। কিন্তু "উত্তেজিত" এই শব্দের অর্থ ভুল বুঝিলে চলিবে না; দপ্ করিয়া যখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন আমরা বলিতে পারি যে, অগ্নি উত্তেজিত হইল; উত্তেজনা একটি মাত্র কথা, কিন্তু ইহাতে দুইরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে; এক অর্থ—আণবিক (Molicular) গতির বেগাধিক্য—যাহা অগ্নির অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে; আর এক অর্থ—গতি নহে কিন্তু দীপ্তি-বোধ—যাহা সচেতন জীবের ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে। এখানে আলোকাদির উত্তেজনা বলিতে পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তেজনা (কিনা গতি-বেগ মাত্র) বুঝিলে চলিবে না। কেন না, উত্তাপ জড়বস্তুতে তীব্রবেগসম্পন্ন গতি উৎপাদন করিতে পারে ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; আমাদের মন্তব্য কথা শুদ্ধ কেবল এই যে, উত্তাপ সচেতন প্রাণী ভিন্ন কোন প্রকার অচেতন পদার্থে তাপবোধ উৎপাদন করিতে পারে না। উত্তাপের অনুভব শক্তি যাহার আছে এমন যে সচেতন জীব, উত্তাপ কেবল তাহারই স্পর্শেন্দ্রিয়কে তাপানুভব দ্বারা উত্তেজিত করিতে পারে। অতএব অগ্রে অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন সচেতন জীব—তাহার পরে আলোকাদির উত্তেজনা; এ নহে যে, অগ্রে আলোকাদির উত্তেজনা—তাহার পরে সচেতন জীব। তবেই হইতেছে যে, সচেতন জীব আলোকাদির উত্তেজনার ফল-স্বরূপ নহে কিন্তু আধার-স্বরূপ। শ্রীদ্বি]

অতএব বিজ্ঞান মতে মস্তিষ্কই চিন্তার যন্ত্র। অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিশেষ হইতেই মানসিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আর মানসিক কার্য্য সমঞ্জস ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে মস্তিষ্কের এমত অবস্থা থাকারই নাম চৈতন্য। অতএব মস্তিষ্কের সহিত চৈতন্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। যেখানে মস্তিষ্ক আছে সেইখানেই চৈতন্য জন্মিতে পারে। যেখানে মস্তিষ্ক নাই তথায় চৈতন্য থাকিতে পারে না। সুতরাং মস্তিষ্কের অভাবে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এমত বলা "সৃষ্টি ছাড়া কার্য্য" এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত।

[প্রমেয় বিষয় দুইরূপ—(১) পরীক্ষাসিদ্ধ এবং (২) স্বতঃসিদ্ধ। পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য অকাট্যরূপে প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের যাথার্থ্য ঘরে বসিয়াই প্রমাণ করা যাইতে

পারে। প্রভাত বাবুর এই যে একটি কথা যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের চৈতন্য মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট ইহা বাস্তবিকই যদি পরীক্ষাসিদ্ধ হয় তবে তাহা শিরোধার্য্য করিতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালুকণাও নহে; আমরা কেবল এইটুকু মাত্র জানি যে, পৃথিবীস্থ জীবগণেরই মস্তিষ্ক যন্ত্র আবশ্যক—তাহাও আবার সকল জীবের নহে; আমীবিয়া নামক জীব শুদ্ধ কেবল একটা তল্‌তলে পিণ্ড মাত্র—তাহার না আছে মস্তিষ্ক—না আছে কিছু। প্রভাত বাবু যদি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন যে, জীবমাত্রই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট, তবে আমরা শুদ্ধ কেবল এই বলিব যে, তাঁহার পরীক্ষা শক্তির পক্ষ প্রলয় বিস্তীর্ণ; আমাদের পরীক্ষা শক্তি পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র কাজেই এ'র অত বড় একটা পালখ উঠিলে—এ তাহার ভারে চাপা পড়িয়া তদ্দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিবে। বহুপূর্ব্বে এক কালে যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবী জলে জলময়-ছিল তখন পৃথিবীতে মেরুদণ্ডধারী প্রাণীদিগের মধ্যে শুদ্ধ কেবল মৎস্য কুম্ভীরাদি শীতলশোণিত জীবদিগেরই একাধিপত্য ছিল—পৃথিবীতে তখন এইরূপ ছিল বলিয়া কিছু আর এটা প্রমাণ হয় না যে, তখন সমস্ত জগতেরই মেরুদণ্ডধারী জীব শীতল শোণিত ছিল। তেমনি অদ্যকার এই পৃথিবীতে উচ্চ শ্রেণীর জীব মাত্রেই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট ইহা যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত হইলেও তাহাতেই কিছু আর এটা প্রমাণ হয় না যে, সমস্ত জগতের সমস্ত উচ্চশ্রেণীর জীবই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট; কেননা, সমস্ত জগতের তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্র একরত্তি বালুকণাও নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এমন হইলেও হইতে পারে যে, সমস্ত জগতের সমস্ত জীবই মস্তিষ্ক যন্ত্র-বিশিষ্ট; তবে কি—না তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ; সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া না দেখিলে আমরা সে বিষয়ে হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না। অতএব প্রভাত বাবু যে কথাটি বলিতেছেন তাহা নিতান্তই পরীক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা যে কথাটি বলিতেছি তাহা স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং পরীক্ষা-নিরপেক্ষ; তাহা এই;—জগতের সকল বস্তুই পরের আকর্ষণে বিধৃত, সুতরাং পরাধীন; সুতরাং সমস্ত জগৎই পরাধীন বস্তুর সমষ্টি; প্রত্যেক সেনাই যদি পরাধীন হয়, তবে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী কাজে কাজেই পরাধীন। অতএব, জগতের সমস্ত বস্তুই যখন পরাধীন, তখন অবশ্য সমস্ত জগৎই পরাধীন। অতএব সমস্ত জগৎ কাহারো না কাহারো আশ্রয়াধীন; সমস্ত জগৎ যাঁহার আশ্রয়াধীন, তিনি নিজে পরাধীন হইতে পারেন না; কেননা এক পরাধীন অন্য পরাধীনকে আশ্রয় দান করিতে পারে না, ভীরু ভয়ার্ত্তকে অভয়-দান করিতে পারে না, অন্ধ অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ, সুতরাং তিনি মস্তিষ্কের অথবা বাহিরের অন্য কোন সামগ্রীর সাহায্য-নিরপেক্ষ। পরিপূর্ণ দ্বিগুণ সত্তাই—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সচেতন সত্তাই—যে, সমস্ত অপূর্ণ সত্তার মূলাধার, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। খণ্ড আকাশ-মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত এ সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য অশেষবিধ খণ্ড আকাশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই,—

আমরা ঘরে বসিয়াই অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত। পুনশ্চ, এক-স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে সরল পথই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ, এই সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য বক্র পথ মাপিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, উহা স্বতঃসিদ্ধ। সেইরূপ, অপূর্ণ পরাধীন জগৎ যে, পূর্ণ স্বাধীন পুরুষের আশ্রয় সাপেক্ষ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ—তাই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ। অতএব, যিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ তিনি মস্তিষ্ক যন্ত্রের অধীন নহেন। শ্রীদ্বি]

এরূপ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি মস্তিষ্কহীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়, না আরোপ না করাই বিজ্ঞানে শোভা পায়? সুতরাং ডাক্তার ডিণ্ডেল্ প্রভৃতি যে, ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় বলিয়া তাঁহাতে চৈতন্য আরোপ করিতে চাহেন না তাহাই বিজ্ঞান অনুগত? না, দ্বিজেন্দ্র বাবুর মস্তিষ্কহীন ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করাই বিজ্ঞান-সঙ্গত? যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু ঈশ্বরকে মস্তিষ্ক-যুক্ত ব্যক্তিই বলেন তবে তাঁহার ঈশ্বর আমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর যদি তিনি ঈশ্বরকে মস্তিষ্ক-হীন বলিয়া তাহাতে চেতনা আরোপ করিতে চাহেন তবে তিনি এরূপ ব্যক্তির আদর্শ কোথায় দর্শন করিয়াছেন? যাহার কোন আদর্শ পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কল্পনা যে বিজ্ঞান-সঙ্গত ইহা তিনি কোন্ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন করিবেন?

[নিউটন কি কোথাও দেখিয়াছেন যে, কোন একটি জড়পিণ্ড অবাধিত গতিতে চলিয়া অনন্তকাল সরল-রেখা পথ পরিভ্রমণ করিয়াছে? তিনি তাহা কস্মিন্ কালেও দেখেন নাই—আর-কেহও তাহা দেখে নাই দেখিবে না। অথচ তিনি এই সত্যটি কৃতবিদ্য-সমাজে প্রচার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই যে, কোন একটি চলমান বস্তু কোন প্রকার বল দ্বারা বাধিত না হইলে তাহা অনন্তকাল সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটনের এ কথাটি এরূপ নহে যে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে; এক কথায়—তাহা স্বতঃসিদ্ধ; যথা;—পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাই—কারণ ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না—এ তত্ত্বটি স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং বিনা কারণে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন সম্ভবে না; অতএব চলমান বস্তু বল দ্বারা বাধিত না হইলে একই সরল-রেখা পথে চলিবে। নিউটন্ কোন জড়পিণ্ডকেই অনন্ত কাল সরল রেখা পথে চলিতে দেখেন নাই ইহা খুবই সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাঁহার উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া গেল? আমরা জগতের কুত্রাপি পরিপূর্ণ সত্য দেখি নাই দেখিবও না, ইহা তেমনিই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়াই কি এই সুস্পষ্ট স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি একেবারেই কিছুই না যে, অপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন? স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সকল-প্রমাণেরই মূলাধার; যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন, তাঁহাদের উপর শ্লেষ দিয়া আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ দর্শনকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা এমনি মহাপণ্ডিত যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে সেই জ্ঞানকে (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে) তাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা আয়ত্ত করিতে যা'ন; যে অগ্নি

কাষ্ঠকে দহন করে সেই অগ্নিকে তাঁহারা কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে যান।” ইহার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত;—মনে কর চন্দ্র-লোক হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল যে, চন্দ্র-লোকে সমস্ত কাকই শ্বেতবর্ণ; ইহার আমি এই উত্তর দিব যে, সাদা কাক আমিও দেখি নাই পৃথিবীস্থ অন্য কোন মনুষ্যও দেখে নাই, কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ যে, চন্দ্র-লোকের সকল কাকই শ্বেতবর্ণ তখন তোমার কথায় অবিশ্বাস করিবার আমি কোন কারণ দেখি না; তুমি যাহা বলিতেছ তাহা হইলেও হইতে পারে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বলে যে, চন্দ্র-লোকে একটা গোলাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গড়াইয়া দিলে কিয়দ্দুর পশ্চিমাভিমুখে গিয়াই তাহা বিনা কারণে উত্তরাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই আমি বলিব যে, কখনই না—তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না; কারণ-ব্যতিরেকে কোন পরিবর্ত্তনই যখন ঘটিতে পারে না, তখন কারণ ব্যতিরেকে চলমান বস্তুর দিক্ পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিবে? কাক সাদা হয় এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই, আর, বিনা কারণে পরিবর্ত্তন ঘটে এটাও আমি বা পৃথিবীস্থ আর কেহ দেখে নাই; তবে, ওটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, “হইলেও হইতে পারে” আর এটার বেলায়ই বা আমি বলি কেন যে, “কখনই না!” এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, যাহা কেবল-মাত্র পরীক্ষাসিদ্ধ কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে—দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে তাহার অন্যথা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহার কুত্রাপি এবং কস্মিন্ কালেও অন্যথা সম্ভবে না; তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ হওয়া দূরে থাকুক—তাহা সকল পরীক্ষারই ভিত্তিভূমি; কেননা, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ থাকা চাইই-চাই এই তত্ত্বটি পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল আছে বলিয়াই পরীক্ষার সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনের বিশেষ বিশেষ কারণ অন্বেষণ করিতে তৎপর হই। এ যেমন, তেমনি অপূর্ণ সত্য মাত্রেই পূর্ণ সত্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ—ইহা একটি পরীক্ষা-নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়াই ভক্ত সাধকেরা নিঃশংসয়ে এবং অকুতোভয়ে ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিয়া চলেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কি বিজ্ঞান—কি তত্ত্বজ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ সত্যের আশ্রয়-ব্যতিরেকে কেহই এক পদও চলিতে পারে না। শ্রী দ্বি]

যদি তিনি তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমর্থন করিতে যান, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কারণ তাহা তাঁহার নিজেরই সম্পত্তি। তিনি আপন সম্পত্তিকে যাহা ইচ্ছা তাহাই মনে করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না।

[জগৎশুদ্ধ জীবের মস্তিষ্ক যদি প্রভাত বাবুর সম্পত্তি হইতে পারিল তবে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যাহা বাস্তবিকই জ্ঞানবান জীব মাত্রেরই (কাজেই প্রভাত বাবুরও) পৈতৃক সম্পত্তি—তাহার অংশ আমাতেও যৎকিঞ্চিৎ বর্ত্তিবে—ইহা তো হইবারই কথা। শ্রী দ্বি]

এখন দ্বিজেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ডাঃ ড্রিস্‌ডেলের মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরকে চেতন ও অচেতন ইহার কিছুই না বলেন এবং তিনি যে কিরূপ পদার্থ তাহাও বলিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে

ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, উঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুগত নহে। তাহা কেবল বিশ্বাসেই অনুগত। বিশ্বাস বাস্তবিক চক্ষুহীন অন্ধ। সে বিজ্ঞানের কথা গ্রহণ করিতে চাহে না, এবং গ্রহণ করিতে সক্ষমও নহে। এই অন্ধ বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্র বাবুতেও বলবান্ রহিয়াছে। তাহাতেই তিনি বিজ্ঞানের সমস্ত উপদেশ ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের অনুকূলে অবৈজ্ঞানিক কথারও যোজনা করিতেছেন। এবং অন্য কেহ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহার প্রতি কটূক্তি করিতেও ক্রুটি করিতেছেন না।

[স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বতন্ত্র, আর অন্ধ বিশ্বাস স্বতন্ত্র। "অমুক বড়লোক (যেমন প্রক্টর বা ডিস্‌ডেল) এই কথা বলিয়াছেন অতএব ইহা বেদবাক্য" ইহারই নাম অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে—খণ্ড আকাশ মাত্রই অসীম আকাশের ক্রোড়ীভূত—অপূর্ণ সত্য মাত্রই পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়াধীন—এরূপ ধ্রুব তত্ত্বসকল অন্ধ বিশ্বাস নহে কিন্তু জাগ্রত জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে বিশ্বাস করিলে যদি লোককে অবৈজ্ঞানিক হইতে হইত, তাহা হইলে নিউটনও অবৈজ্ঞানিক; যেহেতু, এটা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে। স্বতঃসিদ্ধ সত্য-সকল সমস্ত বিজ্ঞানেরই ভিত্তিমূল। কাজেই, যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি বিমুখ হইয়া বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁহারা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালেন; তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রকৃত মর্ম্মের অভ্যন্তরে তলাইতে পারেন নাই; এ সম্বন্ধে বেকন যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্, যথা, —A little philosophy inclineth man's mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion. অল্প জ্ঞান মনুষ্যের মনকে নাস্তিক্যের দিকে টানে; গভীর জ্ঞান লোকের মনকে ঈশ্বর-ভক্তির দিকে টানে। শ্রী দ্বি]

আমরা সম্প্রতি এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলাম। কারণ একত্রে আর অধিক বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে না। আমরা এই প্রস্তাবে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহারই যে, কত ডাল পালা বহির্গত হয় তাহা বলা যাইতে পারে না।

কাণ্টের দর্শন

এবং

বেদান্ত দর্শন।

সত্য নিরূপণ করাই জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) মনোগত সত্য এবং (২) বস্তুগত সত্য। যাহার নিকটে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার নিকটে তাহাই সত্য—এইরূপ যত কিছু সত্য, অর্থাৎ যাহার সত্যতা ব্যক্তিবিশেষের মনের অবস্থার উপরে নির্ভর করে, তাহাই মনোগত (subjective) সত্য; আর, যে সত্য মনের অবস্থা-পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না—সুতরাং সত্যবাদিসম্মত, তাহাই বস্তুগত (objective) সত্য। বস্তুগত সত্যের আর এক নাম বাস্তবিক সত্য; মনোগত সত্যের আর এক নাম প্রাতিভাসিক সত্য; প্রাতিভাসিক সত্য—অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রতিভাসিত হয়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস।

একজন অনভিজ্ঞ কৃষকের নিকটে সকলই বাস্তবিক সত্য। তাহার নিকটে চন্দ্র একখানি থালা অপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপে না; পৃথিবী পর্ব্বতের ন্যায় অচল;

সূর্য্য সাগর-গর্ত্ত হইতে গাত্রোত্থান করে এবং সাগর-গর্ভে নিলীন হয়। সমস্তই তাহার নিকটে যৎপরোনাস্তি ধ্রুব সত্য। দৈবাৎ যদি কখন ভূমি-কম্প হইল—তখন পৃথিবীর স্থায়িত্বের উপরে তাহার বিশ্বাস কিয়ৎকাল স্তব্ধীভূত হয়, তাহার পরেই তাহার মনোমধ্যে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, পৃথিবী বাসুকীর মাথার উপরে ভর করিয়া আছে—বাসুকী মাথা নাড়িলেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে; এই কথাটি শুনিবা-মাত্রই কৃষকের সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। "পৃথিবী অটল" ইহা যেমন—"তাহা বাসুকীর মস্তকের উপর ভর করিয়া আছে" ইহাও তেমনি—দুইই তাহার নিকটে বাস্তবিক সত্য—ধ্রুব সত্য। পৃথিবীকে সে অষ্ট প্রহর দর্শন করিতেছে স্পর্শ করিতেছে, বাসুকীকে কেহই দেখে নাই—স্পর্শ করে নাই, কৃষকের তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; তাহার নিকটে প্রত্যক্ষ সত্যও যেমন বাস্তবিক—আনুমানিক সত্যও তেমনি বাস্তবিক;—চক্ষে দেখা সত্যও যেমন—কর্ণে শুনা সত্যও তেমনি—উভয়ই ধ্রুব সত্য। তাড়কা রাক্ষসীর মুখব্যাদানের ন্যায় তাহার বিশ্বাসের পরিধি আকাশ-পাতাল-ব্যাপী, তাহার অভ্যন্তরে সংশয়ের একবিন্দুও অবকাশ নাই। তুমি আজিকের কালের এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—কৃষকের মনের এইরূপ সংশয়-শূন্য নির্ভীক অবস্থা দেখিয়া তুমি মনে মনে হাস্য করিতেছ, কিন্তু হাস্যে ক্ষান্ত হও। কৃষকের নিকট সকলই বাস্তবিক সত্য—এ যেন খুবই হাস্যাস্পদ, কিন্তু তোমার নিকট কিছুই বাস্তবিক সত্য নহে অথচ তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি যাহা স্থির করিয়াছ তাহাই বাস্তবিক সত্য,—ইহা কি উহা অপেক্ষা কম হাস্যাস্পদ? তুমিও বাস্তবিক সত্য জান না, কৃষকও বাস্তবিক সত্য জানে না; তুমিও বলিতেছ যে, আমি যাহা বুঝি তাহাই বাস্তবিক সত্য, কৃষকও তাহাই বলিতেছে; কিন্তু কৃষকের মন সংশয়শূন্য প্রশান্ত—তোমার মন সংশয়ের বিষ-দংশনে অস্থির; এ বিষয়ে তোমা-অপেক্ষা কৃষক পরম ভাগ্যবান্—তাহাতে আর ভুল নাই। কৃষক সত্য না জানিয়াও যেমন সত্যে নিঃসংশয়, তুমি সত্য জানিয়া যদি সত্যে তেমনি নিঃসংশয় হইতে পার, তবেই বলিব যে, তুমি কৃষক অপেক্ষা জ্ঞানে বড়, কেননা তুমি বাস্তবিক সত্য জান—কৃষক তাহা জানে না; তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ তুমিও যা, কৃষকও তা সমানই; বরং কৃষক তোমা অপেক্ষা ভাল, কেননা তাহার মনে শান্তি বিরাজ করিতেছে—তোমার মনে শান্তি নাই। এই স্থলে কৃতবিদ্য ব্যক্তি উষ্ণ হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর দিবেন সন্দেহ নাই যে, "বিজ্ঞান বলিয়া যে, একটা সামগ্রী আছে, তাহা কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গেলে? তোমার মস্তকের উপরে মধ্যাহ্ন দিবাকর দেদীপ্যমান—তাহাও কি তোমাকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? কি আশ্চর্য্য! বাস্তবিক সত্যের পথপ্রদর্শক বিজ্ঞান নহে তো আর কে?" ইহার উত্তরে আমরা বলি,—থামো! তোমাদের পরম গুরু এবং নেতা কম্‌টি বলিয়াছেন যে, আপেক্ষিক সত্য ভিন্ন বাস্তবিক সত্যে হস্ত প্রসারণ করা বিজ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা। কম্‌টি বলেন "বিজ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যকেই বাস্তবিক সত্য বলিয়া মানিয়া লও—তাহাতেই জনসমাজের সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত

হইতে পারে। তাহার সাক্ষী—সূর্য্যের আকর্ষণ; সূর্য্যকে কেহ পৃথিবী আকর্ষণ করিতে দেখেও নাই দেখিবেও না; কে তবে বলিল যে, সূর্য্য পৃথিবী আকর্ষণ করিতেছে? ভেক যেমন জিহ্বা প্রসারণ করিয়া কীট আকর্ষণ করে, সূর্য্য কি সেই-রূপ কোন সূক্ষ্ম বস্তু প্রসারণ করিয়া পৃ-থিবী আকর্ষণ করে? না দৈবজ্ঞ যেমন মন্ত্র দ্বারা বাটি চালনা করে, সূর্য্য সেই-রূপ বাহ্যবস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেও শূ-ন্যের মধ্য-দিয়া পৃথিবী আকর্ষণ করে? বিজ্ঞান নিরুত্তর! সুতরাং এখানে আক-র্ষণ কথাটাই অপ্রামাণ্য; অতএব আকর্ষণ বিকর্ষণ এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া "পৃ-থিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এইটুকু জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাক – বেশী বাড়াবাড়ি করিও না!" এই তো দেখা যাইতেছে যে, কম্‌টির মতে বাস্তবিক সত্য বিজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত—ব্যবহারিক সত্যই বি-জ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কম্‌-টির এ কথার বিরুদ্ধে আমরা বলি যে, পৃথিবী যে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি কোন কারণ আছে—না কারণ নাই? কিয়ৎ মাস ধরিয়া পৃথিবী সূর্য্য হইতে ক্রমশই দূরে প্রস্থান করে, তাহার পরে সেরূপ না করিয়া ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করে কেন? অবশ্যই তা-হার কোন না কোন কারণ আছে। অত-এব পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ইহা যেমন সত্য—তাহার একটা না একটা কা-রণ আছে ইহা তেমনিই সত্য; পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-কার্য্য এবং তাহার কারণ—দুয়ে মিলিয়া তবে একটা সমগ্র সত্য দাঁড়ায়। কম্‌টি ঐ সমগ্র সত্যটির প্রতি হাত বাড়া-ইতে মানা করেন; তিনি পৃথিবীর প্রদ-ক্ষিণ কার্য্য মাত্রটিতেই—আধখানা স-ত্যেই—সন্তুষ্ট থাকিতে বলেন। এটা তিনি দেখিতেছেন না যে, বিজ্ঞানকে অর্দ্ধ সত্যে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, আর, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে আধ-পেটা অন্নে সন্তুষ্ট থাকিতে বলা, দুইই সমান। ধরিতে গেলে—বিজ্ঞান অর্দ্ধ সত্যও বোঝে না—সিকি সত্যও বোঝে না—বাস্তবিক সত্যই তাহার একমাত্র অন্বেষণের বিষয়; তবে কি না—অপার্য্যমানে সে অর্দ্ধ সত্যেই আপাততঃ সন্তোষ অবলম্বন করে এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে, নেই-মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল। কিন্তু তাহা বলিয়া অর্দ্ধ সত্য কি বাস্তবিক সত্য? সত্য বটে যে, আমার নিকটে চন্দ্রের এক পিট মাত্র প্র-কাশ পায়—কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিকই কি চন্দ্রের সেই দৃশ্যমান পৃষ্ঠই তাহার সর্ব্বস্ব? সমগ্র সত্যই বাস্তবিক সত্য। অর্দ্ধ সত্যে বিজ্ঞানের এবং সংসারের কার্য্য খুবই চলিতে পারে; এমন কি প্রতি বৎ-সর সূর্য্য স্বয়ং উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাতায়াত করে—ইহার উপরে ভর করিয়াই কৃষকের কৃষি-কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে; অথচ বিজ্ঞান শেষোক্ত সত্যকে আপন রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কম্‌টি যদি বলিতে পা-রিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করি-তেছে—এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, কেন করে কি বৃত্তান্ত তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না, কৃষক তবে এ কথা না বলিতে পারিবে কেন যে, সূর্য্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন হই-তেছে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—কেন তাহা হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন করে না? পণ্ডিতের জ্যোতির্বিদ্যাই শুধু যে, বিজ্ঞান, কৃষকের জ্যোতির্বিদ্যা যে, আদ-বেই বিজ্ঞান নহে, এরূপ কথা নিতান্তই

অত্যুক্তি। এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের কৃষি-বিদ্যা অতীব স্থূল রকমের বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বেত্তার কৃষি-বিজ্ঞান অতীব সূক্ষ্ম রকমের বিজ্ঞান, কিন্তু দুইই বিজ্ঞান তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কেননা প্রণালী-পদ্ধতি দুয়েরই সমান। পণ্ডিতেরাও যে প্রণালীতে উদ্ভিদ্ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন—কৃষকেরাও সেই প্রণালীতে কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে; সে প্রণালী কি? না ভূয়োদর্শন এবং বহুদর্শন। কম্‌টির অর্দ্ধ সত্য নয় যোলো আনা বৈজ্ঞানিক, কৃষকের সিকি সত্য নয় আট আনা বৈজ্ঞানিক—কিন্তু তাহাতে কি? অর্দ্ধ হউক—সিকি হউক্—বৈজ্ঞানিক তো বটে! উপকারিতা দুয়েরই সমান—বরং কৃষকের কৃষি-বিদ্যা জন-সমাজের বেশী উপকারী; মূল পদ্ধতিও দুয়েরই সমান—ভূয়োদর্শন এবং বহু-দর্শন। বিদ্যার তবে কিসে এত মাহাত্ম্য? ইহার উত্তর এই যে, বিদ্যার মাহাত্ম্য তাহার পদ্ধতি-নিবন্ধনও নহে—উপকারিতা-নিবন্ধনও নহে; বাহিরের নিয়ম সকলকে মনের ভাবের ন্যায় অন্তরে পাওয়া—ইহাই বিজ্ঞানের চমৎকারিতা; আর, মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করা ইহাই শিল্প বিদ্যার চমৎকারিতা। যাহাই হউক্—কৃষকেরাও কতক পরিমাণে বাহিরের নিয়ম সকলকে মনোমধ্যে আয়ত্ত করে—এ জন্য কৃষকের কৃষি-বিদ্যাও মোটামুটি বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য।

উপরে দেখানো হইল যে, সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) বাস্তবিক (যথা পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণমান), (২) প্রতিভাসিক (যথা পৃথিবী অটল); এখন বক্তব্য এই যে, প্রাতিভাসিক সত্য এবং বাস্তবিক সত্য উভয়ই মিশ্র এবং অমিশ্র (বা বিশুদ্ধ) এই দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের ভিতরেও বাস্তবিক সত্য আছে, আর, "পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণমান" এই বাস্তবিক সত্যের মধ্যেও প্রাতিভাসিক সত্য আছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন পৃথিবী প্রকাশমান পশুদিগেরও সেইরূপ; কিন্তু "পৃথিবী সচল কি অচল" এ ভাবনার দায়ে কোন পশুরই একদিনের জন্যও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। পশুদিগের ইন্দ্রিয়ে রূপরসাদি প্রকাশ পায়—এই মাত্র; কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিতে সত্য প্রকাশ পায় না। পশুরা ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে দূরে পলায়ন করে, ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিলে নিকটে অগ্রসর হয়, এইরূপ অনেক কার্য্য জ্ঞাতসারে করে বটে; কিন্তু কোন কিছুকেই সত্য বলিয়া অবধারণও করে না এবং মনোমধ্যে যত্ন পূর্ব্বক পোষণও করে না। পশু-দিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে পৃথিব্যাদি যেরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু "পৃথিবী অটল" এ যে প্রাতিভাসিক সত্য, ইহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য রহিয়াছে; "পৃথিবী অটল" ইহা বলিবা মাত্রই প্রতিপন্ন হয় যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ। অতএব, "পৃথিবী অটল" এই প্রাতিভাসিক সত্যের মূলে, "পৃথিবী বস্তু-বিশেষ" এই বাস্তবিক সত্যটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পশুরা সত্যাসত্যের কোন ধারই ধারে না—মানসিক সংস্কারই তাহাদের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কিন্তু কি কৃষক, কি পণ্ডিত, সকল মনুষ্যই (অন্ততঃ কার্য্যের সুবিধার জন্য) সত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হয়। কৃষকের এই যে একটি কথা যে, পৃথিবী বস্তু-বিশেষ, এটি তো বাস্তবিক সত্য? তবেই হইতেছে যে, "পৃথিবী অচল" বলিতে যে অংশে বুঝায় যে, পৃ-

থিবী বস্তু-বিশেষ, সেই অংশে উহা বাস্তবিক সত্য, আর, যে অংশে বুঝায় যে, "পৃথিবী আমাদের চক্ষে অটল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে" সেই অংশে উহা প্রাতিভাসিক সত্য। কৃষকের অল্প দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী অচল; পণ্ডিতের বহু দর্শনে প্রকাশ পাইতেছে যে, পৃথিবী ঘূর্ণমান; কিন্তু "পৃথিবী কেন ঘুরিতেছে" তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহা মহা পণ্ডিতেরাও তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদানে পরাভব মানেন; অগাধ সমূদ্রে কেহ বা হাঁটু-জল পর্য্যন্ত—কেহ বা কোমর-জল পর্য্যন্ত—অগ্রসর হ'ন, তাহার পরে কোথাও আর থই পা'ন না। পণ্ডিত ব্যক্তি মনশ্চক্ষে—কল্পনাতে—দেখিতেছেন যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে; অতএব, পৃথিবী-শুদ্ধ কেবল ঘুরিতেছে—আপনা আপনি ঘুরিতেছে, এটিও কল্পনার প্রাতিভাসিক সত্য; তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য এই যে, পৃথিবী কারণ-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতেছে। অতএব, কি চাসার গোটামুটি সিদ্ধান্ত, কি পণ্ডিতের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত, উভয়েরই মূলে বাস্তবিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; আর উভয় সিদ্ধান্তই বাস্তবিক সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য এই দুইরূপ সত্যের সম্মিশ্র। এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য যদিচ পূর্ণ-মাত্রায় বাস্তবিক নহে, তথাপি তাহাতেই লোক-সমাজের কার্য্য কোন-না-কোন প্রকারে চলিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যের এ যেমন—নৈতিক সত্যেরও তেমনি—কোনটিরই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি জন-সমাজের কার্য্য-কলাপে দেখিতে পাওয়া যায় না; স্বার্থের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন থাকে—ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে—এক প্রকার মিশ্র নৈতিক সত্য লোক-সমাজের প্রবর্ত্তক।

এইরূপ মিশ্র বাস্তবিক সত্য দ্বারা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া, তাহা ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া উক্ত হয়। ব্যাবহারিক সত্যের মধ্য হইতে তাহার প্রাতিভাসিক অংশটি টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই অমিশ্র বাস্তবিক সত্য; ঐকান্তিক অমিশ্র বাস্তবিক সত্য বেদান্ত দর্শনে পারমার্থিক সত্য বলিয়া অভিহিত হয়। তেমনি আবার, ব্যবহারিক সত্যের মধ্য হইতে বাস্তবিক সত্য টানিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য—তাহা ঐন্দ্রিয়ক অবভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা সত্য নামেরই অযোগ্য; এইরূপ অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য বেদান্ত-দর্শনে মায়া এবং অবিদ্যা এই দুই নামে অভিহিত হয়। মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং অবিদ্যা জীবের বন্ধন। এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, বাস্তবিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র বাস্তবিক সত্য, এক কথায়—পারমার্থিক সত্য এবং (২) মিশ্র বাস্তবিক সত্য—এক কথায় ব্যাবহারিক সত্য; তেমনি আবার, প্রাতিভাসিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অমিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ঐন্দ্রিয়ক অবভাস, (২) মিশ্র প্রাতিভাসিক সত্য, এক কথায়—ব্যাবহারিক সত্য। অতএব ব্যাবহারিক সত্যের একদিকে পারমার্থিক সত্য আর একদিকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—উহা দুয়ের সম্মিশ্র।

এখন, কথা হ'চ্চে এই যে, বাস্তবিক সত্য—দর্শন এবং বিজ্ঞান দুয়েরই অন্বেষণের বিষয়। কিন্তু উপরে দেখা গেল যে, বাস্তবিক সত্য—অমিশ্র কিনা পারমার্থিক এবং মিশ্র কিনা ব্যাবহারিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তাহার মধ্যে পারমার্থিক

সত্য দর্শনের মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়, ব্যাবহারিক সত্য বিজ্ঞানের (বস্তু-বিজ্ঞানেরও বটে নীতি-বিজ্ঞানেরও বটে) মুখ্য অন্বেষ্য বিষয়। ব্যাবহারিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বস্তু-ঘটিত এবং কর্ত্তব্য-ঘটিত, এক কথায় বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক। পারমার্থিক সত্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেবতা সম্বন্ধীয় এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয়; আধিদৈবিক কি? না ব্রহ্ম; আধ্যাত্মিক কি? না জীবের মুক্তি। ঐন্দ্রিয়ক প্রাতিভাসিক সত্যও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে যাহা আধিদৈবিক (অর্থাৎ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়) তাহা মায়া বলিয়া উক্ত হয়; মায়া কি? না প্রকৃতি (অর্থাৎ ঐশী-শক্তি); আর, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে যাহা আধ্যাত্মিক (অর্থাৎ মনুষ্য-সম্বন্ধীয়) তাহা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়; অবিদ্যা অর্থাৎ জীবের মোহ-বন্ধন। মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মের বিপরীত পৃষ্ঠ; আর, অবিদ্যা বা মোহ-বন্ধম মুক্তির বিপরীত পৃষ্ঠ। অতএব সত্যের শ্রেণী বিভাগ সর্ব্ব সমেত এইরূপ;—

সত্য

বাস্তবিক প্রাতিভাসিক

পারমার্থিক ব্যাবহারিক ঐন্দ্রিয়ক

ব্রহ্ম মুক্তি বৈজ্ঞানিক নৈতিক মায়া অবিদ্যা

এতক্ষণ ধরিয়া এই যাহা ভূমিকা করা হইল, ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল—কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন এ দুয়ের প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া। কাহাকে বলে পারমার্থিক সত্য তাহা আমরা জানিলাম—বিশুদ্ধ (অর্থাৎ অমিশ্র) বাস্তবিক সত্যই পারমার্থিক সত্য। কাহাকে বলে ব্যাবহারিক সত্য তাহাও আমরা জানিলাম—যাহাতে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এইরূপ মিশ্র সত্যই ব্যবহারিক সত্য, যেমন—নৈতিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাতিভাসিক সত্য কাহাকে বলে তাহাও আমরা জানিলাম—যাহার ইন্দ্রিয় সমক্ষে যাহা যেরূপ প্রকাশ পায় তাহাই প্রাতিভাসিক সত্য। দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহাও আমরা জানিলাম—পারমার্থিক সত্য নিরূপণ করাই দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক্।

কাণ্টের মতে পারমার্থিক সত্য তিনটি—(১) ঈশ্বর, (২) মুক্তি (Freedom), (৩) আত্মার অমরত্ব। কাণ্ট তাঁহার প্রথম গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের জ্ঞানের অতীত। সে গ্রন্থের নাম বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্য আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অবলম্বনীয়। এ গ্রন্থের নাম ব্যবহারিক জ্ঞানের সত্যাসত্য বিচার। কাণ্ট একবার এককথা না বলিয়া দুইবার দুই কথা বলিলেন কেন—এই প্রহেলিকাটির ভিতর তলাইতে হইলে তাঁহার মূলগত অভিপ্রায়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টি অতীব সহজ; আর, সহজ বলিয়াই তাহা পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সহজ সত্য তো সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়—তাহার জন্য আবার দর্শনের প্রয়োজন কি? দর্শনের কাজই এই যে, দর্শন আমাদিগকে জটিল সত্য বুঝাইয়া দিবে। ইহাঁদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞান-মাত্রেরই প্রথম পইটাগুলি অতীব সহজ; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া

কেহ যদি এক লম্ফে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে যা'ন, তবে তিনি তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না;—ইতর ভাষায় যাহাকে বলে "গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি" তাঁহার আশার দশা সেইরূপ হয়। অতএব কাণ্টের দর্শন রীতিমত আয়ত্ত করিতে হইলে কাণ্টের মূল অভিপ্রায়টির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য; অভিপ্রায়টি অতীব সরল এবং পরিষ্কার—তাহার মধ্যে কূট-কচালিয়া কিছুই নাই, তাহা এই;—বাস্তবিক সত্যই অন্বেষ্য বিষয়। মনে কর যেন বাস্তবিক সত্য আমি মুষ্টি মধ্যে পাইয়াছি,—তবে তাহা কি সত্য-সত্যই বাস্তবিক, না কেবল আমার নিকটেই বাস্তবিক বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? অতএব বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্যের, এক কথায় পারমার্থিক সত্যের, প্রমাণাভাব; তাই বলি যে, পারমার্থিক সত্যের সম্বন্ধে আপাততঃ কোন কথার উচ্চ-বাচ্য না করিয়া বাস্তবিক সত্য কতদূর প্রামাণিক তাহারই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যা'ক্। বিজ্ঞান তো বাস্তবিক সত্য অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছে—বিজ্ঞান তো দিন দিনই বাস্তবিক সত্যের পথে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে; বিজ্ঞান সত্যের যতখানি প্রদেশ জয় করিয়াছে, তাহা তো বিলক্ষণই সুনিশ্চিত—তাহা তো বাস্তবিকই সত্য। আর এক দিকে দেখা যায় যে, মনুষ্যের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মূলে এমনি কতক গুলি প্রবল সত্য আছে যে, সেগুলি যদি অবাস্তবিক হয় তবে মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই বৃথা পণ্ডশ্রম হইয়া যায়। বাস্তবিক সত্যকে যে, কোন্ পথে অন্বেষণ করিতে হইবে—সমগ্র সভ্য-সমাজ তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। সভ্য সমাজকে জিজ্ঞাসা কর—সে বলিবে যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব এবং নৈতিক মূলতত্ত্ব এ দুইটি বিষয় যদি বাস্তবিক না হয়, তবে বিজ্ঞান মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—সভ্যতা মিথ্যা। বিজ্ঞানের সত্য এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সত্য—এ দুয়ের বাস্তবিকতার উপরে সভ্য-সমাজের ভরপুর বিশ্বাস; মুখের বিশ্বাস নহে কিন্তু কাজের বিশ্বাস। সভ্যসমাজ উভয়ের বাস্তবিকতার উপরে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি কার্য্য-কালে তাহার উপরে একান্তঃকরণে নির্ভর করে। মুখে যদিও কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে, বিজ্ঞান কিছুই নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞান কিছুই নহে; কিন্তু কাজের সময়ে তাঁহাকে অগত্যা বিজ্ঞানের উপরেও নির্ভর করিতে হয়—কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপরেও নির্ভর করিতে হয়; কেননা, তাহা না করিলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়; দেখিয়া না শিখিলে তাঁহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। বিজ্ঞানকে অমান্য করিয়া যিনি জাহাজ চালাইতে যা'ন তিনি গম্যস্থান হইতে বিচ্যুত হ'ন; কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া যিনি সংসার নির্ব্বাহ করিতে যা'ন তিনি পুরুষার্থ হইতে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হইতে—বিচ্যুত হ'ন। সভ্য সমাজে তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারৎপক্ষে কেহই বিজ্ঞানকেও অবহেলা করে না, কর্ত্তব্য-জ্ঞানকেও অবহেলা করে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য পারৎপক্ষে সকলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে—কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সৎলোকের পরামর্শ গ্রহণ করে। কণ্টের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করিতে হইলে তজ্জন্য শূন্যে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন করে না; মনুষ্য সমাজের বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের

মধ্যেই তাহার অন্বেষণ-কার্য্যের গোড়া-পত্তন করা বিধেয়। কেননা, সত্য সত্যই লোকে যাহাকে বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস করে, ও যাহার উপর নির্ভর করিয়া অভীষ্ট পথে সত্য সত্যই অগ্রসর হয়, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কতটুকু আছে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। যাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য অন্বেষণ করিতে যাওয়া না যাওয়া পরের কথা; প্রথম উদ্যমেই তাহাতে হস্ত-ক্ষেপ করা শোভা পায় না; কেন না তাহা করিলে উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা করা হয়।

এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট্ সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞানের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই ইন্দ্রিয়ের অবভাস এবং জ্ঞানের সত্য এই দুয়ের মধ্যে—(বৈদান্তিক ভাষায়) অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে—প্রভেদ নিরূপণ করিলেন। পশুদিগের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে যেমন শব্দ স্পর্শাদি দেশকালে প্রতিভাত হয়—মনুষ্যেরও সেইরূপ; কিন্তু মনুষ্য দেশকালের আবির্ভাব-মাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহার মধ্য হইতে সত্য বাহির করিবার চেষ্টা করে; বরাহ অবতারের ন্যায় অবিদ্যার সাগর-গর্ত্ত হইতে বিদ্যা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। বিদ্যার সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের মন্তব্য কথা এই যে, যেমন তেমন সত্য হইলে চলিবে না, তাহা সুনিশ্চিত হওয়া চাই—তবেই তাহাকে বাস্তবিক সত্য বলিব। একটা জন্তু যদি তোমার বুদ্ধিতে সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমার বুদ্ধিতে মৎস্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর এক জনের বুদ্ধিতে কীট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে বাস্তবিক তাহা যে কি—তাহা বলিতে পারা সুকঠিন; কিন্তু যাহা সকলের বুদ্ধিতেই সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়—তাহা বাস্তবিকই সর্প। তেমনি আবার, মাঠের মধ্যে যদি আমি জলের মতো একটা আবির্ভাব দেখিয়া বলি যে, উহা জল হইলেও হইতে পারে, মরীচিকা হইলেও হইতে পারে; তবে, কি যে বাস্তবিক—তাহার ঠিকানা হয় না; কিন্তু যদি আমি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি যে, উহা জল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তবে তাহা যে বাস্তবিকই জল, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় থাকে না। এইরূপ লৌকিক ব্যবহার কালেও—তাহাকেই আমরা বলি বাস্তবিক সত্য যাহা সকলের নিকটেই সত্য, এক কথায়—সর্ব্ববাদিসম্মত বা সার্ব্বভৌমিক; ও যাহা না হইলেই নয়, এক কথায়—অবশ্যম্ভাবী বা নির্বিকল্প। কিন্তু এটা একটা মোটামুটি রকমের সত্য-নিরূপণ। বাস্তবিক সত্য নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা।

প্রথম দৃষ্টিতে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে—অবিদ্যার মধ্যে—সত্যাসত্য স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু তাহার মধ্যে হইতেও কাণ্ট্ দুইটি অবশ্যম্ভাবী সত্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন—কি? না দেশ-কালে অবস্থিতি। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্যে হইতে রূপ রসাদি সমস্তকেই ভাবনা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা আকাশের যে প্রদেশটিকে এবং কালের যে সময়টিকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে তাহা ভাবনা হইতে কিছুতেই বহিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের পক্ষে দেশ-কালে অবস্থিতি নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী। দেশ-কাল-রূপী অবিদ্যা-ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জ্ঞানকে খাটাইয়া সেখান হই-

তেও আমরা গণিতের ধ্রুব সত্য সকল উপার্জ্জন করি; আর, এই দুইটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হই যে, ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকেই জ্ঞানে আয়ত্ত করা যাইতে পারেনা; যে কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহারই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী, যথা;—গীত-ধ্বনি কতক-পরিমাণ কাল ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ উচ্চ নীচ স্বর-মাত্রা পূরণ করিয়া তবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়; আলোক কতক পরিমাণ দেশ ব্যাপিয়া এবং কতক পরিমাণ ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা পূরণ করিয়া আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরা দেয়। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের ব্যাপ্তি-নিরূপণ এবং মাত্রা-নিরূপণ অন্ধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে—অবিদ্যার কার্য্য নহে, কেবল—জ্ঞানেরই তাহা কার্য্য; তাহা যদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইত তাহা হইলে পশুরাও তাহা করিত—ও সেই সূত্রে গণিত বিদ্যা উপার্জ্জন করিত। গণিত বিদ্যার সত্য-সকল যদিও আপাততঃ দেশ-কালরূপী অবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, কিন্তু বহির্ব্বস্তুর অবলম্বন ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। গণিতের মনঃকল্পিত চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রে কিছু আর বীজ বপন করা যাইতে পারে না,—বাস্তবিক ক্ষেত্রই গণিতের শূন্য ক্ষেত্রের চরম পর্য্যাপ্তি-স্থান। আমাদের মনোমধ্য-স্থিত গণিতের সত্যকে যদি বহির্জগতে প্রয়োগ করা সম্ভব না হইত তবে তাহার কোন মূল্যই থাকিত না। শুধু কেবল মনোরাজ্যে নহে কিন্তু তা ছাড়া—বস্তু-রাজ্যে সংলগ্ন হয় বলিয়াই, গণিতের সত্য বাস্তবিক সত্য নামের যোগ্য। ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মধ্য দিয়া—মনোরাজ্যের মধ্য-দিয়া—বস্তু-রাজ্যে উপনীত হইতে হইবে, গণিত-বিদ্যা তাহারই দ্বার স্বরূপ। ব্যাপ্তি এবং মাত্রা নিরূপণ দ্বারা যখন আমরা কোন ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি, তখন সেই সঙ্গে আমরা এই তত্ত্বটি ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসটি গুণ-মাত্র—তাহা বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে; এই স্থানটিতে এই একটি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুণ পরিবর্ত্তনশীল—বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার পরে আমরা লক্ষ্য বস্তুটির গুণ-পরিবর্ত্তনে অন্যান্য বস্তুর কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে; এবং সর্ব্ব-শেষে আমরা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া পরস্পরাধীনতার প্রকাণ্ড একটা বাণিজ্য ব্যাপার জ্ঞানে উপলব্ধি করি; এখানকার মূলতত্ত্ব এই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া। সর্ব্ব-শুদ্ধ ধরিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, গণিত বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস-মাত্রেরই ব্যাপ্তি এবং মাত্রা অবশ্যম্ভাবী; ভৌতিক বিদ্যার মূলতত্ত্ব এই যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের আধার বস্তু, এবং সেই আধার বস্তুর উপরে আর আর বিভিন্ন বস্তুর বল-ক্রিয়া ও অন্যের বল-ক্রিয়ার উপরে সেই আধার-বস্তুর নিজের প্রতিক্রিয়া, এই তিনটি ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ করিয়া কাণ্ট পাইলেন যে, বিজ্ঞানের অভ্যন্তরেই এরূপ কতকগুলি তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—যাহা একান্ত-পক্ষেই বাস্তবিক; আর ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যক্তিও তাহার বাস্তবিকতার বিপক্ষে একটি কথারও

দ্বিরুক্তি করে না—সকলেই তাহা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করে। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—বাস্তবিক বলি কাহাকে? যাহা বস্তু-গত তাহাই বাস্তবিক; কিন্তু কাণ্টের ঐ মূলতত্ত্ব গুলি—জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব সুতরাং তাহা জ্ঞান-গত। এই কথাটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তটির প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। উপরি-উক্ত মূলতত্ত্ব-গুলি (যেমন কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব) যদি আমরা বহির্বিষয়ের ভূয়োদর্শন হইতে সংগ্রহ করিয়া পাইতাম, তবে ভূয়োদর্শনের ব্যাপ্তির সহিত তাহার নিশ্চয়তার মাত্রা অবিকল সমতুল্য হইত; অর্থাৎ যত অধিকবার আমরা কার্য্য-কারণের ভাব বাহিরে দেখিতাম, ততই আমাদের অন্তঃকরণে কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্বটি অধিকতর নিশ্চয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তা ছাড়া—তাহার নিশ্চয়তা একেবারেই অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। কাক কালো ইহা আমরা ভূয়োভূয় দেখিয়াছি বলিয়া তাহার নিশ্চয়তা-বিষয়ে আমরা খুবই নিঃসংশয়, কিন্তু তবুও আমরা এ কথা বলি না যে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানেই সাদা কাক থাকিতে পারে না। ইহার বিপরীতে এইরূপ দেখা যায় যে, সকলেই এ কথা অকুতোভয়ে বলিতে পারে যে, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন-একটি স্থানেও বিনা-কারণে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। যদি আগন্তুক বস্তু-সকলের ভূয়ো-দর্শন হইতে আমরা ঐ মূলতত্ত্বটি সংগ্রহ করিয়া পাইতাম, তাহা হইলে ঐ মূল-তত্ত্বটিও আগন্তুক-মাত্র হইত (যেমন কাক কালো এই তত্ত্বটি)—অবশ্যম্ভাবী হইত না; তাহা আমাদের জ্ঞানের একটি নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়াই—তাহা জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলিয়াই—তাহা অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-গুলি যদি এইরূপ জ্ঞান-গত ব্যাপার মাত্র হইল, তবে সে-গুলিকে আমরা বস্তু-গত বলি কেন—বাস্তবিক বলি কেন? ইহার প্রতি কাণ্টের প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা যে-কোন বস্তু জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহাতেই আমরা ঐ তত্ত্ব-গুলির প্রয়োগ দেখিতে পাই; তা শুধু নয়— ঐ তত্ত্বগুলিই বস্তু-সকলের বাস্তবিকতার মূল উপাদান। ঐ তত্ত্ব-গুলি যদি কোন বস্তুতেই প্রয়োগ করিতে পারা না যাইত—তাহারা যদি আমাদের মনোমধ্যেই চাবি দেওয়া থাকিত—তাহা হইলেই তাহাদের বাস্তবিকতা সংশয়-গর্ত্তে নিপতিত হইত; তাহা হইলে তাহারা বস্তু-গত না হইয়া আমাদের স্ব স্ব মনোগত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিত। বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের কার্য্যই এই যে, তাহারা বস্তু-সকলেতে অভিসর্পিত হয়—তদ্ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় কার্য্য নাই। বস্তু-সকলেতে সংক্রামিত হওয়াই যখন তাহাদের একমাত্র কার্য্য, আর সে কার্য্য যখন তাহারা আবহমান কাল অভ্রান্ত-রূপে নিষ্পাদন করিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা বাস্তবিক (বস্তু-গত) নহে তো আর কি? তাহারা আমাদের মনোমধ্যে একদণ্ডও চাবি দেওয়া থাকে না—তাহারা সর্ব্ব-বস্তুতে মুক্তভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহারা যদি বাস্তবিক নহে তবে—আর কে?

এই স্থানটিতে—কাণ্ট মনে করিলেই পারমার্থিক সত্যের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি করিয়া বসিলেন। কাণ্ট প্রথমে এই বলিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রকাশ

পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—বিশুদ্ধ জ্ঞানে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য। আমরা বলি যে, তাঁহার এই কথাই ঠিক্। কিন্তু এখন তিনি বলিতেছেন যে, যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহা জ্ঞানগত-সত্য মাত্র;—তাহা বস্তুগত সত্য নহে—বাস্তবিক সত্য নহে; ঐন্দ্রিয়ক অবভাসই বাস্তবিকতার মূল; এইখানে তাঁহার দার্শনিক নৌকা একেবারেই বিপর্য্যস্ত হইল—নৌকার মাস্তুর নীচে চলিয়া গেল ও নৌকার তলদেশ উপরে উঠিল। কাণ্ট বলেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের মূলে বস্তু যাহা অবধারণ করে তাহা ব্যবহারিক সত্য মাত্র, তা ভিন্ন তাহা পারমার্থিক সত্য নহে;—অর্থাৎ তাহা প্রকৃত পক্ষে বস্তু নহে; তবে কিনা—তাহাকে বস্তু বলিয়া বিশ্বাস না করিলে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এমন কি—বিজ্ঞান একপদও চলিতে পারে না; এই জন্য তাহাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার না করিলেই নয়। কাণ্টের এই কথার বিরুদ্ধে বেদান্ত দর্শন বলেন—তুমি আপনিই তো বলিয়াছ যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—অবিদ্যা—আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে না, বিশুদ্ধ জ্ঞানই কেবল আমাদিগকে বাস্তবিক সত্য দিতে পারে; আবার তবে তুমি বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া এ কথা বল কিরূপে—যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য শুদ্ধ কেবল জ্ঞান-গত সত্য, তা ভিন্ন তাহা বস্তু-গত নহে—বাস্তবিক নহে? কাণ্ট ইহার এইরূপ প্রত্যুত্তর দে'ন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য (যেমন বিশুদ্ধ বস্তু-তত্ত্ব) ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত জড়িত ভাবেই আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, কাজেই—সে যাহা প্রতিভাত হয় তাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ঐন্দ্রিয়ক অবভাস দুয়েরই কার্য্য-কারিতা সমান মাত্রায় বিদ্যমান; তাই বলি যে, তাহা মিশ্র সত্য—বিশুদ্ধ সত্য নহে; ব্যবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে। ইহার উত্তরে বেদান্ত দর্শন এইরূপ বলেন যে, সেই মিশ্র সত্যের মধ্য হইতে যদি ঐন্দ্রিয়ক অংশটি (অবিদ্যাত্মক অংশটি) বর্জ্জিত করিয়া অবশিষ্ট অংশটি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক অংশটি গ্রহণ করা যায়—তবে তাহাই তো অমিশ্র বাস্তবিক সত্য—পারমার্থিক সত্য; তাহা কি তাহাই তুমি আমাকে বল—বাজে কথা ছাড়িয়া দেও; কেননা অমিশ্র সত্য পাইলে কেহ আর তাহাকে ছাড়িয়া মিশ্র সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয় না;—এক ভরি খাঁটি সুবর্ণের বিনিময়ে একভরি তাম্র মিশ্রিত সুবর্ণ ক্রয় করিতে যায়—এমন নির্ব্বোধ কে আছে? ইহার উত্তরে কাণ্ট বলেন যে, খাঁটি সত্য আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না—যদি বা ধরা দেয় তাহা হইলেও তাহা আমাদের কোন ব্যবহারে আসে না। বেদান্ত বলেন, ব্যবহারে আসা না আসা পরের কথা—আপাততঃ তাহা জ্ঞানে ধরা দেয় কি না, তাহাই স্থির করা হউক্। খনি হইতে যে সুবর্ণ পাওয়া যায়, তাহা তো আর তাম্র-মিশ্রিত নহে; খাঁটি সুবর্ণকে তাম্র-মিশ্রিত করিলেই তাম্র-মিশ্রিত হয়; তাহা না করিলে তাহা—যেমন বিশুদ্ধ তেমনি বিশুদ্ধ থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের খাঁটি সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করিলেই তাহা মিশ্র সত্য হইয়া দাঁড়ায়,—তাহা না করিলেই তাহা যেমন তেমনি অবিকৃত-ভাবে জ্ঞানে প্রতীয়মান হয়। আমরা আপনারাই খাঁটি সত্যকে অবিদ্যার সহিত মিশ্রিত করি, আবার, আপনারাই বলি যে, তাহা আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয় না;

গোয়ালারা আপনারাই দুগ্ধের সহিত জল মিশায়, আবার—আপনারাই বলে যে, নির্জলা দুগ্ধ পৃথিবীর কুত্রাপি পাওয়া যায় না—তুমিও যে দেখিতেছি সেইরূপ কথা বলিতেছ! আসল কথা এই যে, কাণ্ট্ পারমার্থিক-সত্যকে প্রাতিভাসিক রাজ্যে প্রাতিভাসিক সত্যের মতো করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—তাই তিনি প্রকৃত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে এমনি একটা অপদার্থ-রকমের সত্য পাইয়াছেন যাহা অসত্যেরই সামিল; তাহা এমনি একটি তমসাচ্ছন্ন ব্যাপার যে, জ্ঞান-জ্যোতির সঙ্গে তাহার কস্মিন্ কালেও দেখা সাক্ষাৎ নাই, দেখা সাক্ষাৎ হইবেও না—হইতে পারেও না। কাণ্ট্ বহু কষ্টে কূলের কাছাকাছি আসিয়া "কূল দেখিতে পাওয়া যায় কি না—দেখা যা'ক্" এই অভিপ্রায়ে দূর-বীক্ষণ যোগে কূলাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য তিনি ভুলিয়া গেলেন;—দূর-বীক্ষণের রন্ধ্র-দ্বারের কপাট উত্তোলন করিতে ভুলিয়া গেলেন! এই জন্য তিনি পারমার্থিক সত্যের কূল প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, পারমার্থিক সত্যকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত জীবন্ত পারমার্থিক সত্যের পরিবর্ত্তে কাণ্ট্ কি দেখিলেন? না একটা অন্ধ অনির্দ্দেশ্য মৃত বস্তু—তাহা কি যে তাহার ঠিকানা নাই, আর, তাহার তিনি নাম দিলেন "The thing in itself" "বস্তু-স্বরূপ" অথবা "তৎ-স্বরূপ"। বেদান্ত দর্শনের পারমার্থিক সত্য যেমন সত্য-স্বরূপ—তেমনি জ্ঞান-স্বরূপ,—সেখানে সত্য এবং জ্ঞান একাধারে বর্ত্তমান। কিন্তু কাণ্টের সেই যে "বস্তু-স্বরূপ" সেখানে জ্ঞানের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ; জ্ঞান প্রবেশ করিলে পাছে বস্তু-গত সত্য জ্ঞান-গত হইয়া উঠে এই ভয়েই কাণ্ট্ সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কিন্তু কাণ্টের এ ভয় নিতান্তই নিষ্কারণ—একটা রোগ-বিশেষ। কাণ্টের নিজের দর্শন-শাস্ত্রই আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় তাহা বাস্তবিক সত্য নহে—অতএব যাহা ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় না তাহার মধ্যেই বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহাই বাস্তবিক সত্য, অতএব যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায় না—তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্যের অন্বেষণ করা বৃথা পণ্ডশ্রম। কাণ্টের নিজেরই সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া আমাদের বাহিরে নির্দ্দেশ করি তাহাও আমাদের একটি জ্ঞানগত ব্যাপার—ঐন্দ্রিয়ক ব্যাপার নহে; অতএব কাণ্টের নিজের মতানুসারেই দাঁড়াইতেছে এই যে, তিনি যাহাকে "বস্তুস্বরূপ" বলিতেছেন, তাহা জ্ঞানাত্মক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, কেননা জ্ঞানই তাহার মূল—জ্ঞানই তাহার সর্ব্বস্ব—জ্ঞান-ব্যতিরেকে তাহা কিছুই নহে। এখানে যে জ্ঞানের কথা হইতেছে তাহা তোমার জ্ঞান বা আমার জ্ঞান বা আর কোন জীবের জ্ঞান—নহে; প্রাতিভাসিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত আকাশ যেমন তোমার আকাশ নহে—আমার আকাশ নহে—কিন্তু সর্ব্বজগতের আকাশ,—কাল যেমন সর্ব্বজগতের কাল, তেমনি পারমার্থিক সত্যের অধিষ্ঠান-ভূত জ্ঞান সর্ব্বজগতের জ্ঞান,—জ্ঞান-স্বরূপ; অথচ, আকাশ এবং কাল তোমার জ্ঞানে প্রকাশমান, আমারও জ্ঞানে প্রকাশমান, সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান; জ্ঞান-স্বরূপ

পরব্রহ্ম তোমার আমার এবং সকলের জ্ঞানেই প্রকাশমান। পরব্রহ্ম সর্ব্বজগতের বলিয়াই তিনি সূর্য্যের ন্যায় তোমারও—আমারও—এবং সকলেরই। চক্ষের পরম বিষয় কি?—অন্ধকার নহে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য; তেমনি জ্ঞানের পরম বিষয়—পরম অর্থ কি? পারমার্থিক সত্য কি? অন্ধ সত্তা নহে কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞানময়-সত্তা— সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কাণ্ট্ তাঁহার নিজের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইলেই পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু ব্যবহারিক রাজ্যকে, সুপরীক্ষিত বিজ্ঞান-রাজ্যকে, পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে তাঁহার মন নিতান্তই অন্ধকার দেখিল। তিনি দেখিলেন যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে—অবিদ্যাকে যদি সমূলে পরিত্যাগ করা যায়, তবে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না;—কেননা, মানিলাম কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে বীজভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু কার্য্য দেখিলে তবে তো তাহার কারণ অবধারণ করিব? শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক রাজ্যেই কার্য্য উপস্থিত হয়—প্রাতিভাসিক রাজ্য বিলুপ্ত হইলে কার্য্যের নাম গন্ধও থাকে না; কাজেই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধেরও কোন অর্থ থাকে না। কাণ্ট্ তাই বলেন যে, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকল প্রাতিভাসিক সত্যকে বাস্তবিক করিয়া দাঁড় করায়—এইটিই তাহার বাস্তবিকতা; এক কথায়—তাহার বাস্তবিকতা ব্যবহারিক —পারমার্থিক নহে; এ নহে যে, প্রাতিভাসিক রাজ্য ছাড়িয়া উহা স্বয়ং বাস্তবিক। কাণ্টের মতানুসারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের তত্ত্ব বলিয়া বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব-সকলের কোন মূল্য নাই—বহির্জগতে তাহাদিগকে খাটানো যায় বলিয়াই তাহাদের যত কিছু মূল্য;—হীরকের নিজের কোন মূল্য নাই —তাহা দ্বারা কাচ কাটা যায় বলিয়াই তাহার যত কিছু মূল্য; কেননা বিজ্ঞানের চক্ষে হীরক অঙ্গার-বিশেষ—বিশুদ্ধ জ্ঞান যন্ত্র-বিশেষ!

এইরূপ যান্ত্রিক নাগপাশ হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, কাণ্ট্ মনুষ্যের ধর্ম্মভাবকে সহায় ডাকিলেন; বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রের ভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পা'ন নাই, ধর্ম্ম-নিয়মের মধ্যে তিনি যন্ত্রীর ভাব দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাতিভাসিক ব্যাপার-সকলকে (বেদান্ত-দর্শনের অবিদ্যাকে) বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, তাহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কি—তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে এইরূপ স্থির করিলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন মনুষ্যের বন্ধনের ভিত্তি মূল, ধর্ম্মের নিয়ম সেইরূপ মনুষ্যের মুক্তির (Freedom) ভিত্তি-মূল। মনুষ্য যে, অবিদ্যার প্রতিকূলে মুক্তির পথে চলিবার অধিকারী— ধর্ম্মের নিয়মই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। ধর্ম্মের নিয়ম শুধু যে, আমার নিয়ম বা তোমার নিয়ম তাহা নহে—উহা ব্যক্তি-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের ঘরগড়া নিয়ম নহে—যে-কোন জীবের বিবেচনা-শক্তি আছে সেই জীবই বুঝিতে পারে যে,মুক্তিতেই আত্মার পুরুষার্থ হয়—সুখ দুঃখের বন্ধনে পুরুষার্থ হয় না। কেননা সুখ দুঃখ প্রাতিভাসিক মাত্র—পারমার্থিক নহে। সুখ দুঃখ নিয়তই আসিতেছে যাইতেছে— তাহা কাহারো নির্ভর-স্থল হইতে পারে না—তাহা বালির বাঁধ। সুখ দুঃখ পরি-

বর্ত্তনের মুখেই নিয়ত দণ্ডায়মান। ছায়ার সুখ উপভোগ করিতে হইলে রৌদ্রের তাপ উপভোগ করা আবশ্যক ; আরোগ্যের সুখ উপভোগ করিতে হইলে, পীড়ার দুঃখ উপভোগ করা আবশ্যক ; অন্ন ভোজনের সুখ উপভোগ করিতে হইলে ক্ষুধার জ্বালা উপভোগ করা আবশ্যক ;— সুখ অন্তর্হিত না হইলে তাহা উদিত হইতে পারে না। পরিবর্ত্তনের মুখেই সুখ-দুঃখের বুদ্‌বুদ্ উত্থিত এবং বিলীন হয়। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-শীল ঘটনা-সকল যেমন আগন্তুক অস্থায়ী এবং প্রাতিভাসিক—মনুষ্যের সুখ দুঃখও সেইরূপ। আর প্রকৃতির মূলতত্ত্ব-সকল যেমন অবশ্যম্ভাবী, অটল, বাস্তবিক এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, ধর্ম্মের মূল নিয়মও সেইরূপ। প্রভেদ কেবল এই যে, প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব সকল বস্তু-ঘটিত, ধর্ম্মের মূল নিয়ম কর্ত্তব্য-ঘটিত। সকল বস্তুই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চলে, সকল মনুষ্যেরই ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলা কর্ত্তব্য। সুখ দুঃখ জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম—ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল মনুষ্যেরই ধর্ম্ম। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য অন্ধ বস্তু হইতে চায় না—জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। অবিদ্যা মনুষ্যকে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া অন্ধ বস্তু করিয়া ফেলিতে চায়—মনুষ্য সেই বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জাগ্রত আত্মা হইতে চায়। মনুষ্য যখন অন্ধ প্রকৃতির প্রতিকূলে ধর্ম্ম-পথে চলে—তখন কাজেই সে প্রকৃতির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না ; অন্ধ প্রকৃতি যে, আপনার গলায় আপনি ছুরি দিয়া মনুষ্যকে মুক্তি-পথে অগ্রসর করিয়া দিবে—ইহা হইতেই পারে না ; এই জন্য ধর্ম্ম-পথে চলিবার সময় মনুষ্য অন্ধ প্রকৃতির নিকট হইতে নহে কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করে। ঈশ্বরই ধর্ম্মের সিদ্ধিদাতা বিধাতা। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, বাহির হইতে—প্রকৃতি হইতে—যে ব্যক্তি যত সুখের প্রত্যাশা করে, প্রকৃতি তাহাকে ততই সুখে বঞ্চিত করে ; আর, প্রকৃতির নিকট হইতে যে বড় একটা সুখের প্রত্যাশা রাখে না, প্রকৃতি তাহাকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

মনুষ্য যখন কোমর বাঁধিয়া ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান হয়, তখন দেখিতে পায়—বড়ই সে কঠিন স্থান—প্রকৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্র —শুধু কেবল মুখের কথা নহে। মনে কর একজন ধনী ব্যক্তি এবং এক জন দরিদ্র ব্যক্তি দুইজনেই মনে মনে সংকল্প করিল যে, আমার মনকে আমি কিছুতেই বিচলিত হইতে দিব না—সর্ব্বদাই তাহাকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখিব ; আর, উভয়েই পরস্পরের সহিত সুপরিচিত। হঠাৎ এক দিবস পথে দুই জনের দেখা সাক্ষাৎ হইল ; দরিদ্র ব্যক্তির মনে তদ্দণ্ডেই অর্থের প্রত্যাশা জাগিয়া উঠিল—ধনী ব্যক্তির মনে পালাইবার চেষ্টা জাগিয়া উঠিল ;—ধর্ম্ম-পথ হইতে মন বিচলিত হইবার এই প্রথম সূত্র। দরিদ্র-ব্যক্তিটি ধনী ব্যক্তির গৃহে দুই চারি দিন যাতায়াত করাতে ধনী ব্যক্তি এক দিন বিরক্ত হইয়া দরোয়ান্‌কে দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। মনের স্থৈর্য্য কত না বিচলিত হইল ! দরিদ্র ব্যক্তি যখন দেখিল যে, সহজে কিছুই হইল না, তখন সে প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কত না পদ-স্খলন ! এইরূপ লাখো লাখো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম-পথে এইরূপ অল্প সূত্র হইতেই ক্রমে,

ক্রমে বিপর্য্যয় ফলাও কাণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। উক্ত ব্যক্তি-দ্বয়ের পথে মিলন-কালে এক-জনের মনে অর্থ-কামনা এবং আর এক জনের মনে পলায়ন-কামনা—ইহার পরি-বর্ত্তে যদি উভয়েরই মনে পরস্পরের মঙ্গল-কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সেই অল্প সূত্র হইতে রাশি রাশি ধর্ম্ম ফল ফলিতে পথ পাইত—সন্দেহ নাই। ধনী ব্যক্তি হয় তো প্রসন্ন চিত্তে দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান করিত—দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির নানাবিধ কার্য্যের সহায়তা করিত; এবং দিন দিন উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রব-র্দ্ধিত হইত। যে ব্যক্তি জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাতে আপনি স্বাধীন ভাবে দ-ণ্ডায়মান থাকিতে চেষ্টা করেন—সাংখ্য-দর্শনের উপদিষ্ট কৈবল্য-লাভের প্রার্থী হ'ন—সমস্ত জগৎ সংসার তাঁহার মনকে স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়;—একটি সামান্য কথা—একটি সামান্য দৃশ্য—একটি সামান্য ঘটনা—হয় তো চকিতের মধ্যে তাঁহার মনকে আকাশ হইতে পাতালে ফেলিয়া দিবে। অত-এব শূন্য স্বাধীনতায় ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকা মনুষ্যের পক্ষে যেমন দুষ্কর এমন আর কিছুই নহে। সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া যিনি স্বাধীন হইতে যা'ন, সমস্ত জগৎ তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়;—তিনি একা কত দিক্ সামলাইবেন! চারি-দিকে শত্রু পক্ষ—তাহার মধ্যে স্বাধীন-তাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করা নিতান্তই অসাধ্য ব্যাপার; এরূপ স্থলে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ মহা মহা ধর্ম্মবীর হাবু ডুবু খাইয়া যা'ন—যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে নূতন ব্রতী তাহার তো কথাই নাই। অতএব জগতের উপর চটিয়া এবং জগৎকে চটাইয়া চারিদিকের শত্রুতার মধ্যে স্বাধীন হইতে যাওয়া নি-তান্তই পাগ্‌লামি, কেননা সেরূপ করিয়া কেহই এক মুহূর্ত্তও স্বাধীনতাতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না; শত্রুতা নহে—দ্বেষ হিংসা নহে—প্রেমই স্বাধীন-তার উর্ব্বরা ভূমি। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় জগতের মতে মত দিয়া চলিলে স্বাধীনতা সমূল নির্ম্মূল হইয়া যায়। এখন উপায় কি? উপায় আমাদের প্রতি জনের হস্তে। সত্যসত্যই যদি আমি জগতের মঙ্গল কামনা করি, তবে জগৎও ভিতরে ভিতরে আমার মঙ্গল কামনা করিবে; আমি যদি জগতের মঙ্গল কামনা করি—তবেই জগৎ আমার বন্ধু, আমি যদি জগতের অমঙ্গল কামনা করি তবেই জগৎ আমার শত্রু; এইরূপ, জগৎকে বন্ধু করা এবং শত্রু করা আমার আপনারই হস্তে; আমি যদি আমার শত্রুর মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করি, তবে আমার সে শত্রুরও ক্রমে চক্ষু ফুটিবে;—যদিও স্বার্থের অনুরোধে বাহিরে বাহিরে সে আমার সহিত শত্রুতা করিতে বাধ্য হয়, তথাপি ভিতরে ভিতরে সে আমার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে; তাহার শরীর আমার শত্রু হইলেও তাহার অন্তরাত্মা আমার বন্ধু হইবে—তাহার কার্য্যের সহিত তাহার অন্তরাত্মার বিবাদ উপস্থিত হইবে। অত-এব, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইলে জগ-তের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল-চেষ্টা দ্বারা সর্ব্ব জগতের সহিত এবং সর্ব্ব জগতের সাধারণ কেন্দ্রের সহিত মনকে একতান করিয়া মনের সুর বাঁধা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাহা হইলে ক্রমে আমাদের মঙ্গল-ভাবের তেজঃপ্রভাবে জগতের দ্বেষ হিংসা এবং শত্রুতা আমাদের নিকটে আসিবা-মাত্রই অমনি নতশির হইয়া পড়িবে। এইরূপ সা-ধারণ মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা সাধা-

রণতঃ সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য ; তা ছাড়া আবার—বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগী বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, যেমন—তোমার স্ত্রী পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ তোমার কর্ত্তব্য—আমার স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ আমার কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের মূলে যেমন গার্হস্থ্য প্রেম, সাধারণ কর্ত্তব্যের মূলে তেমনি ঈশ্বর-প্রেম; কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতিরেকে প্রেমের কোন অর্থই হয় না,— ক্রীত দাসের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক প্রেম আদায় করা সম্ভবে না ;—যে যাহাকে প্রীতি করে, সে তাহাকে স্বাধীনভাবেই প্রীতি করে—বলের বাধ্য হইয়া কেহ কাহাকেও প্রীতি করিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের সহিত প্রেমে মিলিতে হইলে—মনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। যে স্বাধীনতা জগতের মঙ্গল-সাধনে পরাঙ্মুখ—যাহার অভ্যন্তরে প্রেম নাই—সেরূপ ফাঁকা স্বাধীনতা কোথাও হইতে পারে কি না – এক তো তাহাই সন্দেহ ; তাহাতে আবার, যদি বা কাহারো দুরদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া থাকে— তবে সেরূপ প্রেম-শূন্য কঠিন-প্রাণ শুষ্ক কাষ্ঠ অপেক্ষা, একটি নব-বিকসিত সরস গোলাব ফুল যাহা আজ আছে কা'ল নাই—তাহা সহস্র-গুণে ভাল। জগতের মঙ্গল-কামনা প্রেম-মূলক হইলে তবেই তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় ;—এটি কাণ্টের কথা নহে—এটি সকল দেশেরই ভক্তজনের হৃদয়ের কথা। কাণ্ট্ কর্ত্তব্য-কার্য্যকে—মঙ্গল ইচ্ছাকে—কঠোর আদেশ করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন,—এবং সেই আদেশ-পালনের প্রবৃত্তিকে তিনি প্রেমের উপরে নহে কিন্তু ভক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্টের এ কথা আমাদের শিরোধার্য্য ; কিন্তু তথাপি আমরা বলি এই যে,কর্ত্তব্য-সাধন প্রথম প্রথম যেমন নীরস দেখায়—চিরকাল কিছু আর সেরূপ থাকে না ; অভ্যাসের গুণে কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন ক্রমে সহজ এবং মধুময় হইয়া দাঁড়ায়—আদিষ্ট কার্য্য জ্ঞানের কার্য্য এবং প্রাণের কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়—শ্রদ্ধা (অর্থাৎ বিশ্বাস) জ্ঞানে পরিণত হয় এবং ভক্তি প্রেমে পরিণত হয়। তবে কি—না কাণ্ট্ ভক্তি এবং প্রেমের মাঝখানে যেরূপ একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারি না। যাহাই হো'ক্—এটা একটি ধ্রুব সত্য যে, আমরা জগতের মঙ্গল-কামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা করিলে আমাদের কখনই অমঙ্গল হইবে না—অবশ্যই মঙ্গল হইবে ; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" কোন কল্যাণ-কারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ;—এইটিই ধর্ম্মের সর্ব্ববাদি-সম্মত মূল-তত্ত্ব। যেমন ক্রিয়া তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া -ইহা যেমন বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—ইহা তেমনি ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব ; উভয়ই ধ্রুব এবং অলঙ্ঘনীয়। তবে, প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের ঐ মূল তত্ত্বটি ভৌতিক নিয়ম, ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্বটি আধ্যাত্মিক নিয়ম ; বিজ্ঞানের ঐ মূলতত্ত্বটির বলে আমরা কেবল পাই যে, সমস্ত জগৎ একই মূল-প্রকৃতির অধীন ; ধর্ম্মের এ মূলতত্ত্বটির বলে আমরা পাই যে, সমস্ত জগৎ একই পরমাত্মার অধীন। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কাণ্ট্ স্থির করিলেন যে ধর্ম্ম-জ্ঞানই পারমার্থিক সত্যের সোপান। পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জগৎ ধর্ম্মের সংগ্রাম-ক্ষেত্র ; ঈশ্বর ধর্ম্মের জয়দাতা বা সিদ্ধিদাতা ; ধর্ম্মের সাহায্যে মনুষ্য অবিদ্যার কার্য্য কারণ শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পারমার্থিক জ্ঞান-রাজ্যে—ঈশ্বরের প্রসন্নতা রাজ্যে—ক্রমশই অগ্রসর হয়।

কাণ্টের মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিজ্ঞানের সহিত পারমার্থিক সত্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই ; শুধু কেবল ধর্ম্ম-জ্ঞানেরই সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, পারমার্থিক সত্যের নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়াও

বিজ্ঞান এ যাবৎকাল স্বীয় অভীষ্ট পথে দিব্য নিরাপদে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞানের ভিতর পারমার্থিক সত্যকে প্রবেশ করাইলে তাহাতে তাহার লাভ কিছুই হয় না, বরং তাহাতে তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের বেলায় এই রূপ দেখা যায় যে, পারমার্থিক সত্যে বিশ্বাস-ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্তই অঙ্গহীন হয়। কাণ্টের এ কথাটি মিথ্যা নহে; তাহার সাক্ষী—কম্‌টির নিরীশ্বর বিজ্ঞান-তন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী; কিন্তু তাঁহার নিরীশ্বর ধর্ম্ম-তন্ত্র ধর্ম্মের পক্ষে এমনি অনুপযোগী যে, তাহা সহৃদয় বিজ্ঞ সমাজে ভক্তি রসের পরিবর্ত্তে শুধু কেবল হাস্য রসেরই উদ্দীপন করে।

প্রথম দৃষ্টিতেই সহৃদয় পাঠকের মনে হইতে পারে যে, কাণ্ট দুই নৌকায় পা দিয়াছেন; বিজ্ঞানের ভিতরে পারমার্থিক সত্যের দর্শন-লাভে পরাভব মানিয়া তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, পারমার্থিক সত্যের প্রমাণাভাব; তাহার পরে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-জ্ঞানের মধ্যে আমরা পারমার্থিক সত্যের অব্যর্থ পরিচয় পাই। এখানে কাণ্টের সপক্ষে এই একটি কথা বলিবার আছে যে, দুই নৌকা যদি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গায়ে গায়ে জোড়া লাগানো থাকে, তবে তাহাকে ঝড়ে শীঘ্র কাবু করিতে পারে না; তাই সিংহলবাসীরা সমুদ্র-বিচরণের সময় ঐরূপ জোড়া নৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে। দুই দিক্ যেখানে বিবেচ্য, সেখানে একদিকে ঝোঁক দেওয়া সময়-বিশেষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে নহে; সজোরে যখন পূর্ব্বে বাতাস বহিতেছে, তখন নৌকার পূর্ব্ব পার্শ্ব ঘেঁসিয়া বসা যাত্রীদিগের কর্ত্তব্য তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু অন্য সময়ে নহে। ধর্ম্ম-সাধন-কালে প্রবৃত্তির বায়ু বহির্বিষয়ের অভিমুখে সজোরে বহিতে থাকে, এই জন্য তখন তাহার বিপরীত দিকে সর্ব্বপ্রযত্নে ঝুঁকিয়া পড়া সাধকের কর্ত্তব্য; কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনা-কালে প্রবৃত্তির বায়ু প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, এজন্য তখন দুই দিকের কোনদিকে ঝোঁক না দিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু কাণ্টের সপক্ষে এই যাহা বলা হইল—এস্থলে তাহা খাটে না; কারণ, কাণ্টের দুই নৌকার মধ্যে যোগবন্ধন এমনি শিথিল যে, এক নৌকা পশ্চিমে—আর এক নৌকা পূর্ব্বে—দুই নৌকা দুই দিকে ধাবমান। এক স্থানে যাহাকে অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর এক স্থানে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে; ধর্ম্মজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দুইকে পরস্পরের প্রতিকূলে দাঁড় করানো হইয়াছে। তিনি যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বসকলকে অন্ধ "বস্তু-স্বরূপের" উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জ্ঞান-স্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতেন—তাহা হইলে তাঁহার দুই নৌকা অতীব দৃঢ় বন্ধনে এক সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া যাইত। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইত যে, বিজ্ঞানের এই যে আধিভৌতিক মূলতত্ত্ব—যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া, এবং ধর্ম্মের এই যে আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এ দুইটি মূলতত্ত্ব একই মূলতত্ত্বের এ-পিট ও-পিট। জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা উভয়েরই ভিত্তি-মূল। সূর্য্য যেমন আলোকের এবং উত্তাপের উভয়েরই কেন্দ্রস্থল; পরমাত্মা সেইরূপ বিজ্ঞানের এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের—ভৌতিক জগতের এবং আধ্যাত্মিক জগতের—উভয়েরই কেন্দ্র-স্থল। অতঃপর বেদান্ত-দর্শনের সহিত কাণ্টের দর্শনের কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

বেদান্ত-দর্শন যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে সময়ে বিজ্ঞানের এখনকার মতো এরূপ হাঁক ডাক ছিল না; গুটি দুই তিন বিজ্ঞান যাহা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিতান্তই আবশ্যক—যেমন পর্ব্বাহ প্রভৃতি নিরূপণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান, রোগপ্রতীকারের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান (তাহাও আবার ঠিক্ বিজ্ঞান science নহে—বিদ্যা art মাত্র)

গণনা কার্য্যের জন্য গণিত বিজ্ঞান, তান্ত্রিক মতের একরূপ রসায়ণ বিজ্ঞান, এইরূপ লোকসমাজের ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি বিজ্ঞান তখন না ছিল এমন নহে। এরূপ সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারি না যে, প্রকৃত বিজ্ঞান তখন আলোক দর্শন করিয়াছিল। প্রকৃত বিজ্ঞানের অর্থাৎ প্রামাণিক বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দুইটি—জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান! এ দুইটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রত্যক্ষের ন্যায় নিঃসংশয়। বরং প্রত্যক্ষের মধ্যে ভ্রম থাকিতে পারে (যেমন মরীচিকা দর্শন), কিন্তু এ দুইটি বিজ্ঞানের কোন স্থানে এমন একটিও ছিদ্র নাই যাহার মধ্য দিয়া ভ্রম প্রবেশ পাইতে পারে—এমন একটিও ঝোপ নাই যাহার আড়ালে ভ্রম লুকাইয়া থাকিতে পারে। এ দুইটি বিজ্ঞান পরস্পরের সহোদর-তুল্য; —জ্যামিতির যেমন ঋজুরেখা, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি শলাকা বা ধারা; জ্যামিতির যেমন বিন্দু, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি রেণু বা অণু; জ্যামিতির যেমন বৃত্ত, যন্ত্র-বিজ্ঞানের তেমনি চক্র; উভয়ের মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ;—প্রভেদ কেবল এই যে, জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়—শূন্য আকাশ-খণ্ড, যন্ত্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়—ভৌতিক বস্তু। নব্য অব্দের বিজ্ঞান কিছু আর আকাশ হইতে পড়ে নাই—অবশ্য তাহা পুরাতন অব্দ হইতেই আসিয়াছে; কিন্তু সেই সকল পুরাতন সামগ্রীকে নব্য অব্দ জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে কালোচিত নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়া প্রামাণিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিয়াছে। কাণ্ট্ জ্যামিতি এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের অভ্রান্তির উপরেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব সকল দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাণ্ট্ যদি শঙ্করাচার্য্যের কালে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে ওরূপ একটা কাণ্ড তাঁহার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারিত না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের কোন গ্রন্থের কোন স্থানেই প্রামাণিক বিজ্ঞানের একটি কথারও সাড়া-শব্দ নাই। এরূপ সত্ত্বেও ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তাঁহার দর্শনের সত্য-নিরূপণ-পদ্ধতি আগাগোড়াই প্রামাণিক পদ্ধতি—সেকেলে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি বলিয়া তাহাকে যে, কেহ উড়াইয়া দিবেন, তাহার জো নাই। তিনি উপনিষদাদি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র; তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করেন নাই,—যেখানে শাস্ত্রীয় কোন কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অথবা যুক্তির এরূপ একটা আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, সেই আলোকেই গম্য-পথের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক রাজসভায়—শাস্ত্র ইংলণ্ডের অধীশ্বরের ন্যায় (সোজা কথায়—সাক্ষী গোপালের ন্যায়) সিংহাসনে উপবিষ্ট; বিচারাদি কার্য্য যাহা নির্ব্বাহ করিবার তাহা দুই মন্ত্রী মিলিয়া নির্ব্বাহ করে; প্রধান মন্ত্রী স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, দ্বিতীয় মন্ত্রী যুক্তি। ইংলণ্ড-বাসীরা যেমন লোকরক্ষার্থে রাজার মান রক্ষা করিয়া থাকে, শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ শাস্ত্রের মান রক্ষা করিয়াছেন—এই পর্য্যন্ত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধান্যার্থী যেমন ধান্যের সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসার পলাল-অংশ পরিত্যাগ করে, জ্ঞানার্থী সেইরূপ শাস্ত্র-সকলের মধ্য হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমশঃ।

শান্তিনিকেতন।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের রেলওয়ে ষ্টেষণের অনতিদূরে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শান্তিনিকেতন" নামক একটি সুন্দর উদ্যান ও উদ্যান মধ্যস্থ শোভাময় পরম রমণীয় প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। এই উদ্যান বাটির চারি-

দিকেই উন্মুক্ত আকাশ ও সুপ্রশস্ত প্রান্তর। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে শাল প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণী মুক্ত বায়ুতে সদাই ক্রীড়াশীল। উদ্যানে আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি তরুরাজি বিহঙ্গ কূজিত হইয়া সংসার তাপিত হৃদয়ে শান্তিবর্ষণ করিতেছে; নিকটে নির্ম্মল তোয়া সুপ্রশস্ত বাঁধ ও উদ্যান ভিতরে সুগভীর প্রশস্ত ইন্দারা। এই স্থান সাধনার অতীব অনুকূল, যেমন নির্জ্জন, তেমনি শান্তিময় পবিত্র ও রমণীয়। এখানে আসিলে সংসার কোলাহল আপনিই অন্তর্হিত হয়, মানব হৃদয় স্বভাবতই ঈশ্বর চিন্তার জন্য ব্যাকুল হয়। এই নিকেতন যথার্থই শান্তিনিকেতন, ধর্ম্ম পিপাসু নির্জ্জন সাধকের অতি প্রিয় পদার্থ। এই স্থানে পূজ্যপাদ মহর্ষি মহাশয় বহুকাল ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই উদ্যান ও উদ্যান মধ্যস্থ প্রাসাদ প্রভৃতি বহু অর্থব্যয়ে মেরামত ও সুসজ্জিত করিয়া সাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং এই শান্তিনিকেতনে নিয়মমত ব্রহ্মোপাসনা, ধর্ম্মবিচার, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, পুস্তকালয় ও আতিথ সেবার অভিপ্রায়ে, এই সুসজ্জিত শান্তিনিকেতন ও বার্ষিক ১৮০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিঃস্বার্থভাবে কেবল ধর্ম্মার্থে উপযুক্ত ট্রষ্টীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখানে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরোপাসনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। রাজা জমিদার হইতে দরিদ্র সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকল অবস্থার লোকই যাহাতে এখানে পরম যত্নে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরোপাসনা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারেন, এই প্রকার সাজ সজ্জা আসবাবাদি ভূরি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় এক সভা আহূত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, যিনি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইঁহারা দুই জনে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ এবং রবীন্দ্র বাবুর প্রাণস্পর্শী সুমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার মহাশয়ও ১। ৪ টি সঙ্গীত করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিনী বাবু শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত বন্ধুগণকে এই স্থানে আসিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। বোলপুর রাইপুর সুরুল প্রভৃতি ভদ্রপল্লি হইতে সকল শ্রেণীর প্রায় ২০০ শত [illegible]লোক আগ্রহের সহিত এই কার্য্যে যোগদিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভক্তিভাজন মহর্ষির নামে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেই যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু সাধারণের তাঁহার প্রতি অগাধভক্তিই ইহার কারণ। সভাভঙ্গের পর সমাগত বন্ধুগণকে সরবত ও তাম্বূল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ মহর্ষি মহোদয়ের দানশীলতার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তিনি জীবনের প্রথম হইতেই বিষয় ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন আছেন। যাহাতে দেশ মধ্যে ধর্ম্মচিন্তা জাগ্রত হয়, দেশবাসী লোকের মন ধর্ম্মপ্রবণ হয়, সে জন্য সহস্র সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি স্বদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনায় সদাই ব্যাকুল, তাই বহুমূল্যের ভূসম্পত্তি ও তাঁহার এই প্রিয় শান্তিনিকেতন, যাহা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হইয়াছে কেবল ধর্ম্মোন্নতির জন্য দান করিলেন। এপ্রকার সাধু দৃষ্টান্ত এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার মহর্ষি নাম সার্থক, পরমেশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করুন।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রম দ্বারা এতদ্দেশের ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ সাহায্য হইবেক। এই আশ্রম ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয়ের সাধনভূমি। তাঁহার সাধনাতে এই আশ্রমের প্রত্যেক ধূলিরেণু পবিত্র হইয়াছে। যাঁহারা বিষয়কোলাহলে উদ্বিগ্ন, সংসারের শোক দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, যাহারা ধর্ম্ম পিপাসু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও সাধনশীল, পাপতাপের যন্ত্রণা দূর করিতে যাঁহারা যত্নবান, তাঁহারা পবিত্র হৃদয়ে, পূজ্যতম মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র শান্তি-নিকেতন আশ্রমে আগমন করুন, বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, যথার্থ ঋষি-জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে মহর্ষি মহাশয়ের পৌত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্নতিকল্পে অটল অনুরাগ ও গভীর উৎসাহের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঈশ্বর করুন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই আশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হউক। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু দ্বিপেন্দ্র বাবু, মোহিনী বাবু রমণী বাবু প্রভৃতি যাঁহারা এই আশ্রমের উন্নতির জন্য এখানে আগমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বোলপুর
৬ কার্ত্তিক ৫৯ ব্রাঃ সং } নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
৫৪৫ সংখ্যা পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯। ১৮১০ শক
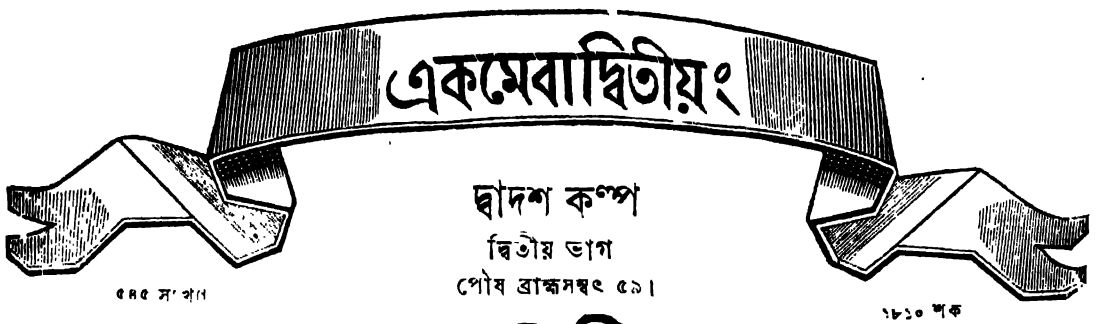
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এত ক্ষণের পর তবে আমরা বেদান্ত-দর্শনের সক্ষেত্রে উপস্থিত; কিন্তু যিনিই যাহা বলুন—এখনো আমরা কাণ্টকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না; আমরা দেখিতেছি যে, কাণ্টের দর্শনের মধ্য হইতে বেদান্ত-পথের যেমন স্পষ্ট ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এমন আর কোথা হইতেও নহে; কাণ্টের দর্শনের মধ্য-হইতে সংশয়ের ইতস্তত-গুলা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সার মন্থন করিয়া লইলে তাহাই বেদান্ত হইয়া দাঁড়ায়। কাণ্ট্ এক জন কলম্বস্-বিশেষ; তিনি বেদান্তের আমেরিকায় ঠিক-ঠাক উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে যে, তিনি প্রাণান্তেও ডাঙায় নাবিলেন না; তিনি ডাঙায় নাবিলেই কে যেন তাঁহার জাহাজ কাড়িয়া লইবে! আমরা তাঁহারই জাহাজের কয়েকজন যাত্রী—কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার ন্যায় জাহাজের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া দম আটকিয়া মারা যাইতে সম্মত নহি; আমরা কূলে অবতরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। কাণ্ট বলিতেছেন "খবরদার কূলে নাবিও না—মারা যাইবে।" আমরা দেখিতেছি যে, মারা যদি যাইতেই হয়—তবে জাহাজের বদ্ধ বায়ুতে মারা যাওয়া অপেক্ষা কূলের মুক্ত বায়ুতে মারা যাওয়া পরম শ্রেয়।

যাহাই হোক্—বেদান্ত-পথের অব্যর্থ সন্ধান কাণ্ট যেমন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এমন আর কেহই নহে। কাণ্ট প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত বিজ্ঞানের মূলে এই তিনটি অকাট্য মূলতত্ত্ব ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হয়—(১) সমস্ত গুণ-প্ররিবর্ত্তনের মধ্যে বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়, (২) পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ অবশ্যম্ভাবী, (৩) যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া; তাহার পরে কাণ্ট ঐ তিনটি বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বের অভ্যন্তরেই পারমার্থিক সত্যের তিনটি সুড়ঙ্গ পথ সন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিরূপে পাইলেন—তাঁহার অন্বেষণ পদ্ধতি কি রূপ? ইহার উত্তর এই যে, ঐ তিনটি মূলতত্ত্বের প্রয়োগ-পদ্ধতি বিজ্ঞান-রাজ্যে এক রূপ—পরমার্থ-রাজ্যে আর-একরূপ, যথা;—

বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূলতত্ত্বকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের সহিত—অবিদ্যার সহিত—মিশ্রিত করা, খাঁটি স্বর্ণকে তাম্রের সহিত মিশ্রিত করা, ইহাই বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম অন্বয়-পদ্ধতি (অর্থাৎ সংযোগ-পদ্ধতি)—ইউরোপীয় ভাষায় method of synthesis; আর, বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব হইতে অবিদ্যা-অংশ বর্জ্জিত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ অংশটি ছাঁকিয়া লওয়া, সোণার মোহর হইতে তাঁবা বাদ দিয়া খাঁটি সোণা বাহির করিয়া লওয়া, ইহাই পারমার্থিক পদ্ধতি; আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় ইহার নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি বা বিবেক-পদ্ধতি—ইউরোপীয় ভাষায় method of analysis। কাণ্ট অন্বয়-পদ্ধতিটিরই—সবিশেষ রসজ্ঞ; বিবেক-পদ্ধতিটি বড় একটা তাঁহার মনঃপূত নহে। কাণ্টের মনোগত ভাব এই যে খাঁটি স্বর্ণ তো আছেই—বাড়া'র ভাগ তাহার সঙ্গে যদি তাম্র মিশ্রিত থাকে, তবে সে তো একটা উপরিলাভ—তাহা ছাড়ি কেন? এই ভাবিয়া তিনি পারমার্থিক রাজ্যেও অন্বয়-পদ্ধতি খাটাইতে নিতান্তই ইচ্ছুক,—যখন দেখিলেন যে, তাহা কোন-ক্রমেই হইবার নহে—তখন তিনি পারমার্থিক সত্যের অনুশীলনে বিশেষ কোন লভ্য দেখিতে না পাইয়া বিজ্ঞানের উপদ্বীপে ফিরিয়া আইলেন—ও সেইখানেই রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। আমাদের দেশের দর্শন-কারদিগের মনের ভাব আর একরূপ; তাহা এই যে, চিনির সঙ্গে বালি মিশাইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অবিদ্যা মিশাইলে—তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লভ্য কিছুই নাই; কেননা, এক তো বালির নিজের কোন মূল্য নাই, তাহাতে আবার তাহা চিনির মূল্য কমাইয়া দেয়; অতএব চিনিকে বালি হইতে পৃথক্ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণের সময় আমাদের দেশের দর্শনকারেরা আহ্লাদের সহিত বিবেক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; কাণ্ট অগত্যা তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এই জন্যই পারমার্থিক সত্যের প্রতি কাণ্টের এত অনাস্থা। কিন্তু আপাতত আমরা কাণ্টের অনাস্থা দ্বৈধ এবং সংশয়—এ সব ব্যাপার ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিব না—তাঁহার মূল কথাটিতেই কেবল আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

আমরা দেখিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুশীলন-কালেই অন্বয় এবং ব্যতিরেক এই দুইটি পদ্ধতি দুইটি বিভিন্ন স্থলে—একটি একরূপ স্থলে এবং আর-একটি আর একরূপ স্থলে—অবলম্বনীয়; যথা;—যখন আমি অশ্বের সাধারণ তত্ত্ব-গুলির পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমি বিশেষ বশেষ জাতীয় অশ্বের (যেমন আরব অশ্বের, বর্ম্মা অশ্বের, তাতার অশ্বের) বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-গুলি বর্জ্জন করিয়া, অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণ-গুলিই গ্রহণ করি; ইহারই নাম ব্যতিরেক-পদ্ধতি। কিন্তু যখন আমি আরব অশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তখন অশ্ব-জাতির সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে আরব-অশ্বের বিশেষ লক্ষণ-গুলি সংযুক্ত করিয়া আরব অশ্বের বিশেষত্ব অবধারণ করি; ইহারই নাম অন্বয়-পদ্ধতি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একরূপ স্থলে আমরা ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করি—আর-একরূপ স্থলে অন্বয় পদ্ধতি অবলম্বন করি। বৈজ্ঞানিক সত্যের বেলায় তো এইরূপ—কিন্তু পারমার্থিক সত্যের বেলায় উভয়-পদ্ধতিই যুগপৎ (অর্থাৎ এক সঙ্গে) অবলম্বনীয়, যথা;—ব্যতিরেক-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞান

হইতে অজ্ঞানকে সমূলে বর্জ্জন করিয়া যখনই আমরা ধ্যানে পাই যে, পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; তখনই অন্বয়-পদ্ধতি অনুসারে সেই জ্ঞানকে সমস্ত জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রাপ্ত হই যে, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ। এইরূপ করিয়াই আমরা পাই যে, পরমাত্মা অনু হইতেও অণু, অথচ মহৎ হইতেও মহৎ; তিনি নির্গুণ অথচ সর্ব্বগুণে গুণী; তিনি নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্বাধ্যক্ষ; ইত্যাদি। ও-দুটি এমনি একাত্মা যে, পারমার্থিক সত্যের অনুসন্ধান-কালে কাণ্ট্ অন্বয়-পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; এবং বেদান্ত দর্শন ব্যতিরেক পদ্ধতির ভক্ত হইয়াও প্রকারান্তরে অন্বয়-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন;—কেননা, পারমার্থিক রাজ্যে ও-দুইটি পদ্ধতি যমক সহোদর—এ পিট ও পট। পারমার্থিক অনুসন্ধান পদ্ধতির আর-একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, এখানে অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়েরই ঐকান্তিক পরাকাষ্ঠা ভিন্ন অল্প কিছুতেই চলিতে পারে না;—ব্যতিরেক-পদ্ধতিরও যেমন পরাকাষ্ঠা, অন্বয়-পদ্ধতিরও তেমনি পরাকাষ্ঠা; অণুর বেলায় অণু হইতে অণুতম—মহতের বেলায় মহৎ হইতে মহত্তম। এই রূপ ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক বিশুদ্ধ জ্ঞানের একটি স্বহস্তের কার্য্য, এজন্য তাহার উপরে কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। কেননা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রমাণ বিশুদ্ধ জ্ঞান নিজেই—তা ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রমাণ সম্ভবে না; তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।"

ইহার অর্থ এই যে, যে জ্ঞান প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে চা'ন, সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা করেন আর কিছু নয়—যে অগ্নি কাষ্ঠকে দহন করে, সেই অগ্নিকে কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে চা'ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক এমনি স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বলিলেই হয়। কাণ্ট্ ঐকান্তিক অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বস্তু গুণের মূলতত্ত্ব শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, আত্মা নির্গুণ বস্তু-স্বরূপ অথচ সমস্ত মানসিক গুণের আধার: কার্য্য-কারণের মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে, ঈশ্বর কালাতীত স্বয়ম্ভু অনাদি, পুরুষ অথচ সমস্ত জগতের আদি-কারণ; ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূল-তত্ত্বকে ঐরূপে শোধন করিয়া পাইয়াছেন যে পরমাত্মা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সর্ব্বজগতেরই মূলাধার অথচ প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই অনুপ্রবিষ্ট।

এই তো গেল পথের বৃত্তান্ত—তা ছাড়া, পথের কোন্ স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া কোন স্থানে পৌঁছিতে হইবে, কাণ্ট্ তাহারও একটি ধারাবাহিক ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা,—

"There is in the progression from our knowledge of ourselves (the soul) to a knowledge of the world and through it to a knowledge of the supreme being, something so natural that it looks like the logical progression of reason from premisses to a conclusion. ইহার অর্থ;—আত্মজ্ঞান হইতে বিশ্ব-জ্ঞানে এবং বিশ্ব-জ্ঞান হইতে পরমাত্ম-জ্ঞানে উপসংক্রমণের যে একটি পদ্ধতি, তাহা এমনি স্বাভাবিক যে, দেখিতে দেখায় ঠিক্ যেন—ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি-পদ্ধতি সাধন হইতে সিদ্ধির দিকে ক্রমে ক্রমে পা বাড়াইতেছে।

কিন্তু হইলে হইবে কি—কাণ্ট্ সংশয়ের ধূলি উড়াইয়া তাঁহার ঐ পথের আ-

দ্যোপান্ত সমস্তই তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন—সেই ধূলি-রাশি অপসারিত করিয়া অনেক কষ্টে তবে আমরা পথটির অন্ধি-সন্ধি পাইয়াছি,—যাহা পাইয়াছি তাহা আমরা যত পারি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

কাণ্টের অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে বস্তু-গণ, তাহার পরে কার্য্য-কারণ, তাহার পরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—এই তিনটি তত্ত্ব উত্তরোত্তর ক্রমে অবলম্বন করিয়া আমরা আত্ম-তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-তত্ত্বে এবং প্রকৃতি-তত্ত্ব হইতে পরমাত্ম-তত্ত্বে উপনীত হই, যথা ;—মনে কর প্রথমে আমরা পৃথিবীকে একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করিলাম; ক্রমে দেখিতে পাইলাম যে, পৃথিবী আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা সূর্য্য হইতে উদ্ভূত এবং সূর্য্যের আকর্ষণে বিধৃত; অতএব, গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য সমস্ত ধরিয়া তবেই তাহা একটি সমগ্র বস্তু; পৃথিবী কেবল তাহার একটি অঙ্গ—এই পর্য্যন্ত ; তা' ভিন্ন—সমগ্র বস্তুর ভাব পৃথিবীতে পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সমগ্র বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে—তাহার মতো একটি সর্ব্বাঙ্গীন বস্তু আমরা প্রকৃতি-রাজ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাই না ; যাহাকেই আমরা বস্তু বলিয়া ধরি—তাহারই নিকটে শুনি যে, "আমার বস্তু আমাতে নাই—আমি আমাতে নাই ;" পৃথিবী বলে যে, আমার বস্তু সূর্য্যে রহিয়াছে, সূর্য্য আবার আর-এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয় ;—পেয়াদার নিকটে যাই সে পেস্কারকে দেখাইয়া দেয়—পেস্কারের নিকটে যাই সে নায়েবকে দেখাইয়া দেয়,—নায়েবের নিকটে যাই সে জমিদারকে দেখাইয়া দেয়—ক্রমাগতই এইরূপ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে জিজ্ঞাসার চালান হইতে থাকে, কোথাও আর কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। ইহাতে এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, সমগ্র বস্তুর একটি ভাব আমাদের আত্মাতে আছে বটে কিন্তু তাহা ভাবমাত্র—সে ভাবের অনুরূপ একটিও বস্তু প্রকৃতি-রাজ্যের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুর ভাব যাহা আমাদের অন্তরে আছে, তাহা অবশ্য বস্তুর সত্তাকে আকাঙ্ক্ষা করে ; এই জন্য প্রকৃত বস্তুকে কোথাও দেখিতে না পাইলেও আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু-ভাবের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য—যাহাকে সম্মুখে পাই তাহাকেই বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—দুধের সাধ ঘোলে মিটাই। বেদান্ত-দর্শনের মতে এটা এক প্রকার পুত্তলিকার বিবাহ দেওয়া ; পুত্তলিকার বিবাহ যেমন মিথ্যা বিবাহ—যাহাকে আমরা সচরাচর বস্তু বলিয়া অবধারণ করি তাহাও সেইরূপ মিথ্যা বস্তু। সত্য বস্তু তবে কি ? আপাততঃ পৃথিবীকেই সমগ্র একটি বস্তু বলিয়া অবধারণ করা যা'ক্; এখন, এই পৃথিবীর সঙ্গে অবশিষ্ট সমস্ত জগতেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে—তাহা এরূপ যে, পৃথিবীর যদি একটি রেণু-কণা বিকম্পিত হয়—তবে সেই সূত্রে সমস্ত জগৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকম্পিত হইবেই হইবে। সমস্ত জগতের সহিত পৃথিবীর এই যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ইহা পৃথিবীর অভ্যন্তরেই চলিতেছে ; এইজন্য এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটিকে যদি হস্তের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই সমস্ত জগৎকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ও সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে একই পরম বস্তুর উপলব্ধি হয় ; তাহা হইলে যে বস্তুকে আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম সেই বস্তু আমাদের হস্তগত হয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের অন্তরে বস্তুর ভাব যাহা বিদ্যমান আছে—সমস্ত জগতের মূলাধারকে প্রাপ্ত হইলে তবেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে; আর, তাহা হইলেই পাওয়া যায় যে, যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার পরব্রহ্ম তিনিই প্রকৃতির মূল-কারণ পরমেশ্বর এবং তিনিই আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মা। এখানকার প্রকৃত মর্ম্ম-কথাটি এই;—প্রথমে বস্তু-জিজ্ঞাসা; কাণ্ট্ বলেন যে, বস্তুর ভাব-একটি আমাদের আছে বটে কিন্তু তাহা বস্তুর জ্ঞান নহে; "বস্তুর ভাব" না বলিয়া যদি "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলা যায়, তাহা হইলে কাণ্টের ঐ কথাটি সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে; কেননা, "বস্তু জিজ্ঞাসা" বলিবা-মাত্রই বুঝায় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে বস্তুর ভাব একটি আছে কিন্তু বস্তু-জ্ঞান এখনো হয় নাই; কেননা এক দিকে যেমন বস্তুর ভাব না থাকিলে বস্তু-জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে না, আর-এক দিকে তেমনি বস্তু-জ্ঞানের অভাব না থাকিলেও বস্তু-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ হইতে পারে না; অতএব কাণ্টের এই যে একটি কথা—যে, বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব, ইহার ল্যাজা মুড়া একত্র করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা আর কিছু নয়—বস্তু-জিজ্ঞাসা। "বস্তু-জিজ্ঞাসা" বলিবা-মাত্রই জিজ্ঞাসুর অস্তিত্ব—জীবাত্মার অস্তিত্ব—প্রতিপন্ন হয়; অতএব বস্তুর ভাব এবং বস্তু-জ্ঞানের অভাব যাহা আমাদের আছে, তাহাতেই জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার পরে বস্তু-ভ্রম; যেমন, প্রথমে পৃথিবীকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়—পৃথিবী সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়;—সূর্য্য আবার আর-এক সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়; ইত্যাদি;—এইরূপ বিফল পরিভ্রমণকেই ভ্রম বলে—ভ্রান্তি বলে; ইহাতেই কার্য্যের কারণ, তাহার কারণ, তস্য কারণ, এইরূপ কার্য্য-কারণময় প্রকৃতির আপেক্ষিক অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাহার পরে বস্তু-জ্ঞান; ইহাতে প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সমস্ত বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সেই সূত্রে সমস্ত জগতের ঐক্য-বন্ধন প্রতীয়মান হয়. আর তাহাতেই প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে সর্ব্বজগতের মূলাধারকে পাইয়া আমাদের অন্তরস্থিত বস্তু-ভাবের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়। এইরূপে, একদিকে আমরা বস্তুর ভাব হইতে কার্য্য-কারণময় নানা বস্তুতে এবং নানা বস্তু হইতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াময় সমস্ত জগতে এবং সেই সূত্রে সর্ব্ব-মূলাধার পরম পুরুষে উপনীত হই; আর-এক দিকে বস্তু-জিজ্ঞাসা হইতে বস্তু-ভ্রমে এবং বস্তু-ভ্রম হইতে বস্তু-জ্ঞানে উপনীত হই; জীবাত্মা হইতে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি হইতে পরমাত্মাতে উপনীত হই।

কাণ্টের পথ অনুসরণ করিয়া চরমে আমরা এইরূপ পাইতেছি যে, সত্য জিজ্ঞাসা—জীবাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক; সত্য-ভ্রম প্রকৃতির অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক; এবং সত্যজ্ঞান পরমাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচায়ক। আরো এই যে, সত্য জিজ্ঞাসার আড়ালে সত্য-জ্ঞান লুকাইয়া রহিয়াছে এবং লুকাইয়া থাকিয়া সত্য জিজ্ঞাসাকে উস্কাইয়া দিতেছে। সত্য-জিজ্ঞাসা একটি হরিণ; তাহার নাভিতেই কস্তুরি (সত্যজ্ঞান) রহিয়াছে; হরিণটি সেই কস্তুরির গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বনময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—ভ্রমারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যখন কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে হতাশ

হইয়া বসিয়া পড়ে—তখন সত্যজ্ঞান তাহার তৃষিত নয়নে আবির্ভূত হয়; মেদিনী গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত হইলে, তবেই বর্ষার বারিধারা আসিয়া তাহার সমস্ত তাপ দূর করিয়া দেয়। কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থ ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ;—কাণ্টের দর্শনের গোড়ার কথাটিতেই বেদান্তের এই তত্ত্বটি বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, সর্ব্ব-মূলাধার পরমাত্মাই পরাকাষ্ঠা পারমার্থিক সত্য, অথচ—কাণ্ট তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই; এই জন্য তাঁহার গ্রন্থের শেষ-ভাগে যখন তিনি ঐ তত্ত্বটিকে প্রকাশ্যে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি তাহার মূল খুঁজিয়া না পাইয়া বিষম এক ধন্দচক্রে নিপতিত হইলেন,—তাঁহার নাভিতেই যে কস্তুরি রহিয়াছে ইহা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাণ্টের দর্শন যদি তেমন এক-জন পাকা বারিষ্টারের আড় প্রশ্নোত্তরের (Cross examination এর) পাল্লায় পড়ে, তবে তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়, যথা;—

বারিষ্টারের প্রশ্ন। তুমি এ কথা বলিয়াছ—যে, ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে কোন একটা বহির্বস্তুর গুণ-সঞ্চার হইলে ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া সেই বহির্বস্তুকে আপনার আয়ত্তাভ্যন্তরে আনিতে যায়?

কাণ্টের উত্তর। হাঁ উহা আমারই কথা বটে।

প্রশ্ন। তুমি আর-এক স্থানে এ কথা বলিয়াছ যে, আমরা যাহাকে বহির্বস্তু বলি তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—জ্ঞান-ছাড়া তাহা কিছুই নহে? এরূপ কথা বলিয়াছ কি না?

উত্তর। আমি এই বলিয়াছি যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। বাহির হইতে গুণ-পরম্পরা একটি-একটি করিয়া ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত হইয়া সেই-সমস্ত বিচ্ছিন্ন গুণ-পরম্পরার মোট বাঁধিয়া সমস্তটা এক যোগে গ্রহণ করে, আর এইরূপ স্থির করে যে, সে-যাহা সে গ্রহণ করিল তাহা শুদ্ধ কেবল গুণ-সমষ্টি, কিন্তু তাহার মূলে বস্তু কোন-না-কোন অবশ্যই আছে,—কিন্তু সেই যে,বস্তু,তাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত,—ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে গুণই কেবল উপস্থিত; বস্তু ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত—অথচ আমাদের জ্ঞানের ইহা একটি ধ্রুব তত্ত্ব যে, তাহা আছেই আছে—তাহা না থাকিলেই নয়। তাই বলি যে, বস্তু-তত্ত্ব শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার, প্রত্যয়েরই ব্যাপার, তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে—বহির্ব্যাপার নহে। ইহার একটি উদাহরণ;—মনে কর "ঈ" এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করিতে ঠিক্ দুই মুহূর্ত্ত সময় লাগে; আর, মনে কর সেই ঈ-ধ্বনিটি আমার কর্ণে উপস্থিত হইল। দুই মুহূর্ত্ত ধরিয়া ঈ ধ্বনিত হইল; সুতরাং প্রথম মুহূর্ত্তে সমস্ত ঈ-ধ্বনি নহে—তখন শুদ্ধ কেবল "ই" এইটুকু উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সেইরূপ আর একটি "ই" উপস্থিত হইল; অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কোন মুহূর্ত্তেই সমগ্র ঈ-ধ্বনি (দীর্ঘঈ) উপস্থিত হয় নাই—দুই মুহূর্ত্তে দুইটি "ই" (হ্রস্বই) পরে পরে উপস্থিত হইল—এই পর্য্যন্ত। ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে যখন দুই মুহূর্ত্তে দুইটি হ্রস্ব ই ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইল—জ্ঞান তখন কি করিল? না সেই দুইটি হ্রস্বই'র মোট বাঁধিয়া একটি দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিল; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রে

একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইয়াই চলিয়া গেল এবং তথায় আর একটি হ্রস্ব ই উপস্থিত হইল—এই মাত্র; সমগ্র দীর্ঘ ঈ কোন কালেই ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং সমগ্র দীর্ঘ ঈ জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার—তাহা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে। তা শুধু নয়—ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই দুইটিও জ্ঞানেরই গড়িয়া-তোলা জিনিস্। কেননা, দুই মুহূর্ত্তে যেমন দীর্ঘ ঈ বাহির হইয়াছে, এক মুহূর্ত্তে তেমনি হ্রস্ব ই বাহির হইয়াছে; অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তে হ্রস্ব ই অপেক্ষাও হ্রস্বতর ই বাহির হইয়াছে—সন্দেহ নাই; অতএব, জ্ঞান যেমন দুই হ্রস্ব ই'র মোট বাঁধিয়া এক দীর্ঘ ঈ গড়িয়া তুলিয়াছে—তেমনি দুই হ্রস্বতর ই জুড়িয়া এক হ্রস্ব ই গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ উত্তরোত্তর ক্রমে, দীর্ঘ ঈ ধরিতে গেলে হ্রস্ব ই আইসে—হ্রস্ব ই ধরিতে গেলে হ্রস্বতর ই আইসে—হ্রস্বতর ই ধরিতে গেলে আরো হ্রস্বতর ই আইসে—ঈ-ধ্বনির মূলান্বেষণ অবশেষে হ্রস্বতম ই'তে গিয়া ঠেকে; কিন্তু হ্রস্বতম ই ধরিতে ছুঁইতে পাইবার বস্তু নহে—জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় তাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। ব্যাপারটি ঠিক্—"ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল!" অতএব নিছক যাহা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহা কিছুই না বলিলেই হয়; ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরাকে জ্ঞান যখন নিজগুণে—হ্রস্ব ই বা দীর্ঘ ঈ বা একটা কোন কিছু করিয়া গড়িয়া তোলে তখনই তাহা জ্ঞানের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জ্ঞানের সেই যে বিষয় (যেমন ঈধ্বনি) তাহা ঐন্দ্রিয়ক গুণ-পরম্পরারই সমষ্টি-বন্ধন; ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে কেবল গুণই উপস্থিত হইয়াছে (যেমন ই ই) তাহা ছাড়া আর কিছুই উপস্থিত হয় নাই; অতএব ইহা নিঃসংশয় যে, ঐন্দ্রিয়ক অবভাসের অভ্যন্তরে "বস্তু" যাহা আমরা অবধারন করি, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের আদবেই কোন হস্ত নাই—তাহা নিছক জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার।

প্রশ্ন। তুমি বলিতেছ যে, আমরা যাহাকে বস্তু বলি তাহা আমাদের জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেরূপ জ্ঞান-গত বস্তু ছাড়া জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না? ইহার তুমি কি উত্তর দেও?

উত্তর। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহা আমি জানি না; কেন না, মনে কর যেন তাহা বাস্তবিকই আছে—কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাহার থাকা-না-থাকা বিষয়ে আমি হাঁ কি না কোন কথাই বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি না তাহাই যেন তুমি জান না, কিন্তু জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে—এটা অবশ্য তুমি জান?

কাণ্ট। এ আবার কিরূপ প্রশ্ন! আছে কি নাই—তাহাই যখন আমি জানি না, তখন তাহা কার্য্য করে কি করে না তাহা আমি কিরূপে জানিব? তোমার সন্তোষের জন্যই হউক, বা আমার আপনার মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই হউক—আমি যেন বলিলাম যে, তাহা কার্য্য করে; কিন্তু তাহা আছে কি নাই তাহা আমি জানি না—সম্ভবতঃ এমনও হইতে পারে যে, তাহা মূলেই নাই, তাহা যদি হয় তবে আমার সে কথা কোথায় রহিল? যে—কার্য্য করিবে সে নাই অথচ আমি বলিতেছি যে, সে কার্য্য করিতেছে! ইহা অপেক্ষা হাস্য জনক ব্যাপার আর কি

আছে? অতএব আমি যখন বলিলাম যে, আছে কি নাই তাহা আমি জানি না, তখন তাহাতেই তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, কার্য্য করে কি করে না তাহাও আমি জানি না।

প্রশ্ন। জ্ঞানাতীত বস্তু আছে কি নাই তাহাও তুমি জান না, কার্য্য করে কি করে না তাহাও তুমি জান না; কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, বহির্বস্তু কার্য্য করে; কেন না তুমি গোড়াতেই বলিয়াছ যে, বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করিয়া তোমার জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে। জ্ঞানাতীত বস্তু কার্য্য করে কি করে না—এইটিই তুমি জান না; কিন্তু বহির্বস্তু কার্য্য করে—এটা তুমি বিলক্ষণই জান;—তবেই হইতেছে যে, তুমি যাহাকে বহির্বস্তু বলিতেছ তাহা জ্ঞানাতীত বস্তু নহে। আবার, ইহাও তুমি বলিয়াছ যে, সেই যে বহির্বস্তু, যাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য-করে, তাহা তোমার ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না; সুতরাং তাহা তোমার ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে; তাহা জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার। কেননা তুমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছ যে, ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে বস্তু উপস্থিত হয় না—গুণই উপস্থিত হয়। তা শুধু নয়—তোমার কথা অনুসারে আরো এইরূপ দাঁড়ায় যে, গুণের মোট-বন্ধন-কার্য্যেও জ্ঞানের বিলক্ষণ হস্ত রহিয়াছে, অতএব ধরিতে গেলে—গুণও জ্ঞানেরই একটি ব্যাপার; কিন্তু সে কথা এখন যাইতে দেও। এখন কেবল বস্তুর কথা হইতেছে। তোমার চরম সিদ্ধান্ত তবে এই;—বহির্বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে; আর, সেই যে বহির্বস্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করে, তাহা জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার। তবেই হইতেছে যে, সেই যে বহির্বস্তু যাহা তোমার জ্ঞানের নিজেরই একটি ব্যাপার তাহাই তোমার ইন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিয়া তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এখন কথা হচ্চে এই যে, তোমার জ্ঞান যদি গোড়াগুড়িই জাগ্রত থাকে, তবে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য আবশ্যক হয় না; আর, তোমার জ্ঞান যদি প্রসুপ্ত থাকে, তবে তাহার নিজেরই একটি ব্যাপার কিরূপে তাহাকে জাগাইবে? প্রসুপ্ত জ্ঞানের "ব্যাপার" আবার কি? ব্যাপার বন্ধ থাকা'র নামই তো প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত জ্ঞান (ব্যাপার খরচ করিয়া) কিরূপেই বা আপনাকে আপনি জাগাইবে? তুমি যখন নিদ্রায় অভিভূত, তখন কি তুমি আপনাকে আপনি জাগাইতে পার—না তুমি পড়িয়া গেলে আপনাকে আপনি স্কন্ধে করিয়া উঠাইতে পার? ইহা সুনিশ্চিত যে, প্রসুপ্ত ব্যক্তি নিজের কোন ব্যাপার দ্বারা আপনাকে আপনি জাগাইয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, বহির্বস্তু—যাহা তোমার জ্ঞানের (প্রসুপ্ত জ্ঞানের) নিজেরই একটি ব্যাপার, তাহাই তোমার প্রসুপ্ত জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে! এটা কিরূপে সম্ভবে?

কাণ্ট যে ইহার কি উত্তর দিবেন—আমরা তো তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা বেদান্তের কূলে নিরাপদে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছি যে, কাণ্ট এত কিনারায় আসিয়াছেন যে, ডাঙায় উঠিলেই হয়; তাহা না করিয়া তিনি শুধু শুধু অনর্থক—সাধ করিয়া—সংশয়ের তুমুল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন। গোড়াতে কাণ্ট এই কথা বলিলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইত যে, বস্তুতত্ত্ব সর্ব্ববাদি সম্মত—অতএব তাহা যে,

শুধু কেবল তোমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার বা আমার জ্ঞানের একটি ব্যাপার—তাহা নহে, তবে কি? না তাহা সর্ব্বসাধারণতঃ জ্ঞানের একটি ব্যাপার, তাহা সর্ব্বজ্ঞানের ব্যাপার; প্রত্যেক জ্ঞানের অভ্যন্তরেই সর্ব্বজ্ঞানের কার্য্য চলিতেছে; প্রসুপ্ত জ্ঞানের অভ্যন্তরেও সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ জাগ্রত আছেন।

"য এষ সুপ্তেষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"—কঠোপনিষদ্।

ইহার অর্থ;—সুপ্তেতে সুপ্তেতে জাগ্রত থাকিয়া যিনি সকলেরই প্রয়োজনীয় বিষয়সকল নির্ম্মাণ করেন তিনিই শুক্র তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন; সর্ব্বজগৎই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব যেখানে যত বস্তু আছে সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞানেরই ব্যাপার; সর্ব্বজ্ঞানই প্রসুপ্ত ব্যষ্টি-জ্ঞানকে (জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞানকে) জাগাইয়া তুলিবার মূলাধার। যদি বল যে, তুমি সর্ব্বজ্ঞানকে কিরূপে জানিলে? তবে তাহার উত্তর এই যে, আমি এই যে ব্যষ্টি জ্ঞান—আমি সর্ব্বজ্ঞানেরই অংশ,—এই সম্পর্ক-সূত্রে আমি সর্ব্বজ্ঞানকে জানিতেছি। যেমন খণ্ড আকাশ দেখিবা-মাত্র আমি অসীম মহাকাশকে সেই সূত্রে উপলব্ধি করি,—সেইরূপ, ব্যষ্টি জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান উপলব্ধি করি। আমাদের ব্যষ্টি-জ্ঞানের অভ্যন্তরেই যে, সর্ব্বজ্ঞান জাগ্রত রহিয়াছে—ব্যক্তিগত জ্ঞানের (limited experienceএর) অভ্যন্তরেই যে, সার্ব্বভৌমিক নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ভিতরে ভিতরে জাগিতেছে,—কাণ্টের সমস্ত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত জুড়িয়া তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ। কেননা, কাণ্টের সমস্ত মূলতত্ত্ব-গুলিই সার্ব্বভৌমিক এবং নির্ব্বিকল্প—একটিও ব্যক্তিগত নহে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অভ্যন্তরে সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম—জাগ্রত রহিয়াছেন। ইহাই বেদান্ত। আমাদের এখানকার মন্তব্য কথাটি সংক্ষেপে এই;—

প্রথমে, সত্য-জিজ্ঞাসা; মূল-সত্য কি—ইহার অন্বেষণ। জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে। জিজ্ঞাসা হয় না কাহার? না প্রথমতঃ যাহার মূলেই জ্ঞান নাই তাহার; দ্বিতীয়তঃ যাহার জ্ঞানের অভাব-বোধ নাই তাহার। জিজ্ঞাসাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানও আছে—জ্ঞানের অভাব-বোধও আছে; জিজ্ঞাসাতে জ্ঞানাজ্ঞান প্রকাশ পায়—অল্প-জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্য-জিজ্ঞাসা অল্পজ্ঞ জীবের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য ভ্রম;—জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমে আমরা যাহাকে তাহাকে মূল সত্য বলিয়া অবধারণ করি; সদ্দারের উপরেও যে সদ্দার রহিয়াছে—এটা আমরা ভুলিয়া যাই। কেহ বলেন যে, যান্ত্রিক বলই মূল সত্য; কেহ বলেন তাড়িত পদার্থই মূল সত্য; কেহ বলেন প্রাণই মূল সত্য; ইত্যাদি। বৈদান্তিক ভাষায় ইহারই নাম রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, অসত্যে সত্য-ভ্রম—অবিদ্যা। অবিদ্যাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, জগতের মধ্যস্থিত কোন বস্তুরই সত্তা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—সমস্তই আপেক্ষিক; বৈদান্তিক ভাষায়—জগতের

সমস্ত বস্তুই সদসদাত্মক, কোন বস্তুই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্যভ্রম সদসদাত্মক প্রকৃতির অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য জ্ঞান; মূল সত্য কি—সর্ব্ব জগতের মূলাধার কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়েও এটা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, মূল সত্য আছেই আছে—আপেক্ষিক সত্যের মূলে নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ সত্য না থাকিলেই নয়। এইরূপ অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে কি প্রকাশ পায়? না জ্ঞানের নিজ মাহাত্ম্য।—জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে; অভ্রান্ত নিশ্চয়তা ঠিক্ তাহার উল্টা দিক্ হইতে—জ্ঞানের প্রভাব-বোধ হইতে—উৎপন্ন হয়। অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, জীবের অল্প জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান জাগিতেছে—এবং সেই সর্ব্বজ্ঞানের প্রভাবেই জীবের অল্প জ্ঞান এবং প্রকৃতির সদসদাত্মক আপেক্ষিক সত্তা উভয়ই প্রাণ ধারণ করিতেছে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, অভ্রান্ত সত্য-জ্ঞান সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মের অস্তিত্ব-সূচক। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈদান্তিক সত্যের একটি অন্তঃশিলা সরস্বতী নদী তলে তলে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু হইলে হইবে কি—এক সর্ব্বগ্রাসী সংশয় আসিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। পারমার্থিক সত্য ঐ যাহা দেখা গেল তাহা বাস্তবিক সত্য—বস্তুগত সত্য—না শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানগত সত্য, এইটির মীমাংসা করিতে গিয়া কাণ্ট অতলস্পর্শ সংশয়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যদি এমন হইত যে, আমাদের জ্ঞান একটা সৃষ্টিছাড়া বস্তু—আমাদের জ্ঞানের সহিত কোন বস্তুরই কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই—তাহা হইলে কাণ্টের ঐরূপ সংশয়ের অর্থ থাকিত। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যখন ভিতরে ভিতরে সমস্ত প্রকৃতির সহিত এবং সমস্ত জ্ঞানের সহিত যোগ-সূত্রে আবদ্ধ—জ্ঞানই যখন সমস্ত জগতের সারাংশ এবং সমস্ত বাস্তবিকতার মূল, তখন জ্ঞান-গত পারমার্থিক সত্য কিসে যে অবাস্তবিক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উল্টা আরো দেখা যায় যে, যাঁহারা বাস্তবিক সত্যের প্রয়াসী তাঁহারা ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হ'ন;—অবিদ্যার পথই অবাস্তবিক মৃগতৃষ্ণার পথ, জ্ঞানের পথই বাস্তবিক সত্যের পথ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য ঐন্দ্রিয়ক সত্য নহে বলিয়াই কি তাহাকে অবাস্তবিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? তাহা যদি করিতে হয়, তবে শুধু তত্ত্বজ্ঞান কেন—বিজ্ঞানও এক-মুহূর্ত্ত-কাল টেকেন না। তাহা হইলে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীকে কেহ ঘুরিতে দেখে নাই—অতএব পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা সত্য নহে। এইরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানের (মিশ্র জ্ঞানের) কথাতেই যখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা তাহা অপেক্ষা আরো কত না শ্রদ্ধেয়। কাণ্টের দর্শন হইতে সংশয়ের আবরণটি অপসারিত করিলেই আমরা অমূল্য সত্য-রত্নের দর্শন পাই—নচেৎ এমনি এক বিষম পাকচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া যাই যে, সেখান হইতে উদ্ধার পাওয়া দেবতারও অসাধ্য। বেদান্ত-দর্শনে ঠিক্ ইহার বিপরীত দেখা যায়; বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সংশয় দূরে থাকুক—তাহার প্রতি শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি-ভূমি। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিজ-মূর্ত্তি হইতে

মুখ ফিরাইয়া বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে তাহার ছায়া যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিলেন। একজন ছুতার মিস্ত্রী একটা হীরক অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে; কিন্তু তাহা হীরক কি না তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, ইহাতে তো কাচ কাটিতে পারা যায়—আপাততঃ এই ঢের! এক জন জহরী সেই হীরকটি পাইয়া তাহাকে আপনার কণ্ঠাভরণ করিয়া রাখিল। কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত-দর্শন দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কাণ্টের দর্শন ছুতার মিস্ত্রী, বেদান্ত-দর্শন জহরী; আর, দুয়ের মধ্যে ঐক্য এই যে, কাণ্টের দর্শনও হীরক (পারমার্থিক সত্য) হস্তে পাইয়াছে, বেদান্ত দর্শনও তাহা হস্তে পাইয়াছে। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়া গাঁথাইলেন—বেদান্ত দর্শন বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। এক যাত্রায় কত না পৃথক ফল! বেদান্ত দর্শনের সকল কথা সবিস্তরে বলিতে গেলে বৃহৎ এক পুস্তক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা না করিয়া আমরা যত সংক্ষেপে পারি তাহার সার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করিয়াই এবারকার মতো ক্ষান্ত হইব।

বেদান্তের পথ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই;—এপারে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, ওপারে ব্রহ্ম-জ্ঞান, মাঝখানে ভ্রম-নদী। ভ্রম-নদী একই নদী—ও-পার হইতে দেখিলে তাহা ঈশ্বরের ঐশী-শক্তি, এ-পার হইতে দেখিলে তাহাই জীবের অবিদ্যা। ভ্রম নদী পার হইয়া ও-পারে যাইতে হইবে—তাহার উপায় অবলম্বন করাই সাধন। ভ্রম-নদীর ও-পারে পৌঁছিলেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হয় এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়; ইহাই মুক্তি।

বেদান্তের এই যে, পথ-বৃত্তান্ত—বিবেচনা করিয়া দেখিলে—ইহা এক দিনের পথ-বৃত্তান্ত;—অবশ্য ব্রহ্মার এক দিন। এ কেবল সঙ্গীতের নীচের সা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া এক সপ্তক পার হইয়া উপরের সা'য়ে যাওয়া; কিন্তু সপ্তকের উপর সপ্তক রহিয়াছে—জিজ্ঞাসা'র উপর জিজ্ঞাসা রহিয়াছে—ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপর ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে—মুক্তির উপর মুক্তি রহিয়াছে; তবে কি না—এক সপ্তকের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল সপ্তকেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়—সৌর-জগতের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল জগতেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়। অতএব, বিজ্ঞানকে কম্‌টি এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, সৌর-জগতের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই—সৌর-জগতের বৃত্তান্তটিই ভাল করিয়া জান, এটি অতি সৎপরামর্শ তাহাতে আর ভুল নাই। আমরা তাই বলি যে, বেদান্ত এক সপ্তকের বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—ভালই করিয়াছেন, কেননা সাধনের পক্ষে সেইটুকুই কেবল প্রয়োজন,—তাহার অধিক আপাততঃ কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি হইবে—এইটি বুঝিলেই মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনে যত্নবান্ হইতে পারে; ইহার উপরে অধিকন্তু এইটুকু কেবল টীকা করা আবশ্যক যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমেই যে, সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জিত হইবে ইহা অসম্ভব। প্রথম উদ্যমের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রথম উদ্যমেরই ব্রহ্মজ্ঞান—প্রথম উদ্যমেরই মুক্তি—উপার্জ্জিত হইতে পারে। তাহার পরে দ্বিতীয় উদ্যমের জিজ্ঞাসার পর দ্বিতীয় উদ্যমের মুক্তি—

এইরূপ তৃতীয়—চতুর্থ—ইত্যাদি অনন্ত ব্যাপার প্রসারিত রহিয়াছে। জীবাত্মা সাধন-দ্বারা অবিদ্যা হইতে প্রথম-ধাপের মুক্তি লাভ করিলে পরমাত্মা যে তাহাকে কতখানি কৃতার্থ-করিবেন, তাহা পরমাত্মারই হস্তে। সুতরাং তাহা বলিবার কহিবার কথা নহে—তাহা বলিবার কহিবার অধিকার কাহারো নাই—ক্ষমতাও কাহারো নাই। তাহা সাধনের ব্যাপার নহে যে, তাহার কেহ উপদেশ দিবেন! তাহা উচ্ছ্বাসেরই ব্যাপার—পরমাত্মার স্বহস্তের ব্যাপার—প্রসাদামৃত-বর্ষণ! তাহা উপদেশের কোন ধারই ধারে না। ব্যাকরণ শিখিবার সময় কালিদাস অবশ্য আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শকুন্তলা লিখিবার সময় তিনি কাহারো উপদেশ গ্রহণ করেন নাই—তাহা যদি করিতেন তবে তাঁহার শকুন্তলা মহাভারতের শকুন্তলার দ্বিতীয় সংস্করন-মাত্র হইত, তাহার অধিক আর কিছুই হইত না। উচ্ছ্বাসের ব্যাপার উপদেশের বিষয় নহে, তাই বেদান্ত দর্শন এই বলিয়াই এক কথায় সংক্ষেপে সারিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি হইলেই—মুক্তি হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া উচ্ছ্বাসের ব্যাপার-টি কাহারো উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। মনে কর যেন জীবাত্মা অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে—তাহা হইলে সে কোথায় যাইবে? অবশ্য পরমাত্মার ক্রোড়ে। এ অবস্থায়, জীবাত্মা যাঁহার প্রসাদে মুক্তি লাভ করিয়াছে তাঁহাকে কত না প্রীতি সমর্পণ করিবে—আর, তখনও কি পরমাত্মার অমৃত ভাণ্ডার ফুরাইয়া যাইতে পারে? জীবাত্মা যখন পরমাত্মাতে প্রীতি সমর্পণ করিতেছে, তখন পরমাত্মার ভাণ্ডারে কি প্রীতি-ধনের এতই অনটন যে, জীবাত্মার প্রীতির তিনি প্রত্যুত্তর-দানে অসমর্থ হইবেন? কখনই না! পরমাত্মার প্রেম-ভাণ্ডার অপরিসীম; তিনি আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই জীবাত্মাকে মুক্ত হস্তে ঢালিয়া দিবেন—জীবাত্মা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলে হয়! তিনি আপনাকে পর্য্যন্ত ঢালিয়া দিবেন—অথচ তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার কোন কালেই ফুরাইবে না—"আর কিছুই দিবার নাই" এরূপ হইবে না, জীবাত্মারও "আর কিছুই গ্রহণ করিবার নাই" এরূপ হইবে না। তাই আমরা বলি যে, জীবাত্মার উত্তরোত্তর সাধনের পরিপাকাবস্থায় অবিদ্যার উত্তরোত্তর বন্ধনচ্ছেদ হয়; আর যখন যখন বন্ধন-চ্ছেদ হয় তখন তখনই জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রভাব বিকসিত হয় এবং প্রসাদ অবতীর্ণ হয়; এইরূপ—পরমাত্মার উত্তরোত্তর প্রসাদ-বর্ষণই জীবাত্মার উত্তরোত্তর মুক্তি।

সমস্ত বেদান্তের এবং কাণ্টের আদ্যোপান্ত সমন্বয় করিয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি যে,

প্রথমতঃ সত্য জিজ্ঞাসা জীবাত্মারই জিজ্ঞাসা—পরমাত্মার নহে; এইখানটিতে জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ছায়াতপের প্রভেদ।

দ্বিতীয়তঃ সত্যজ্ঞান জীবাত্মার এবং পরমাত্মার উভয়েরই—মূলে তাহা পরমাত্মার এবং তাঁহার প্রসাদে তাহা জীবাত্মার। এই খানটিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য।

তৃতীয়তঃ জীবের সত্য জিজ্ঞাসার অভ্যন্তরে যেমন সত্য জ্ঞান বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তেমনি তাহার সত্য-জ্ঞানের অভ্যন্তরেও উচ্চতর সত্যের জিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; পরমাত্মার সত্য জ্ঞান পরিপূর্ণ,

জীবাত্মার সত্য জ্ঞান আংশিক ; পরমাত্মার সত্য-জ্ঞান স্বরূপ-জ্ঞান, জীবাত্মার সত্য জ্ঞান তাহার আভাস মাত্র ; এইটি ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়েই বেদান্ত-দর্শন বলেন যে, পরমাত্মা স্বরূপ-চৈতন্য—জীবাত্মা আভাস চৈতন্য। এইখানটিতেই জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদাভেদ;—জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব—এইটিই উভয়ের অভেদ ; আর প্রতিবিম্ব অবশ্য মূল-জ্যোতি হইতে ভিন্ন—এইটিই উভয়ের প্রভেদ। অতঃপর বেদান্তের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা এবং প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ এবং জীবাত্মার সাধন-পদ্ধতিই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

বেহালা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ কার্ত্তিক বুধবার ১৮১০ শক।

আজকাল অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে গৃহস্থের ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রকারেরা অরণ্যবাসী ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষেই একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আর সংসারী গৃহস্থের পক্ষে দেবদেবীর অর্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানই পর্য্যাপ্ত। বর্ত্তমানে লোকের এইরূপ সংস্কার। কিন্তু এইটি বড় ভ্রান্ত সংস্কার। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই, পরম কারুণিক প্রাচীন ঋষিরা যে সেই মুক্তির নিদান ব্রহ্মজ্ঞানে সংসারী গৃহস্থকে অনধিকারী করিয়াছেন ইহা নিতান্ত উন্মত্ত-প্রলাপ। মহর্ষি মনু এই ভারতভূমির ধর্ম্মসংস্থাপক ও সমাজ-সংস্কারক। বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং। মনু বেদোক্ত পথ হইতে রেখা মাত্রও পরিভ্রষ্ট হন নাই এই জন্যই স্মৃতিকারদিগের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বপ্রাধান্য। সেই মনু কহিয়াছেন—

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।

গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত আছে অপর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা তৎসমুদায় কেবল জ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। সেই জ্ঞান এই যে, তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু উপনিষৎ, প্রমাণে জানেন যে একমাত্র পরব্রহ্মই পঞ্চযজ্ঞাদি তাবৎ বস্তুর আশ্রয়। মনুর যে প্রকরণে এই কথার উল্লেখ তাহার সমাপ্তিতে টীকাকার অতি পরিষ্কাররূপে কহিয়াছেন—

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।

বেদসন্ন্যাসী অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণের প্রতি ইহাই বিধি। এক মনু প্রমাণেই প্রতিপন্ন হয় যে বেদবিহিত কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। তবে যে ইহার প্রতি ঔদাস্য তাহার কারণ আছে। ইন্দ্রিয়-দমন, ব্রহ্মে মতি ও রতি হইবার প্রধান কারণ। অবশ্য বাহ্য পূজায় ইহা উপেক্ষিত নয়। তাহাতেও সংযমের বিধি আছে। বলিতে কি, ব্যবহারত সেই বিধির উপর লোকের ততটা নির্ভর দেখা যায় না। কিন্তু যিনি ব্রহ্মলিপ্সু ইন্দ্রিয়দমন তাঁহার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য। এমন কি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্যতীত কাহারই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে না। মনুষ্য প্রাণের তৃপ্তি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। এইটী তাহার অধীনতা। তাহার প্রতিস্রোতে যাওয়াই তাহার স্বাধীনতা। প্রাণের তৃপ্তির হেতু একমাত্র প্রকৃতি। বেদান্ত শাস্ত্র ইহাকে অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানের মুখ্য কার্য্যই

এই অবিদ্যানাশ অথবা প্রকৃতির বন্ধনচ্ছেদ। যতদিন অবিদ্যার অধীনতা তাবৎ আত্মা পরিস্ফুট হয় না। আত্মাকে পরিস্ফুট করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইন্দ্রিয় ইহার ব্যাঘাতক। ইন্দ্রিয়ই প্রকৃতির অতীত প্রদেশে মনুষ্যকে যাইতে দেয় না। এই জন্যই দেহে আমাদের আত্মবুদ্ধি। ইহাই প্রকৃত অধীনতা বা বদ্ধভাব। ইহার প্রতি-স্রোতে চল, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া দেহ-বন্ধন বা প্রকৃতির বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত কর তোমার আত্মা পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ অবিদ্যার আবরণ হইতে মুক্ত হওয়াই স্বাধীনতা। ইহার প্রথম কার্য্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। এইটী না হইলে ব্রহ্মে রতি ও মতি হয় না। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অতি কঠিন কার্য্য। এই জন্য বেদাদি শাস্ত্রে গৃহস্থের ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার বিধি থাকিলেও বাহ্য পূজায় সহজে তৃপ্তি পায় বলিয়া সে তাহাতে প্রাণমন সমর্পণ করে। কিন্তু প্রত্যেকের এই বেদবাক্য-টীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহ্যকৃতঃ কৃতেন, কৃত যে বাহ্য পূজা তদ্দারা অকৃত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্লবা-হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ। এই যে যাগ-যজ্ঞরূপ ভেলা তাহা নিতান্ত অদৃঢ়। ফলত যাবৎ তুমি অবিদ্যা বা প্রকৃতির বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত না করিবে তাবৎ তোমার রজতভ্রমে শুক্তিসংগ্রহই সার। তুমি প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বহুদূর।

কিন্তু নিরাশ হইবার কথা নয়। ঋষিরা গৃহস্থের ব্রাহ্মী মতি হইবার জন্য উপায়ও করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান ব্রহ্মচর্য্য। এই সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের এক-স্থলে এইরূপ আছে

অনেক জন্ম বিষয়াভ্যাসজনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইত্যতো ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনবিশেষোবিধাতব্যঃ।

যে বিষয়বাসনা আমাদের মনপ্রাণ সমস্ত অধিকার করিয়া আছে তাহা সহসা দূর করা সহজ নয় এ জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনু-ষ্ঠানের আবশ্যকতা। ফলত ব্রহ্মচর্য্য একটী কঠোর ও কষ্টসাধ্য কার্য্য। সকল শাস্ত্রই কহিতেছে এতদ্ব্যতীত কেহ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানে অধিকারী হইতে পারে না। মনুষ্য যৌবনে প্রমাথী ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়ে। বি-ষয়ীর আত্মজ্ঞান ও তদভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। এই জন্য পূর্ব্বতন নিয়মে বাল্য হইতে অর্থাৎ শিক্ষাকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এখনও প্রতি গৃহস্থের তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল নিয়মেরই দেশকালভেদে একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বে যে প্রণালীতে ইহা অনুষ্ঠিত হইত বর্ত্তমানে তাহা একরূপ অসম্ভব, তথাচ তাহার মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চল অবশ্যই ফল পাইবে। ব্রহ্মচর্য্যে শা-রীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শিক্ষা অনুস্যূত। পূর্ব্বকালে ভিক্ষাটন, গুরুর কাষ্ঠভার আহরণ, শিলাতলে একাকী শয়ন প্রভৃতি শারীরিক শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এখন সেই অতীতের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না কিন্তু ঋষিরা কহিতেন, তৈলপাত্রমিবাত্মানং দিধারয়িষেৎ, তৈল পাত্রকে যেমন যত্নে রক্ষা কর সেইরূপ যত্নে দেহকে রক্ষা কর। সুতরাং বাল্যা-বধি ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীর সবল করা আবশ্যক। মানসিক শিক্ষার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে কি দেশীয় কি বিদেশীয় যাহা সৎ শাস্ত্র যাহা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তাহার অনুশীলন কর। আর যেরূপ শক্তি তদনুসারে অল্পে অল্পে অধ্যাত্মিক শিক্ষা-লাভে যত্নবান হও। এতদ্ব্যতীত মধুমাংস

এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কুৎসিত নৃত্যগীতাদি হইতে আপনাকে দূরে রাখ। স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাবে দৃষ্টিপাত কর। সকল প্রকার লোভ সম্বরণ ও মিতাহার অভ্যাস কর। বেশভূষায় দীনভাব ও বিনয় রক্ষায় যত্নবান হও। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। বাল্যাবধি এই মহাব্রত পালনে দৃঢ়তা থাকিলে তুমি যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, যখন সংসারের নানারূপ বাসনা তোমাকে প্রলোভিত করিতে থাকিবে তখন এই ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ শিক্ষাই তোমার এক মাত্র রক্ষক। বিষয় অবশ্যই আসিবে কিন্তু এই শিক্ষার বলে অনাসক্তি তাহার দাসত্ব হইতে তোমায় মুক্ত রাখিবে। এই অনাসক্তের বিষয়ভোগই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভের পূর্ব্ব সোপান, এই প্রসঙ্গে ধম্মপদ নামে এক খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ বড় সুন্দর উপদেশ দিয়াছে।

অপ্পমাদো মতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়ামৃগ হইয়া থাকাই প্রমাদ। ইহা মৃত্যুর পদ। ফলত প্রমাদী যেরূপ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয় অপ্রমাদী সেরূপ হয় না। তুমি যদি প্রকৃতি বা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া আত্মাকে পরিস্ফুট করিতে না পার তবে ইহাই তোমার অধ্যাত্মিক মৃত্যু। ব্রহ্ম এই মহা মৃত্যু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই তো শিক্ষাকালের ব্রহ্মচর্য্য। ইহা গার্হস্থে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা ব্যতীত গার্হস্থের যাহা বিধান আছে তাহাও বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য, প্রত্যেক মনুষ্য পাঁচটী ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দেবঋণ পিতৃঋণ ঋষিঋণ মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ। আশৈশব যে শিক্ষা চলিতে ছিল তৎপ্রভাবে শরীর গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনের উপযোগী বল লাভ করিয়াছে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মন বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে এবং আত্মা স্বাধীন। পূর্ব্ব শিক্ষা গার্হস্থ বিধান রক্ষায় তোমায় সক্ষম করিয়াছে। এখন তুমি ঐ পাঁচটী ঋণ হইতে মুক্ত হও। তোমার উপাস্য সর্ব্বব্যাপা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম। দিন দিন এই পাঁচটি ঋণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তুমি তাঁহাকেই পাইবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে সর্ব্বদা রত থাক ইহা জ্ঞানযোগে আত্মপ্রসারণ। পূর্ব্ব পিতামহগণ যে সকল সদাচার ও সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন বংশপরম্পরায় তাহা প্রচারিত কর ইহা শ্রদ্ধাযোগে লোকান্তরে আত্মপ্রসারণ। যে সকল লোক নিরন্ন জাতি ও বর্ণনির্বিশেসে তাহাদিগকে আশ্রয় দেও ইহা মৈত্রীযোগে আত্মপ্রসারণ। যে সকল পশু পক্ষী তোমার দয়ার একান্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহাদিগকে আহার দেও ইহা প্রীতিযোগে আত্মপ্রসারণ। আর যে দেবতা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত তাঁহাকে আত্মায় দেখিয়া জগতের সহিত আপনার যোগ নিবদ্ধ কর ইহা ধ্যানযোগে আত্মপ্রসারণ। উপাস্যের ধর্ম্ম প্রাপ্তির চেষ্টাতেই প্রীতির পরাকাষ্ঠা। এই পাঁচ ঋণমুক্তি তাহাই সাধন করিয়া দেয়। যাহা অবশ্য দেয় তাহাই ঋণ, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া এই পাঁচ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছ। এক মাত্র ব্রহ্মকে ইহার অধিষ্ঠাতা জানিয়া এবং ইহাতে আপনাকে প্রতিবিম্বিত না দেখিয়া প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত ইহার অনুষ্ঠান কর ক্রমশ তোমার ব্রহ্মলাভের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। কে বলে গার্হস্থে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। ইহা

কি কখন বিশ্বাস করিতে পার পরম কারুণিক ঋষিরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমে মুক্তি পথ রোধ করিয়াছেন? ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধের কথা। ব্রহ্মজ্ঞান কোন অবস্থায় কাহারই পক্ষে সপ্রতিবন্ধ নয়। তবে ইহার জন্য আপনার অধিকার স্থাপন করা চাই। বাল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনে চেষ্টা কর অবশ্যই অধিকারী হইবে। চিত্তশুদ্ধির অনুরোধে বাহ্য পূজায় বৃথা কালক্ষেপ করিও না। ঋষিরা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাতক নয়। ইহা নিশ্চয় জানিও অনধিকারেই উপধর্ম্মের সৃষ্টি। প্রাণপণে তাহা হইতে আপনকে রক্ষা কর ইহাই ঋষিগণের আদেশ ও উপদেশ।

প্রকৃত সময়েই এদেশে ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমরা পরাধীন আমাদের যা কিছু ছিল সমস্তই অন্যে বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। দেশাবচ্ছিন্নে যে ধর্ম্ম প্রচলিত তাহাতে শাস্ত্রত না হোক কিন্তু ব্যবহারত দেহ মন আত্মা এক প্রকার উপেক্ষিত। কিন্তু এই ঋষিসেবিত প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্মই ঐ তিনের উন্নতি ও মুক্তি লাভ। এই সার্ব্বজনীন নিত্য ধর্ম্ম ব্যতীত এ দেশের দুরবস্থা দূর হইবার উপায় নাই। তাই বুঝি ঈশ্বর কৃপা করিয়া যথা সময়ে এই দেশে এই ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। নিশ্চয় জানিও দেহ মন আত্মা এই তিনের সমান ভাবে উন্নতিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব না পাইলে দেশের দুরবস্থা দূর হইবার নয়। এক্ষণে সকলে উত্থান কর জাগ্রত হও। এই ধর্ম্ম নিজের গার্হস্থ জীবনে আনিতে চেষ্টা পাও, এবং এই দেশের দ্বারে দ্বারে ইহা প্রচার কর। ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরই এই কার্য্যে তোমার সহায় হইবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ
সরস্বতী তীর
১৮১০ শক।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৮ সংখ্যা   ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

বিজ্ঞাপন।

উনষষ্টি সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, সত্য-জিজ্ঞাসাই জীবাত্মার বিশেষ পরিচয়-লক্ষণ। জীবাত্মা চায়—ঠিক সত্যটি জানিবে; কিন্তু প্রকৃতি তাহার পরিবর্ত্তে মোটা-মোটি একটা সত্য দিয়া তাহাকে ভুলাই-বার চেষ্টা করে—তৃষিত জীবাত্মার সম্মুখে জলের পরিবর্ত্তে মরীচিকা আনিয়া উপস্থিত করে। আত্মা বারম্বার প্রতারিত হইয়া অবশেষে প্রকৃতির প্রলোভনে যখন কিছু-তেই আর ভুলে না, তখন প্রকৃতি আত্মার উপরে চড়াও হইয়া আক্রমণ করে। বিড়াল-শিশুকে যেমন তাহার মাতা ক্রীড়া-চ্ছলে আক্রমণ করে (তাহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এই যে, আমার শাবকটি যুদ্ধ-বিদ্যা শিখুক)—প্রকৃতি-মাতা আত্মার সহিত ঠিক্ সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে প্রকৃতির ক্রীড়া বিপর্য্যয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মার সহ্য-গুণকে একেবারেই ধরাশায়ী করিয়া দেয়; তাহার কিছুকাল পরেই প্রকৃতি-

মাতা হাস্যময়ী অভয়-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মার ক্রন্দনোদ্যত মুখে হাস্য ডাকিয়া আনেন। যতক্ষণ না আত্মা ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া শিখিয়া এরূপ শক্ত সমর্থ হয় যে, আর সে বিভীষিকাতেও ভয় পায় না—ছলনাতেও ভুলে না, ততক্ষণ প্রকৃতি-মাতা তাহাকে ভয় দেখাইতেও ছাড়েন না—ছলনা করিতেও ছাড়েন না। প্রকৃতি আত্মার "মাতা পরমকো গুরুঃ।" বিড়াল-শিশুকে তাহার মাতা বাস্তবিক কিছু আর বধ করিতে পারে না—যেন বধ করিতে যাইতেছে এইরূপ একটা ভান করে—এই পর্য্যন্ত; প্রকৃতি মাতা আত্মাকে কিছু আর বিনষ্ট করিতে পারেন না—"নায়ং হন্তি ন হন্যতে,"—কেবল আত্মাতে ঐরূপ একটা ভ্রান্তির সঞ্চার করেন। প্রকৃতি-মাতার মর্ম্মগত অভিপ্রায় এই যে, আত্মা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক—আমার বিরুদ্ধে আপনার প্রভাব ব্যক্ত করুক—এইরূপে ক্রমে শক্ত সমর্থ হউক। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যুদ্ধের পরে শান্তি লাভ করিলে তবেই আত্মা শান্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে—ভ্রমের পরে সত্য লাভ করিলে তবেই আত্মা সত্যের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। অতএব প্রকৃতির বিভীষিকাও অমঙ্গল নহে, ছলনাও অমঙ্গল নহে, প্রত্যুত তাহা মঙ্গলেরই অব্যর্থ সোপান।

বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তাহা ঈশ্বরেরই ঐশী-শক্তি—মায়া। পরমাত্মাই সৎ-স্বরূপ—অর্থাৎ অনন্য-সাপেক্ষ নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ সত্য; প্রকৃতি সদসদাত্মক—অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য—ছায়া-সত্য। সাংখ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। আমরা অতঃপর দেখাইতেছি যে, সদসদাত্মক এবং ত্রিগুণাত্মক এ দুইটি বাক্যের অর্থ একই—কি? না আপেক্ষিক সত্য।

সত্ত্বরজস্তমোগুণ আমাদের দেশের আপামর সাধারণ সকলেরই মুখে অনর্গল শুনিতে পাওয়া যায়। কথায় কথায় লোকে বলে—অমুকের বড় তমো হইয়াছে; সাত্ত্বিক আহারে শরীর বড় ভাল থাকে; রাজসিক আচার ব্যবহার যোদ্ধাদেরই মানায় ভাল; ইত্যাদি। কিন্তু বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি—সত্ত্বরজস্তমোগুণ যে ব্যাপারটা কি, কেহই তাহা আমাদিগকে আজ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। আমরা প্রামাণিক রকমে বুঝিতে চাই, তাঁহারা আমাদিগকে শাস্ত্রীয় রকমে বুঝা'ন;—অমুক টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অমুক ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কেহ বলেন উহা আর কিছু নয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কেহ বলেন—জল বায়ু অগ্নি,—এই পর্য্যন্তই সার। ভাগ্যে কাণ্ট্ এবং তাঁহার পরে হেগেল্ জন্মিয়াছিলেন—তাই রক্ষা। লোকে বলে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, আমরা আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—আমরা দেখিতেছি যে, হেগেলে কপিলে কোলাকুলি! হেগেলের এবং কপিলের দোঁহার দুইটি মূল কথার মধ্যে পরমাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে—সত্ত্ব রজস্তমো যে, ব্যাপারটা কি, এখন তাহা আমাদের নিকট জলের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে—তাহা এই;—

হেগেল্ তাঁহার প্রসিদ্ধ দর্শন-পুস্তকের গুণ-শিরস্ক প্রথম অধ্যায়ে অতীব নিপুণরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সত্তা (Being) অসত্তা (nothing) এবং বুভূষা (হইবার চেষ্টা (Becoming) এই তিনটি গুণ

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি এক মুহূর্ত্তেই দেখিতে পা'ন যে, হেগেলের সত্তাগুণ এবং কপিলের সত্ত্ব-গুণ—হেগেলের অসত্তা-গুণ এবং এবং কপিলের তমোগুণ—হেগেলের বুভূষা গুণ এবং কপিলের রজোগুণ—একই ব্যাপার। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ বস্তুটা কি, তবে নিম্নে তাহা ভাঙিয়া বলিতেছি;—

বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ আছে; যেমন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গুণ, পশুর পশুত্ব গুণ, কীটের কীটত্ব গুণ, ইত্যাদি। কিন্তু পশুত্ব-গুণের ভিতর মনুষ্যত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে, কীটত্ব-গুণের ভিতর পশুত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে; প্রত্যেক বস্তুতেই একদিকে যেমন গুণ-বিশেষের সত্তা আছে, আর এক দিকে তেমনি গুণ-বিশেষের অভাব আছে; আবার যাহারই অভাব আছে, তাহারই অভাব-পূরণের একটা-না-একটা চেষ্টা আছে (উদ্ভিদের যেমন—মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আলোকে উত্থান করিবার চেষ্টা); এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্তা, সত্তার অভাব এবং অভাব-পূরণের চেষ্টা তিনই পরিমাণ-বিশেষে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্তাই সত্ত্ব-গুণ, সত্তার অভাবই তমোগুণ এবং অভাব-পূরণের চেষ্টাই রজোগুণ। দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ যেমন পরস্পর-সাপেক্ষ, সাংখ্য-মতে সত্ত্ব রজ স্তমো গুণ সেইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ। পুষ্করিণী কত হাত দীর্ঘ, ইহা মাপিয়া দেখিলেই কিছু আর পুষ্করিণী মাপা হয় না; তা ছাড়া—তাহা কত হাত চওড়া ও কত হাত গভীর তাহাও মাপিয়া দেখা আবশ্যক। তেমনি, কোন-একটি বস্তুকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইলে তাহাতে সত্তা (সত্ত্বগুণ) কতটুকু তাহা শুধু জানিলে চলিতে পারে না; তা ছাড়া—তাহাতে সত্তার অভাব (তমোগুণ) কতটুকু এবং সেই অভাব-পূরণের চেষ্টাই বা কতটুকু, তাহাও জানা চাই। যেমন;—মনুষ্যে সত্তার ভাগ—সত্ত্ব-গুণের অংশ—পশু-অপেক্ষা বেশী; কেননা, পশুতে মনুষ্যত্ব নাই; কিন্তু মনুষ্যে পশুত্বও আছে এবং তা ছাড়া পশুত্বের নিয়ামক মনুষ্যত্বও আছে; সুতরাং সত্তার ভাগ পশু অপেক্ষা মনুষ্যে দ্বিগুণ বেশী। মনুষ্যে, যেমন, পশু অপেক্ষা সত্তার ভাগ বেশী, তেমনি, দেবতা-অপেক্ষা সত্তার ভাগ কম; কেননা, পশুতে যেমন মনুষ্যত্বের অভাব রহিয়াছে, মনুষ্যে তেমনি দেবত্বের অভাব রহিয়াছে; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, পশুর তুলনায় মনুষ্য সত্ত্ব-গুণাত্মক, দেবতার তুলনায় তমোগুণাত্মক। আবার, মনুষ্যেতে দেবত্বের সেই যে অভাব, তাহার পূরণ-চেষ্টা বিষয়ী লোক অপেক্ষা সাধকমণ্ডলীতে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, দেবতার তুলনায় সাধক রজোগুণাক্রান্ত—বিষয়ী তমোগুণাক্রান্ত। মনুষ্যের সম্বন্ধে এ যেমন দেখা গেল, তেমনি—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্ব-রজো এবং তমোগুণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাংখ্যের মতানুযায়ী মূল প্রকৃতি এবং দৃশ্যমান জগৎ দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ বুঝিতে হইলে নিম্ন-লিখিত উপমাটির প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহা পরিষ্কার-রূপে বোধায়ত্ত হইতে পারিবে;—

মনে কর একটি জ্যোতির্বিন্দু হইতে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ ত্রিধা বিকীর্ণ হইয়া দেয়ালের গাত্রে নিপতিত হইয়াছে;—একটি পুচ্ছ পীত-প্রধান,

দ্বিতীয়টি লোহিত-প্রধান, তৃতীয়টি নীল-প্রধান। আবার, যে-টি পীত-প্রধান তাহার মুখ্য অংশ সুপীত, মধ্যম অংশ রক্তিম পীত, শেষাংশ নীলিম পীত; যেটি লোহিত-প্রধান, তাহার মুখ্য অংশ সুলোহিত, মধ্যম অংশ পীতিম লোহিত, শেষাংশ নীলিম লোহিত; যেটি নীল-প্রধান তাহার মুখ্য অংশ সুনীল, মধ্যম অংশ রক্তিম নীল, শেষাংশ পীতিম নীল। আবার সুপীতের মধ্যেও মুখ্য সুপীত, রক্তিম সুপীত, এবং নীলিম সুপীত রহিয়াছে; সুলোহিতের মধ্যেও মুখ্য সুলোহিত, পীতিম সুলোহিত, নীলিম সুলোহিত রহিয়াছে; সুনীলের মধ্যেও মুখ্য সুনীল, রক্তিম সুনীল, এবং পীতিম সুনীল, রহিয়াছে। অতএব সুনীলও ঐকান্তিক নীল নহে, সুপীতও ঐকান্তিক পীত নহে, সুলোহিতও ঐকান্তিক লোহিত নহে,—সমস্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। সংক্ষিপ্ত নাম-করণের অনুরোধে আমরা পীত-প্রধান পুচ্ছটিকে পীত বর্ণ বলি, সত্ত্ব-প্রধান গুণকে সত্ত্বগুণ বলি; নীল-প্রধান বর্ণকে নীল-বর্ণ ও তমঃপ্রধান গুণকে তমোগুণ বলি; লোহিত-প্রধান বর্ণকে লোহিত বর্ণ এবং রজঃপ্রধান গুণকে রজোগুণ বলি। জ্যোতির্বিন্দু হইতে যেমন তিন বর্ণের তিনটি কিরণ পুচ্ছ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র-ভাবে দেয়ালের গায়ে নিপতিত হইয়াছে; মূল প্রকৃতি হইতে তেমনি সত্ত্বরজস্তমো গুণ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ-ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র ভাবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ, যাহা দেয়ালে নিপতিত হইয়াছে, তাহা জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তর হইতেই তিন-রঙা হইয়া বাহির হইয়াছে; সুতরাং জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বর্ণত্রয় বর্ত্তমান রহিয়াছে—বলিতে হইবে; কিন্তু সেখানে কি ভাবে বর্ত্তমান—বিকীর্ণ ভাবে না সংকীর্ণ ভাবে? বিভিন্ন বর্ণত্রয় সেখানে অবশ্য অতীব সংকীর্ণ-ভাবে—সমাহিত ভাবে—অবস্থিতি করিতেছে; কাজেই সেখানে বর্ণ-ত্রয় মিলিয়া মিশিয়া শ্বেত বর্ণে একাকার। এইরূপ ন্যায়ে, দৃশ্যমান জগতে গুণত্রয় বিকীর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; মূল প্রকৃতিতে গুণত্রয় একাকারে সমাহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকার তাই বলেন যে, মূল-প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ একাকার ভাব। হেগেল্‌ও তাঁহার দর্শন-গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বুদ্ধির মূল-প্রদেশে সত্তা এবং অসত্তা একীভূত।

সাংখ্য যেমন বলেন যে, প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক, বেদান্ত তেমনি বলেন যে, মায়া সদসদাত্মক; সদসদাত্মক—অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্তা অসত্তা-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতএব সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয়েরই এক বাক্য এই যে, প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্তা—স্বতন্ত্র সত্তা নহে। বেদান্তের মতে পরমাত্মাই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ—তিনিই সৎ স্বরূপ। যেমন মনুষ্য এবং মনুষ্যত্ব, তেমনি সৎ এবং সত্ত্ব; একটি বস্তু—আর-একটি গুণ। অসত্তার প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে কোন গুণই প্রকাশ পাইতে পারে না;—অন্ধকারের প্রতিযোগেই আলোক অভিব্যক্ত হয়, পশুত্বের প্রতিযোগেই মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হয়, ইত্যাদি। এই জন্য, প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে—সত্ত্বগুণের মধ্যে—রজস্তমোগুণের প্রতিযোগিতা অন্ত-

স্ফূর্ত। সাংখ্য ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা ত্রিগুণাত্মক; বৈদান্তিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা সদসদাত্মক; আধুনিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্য।

কিন্তু জীবাত্মার অন্তরে সমগ্র সত্যের ভাব রহিয়াছে—পরিপূর্ণ সত্যের ভাব রহিয়াছে, এই জন্য কোন আপেক্ষিক সত্যেই তাহার সত্য-জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না; আধ পেটা খেয়ে কাহারো পেট ভরে না। জীবাত্মা তাই তৃষিত নয়নে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির যবনিকা ভেদ করিয়া পরমাত্মার মুখাবলোকন করিতে সচেষ্ট হয়; ইহারই জন্য জীবাত্মার তপজপাদি যত কিছু সাধন। অতঃপর সাধন কিরূপ এবং মুক্তিই বা কিরূপ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

সাধনের প্রথম সংকল্প চিত্ত-শুদ্ধি; এবং চরম সংকল্প ঈশ্বরের সহিত আনন্দ উপভোগ। প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাস্ত করাই সাধনের প্রথম সংকল্প। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতিকে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ যে কেবল পঞ্চভূতই প্রকৃতি, তাহা নহে; আমাদের অন্তরস্থিত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও প্রকৃতিরই অন্তঃপাতী।

সাংখ্য-দর্শনের মতে মূল-প্রকৃতি হইতে সর্ব্ব প্রথমে "মহৎ" উৎপন্ন হয়। মহৎ এই শব্দটি শুনিবা-মাত্রই অপরিচ্ছিন্ন অনিরুদ্ধ সর্ব্বগত সত্তার ভাব মনে উদিত হয়; কিন্তু প্রকৃতির অভ্যন্তরে সেরূপ সত্তা কোথায়? প্রকৃতির সকল সত্তাই তো পরিচ্ছিন্ন সত্তা। এমন কি সমস্ত জগতের মূলে যে এক সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সংখ্য-শাস্ত্রে যাহার নাম মূল-প্রকৃতি, বেদান্ত-মতে তাহাও সদসদাত্মিকা আপেক্ষিক সত্তা—এই জন্য তাহাও সৎশব্দের বাচ্য নহে। বেদান্ত-শাস্ত্রে প্রকৃতি রূপকচ্ছলে পরমাত্মার চতুর্থাংশের একাংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"একাংশেন স্থিতো জগৎ;" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মার অসীম শক্তির কণাংশ মাত্র জগৎ কার্য্যে ব্যয়িত হয়। অতএব প্রকৃতি হইতে "মহৎ" যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে অপরিচ্ছিন্ন সত্তা নহে—তবে কি? না তাহা অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সত্তা অর্থাৎ তাহা প্রকৃতি-জাত আর আর সত্তা অপেক্ষা অপরিচ্ছিন্ন; যেমন—মৃত্তিকা অপেক্ষা জলের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, জল অপেক্ষা বায়ুর সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি-জাত আর আর সকল বস্তু অপেক্ষা মহতের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, এই পর্য্যন্ত। মহৎ সত্ত্ব-গুণ প্রধান—অর্থাৎ তাহাতে সত্তার ভাগই অধিক; কিন্তু সে যে তাহার সত্ত্বগুণ—তাহাও রজস্তমোগুণের সহিত কতক না কতক অংশে জড়িত। এই মহত্তত্ত্বটির আর এক নাম বুদ্ধি। পাঠক হয় তো বলিবেন যে, এ আবার কিরূপ কথা! পাঠক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—সন্দেহ নাই; তিনি অবশ্য লাপ্লাসের আভ্রিক-সিদ্ধান্ত (Nebular theory) অবগত আছেন; তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, "প্রথমে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা—মোটা মুটি ধর যেন একটা ধূমাকার সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা যে, বুদ্ধি, এ কথার তো কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" তাঁহার এ বোধ নাই যে, তিনি তাঁহার আপনার প্রশ্নের আপনিই উত্তর দিয়া বসিয়া আছেন! তিনি বলিয়াছেন "প্রথমেই অপরিচ্ছিন্ন সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায়" তবেই হইল যে, অপরিচ্ছিন্ন

সত্তা বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, এখন দেখিতে হইবে যে, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা শুদ্ধ কেবল বুদ্ধিতেই প্রকাশ পায়—তা' ভিন্ন—পরিচ্ছিন্ন সত্তার ন্যায় তাহা ইন্দ্রিয়-সন্নিধানে প্রকাশ পায় না। বর্ণ-গুণ বলিবা-মাত্রই বুঝায়—দৃষ্টিগোচর বর্ণ; সত্ত্বগুণ (বা সত্তা গুণ) বলিবা-মাত্রই বুঝায়—বুদ্ধি-গোচর সত্তা। বর্ণ দৃশ্য-বস্তুর দৃষ্টি-গ্রাহ্য গুণ, সত্তা বস্তু-মাত্রেরই বুদ্ধি-গ্রাহ্য গুণ। অদৃশ্য বর্ণের যেমন কোন অর্থ হয় না, অবোধ্য সত্তারও তেমনি কোন অর্থ হয় না। অতএব সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহৎ—যাহা ঈশ্বরের তুলনায় পরিচ্ছিন্ন কিন্তু প্রকৃতি-জাত সমস্ত বস্তুর তুলনায় অপরিচ্ছিন্ন—সেই অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা—বুদ্ধিরই অন্তর্ভূত। সকল প্রাকৃত বস্তুই বুদ্ধি-দ্বারা ব্যাপ্য কিন্তু বুদ্ধি আর কোন প্রাকৃত বস্তু-দ্বারা ব্যাপ্য নহে; সুতরাং আর আর সমস্ত প্রাকৃত সত্তা অপেক্ষা বুদ্ধির সত্তা অপরিচ্ছিন্ন; এই জন্যই বুদ্ধি মহৎ শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু ছায়া বা বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে আলোক অভিব্যক্ত হইতে পারে না; তেমনি অসত্তার (তমোগুণের) প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে সত্তা (সত্ত্বগুণ) অভিব্যক্ত হইতে পারে না। অতএব, সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহতের অভিব্যক্তির জন্য তমোগুণ-প্রধান একটা কিছু আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক;—সাংখ্য-দর্শনের মতে সত্ত্বগুণ-প্রধান মহৎ (কি না বুদ্ধি) হইতে তমঃপ্রধান অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। চলিত ভাষাতেও—তমো বলিতে অহঙ্কার বুঝায়। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে সত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে তমো নাই বলিলেই হয়, আর, অহঙ্কারে অসত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে সত্ত্ব নাই বলিলেই হয়। অভাব না থাকার নামই আনন্দ; এই জন্য সকল শাস্ত্রেই সত্ত্ব-গুণ আনন্দাত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের মতে—জগতের মূলস্থিত সেই যে, আনন্দাত্মক সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহৎ, তাহা ঈশ্বরেরই প্রভাব—ঐশীশক্তি বা মায়া; আর, বিষাদাত্মক তমোগুণ-প্রধান সেই যে অহঙ্কার, তাহা জীবের মর্ম্ম-গত অভাব—অবিদ্যা। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্ত মতে মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, সাংখ্য মতে মহৎ এবং অহংকারের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ; যথা; সাংখ্য মতে—প্রকৃতির মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা তাহাই মহৎ কি না বুদ্ধি; আর, যাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন তাহাই অহংকার; বেদান্ত মতে—মায়া সমষ্টি-উপাধি, অবিদ্যা ব্যষ্টি উপাধি—অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন। বুদ্ধিতে তমোগুণ সত্ত্বগুণের উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে—অহঙ্কারে সত্ত্বগুণ তমোগুণের উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ অহঙ্কারে তমোগুণেরই (অভাবেরই) সবিশেষ প্রাবল্য। অভাবের প্রাবল্য হইতে অভাব পূরণের চেষ্টা উৎপন্ন হয়,—সাংখ্যদর্শন তাই বলেন যে, তমঃপ্রধান অহংকার হইতে রজঃপ্রধান মন উৎপন্ন হয়; মন আর কিছু নয়—অভাব পূরণের জন্য আঁকবাঁকু—অধীর কামনা—সংকল্প বিকল্প—ছটফটানি। অহঙ্কার বুদ্ধির আলোক হইতে অবসৃত হইয়া আপনিটি এবং আপনারটি লইয়া, বিষাক্ত ফণীর ন্যায় গর্ত্তে ঢুকিয়া, অন্ধকারে জড়সড় হইয়া, চুপ করিয়া অবস্থিতি করে; আর, যখনই আলোকে বাহির হয়, তখনই সকলকে শত্রু জ্ঞান করে, ও অল্প কিছুতেই ফণা ধরিয়া উঠিয়া ফোঁস্ ফাঁস্ আরম্ভ করে। মন নীড়-স্থিত পক্ষি শাবক—

আলোকে উড্ডয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে—কিন্তু বারবার ভূতলে আছাড় খায়। আর অধিক চরিত্র বর্ণনা আবশ্যক করে না—ফল কথা এই যে, অভাব হইতে অভাবের পূরণ চেষ্টা উৎপন্ন হয়—অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হয়; সর্প হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয়। মন অভাব-পূরণের জন্য অধীর; আর, তাহার প্রণালী পদ্ধতি এইরূপ; যথা;—পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের—একের যাহা আছে—অন্যের তাহা নাই; আবার, একের যাহা নাই অন্যের তাহা আছে;—সকলে যদি সদ্ভাবে সম্মিলিত হয়, তবে পরস্পরের সাহায্যে সকলেরই অভাব পূরিত হইতে পারে; অতএব অভাব পূরণের পদ্ধতি দুইরূপ (১) পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের মধ্যে যোগ-বন্ধন—ইহাতে করিয়া সমষ্টির প্রভাব-দ্বারা ব্যষ্টির অভাব-পূরণ হয়; এবং (২) মূল সত্তার প্রভাব স্ফুরণ—ইহাতে করিয়া সমষ্টির অভাব-পূরণ হয়। নীচে যোগ-বন্ধন হয় এবং উপর হইতে প্রভাব-স্ফুরণ হয়—দুইই এক সঙ্গে হয়—ইহাতেই ক্রমে ক্রমে অভাবের পূরণ হয়। অহঙ্কার আত্ম-পরের মধ্যস্থলে প্রাচীর সংস্থাপন করিয়া অভাবে আক্রান্ত হয়; মন আত্ম-পরের মধ্যে যোগাযোগ সংঘটন করিয়া অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন প্রকৃতি হইতে উত্তরোত্তর-ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহারা প্রাকৃত পদার্থ। বেদান্ত দর্শনের মতেও, শরীর, প্রাণ, মন,বুদ্ধি, আনন্দ, সমস্তই প্রাকৃত ব্যাপার; ঐ পাঁচটি ক্রমান্বয়ে বেদান্তের অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ; ও-গুলি আত্মার উত্তরোত্তর উপাধি মাত্র—তা ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই নহে। এ বিষয়ে কাণ্ট্ কি বলেন—দেখা যা'ক্।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঈ-ধ্বনি যখন আমাদের কর্ণ-গোচর হয়, তখন সর্ব্ব প্রথমে হ্রস্বতম মুহূর্ত্তে হ্রস্বতম ই-ধ্বনি উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই হ্রস্বতম ই-ধ্বনিটি জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় অনির্বচনীয়; তাহা আছে এবং নাই এই দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই জন্য তাহা সদসদাত্মক; তাহাকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না—এই জন্য তাহা জ্ঞান-বিরোধী; তাহাতে ঈ-ধ্বনির সত্তা, অসত্তা, এবং চেষ্টা তিনই বীজ-ভাবে অন্তর্ভূত রহিয়াছে এই জন্য তাহা ত্রিগুণাত্মক। এইরূপ বীজভূত হ্রস্বতম ই-ধ্বনি পরম্পরার অভ্যন্তরে জ্ঞান আপনার ঐক্য সূত্র সঞ্চালন করিয়া বিশেষ একটি বিষয়—ঈ-ধ্বনি—গড়িয়া তুলে;—অবিদ্যাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তুলে। কিন্তু সেই যে অবিদ্যা-নির্বিশেষ হ্রস্বতম ই ধ্বনি, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে বিন্দু বিন্দু করিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে কাহার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়? আমাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব নহে,—বহির্বস্তুরই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। কিসে তবে আমাদের বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়? না অভ্যাগত অবিদ্যাকে যখন আমরা বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তুলি—হ্রস্বতম ই-ধ্বনি-গুলির মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করিয়া ঈ-ধ্বনি গড়িয়া তুলি—তখন সেইরূপ ঐক্য বন্ধন-কার্য্যেই আমাদের বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, বহির্বস্তুর কর্ত্তৃত্বে অবিদ্যা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বে তাহা বিদ্যারূপে পরিগঠিত হয়। বেদান্ত-মতে, ঐ যে বহির্বস্তুর কর্ত্তৃত্ব উহা

ঐশী-শক্তিরই প্রভাব—উহাই মায়া। অগ্রে ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অবিদ্যা উপস্থিত হইলে, তবেই বুদ্ধি তাহাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তোলে; অবিদ্যার উপস্থিত হওয়া-টি ঐশ্বরিক কার্য্য—তাহাতে বুদ্ধির আদবেই কোন হস্ত নাই; অবিদ্যা উপস্থিত হইলে পর—তখন বুদ্ধি তাহাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তোলে—এইখানটিতেই বুদ্ধির যাহা কিছু হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুদ্ধির যত কিছু কার্য্য সমস্তই ঐশ্বরিক কার্য্যেরই প্রতিক্রিয়া–তাহা মূল-ক্রিয়া নহে। বুদ্ধির ক্রিয়া যেহেতু মূল-ক্রিয়া নহে—শুদ্ধ কেবল প্রতিক্রিয়া মাত্র; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধির ক্রিয়া প্রকৃতির ক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি—সুতরাং তাহা প্রকৃতিরই অন্তঃপাতী। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়াই কাণ্ট—তাঁহার প্রথম গ্রন্থে—আত্মতত্ত্বকে যে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহার স্থান অন্বেষণ করিয়া পা'ন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি শুদ্ধ কেবল ধর্ম্মতত্ত্বের উপরে আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বুদ্ধি-তত্ত্বের উপরে কাণ্ট্ আত্মতত্ত্বকে দাঁড় করাইতে পিছ্‌পাও হইলেন কেন? তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, আত্মা প্রকৃতির বিরোধী পক্ষ—বুদ্ধি প্রকৃতির দলের লোক; কাজেই বুদ্ধির সাহায্যে আত্মা স্বরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ধর্ম্ম কিন্তু প্রকৃতির বিরোধী পক্ষ—এই জন্য ধর্ম্মের সাহায্যেই আত্মা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অতএব, আত্মা যে—অপ্রাকৃত বস্তু, এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রসমূহের সহিত কাণ্টের—ভিতরে ভিতরে পরমাশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে।

আত্মা অপ্রাকৃত বস্তু—ত্রিগুণাতীত সদ্বস্তু; এক কথায়—পুরুষ; এবং জগতের আর সমস্তই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি। আত্মা পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া—সুখ দুঃখে অবিচলিত হইয়া—সাক্ষীরূপে স্বপদে অবস্থিতি করিয়া—প্রকৃতির নাট্য লীলা দর্শন করিতে অধিকারী। আত্মা কূলে দাঁড়াইয়া দেখেন যে, প্রকৃতির যত কিছু ব্যাপার সমস্তই শুদ্ধ কেবল—ঈশ্বরের প্রভাব স্ফুরণ এবং জগতের অভাব পূরণ। প্রথমে ঈশ্বর-প্রভাব আকর্ষণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণতঃ সকল বস্তুর প্রভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে—এইটি প্রথম অভাব পূরণ;

তাহার পরে—প্রাণরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাখা পত্রাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঐক্য সূত্র সঞ্চালন করে—ইহাতে স্বগত ভেদের মধ্যে প্রভেদ সংস্থাপিত হয়;—কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ তাহা স্বগত ভেদ। ইহাই দ্বিতীয় অভাব-পূরণ;

তাহার পরে—মনোরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বজাতীয় ভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে; কেননা, মাতা শাবকের মধ্যে, দম্পতির মধ্যে, যূথের মধ্যে, যেরূপ প্রভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ; প্রাণ যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্বগত ভেদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করে, মন সেইরূপ স্ত্রীপুত্রাদি স্বজাতীয় ভেদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করে;—ইহাই তৃতীয় অভাব পূরণ।

তাহার পরে ঈশ্বরের প্রভাব বুদ্ধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিজাতীয় ভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে;—বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের যেরূপ বিজাতীয় ভেদ, সেই বিজাতীয় ভেদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন করে; বুদ্ধির নিকটে "বসুধৈব কুটুম্বকং!" ইহাই চতুর্থ অভাব-পূরণ।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির

সমস্ত ব্যাপারই—(১) অভাব—তমোগুণ, (২) অভাব-পূরণের জন্য আঁকুবাঁকু—রজোগুণ, (৩) অভাব পূরণ—সত্ত্বগুণ; আবার (১) উচ্চতর অভাব (২) তাহার পূরণ চেষ্টা এবং (৩) তাহার পূরণ; আবার ততোধিক উচ্চতর অভাব—ইত্যাদি। এইরূপ করিয়া প্রকৃতির ত্রিগুণ-চক্র নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্ভূত সুতরাং তাহাও গুণচক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে; জাগ্রৎকালে অভিব্যক্ত হইতেছে—নিদ্রাকালে বিলীন হইতেছে। কেবল, বুদ্ধির সাক্ষী-স্বরূপ যে, আত্মা, সেই আত্মাই কেবল গুণচক্রের বাহিরের বস্তু; আত্মা গুণ-চক্রে ঘূর্ণিত হয় না—পরন্তু স্থির ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া ত্রিগুণের নাট্যলীলা নিরীক্ষণ করে। আত্মা ত্রিগুণের অতীত অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই শাস্ত্রে তাহা নির্গুণ শব্দে অভিহিত হয়। শাস্ত্র-অনুসারে, বুদ্ধি হ'চ্চে সত্ত্ব-গুণ—আত্মা হ'চ্চে সদ্‌বস্তু। আত্মা এবং বুদ্ধির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর প্রভেদ। সত্ত্বগুণ অবশ্য অসত্ত্ব-গুণ দ্বারা (তমোগুণ দ্বারা) কোন-না-কোন অংশে পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সদ্‌বস্তু সত্ত্বাসত্ত্ব উভয়েরই মূলস্থিত—সুতরাং অসত্তা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সমস্ত প্রকৃতিই ত্রিগুণাত্মক—আত্মা ত্রিগুণাতীত অথবা যাহা একই কথা—নির্গুণ। সমস্ত প্রকৃতিই সদসদাত্মক গুণচক্র—আত্মা সদ্‌বস্তু। ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত বস্তু হইতে ত্রিগুণাতীত সদ্বস্তুকে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে আত্মা বস্তুর পরিবর্ত্তে পুরুষ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ত্রিগুণাতীত সদ্‌বস্তুই (আত্মাই) পুরুষ শব্দের বাচ্য।

এই স্থানটিতে কাণ্টের সহিত বেদান্তের অনৈক্য-একটি দেখা দিতেছে। কাণ্ট্ যেখানে আত্মাকে নির্গুণ বলিয়াছেন, সেখানে তাহার সঙ্গে এই একটি টিপ্পনী জুড়িয়া দিয়াছেন যে, নির্গুণ কিনা X—অর্থাৎ নিতান্তই অনির্দ্দেশ্য, কি যে তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহা বলিতে পারা যায় না—সত্য, কিন্তু বেদান্ত বলেন যে, তাহা ভিতরে ভিতরে জানিতে পারা যায়। হাত দ্বারা কেমন করিয়া হস্ত-চালনা করিতে হয়—তাহা সকলেই জানে, অথচ কেহই তাহা অন্যকে বলিয়া বুঝাইতে পারে না। অনেক বিষয় এরূপ আছে, যাহা শুদ্ধ কেবল আপনি মনে মনে বুঝিবারই কথা—অন্যকে বুঝাইবার কথা নহে। বেদান্ত নির্গুণ আত্মাকে X না বলিয়া উল্টা আরো বলেন—স্বপ্রকাশ। আত্মা বুদ্ধি-দ্বারা প্রকাশিত নহে কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানে আপনাতে আপনি প্রকাশিত। এই ভাবটি আপনার মনের অভ্যন্তরে অতীব সহজে বুঝিতে পারা যায় কিন্তু অন্যকে বলিয়া বুঝানো বড়ই সুকঠিন; কাজেই নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তটির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল;—

ভূতল-শায়ী সূর্য্য-রশ্মি ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—কিন্তু সূর্য্যের নিজের গাত্রে লেশমাত্রও ছায়া স্থান পাইতে পারে না। ভূতল-শায়ী সূর্য্য-রশ্মি যেমন আলোক ছায়া এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যে জড়িত—বুদ্ধির প্রকাশ সেইরূপ সত্ত্ব তমো এবং রজোগুণে জড়িত। কিন্তু সূর্য্যের নিজ-গাত্রে যেমন ছায়া, বর্ণ বৈচিত্র্য বা ছায়াবচ্ছিন্ন আলোক স্থান পাইতে পারে না, তেমনি আত্মার আত্ম-প্রকাশে তমোগুণ বা রজোগুণ বা সত্ত্বগুণ স্থান পাইতে পারে না। যে আলোক সূর্য্যের গাত্রে তন্ময়ীভূত তাহা সূর্য্যকে ছাড়িয়া বাহিরে বিনির্গত হয় না—এই জন্য তাহা রশ্মি-শব্দের

বাচ্য হইতে পারে না। তবে কি? না যে আলোক সূর্য্য হইতে বিনির্গত হইয়া ছায়া এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যের যোগে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, তাহাই রশ্মি শব্দের বাচ্য। তেমনি, বুদ্ধি-প্রকাশিত পরিচ্ছিন্ন সত্তাই সত্ত্বগুণ-শব্দের বাচ্য; ভূতলশায়ী সূর্য্যালোক যেমন ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সত্ত্বগুণও তেমনি তমোগুণ-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু আত্মার স্বপ্রকাশ সত্তা যেহেতু তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে এই জন্য তাহা সত্ত্বগুণ শব্দের বাচ্য নহে। সূর্য্যের গাত্রে যে আলোক তন্ময়ী-ভূত তাহা রশ্মি-শব্দের বাচ্য নহে—তাহা স্বয়ংই সূর্য্য; তাহা হইতে যে আলোক বাহিরে বিনির্গত হয়—তাহাই রশ্মি; তেমনি, আত্মাতে যে স্বপ্রকাশ জ্যোতি তন্ময়ীভূত আছে, তাহা সত্ত্বগুণ নহে—তাহা স্বয়ংই আত্মা; কেবল, যে জ্ঞান-জ্যোতি আত্মা হইতে বুদ্ধিতে বিনির্গত হয় তাহাই সত্ত্বগুণ—তাহাই রজস্তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; যেমন—ভূতলশায়ী সূর্য্য-রশ্মি বর্ণ বৈচিত্র্য এবং ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সূর্য্যের নিজের গাত্রে তাহার রশ্মিপাত হয় না বলিয়া সূর্য্যকে কি আলোক-শূন্য তমঃপদার্থ বলিতে হইবে? আত্মা বহির্মুখী বুদ্ধির গম্য নহে বলিয়াই কি আত্মাকে জ্ঞান-শূন্য অ-চেতন বলিতে হইবে? কখনই না। রশ্মিই যদি জ্যোতিষ্মান হইল, তবে রশ্মির আকর যে, সূর্য্য, তাহা নিজে কত না জ্যোতিষ্মান্! রশ্মির আকর সূর্য্য যেমন জ্যোতির্ম্ময় প-দার্থ—বুদ্ধির আকর আত্মা তেমনি জ্ঞান-ময় পদার্থ; সূর্য্যও অদৃশ্য নহে—আত্মাও অজ্ঞেয় নহে। সূর্য্য আপনার গাত্রে রশ্মি-প্রয়োগ না করিয়াও জ্যোতিষ্মান্—আত্মা আপনার প্রতি বুদ্ধি-প্রয়োগ না করিয়াও স্বপ্রকাশ; তবে আর এ কথা কোথায় রহিল যে নির্গুণ আত্মা= X! আমাদের দেশের কোন শাস্ত্রই এরূপ কথা বলে না। সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশমান—আত্মা স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ; কোন শাস্ত্রই বলে না যে, আত্মা অপ্রকাশ তমঃ-স্বরূপ।

আত্মা কি অর্থে নির্গুণ এখন তাহা জলের ন্যায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। পৃথিবীতে সূর্য্যের রশ্মি-পতনই দিবা—রশ্মি-অপহরণই রাত্রি এবং উভয়ের সন্ধি-স্থলই সন্ধ্যা। সূর্য্যের নিজের গাত্রে রশ্মি-পতনও হয় না, রশ্মি-অপহরণও হয় না; অতএব সূর্য্য দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা তিনের মূলাধার হইয়াও নিজে দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত। সেই রূপ প্রকৃতিতে আত্মার জ্যোতিঃপতন সত্ত্বগুণ, জ্যোতিঃসংহার তমোগুণ, এবং উভয়ের সন্ধি-স্থল রজো-গুণ; সুতরাং জ্ঞানময় আত্মা সত্ত্বরজস্তমো গুণের মূলাধার হইয়াও নিজে সত্ত্বরজস্তমো গুণ-বিবর্জ্জিত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে নির্গুণ আত্মা বলিতে ত্রিগুণাতীত স্বপ্রকাশ সদ্বস্তু বুঝায়—অপ্রাকৃত পুরুষ বুঝায়, তা ভিন্ন—অনি-র্দ্দেশ্য X বুঝায় না।

সাধনের চরম সংকল্প পরমাত্মাকে আ-ত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত বিমল আনন্দ উপভোগ করা; কিন্তু তা-হার জন্য চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্বপ্রথমেই আব-শ্যক। চিত্ত-শুদ্ধি আর কিছু নয়—প্রকৃ-তির আকর্ষণ হইতে—বিষয়ের মায়াজাল হইতে—অবিদ্যা হইতে—আত্মাকে নি-র্মুক্ত করা। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, আত্মা যদি বিষয়াকর্ষণ হইতে—অবিদ্যার

হস্ত হইতে—একেবারেই পরিত্রাণ পায়, তবে তাহার কোন প্রকার অভাব থাকে না;—আত্মা শরীরাদির সহিত অকাট্য শৃঙ্খলে নিবদ্ধ বলিয়াই তাহার যত কিছু অভাব—শরীরাদি হইতে নির্লিপ্ত হইলে তাহার কোন অভাবই থাকে না; অভাব যদি না থাকিল, তবে কার্য্য কিরূপে থাকিবে? কেন না, অভাব-পূরণের জন্যই কার্য্যের যাহা কিছু প্রয়োজন। অভাবই যদি নাই—তবে কার্য্য কিসের জন্য? ইহার উত্তর এই যে, অবিদ্যা-মুক্ত আত্মা অভাবের উত্তেজনায় কার্য্য করে না—প্রভাবের উচ্ছ্বাসেই কার্য্য করে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সদসদাত্মক প্রকৃতি অভাব-পূরণের জন্য কার্য্য করে—অভাবের উত্তেজনাতেই কার্য্য করে; কিন্তু অবিদ্যা-মুক্ত বিশুদ্ধ আত্মার কোন অভাব নাই—তাহার কার্য্য তবে কিরূপ? ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতি সদসদাত্মক; প্রকৃতির সত্তা আপেক্ষিক সত্তা; কোন প্রাকৃত সত্তাই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—কাজেই কোন প্রাকৃত বস্তুই ভিন্ন বস্তু-দ্বারা চালিত না হইয়া কার্য্য করিতে পারে না,—সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতিরেকে পৃথিবী ঘুরিতে পারে না। প্রকৃতি সদসদাত্মক আপেক্ষিক সত্য বলিয়াই তাহার কার্য্যের দশা এইরূপ। প্রকৃতি নিজে যেমন সদাসদাত্মক; তাহাকে যেমন সৎও বলিতে পারা যায় না—অসৎও বলিতে পারা যায় না; প্রকৃতির কার্য্যও তেমনি সদাসদাত্মক অর্থাৎ সৎও নহে অসৎও নহে। তেমনি আবার, অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত আত্মা নিজে যেমন সদ্বস্তু—তাঁহার কার্য্যও তেমনি সৎকার্য্য। আত্মার স্বধর্ম্মোচিত কার্য্যে আত্মার সদ্ভাবই ব্যক্ত হয়—প্রভাবই ব্যক্ত হয়—অভাব ব্যক্ত হয় না। "আমার কোন অভাব নাই—আমি স্থির আছি" এইভাবে আত্মা আপনার অটল কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া কার্য্য করে—আপনার কার্য্যে আপনার প্রভাব সমর্থন করে। প্রকৃতির কার্য্য আর একরূপ;—"অন্যে আমাকে চালাইতেছে—আমি আপনি কিছুই নহি" এইভাবে প্রকৃতি আপনার কর্ত্তৃত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কার্য্য করে—আপনার কার্য্যে আপনার অভাব ব্যক্ত করে। অতএব এরূপ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক যে, আত্মা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেই তাহা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিবে। তাহা দূরে থাকুক্—বিবেচনা করিয়া দেখিলে উল্টা আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-আত্মার নিজের কোন অভাব নাই—নিদ্রা নাই তন্দ্রা নাই জরা নাই ব্যাধি নাই পাপ নাই তাপ নাই, সে আত্মার—জগতের অভাব-মোচনের জন্য শত গুণ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবারই কথা। এই টুকুই কেবল বলা যাইতে পারে যে, সে আত্মা অভাবের উত্তেজনায় কোন কার্য্য করিতে পারে না—অবিদ্যা-দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না; তা ভিন্ন—এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, সে আত্মার আদবেই কোন কার্য্য নাই। অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা যদি জগতের অভাব মোচনের জন্য আপনার প্রভাব ব্যক্ত না করিবেন—তবে কে তাহা করিবে? সূর্য্য যদি জগতের অন্ধকার অপহরণ করিবার জন্য কর-প্রসারণ না করিবেন তবে কে তাহা করিবে? অতএব আপনার অভাব ব্যক্ত করা যেমন প্রকৃতির স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য, আপনার প্রভাব ব্যক্ত করা সেইরূপ আত্মার স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য। প্রকৃ-

তির কার্য্যেতেই প্রকাশ পায় যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক আপেক্ষিক সত্য; এবং আত্মার কার্য্যেতেই প্রকাশ পায় যে, আত্মা ত্রিগুণের উপরের বস্তু, অপ্রাকৃত সদ্‌বস্তু; এক কথায়—পুরুষ। কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ একটি মন্তব্য কথা আছে;—বলিলাম বটে যে, অবিদ্যামুক্ত আত্মার কোন অভাব নাই কিন্তু—কিসের অভাব নাই? সদসদাত্মক—ত্রিগুণাত্মক—প্রাকৃত কোন কিছুর অভাব নাই। প্রাকৃত অভাব নাই বটে কিন্তু পারমার্থিক অভাব রহিয়াছে; ত্রিগুণাত্মক ভৌতিক অভাব নাই বটে কিন্তু গুণাতীত আধ্যাত্মিক অভাব রহিয়াছে—জ্ঞান-প্রেমের অভাব রহিয়াছে; যে অভাব দ্বারা সমস্ত প্রকৃতি চালিত হইতেছে—সে অভাব নাই; কিন্তু সে অভাব কোন প্রাকৃত বস্তুরই নাই—সে অভাব কেবল আত্মাতেই দেখিতে পাওয়া যায়—কি? না ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং ভগবৎ-প্রেমপিপাসা। যদি বল যে, ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত অভাব হইতে আধ্যাত্মিক অভাব—গুণেই না-হয় বড় কিন্তু জাতিতে তো অভিন্ন; তবে তাহার উত্তর এই যে,—না তাহা নহে—জাতিতেও তাহা বিভিন্ন। প্রাকৃত অভাব—থাকে এক স্থানে—এবং তাহার পূরণ হয় আর এক স্থান হইতে; ক্ষুধা উদরে, ধান্য—ক্ষেত্রে বা গোলায়। কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অভ্যন্তরেই ব্রহ্মজ্ঞান জাগিতেছে—ভগবৎ-প্রেমপিপাসার অভ্যন্তরেই ভগবৎ প্রেমানন্দ জাগিতেছে;—এখানে অভাব এবং প্রভাবের মধ্যে দেশকালের একটুও ব্যবধান নাই। পরমাত্মা যখন আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন—তখন সাধকের প্রেম-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহা পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছে; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধনাদি শত্রু-সকল মরিবার পূর্ব্বেই মরিয়া বসিয়া আছে। আধ্যাত্মিক অভাবের বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা তাহার আপনার বাঞ্ছিত ধনের আপনিই ভাণ্ডার; আত্মা নিজেই পরমাত্মা-রূপ পরম ধনের ভাণ্ডার। এই কারণবশতঃ আধ্যাত্মিক অভাব অভাব-নামেরই অযোগ্য। আধ্যাত্মিক অভাব নহে—শুদ্ধ কেবল প্রাকৃত অভাবই তমোগুণ শব্দের বাচ্য। পারমার্থিক সম্বন্ধ প্রাকৃত সম্বন্ধের ঠিক্ উল্টা দিকে অবস্থিতি করে; মুক্ত আত্মা যখন প্রকৃতিকে বলে যে, তোমাকে আমার কোন আবশ্যক নাই তখন তাহার অর্থই এই যে, তোমার পর্দ্দার আড়ালে পরম পুরুষ যিনি বিরাজমান তাঁহাকেই আমার প্রয়োজন। প্রকৃতি হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবার অর্থই হ'চ্চে—অন্তরতম পরমাত্মার প্রতি মুখ ফিরানো। বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা আত্মাকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিলে—আত্মাকে অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত করিলে—আত্মা এমনি ভাস্বর হইয়া উঠে যে, তাহা হইতে জ্যোতিষ্কণা বিনিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে—তাহাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা; আত্মা এমনি রসার্দ্র হয় যে, তাহা হইতে অমৃত ধারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—তাহাই ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎ প্রীতি। সে জ্যোতিকেও প্রকৃতি আঁটিয়া উঠিতে পারে না—সে উচ্ছ্বাসকেও প্রকৃতি আঁটিয়া উঠিতে পারে না—পরমাত্মা স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলে তবেই মুক্ত আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। মুক্ত জীবের সহিতই বা পরমাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, আর, বদ্ধ জীবের সহিতই বা তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ, এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বদ্ধ জীবের সহিত পর-

মাত্মার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ; মুক্ত জীবের সহিত প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ। অথবা যাহা আরো ঠিক্—মনুষ্য যে অংশে বদ্ধ জীব অর্থাৎ শরীরী জীব, সেই অংশে পরমাত্মার সহিত তাহার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ; আর, মনুষ্য যে অংশে মুক্ত জীব অর্থাৎ অশরীরী আত্মা, সেই অংশে পরমাত্মার সহিত তাহার প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ। পরমাত্মার আশ্রয়-নিকেতনে আমাদের ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত জন্ম হয়, এবং তাঁহার প্রেম-নিকেতনে আমাদের ত্রিগুণাতীত আধ্যাত্মিক জন্ম হয়। এই আধ্যাত্মিক জন্মেরই নাম মুক্তি।

প্রকৃতির দিক্ দিয়া পরমাত্মা আমাদের সাংসারিক নানা প্রকার অভাব পূরণ করিতেছেন, এবং মুক্তির দিক্ দিয়া তিনি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। কেননা বন্ধন-ক্ষেত্রে প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না—মুক্তি-ক্ষেত্রেই (স্বাধীনতা ক্ষেত্রেই) প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইতে পারে। এক জন ক্রীতদাসকে বন্ধন করিয়া তাহার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক প্রীতি আদায় করিতে যাও দেখি—কখনই তাহা পারিবে না; কিন্তু তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান কর তাহা হইলে সে তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিবে। এমন কি, স্বাধীন-শব্দের অর্থই হ'চ্চে প্রেমের বাধ্য; পরাধীন শব্দের অর্থই হ'চ্চে বলের বাধ্য। অতএব মুক্তি-ক্ষেত্রই প্রেমের উর্ব্বরা ভূমি। জীবাত্মা অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমাত্মাকে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবে—এইটিই জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। শাস্ত্রের যাঁহারা খোসা চর্ব্বন করেন তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ একটি ভ্রম জন্মে যে, জীবাত্মা মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি জড়সড়ো হইয়া অজ্ঞানান্ধকারের অতলস্পর্শ গর্ত্তের অভ্যন্তরে নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে এটি মুক্তির লক্ষণ নহে—প্রত্যুত ঘোরতর তমোগুণের লক্ষণ। মৃগের প্রতি ব্যাঘ্রের দৃষ্টি একরূপ, শিশুর প্রতি মাতার দৃষ্টি আর-একরূপ; ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে মৃগের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, মাতার দৃষ্টিতে শিশুর বুদ্ধির কলিকা বিকসিত হইয়া উঠে। পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় প্রেম-দৃষ্টিতে জীবাত্মার হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত হয়—জীবাত্মার অন্তরতম ভাব সকল বিকসিত হইয়া উঠে—সুবিমল আনন্দের অভ্যুদয়ে জীবাত্মার সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়; ইহারই নাম মুক্তি। যে মুক্তি হইতে ঈশ্বরাভিমুখে প্রীতি উৎসারিত হইয়া সমস্ত জগৎকে অমৃত ধারায় প্লাবিত করে, যে মুক্তিতে নিত্য নিত্য ঈশ্বরের নব নব কল্যাণ, নব নব করুণা, নব নব আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে থাকে, এবং ঈশ্বরের নব নব শোভা এবং সৌন্দর্য্যের কপাট উন্মোচিত হইতে থাকে; যে মুক্তিতে ঈশ্বর-প্রীতি কখনই পুরাতন হয় না—কিন্তু নব নব রাগে রঞ্জিত হইয়া, নব নব রসে পরিপূরিত হইয়া, নব নব আনন্দে উৎসারিত হইয়া মুক্ত জীবকে মঙ্গল হইতে মঙ্গলতর—অন্তর হইতে অন্তরতর—ধামের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে, সেই মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

সাধকের সাধন কেবল মুক্তি-পথের বিঘ্ন অপসারণ করিবারই জন্য; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপই মুক্তির প্রদাতা। কি প্রকারে পরমাত্মা জীবাত্মাকে মুক্তি প্রদান করেন—ইহা শুদ্ধ কেবল অন্তরে অনুভব করিবারই কথা,

মুখে বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে; ইঙ্গিত-চ্ছলে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বীর নেপোলিয়ন যখন ভীরুকে বীর করিয়া তুলিতে পারেন, ভক্ত চৈতন্য যখন ডাকাতকে ভক্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তখন মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মা যে, বদ্ধ জীবকে মুক্ত করিয়া তুলিবেন;—ইহা কিছুই আ-শ্চর্য্য নহে। অগ্নিই অঙ্গারকে অগ্নি করিয়া দেয়, কাচ-পোকাই আর্সুলাকে কাচ-পোকা করিয়া দেয়, আনন্দেই আনন্দ উদ্দীপন করিয়া দেয়; মুক্ত-স্বরূপই আ-ত্মাকে মুক্ত করিয়া দেন।

প্রকৃত কথা এই যে, গৃহকে সুসজ্জিত এবং সুপারিষ্কৃত করা অতীব কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা করিলেও গৃহ উজ্জ্বল হয় না—প্রিয়-তমের আগমনেই গৃহ উজ্জ্বল হয়; আ-ত্মাকে অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত করা অতীব কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা করিলেও আত্মা মুক্ত হয় না—পরম প্রেমাস্পদের আগমনেই আত্মা মুক্ত হয়—রোগ-মুক্ত শোক-মুক্ত ব্যাধি-মুক্ত জরা-মুক্ত পাপ-মুক্ত তাপ-মুক্ত। ইহারই নাম মুক্তি।

মুক্ত জীব ঈশ্বরের সহিত উত্তরোত্তর নব নব আনন্দ উপভোগ করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে উন্নতিতে পদার্পন করে। বেদান্ত-শাস্ত্রের মতানুসারে মুক্ত জীব যে, ঈশ্বর হইয়া যা'ন না তাহার প্রমাণ—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যের উপ-সংহার-ভাগে বলিয়াছেন

"জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদ্ অণি-মাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি। জগ দ্ব্যাপারস্তু নিত্য সিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য।"

ইহার অর্থ;—জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপার ব্যতীত অণিমা-আদি আর যত প্রকার ঐ-শ্বর্য্য আছে সমস্তই মুক্ত পুরুষের অধি-কারায়ত্ত; জগদ্ব্যাপার কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই কেবল অধিকারায়ত্ত। এইরূপ, বেদান্ত নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সহিত সাধন-সিদ্ধ মুক্ত জীবের প্রভেদ স্বীকার করেন; কোন্ অংশে তবে ঈশ্বরের সহিত মুক্ত পুরুষের অভেদ? বেদান্ত বলেন—"ভোগ-সাম্যে।" অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের সহিত কামনার সমস্ত ফল উপভোগ করে—আনন্দ হইতে আনন্দ—মঙ্গল হইতে মঙ্গল উপভোগ করে—এইখানেই ঈশ্বরের সহিত মুক্ত জীবের অভেদ। এইরূপ, অভেদের মধ্যে প্রভেদ এবং প্রভেদের মধ্যে অভেদ, ইহাই স্বদেশীয় বিদেশীয় সকল শাস্ত্রেরই মর্ম্মগত অভিপ্রায়। যাঁহারা ভেদাভেদের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন তাঁহারা এক-পক্ষের হইয়া আর-এক পক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন না; যাঁহারা প্রভেদ-শূন্য অভেদের অথবা অভেদ-শূন্য প্রভেদের পক্ষপাতী তাঁহারাই পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করেন।

উপদেশ।

(বলুহাটী সাম্বৎসরিক উৎসব)

নশ্বর পৃথিবীর অন্নপানে প্রতিপালিত হইয়া, অস্থায়ী যশোমান খ্যাতি প্রতিপত্তির ভিখারী হইয়া, ধন ঐশ্বর্য্য স্ত্রী পুত্র পরি-বারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াও আজ আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম! এখানে কেন বিষয়ের দুশ্চিন্তা, বিষয়ীর সদর্প তীব্র কটাক্ষ আমারদের মর্ম্মস্থল প্রকম্পিত করিতে পারিতেছে না! কেন বা আমরা মান-অভিমান সম্পদ-বিভব বিস্মৃত হইয়া ধনী দরিদ্রে একাসনে আ-সীন হইয়া মহেশের যশঘোষণায় স্বরস্বতী-তীর প্রতিধ্বনিত করিতেছি! বিষয়ের কীট হইয়াও কেন বা শ্মশানবৈরাগ্য

আমারদের অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিল! অজস্র কামনার বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়াও কেন বা দুরপনেয় গভীর শূন্য, হৃদয়-মধ্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া পড়িল! আজন্মকাল বিষয়মদিরা পানে যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়া ছিলাম, অতি সন্তর্পণে আপনাকে ধর্ম্ম ঈশ্বর হইতে বহুদূরে রক্ষা করিয়াছিলাম, কে হৃদয়দেশ আলোড়িত করিয়া মোহ-যবনিকা আমারদের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া দিল! কে হৃদয়ের মত্ততা বিদূরিত করিয়া দিয়া বিষয় ভোগের চিরপরিচিত বর্ত্ম হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিল, পথহারা দেখিয়া কল্যাণের পথে কে আমাদিগকে আহ্বান করিল! কে বলিয়া দিল যে ধরাপৃষ্ঠকে সর্ব্বস্ব জানিয়া জীবনের অর্দ্ধাঙ্ক সমাপিত করিলাম, উহা আমারদের তাবৎ নহে!

সকল মনুষ্যেরই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন বিষয়ের চির অভ্যস্ত আমোদ প্রমোদ তাহাকে আর আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। যখন ঘোরতর ঝটিকা প্রবল বেগে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর উচ্ছেদদশা আনয়ন করে, মৃত্যুর করাল মুখব্যাদনে আত্মীয় স্বজন আমারদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন, যখন আপনার বলিয়া কাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গনে সংবদ্ধ করিতে পারি না, যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও নিরাশ্রয় জানিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকি, তখন বুঝিতে পারি যে পৃথিবী আমারদের সর্ব্বস্ব নহে, এখানকার সুখশান্তি আমোদ প্রমোদ আমারদের অন্তরের পিপাসা শান্ত করিতে সক্ষম নহে। সাংসারিক সুখের এই চির অতৃপ্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র হেতু। মনুষ্য ধ্রুব সত্যের ভিখারী। সংসার তাহার হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না বলিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে ধাবমান হয়। যে আনন্দের ক্ষয় নাই, যে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলে আর তাহা হইতে কোন কালে বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, দেবতারা যে আনন্দের ভিখারী সেই দেব-উপভোগ্য আনন্দ লাভ করিবার জন্য মর্ত্ত্যের কীট ক্ষুদ্র মনুষ্যের আন্তরিক পিপাসা। সেই জন্যই আমরা পরিদৃশ্যমান অনায়াস-লব্ধ পার্থিব-সুখে বিসর্জ্জন দিয়া সাধন-লব্ধ কৃচ্ছ্র সাধ্য ভবিষ্যৎ-গর্ত্ত-নিহিত সুখের আশায় ইহকালের আমোদ প্রমোদকে আহুতি দিয়া অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছি, অবিদ্যার বিনাশে ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছি। যে জ্ঞান ঈশ্বরের পথের নিয়ামক তাহা লাভ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পার্থিব ও অপার্থিব উপাদানে মনুষ্য শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। রক্তমাংসঅস্থি-সমন্বিত স্থূলদেহ ধূলিকণিকায় পরিনির্ম্মিত, পৃথিবীর রসে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উহাকেই তাবৎ জানিয়া পরিশেষে জলবুদ্বুদের ন্যায় উহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে। অপার্থিব উপাদান সমুদ্ভূত জীবাত্মা ক্ষুদ্র হইয়াও অপরিসীম ক্ষমতা ধারণ করে। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রসমন্বিত বিশাল পৃথিবী যেমন জড়শরীরস্থ ক্ষুদ্র চক্ষুর একমাত্র লক্ষ্যস্থল, সেইরূপ যিনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের অন্তরাত্মা, যিনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের নিয়ন্তা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যাঁহাকে জানে না তিনিই জীবাত্মার একমাত্র গ্রাহ্য। চক্ষু আবশ্যক বল লাভ করিলে যেরূপ জড় পৃথিবীকে আপনার সম্মুখে দর্শন করে; জীবাত্মার অসাড়তা বিদূরিত হইলে—সংসারের নশ্বরতা তাহার নিকট প্রতিভাত হইলে উহা সাধন

তপস্যা বলে জ্বলন্ত ঈশ্বরকে আপনার সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখে ও পবিত্র পরিশুদ্ধ পরমাত্মাকে আপনার নিজস্ব ধন ও চরমগতি জানিয়া আপ্তকাম হয়। যদি সমুদায় সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, যদি সূর্য্য চন্দ্র গগন হইতে অন্তর্হিত হয় তথাপি তাহার চক্ষু ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হয় না।

যিনি সমুদয় জগতের অধিপতি, যাঁহার অসীম রাজ্যে একই কৌশল কার্য্য করিতেছে, তিনি চান যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তান তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়। তিনি সেই জন্য তাঁহার অনন্ত উদার ক্রোড় সকলেরই জন্য আগ্রহের সহিত উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বিমল আত্মপ্রসাদ বিধান করিয়া তাঁহার প্রত্যেক দুর্ব্বল সন্তানকে তাঁহার দিকে অল্পে অল্পে আহ্বান করিয়া লইতেছেন। আমারদের বিপদ সম্পদেও তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। প্রতি বিপদের দারুণ কশাঘাতে আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন। অণ্ড নিহিত শিশুকে পরিপুষ্ট জানিয়া যেমন পক্ষী, চঞ্চুর আঘাতে সেই অণ্ড ভেদ করিয়া দিয়া শাবককে মুক্তবায়ুতে আনয়ন করে, তেমনি যখনি আমরা সম্পদের আগারে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করি, আপনার আশা ভরসা এখানেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি, তখনই বিশ্বজননী বিপদের তীব্র কুঠারাঘাতে ক্ষণ তৃপ্তিপ্রদ সুখের পার্থিব উপাদানগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন, আমারদের সম্মুখে নূতন রাজ্যের নূতন ভাবের নূতন কল্যাণের যবনিকা ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করেন ও ধর্ম্মক্ষেত্রের বিশাল গগনে সঞ্চরণ করিবার শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিতে থাকেন। রজনীর ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হইলে যখন উজ্জ্বল পূর্ব্বগগনে আরক্ত সূর্য্য স্বীয় কিরণ জাল বিস্তার করে, তখন আশু-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি যেমন একেবারে নয়ন উন্মীলন করিয়া আলোকমালার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন না, প্রত্যুত ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়া লন, তেমনি আজন্ম-সহচর বিষয় হইতে মনুষ্য-হৃদয়কে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিবার সময়ে সেই পরমপিতা বিষয়ের অসারতা ক্রমশঃ দেখাইয়া দিয়া পরিশেষে তাহাকে আপনার পথের পথিক করেন। এ পৃথিবীতে যে না তাঁহার প্রেমের প্রেমিক হইল, তাঁহার অবিশ্রান্ত করুণা পরজগতে তাহার অনুসরণ করিবে। তাঁহার রাজ্যে ঘোর বিষয়ীরও নিস্তার নাই। বিষয়ী আর কতদিন তাহার অতুল্য সম্পদে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। তাঁহার দ্বার চির উন্মুক্ত, তাঁহার হস্ত চিরকার্য্যকর!

তাঁহার রাজ্যের চির-বিচিত্রতা দেখিয়া তাঁহার গুণগানে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত কর। তিনি মনুষ্যের সুখের জন্য পৃথিবীকে সুচিত্র ভূষণে অলঙ্কৃত করিলেন, আনন্দের কতশত উৎস উৎসারিত করিলেন। উপরে নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপে পৃথিবীর মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, নিম্নে ওষধি বনস্পতির লাবণ্যে ফলপুষ্পের মাধুরীতে, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান পশুপক্ষীদিগের কলনিনাদে নিত্য বিশাল উৎসবে মর্ত্তলোক উৎসবান্বিত করিয়া দিলেন! কিন্তু মনুষ্যের জন্য বৈরাগ্যের বীজ রোপণ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। মনুষ্য তাঁহার নিত্য-উদার-সদাব্রতে অন্নপান লাভ করিয়াও চঞ্চল ঘটনার মধ্যে অস্থির অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া তাঁহাকে না পাইয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিল না। সেই জন্যই আমরা অগণ্য সুখে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও হৃদয়ের অপূ-

র্ণতা পরিহারের জন্য তাঁহার দ্বারে তাঁহার আদেশে আগমন করিয়া প্রসাদ-বারির আশে তৃষিত চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিয়াছি।

আমরা সংসারের অনিত্যতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ দিগন্ত-বিশ্রান্ত উত্তাল তরঙ্গ-মালা-সমাকীর্ণ স্বরস্বতীর প্রখর তেজের অবসান হইয়াছে, তাহার সুগভীর ভীষণ গর্ত্ত বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে, উহার তলদেশে এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রহিল। ইহার প্রাণদাতা কালের করাল কুক্ষির মধ্যে স্থান পাইয়া অপার ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকেই সংসারের আশা ভরসায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রান্তর মধ্যস্থ তরুর ন্যায় একাকীই পৃথিবীর ঝঞ্ঝা তরঙ্গের আলোড়ন সহ্য করিতেছেন। হয়ত রোগ শোকের প্রবল আক্রমণে অনেকের দেহযষ্টি ক্ষীণ হইয়া ইহকালের পরপারের অব্যাহত যোগানন্দ প্রেমানন্দ সম্ভোগের উপযুক্ত হইতেছে। হয়ত বৈষয়িক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া অনেকের প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সুশীতল ছায়ার মধ্যে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছে। যাঁহারা ঈদৃশ বিপৎপাতের হস্ত হইতে বহুদূরে আছেন, তাঁহারা দুর্নিবার্য্য ঝটিকার কঠোরতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সহজে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হউন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এখানে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তিনি ভিন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কেহ নাই।

যতদিন শরীরের সঙ্গে আমারদের আত্মার যোগ ততকাল বিষয়ের নিকট হইতে আমরা চিরবিদায় গ্রহণ করিতে পারিব না; শরীরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিষয়ের অধীন হইয়াছি। আমরা প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান না হইয়া যাই, ইহারই জন্য আমাদিগকে নিয়ত সাবধান থাকিতে হইবে। চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে, ঈশ্বরকে হৃদয়ের প্রভু জানিয়া নিত্যনিয়মে তাঁহাকে প্রীতি উপহার প্রদান করিতে হইবে। তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া সংসারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ব্রহ্মযোজিতচিত্তে ফলকামনাশূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয় উপভোগেই জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইবে। পৃথিবীর সুখশান্তি অনিত্য জানিয়া এখানকার প্রতি পরিবর্ত্তনে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে।

আমারদের চারিদিকে অনিত্য বিষয়ের গণ্ডী। চারিদিকে বিষয় কোলাহল, নিরাশার ক্রন্দন, সম্পদের অট্টহাস্য! ইহার মধ্যে যোজিতচিত্ত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মধামের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হওয়াই আমারদের লক্ষ্য। যখন আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করি তখন আর কোন আশা থাকে না। জীবনের অধিকাংশ কাল বিষয়ের সেবাতেই পর্য্যবসিত হইল। তিনি আমারদের ইহ-জীবনের নেতা, আমারদের অমর আত্মার চিরসঙ্গী। সে সঙ্গ ছাড়িয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম কলঙ্কিত করিলাম। তিনি যে আত্মার উন্নতি সাধনের গুরুভার আমারদের মস্তকের উপর অর্পণ করিয়াছেন, আজ সাশ্রু নয়নে কম্পিত কলেবরে নিজ নিজ জীবন পুস্তক উৎঘাটনে আপনার হীনতা ও মলিনতা অনুভব করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া যাইতেছি। অনন্ত আকাশ যাঁর গুরুভার ধারণ করিতে পারে না, এই সমাজ মন্দিরে তাঁহার উজ্জ্বল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সকলে হৃদয়ের প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়া দাও, কৃত অপ-

রাধের জন্য অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকট যোড়করে প্রার্থনা কর, দৈববলে বলী হইবার জন্য তাঁহার দেবপ্রসাদ ভিক্ষা কর, তাঁহার অভয় হস্ত দেখিয়া নির্ভয় হও।

আজ আমারদের সাম্বৎসরিক মহোৎসব। আজ আনন্দের তরঙ্গ এখানে প্রবাহিত হইতেছে। মর্ত্ত্যের নীচ কামনা আমারদের মন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা বন্ধুবান্ধব সহ সম্মিলিত হইয়া বিষয়ের উপরিতন স্তরে মুক্ত বায়ুতে সঞ্চরণ করিয়া তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি সন্দর্শনে বিমল আনন্দলাভের অধিকারী হইয়াছি। আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বেত্তা জ্যোতিষ্কমণ্ডল সন্দর্শন করিবার সময় যেমন উচ্চমঞ্চে আরোহণ করেন, তেমনি আমরা আজ আকাশের অতীত দেবদেব মহাদেবের পূর্ণ মহিমা সন্দর্শন করিবার জন্য বিষয় রাজ্যের সীমার বহির্দেশে—পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়াছি। ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর ভাবের পূতিগন্ধ আমাদের মস্তককে বিকৃত করিতে পারিতেছে না।

হে পরমাত্মন্! এই উৎসব-আমোদের দিবসে তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব। তোমার অনিমিষ চক্ষু আমারদের উপরে দিনযামিনী সমভাবে নিপতিত রহিয়াছে। আমারদের জীবন তোমার করুণার প্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমারদের কি সাধ্য যে তোমার অতুলন মুখচ্ছবি সকল সময়ে সন্দর্শন করিয়া সাংসারিক অভ্যুদয় ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। আমরা মর্ত্ত্যের কীট হইয়া সংসার জলধির পরপারে তোমার অক্ষয় অনন্ত ব্রহ্মধাম দেখিতে পাইব এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। বিষয় চিন্তা ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। তুমি এই অবকাশে আমারদের শূন্য হৃদয়কে অধিকার কর। যেখানে শত শত সূর্য্যের বিমল কিরণে দিক্‌বিদিক্ জ্যোতিষ্মান রহিয়াছে, যেখানে রাত্রি নাই, জরা মৃত্যুর আধিপত্য নাই, কেবলই উৎসবানন্দ প্রেমানন্দের মনোহর তান অনবরত উত্থিত হইতেছে, যেখানে দেবতাদিগের স্তুতিগানে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেখানে তোমার প্রেমের কুসুম চারিদিকে একে একে বিকসিত হইতেছে, যেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান রহিয়াছে, যেখানে সকল সাধকে পরিবৃত হইয়া তোমার যশঘোষণা করিতেছে, যেখানে তোমার আলোকে সাধকের হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তুমি সেই ছবি একবার দূর হইতে আমারদিগের নয়নের সম্মুখে ধারণ কর, তোমার প্রেমের প্রেমিক কর, যে আমরা সংসারকে একেবারে ভুলিয়া যাই, তোমার প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উদাসীনের ন্যায় নশ্বর সুখের ঘোর পিপাসা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি। "আবিরাবীর্ম্মএধি" তুমি আমারদের সম্মুখে চির বিরাজিত থাক, যেন আর পথহারা হইয়া তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। তুমি যে অকৃত অমৃত পুরুষ, আমরা যে অমরত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী, আমরা যেন তাহা সম্যক অবধারণ করিয়া তোমার পূজার্চ্চনায় অমর আত্মার পাথেয় সম্যকরূপে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

(বিগত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকার ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

মোরা মূঢ় মতি, বিষয়ের প্রতি
অমৃত আশয়ে ধাই।
আশায় বিফল, শুধু হলাহল,
লাঞ্ছনা কতই পাই॥
অমৃত সাগর, হয়েন ঈশ্বর,
জীবনের আস্বাদন।
তিনি শান্তি ধাম, তিনিই আরাম,
দুখে সুখ তিনি হ'ন॥
করুণা তাঁহার, গম্ভীর অপার,
অনুক্ষণ হৃদি স্মর।
তাঁর পথে যাও, তাঁর নাম গাও,
তাঁহার বচন ধর॥

বিষয় বাসনা ছাড়ি, তাঁহারে ভজিব,
তাঁর প্রেমেতে গলিব।
তাঁর পানে চাহি, মোহ পাশ পাশরিব,
তাঁরে পরাণ সঁপিব॥
এই চান তিনি—হ'ব তাঁহারি বলিয়া—
দিতেছেন দিব্য জ্ঞান।
মলিন কামনা হ'তে শোধিছেন হিয়া,
দেন অমৃত সোপান॥
বিগত জীবন লাগি না করিহ ভয়,
ডাক তাঁরে সকাতরে।
দুঃখের প্রেমের অশ্রু হেরি দয়াময়,
কাছে ডাকেন সাদরে॥
তাঁহার সহিত প্রেমে জীবন যাপিতে—
তাঁরে করি দরশন।
যত করিয়াছ আশ, তাঁহারে লভিতে,
সব হইবে পূরণ॥
যাঁর বলে চলিতেছে সকল সংসার,
তাঁরে চাও ধর্ম্ম বল।
প্রেয় পরিহরি কর তাঁর পথ সার,
হবে জীবন সফল॥
তাঁর প্রেম যদি আসে তোমার হৃদয়ে—
সেই প্রেমের লক্ষণ।
পুরাতন চলি যা'বে মলিনতা লয়ে
হবে নূতন জীবন॥
ভাতিলে যে প্রেম-সূর্য্য হৃদয়-গগনে—
কি বা আনন্দ অপার।
ক্ষুদ্রভাব [illegible] পলায় সঘনে,
দূরে যায় অন্ধকার॥
হৃদয়-কমল ফুটে সে সূর্য্য কিরণে।
গন্ধ তাঁরে দান করে।
প্রাণ-পাখী গায় তবে প্রেমানন্দ মনে।
তাঁর বায়ুতে বিহরে॥
স্বর্গীয় সে জ্যোতিঃ হৃদি হইলে নির্ব্বাণ,
ঘেরে অজ্ঞান নিশায়।
রিপু অবসর পেয়ে হয় তেজীয়ান্,
ঘোর বিপদ ঘটায়॥
আপনার নাম—তবে আপনার মান,
কিসে হইবে বিস্তার।
বাসনা পুরাতে হয় আকুল পরাণ,
তাহা বাড়ে অনিবার॥
হেন দশা নাহি হো'ক—ভুলিব তা হ'লে,
কেন জীবন ধারণ।
দেব-ভাব হৃদয়ের সব যা'বে চলে,
হবে অধোতে পতন॥
না রহিবে তাঁর দ্বারে কাঁদিয়া প্রার্থনা,
যদি তারেন পামরে।
যদি পাপ রাশি তিনি করেন মার্জ্জনা,
নিজ কৃপা গুণ তরে॥
যাবে—সেই উর্দ্ধ দৃষ্টি সে নয়ন পানে,
তাঁর সহবাস-আশ।
যাহা পেলে স্বর্গ ভোগ হয় এই খানে,
যার মিটেনা পিয়াস॥
ঈশ্বর করুণ তাঁর প্রেমেতে মজিয়া,
যেন ভুলি আপনারে।
তাঁহার চরণে ভক্তি একান্তে রাখিয়া,
যেন চলি এ সংসারে॥

প্রচারিতে তাঁর নাম—পূজা—বিশ্বময়।
তাঁর ভাবে গলে যা'তে সবার হৃদয়॥
তাঁর কার্য্য—তাঁর সেবা—করে জগজ্জন।
তাঁরে পায় লোকে; ইথে করহ যতন॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! অজ্ঞান অন্ধ আমরা সবাই।
তোমার সত্যের পথ দেখিতে না পাই॥
কৃপা করি তুলে লও প্রেয় পথ হ'তে।
লয়ে যাও তব শুভ অমৃতের পথে॥
কেমনে তোমার নাম করিব প্রচার।
কেমনে তোমার ধর্ম্ম করিব বিস্তার॥
দুর্ব্বল—অধীন—লই তোমার শরণ।
করুণা কটাক্ষ তুমি কর বিতরণ॥
দুর্ব্বলে করহ বলী, সভয়ে অভয়।
তোমার কৃপায় নাথ! কিবা নাহি হয়॥
ইতি চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

পত্র।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এখন হইতেই ১১ মাঘের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসবের প্রথম দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নামে এবং দ্বিতীয় দিনে ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসব করা হয়। ১৮০২ শকের ১৮ পৌষ তারিখে উৎসবের এই নিয়ম ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি তৎকালে বেদী হইতে যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। "আমাদিগের ধর্ম্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমনি অসম্ভব। তাঁহার ঋষি ভাব, যোগ ভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক মণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্টাংশ যিনি পরে আসিলেন তিনি করিলেন। * * ইনি বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ হইতে আইসেন তখন ঈশ্বর ইহাঁকে দীক্ষিত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই এক বৎসর নয়, কিন্তু যৌবন হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইহাঁর সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার ন্যায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ।"

কেশব বাবু এখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে মণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন সেই মণ্ডলীর ভগবদ্ভক্ত ও সাধুভক্ত মহাত্মারা পূর্ব্বধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। গত ১৯ পৌষ তারিখে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি চারি জন ভক্ত ১১ই মাঘের শুভ উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ত্তমান আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে লিখিত পত্রের সহিত তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

একান্ত বন্দনীয় ধর্ম্মপিতা
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণকমলে—

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীচরণে নিবেদনমিদম্,

গত কল্য হইতে ঊনষষ্টিতম মাঘোৎসবের প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই শুভ উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নববিধান সমাজ
৭৮নং অপরসর্কুলার রোড
১৯ পৌষ ১৮১০ শক।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু
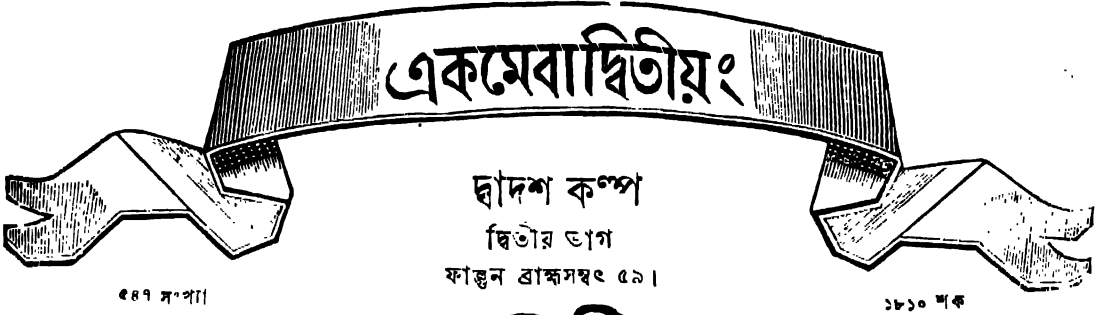
ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বুধবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

প্রাতঃকাল।

আমাদিগের শুভ ব্রহ্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত বহিঃপ্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপের নিম্নে ব্রহ্মোপাসনা হয়। দেশ বিদেশ লইয়া লোকসংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল। যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোৎসবের জন্য লোকের উৎসাহ ও অনুরাগ বাড়িতেছে। এই উৎসবে কোন রূপ বাহ্য আড়ম্বর নাই, তথাচ জনতা, ইহাতে বোধ হয় এক সময় এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশের সকল জাতি ও সকল বর্ণের একমাত্র আশ্রয় হইবে। ফলত প্রাতের লোকসমাগম অতিশয় প্রীতিজনক হইয়াছিল, এই উপলক্ষে বহুদিনের পর অনেক সাধুর দর্শন পাইয়াছিলাম। একমাত্র ব্রহ্ম আমাদিগের উপাস্য। তাঁহার নামেই সকলে আসিয়াছিলেন। তিনিই এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং বাহ্য সৌন্দর্য্য না থাকিলেও ইহাতে চমৎকৃত হইবার পূর্ণ আয়োজন ছিল। যিনি একবার এই উৎসব ভোগ করিয়াছেন তিনি জীবদ্দশায় কিছুতেই ইহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। এই জন্য ব্রহ্মোৎসবে এরূপ জনতা। বেলা ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। সভাস্থল নিবাত নিস্কম্প দীপের ন্যায় স্থির। ব্রহ্মজ্ঞেরা ব্রহ্মযোগে যুক্ত। সমবেত গায়কদিগের মধুর কণ্ঠ গগনাভোগ ভেদ করিয়া অনন্তে মিলিতেছে; সমস্ত সাধু হৃদয় সঙ্গীত সুধায় উন্মত্ত। ফলত প্রাতঃকালের উপাসনা জীবন্তভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। উপাসনার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই উপদেশ পাঠ করেন।

আবার সম্বৎসর পরে ১১ মাঘের প্রাতঃসূর্য্য একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মগণকে উদ্বোধিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মি যেমন শতধা বিকীর্ণ হইয়া সৌর জগতের প্রত্যেক পদার্থকে রঞ্জিত করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মের হৃদয়ে

ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। ভক্তের প্রাণে আজ স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, মঙ্গলের প্রতিদান—কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস হৃদয়ের প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া ছুটিতে চায়, কে তাহা নিবারণ করিবে! আত্মার আত্মজ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া, মনের পবিত্রতা পরিশুদ্ধ হইয়া এবং হৃদয়ের প্রেম প্রশস্ত হইয়া আজ একস্রোতে সেই ব্রহ্মপদের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। ভক্তের চক্ষু আজ যে দিকে ফিরিতেছে সেইদিকেই কি এক অপূর্ব্ব শোভা, মঙ্গলের নিদর্শন এবং গূঢ় গম্ভীর জ্ঞান প্রেমের আভাস নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইতেছে। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশ, নিম্নে তরু নদী, ভূধর প্রান্তর সকলি আজ মধুময়, অমৃতময়। ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের "আনন্দরূপমমৃতং" অদ্যকার বিশেষ আরাধ্য বস্তু। আজ সেই আনন্দ-সাগরে অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া, আজ সেই আনন্দ-সাগরের, অমৃত-সাগরের আনন্দামৃতবারি পান করিয়া এরূপ সুশীতল হইতে হইবে যাহাতে আমরা চিরদিন আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারি; সংসারের কোন শোক, কোন তাপ যাহাতে আর আমাদিগের আত্মাকে বিক্ষোভিত করিতে না পারে। পাপ করিয়া সংশোধিত হইবার জন্য আমরা যাঁহার রুদ্র মুখ অবলোকন করি, পুণ্যে উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য যাঁহার প্রসন্ন মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিতে পাই, অদ্যকার এই মাঘোৎসবের পবিত্র দিবসে তাঁহারই "আনন্দরূপমমৃতং" সর্ব্বত্র সন্দর্শন করিতেছি। তিনি আনন্দরূপে অমৃত রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যেমন এই উৎসবের মূলে প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, আবার আমাদের উপভোগের জন্য আমাদের হৃদয়েও আনন্দধারা, অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন। এই উৎসব দিনে এই অমৃতানন্দ হইতে যে জ্ঞানানন্দ আমরা লাভ করিতেছি তাহা আমাদের অনন্তকালের সম্বল—তাহা আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের নিঃসংশয় নির্ভর। ইহা হইতে এই জ্ঞান সহজেই আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে যে, যে দিন এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই বিবিধ বিচিত্র বস্তুজাত কিছুই ছিল না, কোথাও এক বিন্দু পরমাণুও ছিল না, তখনকার সেই অসীম শূন্য পরিপূর্ণ করিয়া যে এক মহাপ্রাণ, যে এক আদিকারণ জাগ্রৎ ছিলেন তাহা আনন্দেরই রূপ। আর সেই আনন্দস্বরূপ আদিকারণে স্বধা নাম্নী প্রকাশোন্মুখী যে এক মহা শক্তি নিহিত ছিল যাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক অব্যক্ত ছিল, তাহা আনন্দই অব্যক্ত ছিল। সেই আনন্দের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতে এই যে বিশ্বব্যাপার উৎপাদিত হইতেছে ইহাও এই আনন্দের আবহ। গুহাস্থ প্রস্রবণ হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া যে সমুদ্রের মহা আয়তন পূর্ণ করিতেছে তাহা সলিলই। প্রস্রবণের ঝর ঝর নিনাদ, বেগবতী নদীর কল কল শব্দ এবং মহাসাগরের গভীর নির্ঘোষ যেমন নিনাদই,সেইরূপ সেই আদি কারণ প্রাণ স্বরূপ মহেশ্বরের অব্যক্ত মহিমা তখনকার সেই আত্মজ্যোতি, ব্যক্ত মহিমা বহির্জ্যোতি এই গ্রহনক্ষত্রখচিত বিশাল বিশ্ব এবং পারকালিক অনন্ত মঙ্গলের প্রতি আমাদের আত্মার এই যে নিঃসংশয় বিশ্বাস এ সকলি সেই আনন্দই। তাই যখন তপঃপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত পুরুষ আপনার আত্মার বিমল দর্পণে পরমাত্মার পরম সত্য জ্যোতি নিভৃতে সন্দর্শন করিতে থাকেন তখন তাঁ-

হার মনে এত আনন্দ উৎসারিত হয়। তাই যখন মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীত এক প্রান্তরে বহির্গত হইয়া অন্যপ্রান্তরে অবসান পাইতে ধাবিত হয়, তখন পথিকের মনে এত আনন্দের উদয় হয়। তাই যখন কোমল লাবণ্যবতী লতিকার উপরে সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন উদ্যান এত সুন্দর হইয়া উঠে। তাই যখন অঙ্কপূর্ণকারী সরল শিশুর মুখে মধুর হাস্য রেখা অঙ্কিত হয় তখন জননীর হৃদয়ে এত আশা আনন্দের সঞ্চার হয়। তাই যখন অন্ধকার আকাশে চন্দ্র তারকার উদয় হয় তখন যামিনী এত মধুময় হয়, সূর্য্য উদিত হইলে দিবস এত শুভ্র হয়। তাই পরলোক-গমনোন্মুখ তাপস যখন আপনার অনন্ত জীবনের পথ পরিমুক্ত ও পরিশোভিত দেখেন তখন তাঁহার আত্মার এত শান্তি এত তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। আনন্দেরই এই সকল প্রতিরূপ। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই তপঃপরিশুদ্ধ প্রাচীন ঋষি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকলি একটি আনন্দের ধারা। আদিতে আনন্দ, বর্ত্তমানে আনন্দ এবং ভবিষ্যতে আনন্দ। কারণে আনন্দ, কার্য্যে আনন্দ এবং অবসানে আনন্দ। যিনি নিখিল জগতের একমাত্র সেব্য কূটস্থ পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ ইহ জীবনে বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতে এবং কোথাও হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না। তিনি সেই আনন্দ রস অহরহ পান করিয়া আত্মতৃপ্ত হয়েন। যদি সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম এই আকাশে বিরাজিত না থাকিতেন তবে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ মৃত্যুর গভীর অন্ধকারময় ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিত। সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মই এই সকলের পরম গতি, ইনিই সকলের পরম সম্পদ, ইনিই সকলের পরম লোক, ইনিই সকলের পরমানন্দ। এই পরমানন্দ স্বরূপে যিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন, সকল নির্ভরের সহিত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অ[illegible] সম্পূর্ণ সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে হয় না। তিনি শাশ্বত আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন। তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়গ্রন্থি সমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

আমরা এই মর্ত্ত্যের কীট হইয়া এবং জন্ম জরা মৃত্যুর সতত পরিবর্ত্তনশীল চক্রে বিঘূর্ণিত রহিয়া এই যে সংশয়রহিত পরম অমৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হইতেছি ইহা সকল বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবকেই স্মরণ করিয়া দেয়। ব্রাহ্মেরই এই সৌভাগ্য যে তিনি জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার বলে আনন্দময় পরব্রহ্মের সহবাসের যোগ্য হইয়াছেন। মধুমক্ষিকা যেমন আপনার সূক্ষ্ম চক্ষুর বলেই পুষ্পের গুপ্ত মধু ভাণ্ডার হইতে মধুপান করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার বলেই সেই সত্যের পরমনিধান অমৃতভাণ্ডার হইতে অমৃতানন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। এক সম্প্রদায় মনুষ্য আছে, ব্রহ্মলাভের প্রতি যাহাদের কিছুমাত্র যত্ন ও শ্রদ্ধা দেখা যায় না। তাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। মৃত্যুর পরে তাহাদের জ্ঞানময় আনন্দময় লোক হইতে বহুদূরে থাকিতে

হইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বেও অজ্ঞানমেঘে আবৃত থাকিয়া তাহাদিগকে আত্মগ্লানির শিলাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে। যে লোকে আত্মার যে অনুসারে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয়, সেই অনুসারে সেই লোকে তাহার ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হয়। সত্য-পন্থানুগামী ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মেরই ব্রহ্মানন্দ লাভের অধিকার। তিনি কল্যাণ হইতে কল্যাণতর এবং আনন্দ হইতে আনন্দতর লোকে উত্থান করেন। ব্রাহ্মের এই অধিকার এই জন্য যে তিনি এখানে থাকিয়াই আনন্দ স্বরূপ অমৃত স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, হে সমাগত ব্রাহ্মগণ! আইস, আজ আমরা এই ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করি। আর সেই ঋষির সহিত এক স্বরে সেই বাক্য প্রতিধ্বনিত করি যে ঋষি জাহ্নবীতীরে বা হিমাচলের পাদমূলে দণ্ডায়মান হইয়া একদিন আকাশপূর্ণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেহমৃতস্য পুত্রা আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণন্তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়"

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করেন।

সম্বৎসর পরে আবার আমরা ভ্রাতায় ভ্রাতায় পিতাপুত্রে বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া দেবারাধ্য পরম পিতার সুপবিত্র কল্যাণ চ্ছায়ায় সমুপবিষ্ট হইয়াছি। সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে আজ আমরা আমাদের সকল উৎসবের অধিদেবতা—সকল সম্পদের মূলাধার—সকল বিপদের কাণ্ডারী পরম প্রভু পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া এই আনন্দে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছি যে, আজ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অনুপম আনন্দরসে, তাঁহার দেব-দুর্লভ প্রেম-সুধায়, তাঁহার অমোঘ মঙ্গল আশীর্ব্বাদে মনের সাধে আমাদের হৃদয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিব। কাঁহার ইচ্ছায় এখানে আমরা আজ সম্মিলিত হইয়াছি? যাঁহার ইচ্ছায় নৈশ নভোমণ্ডলে তারকা-জ্যোতি সম্মিলিত হয়, সরোবরে বিকসিত পঙ্কজ-শ্রেণী সম্মিলিত হয়, বনবিপিনে পুষ্পিত তরুরাজি সম্মিলিত হয়, তাঁহারই ইচ্ছায় অদ্য এখানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। পিতা মাতা যেরূপ দৃষ্টিতে সন্তান-মণ্ডলীর প্রতি নিরীক্ষণ করেন, প্রাণ-সখা যেরূপ দৃষ্টিতে প্রাণ-সখার প্রতি নিরীক্ষণ করে[illegible] যেরূপ দৃষ্টিতে প্রিয় শিষ্যের অর্দ্ধস্ফুট জ্ঞানালোকের প্রতি নিরীক্ষণ করেন সেইরূপ ইচ্ছা-পূর্ণ মঙ্গল দৃষ্টিতে ঈশ্বর সর্ব্বজগৎকে এবং আমাদের প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্ববিজয়ী মঙ্গল আশীর্ব্বাদ সূর্য্য কিরণের ন্যায় সর্ব্ব জগতে অনাবৃত রহিয়াছে; এবং ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মার অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে; তাই আমরা আপনার আপনার অজ্ঞাতসারেও—এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও—অনেক সময়ে এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি যাহাতে পরিণামে সর্ব্বজগতের মঙ্গল

হয়। যাঁহার মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ আমাদের সুষুপ্তির অভ্যন্তরেও আমাদের অজ্ঞাতসারে অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, য এষ সুপ্তেষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তাঁহারই মঙ্গল আশীর্ব্বাদে আমরা এখানে সমাগত হইয়া কৃত-পুণ্য হইয়াছি। মঙ্গল দুই নহে—মঙ্গল এক। সেই—এক মঙ্গলের সঙ্গে সমস্ত জগতের সমস্ত ব্যক্তির সমস্ত মঙ্গল অনির্ব্বচনীয় প্রেমসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে; সে মঙ্গল কি? না ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা। আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার আপনার যত না মঙ্গল ইচ্ছা, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা তাহা হইতেও অপরিসীম অধিক; কেন না আমরা তাঁহারই পুত্র কন্যা। অতএব তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ করিও না—সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, কৃতজ্ঞতার সহিত, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত, সেই ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছাটি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে আত্মসাৎ করিয়া তদনুসারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর এবং অনায়াসে অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হও, "স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" তোমাদের ইহকালে পরকালে মঙ্গল হউক্।

আমরা আজ আপনার আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া অদ্য যে এখানে সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়াছি—আমাদের এ ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি; কেননা, গোড়াতে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা না করিলে, আমরা আপনারাও আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা করিতাম না—করিতে পারিতামও না। এই তত্ত্বটি না বুঝিয়া বর্ত্তমান কালের কৃতবিদ্য লোকেরাও ফরাসীস দেশের নূতন-সৃষ্ট এই একটা কথায় নির্ব্বিবাদে ঘাড় পাতিয়া দেন যে, আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি একেবারেই বিমুখ হইয়া শুদ্ধ কেবল পরের জন্য কার্য্য করাই ধর্ম্ম-কার্য্য; অন্ধ প্রকৃতি যেমন শুদ্ধ কেবল পরের জন্য কার্য্য করে—সেইরূপ পরার্থ-পরতাই ধর্ম্ম; যেন আপনার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করিলে সে কার্য্যের কোন পারমার্থিক মূল্য নাই। ইহাঁদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আপনার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতাভগিনীর মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিলে তাহারও কোন পারমার্থিক মূল্য নাই—কেননা আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার আপনারই সামিল; তবে কি? না আমার আপনার সহিত মূলেই যাহার কোন সম্পর্ক নাই—নিতান্তই যে আমার পর—তাহার মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিলে তবেই তাহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে! এ তো কেবল দেখিতেছি—উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে হাত বাড়ানো। যে আপনার মঙ্গল বোঝে না সে অন্যের মঙ্গল কিরূপে বুঝিবে? যে আপনার মঙ্গলের প্রতি অযত্ন করে—সে অন্যের মঙ্গলের প্রতি কিরূপে যত্নবান্ হইবে? যে আপনার পুত্রকে খাওয়া পরা দিতে পারে না, সে কিরূপে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভরণ-পোষণ করিবে? আপনার মঙ্গলকে যদি মঙ্গল বলিয়া বোধ না হয়—তবে পরের মঙ্গলকে কিরূপে মঙ্গল বলিয়া বোধ হইবে? যাঁহারা মনে করেন যে, আপনার মঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া পরের মঙ্গল সাধন করাই নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম—তাঁহারা নিঃস্বার্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ এখনো পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। "নিঃস্বার্থ"—শব্দ একটি বই নয়, কিন্তু তাহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে; নিঃস্বার্থ-শব্দের এক অর্থ পরার্থ—আর এক অর্থ পরমার্থ; পরার্থ কি? না আপনাকে আদবেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে না ধরিয়া

—আপনাকে জগৎ হইতে একেবারেই ছাঁটিয়া ফেলিয়া—পরের জন্য কার্য্য করা; ইহারই নাম পরার্থ। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে পরার্থ-পরতা অন্ধ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম; অন্ধ প্রকৃতি আপনার জন্য কোন কার্য্যই করে না—যাহা কিছু করে সকলই অন্যের জন্য। পরমার্থ তবে কি? সংক্ষেপে বলিতে হইলে সর্ব্বজগতের মঙ্গল সাধন করা, ইহাই পরমার্থ। কিন্তু ইহার অর্থ ভাঙিয়া বলিতে হইলে এইরূপে তাহার টীকা করা আবশ্যক যে, সর্ব্বজগতের মধ্যে তুমিও আছ—আমিও আছি—সকলেই আমরা আছি। সর্ব্বজগতের মঙ্গল সাধন করা যদি আমার কর্ত্তব্য হয়, তবে আমার আপনার মঙ্গল সাধন করাও আমার কর্ত্তব্য; কেননা আমি সর্ব্বজগৎ ছাড়া কোন কিছু নহি—আমিও সর্ব্বজগতের অন্তর্ভূত একজন ব্যক্তি। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, অন্ধ প্রকৃতির ন্যায় আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়াই পরার্থ-পরতা; আর, আপনাকে শুদ্ধ ধরিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়াই পরমার্থ-পরতা। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থ এবং পরমার্থ এ দুয়ের কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখিলেই, পরার্থ এবং পরমার্থের মধ্যে প্রভেদ যে, কি, তাহা কাহারো নিকটে অব্যক্ত থাকিবে না। অতীব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় সম্বন্ধ; কিন্তু স্বার্থ এবং পরমার্থের মধ্যে এক দুই সম্বন্ধ; সে কেমন? না যদি বলি যে, প্রথম মুদ্রাটি গ্রহণ করিও না দ্বিতীয় মুদ্রাটি গ্রহণ কর, তবে প্রথম মুদ্রাটি বাদ পড়িয়া যায়; কিন্তু যদি বলি যে, একটি মুদ্রা গ্রহণ করিও না—দুইটি মুদ্রা গ্রহণ কর, তবে দুইটির কোনটিই বাদ পড়ে না। এ যেমন—তেমনি যদি বলি যে, স্বার্থের উদ্দেশে কার্য্য করিও না—পরার্থের উদ্দেশেই কার্য্য কর, তবে স্বার্থ একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়; কিন্তু যদি বলি যে, স্বার্থের উদ্দেশে কার্য্য করিও না—পরমার্থের উদ্দেশে কার্য্য কর, তবে স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের কোনটিই বাদ পড়িয়া যায় না; কেননা স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই পরমার্থের অন্তর্ভূত। আমরা তাই বলি যে, "অনেক" যেমন এক হইতে ভিন্ন, নিঃস্বার্থ তেমনি স্বার্থ হইতে ভিন্ন; কিন্তু অনেক বলিতে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বুঝায় না—দুই তিন চা'র পাঁচই বুঝায়; তেমনি নিঃস্বার্থ বলিতে তোমার স্বার্থ, আমার স্বার্থ, সকলেরই স্বার্থ, একসঙ্গে বুঝায়—পরমার্থ বুঝায়; আমার স্বার্থ ছাড়িয়া তোমার স্বার্থ বুঝায় না—পরার্থ বুঝায় না; কেননা, প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয়ই যেমন দুয়ের অন্তর্ভূত, স্বার্থ এবং পরার্থ উভয়ই তেমনি পরমার্থের অন্তর্ভূত। অনেককে পাইলে যেমন এককেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়, নিঃস্বার্থকে পাইলে তেমনি স্বার্থকেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়। কেবল মাত্র প্রথমকেও দুই বলা যাইতে পারে না—কেবল-মাত্র দ্বিতীয়কেও দুই বলা যাইতে পারে না; তেমনি, কেবল মাত্র স্বার্থকেও পরমার্থ বলা যাইতে পারে না—কেবল-মাত্র পরার্থকেও পরমার্থ বলা যাইতে পারে না; তবে কি? না প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয়ের একীভূত ভাবই দুই; স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের একীভূত ভাবই পরমার্থ।

পরমাত্মার ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত হইয়া তোমার স্বার্থ যখন আমার স্বার্থ

হয় এবং আমার স্বার্থ যখন তোমার স্বার্থ হয়; অথবা যাহা একই কথা— পরমাত্মার ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছা যখন তোমার আমার এবং সকলেরই স্বার্থ হয়; তখনই স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই একীভূত হইয়া পরমার্থে পরিণত হয়। পরমার্থকে পাইলে স্বার্থের কোন অভাবই থাকে না। পরমার্থ কি? না ঈশ্বরের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ। আমাদের প্রত্যেকেরই আপনার আপনার মঙ্গল ইচ্ছা ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছার অন্তর্ভূত; আমাদের প্রত্যেকেরই প্রকৃত স্বার্থ সেই পরমার্থেরই অন্তর্ভূত। তাই একজন লোক-প্রসিদ্ধ ভগবদ্‌ভক্ত সাধু মহাত্মা বলিয়াছেন—"প্রথমে ঈশ্বরের অমৃত নিকেতনের পথ অনুসরণ কর, আর আর যাহা কিছু তোমার প্রয়োজন সমস্তই তোমাতে অনুসংযোজিত হইবে।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শুদ্ধ কেবল পরের জন্যই কার্য্য করিব এরূপ প্রতিজ্ঞার গোড়াতেই দোষ। কেননা, পরমপিতা পরমেশ্বর যখন সকল আত্মারই অন্তরাত্মা, তখন কেহ কাহারো পর নহে—সকলেই সকলের আপনার। পরই যখন নাই, তখন পরের জন্য কার্য্য করা কিরূপ? শিরই যা'র নাই, তা'র আবার শিরঃপীড়া কিরূপ? লোকে যখন স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল সাধন করে, তখন কেহ আর এমন মনে করে না যে, স্ত্রী পুত্রের মঙ্গল আমার আপনার মঙ্গল নহে— তাহা শুদ্ধ কেবল পরেরই মঙ্গল। তেমনি ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ যখন কোন অজ্ঞাত অপরিচিত অতিথির পাতে অন্ন পরিবেশন করেন, তখন তিনি এরূপ মনে করেন না যে, সে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য শুধু কেবল পরেরই মঙ্গল—তাহা তাঁহার আপনার মঙ্গল নহে। দক্ষিণ হস্তও বাম হস্তের পর নহে—বাম হস্তও দক্ষিণ হস্তের পর নহে, কেননা উভয়েই একই হৃদয়ের দুই পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে; তেমনি, তুমিও আমার পর নহ—আমিও তোমার পর নহি—কেননা উভয়েই আমরা একই পরমাত্মা হইতে আসিয়াছি। শাস্ত্রে আছে যে, শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে—পর ভাবিয়া যাহাকে যাহা দান করা যায়, সেরূপ দান'কে কিছু আর শ্রদ্ধার দান বলা যাইতে পারে না; আপনার ভাবিয়া যাহাকে যাহা দান করা যায় তাহাই শ্রদ্ধার দান। পরমেশ্বর সর্ব্বজগতের অধীশ্বর অথচ তিনি ভক্তজনের আপনার ঈশ্বর;—ভক্তজনের নিকটে তিনি অজ্ঞাত অপরিচিত পর নহেন—প্রত্যুত তিনি যেমন তাঁহার আপনার এমন আপনার আর কেহই নহে—

"স এষ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

ঈশ্বর যাঁহার আপনার সকলই তাঁহার আপনার; এই জন্য তিনি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন, তখন তিনি মনে করেন যে, আমি আমার আপনারই মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছি; যখন তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন তখন তিনি মনে করেন যে, আমি জগতের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছি; কেননা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের প্রেম-সূত্রে সকল মঙ্গলেরই সঙ্গে সকল মঙ্গল অবিচ্ছেদে গ্রথিত রহিয়াছে; কাজে কাজেই পরের মঙ্গলও আপনার মঙ্গল, আপনার মঙ্গলও পরের মঙ্গল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি পরের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন, তিনি পরেরও মঙ্গল সাধন করেন আপনারও মঙ্গল সাধন করেন; সকলকে সুখী করিবার জন্য যিনি আপনার সুখ-

অগ্রাহ্য করেন, তিনি ঈশ্বরের সহবাস-লাভে স্বর্গাতীত স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পা'ন তাঁহার আবার অমঙ্গল কোথায় ? অতএব ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মসাৎ করিয়া তদনুসারে আপনার এবং অন্যের মঙ্গল সাধন করা এবং ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া কোন প্রকার কার্য্য না করা—ইহাই এক মাত্র ধর্ম্ম।

ফরাসীস দেশীয় আর একটা অলীক মৃগতৃষ্ণা আমাদের দেশের আধুনিক কৃত-বিদ্য সমাজে বিষম এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিতেছে; সেটা এই যে সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে প্রীতি করিলে তাহাতেই প্রীতির যৎপরোনাস্তি চরিতার্থতা হইতে পারে—ঈশ্বর-প্রীতি কেবল একটা বা-ড়া'র ভাগ। ইহাঁদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কোথায় গেলে আমি সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীর দেখা পাইতে পারি—সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলী থাকে কোথায় ? সকলেই তো আমরা আপনার আপনার পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন সহচর অনুচর বন্ধু-বান্ধব, ইহাঁদিগকেই চক্ষে প্রত্যক্ষ করি, আর, ভাল বাসিবার মধ্যে তাঁহাদিগকেই ভাল বাসি। সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে কে কবে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ? যাহাকে আমি কোন জন্মে প্রত্যক্ষে উপ-লব্ধি করি নাই, তাহাকে আমি কিরূপে ভাল বাসিব ? প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য-মণ্ডলী বলিতে বাহিরের দৃশ্যমান মনুষ্য-মণ্ডলী ছাড়া আর একটি বিষয় বুঝায়—সেটি কেবল অন্তরে প্রত্যক্ষ করিবার সামগ্রী—কি ? না মনুষ্যত্ব। যাহার গুণে মনুষ্য-মাত্রই পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—তা-হাই মনুষ্যত্ব, সুতরাং তাহা মনুষ্য মাত্রে-তেই আছে; তবে—কোন মনুষ্যে তাহার বীজ মাটি-চাপা রহিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার পল্লব গজাইয়া উঠিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার ফুল ফুটিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার ফল ফলিয়াছে—কিন্তু আছে তাহা সকল মনুষ্যেতেই। প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তঃকরণের দ্বারে কাণ পাতিলে মানুষ আর পশু দুয়েরই হাঁক ডাক শুনিতে পা-ওয়া যায়; মানুষটির নাম মনুষ্যত্ব—পশু-টির নাম পশুত্ব। পশুটিকে বশীভূত করিলেই মনুষ্যটিকে জাগাইয়া তোলা হয়। অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে ভাল বাসি-লেই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে ভালবাসা হয়; অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে পর ভাবিয়া অযত্ন করিলেই সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীকে পর ক-রিয়া গড়িয়া তোলা হয়। আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার অন্তরস্থিত সেই যে মনুষ্যত্ব, তাহাই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে হাতাইয়া পাইবার টানা জাল। এ কথা খুবই সত্য যে, আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ মনুষ্যমণ্ডলীর সংসর্গ হইতে—বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ হইতে—মনুষ্যত্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আপনার আপনার অন্তঃ-করণের অভ্যন্তরে পুঁজি করি—এবং তাহাকেই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীর স্থলাভি-ষিক্ত করি; সত্য;—কিন্তু বাহির হইতে মনুষ্যত্ব-রত্ন সংগ্রহ করিতে হইলেও অ-ন্তরে একজন জহরী আবশ্যক। পশু কিছু আর মনুষ্যের মধ্য হইতে তাহার মনুষ্যত্বটি চিনিয়া লইতে পারে না; জ্ঞানই জ্ঞানকে চিনিয়া লইতে পারে, প্রেমই প্রেমকে চিনিয়া লইতে পারে; মনুষ্যের অন্তরে মনুষ্যত্ব আছে বলিয়াই সে বাহিরে মনুষ্যত্ব দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চিনিয়া লইতে পারে। ঘরের হাতি দিয়া যে-মন বনের হাতি ধরিয়া আনিয়া তা-

হাকে ঘরে পোষ মানাইতে হয়, তেমনি অন্তরের মনুষ্যত্ব দিয়া বাহিরের মনুষ্যত্ব ধরিয়া আনিয়া তাহাকে অন্তরে পোষণ করিতে হয়। অতএব ইহা স্থির-নিশ্চয় যে, মনুষ্য মাত্রেরই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে মনুষ্যত্ব গোকুলে বাড়িতেছে;—এক দিন না এক দিন সাধুসঙ্গের পুণ্য বায়ুতে বা সদ্‌গুরুর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় বা বিশেষ কোন ঘটনার গতিকে ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার চক্ষু ফুটিলেই তাহা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। অতএব “সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীকে ভালবাসা” এই যে একটি কথা—এ কথাটির ভিতরের মর্ম্ম শুদ্ধ কেবল এই যে, আপনার আপনার অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে ভালবাসিয়া তাহার প্রতি যত্ন করা এবং অন্তরস্থিত পশু-গুলাকে তাহার বশে সংস্থাপন করা। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরস্থিত এই যে, মনুষ্যত্ব, ইহার মূল অন্বেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, আত্মাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; আত্মাকে ছাড়িয়া মনুষ্যত্ব শুধু কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজ। আত্মা হইতেই মনুষ্যোচিত কার্য্য ফুটিয়া বাহির হয়, এবং সেই মনুষ্যোচিত কার্য্যের অভ্যন্তরেই আমরা মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। আমরা আমাদের আপনার আপনার কৃত মনুষ্যোচিত কার্য্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি এবং অন্যের কৃত মনুষ্যোচিত কার্য্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। সেই যে মনুষ্যোচিত কার্য্য তাহার কর্ত্তা কে—তাহার প্রবর্ত্তক কে? যদি আমরা কাহাকেও এরূপ দেখি যে, সে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বিড়ালের ন্যায় চুরির পন্থায় ফিরিতেছে, তবে সে তাহার কার্য্যের কে প্রবর্ত্তক? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাহার প্রবর্ত্তক আর কেহ নয়—বহির্বস্তুর আকর্ষণ। আর এক ব্যক্তিকে যদি দেখি যে, তিনি ঈশ্বর-প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া তাঁহার অনিষ্টকারীর প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতেছেন, তবে সে তাঁহার কার্য্যের কে প্রবর্ত্তক? বহির্বস্তু নহে কিন্তু আত্মা। অতএব আত্মাই মনুষ্যোচিত কার্য্যের মূল-প্রবর্ত্তক—এবং সেই মনুষ্যোচিত কার্য্যের অভ্যন্তরেই আমরা মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। তবেই হইতেছে যে, আত্মার প্রবর্ত্তিত মনুষ্যোচিত কার্য্য হইতে ফল যাহা আমরা উপার্জ্জন করি তাহাই মনুষ্যত্ব। আত্মা মূল—মনুষ্যত্ব ফল। এতক্ষণ ধরিয়া আমরা করিলামই বা কি, আর, পাইলামই বা কি? আমরা বিস্তীর্ণ সাগর মন্থন করিয়া এক বিন্দু অমৃত পাইলাম। মনুষ্য-মণ্ডলী মন্থন করিয়া মনুষ্যত্ব পাইলাম—মনুষ্যত্ব মন্থন করিয়া জাগ্রত জীবন্ত আত্মা পাইলাম। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে আত্মা মৃত্তিকাভ্যন্তর-স্থিত বীজের ন্যায় গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু বামন অবতারের যেরূপ গল্প শুনা যায়—শরীরস্থিত সেই যে, আত্মা, তাহার অধিকার-বিস্তার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছাপাইয়া উঠিয়া অনন্তে গিয়া মিসিয়াছে। এক দিকে আত্মা এবং আর এক দিকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—আত্মার গুরুভারের নিকটে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নতশির। এইমাত্র বলিলাম যে, আত্মা মনুষ্যোচিত কার্য্যের প্রবর্ত্তক; কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য—বলে কাহাকে? কি উদ্দেশে কার্য্য করিলে মনুষ্যোচিত কার্য্য করা হয়? আত্মা মুক্তির ভিখারী—আত্মার লক্ষ কোন প্রকার প্রাচীরের অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকিতে পারে না—আত্মার লক্ষ অন্তরের দিকে প্রসারিত। অতএব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ

করিয়া আত্মা যে কোন কার্য্য করে, তাহাই মনুষ্যোচিত কার্য্য; এবং সে কার্য্যের ফল অনন্ত এবং চিরস্থায়ী মঙ্গল। যদি কোন প্রকার ক্ষণস্থায়ী এবং পরিমিত ফল উৎপাদন করা আত্মার চরম লক্ষ্য হয়, তবে সেইটি করিয়া চুকিলেই আত্মার সমস্ত কার্য্য ফুরাইয়া যায়; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিলেই তাহার কার্য্য যাহা তাহা শেস হইয়া যায়, কাজেই তাহা শুষ্ক হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। আমরা যে কোন গৃহে অবস্থিতি করি না কেন, তাহারই এমন একটি দ্বার খুলিয়া রাখা আবশ্যক যাহার মধ্য দিয়া মুক্ত বায়ু যাতায়াত করিতে পারে; তেমনি, আমরা যে কোন অবস্থায় অবস্থিতি করি না কেন, তাহারই একটি না একটি দ্বার অনন্তের দিকে খুলিয়া রাখা আবশ্যক,—তাহা হইলে ক্ষুদ্র কুটীরের অভ্যন্তরেও স্বর্গের সোপান উন্মুক্ত হইয়া যায়। আমরা যাহা কিছু করি—সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীরই হিত-সাধন করি, আর আমাদের পরিবারবর্গেরই হিত সাধন করি—তাহা যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ করিয়া করি, তবে তাহার ফল তাহাতেই পর্য্যাপ্ত না হইয়া অনন্তে গিয়া পৌঁছে। মনুষ্য অমৃতের অধিকারী—এইজন্য অমৃতধনের প্রতি লক্ষ করিয়া কার্য্য করাই মনুষ্যোচিত কার্য্য। অতএব অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মার প্রতি আত্মার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেও—তিনিই অক্ষয় অমৃত ধন। অদ্য এই শুভ মাঘের একাদশ দিবসে সেই অক্ষয় অমৃত ধন ভিন্ন আর কোন কিছুই যেন আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে স্থান না পায়। এই শুভ মুহূর্ত্তে আইস আমরা সরল হৃদয়ে নির্ম্মল চিত্তে এবং তদ্‌গত প্রাণে আমাদের সমস্ত প্রীতিভক্তি সেই পরম প্রভু পরমাত্মার চরণে সমর্পণ করিয়া পাপতাপ দুঃখ শোক জরা মৃত্যুর পরপারে উত্তীর্ণ হই।

হে পরমাত্মন্! দীন হৃদয়ে কৃপাবিন্দু প্রদান কর—ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমসুধা প্রদান কর; আমরা আমাদের হৃদয়ের আসন পাতিয়া দিতেছি—তুমি দেখা দিয়া আমাদের জ্ঞান-নেত্র সফল কর। তোমার দর্শন পাইলে আমরা কি ধন না পাই; তোমার অভয় আনন্দমূর্ত্তি আমাদের মোহ-অন্ধকারের আলোক; তোমার প্রসাদবারি আমাদের মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ; তোমার স্নেহ করুণা আমাদের প্রাণের সম্বল; তোমার প্রেমমুখ-জ্যোতি আমাদের আনন্দের প্রাতঃসূর্য্য। আজ আমরা সকলে মিলিয়া তোমার পূজা করিতেছি—তুমি আমাদিগকে দর্শন দিতেছ—আজ আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কত তোমার করুণা! তোমার এইরূপ করুণাতেই মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হয়; এইরূপ করুণাতেই হৃদয়-গ্রন্থি-সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়; এইরূপ করুণাতেই সংসার-সাগরের তুমুল তরঙ্গরাশি প্রশান্ত হইয়া যায়—চতুর্দ্দিকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। দীন জনের প্রতি করুণা করিয়া তুমি যখন তাহাকে দর্শন দান কর, তখন সে তোমার প্রেমে মৃত হইয়া তোমা ভিন্ন আর কোন কিছুই চাহে না—তোমার মুখজ্যোতিই তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব। চির দিনই যেন এইরূপ তোমার প্রেম-মুখজ্যোতি আমাদের পথের আলোক হয়—এই আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রদান কর, তাহা হইলেই আমাদের সকল দুঃখ—সকল অভাব—দূর হইয়া যায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহ পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত ও আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। লোকের সমাগম এত হয় যে ঐরূপ প্রকাণ্ড গৃহে তিলার্দ্ধেরও স্থান ছিল না। সুবিখ্যাত বক্তা বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রতাপ বাবুর বিলক্ষণ জ্ঞান কবিত্ব ও ভাষায় অধিকার আছে। ফলত তিনি স্বীয় বাক্‌শক্তি দ্বারা সভাস্থ সকলেরই যে চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি বারান্তরে তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিব।

প্রতাপ বাবুর বক্তৃতার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি নিম্নোক্তরূপ উদ্বোধন করিলেন।

আজি ব্রহ্মোৎসব। আজি আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে ভজরে ভবতারণে। আজি অন্তর বাহিরে তাঁহাকে দেখ। বাহিরে তাঁহার সেই মঙ্গল-হস্তের রচনার মধ্যে তাঁহাকে দেখ। "আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগৎ-মন্দিরে" অন্তরে এই হিরণ্ময় কোষ মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি কর। এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে শুদ্ধ বুদ্ধ অশরীর পরমাত্মাকে দেখ। "অনিমিষ আঁখি সেই কে দেখেছে, যে আঁখি জগৎ পানে চেয়ে রোয়েছে"। এমন অনিমিষ আঁখি আর কোথায় আছে? তিনি আমাদের প্রতি চাহিয়াই রহিয়াছেন, শুধু চাহিয়া রহিয়াছেন নহে, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাকে একবার এমন সময়ে ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিব না? হৃদয়-মধ্যে উপলব্ধি করিব না? কেবল বৃথা কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াই কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? শরীরকে অচলের ন্যায় ও মনকে দিক্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় স্থির করিয়া শ্রবণ কর—তিনি আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছেন, "ভক্তিযোগে ডাকিলে পরে থাকিতে পারি কৈ?" একবার ভক্তিযোগে তাঁহাকে ডাক। স্বর্গের দেবতারা যাঁহাকে নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, যে প্রেমাশ্রুতে তাঁহার প্রেম-মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, এস আমরা সকল সুহৃদে একবার উৎসবের সময় সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করি—যাঁহার চরণ পূজা করিয়া দেবতারা অমৃতানন্দ লাভ করিতেছেন, এস আমরা সকলে মিলিয়া অনন্যমনে ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণ পূজায় প্রবৃত্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বেদী হইতে একটী উপদেশ দেন। ইনি বহুকাল দেশবিদেশের নানা-সৎশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। এই জ্ঞান-গর্ভ উপদেশে তাহারই পরিচয়। আগামী বারে ইহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

অন্তঃপুরে মহিলা-সমাজ

স্ত্রীলোকের পঠিত উপদেশ।

ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা সকলে তাঁরই সন্তান। আজ আমাদের এত আনন্দ উৎসাহ কিসের? না, সারা বৎসরের পর সকল ভাই ভগিনীতে একত্রিত

হইয়া তাঁর পূজা করিতে, তাঁর গুণগান করিতে তাঁর কথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছি। আজ তাঁরই ডাকে আমরা মিলিত হইয়াছি, সংসারের কোলাহল হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁর প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছেন; এস আমরা হৃদয় খুলিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তাঁহার চরণে হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। বৎসরের মধ্যে এমন সুযোগ আর পাইব না, এমন শুভদিন আমাদের অদৃষ্টে আর আসিবে কি না কে জানে। তাঁহার সঙ্গে সংশ্রব যদিও আমাদের একদিনের জন্য নয়, চির দিনই তিনি আমাদের পিতা মাতা দেবতা, তাঁহাকে পূজা করা আমাদের প্রতিদিনের কর্ত্তব্য, তাঁহাকে প্রীতি করা আমাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য, কিন্তু আজিকার দিন আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন—তাঁহার পূজা করিবার জন্য আজ আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে, এখান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া না যাই, প্রতিদিন নির্জনে তাঁহার পূজা আরাধনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি, এখানকার বাহ্যাড়ম্বরেই হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া না থাকে, এই উৎসব কোলাহলের মধ্যে যে চিরনবীন স্নেহ আমাদিগকে পাপের পথ হইতে সত্যের পথে আহ্বান করিতেছে তাহা আমরা বিস্মৃত না হই।

আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে অল্পে অল্পে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান-লাভ-স্পৃহা দিন দিন বলবতী হইতেছে, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে পরনিন্দা পরচর্চ্চার ভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছে। গৃহে কলহ, বিবাদ ও পরনিন্দা লইয়া তাঁহাদের সময় কাটান আবশ্যক হয় না; লেখাপড়া প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন হইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইলেও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির ভাব যদি মুছিয়া যায় তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ। বিদ্যাশিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে পরের উপকার দেশের উপকার এই সকল ভাব যেমন আসিতেছে, সেইরূপ জ্ঞান ধর্ম্মের প্রতি টানও আবশ্যক। আমরা যেন সেই মূল কারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি, সেই পূর্ণ মঙ্গলের মঙ্গল ভাবে অবিশ্বাস করিয়া হৃদয়ের সৌকুমার্য্য না হারাই। মানবেরা কতদিন হইতে তাঁহার সৃষ্টি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া সকল বিষয় জানিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও এ বিশাল সৃষ্টির একটী ক্ষুদ্রতম পরমাণুকেও কেহ সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। যিনি এই সমুদায় সৃষ্টির কারণ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলেই যাঁহার নিয়মের অধীন, তাঁহাতে অনুরাগ ভিন্ন কে তাঁহাকে পাইতে পারে? তিনি আমাদিগকে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সকলই দিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিব না, ভক্তিভরে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিব না, তবে আমরা এমন শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হইলাম কেন? ভক্তিভরে ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে চিরদিনই বর্ত্তমান—আমরাই তাঁহাকে হেলায় হারাই। জ্ঞানদ্বারা আমরা তাঁহাকে জানিতে পাই, কিন্তু প্রেম ভক্তি বিনা তাঁহার অপার আনন্দ অনুভব করা যায় না। তিনি আমাদের হৃদয়ে না চাহিতেই প্রেম দিয়া রাখিয়াছেন, প্রীতি ভক্তির ভাব আমাদের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া অঙ্কিত ক-

রিয়া দিয়াছেন, আপনার দোষে আমরা সেই প্রীতি-পুষ্প দিয়া তাঁহার চরণ পূজা হইতে বঞ্চিত হই কেন; সেই অপার্থিব অবিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারিণী হইয়াও পার্থিব সুখে আমরা ডুবিয়া থাকি কেন? পৃথিবীর তুচ্ছ ভালবাসার প্রতিদান দিবার জন্য আমরা ব্যাকুল, আর যিনি আমাদিগকে চিরকাল প্রেম দিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে কি হৃদয়ের প্রেম উপহার দিব না? বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আমরা যতই কেন যাহা বলি না, এই প্রেমভক্তির ভাব অশিক্ষিতদিগের নিকট হইতেও আমরা যথেষ্ট শিক্ষা করিতে পারি। ভক্তিভরে তাহারা বুকে হাঁটিয়া কত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে, আমরা এত শিক্ষালাভ করিয়াও যদি দিনান্তে একবার সেই প্রেমদাতাকে স্মরণ না করি, তবে আমাদের কি দুর্ভাগ্য! যাহাতে আমাদের চিরকালের মঙ্গল হইবে, আত্মার উন্নতি হইবে, সে সকল বিষয়ে আমরা অন্ধ থাকিতে চাই। আপনার দোষে সন্তান সন্ততিদিগেরও হৃদয়ের ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্তি পায় না এবং মানবের ভবিষ্যৎ উন্নতি স্রোত কতকটা রুদ্ধ হইয়া আসে। আমাদের এ ভ্রম কবে দূর হইবে? এস, সব ভগিনীতে মিলিয়া পিতার নিকটে আশীর্ব্বাদ চাহি, যাহাতে ধৈর্য্য ক্ষমা অভ্যাস করিয়া চরিত্রকে উন্নত করিতে পারি, বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারি, দীন দুঃখীকে দয়া ধর্ম্ম দ্বারা সুখী করিতে পারি, এবং যাহার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য তাহা পালন করিয়া তাঁরই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি।

ঈশ্বর! আমরা দুর্ব্বল, এই দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও যাহাতে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা প্রতিদিন তোমার উপাসনা করিতে পারি। আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। তুমি আমাদের পিতার পিতা পরমপিতা, তুমি আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু; তোমার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি গ্রহণ কর।

ভাই বোন সমিতি।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভাই বো'নেরা এক সঙ্গে মিলে-মিসে এই যে একটা সদনুষ্ঠানের গোড়া পত্তন করা হ'চ্চে—খুবই ভাল হ'চ্চে। ভালটা এই যে, উপস্থিত থেকে কাজ সুরু করা হ'চ্চে—উপস্থিত ছেড়ে অনুপস্থিতে হাত বাড়ানো হ'চ্চে না। টাট্‌কা টাট্‌কা নতুন—কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোলেই পোড়োদের নজর গুলো আত্যন্তিক ফালাও হ'য়ে ওঠে; তখন তাঁদের প্রতাপ দেখে কে—"মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার!" তাঁদের—ভায়েদের সঙ্গে—বাপ মা'য়ের সঙ্গে—হয় তো আদা-কাঁচকলা; অথচ তাঁরা পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্যকে প্রেম-পাশে আলিঙ্গন কর'বার জন্যে কোল পেতে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! তাঁরা পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্য জাতির কাঙ্গালী—ভাইবোনের কোন ধার ধারেন না! কিন্তু মনুষ্যজাতি তো আর গাছে ফলে না—মনুষ্য-থেকেই মনুষ্য জাতির গোড়া-পত্তন সুরু হয়। দশজন মিল্‌লেই একটা দল হয়, দশ দল মিল্‌লেই একটা সমাজ হয়, দশ সমাজ মিল্‌লেই একটা জাতি হয়। ভাই বো'ন থেকে অল্পে অল্পে পা বাড়া'তে সুরু ক'রে মনুষ্য জাতিতে পোঁছোতে হয়—তা গেল দূরে—আগেভাগেই মনুষ্য জাতি! গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁধি! আসল কথাটা কি তবে বলি শোনো;—প্রত্যেক মানুষেরই অন্তঃকরণের ভিতরের গোড়ায় কাণ পাত'লে মানুষ আর পশু দুয়েরই হাঁক ডাক শুন্‌তে পাওয়া যায়। ভালুক নাচ দেকেছ তো—একবার মানুষ ভালুককে নীচে ফেলে তার উপরে উঠ্‌চে, একবার ভালুক মানুষকে নীচে ফেলে তা'র উপরে উঠ্‌চে; প্রত্যেকের মনের ভিতর মানুষ আর পশুর মধ্যে অষ্ট প্রহর এইরূপ কোস্তাকুস্তি চল্‌চে; অন্তরের মানুষটি যদি অন্তরের পশুগুলোকে একবার বশ ক'রে ফেল্‌তে পারে—কা'উকে বা থাব্‌ড়া থুব্‌ড়ি দিয়ে—কা'রো বা গায়ে হাত বুলিয়ে—কাউকে বা ধমক ধামক দিয়ে—কারো উপরে বা চোক রাঙিয়ে—কাউকে বা চাবুক মেরে—কা-

উকে বা অঙ্কুশ মেরে—একবার যদি কোন রকম ক'রে পশুগুলোকে বশ ক'রে ফেল্‌তে পারে, তবে তাকে আর পায় কে? মনের বাঁদর তার কাচে এমনি পোষ মেনেচে—যে, আর সেটাকে দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌তে হয় না; অহংকারের বাঘ তার কাছে এমনি পোষ মেনেচে যে, আর তাকে পিঁজরের ভিতরে পুরে রাখ্‌তে হয় না; বুদ্ধির ঘোড়া তার কাছে এমনি পোষ মেনেচে যে, আর তা'র সইসের দরকার হয় না—আপনিই পথ চিনে চল্‌তে পারে;—এ যা'র হ'য়ে চুকেছে—সে-ই তো মহাপুরুষ! বাঘ যা'র ঘরের পোষা জন্তু, তা'র শত্রু তার কাছে এগো'তে সাহস পায় না—কি জানি যদি সে বাঘটাকে লেল্‌য়ো দেয়;—কিন্তু সে নিতান্ত উত্ত্যক্ত না হ'লে আর কারো উপরে বাঘ জারি করে না; কেন না, রক্তের আস্বাদ পেলে পোষা বাঘ বুনো হ'য়ে বেঁকে দাঁড়াতে কতক্ষণ? অন্তরস্থিত পশুগুলো যখন অন্তরস্থ মানুষটির অনুগত ভৃত্য হয়, তখনই মানুষটি মাথা তুলে দাঁড়ায়, ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মানুষের অন্তরস্থিত মানুষটিকে আমরা বলি—মনুষ্যত্ব, আর মানুষের অন্তরস্থিত পশুগুলোকে আমরা বলি—পশুত্ব। সেই যে অন্তরস্থিত মানুষ কিনা মনুষ্যত্ব, তা'রই দৌলতে মানুষ-মাত্রই পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সকল মনুষ্যেই মনুষ্যত্ব আছে, তাই সকল মনুষ্যই পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের বীজ মাটি চাপা রয়েছে—যেমন বেলা'র মনে; কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের অঙ্কুর দেখা দিয়েচে—যেমন দীনুর মনে; দীনু কোন খাবার জিনিস পেলে নলিনীকে তা'র ভাগ না দেওয়া কাপুরুষের কাজ মনে করে, কিন্তু সব সময়ে লোভ সাম্‌লাতে পারে না। কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের পাতা গজ্‌য়েচে বা গজাচ্চে—যেমন বর্ত্তমান সমিতির উদ্যোগী শ্রীমান্‌ বাবাজিদিগের অন্তঃকরণে; কে তাঁরা? না

হিতু নীতু ক্ষিতু কৃতু, সুরেন বিবি, বলু সুধী।
জ্যোৎস্না সরলা—কি আর বল্‌ব—সকলগুণে গুণাম্বুধি॥

কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের ফুল ফুটেচে, বা ফুট্‌চে; তাঁরা হ'চ্চেন এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষীয় গুরুলোক, তাঁদের গুণে গেঁথে নাম করাটা ভাল দেখায় না। কারো বা মনে মনুষ্যত্বের ফল ফলেচে বা ফল্‌চে; কিন্তু আছে সেটি সকল মানুষেরই অন্তঃকরণে। তাই বলি যে, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে প্রেমের টানাজালে হাৎড়্যে পাবার জন্যে সহরময় দাপ্‌টে বেড়াবার প্রয়োজন করে না—সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলী প্রত্যেক মানুষেরই মনের অন্তঃপুরে গোকুলে বাড়্‌চে—সেটি আর কিছু নয় অন্তরস্থিত মানুষ—মনুষ্যত্ব। এক দিন না একদিন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে উঠবেই উঠবে—তা যখন সে ক'রবে, তখন অন্তরস্থিত বাঘ ভাল্লুকগুলো একেবারেই তার পদানত দাস হ'য়ে প'ড়বে। সেই যে অন্তরস্থিত মনুষ্য কি না মনুষ্যত্ব—সেইটিই সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে প্রেমে বাঁধবার টানা জাল। সেই ভিতরের মানুষটিকে ভাল বাসলেই পৃথিবী-শুদ্ধ সমস্ত মানুষকে ভাল বাসা হয়—পর ভেবে অযত্ন ক'রলেই পৃথিবী-শুদ্ধ সমস্ত মনুষ্যকে পর ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়। একদিকে যেমন দেখা যায় যে, মনুষ্যত্ব আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-মহলে বর্ত্তমান র'য়েচে; আর এক দিকে তেমনি দেখা যায় যে, বাইরের পাঁচ জন মানুষের—বিশেষতঃ সাধু সজ্জনের—ভাব এবং কাজ দেখে তা-থেকেই আমরা মনুষ্যত্ব সংগ্রহ ক'রে এনে আপনার আপনার অন্তঃকরণের ভিতরে পুঁজি করি। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, মনুষ্যত্ব ব'লে যে একটি রত্ন আছে, সেটি বাইরে-থেকে সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে হ'লেও ভিতরে একজন জহরী আবশ্যক। কেননা ভিতরের জ্ঞানই বাহিরের পাঁচজনের জ্ঞানকে চিন্‌তে পারে, ভিতরের প্রেমই বাহিরের পাঁচ জনের প্রেমকে চিন্‌তে পারে, ভিতরের মনুষ্যই বাহিরের পাঁচ জন মানুষকে চিন্‌তে পারে; অজ্ঞান জ্ঞানকে চিন্‌তে পারে না, অপ্রেম প্রেমকে চিন্‌তে পারে না, পশু মানুষকে চিন্‌তে পারে না। ভিতরে যা'র মনুষ্যত্ব আছে সেই ব্যক্তিই মনু-

ষ্যত্ব দেখলে তৎক্ষণাৎ তা চিনে নিতে পারে। তাই বলি যে, মনুষ্য মাত্রেরই মনের ভিতরে মনুষ্যত্ব গোকুলে বাড়চে; পাঁচ জনের দেখে শুনেই হোক্—বা বিপদে প'ড়ে ঠেকে শিখেই হো'ক—বা সদ্গুরুর উপদেশেই হোক্—বা বই প'ড়েই হো'ক—কোন গতিকে সেই অন্তরস্থ মানুষটির চোক ফুটলেই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে উঠবে। ঘরের হাতি দিয়ে যেমন বনের হাতি ধ'রে এনে তাকে ঘরে পোষ মানাতে হয়, তেমনি, অন্তরের মনুষ্যত্ব দিয়ে বাহিরের মনুষ্যত্ব ধ'রে এনে তাকে অন্তরে পুষতে হয়। অতএব, মনুষ্যত্ব সবা'রই অন্তরে বর্ত্তমান আছে—বাইরের পাঁচ জনের মনুষ্যত্ব সেই অন্তরের মনুষ্যত্বেরই রসদ যোগায়। কিন্তু সেই যে দুর্লভ রত্ন মনুষ্যত্ব তা'র খনি কোথায়? তা'র খনি হ'চ্চে আত্মা। আত্মাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব;—আত্মাকে ছেড়ে মনুষ্যত্ব শুধু কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজ! আত্মা হ'তেই মনুষ্যোচিত কাজ ফুটে বেরোয়—আর, সেই মনুষ্যোচিত কাজের মধ্যেই আমরা মনুষ্যত্বের পরিচয় লাভ করি। কাউকে যদি দেখি যে, সে টাকার লোভ সাম্লাতে না পেরে চুরির পন্থায় ফির্চে—তবে সে যে তা'র কাজ সেটা মনুষ্যোচিত কাজ নয়—সেটা বিড়ালোচিত কাজ; পষ্টই দেখা যা'চ্চে যে, সেরূপ কাজে আত্মার কোন হাত নেই—বাহিরের জিনিসের প্রবল আকর্ষণই সে কাজের মূল। সেরূপ কার্য্য যে যখন করে, তখন তা'কে বাহিরের জিনিসের আকর্ষণ নাকে দড়ি দিয়ে চালায়। আর-এক ব্যক্তিকে যদি দেখি যে, সে ঈশ্বর-প্রেমে গদগদ হ'য়ে আপনার শত্রুর সঙ্গে ভায়ে'র মত ব্যবহার ক'চ্চে—তবে তার সে কাজটিতে বাহিরের জিনিসের কোন হাত নেই—আত্মাই সে কাজের হা'ল ধ'রে ব'সে আছে। এইরূপ আমরা পাচ্চি যে, মনুষ্যোচিত কার্য্যেই মনুষ্যত্ব হয়—আর, আত্মাই মনুষ্যোচিত কার্য্যের কর্ণধার; তবেই হ'চ্চে যে, আত্মা মূল—মনুষ্যত্ব তা'র ফল। পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্য-জাতির ভালবাসা থেকে আমরা চল্‌তে সুরু কল্লুম—চল্‌তে চল্‌তে শেষকালে আমরা আপনার আপনার ভিতর-মুলুকে আত্মাতে এসে পড়্‌লুম্। মনুষ্য-জাতি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে মনুষ্যত্ব বেরিয়ে পড়্‌লো—মনুষ্যত্ব খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে আত্মা বেরিয়ে পড়্‌লো—নির্জীব কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে জ্যান্ত সাপ বেরিয়ে প'ড়্‌লো; তোমরা দেখ্‌চি ভয়ে পিছোচ্চো—কিন্তু যদি তোমরা বীর-পুরুষ ও বীর-কন্যা হও তবে সাপের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভয় না পেয়ে —তা'র মাথা থেকে সাত রাজার ধন মাণিক সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে কোমর বেঁধে তাকে ঘিরে দাঁড়াও—তা'কে কোন মতেই পালাতে দিও না।

আমি চাই এই যে, তোমাদের এই ভাই বো'নের সমিতির মধ্যে-থেকে জাগ্রত জীবন্ত আত্মার ভাব প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুক্; সেই আত্মার ভাবটি প্রথমে জ্যান্ত সাপের মত ভয়ানক—কেননা প্রথমে সেটা প্রতি জনের স্বার্থের বিরোধে ফণা ধ'রে ওঠে। তুমি চাও যে, শুধু কেবল তোমারই ভাল হো'ক্, আর সকলের কারো কিছু হ'য়ে কাজ নেই; কিন্তু আত্মা বলে যে, সকলের ভালই তোমার ভাল; কেননা, সকল শরীরের পক্ষে যা ভাল—তা হাতেরও ভাল—পায়েরও ভাল—বুকেরও ভাল—মাথারও ভাল; কিন্তু যা শুধু কেবল জীভের পক্ষে ভাল কিন্তু পেটের পক্ষে এবং আর আর সমস্ত শরীরের পক্ষে খারাপ—তা সকলের পক্ষেই খারাপ—জীভের নিজের পক্ষেও খারাপ; কেননা, তাতে জীভেও ক্রমে ক্রমে এরূপ অরুচি ধরে—যে আগে যা তা'র কাছে মিষ্টি লাগ্‌তো, শেষে তাও তা'র কাছে তিতো হ'য়ে দাঁড়ায়। এই জন্য যাঁরা শুধু কেবল আপনার ভালটিই চেনেন—তাদের কাছে আত্মার ভাব জ্যান্ত সাপের মত ভয়ানক। কিন্তু যাঁরা সকলের ভাল'র সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভাল চা'ন—তাঁদের কাছে সাপটি নত-শির হ'য়ে আপনার মাথার মাণিকটি তাঁদের পদতলে ঢেলে দেয়। সে মাণিকটি সকল ঐশ্বর্য্যের

সেরা ঐশ্বর্য্য;—কি? না মনের অপরাজিত অদ্ভুত ক্ষমতা—যা'র প্রভাবে বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক মহিষ গণ্ডার সকলেই নতশির হ'য়ে মানুষের পা চাট্‌তে থাকে। বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক কি না মনের ব্যাঘ্র ভল্লুক—দ্বেষ হিংসা বিবাদ কলহ—ইত্যাদি। সকল শরীরের মধ্যে যেমন এক আত্মা—তেমনি তোমাদের সকলের মধ্যে এক আত্মা জেগে উঠুক্—তোমরা সকলে এ-কাত্মা হও। এই একাত্মভাবটি যখন তোমাদের মধ্যে দিয়ে রীতিমত ফুটে বেরো'বে—তখন তারই ভিতরে স্বর্গের সিঁড়ি খুলে যা'বে। কিন্তু সেই যে এ-কাত্মভাব তা শুধু মুখের একাত্ম-ভাব হ'লে চল্‌বে না—কাজের একাত্মভাব, প্রাণের একাত্মভাব এবং জ্ঞানের একাত্ম-ভাব হওয়া চাই;—সেটা যে, কি রূপ তা আরেক দিন ব'লবো; আজ কেবল একাত্ম-ভাবের ইঙ্গিত মাত্র ক'রে ক্ষান্ত হ'চ্চি;—এক দিনে সব কথা ব'লতে গেলে হয় তো সব কথাই এক সঙ্গে ঘুলিয়ে গিয়ে সবই ভণ্ডুল হ'য়ে যা'বে; তায় কাজ নেই—আজ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৬২৫ /০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৬৫২।৶১৫
সমষ্টি ...	৫২৭৭।৶১৫
ব্যয় ...	২৬৯৬ ৶ ৫
স্থিত	২৫৮১। ১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১২১৸৴১৫

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮০৯ শকের ফাল্গুন হইতে ১৮১০ শকের আশ্বিন পর্য্যন্ত	২৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " অনঙ্গমোহন চৌধুরী (ভূষভাণ্ডার)	২০৲
" " শম্ভুচন্দ্র মিত্র	৫৲
" " অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" " ভুবেশচন্দ্র বসু	২৲
" " হরকুমার সরকার (বোয়ালীয়া)	১৲
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲
" " হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১॥৶০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় (ক্ষেত্রপাড়া)	৬০৲
" " কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর)	১৲
" " ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস (উনাও)	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী	১৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ভবদেব নাথ (গোয়াড়ি)	৫৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	৩৲
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়	৪৶১৫
	১২১৸৴১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫১৩॥০
পুস্তকালয় ...	৬৬।৶১০
যন্ত্রালয় ..	১৬৮১॥ ১৫
গচ্ছিত ...	২০৮।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩২॥০
সমষ্টি	২৬২৫/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬৪৩৸৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৮৮ ৶৫
পুস্তকালয়	১২৪॥/১৫
যন্ত্রালয়	১৪২৬॥৫
গচ্ছিত	৫১॥৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩।/০
দাতব্য	৫৮৲
সমষ্টি	২৬৯৬৶৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৮ সংখ্যা　　　　১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বালি ধর্ম্মসভা।

দেখিতে দেখিতে বর্ষচক্র বিঘূর্ণিত হইয়া আমাদিগকে অত্রস্থ ধর্ম্মসভার ষষ্ঠ বৎসরে আনয়ন করিল, যোগানন্দ প্রেমানন্দের নবতর উৎস আমারদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, ভবিষ্যতের কল্যাণ-গর্ভ যবনিকা আমারদের সম্মুখে জ্বলন্ত আশা ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইল। আজ আমারদের আনন্দের সীমা কি! আজ স্বদেশ বিদেশস্থ বন্ধু বান্ধবে সম্মিলিত হইয়া যে শুভদিনের জন্য এতকাল সস্পৃহ ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম সেই শুভক্ষণে পবিত্র মুহূর্ত্তে তাঁহার নামগানে দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছি, এক হৃদয়ে এক প্রাণে জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহার অঙ্গুলির নির্দ্দেশের দিকে ধাবমান হইতেছি। বিষয়ের নীচ কামনা আমাদিগকে আর পশ্চাৎপদ করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে আমরা সংসারের অতীত দেশে বিচরণ করিতেছি, অন্তরে জাজ্জ্বল্যমান অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়-সিংহাসনে বর্ত্তমান, মর্ত্তের ক্ষুদ্র কীট হইয়াও আমারদের জ্ঞানচক্ষু তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়াছে, তাঁহার ও আমারদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই, একি দেবস্পৃহনীয় ব্যাপার। আমরা সেই বিশ্বজননী পরম মাতার উদার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার প্রেমমুখের উপরে সস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি, তাঁহার অনিমেষ নয়ন আমারদের দৃষ্টির উপরে নিপতিত রহিয়াছে, আমরা বিভোর হইয়া তাঁহাকেই দেখিতেছি, তাঁহাকেই ডাকিতেছি, বিষয়ের দারুণ কোলাহল আমাদিগের বধির কর্ণকে আর স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্যের নিদারুণ চিন্তা আমাদিগকে আর আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না; প্রসন্ন-জনন তাঁহার প্রেমমুখ দেখিয়া এখানকার সকল জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছি, একি অলৌকিক সম্মিলন।

আমরা অন্তরে যে ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ করিয়াছি এই ব্রাহ্মসমাজ তাহার বাহিরের বিকাশ মাত্র। আমরা যে ধর্ম্মভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, যে পরিশুদ্ধ বিমল আনন্দে আপনি অপার শান্তি লাভ করিতেছি, তাহা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সজন

নগরের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। নিজজীবনে কোন নূতন সত্য লাভ করিয়া যতদিন না আত্মীয় স্বজনের মধ্যগত হইয়া উপভোগ করি, ততদিন মনুষ্যহৃদয়ে শান্তি নাই। সেই জন্যই নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উপহাস অত্যাচার স্বীকার করিয়াও ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উজ্জ্বল আলোকমালায় বা প্রভূত আড়ম্বরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত লক্ষ্য প্রতিভাত হয় না, বক্তৃতার স্রোতে বা তর্কতরঙ্গে ইহার স্বর্গীয় ভাব বিকশিত হয় না। হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে দেবদেব মহাদেবকে বর্ত্তমান দেখিয়া গোপন নির্জ্জনে নিত্যকাল বা সায়ংসন্ধ্যায় তাঁহার সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া যে ধর্ম্মভাব পোষণ করিতেছিলাম, সাপ্তাহিক উপাসনায় বা আজিকার উৎসবে, সকল ভ্রাতার মধ্যে সেই স্বর্গীয় ভাবের বিনিময়ে আপনাকে সংস্কৃত করিয়া বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য, সকলকে এক পথের পথিক জানিয়া পথশ্রমকে বিদূরিত করিবার জন্য, সাংসারিক অভ্যুদয়ে বা বিপৎপাতে অপরের দৃষ্টান্তে বা উপদেশে আপনাকে গম্যপথে স্থির রাখিবার জন্য, অপরের জ্বলন্ত উৎসাহে আপনাকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই ঈদৃশ সাধু সম্মিলনের নিতান্ত প্রয়োজন। সেই জন্যই আজিকার এত উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি আমারদের মধ্যে জাগিতেছে।

এই আনন্দ কোলাহল এই উৎসব আমোদের মধ্যে যেন আমরা আপনাকে বিস্মৃত হইয়া শূন্য হৃদয় লইয়া ফিরিয়া না যাই। এই উৎসব আনন্দের মধ্যে যেন আমরা এই পবিত্র উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বিস্মৃত না হই। আজ আমারদের আধ্যাত্মিক ক্ষতিলাভ গণনার দিবস। সম্বৎসরকাল যাঁহার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া এই উৎসবক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি তাঁহার প্রতি আমারদের নির্ভরের ভাব কতদূর অগ্রসর হইল, হৃদয়সিংহাসনে তাঁহার জ্বলন্ত মূর্ত্তি কত সুস্পষ্টরূপে সন্দর্শন করিতে পারিলাম, তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস করিয়া পৃথিবীর প্রবল ঘূর্ণায় পতিত হইয়াও কিরূপ ধৈর্য্যের সহিত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম; ইন্দ্রিয়কুলের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মনতরীর হাল কিরূপ তৎপরতার সহিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিতে সক্ষম হইলাম, একাগ্রমনে কতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইয়া জীবনকে মধুময় করিতে সমর্থ হইলাম, অপরের জন্য অসঙ্কুচিত ভাবে কতদূর আত্মবিসর্জ্জনে কৃতকার্য্য হইলাম, আজ তাহারই আলোচনার দিবস। সম্বৎসরকাল যদি আপনাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখিয়া আধ্যাত্মিক বললাভে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, দিনে নিশীথে তাঁহার গুণগানে মনুষ্যজন্ম সফল করিয়া থাকি, যদি অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া—বিষয়-চিন্তা হইতে মনকে কতক পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইয়া থাকি তবে এ উৎসবের নিশা কি আনন্দের নিশা। এই সম্বৎসরকাল মধ্যে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের কত আবর্ত্তন হইয়া গেল, পক্ষমাস ঋতু ধরাতলকে স্পর্শ করিয়া আবার অসীম বেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল, জন্মবৃদ্ধির হাস্যোল্লাস, জরামৃত্যুর গগনভেদী আর্ত্তনাদে দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত হইল, এই সকল চঞ্চল ঘটনার মধ্যগত হইয়াও যদি আমরা সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি, যদি ধ্রুবসত্য সনাতনের প্রতি

আমারদের প্রেম-দৃষ্টি নিপতিত হইয়া না থাকে, যদি পুত্রকলত্রের বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারের সুখসম্পত্তিকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া থাকি, তবে এই ঘোর উৎসব-আনন্দের মধ্যে তীব্র গরল উত্থিত হইয়া গাঢ়নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া দিয়া—অনুতাপের ক্রন্দনে আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে, মোহ-যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া আমাদের মর্ম্মভেদী শোচনীয় অবস্থার দিকে নয়নকে আকৃষ্ট করিতে থাকিবে, মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সম্মুখে ধারণ করিবে। যাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পবিত্রতায় আপনাকে উন্নত করিয়াছেন, তাঁহারদেরই বিমল হৃদয়ে আজ স্বর্গের পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে, আর যাঁহারা সংসারের পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারদের অন্তরে উৎসবের পবিত্র ভাব প্রবল উদাস ঝটিকা উত্থিত করিয়া দিয়া তাঁহারদের অন্তরের শান্তি হরণ করিবে ও এককালে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিবে।

ধর্ম্মের এমনই পবিত্র ভাব, সত্যের এমনই স্বর্গীয় সুষমা, যে ইহার আলোচনা পাষাণহৃদয় ঘোর পাষণ্ডের মনকেও বিনা তর্কে আকুল করিয়া তোলে। যিনি অতুল সম্পদে স্ফীত হইয়া আপনাকে অবিনাশী জ্ঞান করিতেছেন, ঈশ্বরচর্চ্চার প্রতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকে স্পর্শ করিলেই তিনি সচকিত হইয়া উঠেন। যখন রাজগণরাজা ত্রিভুবন-পরিপালক ধর্ম্মরাজ্যের রাজা এবং যখন তিনি স্বয়ং ইহার প্রবর্ত্তক, তখন যে কীটাণুকীট ক্ষুদ্র মনুষ্য তাঁহার শাসন-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি যে তাঁহার রাজনিয়মসকল প্রতি হৃদয়ে জ্বলন্ত অবিনশ্বর অক্ষরে স্বয়ং মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, আমরা আপনার দোষে বিনা-কারণে রাজদ্রোহী হইয়া আপনার মস্তকে অজানিত বিপদ আপনা হইতে আনয়ন করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছি! তিনি যে তাঁহার উদার ক্রোড় আমারদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিত্য উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে সহজে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না! তিনি যে আমারদের আত্মাকে কত সূক্ষ্ম কৌশলে গঠিত করিয়া তাঁহাকে জানিবার প্রশস্ত অধিকারে অধিকারী করিয়াছেন, আমাদিগকে সকল জীবের রাজা করিয়া ধর্ম্মভাব সাধুভাবের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে গিয়া পৃথিবীর অনিত্য খ্যাতি প্রতিপত্তি যশোমান লাভে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি! তিনি যে আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া ধর্ম্মনিয়মের অধীন করিয়া দিলেন, আমরা সকল নিয়মের শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছি! সেই পুণ্যপাপদর্শী পরমেশ্বর সকলই দেখিতেছেন সকলই জানিতেছেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিব না। আমারদের একি মোহ! আমারদের কি দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান হইবে না। আমরা কি চিরকাল পতঙ্গের ন্যায় অনলে আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়া বিনা কারণে দগ্ধ হইতে থাকিব!

চিরনিদ্র বিষয়ীর মোহনিদ্রা অপসারিত করিয়া তাহাকে সচকিত করিবার জন্য, ঈশ্বরপ্রেমী পুণ্যাত্মার উৎসাহজনক

মুখশ্রীকে আরও প্রফুল্লিত করিবার জন্য এখানকার উৎসব দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এখানে ধনী দরিদ্র পাপী পুণ্যবান কাহারও আসিবার বাধা নাই, সকলে নিজ নিজ অতীত জীবন আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত কর। উঠ, জাগ্রত হও, আর কতকাল মোহে অভিভূত থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি";

উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া পরা বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ কর, সাধুসঙ্গে হৃদয়ের মলা প্রক্ষালিত কর, তুমি যে পথে পদার্পণ করিবে সেই ধর্ম্মপথ অতিশয় দুর্গম, পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হও। পণ্ডিতেরা এ পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, যিনি ভূমা যিনি মহান তিনিই সুখ স্বরূপ, তাঁহার ভজন সাধনে আপনাকে নিয়োগ কর, নশ্বর ক্ষুদ্র পদার্থে বা চঞ্চল মনুষ্যের প্রেমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাতেই উন্মত্ত হইয়া প্রতারিত হইও না। সংসার ভয়াবহ মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি; এখানে যাহার জন্ম তাহার ক্ষয়, যাহার জয় পরক্ষণে তাহারই পরাজয়। গঙ্গাস্রোতের ন্যায় এমন চঞ্চল অবস্থার উপরে আপনার সুখের ভিত্তি নিখাত করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইও না। সময় থাকিতে থাকিতে প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নির্ভয় হও। তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সঙ্গে আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছার সম্মিলনে বিপদের কঠোরতা বিদূরিত কর, যে শোক সন্তাপের তীব্রতা ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তাঁহাকে জ্বালা যন্ত্রণার অভেদ্য দুর্গ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

আমরা পবিত্র ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কালের করাল মুখব্যাদানে তাঁহারদের কীর্ত্তি কলাপ সকলই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে পবিত্র তেজীয়ান মন্ত্রে স্বরস্বতী-কূল প্রতিধ্বনিত করিতেন, বেদ উপনিষদনিহিত সেই সকল অমূল্য রত্নের সিদ্ধবিদ্যার অধিকারী হইয়া আমরা তাঁহারদের পবিত্র প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ বহু শতাব্দী পরে সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আর্য্যকুল-দেবতার আরাধনা করিতেছি। আমরা গভীর সাধনায় পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণলভ্য তাঁহারদের ও আমারদের নিজস্ব কুলদেবতাকে লাভ করিতে পারিব, এই আমারদের আন্তরিক বিশ্বাস। সেই জন্যই আমরা তাঁহারদের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেছি, বিশ্বাস ও কার্য্যে তাঁহারদের আর্য্যভাব রক্ষা করিতেছি। সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন সময়ে তাঁহারা ঈশ্বরলাভে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, যে এই ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞানালোকপরিপূর্ণ সভ্য সমাজ তাহা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই সাধন তপস্যায় প্রকৃত হিন্দুভাব রক্ষা করিতে আমরা এত ব্যাকুল, তাঁহারদের পদানুসরণ করিতে এত ব্যস্ত।

আমরা জড়শরীর মন ও আত্মার সমষ্টি। ব্যায়াম শিক্ষা ও অঙ্গসঞ্চালনে যেমন শারীরিক বল পরিবর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে যেমন মানসিক সৌন্দর্য্য পূর্ণায়তন লাভ করে, তেমনই ঈশ্বরচিন্তা ও তদানুসঙ্গিক শ্রদ্ধা ভক্তিরও স্নেহমমতার বর্দ্ধনে মনুষ্যের আত্মা স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে। শরীরের সঙ্গে আমারদের অনিত্য সম্বন্ধ, আত্মা এখানকার সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলাফল ভোগ করিতে করিতে ইহলোক

হইতে লোকান্তরে গমন করিবে। শরীর পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইবে। যিনি আমারদের চিরসঙ্গী, যিনি আমারদের ইহকালের নিয়ন্তা পরকালের সহায় ইহজীবনের বিনাশেও যেন সেই অমূল্য রত্নকে ক্রয় করি। যাঁহা হইতে শরীর মন প্রাপ্ত হইয়াছি আইস তাঁহারই কার্য্যে ইহাকে আহুতি দিয়া আত্মার প্রাণকে পরিপুষ্ট করি। মৃত্যু আসিয়া বাধ্য করিবার পূর্ব্বেই আইস আমরা সহজে তাঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ করি। মায়াময় সংসারের সেবাতেই আমারদের প্রকৃত অধীনতা, তাঁহাকে প্রীতি করায় ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই আমারদের প্রকৃত স্বাধীনতা। তাঁহার কার্য্যেই মনুষ্য ভূমানন্দ লাভ করিতে পারে, এ আনন্দের বিরাম নাই, দেবতারাও এ আনন্দের ভিখারী।

আমরা এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যেন ধর্ম্মমদে উন্মত্ত হওত সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট না হই,ধর্ম্মোন্মাদের কুজ্ঝটিকা আমারদের গন্তব্য পথকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, হৃদয়কে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তোলে, হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব হইতে মনুষ্যকে পরিভ্রষ্ট করে। যাহা ধর্ম্মের প্রতিরূপক বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া আমারদের সম্মুখে প্রতিভাসিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, বাহিরের আড়ম্বরের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনে যতই বহির্মুখী ভাব প্রবল হইবে ততই মনে করিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনের ভাব খর্ব্ব হইতেছে। আমরা বহুকাল পরে বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি, অসূয়া পরনিন্দা যেন আমারদের মধ্যে স্থান না পায়। শান্তোদান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। অন্তরিন্দ্রিয়লৌল্য হইতে মনকে নিবৃত্ত কর, বহিরিন্দ্রিয়গণকে শাসন কর, যুক্তমনা যুক্তকর্ম্মা হও, ক্ষমাপরায়ণ হও, তবে আত্মরূপ দর্পণে পরমাত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখিবে। চিত্তক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়া তাহাতে ব্রহ্মরূপ বীজ নিহিত করিলে কালসহকারে উহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আপনার কাতর প্রাণকে শীতল করিতে পারিবে নহিলে ব্রহ্মসাধন বিড়ম্বনা মাত্র।

হে পরমাত্মন্! ব্রহ্মসাধনের কঠোরতা জানিয়াও আমরা তোমার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন আপনার দুর্ব্বলতার উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আর পরিত্রাণের কোন আশা থাকে না। তুমি আমারদের সর্ব্বস্ব, তুমি তোমার পবিত্র স্বরূপের দিকে আহ্বান না করিলে আমরা আপনা হইতে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি না। আমারদের প্রাণের এমন কি মূল্য, আমারদের সাধনের এমন কি প্রভাব যাহাতে তোমাসম অমূল্য রত্নকে লাভ করিয়া কৃতপুণ্য হইতে পারি। তুমি আমাদিগকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া দাও; ধর্ম্মভাব ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদীপ্ত কর, তোমার সংমোহন মূর্ত্তি দেখাইয়া আমারদের নয়নকে এমনই শীতল কর, যেন আর পৃথিবীর দিকে আমরা ফিরিয়া না যাই। যাঁহারা ধর্ম্মবলে উন্নত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আনন্দের পর আনন্দ বিধান করিয়া তোমার দিকে আরও আকৃষ্ট কর। যাঁহারা তোমার অজস্র করুণার মধ্যে থাকিয়াও তোমার প্রতি বিমুখ, মাতা যেরূপ রুগ্ন সন্তানদিগের প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করেন তেমনই তাহাদিগকে তোমার আলিঙ্গন-পাশে গাঢ়রূপে আবদ্ধ কর, সস্নেহ বচনে হস্তধারণ করিয়া তাহা-

দিগকে তোমার পথের পথিক কর। তোমার করুণাই আমারদের আশা ভরসা সকলই। তোমার দয়ায় শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর আমারদের মৃতপ্রায় অসাড় আত্মা হইতে কি প্রার্থনা ধ্বনি উত্থিত হইয়া তোমার পাদমূল স্পর্শ করিবে না, আমারদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনবরত মধুর ব্রহ্মনাম নিনাদিত হইবে না। আমরা তোমার অধম সন্তান, তোমার সৃষ্টি রাজ্যের ক্ষুদ্র বালুকণা। তুমি আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দাও যেন লোকলোকান্তরে তোমার নাম গাহিতে গাহিতে, তোমার পবিত্র নাম মহীয়ান করিতে করিতে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারি। তোমার দ্বারের ভিখারী হইলে কেহ শূন্য হৃদয়ে শূন্য হস্তে প্রতিনিবৃত্ত হয় না এই বিশ্বাসে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আস্তিক্য বুদ্ধি।

মনুষ্যের সঙ্গে বাহিরের যতটুকু ঘনিস্ট যোগ, তাহা হইতেই সে স্পস্ট দেখিতে পায় যে সে আপনাতে আপনি পূর্ণ নহে। আহার, বিহার, শয়ন উপবেশন, স্বাস্থ্যলাভ সুখবর্দ্ধন সকল বিষয়েই সে বাহ্য জগতের মুখাপেক্ষী। বাহ্য জগতের ক্রোড়ে এইরূপ লালিত পালিত হইতে হইতে তাহার মনে আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়; কোথায় হইতে বা আমি আসিলাম, বাহ্য জগত বা কোথা হইতে আসিল? যতদিন না তাহার মনে এক সরল মীমাংসা স্থান পায়, ততদিন আর তাহার প্রাণের ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি নাই। আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয় হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে সে দেখিতে পায় যে, আমি দেশ কালে বদ্ধ, আমি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসি নাই, সংসার-প্রবাসে কতদিন আমাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে আমার পিপাসা ভৌতিক উপাদানে কিরূপে শান্ত হইবে তাহাও জ্ঞাত নহি। আমি চারিদিকে একটি দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, সহস্র চেস্টা করিয়াও তাহার অতীত দেশে গমন করা আমার পক্ষে যার পর নাই দুঃসাধ্য। এ সীমা কোথা হইতে আসিল? বাহ্য জগতকে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের শৃঙ্খল কে পরাইয়া দিল?

আপনার অস্তিত্বের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই আমি পিতা হইতে, পিতা পিতামহ হইতে, তিনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে হইলে আমরা একটি অনন্তকালব্যাপ্য জীবপ্রবাহ বা কারণ-প্রবাহ দেখিতে পাই, অথচ এমন একটু স্থান দেখিতে পাই না যেখানে গিয়া স্থির হইতে পারি। এরূপ পশ্চাৎগমন আমারদের বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন রূপ আনুকূল্য করে না, অথচ অকারণ জীবপ্রবাহের বা সসীম কারণ-প্রবাহের অনন্তত্ব মানিয়া লইতে হয়। তর্ক শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সসীমের পশ্চাদ্ধাবনে উহার অন্তরালে প্রস্তাবিত বিষয়ের সদুত্তর প্রাপ্ত না হইয়া যখন আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকি, তখন আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ এক আদি কারণের দিকে আমারদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাঁহাতেই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই, ইহাঁকে ছাড়িয়া যে দিকে গমন করি, সেই দিকেই কুজ্‌ঝটিকা

আসিয়া মীমাংসার পথকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

ক্রমে সুস্পষ্ট বুঝিতে থাকি যে এই প্রকাণ্ড বিশ্বচক্রের আদি কারণ অসীম, অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয়, স্বাবলম্ব, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বদর্শী। ইনি ধ্রুব সত্য সনাতন। ঋষিরা ইহাকে সকলের কারণ সকলের একমাত্র আধার ও নিদানভূত জানিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" কেবল তাঁহার কিরণে জগৎ সংসার প্রকাশিত হইতেছে। বাস্তব সত্ত্বা একমাত্র তাঁহারই।

বস্তুত অনাদিমৎ কারণ অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক যে ইহার জন্য কোন রূপ প্রমাণ আবশ্যক করে না। ঈশ্বরের ক্ষমতা বা নৈপুণ্য যাহা সৃষ্টি-কৌশলে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিচায়ক বটে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস যারপর নাই স্বাভাবিক। সসীম জগৎ সংসারে তাঁহার অনুপম সৃষ্টি-চাতুর্য্য এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ীকৃত করে এই মাত্র! নয়ন উন্মীলন করিলে স্থাবর জঙ্গম ভূচর খেচর সমুদয় জীব জন্তুই তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অন্তরে তাঁহার অস্তিত্বের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়া দেয়, তাঁহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে, তাঁহার উপর নির্ভরের ভাবকে প্রশস্ত করিয়া তোলে। যখনই আমরা সসীমকে দেখি, তখনই উহার অবলম্বন অসীমের সত্ত্বা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আপনার কক্ষপথ হইতে বিচলিত হইতেছে না, সূর্য্য পৃথিবীকে আপনার পথ হইতে রেখামাত্র স্খলিতপদ হইতে দেয় না। বৃক্ষ লতা পাদ দ্বারা রসাকর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, নর নারী পশু পক্ষী ফল মূলাহারে জীবিত থাকে। মেঘ বারিধারা বর্ষণে শুষ্ক পৃথিবীকে সিক্ত করে। সূর্য্যের দারুণ উত্তাপে আকাশমণ্ডলে মেঘমালা সঞ্চিত হইতে থাকে। জলদরাশি বায়ুবেগে পর্ব্বতের বক্ষে আহত হইয়া জলরূপে পরিণত হইয়া নদ নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইরূপে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে সূক্ষ্ম যোগে আবদ্ধ, কেহই স্বাধীন নহে। সকলেই অপরের মুখ চাখিয়া রহিয়াছে। সুতরাং একজন নিরবলম্ব কারণ বা পুরুষ ইহার পশ্চাতে থাকিয়া ইহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন। যে আপনি পরাধীন সে কেমন করিয়া আপনার বলে আপনি তিষ্ঠিতে পারে।

আমরা কোন স্বাধীন পুরুষকে দেখিতে পাই নাই বলিয়া কি তাঁর সত্ত্বা নাই। আদি কারণকে বিশেষ রূপে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই বলিয়া কি তাঁহার আস্তিত্ব নাই? তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির বহুদূরে বর্ত্তমান বলিয়া কি তাঁহাকে অগম্যবোধে একবারে পরিত্যাগ করিব? তর্কশাস্ত্র ততদূর উঠিতে পারে না বলিয়া কি তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইব? হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর সে অসঙ্কুচিত ভাবে বলিবে যে ঈশ্বর-বিষয়ক সত্যান্বেষণের অন্যবিধ উপায় আমারদের বুদ্ধির মূলেই বর্ত্তমান। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বিমল জ্যোৎস্নায় অন্তর্দ্দেশ আপনা হইতেই আলোকিত। সকল জড় আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার প্রখর আলোকে অন্তর্দ্দেশ জ্যোতিষ্মান রহিয়াছে। অনন্তের অসীম মহিমার প্রতিবিম্ব আপনা হইতেই হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে।

সকল দেশের সকল কালের সকল মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সকল মনুষ্যে সমান পরিস্ফুট নহে। অসভ্য বর্ব্বরেরা মেঘ বজ্র, বায়ু বরুণের প্রচণ্ড ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ঈশ্বর বোধে তাহারদেরই অর্চ্চনা করে। অপেক্ষাকৃত সুসভ্যেরা আপনার সাদৃশ্যে গঠিত মৃণ্ময় ও দারুময় প্রতিমায় ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহার স্তুতিবন্দনায় কৃতার্থম্মন্য হয়। কেহ বা মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত বা তাঁহার অবতার বোধে সাধনার পথকে অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া তোলে। জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ইহারদের অতীত জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি মানস উপচারে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া, তাঁহার সহিত স্থায়ী অধ্যাত্মযোগ সংস্থাপনে ব্যাকুল অন্তরে সাধন তপস্যায় নিযুক্ত হন। মনুষ্য এইরূপে বিভিন্নপন্থী হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একবারে উদাসীন নহেন। যদি তিনি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার বা ধন সম্পদের অস্থায়ী ছায়ায় আপনাকে সুখী ও নিরাপদ জ্ঞান করেন, বিপদের ঘোর কশাঘাতে তাঁহার জ্ঞানের উদ্রেক হয়। তিনি ভগ্নতরী নাবিকের ন্যায় আপনাকে অসহায় দেখিয়া বিপদের কাণ্ডারী ধ্রুব সত্যের সাহায্য পাইবার জন্য সহজেই অগ্রসর হইতে থাকেন। বিপদের তীব্র ঘূর্ণা নাস্তিকগণের বিষম পরীক্ষার স্থল! এ পরীক্ষায় কাহাকেও জয়লাভ করিয়া নাস্তিকতার রাজ্য বিস্তার করিতে দেখা যায় না। যতকাল শরীরে বিলক্ষণ সামার্থ্য থাকে, যতকাল আপনার শক্তি সামর্থে পৃথিবীতে অশেষ সুখ সম্পদ, স্ত্রী পুত্র পরিবার বিপুল যশোমান খ্যাতি অর্জ্জিত হয়, ততকাল মনুষ্যের ঘোর মোহের অবস্থা। সে সর্ব্ব-সুখদাতা ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখিবে না, সে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। ক্রমে যখন একটি বন্ধুর বিনাশে, সামান্য যশোহানির সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য জগতে অনিত্য সুখ শান্তির মধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হয়; তখন তাহার মোহনিদ্রার অবসানে চৈতন্যের আগম হইতে থাকে, আত্মার ক্ষুধা প্রদীপ্ত হইতে থাকে ও তাহার সকল প্রহেলিকা অন্তর্হিত হয়। এই জন্য মনুষ্য সম্পদ অপেক্ষা বিপদে, যৌবন অপেক্ষা বার্দ্ধক্যে; সবল অপেক্ষা দুর্ব্বল অবস্থায় তাঁহার দিকে ধাবমান হয়। যিনি পার্থিব সম্পদের পরিণাম পূর্ব্ব হইতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনের প্রারম্ভ হইতেই গন্য পথকে নিয়মিত করিয়া লইতে পারেন তিনিই ধন্য!

মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের বা বিশ্বাসের সত্ত্বা বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে এক স্থূল বিশ্বাস মনুষ্য মাত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঘোর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বর্ব্বর জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে ভাষার সম্পূর্ণ ব্যবহার তাহারদের মধ্যে স্থান পায় নাই, অথচ ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর শ্বাপদসঙ্কুল গাঢ় অরণ্য সমন্বিত এ পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে? এ প্রশ্ন যে তাহারা কখন জিজ্ঞাসিত হইবে হয়ত মনে কখন নিমেষের মধ্যে তাহা স্থান দেয় নাই, স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেকের জন্য অন্য কার্য্য বিস্মৃত হইল, একবার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিল, পরক্ষণেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আকাশকে দেখাইয়া দিল। আকাশ অপেক্ষা তাহার সম্মুখে অনন্তের পরিস্ফুট ছায়া

আর কোথা পাইবে। এই জন্যই তাঁহার অঙ্গুলি সহজেই আকাশকে দেখাইয়া দেয়।

ঐশ্বরিক জ্ঞানের এরূপ স্থূল বিশ্বাস মনুষ্য মাত্রেরই নিজস্ব ধন। এই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন মনুষ্যজাতির চেষ্টা ও যত্ন-সাপেক্ষ। জ্ঞানের ও শিক্ষার উন্নতির সহিত বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান পূর্ণাবয়ব লাভ করিতে থাকে। এই জন্যই মনুষ্য জাতির উন্নতির ইতিহাসের প্রতি অঙ্কে এই মত ও বিশ্বাসের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সামান্য বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেমন কালসহকারে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞানের নৈসর্গিক বীজ কাল সহকারে স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে ধ্যান ধারণা সাধন তপস্যার বিবিধ ক্রম তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ীভূত হইতে থাকে। যে দেশে যে কালে এই জ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইতে থাকে সেই দেশেই ঈশ্বরের যথার্থস্বরূপ মানব হৃদয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পথ জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া দেয়। আমরা আর্য্য সন্তান। এই আর্য্যভূমি যে এক কালে সভ্যতার উন্নততম মঞ্চে আরোহণ করিয়া পরা বিদ্যার প্রকৃষ্ট চর্চ্চায় আপনাকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, এখানকার জ্ঞান বিজ্ঞান, চিকিৎসা বা দর্শন, কাব্য বা জ্যোতিষ, নাটক ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস ও সংহিতাই তাহার প্রকৃত পরীক্ষার স্থল। ধর্ম্মভাব ঈশ্বরপ্রেম আর্য্যসন্তানগণের অস্থি মজ্জায় এমনই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল যে তাঁহারা যাহা বলিতেন যাহা করিতেন তাহা হইতে ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিতেন না। বৃক্ষের পত্রে পতঙ্গের পতত্রে হিমালয়ের গগনস্পর্শী উচ্চতায় সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিদ্যুতের চাকচিক্যে, বজ্রের হৃদয়ভেদী নিনাদে, প্রভঞ্জনের দারুণ আঘাতে কেবল তাঁহারই বিকাশ দেখিতে পাইতেন।

ভূতত্ত্ব, রসায়ন,ভূগোল খগোল, জ্যোতিষ ও পদার্থদর্শনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই আমরা জগতের মধ্যে একটি সুন্দর অভিপ্রায়ের পরিচয় পাইতে থাকি ; যতই আপাত-প্রতীয়মান বিশৃঙ্খলতার মধ্যে একটি শৃঙ্খলের সূত্র দেখিতে পাই ততই ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ততই ঈশ্বরের সুমহান মঙ্গলভাব অন্তরে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে; তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে নিষ্ঠা স্থাপন না করিলে, বিপদে শান্তি নাই, রোগে সান্ত্বনা নাই ; দুর্জ্জয় শোক অপনয়নের উপায় নাই, আত্মার ক্ষুধা তৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস দুর্জ্জয় মহাপ্রলয়ের তীক্ষ্ণবীর্য্য মৃদু করিয়া আনে, দীপ্তশিরা হইলে শান্তিবারি বর্ষণে উহার কঠোরতা নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। সকল জ্ঞান সকল বিদ্যা সকল তত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উহারদের পূর্ণতা সম্পাদন করে। তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে স্থিরনিশ্চয় হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞান ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে প্রধাবিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের এমনই সহজ এমনই স্বাভাবিক যে ইহা অদ্যাবধি এই জ্ঞানগর্ব্বিত শতাব্দীর কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরোধী নহে। এবং নিসংশয়চিত্তে ইহা বলা যাইতে পারে যে কোন কালে ইহা অপর বিদ্যার বিসম্বাদী হইয়া দাঁড়াইবে না। ঈশ্বর যখন জড় জগতের রাজা, প্রাণীরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর, সৃষ্টিকৌশলে তাঁহারই প্রদত্ত নিয়মাবলীর অতি অল্প অংশই যখন

মনুষ্যের সকল বিদ্যার আলোচনার ও উদ্ভাবনার বিষয়, কেবল একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছা যখন জগতে কার্য্য করিতেছে, তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদের কারণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আমাদের যৎসামান্য জ্ঞানে স্ফীত হইয়া আমারদের ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তকে কি তাঁহার ধ্রুব ও উজ্জ্বল সত্ত্বার পরিমাপক করিব, তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞানের তলস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইব। ঋষিরা তাঁহাকে স্বল্প জ্ঞান বুদ্ধির অতীত জানিয়া স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন "নৈষা-মতি তর্কেণাপনয়া" তাঁহারা পরীক্ষা যোগে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তর্কের দ্বারা পাইবার উপায় নাই।"

যতই ভৌতিক জগতের কৌশলের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে থাকি, আত্মার ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে ততই ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার স্বরূপে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে থাকে। এই জন্যই পৃথিবীর চক্ষে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে জড়বাদ, প্রতিমাপূজা, অবতারবাদ ও পবিত্র ব্রহ্মপূজা স্থান পাইয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মপূজাই পৃথিবীর জ্ঞানোন্নত বয়সের ধর্ম্ম। যতই জ্ঞানালোচনা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকিবে, যতকাল সাধন তপস্যা ঈশ্বরচিন্তায় মনুষ্যের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা থাকিবে ততকাল পবিত্র একেশ্বরোপাসনা উন্নতমস্তকে রাজত্ব করিবে। কেহই ইহার পবিত্র মূর্ত্তিকে ম্লান করিতে পারিবে না।

পাপে কলঙ্কিত হইলে কাহার রুদ্র মূর্ত্তি আমারদের সম্মুখে দেখিতে পাই? গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কাহার উদ্যত বজ্র আমারদের মস্তকে পতনোন্মুখ দেখি? আমরা স্বাধীন প্রকৃতির জীব হইয়াও কাহার শাসনভয়ে অন্যায্য কর্ম্মের প্রারম্ভেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি? ন্যায় রাজ্যের ন্যায়-দণ্ড কাহারও কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে তবে কেন আমরা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া অনুতাপানলে ভস্ম হইতে থাকি? ন্যায় কার্য্যের দিকে কেন বা আমরা সহজে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি? পৃথিবীর উপরে কি কোন রাজা নাই? আমারদের ন্যায় অন্যায় কর্ম্মের কি কেহ দণ্ডদাতা পুরস্কর্ত্তা নাই? আমরা কি আপন আপন প্রকৃতির স্রোতে অবাধে ভাসমান হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি? ইহা যদি সত্য হয়, তবে জগৎ বলিবে আমি মিথ্যা।

জড় জগৎ একই নিয়মে পরিচালিত হইয়া অনন্তের দিকে বেগে ধাবমান হইতেছে। এখানকার কোন বস্তুই অখণ্ড নিয়মাবলী হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত হইবে না। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ একই নিয়মের দাস। তাহারা একই ভাবে একই নিয়মে একই বৃত্তের অন্তর্ভূত হইয়া জীবনের তাবৎকাল অতিবাহিত করিয়া দিয়া এখান হইতে চলিয়া যায়। তবে কি মনুষ্য সকল নিয়মের অতীত? যেখানকার কীট কীটাণু বালুকণার মধ্যে শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, সেখানকার জীবজগতের রাজা মনুষ্যের মধ্যে কি তদ্রূপ কোন শৃঙ্খলার সত্ত্বা নাই। মনুষ্য কি আপনার বলে আপনার ইচ্ছায় এখানে আসিয়া আপনার পরাক্রমে আপনার ক্ষমতায় জীবিত রহিয়াছে। তবে কেন জরামৃত্যু বাল্য যৌবন তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তবে কেন শারীরিক নিয়মভঙ্গে দেহপিঞ্জর অশেষ ব্যাধির আধার হয়। তবে কেন ন্যায়পথ হইতে বিচলিত হইলে হৃদয়ের তাড়না সহ্য করিতে হয়। ইহলোকে ধর্ম্মের পুরস্কার পাপের দণ্ড যথা-উপযুক্তরূপে প্রাপ্ত না হইয়া কেন বা স্থানবিশেষে অধার্ম্মিকের জয় ধার্ম্মিকের পরাজয় দেখিতে পাই। এইরূপ আপাত

প্রতীয়মান অসঙ্গতি কি পরকালকে অপেক্ষা করে না, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ধ্রুব-বিশ্বাস তাঁহার ন্যায়পরায়ণতায় অবিচলিত নিষ্ঠা আছে বলিয়াই মনুষ্য সহস্র কষ্ট ক্লেশের মধ্যেও ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকে। এখানে ধর্ম্মের পুরস্কার প্রাপ্ত না হইয়াও অদৃশ্য পরলোকে ধর্ম্মের ন্যায্য পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করিতে থাকে।

আমরা দুর্ব্বল জীব, আমারদের পদে পদে বিঘ্ন পদে পদে বিপদ। বিপদের ভীষণ ভ্রূকুটীর মধ্যে আমরা তাঁহাতে নিরাপদ দুর্গ দেখিতে পাই! এখানকার সকল আশা ভরসা তিরোহিত হইলেও আমরা তাঁহাকে ছাড়ি না ইহাই আমারদের আত্মার প্রকৃতি। এই জন্যই ঘোর বিপদের সময় আমারদের ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে তাঁহার নাম সঘন উচ্চারিত হইতে থাকে। যখনই আমারদের দুর্ব্বলতা প্রতীয়মান হয় তখনই তাঁহার উপর নির্ভরের ভাব সহজেই মনে স্থান পায়।

অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির কার্য্যকলাপে তাঁহার প্রতি আমারদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহজেই ধাবিত হয়। যখন আমরা অভ্রভেদী হিমালয়ে বা নীলাকাশে দৃষ্টিপাত করি তখন উহার গাম্ভীর্য্য উহার উচ্চতা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনা ঘোর নাস্তিকেরও পাষাণসমান হৃদয়কে আকুল করিয়া তোলে। যদিও তাহা সাময়িক, তথাপি উহার অজেয় ক্ষমতা মর্ম্মের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিবেই করিবে। ঈশ্বর-বিষয়ক সঙ্গীতের অপরিমেয় ক্ষমতা নাস্তিককেও যেন পৃথিবীর উপরিতন জগতে লইয়া যায়। ঈদৃশ দৃষ্টান্তেরও অপ্রাচুর্য্য নাই। সেই জন্যই বলা যাইতেছে যে মহান ও অনন্তের দিকে মনুষ্যের স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধা নিহিত রহিয়াছে। এবং ঈশ্বরের মহান ভাবে বিশ্বাসই এই ভক্তি শ্রদ্ধাকে চিরতৃপ্ত করিতে পারে।

যদি বা আমরা কখন তর্কদ্বারা তাঁহার অস্তিত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা করি, এবং বিফল-মনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হই তবে সে দোষ আমার ক্ষীণ বুদ্ধির অনধিকার চর্চ্চার। যাঁহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ তাঁহাকে নিজ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই যে এরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব আমার ক্ষুদ্র শক্তির দূরবগম্য হইল বলিয়া কি তাহার বিষয়ে সন্দিহান হইব? আমরা মর্ত্ত্যের ধূলিকণা হইয়া কি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা বিধাতাকে উড়াইয়া দিব? তিনি আমারদের জ্ঞানের মূলে অথচ আমারদের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা তাঁহাকে অঙ্গুলি দ্বারা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তাঁহার অস্তিত্ব-জ্ঞান মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক তিনি তর্কের বাহিরে এমনই উজ্জ্বলরূপে স্থিতি করিতেছেন যে কোন ধার্ম্মিক কবি তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "সে না হলে আপনার—শুনিয়া তর্ক বিচার, বুঝিলে মন নিশ্চয়, প্রাণ কেন বুঝে না"। তিনি আমারদের প্রাণের মূলে রহিয়াছেন এত বড় ব্রহ্মাণ্ড যদি অন্ধশক্তির কার্য্য হয়, জড়জগতের ও প্রাণীরাজ্যের মধ্যে এত সূক্ষ্ম কৌশল দেখিয়া যদি এরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় তবে জানি না ইহা অপেক্ষা কি অধিক অসম্ভপর হইতে পারে।

———

কালনা ব্রাহ্মসমাজ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

আজ যাঁহার উপাসনার জন্য সকলে সমবেত হইয়াছি তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে প্রায় প্রতি গৃহেই মূর্ত্তিপূজা হইত কিন্তু এক্ষণে সুশিক্ষিত সাধুলোক মাত্রই বুঝিতেছেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের পূজা ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির অন্য কোন পথ নাই; তাই আজ এস্থলে—এই পবিত্র দেব-মন্দিরে এত লোকের সমাগম। যিনি চেতনং চেতনানাং তিনি আমাদের আত্মায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য বাহ্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, এই হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে—এই আত্মার মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর। শরৎকালের ন্যায় পূজার প্রশস্ত কাল আর নাই। এখন আকাশ নির্ম্মল, চন্দ্র শুভ্র কিরণে চারি দিক আলোকিত করিতেছে, পথ কর্দ্দম শূন্য, জল স্বচ্ছ, শরৎ শ্রী বিকসিত পদ্মনেত্রে যেন বিশ্বের শোভা দেখিতেছেন। বায়ু মৃদু মন্দ। প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য সহজেই আমাদের মনকে প্রসন্ন করিয়া আজ এই ব্রহ্মোৎসবে প্রবৃত্ত করিয়াছে। যিনি এই প্রকৃতির স্রষ্টা তিনি আমাদের অন্তরে। শরৎ কালের নির্ম্মলতা যেমন জলস্থল আকাশের শোভা সেইরূপ নির্ম্মলতাই আত্মার চির দিনের শোভা। আমাদের প্রত্যেককেই যত্নপূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। জল স্বচ্ছ না হইলে কি তাহাতে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়? সেইরূপ বুঝিও আত্মাকেও স্বচ্ছ করা আবশ্যক। নচেৎ তাহাতে ব্রহ্মের রূপ প্রতিভাত হয় না। আমাদের যা কিছু সাধন সমস্তই কেবল এই জন্য। আমরা নির্ব্বোধের ন্যায় বহির্বিষয়েই ধাবিত হই তদ্দারাই আত্মায় কালিমা সঞ্চিত হয়। সেই জন্য সাধনের পূর্ব্বসোপান যোগ। এই যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তিনিরোধ। ইহা সিদ্ধ করিতে না পারিলে আত্মা কখন স্থির হয় না। আজ আমরা শরতের বাহ্য শোভায় ব্রহ্মে আকৃষ্ট হইয়াছি এই সঙ্গে যদি আমাদের চিত্ত স্থির থাকে তবে নিশ্চয়ই আজকার উৎসবের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। নিঃসঙ্গতাই চিত্তস্থৈর্য্যের হেতু। বহির্ব্যাপারে মন ক্রমশ আসক্তিশূন্য হইলে তাহার স্থৈর্য্যলাভ সহজ হইয়া থাকে। প্রীতির পাত্রকে প্রীতি, স্নেহের পাত্রকে স্নেহ কর, সংসারের যথাযথ ভোক্তৃভোগ্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হউক কিন্তু প্রত্যেকের তৎতৎ বিষয়ে আসক্তিদোষ পরিহারের জন্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সাধনের কোন অঙ্গই সিদ্ধ হয় না। আমরা বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে যোগরক্ষা করিতেছি, আচার্য্যের অন্তর্ভেদী উপদেশ শ্রবণ করিতেছি কিন্তু সময়ে সময়ে আত্মপরীক্ষায় দেখিতে পাই আমি এক পদও অগ্রসর হই নাই। মুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি ইহার কারণ সংসারে ঘোরতর আসক্তি। আমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। মেঘস্থ তুষার বিন্দুতে যেমন অনন্ত আকাশ দর্শন হয় সেইরূপ আমাদের এই ক্ষুদ্র আত্মাতে সেই মহান আত্মাকে দেখিতে হইবে! কার্য্য অতি কঠিন। কিন্তু যে পথে যাইলে সিদ্ধিলাভ হয় আমরা সেই পথ জানিয়াও জানি না দেখিয়াও দেখি না। সেই পথের প্রথম সোপান এই নিঃসঙ্গতা। সকল বেদ সকল শাস্ত্র ভুয়োভুয় ইহারই উপদেশ করিতেছেন।

ব্রাহ্মগণ! জড় মূর্ত্তিপূজায় আত্মার

জড়তা ও অস্বাস্থ্য আইসে তাই আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া বেদবেদান্তোক্ত ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছি। কালে ইহা আমাদের সকল প্রকার জড়তা ও অস্বাস্থ্য দূর করিয়া অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু আজ কএক দিন হইল বঙ্গের গৃহে গৃহে যে শক্তিপূজার উৎসব হইয়া গেল মনে কর কি বাহ্য মৃৎ পাষাণ বৃথা এ আড়ম্বর ইহার প্রাণসর্ব্বস্ব? না কখনই না। আমরা অনন্ত নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের মৃৎ বা পাষাণ মূর্ত্তি কল্পনা-পথে আনিতে কুণ্ঠিত হই। অগ্নি মূর্দ্ধা, দ্যুলোক যাঁর মস্তক, চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ চন্দ্র সূর্য্য যার চক্ষু, দিশঃ শ্রোত্রে দিক সকল যার শ্রোত্র, বাক্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ বিবৃত বেদ যাঁহার বাক্য, পদ্ভ্যাং পৃথিবী পৃথিবী যাঁর পদ, হৃদয়ং বিশ্বমস্য এই বিশ্ব যাঁর হৃদয়, সেই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহু ব্রহ্মের ব্যাপ্য মূর্ত্তি যে কি আমরা ধ্যানে জ্ঞানে কিছুতেই তাহা পাই না। সুতরাং তাহার আলোচনা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু এই গৃহে গৃহে যে এই শক্তিপূজার উৎসব হইয়া গেল ইহাতে আমাদের ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য দুইই আছে। আমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে আমাদের ত্যাজ্য কিন্তু এই মূর্ত্তিপূজার আনুসঙ্গিক এমন সকল ব্যাপার আছে যাহা আমাদের গ্রাহ্য। দেখ ইহার ভিতর অনেক সামাজিক উন্নতি সংসৃষ্ট রহিয়াছে। সংক্ষেপে বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বর্ত্তমানে এই দেশে যা কিছু ভাল যা কিছু শ্রেয় এই শারদীয় উৎসব অনেকটা তাহা রক্ষা করিকরিতেছে। ইহা দ্বারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, শাস্ত্রজ্ঞদিগের শ্রেণী রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। ইহারই প্রভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি এক প্রকার স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সম্বৎসরের সঞ্চিত মনোমালিন্য নষ্ট করিয়া ইহা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সামাজিক উন্নতি সাধনের পক্ষে ইহার কোনটীই ত্যাজ্য হইতে পারে না। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমাদের ধর্ম্ম বেদ বেদান্তোক্ত প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, আমরা বুঝিয়াছি যাঁহাকে মন মনন করিতে পারে না, বাক্য নির্দ্দেশ করিতে পারে না অথচ মন ও বাক্য যাঁহা হইতে স্বস্ব শক্তিলাভ করিয়াছে তিনিই ব্রহ্ম, নেদং যদিদমুপাসতে আর নামরূপ বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। আমরা আত্মশক্তি ও শাস্ত্র মুখে জানিয়াছি মূর্ত্তিপূজায় আমাদের কল্যাণ নাই কিন্তু আজ উৎসবের দিনে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না এই সমস্ত মূর্ত্তিপূজার সহিত মনুষ্য সমাজের পক্ষে যাহা কিছু প্রকৃত হিতকর কার্য্য সংসৃষ্ট রহিয়াছে দেশকাল বিচার পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে যত্ন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি আমাদের প্রতিগৃহে পূর্ব্বপিতামহগণের আরাধ্য নিরকার জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক। বর্ষে বর্ষে এই ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আমাদের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে নিরন্নকে অন্নদান ও বিবস্ত্রকে বস্ত্রদান কর। দ্বেষহিংসা বিস্মৃত হইয়া সকলকেই স্নেহের আলিঙ্গন দেও, ভক্তির পাত্রকে প্রণিপাত কর, দেশের শিল্প সাহিত্য ও গীতবাদ্যের উন্নতি ইহার অঙ্গ করিয়া লও, দৈহিক বলবীর্য্য রক্ষার জন্য ব্যায়ামের উৎসাহ দেও, শক্তি অনুসারে

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকদিগের বৃত্তি বিধান কর এবং এদেশের শারদীয় উৎসবের সহিত জন সাধারণের যাকিছু সৎ ও শ্রেয় সংসৃষ্ট রহিয়াছে ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লও এবং ব্রাহ্ম সাধারণ একমত হইয়া এই সুপ্রশস্ত শরৎকালে ব্রহ্মোৎসব প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আত্মোন্নতির জন্য অমূর্ত্তকে পূজা করিতেছ সেইরূপ দেশহিতকর সমস্ত কার্য্য ইহার সহিত মিলিত করিয়া লও। এইরূপে কিছুকাল চল দেখিবে তুমি ব্রহ্মের নামে যে বিজয়-নিশান তুলিবে তাহার তলে দেশের সমস্ত নরনারী আসিয়া যোড় করে দণ্ডায়মান হইবে। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনং কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আত্মোন্নতি করিলেই সাধনের সকল অঙ্গ সিদ্ধ হইল না, ইহার সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য চাই। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিও না, ব্রহ্মের আহ্বানে সংসারে আসিয়াছ, ব্রহ্মের আদেশে সংসারের কার্য্য করিবে, তিনি প্রভু তুমি ভৃত্য, তবে সংসারের কার্য্যে কেন তোমার অভিমান হইবে, অগ্রে বলিয়াছি নিঃসঙ্গ হও সংসারের প্রতি-কার্য্যে এই প্রভুভৃত্য ভাব রক্ষা করিয়া যদি চলিতে পার তবে যথার্থতই তুমি নিঃসঙ্গ। সঙ্গ হইতে বাসনার উৎপত্তি হয় সকল শাস্ত্র এই বাসনা ছেদনের জন্য ভূয়োভূয় উপদেশ করিয়াছেন। আমরা যেন এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাধনের পথে অগ্রসর হই। ইহাতে আমাদের নিজের মঙ্গল এবং আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উত্থিত হইয়া পরস্পরকে যে প্রীতিবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে এই বাসনার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে আর তাহা ঘটিবে না ইহাতে জগতের মঙ্গল।

পরমাত্মন্! দিন তো অবসান হইতেছে। কবে চক্ষুর এই দুই খানি কবাট পড়িয়া যাইবে, দিন থাকিতে এই দীনকে দর্শন দেও, সম্মুখে ঘোর অন্ধকার, ভবিষ্যৎ যে কি আমরা কিছুই জানি না, তুমি সহায় হও এবং আমাদের হস্তধারণ করিয়া লইয়া চল। নাথ! তুমিই আমাদের একমাত্র আশা ও ভরসা।

দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১১ই মাঘ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

জগৎপিতা পরমেশ্বর সকল জীবকে আনন্দ বিতরণ উদ্দেশে জগৎ সৃজন করিয়াছেন। প্রথমে কিছুমাত্র ছিল না। প্রেমাগ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল আর এই জগতের সৃষ্টি হইল। সকল জীব সর্ব্বদা আনন্দ ভোগ করিতেছে। মনুষ্য অন্য জীবের ন্যায়ও আনন্দ ভোগ করিতেছে। আলোক, বায়ু ও জল যেমন মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না তেমনি ঈশ্বরপ্রদত্ত সার্ব্বভৌমিক সহজ আনন্দ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না। মনুষ্য যেমন মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না বলিয়া আলোক বায়ু ও জলের উপকারিত্ব লক্ষ্য করে না তেমনি সেই সহজ ধারাবাহিক নিত্য আনন্দ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না বলিয়া তাহা লক্ষ্য করে না। দুঃখই তাহার মনে অধিক লাগে। আনন্দই আত্মার প্রকৃতি। আনন্দই মনুষ্যের জীবন। আনন্দ না থাকিলে মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্য যে আনন্দ সর্ব্বদা উপভোগ করে তাহা এক এক সময় অত্যন্ত প্রগাঢ় ভাব ধারণ করে। সে সময় উৎসবের সময়। লোক পুত্রের জন্ম উপলক্ষে উৎসব করে। বিবাহ উপলক্ষে উৎসব করে। জয়লাভ

উপলক্ষে উৎসব করে। সকল আনন্দকর ঘটনা উপলক্ষে উৎসব করে। কিন্তু সকল প্রকার উৎসব অপেক্ষা ধর্ম্মোৎসবে মনুষ্যের আনন্দ যেমন প্রগাঢ় ভাব ধারণ করে এমন অন্য কোন উৎসবে নহে যেহেতু ধর্ম্ম মনুষ্যের অতি প্রিয় পদার্থ। মনুষ্য ধর্ম্মোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে অত্যন্ত দূর হইতে প্রতি পদে পদে প্রণিপাত আরম্ভ করিয়া তীর্থ যাত্রা কার্য্য সমাধা করে। মনুষ্য ধর্ম্মের জন্য সকল ব্রত অপেক্ষা কঠিন চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করে। মনুষ্য ধর্ম্ম জন্য ভীষণ নির্জ্জনারণ্যে বাস করে। ধর্ম্ম যখন মনুষ্যের সকল পদার্থ অপেক্ষা প্রিয়, তখন ধর্ম্মোৎসব সময়ে যে তাহার আনন্দ অত্যন্ত ঘনীভূত আকার ধারণ করিবে তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্মোৎসব অত্যন্ত উপকারী পদার্থ। সম্বৎসর যাহার আত্মা শুষ্ক থাকে ধর্ম্মোৎসব সময়ে তাহাও সরস হয়। ধর্ম্মোৎসব কালে কঠিন আত্মাতেও ধর্ম্মের বীজ হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বীজ পরে ক্রমে ফুল ফল বিশিষ্ট মহাদ্রুমে পরিণত হয়। কিন্তু এই ধর্ম্মোৎসবের উপকারিত্ব লাভ করিবার জন্য তিন প্রকার মদ পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহা না হইলে তাহার সম্যক উপকারিত্ব লাভ করা যায় না। সেই তিনটি মদ কি না বিদ্যা মদ, ধন মদ ও ধর্ম্ম মদ। বিদ্যা মদ ও ধন মদের কথা লোক সর্ব্বদা বলে। সে বিষয়ে কিছু বলিব না। ধর্ম্ম মদ বিষয়ে বলিব। ধার্ম্মিক বলিয়া যে একটি অহঙ্কার জন্মে তাহারই নাম ধর্ম্ম মদ। এই মদ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের দ্বারে না আইলে ঈশ্বর, উৎসবের সম্যক উপকারিত্ব প্রদান করেন না। আমি পাপীর পাপী অতি হেয় পদার্থ এই রূপ দীন ভাবে অতি বিনম্র ভাবে তাঁহার উৎসব ক্ষেত্রে না আগমন করিলে উৎসবের উপকারিত্ব সম্যক রূপে লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম মদ এমনি খারাপ যে বরং ধন মদ বিদ্যা মদের পার আছে, ধর্ম্ম মদের আর পার নাই। উৎসবের উপকারিত্ব সম্যক রূপে লাভ করিবার জন্য আর একটি জিনিস চাই। সেইটি উৎসবানন্দের জন্য ব্যগ্রতা পরিত্যাগ। তেমন আনন্দ হচ্চে না. তেমন আনন্দ হচ্চে না এমন করিলে উৎসবানন্দ আসে না। লোকে যেমন শীতকালে রৌদ্র সেবন সময়ে রৌদ্রকে আস্তে আস্তে শরীরের উপর কাজ করিতে দেয়, তেমনি, উৎসব সময়ে সেই সংসার অন্ধকারের অতীত আদিত্যবর্ণ দেবাত্ম-শক্তির কিরণকে আত্মার উপর আস্তে আস্তে কাজ করিতে দিতে হয় তাহা না হইলে সম্যক্‌রূপে উৎসবানন্দ মনে উদিত হয় না।

অদ্য কি আনন্দের দিন! যিনি আমাদিগের প্রাণসখা, যাঁহার নাম করিবা মাত্র চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হয়, অদ্যকার উৎসব তাঁহারই উৎসব। পৃথিবীর যে যেখানে ঈশ্বরপ্রেমী আছেন তাঁহাদিগের সকলকে আমি এই উৎসবে আহ্বান করিতেছি। সকল বয়সের ঈশ্বর-প্রেমীকে এই উৎসবে আহ্বান করিতেছি। কুমার কুমারী, নবীন নবীনা, প্রবীণ প্রবীণা! তোমরা সকলে ভক্তিপুষ্প সম্ভার হস্তে লইয়া এই উৎসব ক্ষেত্রে আগমন কর। যিনি সমস্ত জগতের অধিপতি অদ্যকার উৎসব তাঁহারই উৎসব অতএব অচেতন সচেতন সমস্ত জগৎকে আমি অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিতেছি। হে অচল ঘন, গহন! তোমরা এই উৎসবে যোগ দিয়া তাঁহার গুণ গান কর। হে রবি, চন্দ্র, তারা! তোমরা এই উৎসবে যোগ দিয়া তাঁহাকে আনন্দে

গান কর। সকল তরুরাজি ফুল ফলে সাজিয়া এই উৎসবে যোগ দান করিয়া তাঁহাকে গান কর। ভেরি, তূরী, ঝাঁজরী, ঢক্কা, জয় ঢক্কা। তোমরা সম্মিলিত হইয়া একটি মহান্ নাদ উৎপাদন কর যেহেতু আমাদিগের নাথ মহান। মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ মুরলী, রবাব, এস্‌রাজ, সেতার, বাহুলীন! তোমরা সম্মিলিত হইয়া একটি মধুর নিক্কন উৎপাদন কর যেহেতু আমাদিগের প্রিয়তম অতি মধুর। মর্ত্তলোকবাসী সকল মনুষ্য! তোমরা এই সকল যন্ত্রের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর। বিহঙ্গ কুল গাও আজি মধুরতর তানে। জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে, জগৎ পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে। মন হৃদয় মিলিয়ে সব সাথে ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেকের জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা বর্ত্তমান ১৮১০ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে ১৮১১ শকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল বর্ত্তমান চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইবে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ১৮১১ শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।
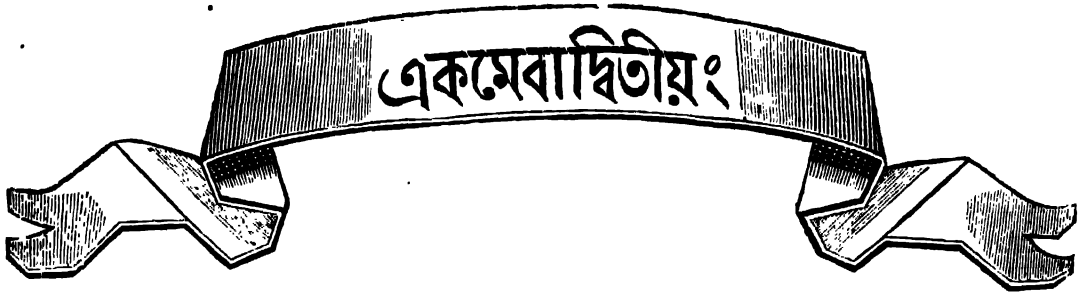
শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

দ্বাদশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

১৮১১ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৬। কলিগতাব্দ ৪৯৯০। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

দ্বাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

৫৪৯ সংখ্যা ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

নব-বর্ষ।

এক মহোজ্জ্বল দীপ এবং অগণন দীপ-মালা হস্তে করিয়া কাল নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুষ্প বিকসিত হইয়া উঠিতেছে, ফল পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বারি বর্ষণ করিতেছে, দিকের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে—আবার হিমাবরণে অবগুণ্ঠিত হইয়া যাইতেছে—পরিপক্ক শস্য-রাশিতে মেদিনীর শ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আর এক নিভৃত পার্শ্বে আর এক প্রকার ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে—সুখ সম্পদ্; আর এক প্রকার ফল পাকিয়া উঠিতেছে—বিদ্যা বুদ্ধি; আর এক প্রকার বারি বর্ষিত হইতেছে—অশ্রু; আর এক প্রকার দিঙ্মুখ প্রসন্ন হইতেছে, আবার হিমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—অন্তঃকরণ; আর এক প্রকার শস্য উৎপন্ন হইতেছে—শ্রীসমৃদ্ধি। এইরূপে কাল-চক্র নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে—কিন্তু "বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।" বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ এক পুরুষ সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমাত্মা—যিনি আমাদের সমস্ত মঙ্গলের একমাত্র আশা ভরসা—তিনি যদি এক নিমেষের জন্যও কাল-চক্রে পরিবর্ত্তিত হইতেন তবে আমরা অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতাম; কিন্তু তিনি "বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ—অটল—এক মহান্ পুরুষ; অনন্ত আকাশ তাঁহার সত্তার ভার-বহনে অসমর্থ; অনাদি অনন্ত সৃষ্টি তাঁহার নয়নের এক শুধু কটাক্ষ। তথাপি তাঁহার এরূপ অপরিসীম করুণা যে, আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য তিনি প্রত্যেক বৎসরের—প্রত্যেক ঋতুর—প্রত্যেক মাসের—প্রত্যেক দিবসের মুখ্য মুখ্য পর্ব্বস্থানে ফল-পুষ্প সুবাসিত বিচিত্র শোভা সমুজ্জ্বল তাঁহার এই স্বহস্ত-বিরচিত দেব-মন্দিরের দ্বার তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া—শোকার্ত্ত জনেরা সান্ত্বনা পাইতেছে—ভয়ার্ত্ত জনেরা আশ্বাস পাইতেছে—পাপার্ত্ত জনেরা হৃদয়-ভার হইতে অব্যাহতি পাইতেছে—সাধু পুণ্যাত্মারা প্রসাদামৃত প্রাপ্ত

হইয়া ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইতেছে। অদ্য সেইরূপ এক মঙ্গল মুহূর্ত্ত উপস্থিত। বৎসরের আজ প্রথম দিবস—প্রশান্ত প্রাতঃকাল; সূর্য্যের অভিনব মুখশ্রীতে লাবণ্য ধরিতেছে না—দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে। অসংখ্য অসংখ্য সূর্য্যের যিনি একমাত্র সূর্য্য—সমস্ত জ্ঞান প্রাণ মঙ্গলের যিনি একমাত্র মূলাধার—বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ সেই দেবাধিদেবকে ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিবার এই হ'চ্চে মুখ্য সময়।

পরমাত্মা অপরিসীম শক্তির মূলাধার; কিন্তু যেমন তাঁহার শক্তি, তেমনি তাঁহার জ্ঞান, তেমনি তাঁহার প্রেম, তেমনি তাঁহার করুণা। এখানে প্রায়ই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা যে পরিমাণে ক্ষমতাশালী হ'ন, তাঁহার শাসন-প্রণালী সেই পরিমাণে কঠোর ভাব ধারণ করে; প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজা স্বীয় রাজ্যের মধ্যে আপনিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইতে ইচ্ছা করেন; মহা-প্রতাপান্বিত রাজারা প্রজাবর্গকে ক্রীতদাসের ন্যায় পদানত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পরমাত্মা আমাদের রাজা কেবল নহেন—তিনি আমাদের পিতা—তিনি আমাদের বন্ধু। কঠোর শাসন-শৃঙ্খলে আমাদের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য তিনি এই বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন নাই; ঠিক্ তাহার বিপরীত—আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করাই সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য। তিনি চা'ন যে, আমরা আপনারা চক্ষুষ্মান্ ভাবে জানিয়া শুনিয়া মঙ্গলের পথ অনুসরণ করিব এবং অমঙ্গলের পথ দূরে বিসর্জ্জন করিব—তাই তিনি আমাদের অন্তরে জ্ঞানের নিরিন্ধন অগ্নি উদ্দীপন করিয়াছেন। কিন্তু মাতা ক্রোড়ের শিশুকে একেবারেই যে মুক্তভাবে ছাড়িয়া দে'ন তাহাও নহে; আর, একেবারেই যে তাহাকে ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখেন তাহাও নহে; যেমন অল্প অল্প করিয়া আমাদের আত্মাতে বলাধান হইতে থাকে, তেমনি অল্প অল্প করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, এবং যে অংশে আমাদের আত্মা অপরিপক্ক অবস্থাপন্ন সেই অংশে তিনি আমাদিগকে ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করেন; সে ধাত্রী প্রকৃতি। কিসে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনার অধিকারী হইব—প্রকৃতি গোড়া হইতে আমাদিগকে সেইরূপে লালন পালন এবং বিনয়ন করিতেছে। প্রকৃতি কিরূপে মনুষ্যের জ্ঞানকে অল্পে অল্পে মুক্তভাবে বিচরণ করিতে দিয়া মনুষ্যকে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করে তাহার প্রণালী আমাদের নিকটে অপরিচিত নহে; কেননা আমাদের দেশের পুরাতন ইতিবৃত্তে তাহা দিবালোকের ন্যায় জাজ্বল্যমান। বন্য তরুই উদ্যান তরুর মূল আদর্শ; প্রথমে উদ্যান তরু ছিল না; বন্য তরুর দেখাদেখি অনেক পরে তবে উদ্যান তরু নগরে পল্লীতে ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব, ভাল করিয়া একটি উদ্যান প্রস্তুত করিতে হইলে অরণ্যকে আদর্শ করিয়া চলা আবশ্যক; কেননা, উদ্যানে যে পরিমাণে অরণ্য প্রতিবিম্বিত হয় সেই পরিমাণে তাহার শ্রেষ্ঠতা এবং চমৎকারিতা; কৃত্রিম শিল্প ব্যাপারে অকৃত্রিম প্রকৃতির মুখচ্ছবি যে পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই পরিমাণে তাহা উচ্চ অঙ্গের শিল্প বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্য আমরা অকুতোভয়ে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, আমাদের এই সামাজিক ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতিতে প্রাচীন কালের আরণ্যক

উপাসনা-পদ্ধতি যে পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হইবে সেই পরিমাণে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা পদ্ধতি হইবে। প্রাচীন কালের উপাসনা পদ্ধতির উত্তরোত্তর তিনটি সোপান-পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনটিই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে যথা ক্রমে প্রকাশিত রহিয়াছে। যথা ; প্রথমে

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥"

যে দেবতা অগ্নিতে যিনি জলেতে যিনি সমুদায় বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধীতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি। অগ্নি এবং জল প্রাণ-বিহীন ভৌতিক পদার্থ সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ওষধি-বনস্পতি প্রাণবিশিষ্ট ভৌতিক পদার্থ সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অগ্নি জল বায়ু চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিতে আমরা ঈশ্বরের বল-রূপী শক্তি দেখিতে পাই, ওষধি বনস্পতিতে তাঁহার প্রাণ-রূপী শক্তি দেখিতে পাই। এইরূপে সমস্ত ভৌতিক জগতের অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক বার বার নমস্কার করা উপসনা-পদ্ধতির প্রথম সোপান-পংক্তি। তাহার পরে

সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং।"

সকল সত্যের তিনি একমাত্র সত্য—সকল জ্ঞানের তিনি এক মাত্র জ্ঞান—অথচ আর আর সমুদায় পরিমিত সত্য এবং পরিমিত জ্ঞান হইতে তিনি ভিন্ন ; তিনি অনন্ত পরব্রহ্ম। তিনি আনন্দ রূপে অমৃত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয়। আনন্দ যাহা সৃষ্টির মূল প্রবর্ত্তক, এবং মঙ্গল যাহা সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য, দুইই সেই অনন্ত জ্ঞানে সমাহিত এবং একীভূত। অগ্নিতে,জলেতে, ওষধীতে, বনস্পতিতে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাকে বার বার নমস্কার করিয়া আমাদের মন যখন সুস্থির এবং সুপ্রশান্ত হয়, তখন পরমাত্মা সহজেই একমাত্র অদ্বিতীয় মূল সত্য মূল জ্ঞান এবং অনন্ত পরব্রহ্ম রূপে আমাদের ধ্যানে উদ্বোধিত হ'ন। তৃতীয় সোপান-পংক্তি—গায়ত্রী। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইহা স্বর্গ মর্ত্ত, অন্তরীক্ষ সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। সমুদায় বিশ্ব-ভুবনের যিনি সূর্য্য-স্বরূপ, আমাদের আত্মার তিনি অন্তরাত্মা ; বহির্জগতে যেমন তিনি তেজ এবং প্রাণ প্রেরণ করিতেছেন, আমাদের আত্মাতে তেমনি তিনি বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপে নিখিল জগতের সূর্য্য-স্বরূপ পরমাত্মাকে বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্র-স্থানে আত্মার অভ্যন্তরে আত্মারূপে উপলব্ধি করা তৃতীয় সোপান-পংক্তি। আমাদের প্রতিজনের এক একটি আত্মা এই প্রকাণ্ড বিশ্ব-গ্রন্থের এক একটি চরম মন্তব্য— সমস্ত জগতের প্রণালী-পদ্ধতি তাৎপর্য্য এবং মর্ম্ম আত্মাতে একত্র পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। এরূপ অনেক পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়—যাহাতে কথা অনেক কিন্তু ভাব অতীব অল্প ; আবার, এমনও পুস্তক কখন কখন নেত্র-গোচরে উপস্থিত হয় যাহাতে অক্ষর অল্প-সংখ্যক কিন্তু ভাব অতলস্পর্শ। বহির্জগৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর পুস্তক—আত্মা শেষোক্ত শ্রেণীর পুস্তক। এই যে এক চমৎকার পুস্তক—আত্মা, এ পুস্তকে সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া একটি মাত্র অক্ষর—ওঙ্কার! কিন্তু সেই এক-অক্ষরের মধ্যেই সমস্ত জগতের সমস্ত ইতিহাস পুরাণ বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত

স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই আশ্চর্য্য পুস্তক-খানির অভ্যন্তরে কিয়ৎদূর প্রবেশ লাভ করেন, তাঁহার দৃষ্টি সে সকল আশ-পাশের দিকে যায় না। কোন ব্যক্তি অনেক অন্বেষণের পর পারিজাত পুষ্প করতলে প্রাপ্ত হইলে, তিনি কিছু আর তাহার পাপ্ড়ি গণনা করিতে বসেন না— তাহার স্বর্গীয় সৌরভে এবং সৌন্দর্য্যেই তিনি ভোর হইয়া যা'ন! সমস্ত জগৎ আত্মার অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে— কিন্তু প্রকৃত আত্মদর্শী ব্যক্তির সে সকল দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ নাই— তিনি আত্মাতে পরমাত্মাকে পাইয়াই ভোর। বহির্জগতের আবরণ উন্মুক্ত ক-রিয়া আত্মার অভ্যন্তরে পরামাত্মার দর্শন লাভ করিতে হইলে—পূর্ব্ব-কথিত তিনটি সোপান-পংক্তি উত্তরোত্তর ক্রমে অব-লম্বন করা বিধেয়। ঐ তিনটি সোপান-পংক্তি কেন যে উত্তরোত্তর অবলম্ব-নীয় তাহার গোড়া'র কারণ এই;— আমাদের অপরিপক্ক মনের প্রথম অবস্থা বিক্ষেপ, পরিপক্ক মনের চরম অবস্থা— সমাধি। বিক্ষেপ নিবারণ করিতে হইলে, তাহার প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, যেখানেই মন প্রধাবিত হউক্ না কেন—সেইখানেই সভক্তি অন্তঃকরণে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে অভ্যাস করা। শিশু যখন হাঁটিতে শিক্ষা করে—তখন চলিতে চলিতে যে-খানে পড়িবার উপক্রম হয় সেইখানে কিছু-কাল স্থির হইয়া দাঁড়ায়; ইহারই ন্যায়— বিক্ষিপ্ত মনকে স্থানে স্থানে স্থিরীভূত করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের প্রতি নিয়োগ করা সাধনের পক্ষে আশু উপকারী। তাহা হ-ইলে নদীতে পর্ব্বতে সমুদ্রে ওষধীতে বন-স্পতিতে চন্দ্রে সূর্য্যে মন যেখানেই প্রধা-বিত হউক্ না কেন, সেইখানেই সে ঈশ্ব-রের শক্তির প্রভাব দেখিয়া ভক্তিতে বিনম্র এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। কিন্তু এইরূপ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বস্তুতে যখন আমরা ঈশ্বরকে অবলোকন করি, তখন তাঁহার প্রভূত শক্তি এবং মহিমা কেবল আমাদের জ্ঞান-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়, তাঁহার জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গল ভাব যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে। বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশ্ব-ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান বা আনন্দ বা মঙ্গল-ভাব—যথাবৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। জগতের নানাবিধ বিচিত্র ব্যাপার হইতে ঈশ্বরের পরিচয় লইতে লইতে অব-শেষে আমরা এমন একটি শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া পড়ি যখন সর্ব্ব জগৎ হইতে ঈশ্ব-রের অপরিসীম জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গল-ভাব আমাদের মনোমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এরূপ যখন হয় তখন আমাদের অন্তঃকরণে কাজেই বিক্ষেপের স্থানাভাব। তখন বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিচিত্র বিশ্ব-ব্যাপার এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড বিশ্ব-ব্যাপার আমাদের ধ্যানে আবির্ভূত হয়, এবং তাহার অভ্যন্তরেই আমরা ঈশ্বরের অপরিসীম জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গল-ভাবের পরিচয় লাভ করি। কিন্তু তাঁ-হাতেও আমাদের আত্মার তৃপ্তি হয় না। মনে কর যেন, কোন একটি ঘটনা-গতিকে পিতা পুত্রে আজন্ম-কাল দেখা সাক্ষাৎ নাই; পথের মাঝখানে হঠাৎ এক দিন উ-ভয়ের সহিত উভয়ের সাক্ষাৎকার হও-য়াতে উভয়েরই মনোমধ্যে বিনা কারণে নূতন একপ্রকার আনন্দের আবির্ভাব হ-ইল—কিন্তু তাহাতে উভয়ের কাহারো আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তাহার পরে যখন উভয়ে উভয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইল—এ আমার পুত্র ইনি আমার পিতা—তখন

উভয়ের আনন্দ দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং উভয়ে পরস্পরের সন্দর্শনে পরম পরিতৃপ্ত হইল। এইরূপ, আগন্তুক ভাবে জগৎ-মন্দিরে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিয়াও আমাদের আত্মা সম্যক্ তৃপ্তি-লাভে সমর্থ হয় না—তখনও তাঁহাকে আত্মার অন্তরাত্মা বলিয়া দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। প্রথমে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশ্ব-ব্যাপারে ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তি সন্দর্শন; তাহার পরে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একতান ভাবে—ঈশ্বরের জ্ঞান আনন্দ এবং মঙ্গলভাব অবলোকন; তাহার পরে জগতের সেই একতান ভাবের কেন্দ্র-স্থানে—আত্মার স্বক্ষেত্রে—পরমাত্মার দর্শন-প্রাপ্তি। ইহাতেই বিক্ষেপের পরম উপশান্তি হয়। চন্দ্রসূর্য্য জল বায়ু অগ্নি ওষধি বনস্পতি সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের মহতী শক্তি প্রত্যক্ষ বিরাজমান দেখিয়া তাহাকে তদ্গত চিত্তে ভক্তিভরে নমস্কার করিতে করিতেই আমরা তাহাকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং এইরূপ দেখিতে পাই; এবং এইরূপে তাহাকে ধ্যানে উপলব্ধি করিতে করিতেই

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং আর আর সকল হইতে প্রিয়—অন্তরতর এই যে পরমাত্মা"—এইরূপে তাঁহাকে আত্মাতে অন্তরতর অন্তরতমরূপে উপলব্ধি করি। ঈশ্বরোপাসনার এইরূপ একটি ক্রম-পদ্ধতি জন-সমাজের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রতিজনের আধ্যাত্মিক পরীক্ষাতেও দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য আমরা বলি যে, এ পদ্ধতিটি ব্যক্তি-বিশেষের কপোল-কল্পিত পদ্ধতি নহে—এ পদ্ধতিটি প্রকৃতির নিজের শিখাইয়া দেওয়া পদ্ধতি সুতরাং অকৃত্রিম। ঋষিদিগের অকৃত্রিম আরণ্যক উপাসনা-পদ্ধতি গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম উদয়গিরিতে নূতন এই দেখা দিয়াছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য যাহা—শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা করিবেই করিবে। ঈশ্বর কেমন সুকৌশলে আর্য্যধর্ম্মকে বিকৃতির পথ হইতে প্রকৃতির পথে ফিরাইয়া আনিতেছেন তাহা যদি একবার আমরা স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তাহা হইলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গিয়া প্রেম ভক্তি কৃতজ্ঞতা রসে প্লাবিত হইয়া উঠে। ঈশ্বরের এই অপার করুণা স্মরণ করিয়া আইস আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রথম প্রস্ফুটিত প্রীতি-পুষ্প এবং প্রথম ফলিত কল্যাণ ফল তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিই—এবং সম্মুখ-স্থিত বিস্তীর্ণ পথের সম্বলের জন্য তাঁহার নিকট হইতে প্রসাদ-বারি যথেষ্ট পরিমাণে যাচ্ঞা করিয়া লই।

হে পরমাত্মন্! বৎসরের এই প্রথম দিবসে জীবন-পথের বাৎসরিক সম্বল উপার্জ্জন করিবার জন্য একান্ত অনন্যগতি হইয়া আমরা তোমাকে আশ্রয় করিতেছি—তোমার প্রসাদামৃত বিতরণ করিয়া আমাদের শরীর মন আত্মাতে বলাধান কর—যেন আমরা মধ্য পথে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া না পড়ি। যাহাতে আমরা তোমার আশ্রয়ে অটল থাকিয়া আনন্দের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে পারি ও যাহাতে তোমার প্রেমামৃতের উৎস আমাদের আত্মাতে উন্মুক্ত হইয়া আমাদের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তিকে কিছুতেই অবসান হইতে না দেয়—আমাদের প্রতি আজ সেইরূপ প্রসাদ বিতরণ কর; তুমিই আমাদের জীবনের

একমাত্র উপজীবিকা—তুমিই আমাদের আনন্দের একমাত্র প্রস্রবণ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বর্দ্ধমান সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

সত্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। আমরা বহুকাল পরে ঋষিগণ-পরিসেব্য ব্রহ্মনামের ব্রহ্মপূজার অধিকারী হইয়াছি। অরণ্য কানন হইতে ব্রহ্মপূজা নগর গ্রামে আনয়ন করিয়াছি। ব্রহ্মপূজাই যে আমারদের এক মাত্র পূজা, ব্রহ্মোপাসনাই যে আমারদের একমাত্র সেব্য, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। আমারদের সম্মুখ হইতে সংশয় অন্ধকার কুসংস্কারের ভীষণ যবনিকা অন্তর্হিত হইয়াছে। সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আমরা সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভ্রান্ত সময়ে ভক্তির অতুলনক্ষেত্র ভারতবর্ষে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা জ্ঞানভক্তির সঙ্গমক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছি। যাহা কিছু সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা কাল সহকারে আবিষ্কৃত হইবে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশাল অধিকারের মধ্যে সংন্যস্ত হইয়াছে ও হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে যদি সত্য কি আমরা সুস্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারি তবে আমারদের সকলই জানা হইল। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না যাঁহা হইতে ফল ফুল তরু লতা পরিশোভিত সুবিশাল নশ্বর পৃথিবী সৃষ্ট হইল, উপরে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র খচিত অসীম অনন্ত আকাশ সুসজ্জিত হইল, যাঁহার সত্তাতে এসকলেরই সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল, যাঁহার আশ্রয়ে জ্ঞানধর্ম্ম পবিত্রতাতে অমর আত্মা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির পরে আপনার ব্যক্ত ও অব্যক্ত মহিমাতে বিরাজিত আছেন ও থাকিবেন, সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরই আমারদের উপাস্য দেবতা। যাঁহার নিত্য উদার সদাব্রতে এক দিন নয় দুই দিন নয়, এক পক্ষ নয়, এক মাস নয়, সম্বৎসর কাল আমরা রোগের ঔষধ, শোকের সান্ত্বনা, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল প্রাপ্ত হইতেছি, আমারদের প্রীতিপ্রবাহ কৃতজ্ঞতার অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্য সহজেই তাঁহার প্রতি উত্থিত হয়। আমরা জ্ঞানযোগে যাঁহাকে আশ্রয় রূপে আদিকারণ রূপে অনুভব করিলাম, প্রীতি তাঁহাকে আপনার নিজস্ব ধন গতিমুক্তির নিদান জানিয়া তাঁহার পদতল গ্রহণ করিল। জ্ঞান ও প্রেমের বিমিশ্রণে এক মহান ভাবের তরঙ্গ হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিল। এই ভাবই সকল ধর্ম্মের অঙ্কুর হইয়া তাবতের মধ্যে বিরাজিত হইল। এই বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমের অল্পাধিক বিমিশ্রণ জাতীয় ভাব জাতীয় প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া প্রকাশিত হইতে গিয়া নানা ধর্ম্মে, উপধর্ম্মে ও শাখাধর্ম্মে বিভক্ত হইয়া পড়িল; পরিশুদ্ধ উন্নত জ্ঞান ও প্রেমের তুল্য বিমিশ্রণই কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের অস্থিমজ্জারূপে জাগ্রত রহিল।

যাহা কিছু সত্য, তাহাই সকল দেশে সকল কালে সত্য, তাহাই একমাত্র অভ্রান্ত। সত্যের প্রকৃতিই এই যে উহা আমারদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আমরা উহাতে মনের সহিত সায় না দিয়া থাকিতে পারি না। সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আমারদের হৃদয়ের বস্তু বলিয়াই সত্য আমারদের এত প্রিয়। আমরা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সহজে আত্মস্থ করিতে সক্ষম

হইব বলিয়া তিনি আত্মপ্রত্যয়কে সত্যের সহচর করিয়া দিয়াছেন। এই সত্য মূলে হইলেও অবস্থা ভেদে উহার অবয়ব বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কাচমধ্যগত আলোক যেরূপ কাচের বর্ণবিভেদ ক্রমে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ সত্য আবরণ মধ্যগত হইয়া প্রকাশিত হইলে উহার মুখচ্ছবি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। সত্যের এই দুই বিভাগের নাম মুক্ত সত্য ও ব্যবহারিক সত্য। যাহা আধ্যাত্মিক সত্য বা বৈজ্ঞানিক সত্য যাহাতে মানব প্রকৃতির ছায়া পতিত হয় না যাহাতে দেশ কালের হস্ত নাই তাহাই মুক্ত সত্য। সহজজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে, আত্মার দিকে পরকালের দিকে যে কিছু নূতন অকাট্য তথ্য আবিষ্কার করে তাহাই মুক্ত সত্য।

কিন্তু ব্যবহারিক সত্যের ভাব সেরূপ নহে। মনুষ্যের অপূর্ণ স্বভাবের বা জাতিগত প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া যে সত্য প্রকাশিত হয় তাহাই ব্যবহারিক সত্য। মনুষ্য একদিকে আধ্যাত্মিক জীব অপর দিকে সামাজিক জীব; মনুষ্য যতদূর আধ্যাত্মিক জীব ধর্ম্ম ও ঈশ্বর যতদূর তাহার সম্ভজনীয়, আধ্যাত্মিক মুক্ত সত্যই তত্দূর তাহার একমাত্র গ্রাহ্য। আবার মনুষ্য যতদূর সামাজিক জীব, অপরের ক্ষতি লাভে আপনার ইষ্টানিষ্ট যতদূর জড়িত, ব্যবহারিক সত্যই তাহার অবলম্বনীয়। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থার সহিত মুক্ত সত্য ও ব্যবহারিক সত্য বিশেষ রূপে সংশ্লিষ্ট। সেইজন্যই সকল দেশের সকল কালের আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে উন্নততম ধর্ম্ম সকলের বিশেষ মতবিভিন্নতা নাই। উপনিষদের প্রতি পত্রে দৃষ্টি নিপতিত হইলে অমনি উহাতে নিজ নিজ সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, ও আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়। ব্যবহারিক সত্যে মনুষ্য প্রকৃতির ছায়া নিপতিত রহিয়াছে বলিয়া উহা দেশভেদে স্বতন্ত্র। আধ্যাত্মিক সত্য তারস্বরে বলিতেছেন "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" ব্যবহারিক সত্য তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অমনি বলিয়া উঠিল "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", সত্য কথা কহ, প্রিয় কথা কহ, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা কহিও না। কেননা দুর্ব্বল মনুষ্য হৃদয় অপ্রিয় সত্য শ্রবণে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক সত্য হিতকারী বন্ধুর ন্যায় বলিতেছেন, "শান্তোদান্তো উপরতস্তিতিক্ষু সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি," শান্ত দান্ত উপরত, তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া ব্রহ্মবিৎ আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন। সমরাভিলাষী তেজীয়ান আরবের হৃদয় তাহাতে শান্তি না পাইয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বলিয়া উঠিল "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং," ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হইলেও তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হয়। কেহবা বংশপরম্পরাগত আচার ব্যবহারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নিরুপাধি পরমেশ্বরের উপাসনায় আপনাকে নিয়োজিত করিতেছেন। কেহবা পূর্ব্ব পিতামহাগত আধ্যাত্মিক সত্যগ্রহণে আপনাকে কৃতার্থ জানিয়া ঈশ্বরপূজায় জীবনকে সার্থক করিতেছেন। কেহ বা সজনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, কেহ বা নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটন করেন। কেহ বা বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বাত্বিক আহার বিহার অবলম্বনে ঈশ্বরে সংন্যস্তচিত্ত হন।

এইরূপে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত সামাজিক ভাব,

মুক্ত সত্যের সহিত ব্যবহারিক সত্য বিমিশ্রিত দেখি। কিন্তু উহাই যে প্রচলিত ধর্ম্মের তাবৎ তাহা নহে। যেখানে মনুষ্যের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি বলহীন সে স্থান শূন্য কল্পনা আসিয়া পূর্ণ করে। অসংস্কৃত বুদ্ধি ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া যদি লক্ষ্যস্থানের শীর্ষদেশে উঠিতে না পারে তবে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই অসত্যের কলেবর কল্পনার দ্বারা অন্ধ ভাব দ্বারা পুষ্ট হইলে উহা এক বিজাতীয় আকার ধারণ করে। অসত্যপরিপূরিত কল্পনা, ধর্ম্মবদ্ধমূলকারী শাসনবাক্য, ব্যবহারিক ও সামাজিক সত্য ও মুক্ত সত্যর বিমিশ্রণই প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের সর্ব্বস্ব। ধর্ম্মগুলিকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লিষ্ট করিলে আমরা এই কয়েকটি তাহার উপাদান দেখিতে পাই। ধর্ম্মভাব মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক, ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বরলাভ মনুষ্যের এমনই সুকঠিন, বাহ্যবিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া বাহ্যজগতের অতীত দেশে স্থাপন করা এমনই কঠোরতা সাপেক্ষ যে মনুষ্য আপনার আত্মার অজেয় পরাক্রমকে বিশ্বাস না করিয়া, তাহার শক্তি সামর্থ্য পরিচালনা না করিয়া পরম্পরাগত বিশ্বাসেই নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় আত্ম সমর্পণ করে। যেখানে জড় চক্ষুর দৃষ্টি পরাভূত, পরমুখবিনির্গত সেখানকার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অসত্য হইলেও সে আপ্তবাক্য বোধে গ্রহণ করে। ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর সুখশান্তি লইয়া মনুষ্য এরূপ ব্যতিব্যস্ত, স্ত্রী পুত্র পরিবারের বৃথা মায়ায় এমনই উন্মত্ত, যে এই সংসার পান্থশালা হইতে যে একদিন বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে তাহা আর মনে সহজে উদয় হয় না। বাল্যের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া, পরিপুষ্ট রিপুকুলের উত্তেজনায়, শারীরিক বলপুষ্টির মধ্যে আপনাকে নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা দেখিয়া আর ঈশ্বরের অক্ষয় ন্যায়কে তাঁহার অনুপম পিতৃভাব ও অতুলন মাতৃস্নেহকে স্মরণ করিতে পারে না, তাঁহার সহিত আশ্রয় আশ্রিত ভাব মনে প্রতিভাত হয় না। ক্রমে যখন দেহযষ্টি ক্ষীণ হইতে থাকে, জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভারবহ হইয়া পড়ে, শোক দুঃখের নিদারুণ আঘাতে জীবন বিষময় হয়, তখন সেই অসহায় অবস্থার মধ্য হইতে অমৃতের দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। কিন্তু মৃত্যুর করালগ্রাস নিতান্ত আসন্ন দেখিয়া তিনি অনুতাপানলে ভস্ম হইতে থাকেন। প্রাণের এমনই জীবনীশক্তি দেখিতে পান না, যাহাতে বিবেক বলে নিজ চেষ্টায় ঈশ্বরের স্বরূপে উপনীত হইতে পারেন। এ অবস্থায় দেশপ্রচলিত বা বংশপরম্পরাগত ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাতে সংক্রমিত হয় এবং তিনি তাহারই সাধনে আপনার মরুময় আত্মাতে শান্তিবারি সেচন করিতে থাকেন। এই জন্যই সকল দেশে সকল কালে প্রচলিত ধর্ম্ম জ্বলন্ত সত্যের বিমল কিরণে দীপ্তিমান না হইলেও মূর্খ জ্ঞানী সকলেরই মধ্যে নির্ব্বিবাদে স্থান পায়।

এই জ্ঞানোন্নত সময়ে সমুদয় পৃথিবীর মধ্যদিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকীর্ণ সত্যের বন্যা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মের আদি গুরু ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রবাহ ভীষণ কল্লোলে প্রথম প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া আমারদের এত আনন্দ। এই প্রবাহের প্রবল ঘূর্ণায় জড়পূজা, মূর্ত্তিপূজা, অবতার পূজা পাতালে প্রবেশ করিয়াছে।

কেবল সকলের মধ্যগত ব্রহ্মপূজা উদ্ভাসিত হইয়া পড়িতেছে। "ইহা নহে ইহা নহে" যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, যিনি আপনার মহিমাতেই পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের পাদদেশ হইতে সত্য উৎসারিত হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের গহন রজনীর পূর্ব্বদিক আরক্তিম করিয়া সমুদয় পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া ইহা তাঁহার চরণতলে প্রধাবিত হইবে। প্রেমে সত্যে আনন্দে জগত পরিপূর্ণ হইবে, পবিত্র পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক সেই জগতের মুখ দর্শন করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।

আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহাই সত্যধর্ম্ম ও একমাত্র আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্ত সত্যে পরিপূর্ণ, ইহাতে সংসারের ছায়া নাই, অপূর্ণ মানবের অপূর্ণতার প্রতিবিম্ব নাই। অসত্য বা কল্পনার কালিমা নাই। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব। যাহা সকল দেশে সকল কালে সত্য, সকল অবস্থায় সত্য, তাহাই ইহাতে সংন্যস্ত রহিয়াছে। এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সখ্যভাব স্থাপিত হইল। এক ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া সমুদয় জাতি ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইল, পৃথিবীর একপ্রান্ত অপর প্রান্তের সহিত সম্মিলিত হইল। একমাত্র আধ্যাত্মিক ভাব জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য ঈশ্বরের পথে নিঃসংশয়চিত্তে পদচারণা করিবার জন্য, মোহকুজ্‌ঝটিকার মধ্যদিয়া নির্ভয়ে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা চিরপ্রদীপ্ত দীপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছি। শুভ্র দীপালোকে আমরা আমারদের গম্য পথ কেমন সুস্পষ্ট অবধারণ করিতেছি, ইহকালের পরপারের সৌন্দর্য্য কেমন স্পষ্ট অবলোকন করিতেছি। যে আধ্যাত্মিক সত্য চিরকালই সত্য পরিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানগম্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ধর্ম্মসমন্বয়ে সত্যের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয় না, কেন না সত্য আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ। যাহা মুক্ত সত্য তাহার বাহ্য পরীক্ষা নাই। যাহা ব্যবহারিক বা সামাজিক সত্য, সমন্বয়ে তাহার উপযোগিতা প্রমাণীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম সমন্বয়ে মুক্তসত্যের অন্বেষণে সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় এই মাত্র। যাহা অসত্য কোন কালেই সত্যের সহিত তাহার সমন্বয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

ব্যবহারিক বা সামাজিক সত্যের সহিত বিমিশ্রণে মুক্ত সত্য বা আধ্যাত্মিক সত্যের মুখ ম্লান হইয়া যায় এই জন্যই আধ্যাত্মিক সত্য গুলিকে অতি সযতনে উহাদিগের গণ্ডীর বহির্দ্দেশে স্থাপন করা হইয়াছে। যাহা ব্যবহারিক ও সামাজিক সত্য তাহার সম্বন্ধে লোকের মতবিভেদ থাকিতে পারে, বিবাদ কলহ উপস্থিত হইতে পারে, এই জন্য আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ সত্যে ও মুক্ত সত্যে পরিপূর্ণ।

হে পরমাত্মন্! সত্যের ভিখারী হইয়া আমরা তোমার দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তুমি যে সত্যের সাগর প্রেমের আকর, তুমি আমারদের সম্মুখে তোমার সত্যের আলোক বিকীর্ণ কর। আমরা মোহান্ধ জীব, অন্ধকারের ভিতরে থাকিয়া আমারদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তোমার প্রেমোজ্জ্বল মুখ দর্শন করিয়া যে আমরা মনুষ্য জীবন সার্থক করিব, আমারদের সে শক্তি নাই। তুমি যে তোমার দিকে আহ্বান করিবার জন্য অন্ধের যষ্টি ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করি-

রাজ্য, আমরা নিজের দোষে তাহার মধ্যে অসত্য ও অকল্যাণ আনয়ন করিয়া সে সৃষ্টিকে ভগ্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তুমি যে স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছিলে আমারদের দুর্ব্বল নয়ন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া উহাতে অন্ধকারের বীজ বপন করিয়াছে। তুমি যে সুনির্ম্মলা শান্তির প্রবর্ত্তক হইয়া সত্যধর্ম্মকে ভারতে প্রেরণ করিলে আমরা তাহার মধ্য হইতেই বিবাদের কারণ, নিজ নিজ যশোমান খ্যাতি প্রতিপত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। আমাদের কি এ দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। চিরকালই কি তোমা হইতে দূরে থাকিয়া সংসারশান্তিকে প্রাপ্ত হইব। ক্রমে যে আমারদের জীবনরূপ দৈশ গগনে সন্ধতারা উঠিয়া পড়িল। এখনও আমরা নিজ নিজ আত্মগরিমা ও অহংকার লইয়া ব্যতিব্যস্ত, আপন আপন অভীষ্ট সম্পাদনের জন্য লালায়িত। তোমার প্রবল তেজোময় বাণী আমারদের কর্ণকুহর স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, আমরা আপনার কথাতে আপনি বিভোর। তুমি নিকটে আসিয়া এ দুরবস্থা হইতে আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আমারদের উপায় নাই। তুমি তোমার মঙ্গল হস্ত আমারদের চক্ষের উপর ধারণ না করিলে এ চক্ষে তোমাকে দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি হৃদয়ে আসীন হইয়া উহাকে প্রক্ষালন না করিলে, আর পঙ্কোদ্ধারের পথ নাই। তুমি আমারদের বাক্যকে স্তব্ধ না করিলে অবাক্ হইয়া তোমাকে দেখিবার শক্তি সামর্থ্য নাই। তুমি বহির্দৃষ্টিকে সংযত করিয়া অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া না দিলে তোমার স্বরূপে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হইবার সম্ভাবনা নাই। শান্ত দান্ত সমাহিত না হইলে যে তোমাকে প্রাপ্তির গত্যন্তর নাই, তাহা তুমি আমাদিগকে কতবার বলিয়া দিয়াছ, আমরা তাহা উপেক্ষা করিয়া তোমাকে পাইতে যাই বলিয়াই পরস্পর নিন্দা গ্লানিতে হৃদয়কে কলুষিত করিয়া ফেলি। তুমি যে দুর্ব্বহ ধর্ম্ম প্রতিপালনের গুরুভার আমারদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার উপর অর্পণ করিয়াছ, নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ক্ষতিলাভ গণনার দিবসে আপনাকে তাহাতে সম্পূর্ণ অপারগ দেখিয়া সাশ্রু নয়নে তোমার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে কম্পিত কলেবরে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি হৃদয় সিংহাসনে আসীন হইয়া আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত কর, আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান, আমারা তোমার চরণে শরণাপন্ন হইলাম! তুমি আমারদের আশা ভরসা সকলই।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আজ বর্ষবিম্ব কালের বিশাল বক্ষে বিলীন হইল। সুখশান্তি জ্বালা যন্ত্রণা পরিপূরিত সম্বৎসরকাল অনন্তকালসাগরে নিমজ্জিত হইতে চলিল। ক্ষুদ্র মনুষ্যের গণনায় অনন্তকাল প্রবাহের এক বৎসর শেষ হইল। অদ্যকার রজনীর ছায়ায় নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার হইল। এই রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান অতীতে পরিণত হইবে, আমারদের সম্মুখে ভবিষ্যতের যবনিকা উত্থিত হইবে। যাঁহার উদার সদাব্রতে সম্বৎসরকাল আমরা ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল, রোগের ঔষধ শোকের সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ বৎসরের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রসন্নজনন প্রেমমুখ দেখিয়া কৃতজ্ঞতানীরে তাঁহার পদতল ধৌত করিব বলিয়া এই পবিত্র-

স্থানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। তিনি দিনে নিশীথে প্রতিমুহূর্ত্তে আমারদের উপর যে কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন, তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিবার এই উপযুক্ত সময়। তিনি যে অমর আত্মাকে তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, আজ দেহপিঞ্জর লইয়া সোপান হইতে সোপানান্তরে পদনিক্ষেপ করিতে গিয়া তাহার প্রীতি-কুসুম আপন হইতেই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। সংসারের তীব্র ঘূর্ণা তাহার সহজ ভাবকে আজ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

অমর আত্মার অনন্ত উন্নতিপথ বিস্মৃত হইয়া যদি আমরা মর্ত্তালোকেই আমারদের আশা ভরসা আবদ্ধ করিয়া থাকি, তবে এই ক্ষুদ্র জীবনের কালক্ষয়ে নিরাশার ক্রন্দন অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়গণের হাহাকার ধ্বনি আমাদিগকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিবে। প্রিয়জনগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বাভাস আমাদিগকে আকুল করিবে। যদি পাপ তাপে হৃদয়কে কলুষিত করিয়া থাকি, ইহজীবনকে সর্ব্বস্ব জানিয়া সংসারের মহামায়ায় বিজড়িত হইয়া থাকি, তবে জীবন ক্ষয়ের নিদারুণ সংবাদ মনের শান্তিকে এককালে হরণ করিবে। যদি শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি পবিত্রতায় আত্মার ভাবকে যতনে বিকশিত করিয়া থাকি, ঈশ্বরের পূজার্চ্চনায় মনুষ্য জন্ম সফল করিয়া থাকি, পাপের আকর্ষণ হইতে আপনাকে সম্যকরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবে আত্মপ্রসাদের বিমল জ্যোৎস্না গত জীবনকে জ্যোতিষ্মান করিবে। অনুতাপের তুষানল সন্তাপের অশ্রু হৃদয়কে আর কলুষিত করিতে পারিবে না। একটী কালগ্রন্থি অতিক্রম করিবার দিবসে বিমল আনন্দ হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিয়া দিয়া প্রীতির উৎস প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইবে।

আমরা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।"

তোমারদের মৃত্যুপীড়া না হউক, এ প্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান। সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি. এখানে যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু। আমরা মৃত্যুর মধ্যদিয়া সঞ্চরণ করিতেছি। মৃত্যুময় শরীর আত্মার আবরণ। মৃত্যুময় স্বজন পরিজন আমারদের সঙ্গী। আমরা সংসারের মহামায়ায় আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুর সঙ্গে যোগ আবদ্ধ করিয়া অমৃত হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছি। শোকের ভীষণ আর্ত্তনাদ যেখানকার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, বিয়োগ যেখানকার প্রকৃতি সেখানেই আমরা আমারদের আরামের সুরম্য নিকেতন নির্ম্মাণ করিতে যাই। যিনি প্রাণারাম, আত্মার একমাত্র নিজস্বধন, যাঁহাকে পাইলে রোগ শোক ভয় বিপদ দূরে পলায়ন করে যাঁহাতে আত্মার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি আমারদের অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃদ আমরা সহজে তাঁহার শরণাপন্ন হই না। যাঁহাতে অক্ষয় সুখ শান্তি নিহিত রহিয়াছে সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখের আস্বাদনে আমরা সে আনন্দে বঞ্চিত হইয়া দিশাহারার ন্যায় ইতস্তত সঞ্চরণ করি। আমরা বিবেকবলে ও সাংসারিক বিপর্য্যয় দর্শনে সংসারের অনিত্যতা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। সেই অকৃত অমৃত পুরুষ ভিন্ন যে আমারদের গতি মুক্তি নাই তাহা সুস্পষ্ট অবধারণ করিতেছি। যতটুকু আমারদের সাংসারিক কামনা ও সংসারের সেবা ততটুকু আমারদের মৃত্যু, যতটুকু ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহার উপাসনা

ততটুকু আমারদের জীবন যৌবন সকলই। সংসারে থাকিয়া বিষয়চিন্তা বিষয়-কামনা হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া যতই আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিবার শক্তি-সামর্থ্য জন্মিবে, যতই অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতে সক্ষম হইব, যতই অমৃতের সহিত সহবাসে প্রীতি ও পবিত্রতায় জীবাত্মা পরিবর্দ্ধিত হইবে, ততই মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া আমরা পরমানন্দ লাভে সমর্থ হইব। সংসারে মৃত্যুর অভিমুখীন স্ত্রী পুত্র পরিবার, স্বজন বান্ধবগণ একে একে সকলেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। কেবল একমাত্র জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্রয়ে উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিতে করিতে ইহ জগত হইতে পর জগতের দিব্যাকাশে উদিত হইবে। একমাত্র ধর্ম্মবলে আমারদের আত্মা প্রতিষ্ঠাবান হইবে। এই সত্যটি যদি আমরা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারি, তবে সংসারের ক্ষতি-লাভ গণনা আমাদিগকে মুহ্যমান করিতে পারে না, আত্মীয় বিচ্ছেদ আমাদিগকে সন্তপ্ত করিতে পারে না, মৃত্যুপীড়া আত্মার অনন্ত জীবনকে ক্লিস্ট করিতে পারে না। ঈশ্বরের অপার করুণা, আত্মার অনন্ত উন্নতি, পরকালে সুদৃঢ় বিশ্বাস মৃত্যুভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। আত্মার বাহিরের আবরণ যে শরীর তাহার স্থিতি ভঙ্গে আত্মার প্রাণ কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না। আত্মা যাহাকে আমি বলি সে তো মৃত্যুর পরে দেহাবরণ ভেদ করিয়া ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর প্রকাশের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিবে। তবে আর আমারদের মৃত্যু কোথা। যাহা জড় শরীর যাহা আত্মার পিঞ্জর তাহাই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আত্মাতো পরজগতের নির্ম্মলতর আকাশে তাঁহার যশোগানে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল মুখ সন্দর্শনে বিভোর হইতে লাগিল।

হে পরমাত্মন্! সম্বৎসরকাল তোমার দ্বারে ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল লাভ করিয়া, তোমার প্রদত্ত অগণ্য সুখে পরিবৃত থাকিয়া আজ কোন্ প্রাণে তোমাকে না ডাকিয়া তোমার চরণে কৃতজ্ঞতার বিমল অশ্রু উপহার না দিয়া থাকিতে পারি। সামান্য উপকারে উপকৃত হইলে যখন মনুষ্যের নিকট আমরা আজীবন কাল কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ থাকি তখন তোমার অনন্ত উদার সদাব্রতের চিরভিখারী হইয়া কি তোমার প্রতি আমারদের অধিক দান নাই? তুমি যে তোমার করুণা সম্বৎসরকাল অজস্রধারে আমারদের উপরে সমভাবে বর্ষণ করিয়াছ, পাপী তাপী সাধু অসাধুর জন্য তোমার উদার ক্রোড় যে তুল্যভাবে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছ। আমারদের অভাব অনটন, পাপ তাপ যেমনই গুরু হউক না তোমার দান তোমার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি যে তাহা হইতেও সহস্রগুণে গুরুতর। দুর্ব্বল মনুষ্য হৃদয়ে পাপের আকর্ষণ যেমনই তীব্র, তোমার মধুর আহ্বান যে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তুমি তোমার পবিত্র স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইবার কত শত সুন্দর অবসর যে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, আমরা মোহান্ধ জীব, আমরা তাহা তুচ্ছ করিয়া সংসারকে আরও দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল ভাব মাতৃস্নেহ পিতৃবাৎসল্য বিপদের মধ্যে সন্দর্শন করিয়াছি। শোক সন্তাপের মধ্যে তোমার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি যে বিপদের প্রতি কশাঘাতে আমার-

দিগকে তোমার দিকে অজ্ঞাতসারে লইয়া যাইতেছ! তুমি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি আমরা তোমার অনন্ত স্থষ্টিরাজ্যের বিন্দু-মাত্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বালুকণা, আমাদের উপরেও এত দয়া। তোমার অজস্র করু-ণার মধ্যে থাকিয়া তোমার নিকট কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। তো-মার করুণা বাক্য বলিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়, মন ধারণ করিতে গিয়া অবশ হইয়া পড়ে। তোমার করুণা অন্তরে বাহিরে, তোমার করুণা বসন্তের সমীরণে, চন্দ্রের সুখদ জ্যোৎস্নায়, তোমার করুণা লতা পুষ্পে, তোমার করুণা ফলমূলে, তোমার করুণা তৃণশস্যে। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে তোমার করুণা প্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আজ তোমার করুণায় আমাদের সন্তাপাশ্রু বিশুষ্ক হউক, হৃদয় হইতে শোকের কালিমা প্রক্ষালিত হউক, পাপের যন্ত্রণা বিদূরিত হউক, অসাড় আত্মার সহজ ভাব জাগ্রত হউক, যে কিছু শোকসন্তাপ আমা-দিগকে প্রপীড়িত করিয়াছে তাহা অতী-তের বিস্মৃতির কক্ষে চিরনিহিত হউক। ভবিষ্যত অনুকূল ভাবে আমারদের নিকট আবির্ভূত হউক। কালচক্র আমাদিগকে সংস্কৃত করিয়া তোমার পবিত্র স্বরূপের দিকে আনয়ন করুক। তোমার প্রতি নির্ভরের ভাবকে জাগ্রত করুক। তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছাতে আমাদিগের ক্ষুদ্র ই-চ্ছার যোগ দিতে শিক্ষা দিউক। আমরা ক্ষুদ্র মলিন জীব, তোমার নিকট হইতে কি কেবল প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, আমারদের মুখ হইতে কি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ধ্বনি বিনির্গত হইবে না, তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কি উদ্দীপ্ত হইবে না? তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কি আমারদের ক্ষুদ্র বল শক্তি নিয়োজিত হইবে না?

পরম মাতা! আজ বৎসরের শেষ রজ-নীতে কেবল বাক্য লইয়া তোমার উপাসনা করিতে আসি নাই। কৃতজ্ঞতার প্রবল উৎস হৃদয় হইতে নিঃসারিত হইতে গিয়া বাক্যকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া ফেলিয়াছে! সুদীর্ঘ সম্বৎসর কাল তো-মার অসীম করুণায় তোমার অবারিত দানে পুষ্ট হইয়া কেবল মাত্র পবিত্র অশ্রুজল লইয়া তোমার পূজায় আগমন করিয়াছি। তোমার চরণতল অশ্রুজলে ধৌত করিয়া হৃদয়ের ক্ষোভ নিবৃত্ত করিব, ইহাই আন্তরিক কামনা। তুমি কৃপা ক-রিয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও, যোড়করে তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যান।

চল শ্রেয় পথে, পাবে যাহা হ'তে, সুখ শান্তি অতিশয়।
যেওনা প্রেয়েতে, ভুলনা মোহেতে, প্রেয়ে দুখ শুধু হয়॥

শ্রেয় ধর্ম্ম-পথ শুন তাহার লক্ষণ।
কায়মনে ঈশ্বরের ভজন সাধন।
তিনি জীবনের সার, সকলি অসার আর,
জানি তাঁর পদে করা আত্ম-সমর্পণ॥

ভক্তি প্রেম ভরে তাঁরে সদাই স্মরণ।
তাঁহারে যতনে দান হৃদি সিংহাসন।
তাঁ'ছাড়া যতেক আশা, তাঁ ছাড়া যা ভালবাসা,
মলিন কামনা যত, যতনে বর্জ্জন॥

তাঁর সহচর হয়ে জীবন যাপন।
স্নেহ প্রেম অতুলনে, তিনি হৃদি সংগোপনে,
কতই অমৃত ধার বলেন বচন।
প্রাণ পণে সে বচন ধারণ পালন॥

তাঁহার মঙ্গল কার্য্য,
শ্রেয়ঃ করে শিরোধার্য্য,
তাঁহার মঙ্গল কায সাধিতে কিঞ্চিৎ,
করে ব্রত জগতের করিবারে হিত।
ভাই ভগ্নীদের তরে, যেবা সাধ্যমত করে,
মায়ের আশিষ সেই পাইবে নিশ্চিৎ॥

শ্রেয় কি? না তাঁর সহ হৃদয়ের যোগ।
হৃদি তাঁরে আবাহন, তাঁর পূজা আরাধন,
তাঁর সহবাস হৃদি নিরত সম্ভোগ॥

হে জীব! তোমারে তিনি দিয়াছেন জ্ঞান।
যাহ'তে পাইছ তুমি তাঁহার সন্ধান।
মোহ পাশ পাশরিতে, তাঁরে মন প্রাণ দিতে,
এই খানে মুক্তি পে'তে তোমারে শিখান॥
শোন তাঁর মধুর আহ্বান।
তাঁর পথে করহ প্রয়াণ।
সেবে ইহা সাধুজন, সেবে ইহা দেবগণ,
এই পথে অমৃতের পাইবে সন্ধান॥

ইথে হয় দেবভাব—প্রেমের নয়ন।
প্রেম ভাবে ঈশ্বরের সদাই স্মরণ।
অমূল্য যে ধর্ম্মধন, করিবে তা উপার্জ্জন,
প্রভুর দক্ষিণ মুখ করিবে দর্শন॥

আত্মার সন্তোষ কিবা এ পথে চলিতে।
মীন যথা নিজানন্দে বিচরে বারিতে।
আপনি স্বাধীন হ'য়ে, নিজ স্বাধীনতা ল'য়ে,
প্রেমদাতা যিনি তাঁর চরণে অর্পিতে॥

শাণিত ক্ষুরের ধার এই পথ কয়।
চাহি সদা তাঁর পানে, চল ইথে সাবধানে,
হস্ত ধরিবেন মাতা নাহি কিছু ভয়।
এই পথে প্রতীক্ষিয়া, আছেন যে দাঁড়াইয়া,
তাঁহার পথিকে দেন আপন আশ্রয়।

প্রেয় পাপ-পথ যাহে লোক রিপু বশে।
করে স্বেচ্ছাচার ডোবে বিষয়ের রসে।
তৃণ আচ্ছাদিত কূপ, প্রেয় পথ হেন রূপ,
অনলে পতঙ্গ যেন তাহে মূঢ় পশে॥

হে যুবা! শরীর মন তব তেজীয়ান্।
জ্ঞানের নয়ন এবে হয় জ্যোতিষ্মান্।
নবীন উৎসাহ প্রাণ, দেহ বল বুদ্ধি জ্ঞান,
যাঁর কাছে এই সব পাইয়াছ দান।

সে সব তাঁহার কাযে কর নিয়োজন।
পাবে এই খানে তুমি ব্রহ্মনিকেতন।
প্রেয় পথে যেই যায়, মৃত্যু পদে পদে পায়,
ঈশ্বর বিহনে তার বিফল জীবন॥

প্রেয় নারীরূপা বিলোল নয়না।
হাব ভাব ময়ী বিচিত্র বসনা।
হৃদি হলাহল ভরা মুখে মধু ভাষি,
বলে "ওহে যুব," হাসি কুহকীর হাসি,
"পুত্র পৌত্র বলীয়ান্ অশ্ব রথ গজ যান,
অট্টালিকা মণি মুক্তা শত দাস দাসী,
কত শচী আনি দিব, কতই পুষ্পক,
হও হও হও তুমি আমার সেবক।
সুগন্ধ সমীর তোমা করিবে বীজন।
উৎসবে মাতিবে নিত্য তোমার ভবন।
নৃত্য গীত পরিহাস, গন্ধামোদ মহোল্লাস,
নিতুই ভুঞ্জিবে সুখ কতই নূতন।
হবে রাজা রাজ্য তব হইবে বিস্তার।
চারিদিকে যশঃ তব হইবে প্রচার।
যোড় করে লোক যত, হবে তব পদানত,
হবে হেন—হও তবে সেবক আমার॥"
সাধু যুবা না টলিল প্রেয়ের বচনে।
গিরি কি কখন টলে ঝঞ্ঝার তাড়নে।
উত্তরিল—"তব বাণী, সার যাহা তাহা জানি,
ভুলিব কেমনে আমি তোমার ছলনে॥
দেখাছ যে ভোগ তাহে ইন্দ্রিয়ের ক্ষয়।
দুদিনের তরে তাহা এই বই নয়।
নৃত্য গীত ধন জন, মণি ময় আভরণ,
আত্মার গভীরে তাহে তৃপ্তি নাহি হয়।

বিষয় ভোগেতে বটে সুখের আবেশ।
কিন্তু পরিণাম তার দুঃখ আর ক্লেশ।
মরীচিকা মাত্র সার, কিন্তু তৃষ্ণা অনিবার,
বিকারের মত সদা বাড়য়ে অশেষ॥
তব পথে গেলে মোর এই হবে ফল।
হৃদয়ের দেবভাব ঘুচিবে সকল।
বিষয়ের কীট হ'য়ে, অকিঞ্চিৎ কাচ ল'য়ে,
ভুলিব হয়েন যিনি চরম সম্বল॥
দিতে পার হেন কিছু ধন?
যার নাই ক্ষয় কদাচন?
যা'তে প্রীতি করিলে স্থাপন,
প্রিয় হয় দারা পুত্র জন?
সেই ধন স্পর্শমণি, কি বা অমৃতের খনি,
আছে কি ভাণ্ডারে তব এমত রতন?"
প্রেয় মৌন হয়ে তবে করিল প্রস্থান।
সাধু যুবা প্রেয় হ'তে পান পরিত্রাণ॥
প্রলোভন তারে, আক্রমিতে নারে,
বিষাদে ঘেরিল কিন্তু তাহার পরাণ॥
সংসারের সুখ প্রীতি, হইল উদাস মতি,
ভাবিল সংসার এক দারুণ শ্মশান॥

ব্যাকুল হইয়া যথা মৃগ পিপাশায়।
মরীচিকা পানে ধেয়ে ফেরে নিরাশায়।
তেমতি যুবক, ফিরিয়া সংসার,
না মিলিল সুখ করে হাহাকার,
সংসারের দাবানলে. হৃদয় তাহার জ্বলে,
না জানে কোথায় পাবে শান্তি বারি ধার॥

জীবন-মরুতে যিনি আনন্দ আকর।
যাঁরে পে'লে সংসারের সুখ সুখকর।
যিনি আপনারে দিয়া, সব জ্বালা নিভাইয়া,
সুবিমল শান্তি দেন আত্মার ভিতর॥
যুবা তাঁরে নাহি জানে, করয়ে ক্রন্দন।
আত্মার অভাব কিসে হইবে মোচন।
আত্মা যেন কিবা চায়, কেবা দিবে তা আমায়,
কিসে দুঃখ তাপ মোর হবে নিবারণ।
হেন কালে দেবী পবিত্র বরণা,
ধবল বসনা, করুণ-নয়না
কাছে আসি তার, বচনে সুধার
বলিতে লাগিল করিয়া সান্ত্বনা॥

ক্রমশঃ।

প্রার্থনা।

(কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মের পারিবারিক উপাসনায় ব্যবহৃত)

হে পরম পিতা পরম মাতা পরমেশ্বর! আমরা পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনী সকলে মিলিত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পুরঃসর তোমার পূজা করিতেছি। তুমি আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগের গৃহদেবতা; তোমাকে ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও জানি না, তুমি আমাদিগের প্রতি করুণা কর। তুমি এই পরিবারকে তোমার মঙ্গলচ্ছায়া প্রদান কর। এই পরিবার মধ্যে যেন কখন বিরোধ ও কলহ উপস্থিত না হয়। যদি আমরা সম্পদে উত্থিত হই তবে সেই সম্পদে মত্ত হইয়া তোমাকে যেন বিস্মৃত না হই। যদি আমরা বিপদে পতিত হই সে বিপদ মধ্যে তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন অটল ভাবে অবস্থিতি করি। তোমার ধর্ম্মবলে বলীয়ান কর। তোমার নিকটে আর আমাদিগের অন্য প্রার্থনা নাই।

সমালোচনা।

গো-জীবন। শ্রীযুক্ত মীর মোশার্‌রফ হোসেন প্রণীত।

লোকে প্রায় গতানুগতিকই হইয়া থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যে আচার ব্যবহার পরম্পরা প্রচলিত হইয়া আইসে, সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্বর্ত্তী অধিকাংশ লোকেই ঐ আচার প্রভৃতিকে নিয়তির নিগড় স্বরূপ জানিয়া অকুণ্ঠ ভাবে তাহাতে বিচরণ করিতে থাকে। কিন্তু যাঁহারা সেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানবান্ ও প্রতিভাসম্পন্ন তাঁহারা ধারাবাহিক আচার সমূহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তর্ক করেন, সেটি অন্যায় তাহার প্রতিবাদ করেন ও তৎপরিত্যাগে যত্নবান হন। আমরা গো-জীবন লেখক শ্রীযুক্ত মীর মোশার্‌রফ হোসেনকে শেষোক্ত দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে স্থান দিতে চাই। তিনি মুসলমান হইয়া স্বীয় ভ্রাতা মুসলমানদিগকে গোমাংস সেবনে বিরত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন গোজাতির উপকারিতা ভূয়সী, উহার নিধনে দেশের দুগ্ধ প্রভৃতি সুখাদ্যের ও কৃষিকার্য্যের হানি, গোমাংস সেবনে উৎকট ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা—যে হেতু উহা এ দেশের উপযোগী নহে। পরন্তু তিনি ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে গোহত্যা না করিলে কোরাণের বিধি পালন হয় না এমত নহে। লেখককে ধন্যবাদ। দয়া ধর্ম্মের মূল এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ঈশ্বর তাঁহার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

আমরা আহ্লাদ সহকারে এই মুসলমান গ্রন্থকারের উচ্চ মনের ভাব সাধারণকে উপহার দিবার জন্য গো-জীবন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভারতের অনেক স্থানে গোবধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরাজি বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মোসল্মান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদ ও চলিতেছে। এ সময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।

আমি মোসল্মান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গো মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটীর গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ি গো বৎস্যের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছি যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাব-বশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জ্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগত পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮১০ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে ১৮১১ শকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ১৮১১ শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্বাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

৫১০ সংখ্যা ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপনিষৎ।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

আত্মার দর্শন ওরে আগ্রহ করিবে
শ্রবণ মনন ধ্যানে আলস্য ত্যজিবে।

আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মনআনন্দং। শান্তি সমৃদ্ধমমৃতং। ইতি প্রাচীন যোগোপাস্ব।

ওহে জ্ঞান বৃদ্ধ নর, ভজ ব্রহ্ম পরাৎপর,
অনন্ত আকাশ এই শরীর যাঁহার।
আত্মা যাঁর সত্য জ্ঞান, আরাম যাঁহার প্রাণ,
আনন্দই মন, শান্তি অমৃত ভাণ্ডার।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরে মহিলা-সমাজ।

নব-বর্ষ।

দেব, আজ শুভ দিনে—শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে তোমার আহ্বানে আমরা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছি; আজ আর আমরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অচেতন অবস্থায় নাই। নববর্ষের নূতন উষায় আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে; এই উষা কালের শীতল মলয়-সমীরে শরীর যেমন স্নিগ্ধ হইতেছে; তোমার প্রেমামৃত রসপানে আত্মারও সেইরূপ তৃপ্তি সাধন হইতেছে। আজ কি শুভদিন! তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পাইতেছি। অপর বাসনা আসিয়া মনকে আজ বিচলিত করিতে পারিতেছে না—প্রাণ আজ তোমার পূজার জন্যই ব্যাকুল, তোমার দর্শন লাভই তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমরা ক্ষুদ্র হইলেও যে অমৃতের অধিকারী আজ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি—হৃদয়ে তোমার অসীম করুণা উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইতেছি। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য।

তোমার রাজ্যে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। পুরাতন কর্ম্ম সমাধা করিয়া চলিয়া যায়, নূতন আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তোমার নিয়মে মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে, যাইতেছে; বাল্য যৌবন জরা, সুখদুঃখ,

জন্ম মৃত্যু নিয়ত কালচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া পুরাতনের মধ্যে নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য জাজ্বল্যমান। তুমি সেই একধ্রুব সত্য অটল অচল ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য চিরদিন তাহাকে পালন করিয়া আসিতেছ। তোমার এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের সুশৃঙ্খলা দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। একদিকে তুমি যেমন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ত চালাইতেছ, আর একদিকে সেইরূপ একটী ক্ষুদ্র কীটাণুকীটের মধ্যে থাকিয়া তাহারও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। তোমার শক্তি অসীম, করুণা অসীম, প্রেম অসীম। আমি ক্ষুদ্র জীব তোমার মহিমা বলিয়া শেষ করিব কিরূপে? এ জগৎ যখন কিছুই ছিল না—এ আকাশ, এ পৃথিবী, এ সীমাহীন নক্ষত্রপুঞ্জ যখন সৃষ্টই হয় নাই, তখনও তুমি পুরাতন। তোমার মহিমা ব্যক্ত করিতে পারে কে?

আজ নব-বর্ষের প্রথম দিনে এই যে সুগন্ধ হিল্লোলে প্রাণিগণ পরিতৃপ্ত হইতেছে, এ সুগন্ধ প্রেরণ করিতেছেন কে? ঋতুতে ঋতুতে সময়োপযোগী ফুল ফলে প্রকৃতিকে যিনি সাজাইয়া দেন, এ সুগন্ধহিল্লোল কি তাঁহারই প্রেরিত নহে? এই বিশাল সৃষ্টিতে আমরা যেদিকেই চাহি না কেন, সেই সৌন্দর্য্যের আধার বিশ্বরচয়িতার সুনিপুণ রচনা চক্ষে পড়ে। আমরা যাহা দেখি, যাহা উপভোগ করি, সকলেতেই সেই আনন্দ স্বরূপের মঙ্গল হস্ত বিদ্যমান। আমাদের যাহা প্রয়োজন না চাহিতে তিনি তাহা দিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে, কল্যাণ হইবে, প্রার্থনা না করিতে তিনি তাহার বিধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের এত দিয়াছেন যে, চাহিবার আর কিছুই নাই, ভিক্ষা করিয়া কিছুই সংগ্রহ করিতে হইবে না। তাঁহার প্রেমে বাস্তবিক পাষাণ পর্য্যন্তও গলিয়া যায়; সম্বৎসর পরে সেই দয়াময়কে আমরা কি একবার ডাকিব না, আমরা কি একবার তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে সত্যের প্রভাব অনুভব করিব না, একবার কি পিতার দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব না? তিনি ভক্তবৎসল—তিনি দেখা দিবেনই। ভক্তিভরে ডাকিলে পরে তিনি দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না।

আজ সম্বৎসর পরে আমরা একত্র সম্মিলিত হইয়াছি—আইস আজ আমরা একবার আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি। দেখি, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের পথে আমরা কতদূর উঠিতে পারিয়াছি, তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম কতটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য আমরা কতদূর সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই রূপে প্রতি বৎসর আমরা যদি আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, আমরা উন্নতির পথে কিরূপ অগ্রসর হইতেছি। আমরা যেমন কৃতকার্য্য হইব, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দিত হইব। তিনিও আমাদিগকে বিপথ হইতে উদ্ধার করিতে ভুলিবেন না। সংসারের নানাবিধ প্রলোভনে আমরা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি, কিন্তু অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে বিপদ আর থাকে না। তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিলে সংসারের সকল ভয় দূর হয়। তিনি দয়াময়—হাত ধরিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যান।

করুণাময় প্রভো! তোমাকে আর বলিব কি, তুমিত সকলই জান। আমাদের উপর তোমার করুণা চির দিনই বর্ষিত হইয়া আসিতেছে, তোমার এই সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করিয়াই আমরা জীবিত আছি, তোমাকে আর বলিব কি। তোমার কাছে আমাদের চাহিবার কিছু নাই,বলিবার কিছু নাই, ভক্তিভরে তোমাকে প্রণাম করিতেছি গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মানবীকরণ বটে।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

মূল-কারণই প্রকৃত কর্ম্ম-কর্ত্তা, সাক্ষাৎ কারণ তাঁহার কার্য্য-সাধক যন্ত্র। ইহা হইলে মূল কারণকে চেতন এবং সাক্ষাৎ কারণকে অচেতন বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাত্মা সর্ব্বদাই সৃষ্টি-সাধক যন্ত্র লইয়া কর্ম্মশীল আছেন।

[প্রভাত বাবু এই যাহা বলিলেন, ইহার ভাব এই যে, জগতের উপরে পরমাত্মার সার্ব্বকালিক কর্ত্তৃত্ব মানিতে গেলে তাহাতে এইরূপ দাঁড়ায় যে, পরমাত্মা এক প্রকার যন্ত্র—সচেতন জগচ্চালক যন্ত্র। কেননা, অষ্টপ্রহরই যে ব্যক্তি কেবল যন্ত্র লইয়া কর্ম্মশীল থাকে—সে নিজেই এক প্রকার যন্ত্র; তাহার সাক্ষী—ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া—ঘানিটানা গরু—ইত্যাদি। এ সব জন্তুরা এক প্রকার যন্ত্র—সজীব যন্ত্র—ধোঁয়াকলের ছোটো ভাই! যন্ত্রের পক্ষে সজীব এবং সচেতন হওয়া বড়ই কর্ম্মভোগ! কেননা তাহা হইলে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রণা—কর্ম্মের সঙ্গে ঘর্ম্ম—অনবরতই লাগিয়া থাকে;—নির্জ্জীব যন্ত্রের এরূপ কোনও আপদ-বালাই নাই। কাজেই—সজীব যন্ত্র অপেক্ষা নির্জ্জীব যন্ত্র—ঘানিটানা গরু অপেক্ষা ধোঁয়া-কল—লাখো-গুণে ভাল। এই জন্য আমরা বলি যে, ঈশ্বরকে সচেতন যন্ত্র বলা অপেক্ষা, জগৎকে ঈশ্বর-ভ্রষ্ট নির্জ্জীব যন্ত্র বলা সহস্র-গুণে শ্রেয়। প্রভাত বাবু এখানে যে একটি কূট-তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার ভিতরে পরম একটি রহস্য মাটি-চাপা রহিয়াছে—তাহা তিনি দেখেন নাই—সেটি এই;—খুব উচ্চ এবং খুব নিম্ন, এ দুয়ের মধ্যে এক দিকে যেমন খুবই বৈপরীত্য—আর-এক দিকে তেমনি খুবই সৌসাদৃশ্য; কিন্তু ল্যাজা-মুড়া'র সহিত মধ্যম অংশের—না আছে বৈপরীত্য—না আছে সৌসাদৃশ্য। যথা;—

নিম্ন	মধ্য	উচ্চ
বীজ	শাখা-পত্র	শস্য
সা	রে,গ,ম,পা,ধা,নি,	সা
শিশু	পণ্ডিত	পরম জ্ঞানী
জড়	অপক্ক চিন্তা	পরিপক্ক জ্ঞান

ধানের গাছ দেখ—তাহার বীজ এবং শস্যের মধ্যে কেমন মিল! কিন্তু ধানের ডাঁটার সহিত দু'য়ের কাহারো কোন মিল নাই। স্বর-সপ্তক দেখ—নীচে'র সা'র সহিত উপরের সা'র কেমন মিল! কিন্তু মাঝের স্বরের সহিত দুয়ের কাহারো কোনও মিল নাই। শিশু এবং পরম-জ্ঞানী—উভয়েই কেমন সরল-চিত্ত এবং নিরভিমান; কিন্তু মাঝের ধাপের পণ্ডিত

বিদ্যাভিমানে পরিপূর্ণ—প্রান্ত-যুগলের কাহারো সহিত মাঝের মিল নাই। জড়-পিণ্ড যখন যে-দিকে চলে—তখন সেই দিকেই চলে, যখন চলে না—তখন চলে না; জড়-পিণ্ড এক-রোখা; পরিপক্ক জ্ঞানও একনিষ্ঠ,—দুয়ের মধ্যে এইরূপ সৌসাদৃশ্য; কিন্তু অপক্ক চিন্তা নানা দিকে বিক্ষিপ্ত—এবং সংশয়াক্রান্ত। সর্ব্বত্র এইরূপ ল্যাজা মুড়া'র পরস্পর সৌসাদৃশ্য, এবং মাঝখানের সহিত দুয়েরই বৈসাদৃশ্য, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গে এটা যেন স্মরণ থাকে যে, শস্য বীজের দ্বিতীয় সংস্করণ বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্তিকাগর্ভস্থিত বীজ সত্যসত্যই কিছু আর আলোক-বিহারী শস্য নহে; উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তি শিশুর ন্যায় নিরভিমান বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রহ্মসংস্থ জ্ঞানী ব্যক্তি সত্য সত্যই কিছু আর ক্রোড়-সংস্থ শিশু নহে; স্বয়ম্ভু শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষের কার্য্য যন্ত্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত অব্যর্থ এবং অস্খলিত বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া স্বয়ম্ভু মুক্ত পুরুষ সত্য সত্যই কিছু আর যন্ত্র নহেন—ঘড়ি'র কলের ন্যায় অচেতন যন্ত্রও নহেন—অশ্বগর্দ্দভের ন্যায় সচেতন যন্ত্রও নহেন। মনুষ্যের আত্মশক্তির কার্য্য শিশুর পদ-চারণা'র ন্যায় পতন-শীল—যন্ত্রের ন্যায় অব্যর্থ এবং অস্খলিত নহে; কিন্তু এরূপ হয় কেন? না যেহেতু মনুষ্যের মনোমধ্যে শরীরাদি যন্ত্রের বদ্ধ ভাব এবং আত্মার বিশুদ্ধ মুক্ত ভাব এই দুই ভাবের কোস্তাকুস্তি নিরন্তর চলিতেছে—কখনও বা তলে তলে গূঢ়ভাবে চলিতেছে—কখনও বা পষ্টাপষ্টি ব্যক্ত ভাবে চলিতেছে। মনুষ্য—দেবতা এবং পশু দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। মনুষ্য যে অংশে পশু-ঘেঁসা সেই অংশে তাহার কার্য্য বদ্ধভাবের কার্য্য, আর, যে-অংশে দেবতা-ঘেঁসা সেই অংশে তাহার কার্য্য মুক্ত ভাবের কার্য্য। মুক্ত-ভাবের কার্য্য কি? না যে কার্য্য কায়-মনোবাক্যের ঐক্য-স্থান হইতে—অন্তর-বাহিরের ঐক্য-স্থান হইতে—আত্ম-পরের ঐক্য-স্থান হইতে—বাহির হয়, তাহাই মুক্ত ভাবের কার্য্য; আর, যাহা কায়-মনোবাক্যের—অন্তর বাহিরের—আত্মপরের বিরোধ-স্থান হইতে বাহির হয়, তাহাই বদ্ধ ভাবের কার্য্য। ঐক্যের মূল আত্মা এবং বিরোধের মূল শরীর ইহা বলা বাহুল্য। এখানে পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন যে, শরীর আমাদের মতে হেয় পদার্থ;—আমাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, শরীর স্বতঃ হেয়ও নহে—উপাদেয়ও নহে; তবে কি? না যে-শরীর আত্মার অবশীভূত তাহাই কেবল হেয় পদার্থ; কিন্তু যে শরীর আত্মার বশীভূত, তাহা পরমকল্যাণের আস্পদ। মুক্তভাবের কার্য্য কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত—উপরে তাহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম; যিনি বোঝেন—বুঝিবেন, না বোঝেন—না বুঝিবেন; সংক্ষেপোক্তি ভিন্ন এখানে আমাদের গত্যন্তর নাই। আরো সহজ কথায় বলিতে গেলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, খোলা-প্রাণের এবং ভরা-প্রাণের কার্য্যই মুক্ত ভাবের কার্য্য; তা' ছাড়া, মুখে এক ভাব—পেটে আর-এক ভাব, আপনার বেলায় এক ভাব—অন্যের বেলায় আর এক ভাব, এইরূপ সংকীর্ণ ভাবের যত কিছু কার্য্য আছে—সমস্তই বদ্ধ-ভাবের কার্য্য। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, মনুষ্যের হস্ত হইতে যখন মুক্ত ভাবের কার্য্য প্রথম প্রথম বাহির হয়, তখন তাহা অনেক ইতস্তত করিয়া বাহির হয়; ক্রমে

যখন তাহা সাধন দ্বারা পরিপক্বতা লাভ করে, তখনই তাহা যন্ত্র-চলনের ন্যায় অস্খলিত-ভাবে বাহির হইতে থাকে। একজন অভিনব ব্রতী গায়কের গীতি-কার্য্যে—হ'ল বা কোথাও স্বর-চ্যুতি হইয়া গেল—হ'ল বা কোথাও তাল-ভঙ্গ হইয়া গেল—হ'ল বা কোথাও রাগ-ভঙ্গ হইয়া গেল—এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে; কিন্তু খুব একজন পাকা ওস্তাদের গীত যন্ত্র-চালিত আর্গিনের গীতের ন্যায় অভ্রান্ত এবং অবিস্খলিত। আর্গিনের গীত এবং ওস্তাদের গীত দুইই অভ্রান্ত এবং অবিস্খলিত—কার্য্য দুইটি একই প্রকার—কিন্তু তাহার কারণ-দুইটির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়, যথা;—আর্গিনের গীত জড়-যন্ত্রে যন্ত্রিত বলিয়া অস্খলিত, ওস্তাদের গীত জড়-যন্ত্রে অযন্ত্রিত বলিয়া—মনের অবাধিত উচ্ছ্বাস বলিয়া—অস্খলিত; দু-য়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্যও যেমন—বৈপরীত্যও তেমনি! উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বদ্ধভাব মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ—মুক্তভাব মনুষ্যের সাধন-সিদ্ধ; বদ্ধ-ভাবের কার্য্য মনুষ্যের অভ্যস্ত কার্য্য, মুক্ত ভাবের কার্য্য মনুষ্যের অভীষ্ট কার্য্য। মনুষ্যের কার্য্য এইরূপ দুই পক্ষের বিবাদে আক্রান্ত হওয়াতেই—আপাততঃ তাহা যন্ত্রবৎ অব্যর্থ এবং অস্খলিত হইতে পারিতেছে না; কিন্তু আপাততঃ যাহাই হউক্ না কেন, কাল-ক্রমে মনুষ্যের সাধন যতই পরিপক্বতা লাভ করিবে—মুক্ত-ভাবের কার্য্য ততই তাহার স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের কার্য্য গোড়াগুড়িই—স্বভাবতই—নিত্য নিত্যই—মুক্ত ভাবের কার্য্য; তাই তাহা যন্ত্র-চলনের ন্যায় অভ্রান্ত এবং অস্খলিত। এইটি কেবল এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, ওস্তাদের গীত যন্ত্র-বৎ অস্খলিত বলিয়া ওস্তাদকে যেমন আর্গিন-যন্ত্র বলা বিধেয় নহে—ঈশ্বরের কার্য্য যন্ত্রের ন্যায় অস্খলিত বলিয়া ঈশ্বরকে তেমনি জগচ্চালক যন্ত্র বলা বিধেয় নহে; কেননা তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ভাবে—সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দের সহিত—জগৎ কার্য্য চালাইতেছেন; তিনি জড় পিণ্ডের ন্যায় অন্ধ-ভাবেও কার্য্য করেন না, আর, দেহ-বদ্ধ জীবদিগের ন্যায় শ্রমও অনুভব করেন না—সমস্ত জগৎ সংসার তাঁহার আনন্দেরই উচ্ছ্বাস।

স্বয়ম্ভু শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা তো যন্ত্র নহেনই—তাঁহার সৃষ্ট জগৎ কতদূর যন্ত্র নামের যোগ্য তাহাও বিবেচনা-স্থল। "যন্ত্র" শব্দ একটি মাত্র, কিন্তু তাহার অর্থ প্রধানতঃ তিনরূপ ও কড়াক্কড় করিয়া ধরিতে গেলে—অনেক রূপ। যন্ত্র শব্দের মুখ্য অর্থ নির্জীব যন্ত্র; যেমন ঘড়ির কল, তাঁত, ধোঁয়া-কল, ইত্যাদি। যন্ত্র শব্দের দ্বিতীয় অর্থ সজীব যন্ত্র; যেমন—বৃক্ষ একটি রস-কর্ষক যন্ত্র—অথবা ফলোৎপাদক যন্ত্র। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত যন্ত্র প্রথমোক্তের ন্যায় কেবল-মাত্র যন্ত্র নহে—তাহা প্রাণ × যন্ত্র অর্থাৎ প্রাণময় যন্ত্র। যন্ত্র শব্দের তৃতীয় অর্থ সচেতন যন্ত্র; যেমন জীব-দেহ। ঘড়ির কল অপ্রাণ যন্ত্র—বৃক্ষ সপ্রাণ যন্ত্র; এ যেমন, তেমনি—বৃক্ষ অচেতন যন্ত্র, জীব-দেহ সচেতন যন্ত্র; ঘড়ির কল যন্ত্র মাত্র; বৃক্ষ—প্রাণ × যন্ত্র অর্থাৎ প্রাণময় যন্ত্র; জীব-শরীর—মন × প্রাণ × যন্ত্র অর্থাৎ মনোময় প্রাণ-ময় যন্ত্র। মনুষ্য-শরীর = বুদ্ধি × মন × প্রাণ × যন্ত্র। মনুষ্যের মধ্যে আবার উন্নতি ভক্তের শরীর = আনন্দ × বুদ্ধি × মন × প্রাণ × যন্ত্র। সংক্ষেপে বলিলাম "আনন্দ" কিন্তু তাহার অর্থ বিষয়-

সুখ নহে – ঐন্দ্রিয়ক আনন্দ নহে ; আনন্দ কিনা আধ্যাত্মিক আনন্দ—ব্রহ্মানন্দ। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, শিশুর অন্তঃকরণে যেমন বিষয়-লালসা নাই অথচ সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজ করে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে সেইরূপ বিনা-কারণে সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজ করে; ঐন্দ্রিয়ক আনন্দ বিশেষ বিশেষ বিষয়কে অপেক্ষা করে—তাই তাহা সহেতুক (conditioned) আনন্দ বলিয়া উক্ত হয়; কিন্তু এখানে যে আনন্দের কথা হইতেছে তাহা অহেতুক (unconditioned) আনন্দ; তাহা ঐন্দ্রিয়ক বিষয়ে শৃঙ্খল-বদ্ধ নহে ;– তাহা উদার অমায়িক মুক্ত ভাবের আনন্দ। বিষয়-সুখ যেমন বিষয়-জ্ঞানের সহচর—স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিমল আনন্দ সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সহচর ; এইপ্রকার আনন্দেরই রশ্মি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মুখ-চক্ষু হইতে সময়ে সময়ে ফুটিয়া বাহির হইতে দেখা যায়। এখন বক্তব্য এই যে, সামান্য যন্ত্র (ঘড়ির কল) এক শ্রেণীর যন্ত্র ; প্রাণময় যন্ত্র (বৃক্ষ) আর এক শ্রেণীর যন্ত্র। সামান্য প্রাণ (যেমন বৃক্ষের প্রাণ) এক শ্রেণীর প্রাণ– তাহা সুখ-দুঃখ-বিহীন ; মনোময় প্রাণ (যেমন জীবের প্রাণ) আর এক শ্রেণীর প্রাণ। সামান্য মন (যেমন পশুর মন) এক শ্রেণীর মন ; বুদ্ধিময় মন (যেমন মনুষ্যের মন) আর এক শ্রেণীর মন- বিবেক-নিষ্ঠ (reflective) মন। সামান্য বুদ্ধি এক-শ্রেণীর বুদ্ধি; আনন্দ-ময় (inspirational) বুদ্ধি আর এক শ্রেণীর বুদ্ধি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে শুধু যদি কেবল যন্ত্র (যেমন ঘড়ির কল) বলা যায়, তবে প্রকৃত বৃত্তান্তটি'র কিছুই বলা হয় না। "নিউটন কে?" "এক জন গোরা লোক"—এ যেমন প্রশ্নোত্তর; "জগৎ কি?" "একটা যন্ত্র"—এ-ও অবিকল তেমনি। লৌকিক ব্যবহার-কালে অনেক সময়ে ষোলো আনা কথার এক আনা মাত্র আমাদের মুখে বাহির হয়—পোনেরো আনা কথা আমাদের পেটে থাকিয়া যায় ; চলিত ভাষায় কথা কহিবার সময় অনেক কথা আমরা সাঁটে-সোঁটে ইঙ্গিত-ইসারায় ব্যক্ত করি ; আর, তাহাতেই আমাদের কাজ চলিয়া যায়। এমন কি একজন মহা-মহোপাধ্যায় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতও আসল বৃত্তান্তটি সাত হাত জলের নীচে ফেলিয়া রাখিয়া মুখে বলিবার সময় নিশ্চয়ই বলেন "পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উঠিয়াছে ;" তা ভিন্ন, এরূপ কখনই বলেন না যে, পশ্চিম দিকে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে। জগৎকে যন্ত্র বলা সেইরূপ একটা মৌখিক ধরণের কথা—তাহা লৌকিক ব্যবহার স্থলেই শোভা পায়। কিন্তু জ্ঞানালোচনার সময় জগৎকে শুদ্ধ যদি কেবল যন্ত্র বলিয়াই নিরস্ত থাকা যায় (যেন জগতের মূলে আনন্দ নাই, প্রাণ নাই, ঈশ্বর নাই ; ও জগতের মর্ম্মে মর্ম্মে অস্থিতে অস্থিতে— ঈশ্বরের প্রভাব ওতপ্রোত-ভাবে পরিব্যাপ্ত নাই ; জগৎ একটা ঘড়ির কল মাত্র !) তবে তাহাতে কাহারো আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর এবং ভৌতিক বিশ্ব-যন্ত্রের মধ্যে একটি ধারাবাহিক সোপান-পরম্পরা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সে সোপান-পরম্পরা ঈশ্বরেরই প্রভাবের উচ্ছ্বাস। মূল-কারণের প্রভাব-স্ফূর্ত্তি হইতেই সাক্ষাৎ কারণ সকল উদ্গীরিত হইতেছে—এবং উদ্গীরিত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়-সাধনে উদ্যোগী হইতেছে। আমরা যদি সাক্ষাৎকারণ অস্বীকার করিতাম—যদি বলিতাম যে, মূল কারণ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন প্রকার কারণ জগতে নাই, তবেই প্রভাত বাবুর মুখে

এরূপ কথা মানাইত যে, আমাদের মতে মূল কারণই একমাত্র কর্ম্ম-কর্ত্তা, ও আর যত কিছু পদার্থ সমস্তই তাঁহার কার্য্য-সাধক যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু আমরা সাক্ষাৎ কারণের অস্তিত্ব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছি এবং এখনো স্বীকার করিতেছি। "গোড়া নাই আগা" অসম্ভব, কাজেই মূল-কারণের অস্তিত্ব না মানিলেই নয়; তেমনি আবার, "মধ্য নাই আগা" অসম্ভব, কাজেই সাক্ষাৎ কারণের অস্তিত্ব না মানিলেও চলে না। আমরা যখন সাক্ষাৎ কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি তখন তাহাতেই প্রভাত বাবুর বোঝা উচিত ছিল যে, সাক্ষাৎ কারণও কারণ—তবে কিনা তাহা আপেক্ষিক কারণ; যাহাই হৌক্—তাহা কারণ তো বটে? সাক্ষাৎ কারণে যদি কারণত্ব না থাকিত তবে তাহাকে আমরা মলেই "সাক্ষাৎ কারণ" বলিতাম না—আর কিছু বলিতাম; কেননা—যাহা কোন অংশেই কারণ নহে তাহা কখনও সাক্ষাৎ-কারণ নামে সংজ্ঞিত হইতে পারে না। যাহা কোন অংশেই জল নহে তাহা কখনও ঘোলা জল নামে সংজ্ঞিত হইতে পারে না। অতএব, প্রভাত বাবুর জানা উচিত ছিল যে, সাক্ষাৎ কারণও কতক অংশে কারণ; সাক্ষাৎ কারণও মূল কারণের কর্ম্ম-কর্তৃত্বের আংশিক অধিকারী। মূল কারণের সহিত সাক্ষাৎ কারণের সম্বন্ধ সবিস্তরে খুলিয়া বলিতে গেলে এইরূপ বলা বিধেয় যে, সাক্ষাৎ কারণ যে-অংশে কারণ—চালক—প্রবর্ত্তক—সেই অংশে তাহা মূল-কারণের অনুযোগী (অর্থাৎ মূল কারণের কারণত্বের অংশাধিকারী); আর সাক্ষাৎ কারণ যে অংশে কার্য্য—চালিত—প্রবর্ত্তিত—সেই অংশে তাহা মূল কারণের প্রতিযোগী। প্রভাত বাবু শুদ্ধ কেবল প্রতিযোগী সম্বন্ধটিই বুঝিয়াছেন—অনুযোগী সম্বন্ধটি একেবারেই তিনি বিস্মৃত। যেখানে অনুযোগী এবং প্রতিযোগী দুইই সম্বন্ধ এক সঙ্গে বিবেচ্য, সেখানে কেবল-মাত্র প্রতিযোগী সম্বন্ধটিকেই সর্ব্বস্ব করিয়া মানিলে কিরূপ ভ্রমে জড়াইয়া পড়িতে হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি:—মনে কর একজন সেনা-পতি দশ সহস্র সামান্য সৈন্যের এবং তাহাদের উচ্চ-নীচ অধিনায়কদিগের অধিপতি; আর, মনে কর সেনাপতির অধীনে দশজন সহস্র পতি রহিয়াছে; প্রত্যেক সহস্র-পতির অধীনে দশজন শত-পতি রহিয়াছে; প্রত্যেক শতপতির অধীনে দশজন দশপতি রহিয়াছে; প্রত্যেক দশপতির অধীনে দশজন সামান্য সৈন্য রহিয়াছে। এরূপ স্থলে মোটামটি যদিচ বলা যাইতে পারে যে, সেনাপতিই প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্তা—সৈন্যেরা কেবল তাহার কার্য্য-সাধক যন্ত্র; কিন্তু তাহা হইলে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্তটির কিছুই বলা হয় না। ঠিক্ সত্যটি ব্যক্ত করিয়া বলিতে গেলে এইরূপ বলা আবশ্যক যে, সেনাগণের মধ্যে যে ব্যক্তি যে অংশে নিম্ন পদবীস্থ সে-ব্যক্তি সেই অংশে যন্ত্রবৎ পরিচালিত; আর, যে ব্যক্তি যে অংশে উচ্চ পদবীস্থ সে ব্যক্তি সেই অংশে সেনাপতির প্রতিনিধি-স্বরূপ—সুতরাং সেই অংশে সেনাপতির কর্ত্তৃত্ব-ভার তাহাতে বর্ত্তিতেছে। সৈন্যেরা সেনাপতির যন্ত্র-স্বরূপ এইটিই এখানে প্রতিযোগী সম্বন্ধ; আর, সৈন্যেরা উচ্চ নীচ পদবী অনুসারে সেনাপতির কর্ত্তৃত্বের অংশাধিকারী—এইটিই এখানে অনুযোগী সম্বন্ধ; উভয় সম্বন্ধই এক সঙ্গে বিবেচ্য। যদি অনুযোগী সম্বন্ধটি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিযোগী সম্বন্ধটিকেই সর্ব্বস্ব

করিয়া মানা যায় তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, সেনা-মণ্ডলীর যুদ্ধ কার্য্য এক প্রকার পুৎলো-বাজি, আর, সেনা-পতি সেই পুৎ-লো-বাজির বাজিকর; তেমনি আবার, যদি প্রতিযোগী সম্বন্ধটি ছাড়িয়া দিয়া কেবল-মাত্র অনুযোগী সম্বন্ধটিকেই সর্ব্বস্ব করিয়া মানা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, প্রত্যেক সেনারই যুদ্ধ-কার্য্যে ষোলো আনা কর্ত্তৃত্ব, অথবা যাহা একই কথা—প্রত্যেক সেনাই সেনাপতি। দুইই এক দিক্ ঘেঁসা ভ্রম-সিদ্ধান্ত—সত্য উভয়ের মধ্য স্থলে। সত্য যাহা—তাহা এই যে, সেনাপতির ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব; সহস্র পতির দশমাংশ কর্ত্তৃত্ব; শতপতির শতাংশ কর্ত্তৃত্ব; দশপতির সহস্রাংশ কর্ত্তৃত্ব; অধম সেনার সহস্রাংশের দশমাংশ কর্ত্তৃত্ব। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এরূপ কর্ত্তৃত্ব-বিভাগ একটা মনুষ্যকৃত কৃত্রিম ব্যাপার বই নয়; মনুষ্য-সমাজেই কেবল—এইরূপ কর্ত্তৃত্ব-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; তা ভিন্ন আর কোথাও নহে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, কি অন্তর্জগতে—কি বহির্জগতে—প্রকৃতির কার্য্য-প্রণালী সর্ব্বত্রই এরূপ; যথা;—

(১) অপ্রাণ ভৌতিক জগতে এইরূপ দেখা যায় যে, সূর্য্যের আকর্ষণ-কর্ত্তৃত্ব আংশিকরূপে গ্রহ-গণে বর্ত্তিতেছে—গ্রহের আকর্ষণ-কর্ত্তৃত্ব আংশিক-রূপে উপগ্রহে বর্ত্তিতেছে;—এই গেল অনুযোগী সম্বন্ধ। আর-একদিকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি সূর্য্যের নিকটে নতশির—উপগ্রহের আকর্ষণ-শক্তি গ্রহের নিকটে নতশির? এই গেল প্রতিযোগী সম্বন্ধ। সেনাপতির উপমাটি এখানে দিব্য সংলগ্ন হয়; যেমন—সেনাপতি, সহস্র পতি, শত পতি; তেমনি—সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ। সহস্র-পতি একদিকে যেমন সেনাপতির আজ্ঞায় চালিত হইয়া চলিতেছে—আর-এক দিকে তেমনি সেনাপতির প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া শত-পতিগণকে চালাইতেছে। পৃথিবীও তেমনি; এক দিকে সে যেমন সূর্য্যের আকর্ষণে চালিত হইতেছে, আর এক দিকে তেমনি সূর্য্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া চন্দ্রকে চালনা করিতেছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অনুযোগী এবং প্রতিযোগী দুইই সম্বন্ধ দুই পক্ষেই সমান।

(২) সপ্রাণ ভৌতিক জগতে এইরূপ দেখা যায় যে, শাখা মূলের আশ্রিতও বটে—প্রতিনিধিও বটে—দুইই; কেননা, মূল যেমন শাখার আশ্রয়-দাতা, শাখাও তেমনি উপশাখার আশ্রয়-দাতা।

(৩) অন্তর্জগতেও তাই। বহির্জগতে মূল শাখা এবং উপশাখার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, অন্তর্জগতে বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ;—সকল জগৎ একই আদর্শে পরিগঠিত! কেনই বা তাহা না হইবে,—জগৎ সহস্র-ধা বিচিত্র হইলেও তাহা একেরই সৃষ্টি। জগৎ একেরই সৃষ্টি—এ বৃত্তান্তটিকে জগৎ অতল-স্পর্শ গহ্বরের অভ্যন্তরে চাপাচুপি দিয়া কোন মতেই গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না,—উহাকে একদিকে চাপা দিয়া রাখিতে গেলে উহা আর-এক দিক্ দিয়া তাড়িয়া ফুঁড়িয়া বাহির হয়। একত্বের আদর্শটিকে ভৌতিক আবরণে চাপা দিয়া রাখিতে গেলে উহা উদ্ভিদ্ জগতে বাহির হইয়া পড়ে; উদ্ভিদ্ জগতে উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে গেলে চেতন-জগতে বাহির হইয়া পড়ে। একত্বের আদর্শটি মনুষ্যের আত্মাতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট-

ভাব ধারণ করে—কিন্তু আছে তাহা সর্ব্ব-স্থানেই; কঠিন ভৌতিক পিণ্ডেও তাহা ভার-কেন্দ্র-রূপে (centre of gravity) বর্ত্তমান! ভার-কেন্দ্র যদিচ একটি জ্যামিতিক বিন্দু-মাত্র—তা ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বিন্দুটির উদরাভ্যন্তরে অনেক কথা সংগোপিত রহিয়াছে—একটি কথা তাহার মধ্যে এই যে, জড়-পরমাণু-সকল যদিচ গণনায় পৃথক্ পৃথক্—তথাপি সকলের মধ্য দিয়া একই ঐক্য-সূত্র আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সটানে চলিয়াছে। ভার-কেন্দ্রের অর্থই এই যে, পরিমাণুগণ বাহিরে দেখিতেই কেবল পরস্পর-হইতে বিচ্ছিন্ন—ভিতরে ভিতরে তাহারা একেরই শাখা-প্রশাখা। অনেক দিনের পর তুই ভ্রাতায় পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলেই যেমন দোঁহে দোঁহার সহিত কোলাকুলি করে—তুই পরমাণু সেইরূপ কাছাকাছি হইলেই দোঁহে দোঁহার প্রতি ধাবিত হয়; ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে—যে, ভ্রাতৃ-দ্বয়ও যেমন—পরমাণু-দ্বয়ও তেমনি—পূর্ব্ব হইতেই উভয়ে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। আলিঙ্গন-টিই কেবল নূতন ঘটনা কিন্তু সৌহার্দ্দ-সম্বন্ধটি পুরাতন বন্ধন-সূত্র। ভৌতিক-বস্তু-মাত্রেরই ভার-কেন্দ্র সেই আন্তরিক বন্ধন-সূত্রটির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বহির্জগতের বন্ধন-সূত্র আমরা ভাবে গতিকে বুঝিয়া লই, কিন্তু অন্তর্জগতের বন্ধন-সূত্র আমরা অন্তশ্চক্ষুতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাই;—বাহিরে যেমন আকর্ষণ-বন্ধন, অন্তরে তেমনি প্রেম বন্ধন; বাহিরে যেমন বিকর্ষণ, অন্তরে তেমনি স্বৈর-ভাব। অনুযোগী প্রতিযোগী তুইই সম্বন্ধ বহির্জগতের আকার-প্রকারে ভাবে-গতিকে আভাসিত হয়; অন্তর্জগতে তাহা অন্তশ্চক্ষুতে পষ্টাপষ্টি ধরা দেয়। তাহার সাক্ষী—বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ—ভেদাভেদ—অনুযোগিতা-প্রতিযোগিতা।

প্রথম ইন্দ্রিয়;—ইন্দ্রিয় বলিতে কি বুঝায়? শুধু কি কেবল শরীরের অঙ্গ বিশেষ বুঝায়? না—তাহা নহে। চর্ম্ম-চক্ষুও চক্ষু নহে—চর্ম্ম-কর্ণও কর্ণ নহে। এমন কি, প্রসুপ্ত ব্যক্তির উন্মীলিত চক্ষুও চক্ষু নামের যোগ্য নহে; কেননা—তাহাতে দৃষ্টি-শক্তি অবর্ত্তমান। দৃষ্টি-শক্তি এক প্রকার মানসিক শক্তি—সে শক্তি চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত প্রাণ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়া কার্য্য করে—তাহাই প্রকৃত চক্ষু; চর্ম্ম চক্ষু তাহার বহিরাবরণ মাত্র। তলোয়ারের খাপও তলোয়ার নহে—ইন্দ্রিয়ের বহিরাবরণও ইন্দ্রিয় নহে। বহির্দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয় বটে যে, চক্ষু বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়—শুদ্ধ কেবল শরীরেরই অঙ্গ-বিশেষ; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা মনেরই বৃত্তি-বিশেষ। যে-অংশে উহা শরীরের অঙ্গ-বিশেষ, সেই অংশে উহা ইন্দ্রিয়ের বাহ্য আবরণ; আর, যে অংশে উহা মনের বৃত্তি-বিশেষ সেই অংশে উহা প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়।

দ্বিতীয়, মন;—সেনাপতি এক হিসাবে সেনারই সামিল; কিন্তু আর এক হিসাবে সেনাপতি সেনা নহে—কিন্তু সেনার অধিনায়ক। যাহারা দলবদ্ধ হইয়া সশস্ত্রে যুদ্ধ করিতে যায়, তাহারাই সেনা—কাজেই সেনাপতিও সেনা; কিন্তু সেনাপতি এক-দিকে যেমন সেনা, আর-একদিকে তেমনি সেনাগণের সর্ব্বাধ্যক্ষ। দলবদ্ধ যোদ্ধাগণ সকলেই সেনা—সেনাপতিও সেনা; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর কোন ব্যক্তি সর্ব্বাধ্যক্ষ নহে—এক কেবল সেনাপতিই তাহা-

দের মধ্যে সর্ব্বাধ্যক্ষ। যদ্দ্বারা দেখা শোনা প্রভৃতি বিষয়-গ্রহণ সংসাধিত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়—কাজেই মনও ইন্দ্রিয়; কেননা, কি শব্দ-শ্রবণ, কি রূপ-দর্শন, কি রসাস্বাদন, মনের কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোনও উপলব্ধি-কার্য্যই চলিতে পারে না। কিন্তু সেনা-পতি একদিকে যেমন সেনা—আর-এক দিকে তেমনি সেনা-গণের অধিনায়ক; মন একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়, আর এক দিকে তেমনি ইন্দ্রিয়-গণের অধিনায়ক। চক্ষু শুধু কেবল দর্শন-কার্য্যেরই কর্ত্তা—শ্রবণ কার্য্যের নহে; কর্ণ শুধু কেবল শ্রবণ কার্য্যেরই কর্ত্তা—দর্শন-কার্য্যের নহে; কিন্তু মন দর্শন-কার্য্যেরও কর্ত্তা—শ্রবণ-কার্য্যেরও কর্ত্তা—সকল ইন্দ্রিয়-কার্য্যেরই কর্ত্তা। চক্ষু না থাকিলেও কর্ণ শুনিতে পায়, কর্ণ না থাকিলেও চক্ষু দেখিতে পায়; কিন্তু মন না থাকিলে চক্ষুও দেখিতে পায় না—কর্ণও শুনিতে পায় না- কোনো ইন্দ্রিয়ই কোনো কার্য্য করিতে পারে না। অতএব মনও ইন্দ্রিয়, অপরাপর ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়; কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, মন অধিনায়ক ইন্দ্রিয়—আর আর ইন্দ্রিয় অধীনস্থ ইন্দ্রিয়; এ প্রভেদটি অনিবার্য্য। সেনাপতি যেমন অধীনস্থ অধিনায়কদিগের একের অবর্ত্তমানে তাহার কার্য্য অন্যকে দিয়া চালায়—মন তেমনি চক্ষুর অবর্ত্ত-মানে চক্ষুর কার্য্য কতক-বা কর্ণকে দিয়া - কতক-বা স্পর্শেন্দ্রিয়কে দিয়া—চালায়; অন্ধ ব্যক্তির শ্রবণ এবং স্পর্শ যে, এত সজাগ, তাহার কারণই ঐ। ইন্দ্রিয় না থাকিলেও মন আপনার ভিতর হইতে ইন্দ্রিয় যোগায়, যেহেতু, সকল ইন্দ্রিয়ই মনের অভ্যন্তরে বীজ-ভাবে বর্ত্তমান রহি-য়াছে। মনের অভ্যন্তরে যদি ইন্দ্রিয়-সকল বীজ ভাবেও বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে স্বপ্নের দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার-গুলি অসম্ভব হইত; কেননা, মনের অভৌ-তিক চক্ষু দ্বারাই আমরা স্বপ্নের আলোক দর্শন করি; মনের অভৌতিক কর্ণ দ্বারাই আমরা স্বপ্নের গীত শ্রবণ করি। জাগ্রৎ কালেও আমরা যখন মনে মনে গীত গাই—তখন তাহা আমরা মনঃকর্ণে শ্রবণ করি—এ কর্ণে নহে; যখন আমরা আগ্নেয় গিরির অগ্নি-উদ্গীরণ ভাবনা করি, তখন সেই মান-সিক অগ্নি-উদ্গীরণ আমরা মনশ্চক্ষে দর্শন করি—এ চক্ষে নহে; এইরূপ দেখা যাই-তেছে যে, দর্শন শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় মনের অভ্যন্তরে বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনেরই শক্তি-ভূত। প্র-ভাত বাবু নিশ্চয়ই এখানে বলিবেন যে, রূপবান্ বস্তুর প্রতিবিম্ব যাহা নেত্র-গো-লকে নিপতিত হয়, সেই প্রতিবিম্ব তলে তলে উদ্বোধিত হইয়াই স্বপ্নের দৃশ্য-রাজি গঠন করিয়া তুলে। প্রভাত বাবুর এই কথাটিতেই যদি সব গোল মিটিয়া যাইত, তবে আর ভাবনা ছিল না! দৃশ্যমান অট্টালিকাদির নেত্রগত প্রতিবিম্বই প্র-কৃত দৃশ্য বস্তু—এ যেন হইল; কিন্তু তাহাতে কাহার কি আইল গেল? দৃশ্য অট্টালিকা এবং দৃশ্য অট্টালিকার প্রতি-বিম্ব এ দুয়ের মধ্যে কেবল ছোটো ব'ড়র প্রভেদ—দূর নিকটের প্রভেদ—এ বই তো আর নয়! অট্টালিকার প্রতিবিম্বই দৃশ্য অট্টালিকা এ কথা সত্য হইলেও তাহা যে, প্রতিবিম্ব বলিয়াই দৃশ্য তাহা তো আর নহে! নিদ্রিত ব্যক্তির অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষে অট্টালিকার প্রতিবিম্ব বিলক্ষণই নিপতিত হয়—অথচ অট্টালিকা তাহার দৃষ্টিতে প্রতি-ভাত হয় না। প্রভাত বাবু হদ্দ মুদ্দ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে, বাহ্য-পদার্থ-সক-লের ছবি আলোক-যানে ভর করিয়া স্নায়ু-

ময় নেত্র-পটে উপস্থিত হয়—এটা একটা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত। কিন্তু বস্তু-সকলের ছবি কিরূপে নেত্র-পটে চিত্রিত হয়, তাহার কথা এখানে হইতেছে না; চিত্রিত ছবি কিরূপে দৃশ্য হয় তাহাই এখানে জিজ্ঞাস্য। চর্ম্ম-চক্ষুই পটের ন্যায় বিস্তৃত; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চর্ম্ম চক্ষু চক্ষুর বহিরাবরণ-মাত্র। সেই বহিরাবরণের অভ্যন্তরস্থিত দর্শন-শক্তি, যাহা পটের ন্যায় বিস্তৃত নহে—কিন্তু জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় অবিস্তৃত, তাহাই প্রকৃত পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়। সেই অবিস্তৃত কেন্দ্র হইতে কিরূপে বিস্তৃত দৃশ্য বিকসিত হয় (তা সে দৃশ্য-খানি প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রই হউক, আর সেই সমুদ্রের হিম-বিন্দু পরিমাণ ক্ষুদ্র একটি প্রতিবিম্বই হউক, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না—ছোটো বড়োতে কিছুই আইসে যায় না, বিস্তৃত অবিস্তৃত লইয়াই কথা) অবিস্তৃত কেন্দ্র হইতে কিরূপে বিস্তৃত দৃশ্য বিকসিত হয়—এইটিই এখানকার একমাত্র জিজ্ঞাস্য। আমরা তাই বলি (আর, সকলেই এটা স্ব স্ব অন্তরে উপলব্ধি করেন) যে, অন্তরস্থিত অবিস্তৃত চক্ষুরিন্দ্রিয়ই দর্শন-ক্রিয়ার মূল-শক্তি—দৃশ্য-বস্তুর নেত্রগত প্রতিবিম্ব সে শক্তির উদ্দীপক মাত্র। আর, এটাও সকলেরই জানা কথা যে, এইরূপ যত প্রকার অন্তরস্থিত অবিস্তৃত ইন্দ্রিয় আছে—মনই তাবতের অধিনায়ক। অতএব মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়-রাজ্যে মনের অধিকার ষোলো আনা—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এক-একটির অধিকার তাহার পঞ্চম অংশ মাত্র। আর যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দুইকে ধরা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে, দশ ইন্দ্রিয়ের এক-একটির অধিকার মনঃক্ষেত্রের দশম অংশ মাত্র।

তৃতীয়—বুদ্ধি; আমরা যদি বলি যে, মন চিন্তার ইট কাট সংগ্রহ করে এবং বুদ্ধি চিন্তার অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করে, তবে পাঠক হয় তো মনে করিবেন যে, আমাদের মতে বুদ্ধি এবং মন যেন দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি; তাহা যদি তিনি মনে করেন তবে সেটি তাঁহার বড়ই ভুল। কাজের সময়েও যেমন—জ্ঞানচর্চ্চার সময়েও তেমনি—দেশ-কাল-পাত্র সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। যেখানে দেশভেদের কথা হইতেছে সেখানে কাল-ভেদ বা পাত্র-ভেদ বুঝিলে চলিবে না; যেখানে কাল-ভেদের কথা হইতেছে সেখানে দেশ-ভেদ বা পাত্র-ভেদ বুঝিলে চলিবে না; যেখানে পাত্র-ভেদের কথা হইতেছে সেখানে দেশ-ভেদ বা কাল-ভেদ বুঝিলে চলিবে না। বস্তু-সকলের অংশ-ভেদ বা অঙ্গ-ভেদ দেশ-ভেদকে অপেক্ষা করে; তাহার সাক্ষী—চক্ষু একস্থানে, কর্ণ আর-একস্থানে; হস্ত এক স্থানে, পদ আর এক স্থানে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শরীরের অঙ্গ-ভেদ বা অংশ-ভেদ দেশ-ভেদকে অপেক্ষা করে। বৃত্তিভেদ কাল-ভেদকে অপেক্ষা করে; যেমন, প্রথমে দর্শন—পরে স্মরণ—পরে কল্পনা; অথবা, প্রথমে সংশয়, পরে অনুসন্ধান, পরে তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ; ইহাদের মধ্যে যত কিছু বৃত্তি-ভেদ সমস্তই কাল-ভেদের অনুযায়ী। তাহার পরে আসিতেছে—পাত্র-ভেদ; পাত্র-ভেদ—কি না ব্যক্তি-ভেদ। এখন বক্তব্য এই যে, (১) যেখানে বলা হইতেছে "সঞ্জয় দেখেন এবং ধৃতরাষ্ট্র শোনেন," সেখানে দ্রষ্টা এবং শ্রোতার মধ্যে ব্যক্তি-ভেদ বুঝিতে হইবে। (২) যেখানে বলা হইতেছে "চক্ষু দেখে এবং কর্ণ শোনে" সেখানে দ্রষ্টা এবং শ্রোতার মধ্যে (নেত্র-কর্ণ ঘটিত) অঙ্গভেদের সঙ্গে

সঙ্গে (দর্শন-শ্রবণ-ঘটিত) বৃত্তি-ভেদ বুঝিতে হইবে; এ ভিন্ন সেখানে ব্যক্তি-ভেদ বুঝিলে কোন ক্রমেই চলিবে না। (৩) যেখানে বলা হইতেছে "মন তোলাপাড়া করে, বুদ্ধি তত্ত্ব নিরূপণ করে," সেখানে শুদ্ধ কেবল বৃত্তি-ভেদই বুঝিতে হইবে; তা ছাড়া—সেখানে অঙ্গ-ভেদ বুঝিলেও চলিবে না—ব্যক্তি-ভেদ বুঝিলেও চলিবে না। অঙ্গ-ভেদের বেলা'য়ই এরূপ কথা খাটে যে, হাত উপরে—পা নীচে; এক হাত বামে—আর এক হাত ডাহিনে; কিন্তু বৃত্তি-ভেদের বেলায় এরূপ কথা কোন-ক্রমেই খাটে না যে, মন বামে—বুদ্ধি ডাহিনে; অথবা মন নীচে—বুদ্ধি উপরে। মন এবং বুদ্ধির প্রভেদ নির্ণয়-কালে দৈশিক সম্বন্ধ কোন কার্য্যেই লাগে না—কালিক সম্বন্ধই কেবল কার্য্যে লাগে। কালিক সম্বন্ধ অনুসরণ করিয়াই আমরা পাইতেছি যে, মন ক্ষণিক বৃত্তি—বুদ্ধি ত্রৈকালিক বৃত্তি, যথা;—

হনুমান যখন অশোক বনে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যস্থলে সীতাকে সর্ব্ব প্রথমে দেখিল, তখন এটা সে বেস্ বুঝিল যে, ইনি কোন অংশেই রাক্ষসী নহেন; কিন্তু তিনি যে, সীতা, এটা তখন সে বুঝিল না;—কেমন করিয়াই বা বুঝিবে? তাহার পূর্ব্বে সীতাকে সে কস্মিন্ কালেও দেখে নাই। একবার তাহার মনে হইতেছে যে, এ হয় তো কোন দেব-কন্যা; আবার মনে হইতেছে—হয় তো বা ইনিই সীতা; কিন্তু তাহার মন একটা কোন কিছুতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। "ইনি রাক্ষসী নহেন" এইটিই এস্থলে বুদ্ধি-ক্রিয়া; এই যে বুদ্ধি-ক্রিয়া ইহা একটি ত্রৈকালিক ব্যাপার—মনের ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার নহে। "ইনি রাক্ষসী নহেন" এটা স্থির করিবার সময় হনুমানের অন্তঃকরণে অতীত-মুখী (স্মরণ), বর্ত্তমান-মুখী (প্রত্যক্ষ), এবং ভবিষ্যৎ-মুখী (সংকল্প)—এই তিনমুখী তিন বৃত্তি এক-মুখী হইয়া কার্য্য করিয়াছে। হনুমানের বুদ্ধিতে এটা তো স্থির যে, "ইনি রাক্ষসী নহেন"? তবেই হইতেছে যে, হনুমান ইহার পূর্ব্বে রাক্ষসী দেখিয়াছে; সেই দৃষ্ট-পূর্ব্ব রাক্ষসীদের সঙ্গে সীতার চতুর্দিকস্থ রাক্ষসীদের খুবই সে ঐক্য দেখিতে পাইতেছে—সীতার কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিন্দু-বিসর্গও ঐক্য দেখিতে পাইতেছে না। এই গেল ভূত কালের সহিত বর্ত্তমানের ঐক্যানৈক্য; ইহাতে অন্তঃকরণের অতীত-মুখী এবং বর্ত্তমান-মুখী—উভয়-মুখী বৃত্তিরই সহকারিতা রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ-বৃত্তিও কার্য্য করিতে থাকে, যথা;—ইনি রাক্ষসী ন'ন—এটা স্থির; হয় ইনি দেবী—নয় বর-গুণান্বিতা মানবী—কি তাহা স্থির করা যা'ক,—এই সংকল্পটি ভবিষ্যৎ-মুখী। "ইনি রাক্ষসী ন'ন" এই সিদ্ধান্তটি—"ইনি সীতা" এই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তটির পত্তন-ভূমি। মন এটা হইতে ও-টাতে—ওটা হইতে সেটাতে ধাবিত হয়; বুদ্ধি সমস্তের মধ্যে ঐক্যানৈক্য অবধারণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করে। মন একবার সীতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে—একবার দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয় স্মরণ করিতেছে—একবার কি করিবে তাহা ভাবিতেছে; একবার বর্ত্তমান, একবার অতীত, একবার ভবিষ্যৎ, এইরূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; বুদ্ধি—মনের অসম্বদ্ধ ব্যাপারগুলিকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করিয়া যথাবৎ সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছে। এইরূপ, মনুষ্যের অন্তঃকরণে দুই-অঙ্গের দুইটি বৃত্তির অন্বেষণ পাওয়া যায়—একটি ক্ষণিক অস-

স্বন্ধ ব্যাপারে ব্যাপৃত—ইহারই নাম মন; আর একটি ত্রৈকালিক বন্ধন-সূত্রে ব্যাপৃত—ইহারই নাম বুদ্ধি। অতএব মোটামুটি-গণনায় বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধি-বৃত্তির অধিকার-ভূমি ষোলো আনা; আর (১) অতীত বৃত্তি—স্মরণ, (২) বর্ত্তমান বৃত্তি—প্রত্যক্ষ, এবং (৩) ভবিষ্যৎ বৃত্তি—সঙ্কল্প, তিনটি মনোবৃত্তির এক-একটির অধিকার-ভূমি তাহার তৃতীয়াংশ মাত্র। সর্ব্ব-সমেত এইরূপ;—

ত্রৈকালিক বৃত্তি (বুদ্ধি)

অতীত-মুখী মন	বর্ত্তমান-মুখী মন	ভবিষ্যৎ-মুখী মন
(স্মরণ)	(প্রত্যক্ষ)	(সঙ্কল্প)

মন

দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন স্পর্শ

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সূর্য্য গ্রহ এবং উপগ্রহের মধ্যেও যেমন—বৃক্ষ শাখা এবং উপশাখার মধ্যেও তেমনি—বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তথৈব—প্রকৃতির সর্ব্বত্রই গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ধারা-বাহিক সোপান-পদ্ধতি বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেই সোপান-পদ্ধতির মাঝের ধাপ উল্লঙ্ঘন করিয়া নীচের ধাপ হইতে উপরে ওঠাও সম্ভবে না—উপরের ধাপ হইতে নীচে নাবাও সম্ভবে না। এমন কি—লঙ্কায় যাইবার সময় পৌরাণিক হনুমানকেও মাঝের সমুদ্র পথ না হউক—মাঝের বায়ুপথ—অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। গন্তব্য পথে পৌঁছিতে হইলে মাঝের পথ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে—এটি একটি ধ্রুব সিদ্ধান্ত। এখন, ঈশ্বর সর্ব্বোপরিস্থিত এবং ভৌতিক জগৎ সর্ব্বনিম্নস্থিত—এটা যখন স্থির, তখন কাজেই এ লোক হইতে অন্যলোকে সংক্রমণ করিতে হইলে মাঝের পথ অলঙ্ঘনীয়। ঈশ্বরের প্রভাব যাহা ধারা-বাহিক সোপান-পরম্পরায় সর্ব্ব-জগতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে তাহাই সেই মাঝের পথ। ঘড়ি-ওয়ালার প্রভাব কিছু আর ঘড়ির মর্ম্মের অভ্যন্তরে অর্থাৎ ঘড়ির প্রত্যেক পরমাণুর গূঢ়-তম প্রদেশে—কার্য্য করে না, তাহা ঘড়ির উপরে উপরেই কার্য্য করে; এই জন্য, ঘড়িওয়ালাকে যদি অষ্টপ্রহরই ঘড়ি লইয়া কর্ম্ম-শীল থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাহার কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকিত না; কেননা, ঘড়ি ঘড়ি-ওয়ালার বাহিরের বস্তু,—বাহিরের বস্তুর সঙ্গে কোস্তাকুস্তি করা শ্রমের কার্য্য সুতরাং তাহা মাত্রাতিশয্য হইলেই তাহা কষ্ট-কর হইয়া উঠে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রভাব জগতের নিগূঢ় মর্ম্মাভ্যন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে; ঘড়িওয়ালার কার্য্য যেমন বাহিরের বস্তুর সহিত কোস্তাকুস্তি—ঈশ্বরের কার্য্য সেরূপ নহে; কেননা জগৎ ঈশ্বরের প্রভাবেরই উচ্ছ্বাস—আনন্দেরই উচ্ছ্বাস—তা ভিন্ন তাহা তাঁহার বাহিরের কোনো-কিছু নহে; কাজেই জগৎ লইয়া সদা-কর্ম্মশীল থাকা ঈশ্বরের পক্ষে শ্রম-জনকও নহে—কষ্ট-জনকও নহে। কিন্তু এখানে এইটি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক যে, ঈশ্বরের প্রভাব সর্ব্বজগতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে, এ কথার অর্থ এরূপ নহে যে, ঈশ্বরের প্রভাব সকল স্থানে একই ভাবে কার্য্য করিতেছে। যদি বলা যায় যে, নেপোলিয়নের প্রভাব সৈন্য মণ্ডলীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে—তাহাতে কিছু আর এরূপ বুঝায় না যে, একজন সামান্য পদাতিককে তিনি যতটা কর্ত্তৃত্ব-ভার দিয়াছেন—সহস্র-পতিকে তিনি তাহার অধিক কর্ত্তৃত্ব-ভার দেন নাই; নেপোলিয়নের নিজের তুলনায় সহস্র-

পতির কর্ত্তৃত্ব কিছুই নহে—কিন্তু একজন সামান্য পদাতিকের তুলনায় সহস্র-পতির কর্ত্তৃত্ব কম কর্ত্তৃত্ব নহে। সেনাপতির অধীনস্থ সামান্য সৈন্য যদি চারি সহস্র মাত্র হয়, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, সেনাপতির কর্ত্তৃত্ব ষোলো আনা—সহস্র-পতির কর্ত্তৃত্ব তাহার সিকি অংশ মাত্র; কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—সেনাপতির ষোলো আনা কর্ত্তৃত্বের সিকি অংশ সহস্র-পতিতে বর্ত্তিতেছে বলিয়া এরূপ আমরা বলিতে পারি না যে, সহস্রপতি যখন সেনাপতির চারি আনা কর্ত্তৃত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন সেনাপতির ষোলো আনা কর্ত্তৃত্ব হইতে চারি আনা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেনাপতির ষোলো আনা কর্ত্তৃত্বের ষোলো আনাই সেনাপতিতে বর্ত্তমান থাকে অথচ তাহার চারি আনা অংশ সহস্রপতিতে উপসংক্রান্ত হয়—এতো একটা জানা শুনা কথা; অতএব এই যে একটি কথা যে, ঈশ্বরের সমস্ত কর্ত্তৃত্বই ঈশ্বরেতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে—অথচ সেই অক্ষয় ভাণ্ডারের অংশোপাংশ যথা-পাত্রে যথা-পরিমাণে নিয়তই বর্ত্তিতেছে, এ কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই সে বিষয়ে আর কোনও প্রকার সংশয় থাকিতে পারে না। যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, জগতে প্রাণ রহিয়াছে—মন রহিয়াছে—বুদ্ধি রহিয়াছে—আনন্দ রহিয়াছে, তখন আমরা কোন্ লজ্জায়—কোন্ সাহসে—কোন্ যুক্তিতে বলিব যে, জগৎকে ঈশ্বর শুধু কেবল একটা যন্ত্র মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত আছেন; অর্থাৎ জগতে শুদ্ধ কেবল ঈশ্বরের প্রতিযোগী ভাবই আছে—তাঁহার অনুযোগী ভাব মূলেই নাই। কেহ যদি বলে যে, পৃথিবীতে সূর্য্যের রশ্মি নিপতিত হয় না—অথচ বৃক্ষাদির ছায়া নিপতিত হয়; তবে সে কথাও যেমন, আর, উপরি-উক্ত ও-কথাটিও তেমনি, দুইই সমান যুক্তি-বিরুদ্ধ। এমন প্রাণ-মন-বুদ্ধি-বল-সমন্বিত বিচিত্র জগৎকে প্রভাত বাবু যদি শুধু কেবল একটা ঘড়ির কলের মত যন্ত্র-ভাবে দেখেন—তবে তিনি কিরূপে এ-আশা করেন যে, অন্যেরা তাঁহাকে যন্ত্র-ভাবে দেখিবে না—জ্যান্ত মনুষ্য-ভাবে দেখিবে? অবশ্য, ঈশ্বরের পূর্ণ প্রভাব জগতের কুত্রাপি নাই; তাহা স্বয়ং ঈশ্বরেতেই আছে (যেমন সৈন্য-মণ্ডলীর উপরে ষোলো আনা কর্ত্তৃত্ব কেবল সেনা-পতিরই আছে—অন্য কাহারো নাই); কিন্তু তাহা বলিয়া কি সৈন্য-গণ সেনাপতির প্রভাবের যথা-পরিমাণ অংশাধিকার প্রাপ্ত হয় না? ঈশ্বরের প্রভাব কি সমস্ত জগন্ময় যথা পরিমাণ অংশোপাংশ ক্রমে পরিব্যাপ্ত হয় না? সেশ্বর জগৎও কি নিরীশ্বর জগতের ন্যায় শ্রী-ভ্রষ্ট—প্রাণ-ভ্রষ্ট—জ্ঞান-ভ্রষ্ট (এক কথায়—ঈশ্বর-ভ্রষ্ট)? এ তো হইতেই পারে না। সজীব শরীরও মৃত শরীরের ন্যায় নির্জীব হইতে পারে না—সেশ্বর জগৎও নিরীশ্বর জগতের ন্যায় যন্ত্র-মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। প্রভাত বাবুর কথার প্রতিবাদ করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এত কথা বিস্তার করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না—শুধু কেবল এই বলিলেই হইত যে, যদি মূল-কারণ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন কারণ না থাকিত তবেই তাঁহার এ কথা শোভা পাইত যে, মূল কারণই এক-মাত্র কর্ম্মকর্ত্তা, আর সমুদায়ই শুদ্ধ কেবল যন্ত্র-মাত্র; কিন্তু আমরা যখন বলিয়াছি যে, মূলকারণ ছাড়া সাক্ষাৎ কারণও আছে, ত-

খন তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে, সাক্ষাৎ কারণও কতক অংশে কারণ – সুতরাং মূল-কারণের কারণত্বের আংশিক অধিকারী। ঈশ্বর শুধু কেবল নির্জীব যন্ত্রের ঈশ্বর নহেন—মৃত জগতের ঈশ্বর নহেন—তিনি দেব মনুষ্য পশু পক্ষী উদ্ভিদ্ চরাচর সমস্ত-সম্বলিত সমগ্র জগতের ঈশ্বর। শ্রীদি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার।

আমাদের কোন কোন ব্রাহ্ম-ভ্রাতার এইরূপ মত যে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া উহা যতদূর প্রচারিত হইয়াছে তাহা বড় আশা-প্রদ নহে। তাঁহাদের সংস্কার যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যতদূর প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই এবং উহা দ্বারা দেশের লোকের কুসংস্কার যতদূর দূরীকৃত হইবার ভরসা ছিল তাহা হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কার স্বতন্ত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম। পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত দেখা যায় আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাহা হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উচ্চতা এত অধিক যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনায়াসে ও সহজে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। মানব মন যে মত ও বিশ্বাসে চিরা-ভ্যস্ত, বা বহুকাল হইতে অভ্যস্ত, তাহা উন্নত ও সংস্কৃত করা সময়-সাপেক্ষ, এবং উহা যত অধিক পরিমাণে উন্নত ও সংস্কৃত করিতে যাওয়া যায় তত অধিক সময়ের আবশ্যক হয়, ইহা একটী পরম সত্য। একটী জাতির প্রাণে কোন একটী নূতন ভাব সঞ্চার করিয়া দেওয়া দু দিনের কার্য্য নহে, তাহা শত শত বৎসরের চেষ্টা-সাধ্য। ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, বা রাজনীতি, যে কোন বিষয়েরই হউক একটী নূতন উন্নত মত বা একটী নূতন উচ্চতর আদর্শ একটী জাতির মানসিক প্রকৃতিতে বদ্ধমূল করা যে কাল-সাপেক্ষ, পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাকারবাদী হিন্দুকে নিরাকার বাদী করা, পৌত্তলিক হিন্দুকে ব্রহ্মোপাসক করা, লৌকিক আ-চারের ক্রীতদাসবৎ অনুবর্ত্তি জাতিকে বিবেক বাণীর সেবক করা পঞ্চাশ বা এক-শত বৎসরের কার্য্য নহে। সহস্র সহস্র বৎসর সাকারোপাসনা করিয়া, পুত্তলিকা পূজা করিয়া, এবং বিবেক বাণীর পরিবর্ত্তে আচার ব্যবহারের সেবা করিয়া, যে জাতির মানসিক প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে, সে জাতি যাহাতে নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করিতে পারে এবং বিবেকবাণীরই সেবা করিতে পারে এমন করিয়া তাহার প্রকৃতি উন্নত ও সংস্কৃত করা কি কখন অল্প সময় ও অল্প আয়াস সাধ্য হইতে পারে? হিন্দু জাতির বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও নৈতিক অ-বস্থা যাহা, এবং ব্রাহ্মসমাজ উহাকে যে উচ্চ আদর্শানুযায়ী করিতে চাহেন, এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করিলে এতদূর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে গত বাইট বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া আমরা নৈরাশ্যকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না।

ব্রাহ্মের বা ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেখিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যের পরিমাণ সিদ্ধান্ত ক-রেন তাঁহারা ভ্রমান্ধ। অসাক্ষাৎ ভাবে দেশের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে তাহার প্রতি অন্ধ হওয়া

উচিত হয় না। এই যে আজ কাল বহুদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হরিসভা দেখা যায়, ব্রাহ্মধর্ম্মই ঐগুলির জন্মদাতা। এই সকল সভা সাকারবাদী নহে, পৌত্তলিকও নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান ভাব যে একেশ্বরোপাসনা তাহাই এই সভাগুলির প্রাণ। যে সকল লোক ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দুসমাজচ্যুত হইবার ভয় করেন, কিন্তু সাকারবাদের ও পৌত্তলিক পূজার ভ্রমাত্মকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারাই এই সভার সভ্য হয়েন। ইঁহাদিগের অনেকে কার্য্যে ও মতে সঙ্গতি রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না বটে, তথাপি হরিসভার সভ্যগণ সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায় হইতে উন্নত ও ব্রাহ্মসমাজের অধিকতর নিকটবর্ত্তী তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরলোকগত দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজও ব্রাহ্মসমাজের সন্তান। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ অঞ্চলীয় অনেকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন দয়ানন্দ সরস্বতী ঐ ধর্ম্মমতের সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গেলে হিন্দু সমাজচ্যুত হইতে হয় দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান মত যে একেশ্বরোপাসনা তাহাই আর্য্যধর্ম্ম নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আর্য্যধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী কোন কোন মত আছে বটে, কিন্তু উহার ভিত্তিভূমি একেশ্বরবাদ। এই আর্য্যধর্ম্ম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে খুব প্রচলিত হইতেছে। হরিসভার ন্যায় আর্য্য সমাজও ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল। আবার আজকাল মান্দ্রাজ প্রদেশে দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও হিন্দু শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিয়া "সংস্কৃত হিন্দু ধর্ম্ম" নাম দিয়া যে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ঐক্য আছে এবং তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল। ব্রাহ্মধর্ম্ম মান্দ্রাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবার পরে তথায় "সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের" অভ্যুদয় হইয়াছে। এখানেও সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে শিক্ষিত লোকে ব্রাহ্ম না হইয়া দেওয়ান রঘুনাথ রাওর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। আমাদিগের বিশ্বাস যে হরিসভা, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আর্য্যসভা ও মান্দ্রাজের সংস্কৃত হিন্দু সভার সভ্যগণ ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন। এই সকল সভাগুলি যেন হিন্দুদিগকে ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যেমন কোন কোন ধর্ম্মের মত এই যে অনাদি পুরুষ পরব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইতে গেলে কোন মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের সাহায্য আবশ্যক, তেমনি আমরা দেখিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজে আসিতে গেলে অনেকের পক্ষে উপরোল্লিখিত সংস্কৃত হিন্দু সমাজের কোনটীর মধ্য দিয়া আসা আবশ্যক। ভরসা হয় ঐগুলি ক্রমে অনেকের পক্ষে এইরূপ মধ্যবর্ত্তী সভার কার্য্য করিবে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে দ্রুতবেগে প্রচারিত হইতেছে না তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রচলিত ধর্ম্ম সকল অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এত উন্নত ও সংস্কৃত যে মানব প্রকৃতির নিয়মানুসারে উহা অল্পকাল মধ্যে বহু সংখ্যক লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ উচ্চ ধর্ম্ম এবং প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা উহা যেরূপ শ্রেষ্ঠ তাহাতে বৎসরে বৎসরে উহা সহস্র সহস্র লোক গ্রহণ

করিবে দেশের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থায় এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না। খ্রীষ্টীয়ান মিসনরিদিগের ন্যায় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে যাইয়া দুই মাসের মধ্যে এক লক্ষ লোককে আমাদিগের উচ্চ ধর্ম্মে দীক্ষিত করা আমরা ঘৃণা করি। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের উন্নতি ধীর অথচ স্থির হইবে ইহাই আমরা ন্যায্য রূপে আশা করিতে পারি।

উপসংহারে বলা নিতান্ত আবশ্যক যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চ ও সংস্কৃত মত অপেক্ষা ব্রাহ্ম জীবনে প্রদর্শিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের অধিকতর সহায়তা করিবে।

MAHARSHI DEBENDRA NATH TAGORE. PERSONAL REMINISCENCES AND STRAY NOTES ON HIS LIFE AND CHARACTER.

(By ONE OF HIS BRAHMO-ADMIRERS.)

(*National Guardian.*)*

WHY IS HE CALLED MAHARSHI?

The Rishis of old fire the imagination of Debendra Nath Tagore, and he is full of admiration for them. The life of a true Rishi has been, I believe, his ideal, and it is admitted that he has attained that ideal. If *Brahma Jnana Brahmadhyan* and *Brahmananda rasapana* or the knowledge of God, contemplation of God, and drinking in the nectar of spiritual joy derived from communion with God be the essential characteristics of a Maharshi or a Rishi of the *highest* order, then Debendra Nath Tagore is, indeed, a Maharshi. He may live in a mansion furnished *a la-Anglice*, he may drive in equipages, he may organize and lead a Church, he may supervise the affairs of an extensive estate, but these are not calculated to a reasonable mind to seem antagonistic to the best traditions of the high and noble title with which his well-meaning disciples have invested him, when the fact is established beyond all cavil and dispute that he has reached, by the life-long exercise of the great powers of his magnificent soul, that high stage of spiritual development which a Maharshi in the days of Vedas and Upanishads was known to attain to.

HIS MODE OF DAILY LIFE.

Some four years ago, I had an opportunity to be a witness to the mode of life he lived. Rising at, what is termed by Manu, the *Brahma Muhurta*, or the earliest light of dawn, the Maharshi took his seat on the verandah of the house he was then occupying, and turning his face towards the east, watched the sunrise in all its glory. The beauty and splendour of the rising sun fills his mind with a sense of the ineffable greatness of the Sun of suns the prime source of the light that lighteneth the countless suns in the Universe. Thus with a soul refreshed by the inspiration of the rising sun, he entered upon his devotions which lasted two hours, sometimes more. Then a little lunch was taken, which was followed by the reading of letters and newspapers and attendance to such important household affairs, as required his guidance, advice or instruction. At twelve the noon meal was taken, which consisted of boiled rice, milk, fruits, &c. After meal, two or three hours were devoted to the attentive study of some of his favorite authors. At about four o'clock the Maharshi repaired to a boat, and took an airing on the Ganges which flowed past his residence. The two hours or so that were spent on the breast of the Ganges were consecrated chiefly to the silent contemplation of the Divinity who had been revealed to his soul as He had perhaps been done to none else in this age of materialism. As the sun began to sink in the West this enraptured lover of God and his works took his seat on the top of the boat, and facing the west, gazed on the splendour of the western sky, and gazed and gazed till the last crimson ray of the setting sun had ceased to bedeck the heavens. Then he closed his eyes and retired within himself, and sat 'rapt into still communion,' till it was almost dark. Retirement to rest for the night was preceded by prayers and devotions lasting for hours.

* The typographical errors that crept into the article, as published in the *National Guardian*, have been corrected by the writer.—*Editor T. Patrika.*

HIS INTEREST IN CURRENT EVENTS.

Though devotional exercises have been latterly his chief occupation, he has never been indifferent to matters of ordinary importance. I have noticed him taking warm interest in the current events. It was, and I believe, still is his habit daily to go through a number of newspapers, both Bengali and English, and make very wise and shrewd observations on the important events of the day to any friends who might be present at the time.

HIS FAVORITE RELIGIOUS BOOKS.

Are the Sanskrit Upanishads and the Persian religious poems of Hafiz. It was the accidental perusal of a *sloka* of one of the Upanishads that converted Debendra Nath Tagore from Mammon to God, and raised his mind's eye from the world to Heaven. It is no wonder then that he should regard the Upanishads with the veneration which a disciple would feel for his spiritual guide. It is an ennobling intellectual and spiritual treat to listen to the Maharshi reciting slokas from the Upanishads. It appears as if he becomes all spirit then, and even if you be one among the least impressionable, you cannot but be mightily moved by the soul-quickening fire of his divine enthusiasm. His Heaven-gravitating soul seems saturated, as it were, with the divine inspiration of the noble religious truths that find expression in those incomparable records of the religious experiences of the Rishis of old—the Upanishads. Next to Upanishads, it is the poems of the Persian poet Hafiz that Debendra Nath Tagore prizes most. There, perhaps, never breathed a more devout lover of God than this Persian bard, and the God-intoxicated soul of the patriarch of the Brahma Somaj has found a counter-part in him. I do not think there is another Hindu living who has so thoroughly appreciated the thoughts and sentiments of Hafiz and who could be found better able to give the spiritual interpretations of his gazals.

FAVORITE AUTHORS OTHER THAN RELIGIOUS.

Books other than religious which the Maharshi has ever cared to study related, I believe, to the history, antiquity, literature, and philsophy of ancient India and to general European metaphysics. Of the former class, I have, from time to time, noticed on his table the works of such orientalists as Max Muller, Colebrooke, H. H. Wilson and Monier Williams, and of metaphysics, he is known to have studied the best works of Victor Cousin, Immanuel Kant, Fichte and others.

READING ANTI-THEISTIC AUTHORS.

There is a certain class of religious men who would think it an abomination to read books or publications that treat of a theology antagonistic to their own. But Debendra Nath Tagore is much above the low plane of such illiberalism. His faith in God is founded on an immovable basis—a basis too strong and deep to be shaken by the perusal of the works of infidels. He sees more clearly the eternal truth of his transcendental Theism, as he compares the strong reasonableness of its doctrines with the utter untenableness and the tottering weakness of atheistical or sceptical dogmas. I have seen him perusing almost with the devotion of a disciple Herbert Spencer's First Principles, but the agnosticism of the English philosopher has only revealed to the Brahmo leader the more clearly the ever-lasting character of the foundation on which the Brahmic faith is based. It is, perhaps, to see how weak is the basis of the religious systems opposed to Theism, that Maharshi Debendra Nath Tagore has sometimes been known to read anti-Theistic works.

HIS GREATEST THEOLOGICAL WORK.

Brahmo Dharmer Bakhyan or the exposition of Brahmoism is the greatest theological work of the Maharshi. They contain his sermons delivered from time to time in the course of a long career, epitomizing in a style as pure as it is elevated, the priceless spiritual experiences of his God-devoted life. The *Bakhyan* is a store-house of religious truths which can never fail to be valued beyond all price by all who aim at living the life of the spirit. It is, in fact, the Upanishad of the Nineteenth Century, and with the progress of the Indian nation in spirituality, this unique production must assume a high place in the Indian religious literature. It is a monument of the Maharshi raised by himself, and we can confidently look forward to a time when Brahmos and non Brahmos will come to regard it with equal veneration and prize it

with equal ardour as one of the best *vade mecums* for the spiritually-minded and the religiously disposed.

A GREAT AMBITION OF HIS LIFE.

To see the principles of Brahmoism—a faith which he has preached and to the high standard of which he has lived—disseminated among his countrymen in India has been a great ambition of his life. He has devoted a large portion of his wealth to carry out this his most noble intention. There is scarcely a Brahmo Somaj in the Empire to the erection of whose building the Maharshi has not liberally contributed. To him to propagate Brahmoism is to glorify the eternal 'Brahma', and he has ever considered the use of his wealth thus to glorify his God as its best and holiest utilization. Few things are known to arouse his enthusiasm so much as schemes for the dissemination of the religion of which he is the best living illustration. The high and lofty ideal of Brahmoism has prevented it from becoming so popular a faith as Debendra Nath Tagore wished and endeavoured to make it, but he may peacefully and joyously enter the Abode of his Beloved with the assurance that a religion which could claim to have produced a noble and holy character like himself, cannot but, through the blessings of the Supreme and Merciful Ordainer of all things, be gradually accepted by mankind as they progress in knowledge and spirituality.

HE THE FATHER OF THE BRAHMO CHURCH.

That Ram Mohun Ray laid the foundations of the Brahmo Somaj is true, but it is Debendra Nath Tagore who communicated life and vigour into it. Maharshi Debendra Nath Tagore is unquestionably the Father of the modern Brahmo Church. The cardinal principles of Brahmoism as they now stand are not exactly those of Ram Mohun Ray's but of Debendra nath Tagore's. If Ram Mohun Roy was the grand-father, Debendra Nath Tagore is the father of the Brahmoism of the day. India may not know it, Europe may not yet have heard of it, but it is nevertheless a fact that the position of Debendra Nath Tagore in the Brahmo Somaj is much higher than that once occupied by the late Keshub Chunder Sen. It was possibly because Keshub was conscious of this undeniable fact that he latterly gave a new name to his faith, and proclaimed himself as the founder of the Religion of the New Dispensation. The Maharshi was the spiritual father of Keshub Chunder Sen, as has been more than once publicly acknowledged by the latter, and the world could have scarcely heard of Keshub as a missionary of Brahmoism, had there been no Debendra Nath Tagore. Modern Brahmoism in its essential and unsophisticated form is Debendra Nath Tagore's and not Keshub Chunder Sen's, as is erroneously supposed by many in India and Europe. It is as the Father of Modern Hindu Theism, no less than as a great and extraordinary religious character, that Maharshi Debendra Nath Tagore's name will be handed down to posterity, and immortalized in the history of the nineteenth century.

HIS LOVE OF NATURE.

That Debendra Nath Tagore's mind is cast in the mould of that of the Rishis of old is evidenced not only by his love for a contemplative and meditative life, but also by his attachment for a life amidst the amplitudes of Nature. Communion with Nature and Nature's God has been his element, and in it had he chiefly lived, moved and grown into a unique and great religious character. He had spent years and years in the beautiful and sublime regions of the Himalayas, nursing his soul in the love of God and of His lovely material garb of Nature. The Maharshi has, since the dawn of the divine light in his soul, frequently shown a disinclination to reside in cities in general and in Calcutta in particular. The din and noise of the city and the demands of the too busy social life which one in his position must be compelled to live in it, would not be quite agreeable to him. Even when required to live in the plains, under the advice of the physician, or under the pressure of some other necessity, he had selected some place where Nature reveals herself a little more freely than she could in a city. So at times in 1874, 1879 and 1884 I saw him residing in some villages close to this city and in houses commanding a beautiful prospect of the broad-breasted Ganges. If the Maharshi lives in the close of his life in the metropolis, away from the inspiring influences

and hallowed charms of the Himalayas, it is because a sense of duty compels him to obey the mandate of his physicians.

HE THE GOD-INTOXICATED MAN.

Benedict Spinoza, the Dutch Pantheistic Philosopher, was called by Novalis, "the God-intoxicated man." You canonly *read* of Spinoza, but if we wish to see a God-intoxicated man, you can assuredly see him in Maharshi Debendra Natli Tagore. You have no doubt come across men full of Self, or full of Mammon, but here is verily a man who is full of God. You cannot spend an hour with him without strongly feeling that his soul and his mind are intoxicated with the wine of Divine love. There is every outward manifestation to convince you of the fact. You catch it unmistakably in his eyes, radiant and rolling with emotion, in his countenance, flushed yet serene, and in his enthusiastic gestures, as he discourses on the Lord he adores and worships so devoutly, in spirit and in truth. Though not in the least putting his faith in the Pantheistic idea that *all* is God, the Maharshi sees, with the penetrating vision of a seer, God *in* all, as the life and soul of all that exists. The bird singeth, and he hears in its song the soul-enrapturing voice of his Beloved; the flower bloometh and he smells in its perfume, the fragrance of the immaculate purity of his Divine Father; the soft breeze bloweth, and he feels in its breath the loving and merciful touch of his ever kind Friend; the Sun shineth, and in its bright effulgence he finds revealed the benign influences of the Divine Light; the boundless sky stretcheth forth before his beatified vision, and in its countless, stars, planets, and systems of worlds he realizes the sublimity of the Great Being who had been the Pole-Star to the majestic bark of his life in the ocean of this world. As without him, so within him, as in the outer world of Nature, so in the inner world of his soul, Maharshi Debendra Nath perpetualy enjoys the presence and companionship of the the Supreme Spirit. Intoxicated in the highest sense, as he is, by the wine of Divine Love, he never feels more at home than when he discourses on the attributes of God, or communes with Him, or allows his soul to revel in the ocean of Brahmananda or the joy of God that passeth all understanding.

HIS LEGACY TO THE NATION.

The incomparable religious character of Debendra Nath Tagore is a rich legacy to the Indian nation. Happy are the people that can sufficiently realize the inestimable value of so matchless an inheritance. Christ's legacy of his character and example to the succeeding generations was scarcely more significant, grand and divine than is Maharshi Debendra Nath Tagore's to the human race of these and the coming times. How to make each of the sides of human nature work without detriment to the other, how to be wordly and at the same time religious, how to reconcile the requirements of this life with those of that is to come, is yet the grandest problem on the earth. Debendra Nath Tagore has offered a practical solution of this problem in his extraordinary life in a manner so prominent as no man in these modern times of materialism and Mammon worship has done. He has been a man of the world in the best and truest sense, making himself as vastly useful in the field of worldly life as his capabilities and resources would allow, and at the same time has been a religious man of the highest order. He did not, like a Hindu Rishi of old, leave the world for God, nor did he like a modern nineteenth century worldling, relinquish God for the world. He has been, both Godly and worldly, without allowing his devotion to God to weaken his sense of wordly duties or his attention to the world to interfere with his religious and devotional exercises. Not only has he been a devotee, revelling in Divine contemplation and meditation, but he has also been the leader of a Church, the active missionary of a religion, an eminent social reformer, an able author, a wise landlord, a friend of education, a patron of benevolent and useful schemes and the responsible head of a large family. The grand lesson and momentous truth, that it is possible to be God-intoxicated and at the same time to perform our worldly duties, that it is within the range of human capabilities to be equally true to our spiritual and temporary interests, is the legacy which Maharshi Debendra Nath Tagore bequeaths to us, and may we be worthy of this rich heritage.
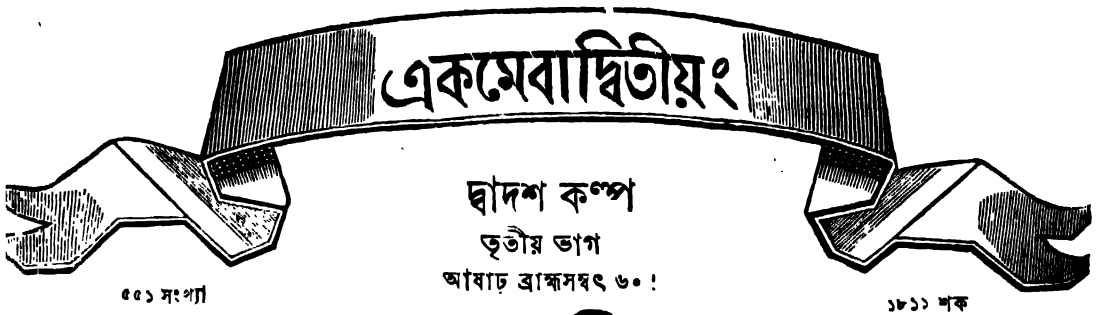
দ্বাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

৫৫১ সংখ্যা ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव। •

মানবী-করণই বটে।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

মূল কারণ প্রকৃত কর্ম্ম-কর্ত্তা এবং সাক্ষাৎ কারণ তাহা কর্ত্তৃক বিন্যস্ত কৌশল। ইহা হইলে কৌশলের পিছনে কর্ম্ম-কর্ত্তাকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা আবশ্যক নহে। যদি কৌশল অপূর্ণ ও অল্প-স্থায়ী হয়, তবে কর্ম্ম-কর্ত্তাকে সময়ে সময়ে তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া পুনরায় শিজিল করিতে হয়। কিন্তু যদি বিন্যস্ত কৌশল পূর্ণ ও চিরস্থায়ী হয়, তবে তাহার উপর কর্ম্মকর্ত্তার কোন দিন হস্তার্পণ করা আবশ্যক হয় না।

[আধ্যাত্মিক সত্য লোকের মনোমধ্যে সহসা ধারণা হয় না—এই জন্যই উপমা-প্রদর্শনের যত কিছু আবশ্যকতা; কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকৃত প্রদীপ—নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপ—কিছুতেই তাহা টলে না; কোন উপমাই এ প্রদীপের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, চন্দ্রের জ্যোৎস্না অতীব সুমধুর অর্থাৎ সুমিষ্ট; কিন্তু তাহা বলিয়া সে-তাহার মিষ্টরস কিছু আর চিনির পানা'র মতো মিষ্টরস নহে—তাহা রসনেন্দ্রিয়ের গম্য নহে; নির্জ্জিহ্ব ব্যক্তি সে রস আস্বাদন করিতে পারে কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি কদাচ তাহা পারে না। এইরূপই একটা উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, জাগ্রৎকালে মনুষ্য যেমন সর্ব্বদাই অক্লেশে স্বীয় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া রাখে, ঈশ্বর সেইরূপ সমস্ত জগৎকে প্রতিনিয়তই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের পথে ইচ্ছামাত্রে ধরিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এ উপমাটি শুধু কেবল উপমা-মাত্র—তা বই আর কিছুই নহে। জ্যোৎস্নার মাধুর্য্য-রস চক্ষু-দ্বারা আস্বাদন না করিয়া জিহ্বা-দ্বারা আস্বাদন করিতে যাওয়া যেরূপ—ঈশ্বরের ভাব বিশুদ্ধ জ্ঞানে উপলব্ধি না করিয়া উপমার সাহায্যে কল্পনাতে উপলব্ধি করিতে যাওয়াও সেইরূপ। প্রকৃত কথা এই যে, মূলে জ্ঞান অবিচ্ছেদে লাগিয়া না থাকিলে জগতের অস্তিত্বই সম্ভবে না—জগতের কলকৌশল তো তাহার পরের কথা। জগতের অস্তিত্ব থাকিলে তবে তো তাহার

কল-কৌশল চলিবে ;—কিন্তু মূলে জ্ঞান না থাকিলে জগতের অস্তিত্বই সম্ভবে না। আমার যদি জ্ঞান না থাকে তবে আমার নিকটে জগতের অস্তিত্ব সম্ভবে না—তোমার যদি জ্ঞান না থাকে তবে তোমার নিকটে জগতের অস্তিত্ব সম্ভবে না—মূলেই যদি জ্ঞান না থাকে তবে মূলেই জগতের অস্তিত্ব সম্ভবে না। যখন আমি ছিলাম না—তুমি ছিলে না—কোনও মনুষ্যই ছিল না—তখনও জগতের অস্তিত্ব ছিল ; এই কথাটি মানিতে গেলেই তাহার সঙ্গে এটাও অগত্যা মানিতে হয় যে, তখনও জ্ঞান বিদ্যমান ছিল ; কেননা, অস্তিত্ব-শব্দের অর্থটির প্রতি ভাল করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অস্তিত্ব অথচ জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই—এরূপ অস্তিত্ব অস্তিত্বই নহে—কিছুই নহে।

জ্ঞানের সহিত অস্তিত্বের দুইরূপ সম্বন্ধ (১) পরোক্ষ সম্বন্ধ, কি না পরম্পরা-সম্বন্ধ ; (২) অপরোক্ষ সম্বন্ধ কি না সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। উত্তর-মেরু মনুষ্যের অগম্য প্রদেশ ; অথচ আমরা বলি যে, "উত্তর-মেরু আছে ;" কি সূত্রে বলি যে, "উত্তর-মেরু আছে" ? আমি যে স্থানে এখন অবস্থিতি করিতেছি, সেই স্থানটিই কেবল আমার জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে ; কিন্তু সেই স্থান হইতে যদি একটি লম্বক-রেখা (longitude) দূর হইতে সুদূরে প্রসারিত করা যায় তবে তাহা উত্তর-মেরুতে গিয়া ঠেকে ; এই সূত্রে আমি উত্তর-মেরুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। উত্তর-মেরুর অস্তিত্বের সহিত আমার জ্ঞানের এইরূপ পরোক্ষ সম্বন্ধ—ক্রম-পরম্পরা সম্বন্ধ। তেমনি আবার, মহারাণীর আমল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানে বর্ত্তমান—সিরাজ-উদ্দৌলার আমল পরম্পরা-সম্বন্ধে আমার জ্ঞানে বর্ত্তমান ;—কেন না, মহারাণীর আমল হইতে কোম্পানির আমলের মধ্য দিয়া কাল-সূত্র চালনা করিলে তাহা সিরাজ-উদ্দৌলার আমলে গিয়া ঠেকে। এইরূপ, আমাদের বাহ্য-জ্ঞানে. অতীব একটি ক্ষুদ্র সীমার অভ্যন্তরে বিষয়-সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিভাত হয়, আর, সেই সীমার বহিঃপ্রদেশ-স্থিত যত কিছু বস্তু সমস্তই পরোক্ষ সম্বন্ধে প্রতিভাত হয়। পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ এই-যে দুই রূপ জ্ঞান তাহার মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় সুনির্দ্দিষ্ট (যেমন গণিতের a, b, c,), পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় অনির্দ্দেশ্য (যেমন গণিতের x y z) ; কিন্তু উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বিত হইলে পরোক্ষ বিষয়-সকলও ক্রমে ক্রমে অপরোক্ষ পদবীতে আরোহণ করে—অনির্দ্দেশ্য বিষয়-সকলও সুনির্দ্দিষ্ট পদবীতে উপসংক্রমণ করে (যেমন আঁক কসিয়া পাওয়া যায় যে, $x=a$, $y=b$, $z=c$ ইত্যাদি)। এখন বক্তব্য এই যে, আকাশ (অর্থাৎ বর্ণাদি-বিহীন জ্যামিতিক আকাশ) যদিও চক্ষুর অগোচর, তথাপি, আকাশের যতখানি অংশ প্রত্যক্ষ বস্তু-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (যেমন ঘটাকাশ অর্থাৎ ঘট যতখানি আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে) সেই পরিচ্ছিন্ন আকাশ-খণ্ডকে যদি সংক্ষেপে প্রত্যক্ষ আকাশ বলা যায় (প্রত্যক্ষ আকাশ—কি না প্রত্যক্ষ বস্তু-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন খণ্ড-আকাশ) তবে এইরূপ দাঁড়ায় যে, আমাদের সম্মুখস্থিত প্রত্যক্ষ আকাশ,এবং তদতিরিক্ত অবশিষ্ট আকাশ, দুয়েরই মূলে একই অসীম মহাকাশ অবস্থিতি করিতেছে ; তেমনিই আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞানের (অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের) উপদ্বীপ এবং তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত

পরোক্ষ জ্ঞানের মহাসাগর, দুয়ের মূলে এক অসীম জ্ঞান অবস্থিতি করিতেছে—সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন। কেননা, যেমন অসীম মহাকাশ গোড়ায় না থাকিলে, নিকটস্থিত আকাশের সহিত দূর-স্থিত আকাশের পরম্পরা-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ মূলে মহাজ্ঞান না থাকিলে আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত পরোক্ষ জ্ঞানের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আদিম কাল হইতে মনুষ্য-সমাজে নানা দিক্ হইতে নানা জ্ঞান উৎসারিত হইয়া এবং দিন দিন ক্রমশই বিস্ফারিত হইয়া একই মহাসত্যের অভিমুখে প্রসারিত হইতেছে; সেই সমস্ত বহুধা বিচিত্র নানা জ্ঞানের মূলে যদি এক অদ্বিতীয় মহাজ্ঞান বর্ত্তমান না থাকিবে—তবে তাহাদের গোড়ার বাঁধুনি কোথায়? তাহাদের যদি গোড়ার বাঁধুনি না থাকে, তবে তাহাদের মূল্য কি? তাহাদের গোড়ার বাঁধুনি অবশ্যই আছে;—কাজেই ইহা না মানিলেই নয় যে, আমাদের পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ সমস্ত জ্ঞানই একই মহা-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সত্য-জ্ঞানের প্রকৃতিই এইরূপ যে,—ভবিষ্যতে আমরা যত কিছু সত্য-জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, তাহা বর্ত্তমান কালের সত্য-জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-বিহীন হইতে পারে না; মনে কর, প্রথমে আমরা পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ অবধারণ করিলাম, তাহার পরে সূর্য্যের পরিক্রমণ পথ অবধারণ করিলাম—দুই সত্যের একটির সহিত আর-একটির কোন-না-কোন সম্পর্ক-বন্ধন থাকিবেই থাকিবে। সকল সত্যের সঙ্গেই যখন সকল সত্যের সম্পর্ক রহিয়াছে, তখন, এক সত্যজ্ঞান কদাপি আর এক সত্য-জ্ঞানের একান্ত "পর" হইতে পারে না; কাজেই বলিতে হয় যে, সকল সত্য-জ্ঞান একই অদ্বিতীয় পরম সত্য-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত; কেননা, তাহা যদি না হইত—তবে এক সত্য-জ্ঞানের সহিত আর-এক সত্য-জ্ঞানের আদবেই কোন সম্পর্ক থাকিতে পারিত না। সেই এক অদ্বিতীয় পরম সত্যজ্ঞানই সর্ব্বজগতের মূলাধার। প্রভাত বাবু বলিতেছেন যে, "কৌশলের পিছনে কর্ম্মকর্ত্তাকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা আবশ্যক নহে"; আমরা বলি এই যে, অস্তিত্বের পিছনে জ্ঞান সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা আবশ্যক; আর,জগতের অস্তিত্বের মূলে সেই-যে জ্ঞান চির-বর্ত্তমান, সেই জ্ঞান-হইতেই জগতের সমস্ত কল কৌশল আবির্ভূত হইয়াছে। কেননা;—"আছে" বলিলেই জ্ঞানের প্রমাণ আবশ্যক—জ্ঞানের প্রমাণ চাহিলেই মূল-স্থিত জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। আমি যখন হিমালয় ভাবিতেছি তখন হিমালয়-ভাবনা যে আমার মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে তাহার প্রমাণ কি? জ্ঞান; কেননা,আমার অন্তঃকরণে যে,হিমালয় ভাবনা চলিতেছে, ইহা আমি অন্তরে অনুভব করিতেছি;—অনুভব একপ্রকার সাক্ষাৎ জ্ঞান। হিমালয়-পর্ব্বত আছে, ইহার প্রমাণ কি? জ্ঞান; কেননা, আমি আপনি অথবা অপর কোন ব্যক্তি হিমালয় পর্ব্বত প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়াছে—ইহাই হিমালয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ; অনুভব যেমন এক প্রকার সাক্ষাৎ জ্ঞান—প্রত্যক্ষ তেমনি আর এক প্রকার সাক্ষাৎ জ্ঞান। "আমি আছি" ইহার প্রমাণ কি? জ্ঞান; কেননা আমি যদি আমার আপনার জ্ঞানে বিদ্যমান না থাকি তবে "আমি আছি" এ কথার কোন অর্থই হয় না। "আমি আছি" এই যে জ্ঞান, ইহাও এক প্রকার সাক্ষাৎ জ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান।

"আমি হিমালয় ভাবিতেছি" এই যে একটি ব্যাপার, ইহাতেই তিনটি বিষয়ের অস্তিত্ব আমি একসঙ্গে উপলব্ধি করিতেছি——(১) আমার বাহিরে হিমালয়ের অস্তিত্ব; (২) আমার অন্তরে হিমালয়-ভাবনার অস্তিত্ব; (৩) তাহারও অভ্যন্তরে আমার আপনার অস্তিত্ব। হিমালয়ের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-মূলক—হিমালয়-ভাবনার অস্তিত্ব অনুভব-মূলক—আমার আপনার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-মূলক; তিনই জ্ঞান-মূলক। হিমালয় পর্ব্বত উত্তর-প্রদেশে; কিন্তু হিমালয় ভাবনা উত্তরেও নহে—দক্ষিণেও নহে; উত্তর-দক্ষিণাদি সম্বন্ধ বহির্বিষয়ের সম্বন্ধেই খাটে—অন্তরের ভাবনা-সম্বন্ধে খাটে না; বহির্বিষয়ের ন্যায় অন্তরের ভাবনা আকাশে অধিষ্ঠান করে না, এই জন্য অন্তরের ভাবনার সম্বন্ধে উত্তর দক্ষিণাদি দৈশিক সম্বন্ধ খাটে না—দৈশিক সম্বন্ধ খাটে না বটে কিন্তু কালিক সম্বন্ধ (কালের অগ্র পশ্চাৎ সম্বন্ধ) খাটে; পূর্ব্বে আমি অট্টালিকা ভাবিতেছিলাম এখন আমি হিলাময় ভাবিতেছি—এ দুই ভাবনার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী সম্বন্ধ স্পষ্টই বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিমালয়-ভাবনা যদিচ আমারই ভাবনা—কিন্তু আমার হিমালয়-ভাবনা হইতে আমি আপনি স্বতন্ত্র। যদি এরূপ হইত যে, আমার হিমালয়-ভাবনাই আমি আপনি, তবে দাঁড়াইত যে, আমার অট্টালিকা-ভাবনাও আমি আপনি; কিন্তু হিমালয়-ভাবনা এক ভাবনা—অট্টালিকা ভাবনা আর-এক ভাবনা; দুই ভাবনা কিছু আর একই ভাবনা নহে; আমি কিন্তু একই আমি। ভাবনাই যদি আমি হই, তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ভাবনা যখন এক নহে কিন্তু দুই, তখন কাজেই আমিও এক নহি কিন্তু দুই। কে বলিতেছে যে, আমার ভাবনা অনেক কিন্তু আমি একই? স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—হিমালয়ের অস্তিত্বের সাক্ষী স্বরূপ; অন্তঃকরণের অনুভব হিমালয়-ভাবনার অস্তিত্বের সাক্ষী স্বরূপ; এবং সেই ভাবনার মূলস্থিত যে, আমি আপনি, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সেই আমার আপনার অস্তিত্বের সাক্ষী স্বরূপ। অতএব জ্ঞানই অস্তিত্বের সাক্ষী—জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ। এই জন্য বলি যে, যদি জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে তাহার সঙ্গে এটাও স্বীকার করিতে হয় যে, আমি যখন ছিলাম না এবং আমার ন্যায় আর কেহই যখন ছিল না, তখনও জগতের অস্তিত্ব ছিল; অস্তিত্ব যখন ছিল—তখন অবশ্য তাহা কোন না কোন জ্ঞানেই বিদ্যমান ছিল—কেননা অস্তিত্ব জ্ঞান-ছাড়া আর কোথাও অবস্থিতি করিতে পারে না। জড়পিণ্ড আকাশে অবস্থিতি করে; মানসিক চিন্তা কালে অবস্থিতি করে; আত্মা অনাকাশে এবং অকালে অবস্থিতি করে; এবং সমুদায়েরই অস্তিত্ব জ্ঞানে অবস্থিতি করে। "আছে" বলিলেই বুঝায় যে, কাহারো না কাহারো জ্ঞানে আছে; যাহা কাহারো জ্ঞানে নাই—ঈশ্বরেরও জ্ঞানে নাই—তাহা মূলেই নাই।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, আমাদের বাহ্য-জ্ঞানই পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; কিন্তু সেই বাহ্য-জ্ঞানের মূলে যে-এক গোড়া'র বিশুদ্ধ জ্ঞান বর্ত্তমান আছে—তাহা কেবল-মাত্র অপরোক্ষ জ্ঞান; তাহা ইন্দ্রিয়ের কোন ধার ধারে না—তাহা আত্মার স্বকীয় ধর্ম্ম। ইহার একটা মোটামুটি দৃষ্টান্ত এই যে, আমাদের সম্মুখস্থিত বস্তু-সকলেতে যে-

টুকু আকাশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে উপলব্ধি করি; তাহার ও-দিকে অবশিষ্ট আকাশ যাহা দূর হইতে সুদূরে প্রসারিত রহিয়াছে তাহা আমরা পরোক্ষ জ্ঞানে (পরম্পরা সম্বন্ধ অনুসারে) উপলব্ধি করি; আর, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সকল-আকাশের মূলে একই অসীম মহাকাশ বর্ত্তমান--ইহা আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষবৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি; আর, "আকাশ অসীম" এ তত্ত্বটি আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি বলিয়া তাহা উপার্জ্জন করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ কোন সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় না—আকাশের আয়তন মাপিয়া দেখিতে হয় না—একেবারেই আমরা স্থির জানি যে, সমুদায় খণ্ড আকাশের মূলে অসীম মহাকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। তেমনি, একেবারেই আমাদের আত্মাতে ধ্রুব-রূপে প্রতীয়মান হয় যে, সকল সত্য-জ্ঞানের মূলে এক পরম সত্য-জ্ঞান সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান। সর্ব্ব জগতের মূলে যদি এক অদ্বিতীয় চিরন্তন সত্য-জ্ঞান না থাকিত, জগৎ যদি বাহিরে আড়ম্বর ভিতরে ভুও হইত, তাহা হইলে দাঁড়াইত যে, জগতের আদিম অস্তিত্ব অসাক্ষিক এবং অপ্রামাণিক সুতরাং কিছুই নহে। অতএব ইহা নিঃসংশয় যে, জগতের অস্তিত্বের মূলে—এবং আমাদের পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ সকল প্রকার জ্ঞানের মূলে—এক মহাজ্ঞান চির-বর্ত্তমান; কাজেই, জগতের সমস্ত কল-কৌশলের মূল সেই একই অদ্বিতীয় জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ঘড়িওয়ালার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও ঘটিকা-যন্ত্র দিব্য নিরাপদে চলিতে থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জগতের কল চলা দূরে থাকুক্—জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; কেননা, ঈশ্বরের প্রভাবই জগতের অস্তিত্বের চিরন্তন উৎস। ইহার অতীব একটা যৎসামান্য স্থূল উপমা এই যে, দেহের চলা, বলা, ওঠা, বসা দাঁড়ানো সমস্তেরই মূলে দেহীর অধিষ্ঠান আবশ্যক; দেহীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে দেহের কল-বল বন্ধ হইয়া যায়। প্রভেদ এই যে জগৎ সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার অভিব্যক্তি—প্রভাবের উদ্গীরণ—আনন্দের উচ্ছ্বাস; দেহ অতীব অল্প-পরিমাণেই দেহীর ইচ্ছাধীন; এমন কি—দেহ অনেক সময় দেহীর ইচ্ছার বিরোধী, সুতরাং ভারবহ হইয়া উঠে। দুয়ের মধ্যে এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও—উপমাটিকে শুদ্ধ কেবল উপমা-মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে বিশেষ কোন হানির সম্ভাবনা নাই।

আমাদের প্রকৃত কথা এই যে, এক এক আত্মা-হইতে কেমন করিয়া অনেকানেক ভাব ক্রমান্বয়ে বিকসিত হয়, তাহার প্রকরণ পদ্ধতি অবগত হইতে হইলে রীতি-মত দর্শন-শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা আবশ্যক; সুতরাং এরূপ গুরুতর বিষয়ে আমরা এখানে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। এখানে কেবল আমরা এই একটি বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র করা শ্রেয় বোধ করি যে, প্রভাত বাবু যদি মনে করেন যে, বাহির হইতে অন্তরে ভাব-স্ফুরণ হইতেছে—এইটিই কেবল বিজ্ঞান-সঙ্গত ও সহজ-বোধ্য, আর, অন্তর হইতে বাহিরে ভাব অভিব্যক্ত হইতেছে—এটা বুদ্ধির অগোচর; তবে সেটি তাঁহার অভ্যস্ত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেননা অনেকের এক-মুখিতা (convergence of the many towards the one) বুঝিতে পারাও যেমন, আর, একের অনেক-মুখিতা (Divergance of the

many from the one) বুঝিতে পারাও তেমনি; উভয়ই সহজ ভাবিলে সহজ হইতেও সহজ, কঠিন ভাবিলে কঠিন হইতেও কঠিন। অনেকানেক পরীক্ষিত বিষয়ের সূত্র অবলম্বন করিয়া সাধারণ হইতে সাধারণ-তর নিয়মে আরোহণ করা বিজ্ঞানের পদ্ধতি; আর, এক মূলতম বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ইচ্ছা হইতে বিচিত্র বিশ্বব্যাপারে অবরোহণ করা দর্শনের পদ্ধতি, এ দুই পদ্ধতির মধ্যে এপিট ওপিট সম্বন্ধ। কেননা, যে যুক্তি অনুসারে অনেকানেক ঘটনা হইতে এক এক মূল-নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়, সেই যুক্তি অনুসারেই এক এক মূল-নিয়ম হইতে অনেকানেক ঘটনার অভিব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যে পথ দিয়া যাওয়া যায়, সেই পথ দিয়াই আসা যায়; আর, যে পথ দিয়া আসা যায়, সেই পথ দিয়াই যাওয়া যায়। কাজেই বিজ্ঞান যে, স্থূল ঐন্দ্রিয়ক জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বৈজ্ঞানিক নিয়মে পদ নিক্ষেপ করিতেছেন; এবং দর্শন যে, সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল জগতের অভিব্যক্তিতে পদনিক্ষেপ করিতেছেন; দুয়ের পথ যাহা তাহা একই—দিকেরই কেবল প্রভেদ। উপমা এবং কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়ই এক-বাক্যে বলিতেছে (কথায় না বলুক্ কিন্তু ভাবে-গতিকে বলিতেছে—কাজে বলিতেছে) যে, সূক্ষ্ম-রূপী এক স্থূল-রূপী অনেকের দ্যোতক (অর্থাৎ সূক্ষ্মের আলোকেই স্থূল-সকল জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে উপনীত হয়—যেমন সূক্ষ্ম ভারাকর্ষণের আলোকে জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতি স্থূল অভিব্যক্তি-সকল জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে উপনীত হয়); আর, সূক্ষ্ম এবং স্থূলের মধ্যে—এক এবং অনেকের মধ্যে—জ্ঞান এবং জড়ের মধ্যে—সমস্ত দ্বন্দ-যুগলের মধ্যে—নিরবচ্ছিন্ন সোপান-পরম্পরা পুঙ্খানুরূপে বর্ত্তমান। এই সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিত জড়ের অভ্যন্তরেও জ্ঞানোপযোগী নিয়ম সকল অন্বেষণ করেন এবং দর্শনবিৎ পণ্ডিত জ্ঞানের অভ্যন্তরেও জড়োপযোগী শক্তি-সকল অন্বেষণ করেন। নিয়ম-হীন শক্তি এবং শক্তি-হীন নিয়ম উভয়ই অঙ্গহীন;—নিয়ম-হীন শক্তি অন্ধ শক্তি; শক্তি-হীন নিয়ম অকার্য্যকর শূন্য নিয়ম। দুয়ের একাধার-বর্ত্তিতাতেই দুয়ের পূর্ণতা হয়; অতএব সমস্ত অপূর্ণ এবং আপেক্ষিক সত্যের মূলে এক যিনি অদ্বিতীয় পূর্ণ সত্য, তাঁহাতে সমস্ত জ্ঞানের নিয়ম এবং সমস্ত জড়-জগতের শক্তি একাধারে বর্ত্তমান—এইটিই বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়েরই সার সিদ্ধান্ত; আর, মুখ্য-রূপে ধরিতে গেলে, এটি বিজ্ঞানেরও তত নহে—দর্শনেরও তত নহে—যত অন্তর-তম বিশুদ্ধ জ্ঞানের সার-সিদ্ধান্ত। বিশুদ্ধ জ্ঞান—বিজ্ঞান এবং দর্শন দ্বারা মার্জিত হয় মাত্র; আর এক দিকে তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রীতি ভক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হয় মাত্র; কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞানই—তাহা বিজ্ঞান দর্শন প্রীতি ভক্তি সকলকে লইয়া সকলেরই মূলে অবস্থিতি করে। বিশুদ্ধ-জ্ঞানেই এই তত্ত্বটি সুস্পষ্টরূপে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে যে, সমস্ত জগৎ এক মহাশক্তি-পূর্ণ মহাজ্ঞানেরই মহিমা। শ্রীদ্বি]

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

গার্হস্থ্য।

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত।)

শিব কহিলেন দেবি! মনুষ্যের পক্ষে গার্হস্থ্যই প্রথম ধর্ম্ম, আমি অগ্রে তাহাই কহিতেছি শুন। গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে এবং যে কোন কর্ম্ম করিবে তাহা ব্রহ্মে অর্পণ করিবে। কদাচ মিথ্যা কহিবে না, কাহারও সহিত শঠতা করিবে না, দেবপূজা ও অতিথি সৎকারে নিযুক্ত থাকিবে। গৃহী মাতা পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিবে। মাতা ও পিতা পরিতুষ্ট হইলে পরব্রহ্ম প্রসন্ন হন। ব্রহ্মই জগতের মাতা পিতা, যে কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর গৃহীর পক্ষে তাহাই তপস্যা। যোগ্য সময়ে শয্যা আসন পান ভোজন পিতামাতাকে দান করিবে। কুলপাবন সৎপুত্র তাঁহাদিগকে মৃদুবাক্য শুনাইবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় আচরণ করিবে এবং আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিবে। যদি আপনার হিত ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মুখে ঔদ্ধত্য পরিহাস ভৃত্যাদিকে ভর্ৎসনা ও অন্যের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। পিতা মাতাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিবে। তাঁহাদের আদেশ ব্যতীত কদাচ উপবেশন করিবে না। বিদ্যা ও ধনমদে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অপহেলা করিবে না, ইহা দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে পড়িতে হয়। যদি প্রাণ কণ্ঠগতও হয় তথাচ পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র সহোদর ও অতিথিকে ত্যাগ করিয়া আহার করা গৃহীর কর্ত্তব্য নয়। যে ঔদরিক ইহাঁদিগকে বঞ্চনা করিয়া ভোজন করে সে ইহলোকে নিন্দনীয় ও পরলোকে নরকগামী হয়। গৃহস্থ স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রতিপালন করিবে ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পিতা এই দেহের স্রষ্টা, এবং মাতা প্রতিপালক, যে ব্যক্তি স্বজন কর্ত্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে সে নীচ। ইহাঁদের জন্য অশেষ কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সর্ব্বদা শা[illegible] অনুসারে ইহাঁদিগকে প্রীত ও প্রসন্ন করিবে ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ভার্য্যাকে কখন প্রহার করিবে না, তাহাকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করিবে আর যদি স্ত্রী সতী ও সাধ্বী হয় তাহা হইলে ঘোর কষ্টের সময়েও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। নিজের স্ত্রীসত্তে কুঅভিপ্রায়ে অন্য স্ত্রী স্পর্শ করিবে না, ইহাতে নিশ্চয়ই নরকপাত হয়। প্রজ্ঞাবান গৃহী নির্জনে পরস্ত্রীর সহিত শয়ন ও একত্র বাস করিবে না, স্ত্রীলোককে কোন অযুক্ত কথা কহিবে না এবং তাহার প্রতি শৌর্য্য প্রদর্শন করিবে না। ধন বস্ত্র প্রীতি শ্রদ্ধা ও অমৃতোপম বাক্যে স্ত্রীকে সতত সন্তুষ্ট করিবে, কদাচ তাহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি উৎসব-ক্ষেত্র লোক-যাত্রা তীর্থস্থান ও পরগৃহে পত্নীকে পুত্র ও অমাত্যের সঙ্গ বর্জ্জিত করিয়া প্রেরণ করিবে না। পতিব্রতা পত্নী যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তৎকর্ত্তৃক সমস্ত ধর্ম্মই কৃত হয় এবং সে ব্রহ্মের প্রিয় হইয়া থাকে। পিতা চার বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রকে লালন পালন করিবে, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত নানাবিধ গুণ ও বিবিধ বিদ্যা শিখাইবে, বিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে গৃহকার্য্যে নিয়োগ করিবে। কন্যাকেও পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন পূর্ব্বক শিক্ষা দিবে এবং তাহাকে ধনরত্নের সহিত বিদ্বান পাত্রে সম্প্রদান করিবে। যেমন পুত্র কন্যার প্রতি ব্যবহার বিহিত হইয়াছে সেইরূপ

ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞাতি মিত্র ও ভৃত্যদিগকেও প্রতিপালন ও নানা প্রযত্নে তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করিবে। পরে স্বধর্ম্মী একগ্রামবাসী এবং অভ্যাগত উদাসীনদিগকেও সস্নেহে দেখিবে। দেবি! গৃহস্থ সম্পদ সত্ত্বে যদি এইরূপ কার্য্য না করে তবে সে পশু লোকনিন্দিত ও পাপী। অতিরিক্ত নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করিবে। দেহের প্রতি অধিক যত্ন ও কেশবিন্যাস করিবে না। আর আহার ও পরিচ্ছদে অধিক আসক্তি রাখাও উচিত নয়। মিতভোজী হইবে, অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইবে, মিতভাষী হইবে, অকারণ শুক্রক্ষয় করিবে না, সরল হইবে, বাহ্য ও অভ্যন্তর পবিত্র রাখিবে এবং সতত উদ্যমশীল থাকিবে। শত্রুর নিকট বিক্রমী এবং বন্ধু ও গুরুজনের নিকট বিনীত হইবে। ঘৃণিতকে আদর এবং সম্মানিত ব্যক্তিকে অনাদর করিবে না। অগ্রে সহবাস ও পরীক্ষা দ্বারা লোকের সৌহার্দ্দ ব্যবহার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি সম্যক বুঝিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। বুদ্ধিমান লোক নিজের অবস্থা আলোচনা করিয়া সামান্য শত্রুর প্রতিও ভয় রাখিবে এবং যথা-কালে নিজের প্রভাব প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ থাকিবে না, আর ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিবে না। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় যশ পৌরুষ এবং গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হয় তাহা আর উপকারের নিমিত্ত যাহা কৃত হয় তাহা কদাচ প্রকাশ করিবে না। যত্নবান হইয়া বিদ্যা ধন যশ ও ধর্ম্ম উপার্জন করিবে আর স্ত্রী দ্যূতাদিতে আসক্তি অসৎসঙ্গ ও মিথ্যা দ্রোহ পরিত্যাগ করিবে। অবস্থা ও সময় বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অলব্ধ বস্তুর লাভ ও রক্ষণে যত্ন করিবে, ধর্ম্মশীল কার্য্যকুশল ও বন্ধুবৎসল হইবে। আর স্বভাবত বিশেষত মাননীয় লোকের নিকট মিতভাষী ও মিতহাস্য হইতে অভ্যাস করিবে। ইন্দ্রিয় জয় করিয়া সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকা ও শাস্ত্রচিন্তা করা আবশ্যক, দৃঢ়ব্রত সাবধান ও দীর্ঘদর্শী হওয়া উচিত, আর ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিবে। ধীর ব্যক্তি সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাক্য কহিবে আর নিজের উৎকর্ষ ও পরের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। যিনি গমনাগমনের পথে জলাশয়খনন বৃক্ষরোপণ বিশ্রামগৃহ ও সেতু নির্ম্মাণ করেন তিনি ধন্য। যাঁহার প্রতি পিতা মাতা সন্তুষ্ট ও সুহৃদ্গণ অনুরক্ত এবং সকলে যাঁহার যশোগান করে তিনি ধন্য। সত্যই যাঁহার ব্রত যিনি দীনের প্রতি দয়া করেন আর কাম ও ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তিনিই ধন্য। যিনি পরস্ত্রীতে বিরক্ত পরদ্রব্যে নিস্পৃহ এবং দম্ভ ও মাৎসর্য্যহীন তিনিই ধন্য। যিনি অসংশয়ী শ্রদ্ধাবান সদাচারপর ও বিধিনিষেধদর্শী তিনিই ধন্য। যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া অসক্ত ভাবে লোকযাত্রা সিদ্ধির নিমিত্ত কার্য্য করেন তিনিই ধন্য। বাহ্য ও আন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মে আত্মার্পণকে অন্তঃশৌচ বলে, আর জলাদি দ্বারা দেহশুদ্ধিকে বহিঃশৌচ বলে। এই শৌচাশৌচের বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই, যাহার যাহাতে মন পবিত্র হয় সে তাহাই আচরণ করিবে। গৃহস্থের ত্রৈকালিক উপাসনা করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয় মধ্যাহ্ন ও সূর্য্যাস্ত এই তিন কাল উপাসনার প্রশস্ত কাল। কলির লোক অন্নগতপ্রাণ, সুতরাং উপবাস দ্বারা ধর্ম্মাচরণ তাহাদের উচিত নয়। বরং উপবাসের প্রতিনিধিত্বে

দান করা আবশ্যক। দানক্রিয়া সর্ব্বসিদ্ধিকর, ইহার পাত্র কেবল সচ্চরিত্র দরিদ্র। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায় পিতৃমাতৃসেবা ও ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণে উপেক্ষা করিয়া তীর্থযাত্রা করে সেই তীর্থযাত্রা তাহার কেবল নরকের নিমিত্ত হয়। স্ত্রীলোকের পতিসেবা ব্যতীত তীর্থযাত্রা উপবাসাদি কার্য্য ও ব্রত নিয়ম কিছুই নাই। পতিই স্ত্রীলোকের তীর্থ এবং পতিই স্ত্রীলোকের তপ দান ও ব্রত, অতএব স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রযত্নে পতি-সেবা করিবে। সে কায়মনোবাক্যে পতির প্রিয় আচরণ করিবে এবং তাহার আজ্ঞাকারিণী হইয়া পতি-বান্ধবদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। পতিব্রতা পত্নী ক্রূর দৃষ্টি দ্বারা কদাচ পতিকে দর্শন করিবে না, কদাচ দুর্বাক্য শুনাইবে না এবং মনেও কখন তাহার অপ্রিয় আচরণ করিবে না। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে স্বামীকে প্রীতি করে তাহারই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। সে অন্য পুরুষের মুখ দেখিবে না এবং অন্য পুরুষকে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইবে না। বাল্যকালে পিতার অধীন থাকিবে, যৌবনে ভর্ত্তার অধীন থাকিবে এবং বার্দ্ধক্যে পতি-বন্ধুগণের অধীন থাকিবে৷ ফলত কোন কালেই তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই। যে স্ত্রী পতিমর্য্যাদা জানে না যে পতিসেবা জানে না এবং যে ধর্ম্মশাসন জানে না পিতা সেই বালিকার কদাচ বিবাহ দিবে না। নরমাংস নরাকৃতি পশুর মাংস বহূপকারী গো-জাতির মাংস আস্বাদশূন্য মাংসাশী পশুর মাংস আহার করিবে না। গ্রাম্য ও বন্য বিবিধ ফল মূল ও নানা প্রকার ভূমিজাত দ্রব্য স্বেচ্ছানুসারে খাইবে। ব্রাহ্মণের অধ্যাপন ও যাজনই উৎকৃষ্ট কার্য্য, কিন্তু তদ্বিষয়ে অশক্ত হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও ভূমিশাসন উৎকৃষ্ট কার্য্য। তদ্বিষয়ে অশক্ত হইলে বণিকবৃত্তি ও শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করিবে।

ব্রাহ্মণ দ্বেষ মাৎসর্য্যশূন্য দেহাদিতে মমতাহীন শান্ত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও স্ববৃত্তিতে কপটতাশূন্য হইবেন। তিনি সুশীল শিষ্যদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে অধ্যাপন করিবেন এবং সর্ব্বলোকহিতৈষী ও অপক্ষপাতী হইবেন। তিনি মিথ্যালাপ অসূয়া ব্যসন অপ্রিয়ভাষণ নীচসংসর্গ ও অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন।

ক্ষত্রিয় প্রজার ধনে নির্লোভ হইয়া পরিমিত কর গ্রহণ এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পুত্রবৎ প্রজাপালন করিবেন। ন্যায়যুদ্ধ সন্ধি ও অন্যান্য কার্য্য মন্ত্রিগণের সহিত সম্যক বিচার করিয়া অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় রাজা নীচসংসর্গশূন্য বিদ্বজ্জন-প্রিয় বিপদে ধীর সুনিপুণ সচ্চরিত্র ও মিতব্যয়ী হইবেন। তিনি শস্ত্রশিক্ষায় বিচক্ষণ দুর্গসংস্কারে দক্ষ ও সৈন্যের মনোভাব পরীক্ষক হইয়া তাহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিবেন। যুদ্ধে মূর্চ্ছিত ও ত্যক্তশস্ত্র রণপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করা নিষিদ্ধ এবং শত্রুর স্ত্রী ও শিশুদিগকে বিনাশ করা অবিধেয়। যে বস্তু জয়লব্ধ বা সন্ধিপ্রাপ্ত তাহা যথাযোগ্যরূপে সৈন্যমধ্যে বিভাগ করিয়া দিবে। রাজা প্রত্যেক যোদ্ধার শৌর্য্য চরিত্র পরীক্ষা করিবেন এবং আত্ম-হিতের জন্য এক ব্যক্তিকে কদাচ বহুসৈন্যের অধিনায়ক করিবেন না। নীচের সহিত ক্রীড়া ও পরিহাস পরিত্যাগ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী মিতভাষী এবং জ্ঞানী হইয়াও জিজ্ঞাসু হইবেন। যদিও তাঁহার প্রচুর সম্মান তথাচ

তজ্জন্য দম্ভ ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া থাকিবেন এবং দণ্ড ও প্রসন্নতায় ধীরভাব ধারণ করিবেন। নিজেই হউক বা চরনিযোগ দ্বারাই হউক প্রজাদিগের ভাব পরীক্ষা তাঁহার কর্ত্তব্য। যে রাজা তত্ত্বদর্শী তিনি ক্রোধ দম্ভ ও প্রমাদ বশত সহসা কদাচ সম্মান ও শাসন করিবেন না। তিনি সৈন্য সেনাপতি অমাত্য বনিতা অপত্য ও সেবকদিগকে প্রতিপালন করিবেন কিন্তু যদি ইহাদিগের কোনরূপ দোষ দেখা যায় তাহা হইলে যথাবিধি দণ্ডই বিধেয়। প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা উন্মত্ত অসমর্থ পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক রোগাক্রান্ত ও বৃদ্ধ তাহাদিগকে পিতৃবৎ রক্ষা করিবেন।

বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যই অবলম্বনীয়। কারণ ইহা দ্বারা সকলের শরীর নির্ব্বাহ হইবে। অতএব বৈশ্য বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে প্রমাদ ও আলস্য পরিত্যাগ করিবে। বিক্রয়ী ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে বস্তু ও তন্মূল্য নির্ণয় হইয়া ক্রয়সিদ্ধি করা উচিত। কিন্তু যাহারা মত্ত ক্ষিপ্ত বালক ও শত্রুগ্রস্ত এবং রোগপ্রভাবে যাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে তাহাদের দান বিক্রয় অসিদ্ধ। অদৃষ্ট বস্তুর গুণশ্রবণে ক্রয়সিদ্ধি হয় কিন্তু গুণের অন্যথায় ইহার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। হস্তী অশ্ব ও উষ্ট্রের এক বৎসর অতীত হইলেও যদি গুপ্ত দোষ প্রকাশ হয় তাহা হইলে তন্মূল্য ফিরাইয়া লইবে। এই মানব দেহ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ভাজন, হে দেবি আমি কহিতেছি কদাচ ইহার ক্রয়সিদ্ধি হইবে না।

যে সেবক সে সেবা বিষয়ে অপ্রমাদী ও অনলস হইবে, কার্য্যে দক্ষতা তাহার আবশ্যক এবং সে শুচি সত্যবাদী জিতনিদ্র ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। যে ভৃত্য ইহকাল পরকালে সুখ চায় সে প্রভুকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিবে এবং প্রভু-পত্নীকে জননীর ন্যায় দেখিবে। প্রভুর স্বসম্পর্কীয় ও বান্ধবগণের যথোচিত সম্মান রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য। প্রভুর মিত্রই তাহার মিত্র, প্রভুর শত্রুই তাহার শত্রু। প্রভুর অপমান গৃহছিদ্র গোপন রাখিবার জন্য উক্ত কথা ও যাহা কিছু গ্লানিকর সমস্তই যত্নসহকারে গোপন করিবে। সে স্বামি-ধনে নির্লোভ ও স্বামির হিতকর কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইবে। প্রভুর নিকট কোন রূপ অসদ্ভাব ক্রীড়া ও হাস্য পরিত্যাগ করিবে। সে প্রভুর দাসীগণকে পাপমনে কখন দেখিবে না এবং তাহাদের সহিত নির্জনবাস ও রহস্যালাপ কখনই করিবে না। প্রভুর শয্যা আসন যান বসন ভূষণ ভোজনাদির পাত্র পাদুকা ও শস্ত্র কদাচ নিজের ব্যবহারে অনিবে না। যদি অপরাধ হয় তবে প্রভুর নিকট ক্ষমা চাহিবে এবং তাঁহার সম্মুখে ধৃষ্টতা ও প্রৌঢ়বাদ পরিত্যাগ করিবে।

দেবি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। মনুষ্য জাতমাত্র গৃহস্থ হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে গার্হস্থ্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। পরে তত্ত্বজ্ঞানে যখন মনে প্রবল বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে তখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। বাল্যে বিদ্যাভ্যাস যৌবনে ধনোপার্জ্জন ও বিবাহ পৌঢ় কালে ধর্ম্মকর্ম্ম এবং চরমে প্রব্রজ্যা। কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতা পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে না। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে মহাপাতকী। সে মাতৃহন্তা পিতৃঘাতক স্ত্রীঘাতী ও ব্রহ্মঘাতক।

নাস্তিকতা।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের যার পর নাই স্বাভাবিক হইলেও, তাঁহার অতলস্পর্শ জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কেহ বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন না. কেহ বা তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহার উপাসনার বা পূজার্চনার বিশেষ আবশ্যকতা দেখেন না। প্রার্থনা যে দুর্ব্বল মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস তাহা অনেকে সম্যকরূপে অবধারণ করিতে পারেন না। মনুষ্যের মন মোহতিমিরে এমনই আচ্ছন্ন, আশুতৃপ্তিকর বিষয়ের আকর্ষণ এমনই তীব্র, উন্মার্গগামী রিপুকুলের পরাক্রম এমনই দুর্দমনীয়, যে মনুষ্য আপনার ভোগবিলাসকে অব্যাহত রাখিবার জন্য পাপচিন্তা পাপানুষ্ঠানে রত থাকিবার জন্য ঈশ্বরের ভাবকে মনে প্রতিভাত হইতে দেয় না, ক্রমাগত তাঁহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে থাকে। যে সকল তর্কতরঙ্গে স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহারই অনুশীলনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, এবং তাঁহার অস্তিত্ব বিলোপে আপনার জড়প্রায় ও পাপময় হৃদয়ের জড়তা ও চিরকলঙ্ক পোষণ করিতে থাকেন।

যদি কেহ বলেন যে ঈশ্বর নাই, তবে সেরূপ অস্বীকারের কোন মূল্য নাই, কেন না তাহা হইতে কিছুই প্রমাণ হইল না। ঈশ্বর নাই মুখে বলা সহজ, কিন্তু এরূপ অস্বীকার যার পর নাই বিজ্ঞানবিরোধী। কেহ বলেন ঈশ্বর কেমন করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি ভৌতিক ও প্রাণীজগতের সম্পূর্ণ অতীত। যখন তাঁহার বিষয় কিছুই জানি না, তাঁহাকে চক্ষে দেখা যায় না, কর্ণে শ্রবণ করা যায় না, হস্তে স্পর্শ করা যায় না, যখন তাঁহার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তখন কেমন করিয়া বলিতে পারি যে ঈশ্বর আছেন। এ সকল চিন্তা বা কুতর্ক সহজেই মনে উদয় হইতে পারে বটে কিন্তু তাহারা প্রকৃত যুক্তির উপর স্থাপিত নহে। আমরা তর্ক-শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনায় সুস্পষ্ট বুঝিতেছি, (১) চিন্তা বা মনে স্পষ্ট ধারণা কোন এক বস্তুর অস্তিত্বের নিয়ামক হইতে পারে না। যদি এরূপ বলা যায়, যাহা আমরা মনে স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি, তাহার সত্তা আছে, যাহা ধারণা করিতে পারি না তাহার অস্তিত্ব নাই, তবে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। কোন এক বিষয়ের অস্তিত্বের ধারণা তোমার মনে সুস্পস্ট না হইতে পারে কিন্তু আমার মনে কতকদূর পর্য্যন্ত সম্ভবে, অপর একজনের নিকট তাহা সুস্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে। এরূপ স্থলে মনে সুস্পস্ট ধারণা কেমন করিয়া কোন এক বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় পরিচয় প্রদান করিবে। সুতরাং ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না বা ধারণা করিতে পারি না বলিয়া তাঁহার অনস্তিত্ব কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল।

(২) পুনরপি আমারদের অজ্ঞতা হইতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব মীমাংসিত হইতে পারে না। আমরা যাহা জানিতেছি তাহা আছে, যাহা জানিতে পারি না তাহার বিদ্যমানতা নাই, ইহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ। যদি কেহ বলেন যে চন্দ্রমায় মনুষ্যের ন্যায় জীব বসতি করে, কেহ তাহা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ স্বরূপ কখনই এরূপ বলিতে সাহসী

হন না, যে চন্দ্রমায় মনুষ্য নাই, থাকিলে অবশ্যই জানিতাম। জ্ঞানলাভের দ্বার বহু। তন্মধ্যে একটি পথ আমার নিকটে অবরুদ্ধ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অপর বর্ত্মগুলি যে একেবারে প্রতিরুদ্ধ তাহা কে বলিল। একদিক দিয়া সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইতে গিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিফলমনোরথ হইতে পারি বটে, কিন্তু এমন শত শত পথ আমাকে তাঁহার উজ্জ্বল স্বরূপের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য আমার সম্মুখে চির-প্রমুক্ত হইয়াছে।

ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নাস্তিবাদের কোন মূল্য নাই, যে পর্য্যন্ত না ইহা আস্তিক মত গুলিকে খণ্ডন করিয়া— আপনি একটি মত স্থাপন করিতে পারে। এই আস্তিক মত মধ্যে মুখ্যতঃ একটি নাস্তিকের খণ্ডনের বিষয় হইতে পারে। নাস্তিক বলিতে পারেন এই জগৎকার্য্যের শক্তি যাহা ঈশ্বরেতে আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। এবং জগতে অমঙ্গল আছে ইত্যাদি। জগৎ কার্য্যে ঈশ্বরের শক্তি পর্য্যাপ্ত নয় এবং আপাত প্রতীয়মান সামঞ্জস্যবিহীন ঘটনা কোন কল্যাণ প্রসব করে না যদি তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন তবে জানি যে আস্তিকতা কিছুই নহে। কিন্তু যখন দেখিতেছি এক পরিপূর্ণ প্রথম কারণ সমুদয় জগত সমুদয় ঘটনার একমাত্র প্রসবিতা, তখন আর আস্তিকতা কেমন করিয়া অসঙ্গতি দোষে দোষী হইতে পারে। যখন দেখিতেছি যে ঈশ্বর নিরবলম্ব, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সংসার সমুদয় লোক সকল প্রাণী স্থিতি করিতেছে, যখন উভয়ের মধ্যে আশ্রয় ও আশ্রিত সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, যখন সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের সুমহান উদ্দেশ্য সফল করিতেছে, যখন তাঁহাকে ধরিয়া জগতের আপাত প্রতীয়মান সামঞ্জস্যবিহীন ঘটনা ও অবস্থা বহুকল্যাণ উদ্গীরণ করিতেছে, তখন আর জগৎ কার্য্যে অমঙ্গল কোথায় রহিল।

নাস্তিক বলিবেন অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে, এই সসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন এক কারণ স্বীকার করিয়া লইতে হয়, যিনি এই বিশ্বসৃজনের প্রয়োজনাপেক্ষা অতিরিক্ত শক্তি ধারণ করেন। আরও তিনি বলিতে পারেন যে এরূপ প্রয়োজনাপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর অনন্ত শক্তিসম্পন্ন কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু এরূপ স্বীকার যুক্তিসম্মতও নহে; কারণ ইহা এক প্রকার মশা মারিতে কামান পাতা। তবেই হইল সসীমের কারণ অসীম অনন্ত না হইয়া সসীম, কেননা তদ্ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমাদিগকে সসীম সৃষ্টির কারণানুসন্ধানে ক্রমাগত পশ্চাদপদ হইতে হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এ বৃক্ষ কোথা হইতে আসিল আমি বলিব ফল হইতে, ফল কোথা হইতে আসিল, বৃক্ষ হইতে, তুমি কোথা হইতে আসিলে পিতা হইতে, পিতা কোথা হইতে আসিলেন, পিতামহ হইতে, পিতামহ কোথা হইতে তাঁহার পিতা হইতে ইত্যাদি। এরূপে কোন এক বস্তুর কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে ক্রমাগত অতীতের গর্ভে প্রবেশ করিতে হয়, ইহাকেই বলে অনবস্থা দোষ। ইহাতে কেবল এক কারণপ্রবাহে ভাসমান হইতে হয়। সেই জন্যই বলিতেছি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আমারদের যারপর নাই স্বাভাবিক, তর্কশাস্ত্র দ্বারা আমরা তাঁহার অস্তিত্বে উপনীত হই না। বাহ্যজগতের পর্য্যা-

লোচনা আমারদের সেই আন্তরিক বিশ্বাসকে আরও জাগ্রত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে বটে, কিন্তু উৎপাদন করিতে পারে না। "সুতরাং প্রয়োজনাপেক্ষা অধিকতর শক্তি সম্পন্ন কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই," তর্কশাস্ত্রের এই যে সত্য আমারদের স্বাভাবিক বিশ্বাসের নিকটে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল। এবং ইহাও প্রমাণীকৃত হইল যে সসীম কারণ প্রবাহ স্বীকারে আমরা জগৎ উৎপত্তির মূলদেশে উপস্থিত হইতে পারি না। কেবল এক অনন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস সসীম জগৎ সৃষ্টির মূলদেশে আমাদিগকে লইয়া যায়।

প্রচলিত তর্কশাস্ত্র গুলির একটি গণ্ডী বা সীমা আছে। তর্কশাস্ত্রের মূল নিয়ম বা সত্যগুলি কেবল সেই সীমার মধ্যেই কার্য্যকর। এই সীমার বহির্গত হইলে তর্কশাস্ত্রের অমোঘ সত্যগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। তর্কশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপস্থিত হওয়া ইহার মধ্যে অন্যতম। তর্কশাস্ত্র সসীম হইতে সসীম বস্তুর তত্ত্বান্বেষণ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করে। কিন্তু যখনই সসীম জগত হইতে অসীম অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখনই তর্কশাস্ত্র ক্ষীণবীর্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া এই জগৎসৃষ্টি অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, নাস্তিকতা জড়বাদে পরিণত হয়। ঈশ্বর নাই, স্বীকার করিলেও এই জগতের সত্তা কোথা হইতে আসিল। জড়বাদিগণের মতে ইহার উপাদান অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে ও তাহা নিত্য। কিন্তু এখানেও তাঁহাদিগের দুর্গ নিতান্ত ভগ্ন, শত্রুদিগের সুপ্রবেশ্য। জড় উপাদান জগতের কারণ হইলেও (১) এই অসম্বদ্ধ উপাদান কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলাবদ্ধ অস্তিত্বে পরিণত হইল। (২) এই জড় উপাদান আপেক্ষা উন্নততর—অস্তিত্বের ভাব—ঈশ্বরের ভাব অন্তরে কোথা হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম। জড়বাদ ইহার কোন কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

অনাদিকাল হইতে জড় উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও পরিত্রাণ নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনাদিকাল হইতে এক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে জড়উপাদান পরিচালিত হইয়া কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। সৃষ্টিকাল হইতে জড় উপাদান ও জড়শক্তির সত্তা স্বীকারে যে বিবেচ্য বিষয় পরিস্ফুট হইয়া আইসে তাহা নহে, বরং গোলযোগ আরও শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। কোথায় বা অন্ধ শক্তির সহিত জড় উপাদান সংযুক্ত হইবে, কোথায় বা বিযুক্ত হইবে, বল বা শক্তি কি পরিমাণে জড় উপাদানের উপর কার্য্যকর হইবে, কে বা তাহাদিগকে কখন বা সংযুক্ত বা বিযুক্ত করিয়া জগত সংসারকে পরিচালিত করিবে, অন্ধশক্তি ও জড় উপাদানের মধ্যে পরস্পারের কেমন করিয়া সখ্যভাব স্থাপিত হইবে, এ প্রহেলিকা হইতে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে।

অন্ধশক্তি ও জড়উপাদান জগতের কেবলমাত্র কারণ হইলেও, তাঁহারদের সংযোগ বিযোগে জগৎসংসার পরিচালিত হইলেও, জগৎকার্য্যে অনুপম জ্ঞানের চিহ্ন শিল্পচাতুরী কোথা হইতে দেখা দিল। মনুষ্যের শরীর যেন জড় উপাদানে নির্ম্মিত, কিন্তু অন্তর্জগৎ, জ্ঞান ও বুদ্ধির সূক্ষ্ম উপাদানে কেমন করিয়া পরিনির্ম্মিত হইল, বি-

পদে ধৈর্য্য, অনিষ্টাচরণে ক্ষমা, ধর্ম্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, উচ্চ আশা, ঘোর সঙ্কটে অভয় এসকল ভাব কোথা হইতে আসিল। যখন অন্ধ শক্তি ও জড় উপাদান ভিন্ন আমারদের সঙ্গতি নাই, তখন স্বীকার করিতে হইবে, যে এতদুভয়ের সম্মিলনে বা কোন একটি হইতে জগৎকার্য্যে জ্ঞানের উন্মেষ ও মনুষ্যে জ্ঞানবুদ্ধি দেখা দিয়াছে। অন্ধশক্তি ও জড়উপাদানে যদি এক উন্নততর ও সূক্ষ্মতর বস্তুর উৎপাদন সম্ভব হয়, তবে জানি না কি হইতে কি উৎপন্ন না হইতে পারে! অথবা এই শক্তির যদি এমন প্রভাব থাকে যাহা হইতে সৃষ্টিকার্য্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির সঞ্চার হইতে পারে, তবে এই শক্তি জড়শক্তি নহে, ইহা জ্ঞানাত্মক শক্তি! এই জ্ঞানাত্মক শক্তিই জগতে অনুপম কৌশলের প্রসবিতা ও মনুষ্যের জ্ঞানশক্তির প্রেরয়িতা। এই অতুল্য শক্তিমান জ্ঞানাত্মক শক্তিকে স্বীকার করিলে আর জড় উপাদানের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয় না। এই জ্ঞানাত্মক শক্তিই আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গল স্বরূপ। ইনিই আলোচনা করিলেন, আর তরুলতা ফলফুল প্রাণীজঙ্গম সমন্বিত বিশ্ব সৃষ্ট হইল।

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপনীত হইবার দুইটি পথ, প্রথম অন্তর্দৃষ্টি দ্বিতীয় বহির্দৃষ্টি। ঈশ্বর যেমন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তেমনি আবার বাহ্যজগত তাঁহার অস্তিত্বের চূড়ান্ত সাক্ষী! স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপের কুটিল পথকে সুগম করিবার জন্য যদি আত্মরূপ বিমল দর্পণ হইতে ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ ছবি মুছিয়া ফেলি, তাহা হইলেও বাহ্যজগত আমারদিগের প্রতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কুটিল ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিবে। বাহ্যজগতের সৃষ্টি প্রণালী অন্য রূপ কারণপ্রসূত বলিয়া যদি অসত্য যুক্তির অবতারণা করি, তথাপি তাহা অমোঘ তর্কসংগ্রামে তিষ্ঠিতে পারিবে না। আত্মপ্রত্যয় বা বাহ্যজগত যাঁহার অস্তিত্বের বিশদ প্রমাণ, কুতর্ক কতক্ষণ তাঁহাকে আমারদিগের নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সকল প্রকার তর্কতরঙ্গের অতীত বলিয়া যতই আমরা নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে তাঁহাকে মন হইতে অপসারিত করিতে চাই, ততই তাঁহার দুর্জ্জয় অস্তিত্ব আমারদের কূট বুদ্ধির মধ্য হইতেও আপনা হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যাহা বাস্তবিক সত্য তাহাকে অসত্য বলিয়া প্রমাণ করা যারপর নাই অসম্ভব। আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, সেখানে ঈশ্বরের সংমোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, বাহ্যজগত আলোচনা কর সেখানকার জড় আবরণের মধ্যেও তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন দেখিবে।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন।

ব্রাহ্মসমাজ আজ কাল তিনটী দলে বিভক্ত। এই তিন দলের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে মত প্রভেদ আছে। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা যে ধর্ম্মসমাজের অনুমোদিত, সে সমাজের লোকের মধ্যে যে সকল বিষয়েই মতের একতা থাকিবে তাহা আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তিন দলের ব্রাহ্মগণই কয়েকটী মতে সমান রূপে বিশ্বাস করেন। অতএব এই সূত্রে সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য অনুশীলন আশা করা যাইতে পারে।

কিছুকাল হইল বিভিন্ন দলের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্মিলনের জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে ঐ প্রকার যে

চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা অতি সাধু চেষ্টা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ প্রকার চেষ্টা যে কিয়ৎ পরিমাণেও সফল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহার কারণ কি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

আমাদিগের স্থির বিশ্বাস যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মত বৈষম্য দূর করা যদি ব্রাহ্ম সম্মিলনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে ব্রাহ্ম সম্মিলন স্থায়ী হইবে না, এবং সকল ব্রাহ্ম আগ্রহের সহিত তাহাতে যোগ দিবেন না। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণের যে যে বিষয়ে এক মত তাহাই ব্রাহ্ম সম্মিলনের ভিত্তিভূমি করা পরামর্শসিদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম বিশ্বাস করেন, সেই বীজই ব্রাহ্ম সম্মিলনের প্রবর্ত্তক বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্ম সম্মিলন সাধন জন্য সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ একত্রিত হইয়া সে ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাহাতে যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করেন তাহারা বিভিন্ন শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মত বিভেদ আছে, বক্তৃতা বা প্রার্থনার মধ্যে সেই বিষয়ের অবতারণা করিয়া থাকেন। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ করিলে ব্রাহ্ম সম্মিলনের উদ্দেশ্য সাধনের পথে ঘোর প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হয়। ব্রাহ্ম সম্মিলন সাধনার্থ উপাসনা বা কথোপকথন সভা যাহা কিছু অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে যে যে বিষয়ে সকলে এক মত সেই সেই বিষয়েরই প্রস্তাবনা ও আলোচনা হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যতটুকু মনের মিল হইতে পারে ততটুকু মনের মিল সংসাধন করা যদি ব্রাহ্ম সম্মিলনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে যেখানে একটু মাত্র অমিল সেস্থান স্পর্শ না করাই কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্ম সম্মিলনের কার্য্য যদি এরূপ করিয়া পরিচালনা করা হয় যে তাহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মগণের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ মত গুলির অনুশীলন বৃদ্ধি হয় এবং তাহারই সাহায্যে তাঁহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও বন্ধুভাব বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মসম্মিলনের ফল অকিঞ্চিৎকর হইবে না। আমাদিগের ধারণা যে এইরূপ সম্মিলন হইতে ব্রাহ্মগণ স্ব স্ব দলীয় ভাব হইতে ক্রমে আপনাদিগকে অনেকটা মুক্ত করিতে পারিবেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা সার জিনিস—ঈশ্বরপ্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন—তাহার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি অধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যান।

(গত বৈশাখ মাসের পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার পর)

"যাঁর প্রেম রবি-করে,
যাঁর সুধা সুধাকরে ঝরে,
যাঁর দয়া গায় পাখী সুললিত স্বরে,
স্তব্ধ পর্ব্বতগণ যাঁর ধ্যান ধরে,
যিনি জীবের জীবন,
যাঁরে ঘোষে সদা সমীরণ,
কত রবি শশী তারা গগনে গগনে
যাঁর নাম দশ দিশি করিছে কীর্ত্তন।
পরম সম্পদ যিনি অতুলন ধন।
চিরদিন যিনি বন্ধু অভয় শরণ।
যাবে শোক তাপ, তাঁরে কর অনুরাগ,
কর তাঁর প্রেম রূপ হৃদয়ে দর্শন।
"শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্য মাঝে হয়ে শান্তিহারা,
যাঁর প্রীতি সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রীতি নিরখিয়ে পুঁছ অশ্রুধারা।"

যাঁরে প্রীতি করিলে স্থাপন।
প্রিয় হয় জগবাসী জন,
হৃদি বর্ষে সুধা অনুক্ষণ,
পিরিতীর হয় সম্পূরণ।
তাঁর সঙ্গে কর যোগ, তাঁর সহবাস ভোগ,
তাঁর প্রেমে হওরে মগন॥

সেই প্রেম স্পর্শমণি হইবে তোমার,
শোক অশ্রু ঘুচি হবে প্রেম অশ্রুধার।
যাবে মোহ-অধীনতা, যাবে শুষ্ক হৃদয়তা,
প্রেমানন্দ শান্তি সুধা পাবে অনিবার।

কররে উত্থান, ভাঙ্গ মায়ার স্বপন।
জাগিয়া জ্ঞানের অসি কররে ধারণ।
কর মোহ বিনাশন॥
আমি শ্রেয়—দিব আমি তোমা শুভগতি,
মম কথা শোন মোর ধরহ যুকতি।
যিনি জীবনের সার ধন,
যিনি বিনা বৃথায় জীবন।
তাঁরে ছেড়ে শূন্য কেন জীবন যাপন?
আমি তোমা লয়ে যাব ঈশ্বর সদন।
তাঁর ক্রোড়ে আমি তোমা করিব অর্পন।
"ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে"
হৃদয়ে দিবেন দেখা হৃদয়-রঞ্জন॥

শাণিত ক্ষুরের ধার সম।
ধর্ম্ম-পথ বড়ই দুর্গম।
যাহে প্রলোভন-চয় কণ্টক সমান,
প্রবৃত্তি হানিছে যথা খরতর বাণ।
যে তাঁর শরণ লয়, তার কিন্তু নাহি ভয়,
দুরগম হয় যে সুগম॥

ধর্ম্ম—তাঁর আদেশ পালন।
সুখে—দুঃখে—করিবে সাধন।
ধর্ম্ম বিনা পুরস্কার, ধর্ম্মের নাহিক আর,
আত্মার প্রসাদ হবে—ধর্ম্মের কারণ।
দেখিবে প্রভুর তাহে প্রসন্ন বদন।

ধরমের ফল নহে মুদ্রা যশোমান।
অট্টালিকা মণি মুক্তা অশ্ব রথ যান।
স্বরগের দেবগণ, সেবে যাহা অনুক্ষণ।
পৃথিবীর ধূলা তার নহে পরিমাণ,

ধর্ম্ম পথ কণ্টকিত হয়।
পরীক্ষার তরে দুঃখ দেন দয়াময়।
সুবর্ণ শ্যামিকা ত্যজে, পুড়িয়া যেমন,
সাধু হয় বিশোধিত, দুঃখেতে তেমন,
দুঃখে যদি নাহি টলে, স্থির ধর্ম্ম পথে চলে,
তবে পায় সে সম্পদ যার নাহি ক্ষয়॥

সেই দিন সুদিন গণিবে,
ধর্ম্মতরে আপনা সঁপিবে।
তাঁর কায সাধিবারে,
যবে ভুলি আপনারে,
করিতে সর্ব্বস্ব দান, কিবা বলি দিতে প্রাণ,
অকাতরে প্রস্তুত থাকিবে॥

সেব ধর্ম্মে ছাড় মোহ ছাড় কুমন্ত্রণা।
পাইবে অমৃত হেথা যাইবে যন্ত্রণা।
শ্রেয়ঃ যাহা হৃদি কয়, ঈশ্বরের বাণী হয়,
প্রাণপণে সেইবাণী ধরনা ধরনা।
সেই বাণী মত কায করনা করনা॥"

শ্রেয়ঃ যা বলিল, যুবা তা শুনিল,
চেতিল—পাইল জ্ঞান।
কিসের কারণ, জীবন ধারণ
করে সেই প্রণিধান।
প্রাণের ভিতরে, প্রাণের ঈশ্বরে
ডাকে যুবা সকাতরে।
তাঁহারে জীবন, করে সমর্পণ
তাঁর প্রতি প্রেম ভরে॥
স্বার্থ আপনার, না রাখিল আর,
হলো দীন অকিঞ্চন।
মলিন কামনা, বিষয় বাসনা
করিলেক বিসর্জ্জন॥

যিনি প্রেমদাতা পিতা মাতা পাতা,
শরণ লইল তাঁর।
অমৃত পাইল, কৃতার্থ হইল,
মৃত্যু ভয় নাহি আর॥
শ্রেয়ঃ কথা শুনি যেবা কায় মনঃপ্রাণ।
ঈশ্বরেতে সযতনে করে সমাধান॥
অমৃত তাহার লাভ এইখানে হয়।
শূন্য পূর্ণ হয় তার, দিক্ মধুময়॥
পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় শনিবার রাত্রি সাড়ে সাত টার সময় ভবানীপুর সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।
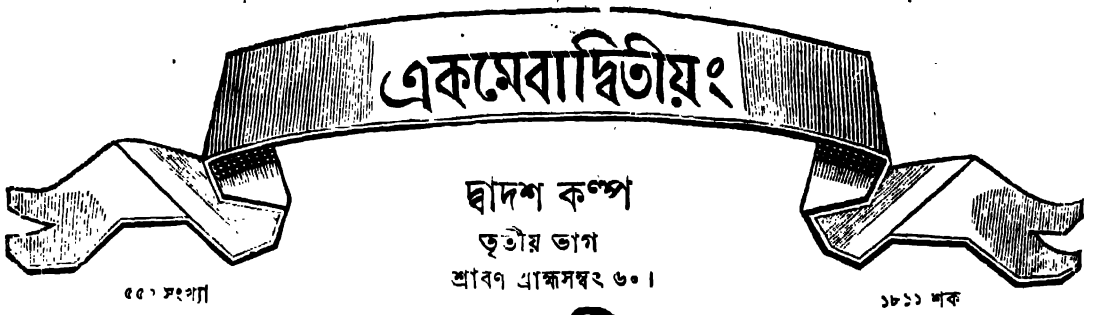
দ্বাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫৫০ সংখ্যা শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০। ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় ১৮১১ শক।

ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আছে "সহজেই ধায় নদী সিন্ধু-পানে কুসুম করে গন্ধদান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে—তোমাতেই অনুরাগী—মোহ যদি না ফেলে আঁ-ধারে॥" আমাদের মন যখন পরিশুদ্ধ হয়, তখন সমুদয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সহস্র কিরণ-বর্ষী এক অদ্বিতীয় জ্ঞান-সূর্য্যের প্রেম-মুখ ছবি হইয়া দীপ্তি পায়। ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আছে "এক ভানু অযুত কিরণে উজলে যেমতি সকল ভুবন--তোমার প্রীতি হ-ইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম জননী হৃদয়ে করে বসতি।" এরূপ সত্ত্বেও, আ-মাদের অন্তঃকরণে যখন মোহ-মেঘ ঘনী-ভূত হয়, তখন সমস্ত জগৎ সংসার ঈশ্বরের অমৃত-নিকেতনের লৌহ-পাষাণ বিনির্ম্মিত অভেদ্য দুর্গ হইয়া উঠে। মোহ-মেঘের ঘন আবরণে যখন আমাদের অন্তশ্চক্ষু তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তখন আমরা আ-মাদের বহিশ্চক্ষুকে সমস্ত বিশ্বময় দৌড় করাইয়া আনিয়া মনে মনে এইরূপ শ্লাঘা করি যে, আমরাই চক্ষুষ্মান্! আমরা বহি-শ্চক্ষুতে কি না দেখিতে পাই—সমস্তই দেখিতে পাই;—মন্দিরের স্তম্ভে স্তম্ভে—প্রাচীরে প্রাচীরে—অশেষ-বিধ পরমাশ্চর্য্য শিল্প কারীকরী দেখিতে পাই; নানাবিধ অপূর্ব্ব শোভন সজ্জা দেখিতে পাই; উজ্জ্বল দীপালোক দেখিতে পাই; সমস্তই দেখিতে পাই! দেখিতে পাই না কেবল এক বস্তু—মন্দিরের দেবতাকে দেখিতে পাই না; যেহেতু আমাদের অন্তশ্চক্ষু মোহ-মেঘে তমসাচ্ছন্ন! এইখানে ব্রহ্ম-সঙ্গীতের এই কথাটি স্মরণ হয়—"হবে কি হবে দিবা আলোকে—জ্ঞান-বিনা সকলই আঁধার!" বাস্তবিক জ্ঞান-বিনা সকলই আঁধার—প্রেম-ভক্তি বিনা সকলই প্রস্তর-পাষাণ মরু-ভূমি!

এখানে একটি তর্কের কথা এই যে, জগৎ সংসার অজ্ঞান-তিমিরেও যেমন অ-ন্ধকার—জ্ঞানালোকেও তেমনি অন্ধকার; জগৎ সংসার প্রেম-ভক্তির অভাবে যেমন মরুভূমি—প্রেম-ভক্তি বিদ্যমানেও তেমনি মরুভূমি; জ্ঞানালোকে বরং সংসারের অন্ধ-

কার অধিক পরিস্ফুট হয়—তাহা অপেক্ষা অজ্ঞান বরং ছিল ভাল; প্রেম ভক্তির সুকোমল মাধুর্য্য আস্বাদনের পর সংসারের কঠোরতা নিষ্ঠুরতা এবং অসারতা দ্বিগুণ তিক্ত হইয়া উঠে—তাহা অপেক্ষা তাহা আস্বাদন না করাই বরং ছিল ভাল! জ্ঞানী ব্যক্তির বিবেক-নেত্রেও তো সমস্ত জগৎ সংসার অন্ধকার-ময় অবিদ্যা—অজ্ঞানের অন্ধকার তবে কি দোষ করিল? ভক্ত-জনের বিরাগ-নেত্রেও তো জগৎ সংসার কঠোর উত্তপ্ত মরুভূমি—দ্বেষ হিংসার দাবানল তবে কি দোষ করিল? কিন্তু এই যে একটি কথা যে, জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত জগৎ অন্ধকার-ময় অবিদ্যা এবং প্রেমের চক্ষে সমস্ত জগৎ কঠোর মরুভূমি, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, জগতের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা প্রভৃতি যত কিছু উৎকৃষ্ট সামগ্রী আছে—তাহাও অন্ধকারময় অবিদ্যা; অথবা, জগতের মধ্যে যত কিছু সরস পবিত্র প্রেম-ভক্তি, সৌন্দর্য্য ঔদার্য্য আছে, সমস্তই কঠোর মরু-ভূমি; তবে কি? নূতন কিছুই নহে—সোজা কথা—সকলেই তাহা জানেন! জ্ঞানের সুবিমল জ্যোতিতে এবং প্রেম-ভক্তির অমৃত মাধুর্য্য-রসে সমস্ত জগৎসংসার অপূর্ব্ব এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে; এই নূতন মূর্ত্তির তুলনায় জগতের পূর্ব্বতন মূর্ত্তি নিতান্তই অসার এবং অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়;—তাই জ্ঞানা-লোকের অভ্যুদয়-মাত্রেই সাধক বলিয়া উঠেন—"সমস্ত জগৎ সংসার অন্ধকার-ময় অবিদ্যা" অর্থাৎ—পূর্ব্বে আমি জগৎকে যে ভাবে দেখিতাম এবং সচরাচর লোকে জগৎকে যে ভাবে দেখে—সেই ভাবের জগৎ অন্ধকার-ময় অবিদ্যা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ আর-এক প্রকার। প্রেমের অভ্যুদয়ে সাধক বলিয়া উঠেন—জগৎ সংসার বিষতুল্য; অর্থাৎ বিষয়ী লোকে জগৎ সংসারকে যে ভাবে দেখে সেই ভাবের জগৎ বিষ-তুল্য; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ অমৃতের প্রস্রবণ। সূর্য্যের কিরণাবলী প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার হইতে পারে না—অন্ধের নিকটেই তাহা অন্ধকার। অমৃত ঘনের ধারাবর্ষণ কখন প্রকৃত পক্ষে তিক্ত হইতে পারে না—বিকার-গ্রস্ত রোগীর নিকটেই তাহা তিক্ত।

জগতের এইরূপ মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তন শুধু যে, কেবল ধর্ম্ম-রাজ্যেই দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহা নহে। এরূপ মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন বিজ্ঞান-রাজ্যেও ঘটিয়া থাকে—মনো-রাজ্যেও ঘটিয়া থাকে—তা ভিন্ন তাহা নূতন কিছুই নহে; একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নহে! সকলেই জানেন যে, বিজ্ঞানের আন্দোলন-প্রভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বতন মূর্ত্তি আপাদ-মস্তক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সূর্য্য নবগ্রহের মধ্যে একতম গ্রহ বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন তাহা সকল গ্রহের মূলাধিষ্ঠিত কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়; পূর্ব্বে বহির্বস্তু-সকল স্থূল জড়-পিণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইত, এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, যেখানে যত স্থূল বস্তু সমস্তই সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আবর্ত্ত-বিশেষ—প্রস্তর পাষাণও নিশ্চেষ্ট পিণ্ড মাত্র নহে। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে এ যেমন—লৌকিক প্রেম-দৃষ্টিতেও তেমনি জগৎ সংসারের মূর্ত্তি ঠিক্ সে প্রকারে না হউক্—আর এক প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দৈব-যোগে কাহারো মনে কখনো যদি বলবৎ প্রেমের সঞ্চার হয়, তবে তাহার প্রভাবে তাঁহার নূতন চক্ষে সমস্ত জগৎই নূতন হইয়া দাঁড়ায়; তখন তাঁহার চক্ষে—সে চন্দ্র

আর সে চন্দ্র নাই—সে সূর্য্য আর সে সূর্য্য নাই—সে সমীরণ আর সে সমীরণ নাই; সকল বস্তুই তাঁহার সমক্ষে আর এক বেশে—আর এক ভাবে—আর এক জ্যোতিতে উপস্থিত হয়। মোহাচ্ছন্ন পার্থিব প্রেমেই যখন এইরূপ হয়; তখন জ্ঞানোজ্জ্বল স্বচ্ছ পবিত্র প্রেমে জগতের মূর্ত্তি আরো কত না পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবার কথা! বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রস্তর-পাষাণ স্থূল পিণ্ড মাত্র নহে—এই পর্য্যন্ত; কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমী সাধু ব্যক্তির রসার্দ্র অন্তঃকরণের সন্নিধানে প্রস্তর পাষাণ কথা কহে—আপনার অন্তরের নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত করে! তিনিও চরাচর প্রকৃতিকে পর ভাবেন না—চরাচর প্রকৃতিও তাঁহাকে পর ভাবে না; ফল পুষ্প তাঁহাকে যেমন প্রাণের সহিত গন্ধ-দান করে—এমন আর কাহাকেও নহে; তাঁহার উৎপক্ষ্ম নয়নে চন্দ্রমা যেমন প্রাণের সহিত জ্যোৎস্না বর্ষণ করে, এমন আর কাহারো নয়নে নহে। যাঁহার অন্তঃকরণে মোহের আবরণ নাই—তাঁহার সমক্ষে চরাচর বিশ্ব সংসারে কোনও আবরণই নাই। জগৎ, কেন তবে, সময়ে সময়ে ঈশ্বরপ্রেমীর প্রতি খড়গহস্ত হয়—ঈশ্বরপ্রেমীই বা কেন সময়ে সময়ে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহা অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন? ইহার উত্তর এই যে, চরাচর প্রকৃতি ঈশ্বর-প্রেমী সাধু ব্যক্তির পর নহে, ইহা সত্য; প্রকৃতিই যেন তাঁহার পর নহে—কিন্তু বিকৃতি? বিকৃতি তাঁহার খুবই পর! কেননা, প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয়ে পরস্পরের সপত্নী। স্বাস্থ্যই শরীরের প্রকৃতি, কিন্তু অস্বাস্থ্য শরীরের বিকৃতি। ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃতি কিন্তু অধর্ম্ম মনুষ্যের বিকৃতি। ব্যাঘ্র ভল্লুকের বটে দ্বেষ হিংসাই প্রকৃতি, কিন্তু মনুষ্যের তাহা প্রকৃতি নহে কিন্তু বিকৃতি। ব্যাঘ্রের যাহা প্রকৃতি—মনুষ্যের তাহা বিকৃতি। দ্বেষ হিংসা ব্যাঘ্রেরই ধর্ম্ম—মনুষ্যের তাহা ধর্ম্ম নহে কিন্তু অধর্ম্ম। ঈশ্বর-প্রেমী সাধুর সহিত প্রকৃতি মুক্তাবগুণ্ঠনে বাক্যালাপ করে—বিকৃতি তাঁহার নিকটে লজ্জায় জড়ো সড়ো হয়; ঈশ্বরপ্রেমীর উপরে বিকৃতির তাই এত বিষ-দৃষ্টি। ভগবদ্‌ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই বিকৃতির মধ্য হইতে প্রকৃতিকে বাছিয়া লইতে পারেন—কেননা তিনি নিজে প্রকৃতিস্থ। এইরূপ, বিকৃতির মধ্য হইতে প্রকৃতিকে বাছিয়া লওয়ার নামই বিবেক। শাস্ত্র সমূহের বাক্যাবরণ ভেদ করিয়া তাহার ভিতরে তলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সংসারের মধ্যে বিকৃত ভাব যত কিছু আছে—তাহাই ভগবদ্‌ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে অন্ধকারময় অবিদ্যা—তাহাই কঠোর মরুভূমি; কিন্তু বিকৃতির বিরোধী যত কিছু ভাব—প্রকৃত পক্ষেই যাহা প্রকৃতি—তাহা তাঁহার নিকটে ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রশ্মিজাল—প্রেমময়ের সুমধুর আশ্বাসবাণী। মনুষ্যের অন্তরতম প্রকৃতিকে লক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছে যে, "সহজেই ধায় নদী সিন্ধুপানে কুসুম করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে তোমাতেই অনুরাগী" আর, বিকৃতিকে লক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছে যে, "মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।" অতএব বিকৃতিকে সাবধান!

তার্কিক ব্যক্তি এখানে একটি তর্ক তুলিতে পারেন; তিনি বলিতে পারেন যে, হিংস্র জন্তুর যেমন হিংসাই প্রকৃতি, হিংস্র মনুষ্যেরও তেমনি হিংসাই প্রকৃতি; উহারই বেলায় হিংসা প্রকৃতি, আর, ইহারই বেলায় হিংসা বিকৃতি, এ কথা তুমি.

তোমার গায়ের জোরে বলিতেছ। ইহার উত্তর এই যে, দ্বেষ হিংসা যদি মনুষ্যের প্রকৃতি হইত, তবে তজ্জন্য মনুষ্যকে লজ্জিত অথবা কুণ্ঠিত হইতে হইত না। ব্যাঘ্র তো আপনার দ্বেষ হিংসার জন্য এক দিনের জন্যও লজ্জিত কুণ্ঠিত অথবা অনুতপ্ত হয় না—মনুষ্য তবে কেন আপনার দ্বেষ হিংসাকে নানা প্রকার সভ্য পরিচ্ছদে আবরণ করিবার জন্য যত্নবান্ হয়? ব্যাঘ্র যখন শিকারের রক্ত শোষণ করে, তখন সে আরক্ত নয়নে বিকট দশনে গর্জ্জন করিতে থাকে—কিন্তু মহাপ্রতাপশালী রাজা যখন প্রজার রক্ত শোষণ করেন তখন কেন তিনি তাঁহার নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিতে সঙ্কুচিত হ'ন? আর এক কথা এই যে, আমরা যখন ব্যাঘ্রকে হরিণ আক্রমণ করিতে দেখি, তখন তাহাতে আমরা একপ্রকার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই; কিন্তু যখন আমরা কোন অত্যাচারী রাজাকে প্রজাপীড়ন করিতে দেখি, তখন তাহা আমাদের নিতান্তই চক্ষুঃশূল হয়—অত্যাচার যদি মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ হইত তবে কখনই এরূপ হইত না। তা ছাড়া—ব্যাঘ্র হরিণ বধ করিয়া পরম পরিতোষ ভিন্ন এক মুহূর্ত্তের জন্যও গ্লানি অনুভব করে না; কিন্তু অত্যাচারী রাজা প্রজাপীড়ন দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশে কিছুতেই শান্তি লাভ করেন না—"এই কার্য্যের জন্যই কি আমি এই দুর্লভ মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি" এইরূপ একটা দুর্ভাবনার বিষজ্বালা যখন তখন তাহার মনোমধ্যে জাগরূক হইয়া উঠে। দ্বেষ হিংসা অত্যাচার যদি মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ হইত তবে কখনই এরূপ হইত না। মনুষ্যের বিকৃতি যেমন পদে পদে, তেমনি তাহার বিপরীত আর একটা দিক্ শুদ্ধ কেবল মনুষ্যের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—কি? না বিকৃতির মধ্য হইতে প্রকৃতিতে উত্থান করিবার শক্তি। বিকৃতি মনুষ্যকে চিরকালের মতো কাবু করিয়া রাখিতে পারে না—বিকৃতি মনুষ্য সমাজে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উন্মূলিত হইবার মধ্যে মনুষ্য-সমাজে কেবল দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি বিকৃতি সকলই উত্তরোত্তর ক্রমে উন্মূলিত হইয়া যায়; পরিস্ফুট হইবার মধ্যে মনুষ্য-সমাজে কেবল জ্ঞান ধর্ম্মই উত্তরোত্তর ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। মনুষ্য যখন বিকৃতির মধ্যে অবস্থিতি করে, তখনও সে ঈশ্বরের বজ্রধ্বনির আহ্বান শুনিতে পায়—তাহা শুনিয়া আর সে স্থির থাকিতে পারে না। এ তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, "সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে কুসুম করে গন্ধদান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে তোমাতেই অনুরাগী—মোহ যদি না ফেলে আঁধারে!" কিন্তু মোহ যদি ফেলে আঁধারে? তখন কি হয়? তখনও অমৃত নিকেতনে ফিরিয়া যাইবার পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায় না। পূর্ব্বকথিত ঐ গীতটির পরেই আসিতেছে "প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার; তেমনি নাথ তোমার কৃপা হে বিশ্বময় প্রচার, অবারিত তোমারি দুয়ার।" সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ঈশ্বরের মহতী শক্তি এবং করুণা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত! অমৃত নিকেতনের দ্বার সর্ব্বত্র অবারিত! মেঘাচ্ছন্ন হইতে কেবল আমাদের চক্ষুই মেঘাচ্ছন্ন হয়—সূর্য্য কখনই মেঘাচ্ছন্ন হয় না। মোহের ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া পরমাত্মার করুণা-রশ্মি অবতীর্ণ হয়—

আর অমনি—মোহাচ্ছন্ন জীবের বিস্মিত নেত্রে আলোকের পথ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত হইয়া যায়। মনুষ্যের বিকৃতি-রাশি ক্ষণস্থায়ী এবং মরণ-শীল—মনুষ্যের অন্তর-তম প্রকৃতি অবিনাশী এবং চির-উন্নতি-শীল। ঈশ্বর যে অভিপ্রায়ে মনুষ্যকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, সে অভিপ্রায় তোমার আমার অভিপ্রায় নহে—যে, তাহা অল্প একটু আঘাতেই ভগ্নোদ্যম হইয়া ধরাশায়ী হইবে! সে অভিপ্রায় কিছুতেই বিফল হইবার নহে; মহোচ্চ পর্ব্বত যদি সেই অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে গ্রীবা উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়; মহাসমুদ্র যদি তাহার প্রতি-পথে পড়ে, তবে তাহা পাতালে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; ঈশ্বরের অভিপ্রায় পর্ব্বত অপেক্ষাও অনন্ত-গুণ ধৈর্য্যশীল এবং বজ্র অপেক্ষাও অনন্ত-গুণ বল-শালী; মনুষ্যের আশা এত যে বলবতী—তাহার কারণই ঐ। ঈশ্বরের অপরাজিত করুণা এবং মহতী শক্তিই ভক্ত হৃদয়ের এক-মাত্র বল—সেই বলেই মনুষ্য সর্ব্বজয়ী। অদ্য আমরা আমাদের পরম পিতার অবারিত দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি—চতুর্দ্দিকে তাঁহার আশীর্ব্বাদের পবিত্র সমীরণ বহমান হইতেছে—আইস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি—আমাদের সমস্ত হৃদয়-মন-প্রাণ তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিই; এবং তাঁহার অমোঘ বলে বলী হইয়া ভয় তাপ দুঃখ দূরে বিসর্জ্জন করি।

হে পরমাত্মন্! মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে তোমার বিমল জ্যোতি আবির্ভূত হউক! সংসার-তাপে উত্তপ্ত হৃদয়ে তোমার প্রেমের উৎস উন্মুক্ত হউক্! তোমার মঙ্গল-দৃষ্টির একটিমাত্র কটাক্ষে প্রলয়ের দিগ্‌দিগন্তের-স্পর্দ্ধী উচ্ছৃঙ্খল কোলাহল প্রশান্ত নিস্তব্ধ হইয়া যায়—ও নূতন সৃষ্টির নবারুণ জ্যোতিতে অনন্ত আকাশের অনন্ত মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠে! সেই তোমার অপরাজিত মঙ্গল-মূর্ত্তি আমাদের অন্তঃকরণে জাগ্রত হইয়া উঠুক্ সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি এই দণ্ডে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে! আমরা রাজাও জানি না—প্রজাও জানি না—আমরা তোমাকেই জানি, তুমি আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশকে—দুর্ভাগ্য সমাজকে—তোমার এই দীন হীন পুত্র কন্যাগণকে দারুণ দুর্গতি হইতে রক্ষা কর! তুমি আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও! "মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাংশ্চ বিধেহি নঃ" তুমি মাতার ন্যায় পুত্রগণকে রক্ষা কর—তুমি আমাদিগকে শ্রী দেও—প্রজ্ঞা দেও! তোমার চরণে আমাদিগকে স্থান দেও—এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মানবীকরণই বটে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু যে প্রকৃতিকে বৃক্ষোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিতেছেন তাহা দ্রব্যগুণ না তদতিরিক্ত কোন পদার্থ?

[প্রকৃতিকে দ্রব্য-গুণ বলিলে প্রকৃতির পক্ষ-চ্ছেদ করিয়া তাহাকে পিঞ্জর-বদ্ধ করা হয়। বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণকেই দ্রব্য-গুণ কহে। সেই সকল বিশেষ-বিশেষ গুণ—বিশেষ-বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি, তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া

প্রকৃতি-শব্দে বিশেষ কোন-একটি বস্তুর বিশেষ কোন-একটি প্রকৃতি বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে তাহাতে প্রকৃতির কিছুই বোঝা হয় না। একজন বঙ্গ-ভাষানভিজ্ঞ বিদেশী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, উদ্ভিদ্ শব্দের অর্থ কি? তাহার উত্তরে আমি যদি তাহাকে এক গাছি তৃণ আনিয়া দেখাই, ও বলি যে, ইহাই উদ্ভিদ্; তবে সে ব্যক্তি উদ্ভিদ্ শব্দের অর্থ তৃণ বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলে তো চলিবে না! তৃণ শুধু কেবল উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত পদবীতেই স্থান পাইতে পারে—তা ভিন্ন, তাহা সমগ্র উদ্ভিদের পদারূঢ় হইতে পারে না। যেখানে সাধারণতঃ সকল জগতের মূল-স্থিত প্রকৃতির কথা হইতেছে—সেখানে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি (যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি) শুদ্ধ কেবল মূল-বিষয়টির দৃষ্টান্ত-স্থলেই কাজে লাগিতে পারে—তা ভিন্ন—তাহা মূল-বিষয়টির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। শ্রী দ্বি]

যদি তাহা দ্রব্যগুণই হয়, তবে তাহা জড়াধার হইতে পৃথক্ হইতে পারে কি না?

[দ্রব্য-গুণ—অর্থাৎ বিশেষ কোন-একটি দ্রব্যের বিশেষ কোন-একটি গুণ—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি, ইত্যাদি; এরূপ দ্রব্যগুণ অবশ্য আধার-বস্তু হইতে পৃথককৃত হইতে পারে না। এখন কথা এই যে, অগ্নির দাহিকা-শক্তি অগ্নিরই প্রকৃতি—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা কিছু আর সর্ব্ব-সাধারণতঃ সকল বস্তুর প্রকৃতি নহে—জলের প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি শুধু কেবল অগ্নির অভ্যন্তরে দাহিকা-শক্তিরূপে নহে—কিন্তু সর্ব্ব জগতের অভ্যন্তরেই নানা-রূপে বিচেষ্টিত হইতেছে। অগ্নির দাহিকা-শক্তি—বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি—এইরূপ যত প্রকার বিশেষ বিশেষ দ্রব্যগুণ আছে, সমস্তই একই প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ পরিণাম। উদ্ভিদ্-প্রকৃতি বলিতে যেমন, তৃণ লতা বৃক্ষ প্রভৃতি সাধারণতঃ সকল উদ্ভিদেরই প্রকৃতি বুঝায়; সেইরূপ চরাচর-প্রকৃতি বলিতে সাধারণত সকল বস্তুরই প্রকৃতি বুঝায়। যে এক সর্ব্ব-সাধারণ প্রকৃতি সকল বস্তুর অভ্যন্তরেই বিচেষ্টিত হইতেছে, আর, বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ দ্রব্য-গুণ যাহার বিশেষ বিশেষ পরিণাম মাত্র—তাহাই মুখ্যরূপে প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য। এক মূল-প্রকৃতি হইতে কেমন করিয়া বহুধা বিচিত্র প্রকৃতি (অথবা যাহা একই কথা—নানা বিধ দ্রব্য-গুণ) কাল ক্রমে পরিস্ফুট হয়, বর্ত্তমান অব্দের নবাবিষ্কৃত ক্রমাভিব্যক্তি-বাদ Evolution Theory তাহার প্রণালী প্রদর্শনে সাধ্যমতে ত্রুটি করিতেছে না।

"প্রকৃতি" এই শব্দটিতেই প্রকৃতির অর্থ দেদীপ্যমান। প্রকৃতি=প্র+কৃতি। কৃতি কি না ক্রিয়া। প্রকৃতি কিনা pro কৃতি—বহিঃপ্রসারিত ক্রিয়া, কার্য্যোৎপাদিকা ক্রিয়া। ক্রিয়ামাত্রই শক্তির অভিব্যক্তি। যে শক্তির কার্য্য-কারিতায় জগতের ঘটনা-সকল সংঘটিত হয়, দ্রব্য-গুণ-সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, তাহাই প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য। কিন্তু জগতের ঘটনা-মাত্রেতেই দুইরূপ শক্তির সমবেত কার্য্য-কারিতা দৃষ্টি-গোচর হয়; (১) করণ শক্তি এবং (২) হওন-শক্তি। দহন-কার্য্যে করণ-শক্তি কি? না দগ্ধ করণের শক্তি—যাহা অগ্নিতে আছে; হওন-শক্তি কি? না দগ্ধ হওনের শক্তি—যাহা কাষ্ঠাদিতে আছে; এ দুয়ের সমবেত কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে দহন-

কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। দগ্ধ করিবার শক্তি অগ্নিতে আছে—কিন্তু দগ্ধ হইবার শক্তি ভস্মেতে নাই—এরূপ স্থলে দহন-কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার, দগ্ধ হইবার শক্তি কাষ্ঠেতে আছে, কিন্তু দহন করিবার শক্তি জলেতে নাই; এরূপ স্থলেও দহন-কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। আর একটি উদাহরণ;—উপযুক্ত জল বায়ু মৃত্তিকাকে বৃক্ষে পরিণত করিবার শক্তি বীজেতে আছে—এবং বৃক্ষরূপে পরিণত হইবার শক্তি জল-বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতি সামগ্রী সকলেতে আছে; দুয়ের সমবেত কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে বৃক্ষোৎপত্তি সম্ভবে না। মরু ভূমিতে খুব সারবান্ বীজ নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না; আর খুব উর্ব্বরা ভূমিতে দগ্ধবীজ নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দহন-কার্য্যের সংসাধক শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) দগ্ধ করিবার শক্তি এবং (২) দগ্ধ হইবার শক্তি; আর সে দুই শক্তি দুই বিভিন্ন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিতেছে—দাহিকা-শক্তির আধার-বস্তু—অগ্নি, দাহ্যতা-গুণের আধার-বস্তু—কাষ্ঠ। অতএব, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দহন-কার্য্যের এক-মাত্র কারণ কি? তবে তুমি বলিতে পার না যে, অগ্নিই দহন-কার্য্যের একমাত্র কারণ; কেননা, দহন-কার্য্যের জন্য অগ্নি যেমন আবশ্যক—দাহ্য বস্তুও তেমনি আবশ্যক; সুতরাং অগ্নি তাহার একমাত্র কারণ নহে। এখন বক্তব্য এই যে, কোনও দ্রব্য-গুণই কোন কার্য্যের একমাত্র কারণ হইতে পারে না;—বিষের একটি দ্রব্য-গুণ এই যে, তাহা প্রাণ সংহার করে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিষ প্রাণ-সংহারের একমাত্র কারণ হইতে পারে না—শরীর-বিশেষে বিষও অমৃতের কার্য্য করে; "বিষস্য বিষমৌষধং।" তবেই হইতেছে যে, শারীরিক প্রকৃতির সহায়তা-ব্যতিরেকে কেবল-মাত্র বিষ প্রাণ-সংহার-কার্য্যে সমর্থ নহে। অতএব প্রকৃতিকে যদি জগতের সমস্ত কার্য্যের এক মাত্র কারণ বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় যে, কোনও দ্রব্য-গুণই প্রকৃতি শব্দের বাচ্য নহে; কেননা, কোনও দ্রব্য-গুণই কোনও কার্য্যের একমাত্র কারণ নহে। এরূপ সত্ত্বেও, সকলেই এ কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, একমাত্র প্রকৃতি জগতের সকল ঘটনার অভ্যন্তরেই কার্য্য করিতেছে—সুতরাং দহন-কার্য্যের অভ্যন্তরেও তাহা কার্য্য করিতেছে। দহন-কার্য্যের একমাত্র সংসাধক শক্তি যদি কিছু থাকে, তবে তাহা প্রকৃতি। দহন-কার্য্যের একমাত্র সংসাধক শক্তি আছে কি না—সে কথা পরে হইবে; এখন শুধু "যদি থাকে" তবে তাহা অগ্নির দাহিকা-শক্তিও নহে—কাষ্ঠের দাহ্যতা-গুণও নহে—কিন্তু তৃতীয় আর-একটা কিছু, এই বিষয়টি ইঙ্গিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। দহন-কার্য্যের মধ্যে দ্রব্য-গুণ যত কিছু আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই বিশেষ কোন-না-কোন একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে; দহন করিবার শক্তি অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে—দগ্ধ হইবার শক্তি কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে; আর, ঐ যে-সমস্ত শক্তি বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতেছে—তাহাদের কোনটিই দহন-কার্য্যের একমাত্র নিঃসঙ্গ কারণ নহে—তাহা অন্যান্য দ্রব্য-গুণের সঙ্গ-সাপেক্ষ; অগ্নির দাহিকা-শক্তি কাষ্ঠের দাহ্যতা-গুণের সঙ্গ-সাপেক্ষ। কাজেই বলিতে হয়,

যে, যে কোন গুণ বিশেষ-কোন-একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে—তাহা কোনও কার্য্যেরই একমাত্র নিঃসঙ্গ কারণ নহে,—তাই উপরি-উক্ত সংজ্ঞা-অনুসারে তাহা প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য নহে; কেননা, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কার্য্য-সকলের একমাত্র গোড়ার কারণই প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। অতএব স্থির হইল যে, জগৎকার্য্যের একমাত্র মূল-ক্রিয়া যদি কিছু থাকে, আর, তাহার যদি নাম দেওয়া যায়—প্রকৃতি,তবে আপনা-হইতেই প্রতি-পন্ন হয় যে, তাহা বিশেষ কোন-একটি দ্রব্যের দ্রব্য-গুণ নহে—সুতরাং তাহা বিশেষ কোন-একটি দ্রব্যকে আশ্রয় ক-রিয়া বর্ত্তমান নাই; তবে কি? না যে খানে যত দ্রব্য-গুণ আছে—সমস্তেরই তাহা মূলীভূত শক্তি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—দ্রব্য-গুণ বলিতে সচরাচর যে অর্থ বুঝায়, প্রভাত বাবু সেই অর্থেই "দ্রব্য-গুণ" এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, আমরাও এখানে তাহাই করিলাম; সেই অর্থেই আমরা বলি যে, প্রকৃতি বিশেষ কোন একটি দ্রব্যকে (অর্থাৎ কোন জড় পদার্থকে) আশ্রয় ক-রিয়া বর্ত্তমান নাই--কিন্তু পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমাদের মতে জগতের মূল-শক্তি (প্রকৃতি) একেবারেই নিরাশ্রয়—কেননা আমরা বলি যে, ঐশী-শক্তিই প্রকৃতি; কাজেই ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহা থাকিতে পারে না; তা শুধু নয়—ঈশ্বরকেই আমরা মূল-কারণ বলি, আর, প্রকৃতিকে আমরা সাক্ষাৎ কারণ বলি। আমরা বলি যে, জগতের মূল আত্মা যিনি পরমাত্মা, তিনিই জগতের মূল কারণ; আর, জগতের মূল-শক্তি যে প্রকৃতি (যাহা ঈশ্বরেরই ঐশী-শক্তি) তা-হাই জগতের সাক্ষাৎ কারণ। কেন আমরা এরূপ বলি—তাহা পরে দেখা যাইবে। জগৎ-কার্য্যের একমাত্র মূল-শক্তি যদি থাকে, তবে তাহা দ্রব্য-গুণ নহে—উপরে এইটিই কেবল প্রমাণ করা হইল; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা যদি দ্রব্য-গুণ না হয় তবে তাহা কি? আর তাহা যে আছে তাহারই বা প্রমাণ কি? শ্রী দ্বি]

প্রকৃতি যদি জড়াধার হইতে পৃথক্ হইতে পারে, তবে দ্বিজেন্দ্র বাবু এই তত্ত্ব জগতের কোনো ঘটনা হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন? না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলি-য়াই প্রকাশ করিতেছেন? আর যদি প্রকৃতি দ্রব্যগুণের অতিরিক্ত কিছু হয়, তবে তাহার পরিচায়ক লক্ষণ কি?

[আমরা ইতি পূর্ব্বে প্রমাণ করিলাম যে, প্রকৃতি (অর্থাৎ জগতের একমাত্র মূল-শক্তি) যদি থাকে, তবে তাহা দ্রব্য-গুণ নহে--সুতরাং তাহা জড়াধারকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে না; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, (১) সেরূপ শক্তি যে, আছে তা-হার প্রমাণ কি? (২) আর, তাহার পরি-চায়ক লক্ষণই বা কি?

প্রথম প্রশ্ন এই যে, প্রকৃতি যে আছে তাহার প্রমাণ কি? প্রভাত বাবু তাই বলিতেছেন যে, "দ্বিজেন্দ্র বাবু এই তত্ত্ব জগতের কোনো ঘটনা হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন? না তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলি-য়াই প্রকাশ করিতেছেন?" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের মূল-তত্ত্ব মাত্রই স্বতঃসিদ্ধ; যেমন, ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু যখন মূল-তত্ত্ব হইতে নীচে নাবিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এই বিশেষ ঘটনাটির বিশেষ কারণ কিরূপ? আর তাহার উত্তরে যখন

আমরা বলি যে, "এই বিশেষ ঘটনাটির বিশেষ কারণ এইএই," তখন পরীক্ষাই তাহার প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ভৌতিক অভিব্যক্তি সকলের (phenomena) মূলান্বেষণ করিতে গেলে, "অনেকের" মধ্য হইতে মূল-স্থিত "এক" উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; তাহার সাক্ষী—লা প্লাসের আভ্রিক সিদ্ধান্ত (Nebular theory) অনুসারে, সৌর জগৎ এক মাত্র অভ্রাকার পদার্থ ছিল; বর্ত্তমান আণবিক সিদ্ধান্ত (molecular theory) অনুসারে, উত্তাপ আলোক প্রভৃতি অভিব্যক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নহে কিন্তু একই আণবিক গতির ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম। কিন্তু আর-এক দিকে দেখা যায় যে, সমস্ত জগৎ যে একই জগৎ—ও জগতের বিভিন্ন অভিব্যক্তি যে, একই মূল-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম, এ কথাটির গোড়া'র বনিয়াদ—স্বতঃসিদ্ধ সত্য; তাহা এইরূপ;—জগতের বস্তুসকল যতই বহুধা বিচিত্র হউক্ না কেন, কিন্তু প্রকাশ পাইবার সময় তাহা একই জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ পায়; জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতা সমস্ত বস্তুরই সাধারণ ধর্ম্ম, আর, সেই একের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতাই জগতের মৌলিক একত্বের পরিচায়ক। প্রভাত বাবু হয় তো আমাদের কথার অর্থ না বুঝিয়া বলিবেন যে, দূরবীক্ষণের অগম্য এমন অনেক অনেক নক্ষত্র থাকিতে পারে—যাহা আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশ, আর, কখনও যে তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই—তবে আর এ কথা কোথায় রহিল যে, জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্যতা সমস্ত জগতের সাধারণ ধর্ম্ম? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, "জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্যতা" স্বতন্ত্র, আর, জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া স্বতন্ত্র; এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য—অথচ জ্ঞানে প্রকাশ পায় নাই। অনেকানেক নক্ষত্র পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিল—বিশিষ্টরূপ তেজালো দূরবীনের সাহায্যে তাহা অধুনাতন কালে প্রকাশিত হইয়াছে,—এমত স্থলে আমরা বলিতে পারি না যে পূর্ব্বে তাহা প্রকাশ-যোগ্য ছিল না; এই পর্য্যন্তই কেবল বলিতে পারি যে, পূর্ব্বে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কাহাকে আমরা বলি প্রকাশ-যোগ্য, আর কাহাকেই বা আমরা বলি প্রকাশের অযোগ্য, নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই;—গোল-চতুষ্কোণ শুধু যে কেবল জ্ঞানে প্রকাশিত হয় না তাহা নহে—মূলেই তাহা জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য নহে; তেমনি, কারণ-শূন্য ঘটনা, সীমাবদ্ধ মহাকাশ, দুই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, একই প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ার অনুভব-কর্ত্তা এবং স্মরণকর্ত্তা দুই বিভিন্ন ব্যক্তি; এই সকল বিষয় জ্ঞানে তো প্রকাশ পায়ই না—তা ছাড়া, ও-সকল বিষয় মূলেই জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য নহে। কেননা, ও-সকল বিষয় জ্ঞানের মূল-নিয়মের বিরোধী। পক্ষান্তরে, অগাধ সমুদ্র-গর্ভে হয় তো এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা আজ-পর্য্যন্ত কোনও মনুষ্যেরই জ্ঞানে প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু তাহা জ্ঞানের মূল-নিয়মের বিরোধী নহে—এই জন্য আমরা বলি যে, তাহা জ্ঞানে প্রকাশ পা'ক্ বা না পা'ক্—তাহা জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য তাহাতে আর ভুল নাই; তাহা গোল-চতুষ্কোণের ন্যায় প্রকাশের অযোগ্য নহে। জ্ঞানের একই মূল নিয়ম সমস্ত জগতেই খাটে—ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত জগৎ একই জগৎ। "ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে",

এই তত্ত্বটি যদি কেবল পৃথিবীতেই খাটিত—সূর্য্য-লোকে না খাটিত—তবেই বলিতে পারিতাম যে, পৃথিবী যে জগতের অন্তর্গত—সূর্য্য-লোক সে জগতের অন্তর্গত নহে; কিন্তু জ্ঞানের ঐ মূল নিয়মটি যখন সর্ব্ব জগতেই সমান বলবৎ—তখন সমস্ত জগৎ যে একই জগৎ একই মূল-শক্তির বিস্তীর্ণ ক্রীড়া-ক্ষেত্র, ও একই মূল-নিয়মের অধীন, তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব দুইটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব জগতের একত্বের প্রতিপাদক; সে দুইটি তত্ত্ব এই যে, (১) জ্ঞানের মূলস্থিত একত্ব; এবং (২) সেই একত্ব-সূত্রে সমস্ত জগতের বন্ধন-যোগ্যতা। যখনই নানাবিধ বিচিত্র গুণ আমাদের জ্ঞানের একত্ব-সূত্রে গ্রথিত হয়, তখনই আমরা সেই সকল গুণের মূলস্থিত বস্তুর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি; যখনই প্রভাত বাবুর প্রস্তাবটির আদ্যোপান্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার জ্ঞানের একত্ব-সূত্রে গ্রথিত হয়, তখনই আমার মনে এই বিশ্বাসটি উৎপন্ন হয় যে, সে ঐক্য-সূত্রটি প্রভাত বাবুর মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ছিল। অতএব জ্ঞানের মূল-গত একত্বই জগতের একত্বের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। জগতের একত্ব স্বীকার করিলেই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে, সমস্ত জগৎ একই মূল-শক্তির অভিব্যক্তি। কেননা এরূপ যদি হয় যে, পৃথিবীর পরিবর্ত্তন-ঘটনা এক মূল-শক্তির অভিব্যক্তি ও চন্দ্র-লোকের পরিবর্ত্তন-ঘটনা আর-এক মূল-শক্তির অভিব্যক্তি, তাহা হইলে দাঁড়ায় যে, পৃথিবী এক জগতের বস্তু—চন্দ্রলোক আর-এক জগতের বস্তু। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের মূল-গত একত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব—আর, এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বটিই জগতের একত্বের মুখ্য প্রমাণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ; এক্ষণে দেখাইলাম যে, জ্ঞানের একত্বই জগতের একত্বের প্রমাণ; আর জগতের একত্ব হইতেই এইটি প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত জগতের ঘটনা একই মূল-শক্তির অভিব্যক্তি। এই গেল, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-মূলক প্রমাণ; তা ছাড়া—প্রকৃতির অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কিরূপ—অতঃপর তাহাই দেখা যাইতেছে।

"প্রকৃতি বৃক্ষোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ" এই যে একটি কথা, ইহার বৈজ্ঞানিক অর্থ কি—দেখা যা'ক্। ইহার বৈজ্ঞানিক অর্থ এই যে, যে এক মূল-শক্তি সাধারণতঃ সকল জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করে—তাহা প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই কার্য্য করে; যথা;—ইহা যদি সত্য হয় যে, ভারাকর্ষণ সমস্ত ভৌতিক জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করে, তবে ইহা অকাট্য যে, তাল-ফল যখন বৃক্ষ-চ্যুত হইয়া ভূপতিত হয়, তখন সে ঘটনাটির সাক্ষাৎ কারণ ভারাকর্ষণ; যদি জিজ্ঞাসা কর যে, সকল ভৌতিক বস্তুই যে, ঐরূপ আকর্ষণের অধীন তাহার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর অতীব সংক্ষেপে এই যে, পরীক্ষা। ভূতল-স্থিত যে সে বস্তু—এবং আকাশ-স্থিত গ্রহ চন্দ্র—তাবতেরই ভৌতিক স্থিতি-গতি শুদ্ধ কেবল এক আকর্ষণ দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতে পারে। যে প্রকার স্থিতি গতি আকর্ষণ-দ্বারা প্রতিপাদন-সাধ্য, সেই প্রকার স্থিতি গতি সর্ব্বত্রই পরীক্ষাতে পাওয়া যায়—ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারাকর্ষণ সকল ভৌতিক জগতেরই সাধারণ কার্য্য-প্রবর্ত্তক; তাহা যখন হইল, তখন কাজেই মানিতে হয় যে, তাল-ফল যখন বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূপতিত হয়, তখন তাহার সাক্ষাৎ

কারণ ভারাকর্ষণ। অতএব তাল-ফলের ভূপতন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, যে শক্তি দ্বারা সাধারণতঃ সমস্ত ভৌতিক জগতের স্থিতি-গতি নির্ব্বাহিত হয়, সেই শক্তি দ্বারাই তাল-ফল ভূপতিত হয়। এইরূপ, এক অদ্বিতীয় মূল শক্তি যাহা সাধারণতঃ সকল জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করে--এবং কাজে কাজেই প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে কার্য্য করে, বিজ্ঞানের পদবী অনুসরণ করিয়া তাহাকেই আমরা বলি—ভৌতিক জগতের প্রকৃতি। আমরা তাই বলি যে, আকর্ষণ বিকর্ষণ অথবা তাহারই প্রকারান্তর কেন্দ্রানুগ (centripetal) এবং কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) বিচেষ্টা—ইহাই প্রাণ-শূন্য ভৌতিক জগতের প্রকৃতি; এবং প্রাণ-শূন্য ভৌতিক রাজ্যে যেখানে যে-কোন প্রকার স্থিতি-গতি সংঘটিত হয়—তাবতেরই তাহা সাক্ষাৎ কারণ। এই গেল ভৌতিক প্রকৃতি তাহার পরে আসিতেছে জৈবিক প্রকৃতি। ভৌতিক প্রকৃতি, জৈবিক প্রকৃতি, মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদি প্রকার নানাবিধ প্রকৃতির মূলে যে এক অদ্বিতীয় প্রকৃতি কার্য্যে বিচেষ্টিত হইতেছে—তাহাই সর্ব্ব-জগতের প্রকৃতি—তাহা সকলের শেষে আসিবে; আপাতত জৈবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহাই অতঃপর দেখা যাইবে। শ্রীদ্বি]

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

জ্ঞান-সঞ্চার।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ পূর্ণ হইতে আঠারো হাজার দিন লাগিয়াছে। এই আঠার হাজার দিনে পৃথিবীর অনেক জিনিশ চেনা হইয়াছে, এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ফল, আজ্ পর্য্যন্ত যে-কিছু জ্ঞান উপার্জন করিয়াছি, পার্থিব পদার্থ চিনিয়াছি (পদার্থ-বোধ ও জ্ঞান-উপার্জন সমান কথা) সে সকল, ক্রমপরিবর্ত্তিত আঠার হাজার দিনেই চিনিয়াছি, এক দিনে চিনি নাই। কিন্তু কোন্ দিন কি চিনিয়াছি—কোন্ দিন কোন্ জ্ঞান অর্জন করিয়াছি–তাহা স্মরণ হয় না। অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই ঈশ্বরবিষয়ক পরোক্ষ-জ্ঞান * উপার্জনের দিনটী মনে পড়িল না। কোন্ বৎসরের কোন্ দিনে কি উপলক্ষ্যে যে আমার অন্তরে "ঈশ্বরোঽস্তি" জ্ঞান উদিত হইয়াছিল তাহা এখন মনে করিতে অসমর্থ। এখন এই মাত্র মনে হয়, তিন চার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এ সমস্তই অপরিচিত ছিল, তৎপরে অল্পে অল্পে এক একটী করিয়া অসংখ্য লৌকিক অলৌকিক জ্ঞান উপার্জন করিয়াছি। তিন চার বৎসরের পূর্ব্বে কিরূপ ছিলাম, যদিও তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না, তথাপি, অন্যের পূর্ব্বাবস্থা দেখিয়া তাহার কতকটা তুলনার দ্বারা স্থির করিতে পারি। প্রতিদিনই দেখিতে পাই, মানব প্রথমে স্পন্দায়মান মাংস খণ্ডপ্রায় হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে এ জিনিশ ও জিনিশ সে জিনিশ--ক্রমে পৃথিবীর অসংখ্য জিনিশ চিনিয়া থাকে। এই ব্যাপার কি কৌশলে বা কি প্রণালীতে সাধিত হইতেছে—সম্পন্ন হইতেছে—তাহা ভাবিতে গেলে চিত্ত বিকল ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়। যে মানব এক দিন ঘোর অজ্ঞান

---

* পরোক্ষ জ্ঞান "আছে" এতদ্রূপ জ্ঞান। যাহা দেখা যায় না অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গোচরে আইসে না, অথচ "আছে" বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান। এই জ্ঞান বিশ্বাসাত্মক।

ছিল, কেবল স্পন্দায়মান মাংসখণ্ডমাত্র ছিল, সেই মানব আজ জ্ঞান-ক্রিয়া-পূর্ণ হইয়া পৃথিবী উত্তোলনের উদ্যম করিতেছে, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। এই ব্যাপার চিন্তা করিয়া একজন জ্ঞানী এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যৎগর্ভবাসস্থিতং
রেতশ্চেতি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূত নানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েন শিশুত্ব যৌবন জরা রোগৈরনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি।"*

ইহা অপেক্ষা ইন্দ্রজাল অর্থাৎ অদ্ভুত ভোজবাজী কি আছে যে, গর্ভবাসস্থিত এক বিন্দু রেতঃ সচেতন হয়, তাহা আবার হাত পা মাথা প্রভৃতি বহু অঙ্গ বিশিষ্ট হয়, তাহাতে বাল্য যৌবন জরা পর্য্যায় ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয় ও সেই পদার্থই আবার দেখে, শুনে, খায়, পরে, যায় ও আইসে!

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে শিশু ভূমিষ্ঠ দিবসেই গার্ভিক অজ্ঞানের সংস্রব ত্যাগ করিয়া পার্থিব-জ্ঞানের সংস্রবে প্রবিষ্ট হয়। হাস্য, রোদন, তুষ্ণীম্ভাব, অস্ফুট অভিপ্রায়মূলক অঙ্গচালন, এই সমুদয় তাহার সূচক বা অনুমাপক। শিশু গর্ত্তচ্যুত হইল, যন্ত্রণা অনুভব করিল, অমনি রোদন করিল। চক্ষুঃ প্রসারিত করিল, দুই একটী দৃশ্য দেখিল, তাহার অপূর্ণ নেত্রমণিতে তাহা অস্পষ্টভাবে বিম্বিত হইল, তাহা তাহার হৃদয়ে ভবিষ্যদ্ জ্ঞানের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম বীজ বপন করিল। ঐ প্রকারে যে দিন যে দৃশ্য তাহাদের চক্ষুর্গোচর হয়, যে শব্দ কর্ণ প্রবিষ্ট হয়, যে স্পর্শ ত্বক্‌প্রাপ্ত হয়, যে রস রসনাগত হয়, যে গন্ধ নাসিকাগামী হয়, সেই দিনেই তাহাদের জ্ঞানাধারে সেই সকল বিষয়ের ভবিষ্যৎজ্ঞানের সূক্ষ্ম বীজ আহিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই সে জ্ঞানের অনুব্যবসায় হয় না। শিশুদিগের অনুব্যবসায়শূন্য সূক্ষ্ম অপরিচিত তাদৃশ জ্ঞানের শাস্ত্রীয় নাম সম্মুগ্ধ জ্ঞান ও নির্ব্বিকল্প জ্ঞান।*

শিশুদিগের জ্ঞানকে অনুব্যবসায়শূন্য অপরিচিতপ্রায় সম্মুগ্ধ ও নির্ব্বিকল্প বলিবার কারণ এই যে, সে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষণ অর্থাৎ পরিমাণ, সংস্থান (অবয়ব সন্নিবেশ বিশেষ সাজান,) ও আকার প্রকার প্রভৃতি কিছুই প্রকাশ পায় না, সামান্য বস্তুমাত্র অঙ্কিত হয়। এক দিন একটা নির্ব্বোধ চাকর চিনাবাজার হইতে তাহার নিজের ফটোগ্রাপ্ ছবি আনিয়াছিল। আমি দেখিলাম, তাহা একটী সামান্য আকার মাত্র, তাহাতে তাহার মূর্ত্তির বিশেষণ (চিনিবার যোগ্য আকার প্রকার) আদৌ নাই। সেই ফটো দেখিয়া তাহাকে চেনা দূরে থাকুক, মনুষ্যের ছবি বলিয়াও মনে হইল না। তাহা দেখিয়া মনে হইল, এই খারাপ ফটোগ্রাফ খানি শিশুদিগের সম্মুগ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

শিশু যে-প্রকারে জ্ঞান উপার্জ্জন আরম্ভ করে সেপ্রকারটী যদিও ঠিক্ বুঝা না যাউক, অর্থাৎ অস্মদাদির প্রত্যক্ষ না হউক, তথাপি, অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলেই তাহা অনুমানারূঢ় হইতে পারে। ইহা বেশ বুঝা যায়—স্পষ্টই দেখা যায়—বৃদ্ধব্যবহার ও হৃদয়শায়ী পুরুষের সুখ দুঃখের সংস্রব, এই দুই উপলক্ষ্যেই মানব শিশু একে একে পৃথিবীর সমস্ত

* বিদ্যারণ্য স্বামী।

* অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্।
বালমূকাদিবজ্‌জ্ঞানং সম্মুগ্ধং শুদ্ধবস্তুজম্॥

জিনিশ চিনিয়া লয়। যাহারা শিশুর বড়, তাহারা শিশুর বৃদ্ধ। শিশু সেই বৃদ্ধদিগের বিবিধ ব্যবহার (কায কর্ম্ম খেলা ও আহার বিহার সংক্রান্ত) দেখিতে দেখিতে ও তাহাদের উচ্চারিত বস্তুবোধক কথা শুনিতে শুনিতে নাম, গুণ ও ক্রিয়া সম্বলিত সেই সেই বস্তু তাহাদের জ্ঞানাধারে অঙ্কিত হইতে থাকে। সেই অঙ্কন বা প্রতিবিম্বনকে আমরা "জ্ঞান" সংজ্ঞা দিয়াছি, বস্তুপরিচয় সংজ্ঞাও দিয়াছি।*

বৃদ্ধব্যবহার ও সুখদুঃখের সংস্রব, এই উপলক্ষ্যদ্বয়ের ফলপ্রসবতা শক্তি একরূপ নহে। বৃদ্ধব্যবহার অধিকাংশ স্থলেই জিনিশের নাম মাত্র চেনাইয়া দেয়, দিয়া চরিতার্থ হয়। পরে সুখ দুঃখের সংস্রব সে সকলের দোষ, গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ও জাতি প্রভৃতি বুঝাইতে থাকে। অতএব, বাহ্যবস্তুর সহিত হৃদয়শায়ী আত্মার যে সুখদুঃখসম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ হইতেই মানুষ অধিকাংশ স্থলে দ্রব্যশক্তির পরিচয় লাভ করে ও বৃদ্ধব্যবহারের ভূয়োদর্শন হইতে সে সকলের নাম শিক্ষা করে। ব্যবহারের (বাগ্‌ব্যবহার ও কার্য্যব্যবহারের) ভূয়োদর্শন শিশুকে যে-প্রক্রিয়ায় যে প্রণালীতে পার্থিব পদার্থের নাম শিক্ষা দেয়—সে প্রক্রিয়া বা সে প্রণালী সম্ভবতঃ এইরূপ—

শিশুর অনতি দূরে শিশুর ভাই ভগিনীরা খেলা করিতেছে। তাহাদের এক জন এক জনকে বলিল, ভাই! পুতুল আন। সে পুতুল আনিল। "পুতুল আন" কথাটা শিশুর কর্ণপ্রবিষ্ট হইল এবং "পুতুল আনা" কার্য্যটীও তাহার প্রত্যক্ষ হইল। এখনও সে পুতুল চেনে নাই, আনা কাহাকে বলে তাহাও জানে নাই। পর দিন আবার সেই ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে বা অপর ব্যক্তিকে বলিল, কাপড় আন। সে কাপড় আনিল। এবারও শিশু "কাপড় আন" কথা শুনিতে পাইল, এবং যাহা দেখিল তাহা পূর্ব্বের মত নহে। তাহার আকার আর এক প্রকার। এবার তাহার হৃদয়শায়ী পুরুষ অভ্যুত্থিত হইয়া তাহাকে এই বুঝাইয়া দিল যে, পূর্ব্বের জিনিশটা পুতুল ও আজকার জিনিশটা কাপড়। শিশু প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় পুতুল ও কাপড় চিনিল সত্য; কিন্তু আনা কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারিল না। যখন সে শোনে—"পুতুল রাখিয়া আইস, কাপড় রাখিয়া আইস," এবং যখন সে পুতুলকে ও কাপড়কে স্থানান্তরিত করিতে দেখে, তখন সে "আনা" ও "রাখা" উভয়ই বুঝিতে পারে। অমুক প্রকারের নাম আনা ও অমুক প্রকারের নাম রাখা। নিত্য ঐরূপ ঐরূপ ব্যবহার দর্শন ও ব্যবহার্য্যের সাঙ্কেতিক নামের আবাপ উদ্বাপ † শ্রবণ করিতে করিতে ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে শিশুদিগের হৃদয়ে সেই সেই জিনিশের ও সেই সেই ক্রিয়ার নাম-জ্ঞান সঞ্চিত হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহারা সুখ দুঃখের সংস্রবে অর্থাৎ ভোগের দ্বারাও অনেক সময়ে অনেক পদার্থের পরিচয় পায়।

* লক্ নামক ইংলণ্ডীয় দার্শনিকের এইরূপ মত ছিল—কিন্তু তাহার পরে কাণ্ট্ এ মত খণ্ডন করিয়া এইরূপ দেখাইয়াছে; যে, বাহিরের উপকরণ এবং ভিতরের প্রকরণ, দুয়ের যোগে বস্তু সকল জ্ঞানে আরূঢ় হয়—নিছক কেবল বাহিরের প্রতিবিম্ব জ্ঞানপদবীতে আরূঢ় হইতে পারে না।

সম্পাদক।

† আবাপ=নিক্ষেপ। উদ্বাপ=প্রক্ষেপ। উভয়ের দলিতার্থ পরিবর্ত্তন। পুতুল আনার পর কাপড় আন বলায় পুতুল শব্দের নিক্ষেপ ও কাপড় শব্দের প্রক্ষেপ হইয়াছে অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

যথা—শিশু যদৃচ্ছাক্রমে দীপশিখায় হাত দিল—তাহার হস্তে তাপ লাগিল—তাহাতে তাহার দুঃখ হইল—শিশু জানিল, আগুণ হাত পোড়ায়। আগুণের অন্য-সন্নিবেশের নাম দীপ, ইহা সে বৃদ্ধদিগের নিকট পূর্ব্বে শিখিয়াছিল।

সুখদুঃখের সংস্রব ও বৃদ্ধ ব্যবহারের ভূয়োদর্শন এ উভয় অধিকস্থলেই বিদ্যমান পদার্থের শিক্ষক। কেন-না, অতীত ও অনাগত বস্তুর জ্ঞান দেখিয়া ও ভোগ করিয়া আহরণ করা যায় না। সে সকল জ্ঞান কার্য্যকারণসম্বন্ধমূলক এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধজ্ঞান অনেক স্থানেই উপদেশ সাপেক্ষ। বৃদ্ধ ব্যবহারের যে অঙ্গের নাম উপদেশ—সেই অঙ্গ হৃদয়শায়ী পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ অনুমান শক্তি ও বিশ্বাসের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যবিষয়ক জ্ঞানের উদ্বোধন করে। আমরা পরিণত বয়স্ক যুবার কথা বলিতেছি না, শিশুর কথাই বলিতেছি। তুমি যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে, তখন তোমাকে-কে কি শিখাইয়াছিল, তাহাই বলিতেছি। যখন তুমি কতক দেখিয়া, কতক শুনিয়া কতক নিজের অনুমান-শক্তি ও বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর জিনিশ চিনিতে ছিলে তখনকার কথাই বলিতেছি। যদিও তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও অন্তঃকরণ তোমাকে অনেক বিষয় দেখাইয়াছে, তথাপি মানিতে হইবেক, স্বীকার করিতে হইবেক যে, তোমার কাণ তোমাকে বিশেষ করিয়া অনেক বিষয় শিখাইয়াছে। যে সকল বিষয় অতীত, ভবিষ্যৎ ও অলৌকিক, তোমার জ্ঞানী গুরু তোমাকে না বুঝাইয়া দিলে তুমি সে সকল বুঝিতে না—আজ্ জ্ঞানী বলিয়া অভিমান ও খ্যাতিলাভ করিতে পারিতে না। মনে কর, শিশু মিষ্টান্ন খাইল—খাইতে ভাল লাগিল—সে-সুখ তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল—সে তাহা আবার খাইল। কিছু দিন পরে তাহার পীড়া হইল। এই পীড়ার সহিত শিশুর সেই মিষ্টান্ন ভোজনের যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাহা শিশু তখন জানিতে পারিল না। যখন তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল তখন জানিতে পারিল। বুঝাইয়া দিলে পারে, নচেৎ পারে না, এইরূপ স্থলই অধিক। যতক্ষণ না বুঝাইয়া দেওয়া যায় শিশু ততক্ষণ জানিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, এই নিদর্শনের দ্বারা স্থির হয়, বৃদ্ধব্যবহারের ভূয়োদর্শন ও সুখদুঃখভোগ, এতদুভয় জ্ঞানসঞ্চারের মূল হইলেও তাহাতে উপদেশের বিশেষ সহায়তা আছে। ফল, অনেক সময়ে ও অনেক স্থলে কেবল মাত্র উপদেশের দ্বারা জ্ঞানবিশেষের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। শিশু যে বুঝাইয়া দিলে বুঝে, অদৃশ্য বা অবিদ্যমান বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, তাহার অন্যতর কারণ তাহার বিশ্বাস। সুখ দুঃখের সংস্রব ও ব্যবহারের ভূয়োদর্শন, এ দুএর কোনটীই তাহার কারণ নহে। সুখ দুঃখের ভোগ ও হৃদয়শায়ী পুরুষের অভ্যুত্থান বা স্বভাবসিদ্ধ অনুমান শক্তি (সম্বন্ধ-জ্ঞান), এ দুএর দ্বারাও কোন কোন ভবিষ্যৎ জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। শিশুর ক্ষুদ্বোধ হইল,—জননী তাহাকে স্তন্যপান করাইলেন,—তাহাতে তাহার ক্ষুদ্বাধা নিবারিত হইল। পরদিন আবার ক্ষুদ্বোধ হইল—শিশু স্তন্য পাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। কেমন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে সে জানিয়াছে, স্তন্য পানে আমার ক্ষুদ্ যন্ত্রণা নিবারিত হইবে। ইহাতেও স্থির হয়, যে, ব্যবহারের ভূয়োদর্শন ও সুখ দুঃখের সংস্রব, এই দুই মূল বিভাগের অ-

বাস্তব বিভাগ উপদেশশ্রবণ, হৃদয়শায়ী আত্মার স্বতঃসিদ্ধ অনুমানশক্তি ও তাহার স্বতঃসিদ্ধ সরল বিশ্বাস। এই চারি প্রকার বিভাগই মনুষ্যকে প্রসূতাবস্থা হইতে মরণাবস্থার পূর্ব্বপর্য্যন্ত নিত্য নূতন জ্ঞান শিক্ষা করায়।

উপদেশও জ্ঞান সঞ্চারের কারণ, এতৎ প্রসঙ্গে একটী সাময়িক ব্যবস্থা ও আন্দোলন মনে আসিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে আজকাল নব্যদলের মধ্যে এইরূপ আন্দোলন শুনিতে পাওয়া যায় যে, ছেলেকে বিধি-নিষেধের দ্বারা অর্থাৎ উপদেশ দান দ্বারা কিছু না শিখাইয়া ছেলে যাহাতে ঠেকিয়া শেখে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ছেলেকে যদি পরকীয় ভাষা শিখাইতে চাও—তবে ছেলেকে তদ্ভাষাজ্ঞ লোকের সহবাস করাও—ছেলের জন্য তদ্দেশীয় চাকর চাকরাণী রাখ—ছেলে তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে ও তাহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে তাহাদের ভাষা শিখিয়া লইবে। কোন দ্রব্যের গুণ, ধর্ম্ম ও ব্যবহারাদি শিখাইতে হইলে কেবল কথায় বলিয়া দিলে হইবে না, সেই সেই দ্রব্য তাহাদিগকে আনিয়া দিতে হইবে। সে ব্যবহারে আনিয়া সে সকলের গুণাদি বুঝিয়া লইবে। ইহাই ভাষা ও বাহ্যপদার্থ শিক্ষার অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। নব্যেরা এইরূপে ঠেকিয়া শেখাকে বলবৎ ও উপদেশকে দুর্ব্বল করিতে ইচ্ছুক। স্বীকার করি, ব্যবহারের ভূয়োদর্শনে ও ঠেকিয়া শেখায় জ্ঞান বদ্ধমূল হয় সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া উপদেশের মহিমা অস্বীকার করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপদেশ বৃদ্ধব্যবহারেরই অপর অঙ্গ। অপিচ, ঠেকে শেখা এ কথার অর্থ কি? তাৎপর্য্য কি? ভোগ দ্বারা শিক্ষা করারই অন্য নাম ঠেকে শেখা। যদি পৃথিবীর সমুদায় ব্যাপারে সেই মুহূর্ত্তেই সুখদুঃখভোগ হইত তাহা হইলে অবশ্যই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সুখদুঃখ সংস্রবকেই জ্ঞানশিক্ষার ভিত্তি বলিতে পারিতে। কিন্তু পৃথিবীর অধিক ব্যাপারই অতিক্রান্ত কালে সুখ দুঃখ জন্মায়। অর্থাৎ অনেক স্থলেই সুখ দুঃখ কাল-ব্যবধানে সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহা কাল-ব্যবধানে ঘটে, তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ বিনা উপদেশে জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। সেই কারণে অনেক বিষয়ে যুবাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় এবং বৃদ্ধকেও তাহার ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের মূল বুঝাইবার জন্য আবহমান কাল হইতে অনাদি বিধি নিষেধ বাক্য উপস্থিত আছে। যাঁহারা উপদেশের উপর জ্ঞান-ভিত্তি স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রণালী যে অঙ্গভঙ্গবিশিষ্ট, তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব বিধিনিষেধের দ্বারাও জ্ঞানের প্রাকট্য অবস্থা আইসে, এ তত্ত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। কেবল সুখ দুঃখ ভোগের উপর জ্ঞানভিত্তি ও শিক্ষাভিত্তি স্থাপন করিলে কার্য্য কালে তাহা দৃঢ় থাকে না। নিষ্কামধর্ম্ম প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। বিধিপ্রতিপালন করা যে পরম ধর্ম্ম ও শান্তিলাভের উপায়—সে ধর্ম্ম ও সে উপায়ে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব, জ্ঞানসঞ্চারের মূল খুঁজিতে গেলে তাহা কেবল সুখ দুঃখ বিচারের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। জ্ঞানের প্রকৃত মূল অনাদি—সেই কারণে ঋষিরা ইহার সহিত পূর্ব্ব জন্মের সংস্রব দেখিতে পাইতেন। * আমরা যদি খুব অনুসন্ধান

* এ কথা ঋষি-বাক্য বটে কিন্তু ইহার প্রমাণ কি রূপে সম্ভবে? সম্পাদক।

করি তাহা হইলে জঠর বাসের শেষ মাসের পূর্ব্বভাগেও উহার মূল দেখিতে পাই।

বৃদ্ধব্যবহার, হৃদয়শায়ী পুরুষের সহিত বহির্বস্তুর সুখ দুঃখ সম্বন্ধ, হৃদয়বাসী আত্মায় যে স্বতঃসিদ্ধ বোধ-বীজ আছে তাহা ও তদ্বিকাশক উপদেশ, এই কএকটী সমবেত ও পূর্ণ না হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। যে-টীর অভাব বা ত্রুটী হইবে সেইটীই জ্ঞানসঞ্চারের বা আত্মার অভ্যুত্থানের বৈগুণ্যসাধন করিবে। যে যত অধিক বৃদ্ধব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করে সে তত অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়। যে যত অধিক বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্ক পাতায় সেও তত অধিক সে সকলের গুণাগুণ জানিতে পারে। যে যত অধিক উপদেশ শুনে ও বিশ্বাস করে সে তত অধিক ভূতভবিষ্যদ্দর্শী হয়, যদি তাহার স্বতঃসিদ্ধ বোধ বীজ অঙ্কুরিত হইবার কোনরূপ আধ্যাত্মিক বাধা না থাকে। (আধ্যাত্মিক বাধা= ইন্দ্রিয়-বৈকল্য)। অনেক মানুষ উপদেশ পায় না ও শুনে না, তাই তাহাদের জ্ঞানের একটী অঙ্গ অপ্রকট থাকে। অনেক মানুষ লোকব্যবহার অল্প দেখে, তাই তাহাদের জ্ঞানের এক অঙ্গ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মানব-জ্ঞানের উত্তমাধম ভাব চলিতেছে ও নির্ব্বাহ পাইতেছে। লোকব্যবহারের অদর্শনে ও উপদেশের অভাবে মানব-জন্ম যে কিরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হয় তাহা ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্যের বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইন্দ্রিয়বিপর্য্যয়রূপ আধ্যাত্মিক বাধা মানব জ্ঞানের যেরূপ বিঘ্ন করে তাহাও মূলের জ্ঞান পর্য্যালোচন করিলেও বুঝা যাইতে পারে।

ক্রমপ্রকাশ্য।

জীবস্থিতি।

(কুলার্ণব তন্ত্রোক্ত)

পার্ব্বতী কহিলেন, দেব, এই দুঃখসঙ্কুল সংসারে কত জীব জন্মিতেছে ও মরিতেছে ইহার কোন অন্ত নাই। কিন্তু এই সংসারে কেহই সুখী নয়। এক্ষণে বল ইহারা কোন্ উপায়ে এই সংসার-বন্ধন মুক্ত হইতে পারে।

শঙ্কর কহিলেন; দেবি, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিলে কহিতেছি শুন। ইহা শুনিবা মাত্র মনুষ্যের সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়। দেবি, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম আছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বেশ্বর নির্ম্মল ও নিষ্কল। তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি স্বয়ংজ্যোতি নিত্য নির্ব্বিকার জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ। এই সমস্ত জীব তাঁহারই অংশ। অগ্নির পক্ষে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ অভিন্ন ব্রহ্মের পক্ষে জীবও সেইরূপ অভিন্ন। কেবল মায়াকৃত উপাধি দ্বারা তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া আছে। এবং স্বীয় সুখদুঃখপ্রদ পুণ্যপাপে নিয়মিত হইয়া দেহ আয়ু ও কর্ম্মজ ভোগ লাভ করিতেছে। ফলত ইহারা মায়া-প্রভাবে একান্ত হতজ্ঞান। দেখ, অনেক সুকৃতিবলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। সেই মনুষ্যের মধ্যে যে জ্ঞানী মুক্তি তাহারই ঘটিয়া থাকে। ফলত মনুষ্য ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী আর কেহই নয়। এই মনুষ্যজন্ম অনেক পুণ্যের পুরস্কার। মুক্তির সোপান এই দুর্লভ নৃদেহ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্ধার না করে তদপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কেহই নাই। এই উত্তম মনুষ্যজন্ম ও ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে আত্মহিত না বুঝে সেই যথার্থ আত্মঘাতী। দেহ ব্যতীত কাহারই পুরুষার্থ

দৃষ্ট হয় না, অতএব দেহ পাইয়া পুণ্য সাধন করিবে। সর্ব্বোপায়ে এই দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহা সকল মঙ্গলের ভাজন। গ্রাম পুনর্বার হয়, ক্ষেত্র পুনর্বার হয়, ধন পুনর্বার হয়, গৃহ পুনর্বার হয় এবং শুভাশুভ কর্ম্মও পুনর্বার হয় কিন্তু দেহ পুনঃ পুনঃ হয় না। এই শরীর রক্ষার্থ সকলেই যত্ন করিয়া থাকে, অধিক কি, কুষ্ঠাদি মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকও দেহত্যাগ ইচ্ছা করে না। যাহার জন্ম ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্ম জ্ঞানের জন্য, জ্ঞান ধ্যানের জন্য সে শীঘ্রই মুক্ত হয়। আপনিই যদি আপনাকে অহিত হইতে উদ্ধার না করে তবে আপনার অপেক্ষা আর কে আত্মোদ্ধারক হইতে পারে জানি না। যে ব্যক্তি ইহলোকে নরকরোগের চিকিৎসা না করিল নিরৌষধ দেশে গিয়া সেই ব্যাধিগ্রস্ত আর কি করিবে। যাবৎ এই দেহ তাবৎ তত্ত্ব চিন্তা করিবে, গৃহ বহ্নিপ্রদীপ্ত হইলে কোন্ নির্বোধ কূপ খনন করে। জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় আছে, আয়ু সচ্ছিদ্র ঘট হইতে জলের ন্যায় অল্পে অল্পে স্খলিত হইতেছে, এবং রোগ দুরন্ত শত্রুর ন্যায় পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন ঘটাইতেছে, অতএব সর্ব্বথা আপনার শ্রেয় অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাবৎ দুঃখ না আইসে, যাবৎ আপদ না আইসে, যাবৎ ইন্দ্রিয়বৈকল্য না ঘটে তাবৎ আপনার শ্রেয় অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সাংসারিক সুখদুঃখময় নানা কার্য্যে কাল তো যাইতেছে কিন্তু কেহই আপনার হিত দেখিতেছে না। এই সংসারে কেহ জড় কেহ পীড়ায় কাতর কেহ মৃত কেহ বিপন্ন কেহ শোকাকুল কিন্তু লোক সকল মোহমদিরায় উন্মত্ত, এই সকল দেখিয়াও ইহাদের মনে ভয় নাই। সম্পদ স্বপ্নবৎ অলীক, যৌবন পুষ্পের ন্যায় হয় আর যায় এবং আয়ু বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির, এই সমস্ত জানিয়া, বল, কাহার ধৈর্য্য থাকিতে পারে। মানুষ যদি শতায়ু হয় তাহা একে তো অল্প কাল, এই অল্প কালের অর্দ্ধাংশ আবার নিদ্রায় যায়, আর অর্দ্ধ বাল্য রোগ জরা ও দুঃখে বৃথা নষ্ট হয়। এই দেহ জলবিম্ববৎ ক্ষণিক এবং জীব নিরবচ্ছিন্ন শোক মোহে আকুল এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া না দেখে সে অস্থায়ীকে স্থায়ী বলিয়া বুঝে এবং অনর্থে অর্থজ্ঞান করে। দেবি! এই জীবলোক তোমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া আছে, ইহারা দেখিয়া চলিলেও স্খলিতপদ হয়, শুনিলেও বুঝিতেছে না, এবং পড়িলেও জানিতে পারিতেছে না। এই জগৎ মৃত্যু রোগ ও জরারূপ গ্রাহসঙ্কুল গম্ভীর কাম-সমুদ্রে তোমার মায়াবলে নিমগ্ন, কিন্তু কেহই তাহা বুঝিতেছে না। এই দেহ যে প্রতিক্ষণই জীর্ণ হইতেছে তাহা অবশ্য বুঝা যায় না, কিন্তু যখন জলমধ্যগত আম কুম্ভের ন্যায় ইহা এককালে শীর্ণ হইয়া পড়ে তখনই তাহা বুঝা যায়। যেমন বায়ুকে বন্ধন করা যায় না, আকাশকে ছেদন করা যায় না এবং তরঙ্গ গুলিকেও ধরিয়া রাখা যায় না সেইরূপ এই আয়ুতে আস্থা রাখা অসম্ভব। যখন পৃথিবী দগ্ধ হয়, সুমেরু চূর্ণ হয় এবং সমুদ্রও শুষ্ক হয় তখন শরীরের কথা আর কি বলিব। আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার অভীষ্ট, লোক কেবলই এই সব কথা লইয়া আছে কিন্তু কাল-বৃক বলপূর্ব্বক তাহাকে এই সমস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়। ইহা করা হইয়াছে, এইটী করিতে হইবে, মনুষ্য কেবল এইরূপ লইয়াই থাকে কিন্তু মৃত্যু তাহা পূর্ণ করিতে না দিয়া বলপূর্ব্বক তা-

হাকে লইয়া যায়। কল্য যাহা করিতে হইবে অদ্যই তাহা করা কর্ত্তব্য, অপরাহ্ণে যাহা করিতে হইবে পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা করা কর্ত্তব্য, কারণ মৃত্যু লোকের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল কি না তাহার কোনও প্রতীক্ষা করে না। নর! তুমি তো অভিজ্ঞ বট কিন্তু দেখিতেছ না যাহার অগ্রে অগ্রে জরা সেই মৃত্যু প্রচণ্ড ব্যাধিসেনার সহিত ছাসিতেছে। মনুষ্য আশাশলাকাবিদ্ধ হইয়া রাগদ্বেষানলে অভীষ্ট বিষয়রূপ ঘৃতে সুপক্ক, মৃত্যু তাহাকে পরম সুখে আহার করিতেছে। জগতের কথা বলিব কি, এখানে মৃত্যু বালক বৃদ্ধ যুবা ও গর্ভগত অর্ভককেও আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মনুষ্যের কথা কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাও মৃত্যুর অধীন, অতএব ইহা সম্যক আলোচনা করিয়া যাহা শ্রেয় তাহার অনুষ্ঠান করিবে। স্বস্ব বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট আচারের ব্যতিক্রম, দুষ্প্রতিগ্রহ এবং পরস্ত্রী ও পরধনলোভ বশত মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। বেদাদিশাস্ত্রের অননুশীলন, গুরুবঞ্চনা ও ইন্দ্রিয়সেবা এই কএকটি দোষেই মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। জোঁক যেমন একটি তৃণ হইতে অপর তৃণে যায় সেইরূপ জীব এক দেহ ত্যাগ করিয়া আর এক দেহে গিয়া থাকে। বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য যেমন দেহের অবস্থান্তর সেইরূপ জীবের দেহান্তর প্রাপ্তিও একটা অবস্থান্তর, ধীর ব্যক্তি ইহাতে কিছুমাত্র বিমোহিত হন না। ইহলোকে যাহা করা যায় পরলোকে তাহার ফল হয়; বৃক্ষের মূলে জলসেক করে কিন্তু শাখাতেই তাহার ফল হইয়া থাকে। দারিদ্র্য দুঃখ রোগ ও নানারূপ ব্যসন এই গুলি আত্মাপরাধরূপ বৃক্ষের ফল বলিয়া বুঝিবে। যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ সেইই মুক্ত, সমস্ত দোষই সঙ্গজ, অজ্ঞের কথা দূরে থাক্ জ্ঞানীরও সঙ্গদোষে অধঃপাত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকারে সঙ্গত্যাগ কর্ত্তব্য, যদি তাহা না পার তবে সাধুর সহিত সঙ্গ করিবে, কারণ সৎসঙ্গ ঔষধ। সৎসঙ্গ ও বিবেক এই দুইটী মনুষ্যের নির্ম্মল চক্ষু, যে ব্যক্তির ইহা নাই সে অন্ধ, এরূপ অন্ধ লোক কেন না আপদের পথে যাইবে। মানুষ মনের যতগুলি প্রিয় সম্বন্ধ ঘটাইয়া রাখে ততগুলি শোক-শঙ্কু তাহার মনে নিখাত হইয়া থাকে। দেবি, মনুষ্য আপনার দেহকেও ত্যাগ করিয়া যায় তবে তাহার স্ত্রী পুত্রাদি স্বজন-সম্বন্ধ আর কি জন্য। এই সংসার দুঃখের মূল; ইহা যাহার আছে সেই দুঃখী, আর যে ইহা ত্যাগ করিয়াছে সেইই সুখী, অন্যে নয়। সংসার সকল দুঃখের আকর সকল বিপদের আশ্রয় ও সকল পাপের আলয়, ইহাতে কদাচ আসক্ত হইবে না। যাহারা আসক্ত তাহাদের পক্ষে সংসার অরজ্জুকৃত বন্ধন ও অশস্ত্রকৃত খণ্ডন এবং মিশ্রীকৃত মহাবিষ। যখন ইহার আদি মধ্য ও অন্তে কেবলই দুঃখ তখন ইহাতে আসক্তি ছাড়িয়া মনুষ্য তত্ত্বনিষ্ঠ ও সুখী হইবে। যদি কেহ লৌহময় বা দারুময় পাশে দৃঢ়রূপেও বদ্ধ হয় তাহার মুক্তি আছে কিন্তু যে ব্যক্তি স্ত্রী ও ধনাদিতে আসক্ত তাহার কখন মুক্তি নাই। যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি চিন্তায় উন্মত্ত তাহার সমস্ত সদ্গুণ আমকুম্ভস্থ জলের ন্যায় অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইয়া যায়। হা! স্ত্রী মদ্যাদি বিষয়ই যাদের ভোগ্য সেই দেহস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়দস্যু সকলকেই বিনাশ করিল! মাংসলুব্ধ মৎস্য যেমন লৌহশঙ্কু বড়িশকে দেখে না তদ্রূপ সুখলুব্ধ মনুষ্য যমবাধা দেখিতে

পায় না। যাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য উচ্ছৃঙ্খল ও ঔদরিক সেই সমস্ত মূর্খই নারকী। ক্ষুধা আহার নিদ্রা ও মৈথুন প্রাণিমাত্রেরই সমান, তন্মধ্যে যে জ্ঞানবান সে মানুষ,আর যে জ্ঞানহীন সে পশু। মনুষ্য প্রভাতে মলমূত্র, মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসা এবং রাত্রিতে কামবেগে ও নিদ্রায় নিপীড়িত হয়। ফলত স্বীয় দৈহিক ধর্ম্ম ও স্ত্রী প্রভৃতিতে আসক্তি ব্যতীত ইহাদের কোনও কার্য্য নাই। এইরূপ অজ্ঞানান্ধ লোক, হা! কেবলই জন্মিতেছে ও মরিতেছে। সকল লোকই স্বস্ব বর্ণাশ্রম নির্দ্দিষ্ট আচার রক্ষায় তৎপর, দেবি! ইহারা পরম তত্ত্ব কিছুই জানে না সুতরাং বৃথা নষ্ট হয়। এমনও আবার কতকগুলি লোক আছে তাহারা কেবল ব্রতচর্য্যা ও ক্রতুচর্য্যা বুঝে এবং কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে সততই ব্যাপৃত। সেই সকল মূর্খ ও প্রতারক যাগযজ্ঞ মন্ত্রোচ্চারণ ও হোমাদি ব্যাপারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া নামমাত্রে সন্তুষ্ট হয় এবং একাহার উপবাস ও দেহশোষণাদি দ্বারা পরোক্ষ ফল কামনা করিয়া থাকে। দেবি, দেহদণ্ড মাত্র দ্বারা এই সকল অবিবেকীর কি মুক্তি হয়? বল্মীকের উপর লগুড় প্রহার করিলে কি অজগর বিনষ্ট হইয়া থাকে? অনেক দাম্ভিক শাস্ত্রোক্ত বেশ ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানীর ন্যায় বিচরণ করে এবং অনেককে ভ্রমে ফেলিয়া থাকে। তাহারা ধনোপার্জ্জন ও আহারান্বেষণে নিযুক্ত এবং সাংসারিক সুখে অতি মাত্র আসক্ত। তাহারা মুখে বলে আমি ব্রহ্মজ্ঞ কিন্তু বস্তুত কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই পরিভ্রষ্ট। যেমন অন্ত্যজের সংস্রব ত্যাগ করা আবশ্যক সেইরূপ ঐ সকল লোকের সংস্রব সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। গর্দ্দভাদি জন্তুর চক্ষে গৃহ ও অরণ্য উভয়ই একরূপ, তাহারা নির্লজ্জ ও দিগম্বর হইয়া বিচরণ করে, বল দেখি, তাহারাও কি যোগী? যদি মৃত্তিকা ও ভস্ম মাখিলেই মনুষ্যের মুক্তি হয় তবে যে সকল গ্রাম্য জন্তু মৃৎভস্মের স্তূপে পড়িয়া থাকে তাহারাও কি মুক্ত হইতেছে? যদি তৃণ পত্র ও জলমাত্রে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সতত বনবাসী হইলেই যোগী হয় তবে হরিণেরা তো তাহাই করিয়া থাকে, তাহারাও কি যোগী? পারাবতেরা শিলাহারী, চাতকেরা কদাচ পৃথিবীর জল পান করে না, তাহারাও কি যোগী? শূকরেরা শীতবাতাতপ অক্লেশে সহ্য করিতেছে এবং তাহাদের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য উভয়ই সমান তাহারাও কি যোগী? মণ্ডুক মৎস্য ও নক্র কুম্ভীর জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারাও কি মুক্ত হয়? শুকশারিকারা লোকের সম্মুখে হৃদয়ের আনন্দ ব্যক্ত করে এবং কত কি পড়ে তাহারাও কি পণ্ডিত? অতএব এই সকল কার্য্যের লোকরঞ্জনই একমাত্র কারণ, দেবি, মোক্ষের কারণ কেবল তত্ত্বজ্ঞান। পশুরা ষড়দর্শনরূপ মহা কূপে পতিত ও পশুপাশে নিয়ন্তৃত সুতরাং পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছে না। অনেক কুতার্কিক বেদ শাস্ত্ররূপ ভীষণ সমুদ্রে কালরূপ প্রবল তরঙ্গে ইতস্তত ভ্রাম্যমান ও গ্রহগ্রস্ত হইয়া অবস্থান করে। যে ব্যক্তি বেদ আগম ও পুরাণজ্ঞ হইয়াও পরমার্থ না জানে তবে ঐরূপ শাস্ত্রজ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র। যাহারা তত্ত্ববিমুখ তাহারা এই জ্ঞান এই জ্ঞেয় এই চিন্তায় আকুল হইয়া অহর্নিশি পড়িয়া থাকে কিন্তু সকলই নিষ্ফল। পরম ভাব অন্য প্রকার কিন্তু লোক সকল ক্লেশ পায় আর এক প্রকার, শাস্ত্রার্থ অন্য প্রকার কিন্তু ব্যাখ্যা করে আর এক

প্রকার। এদিকে মুখে তন্ময়ীভাব বলা হইতেছে কিন্তু হৃদয়ে তাহার অনুভব নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ অহঙ্কারে উপহত কেহ বা উপদেশশূন্য। অনেকে বেদশাস্ত্র পাঠ করে, শাস্ত্রার্থ লইয়া পরস্পর বিবাদে উন্মত্ত হয় কিন্তু দর্ব্বী (হাতা) পাকরস যে কি তাহা যেমন জানে না সেই রূপ পরম তত্ত্ব যে কি ইহারা তাহা জানে না। মস্তক পুষ্প ধারণ করে কিন্তু নাসা তাহার গন্ধ জানে, এ যেমন, সেইরূপ বেদ পড়িতেছ তুমি আর তাহার ভাব বুঝিবে কি আর এক জন? মূঢ় লোক তত্ত্ব যে আত্মস্থ তাহা না জানিয়া শাস্ত্র পাঠে মুগ্ধ হইয়া থাকে; ছাগ পশু নিজের কক্ষস্থ কিন্তু নির্বোধ গোপ উহাকে কূপের ভিতর দেখিতেছে ইহা কি আশ্চর্য্য। শাস্ত্রবোধ সংসারমোহনাশে কখন পর্য্যাপ্ত নয়, প্রদীপের কেবলমাত্র বর্ত্তি (শলিতা) দ্বারা কখন অন্ধকার নষ্ট হয় না। নির্বোধের শাস্ত্র পাঠ যেমন অন্ধের দর্পণ, ফলত বুদ্ধিমানের নিকটই শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। যাহার প্রত্যক্ষ গ্রহণ নাই কেবল কথায় তাহার গ্রহণ কিরূপে হইবে স্থতরাং যাহারা শাস্ত্রে মুগ্ধ তাহারা নিঃসন্দেহ তত্ত্ব হইতে বহু দূর। এই জ্ঞান এই জ্ঞেয় লোকে সর্ব্বত্র ইহাই শুনিতে চায় কিন্তু এইরূপ করিয়া সহস্র বৎসর বাঁচিলেও কেহ শাস্ত্রের পারে যাইতে পারে না। ফলত বেদাদি শাস্ত্র সংখ্যায় অনেক, এদিকে মানুষ স্বল্পায়ু, তার উপরও আবার নানা রূপ বিঘ্ন, অতএব যাহা সার সেই টুকুই জানিয়া লইবে।

ক্রমশঃ

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৫১ শকের ১১ মাঘে প্রতিষ্ঠিত।

সংস্থাপক।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

বিশ্বস্ত অধিকারী।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(পাথুরিয়াঘাটা)
শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মিত্র।
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ ও যন্ত্রাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(পাথুরিয়াঘাটা)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ধর্ম্মবীর।

(উৎকল ভাষা হইতে অনুবাদিত।)

মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব মুসলমান ধর্ম্মে অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি নানা ছলে অত্যাচার করিতেন। তাঁহার অধিকার কালে দিল্লীর অনতিদূরে সত্যরামী নামে এক সম্প্রদায় বাস করিত। তাহাদের মতে একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের উপাস্য দেবতা—তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, কিম্বা তাঁহার নামে কোনও মনুষ্যের উপাসনা করা অনুচিত। সত্যরামিগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত, এই ছল করিয়া সম্রাট তাহাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে বিনাশ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাদের প্রধান গুরু বন্দী হন। তাঁহার সম্মুখে তদীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজনকে নিহত করাতেও তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। অবশেষে তিনি দিল্লীতে আনীত হন। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে প্রাণ বধ করিবেন এই ভয় দেখাইয়া সম্রাট বলিলেন—

শুনরে কাফের, পড়রে কোরাণ,
নতুবা জল্লাদ লইবে পরাণ।
শুন সত্যরামি, হও মুসলমান,
নতুবা মরিতে হও আগুয়ান।

তখন ঘাতককে সম্রাটের ইঙ্গিত ক্রমে নিষ্কোষিত অসি উত্তোলন করিতে দেখিয়া সত্যরামী গম্ভীর স্বরে আরঙ্গজেবকে বলিতে লাগিলেন।

মোরে কিনা চিনিস্‌রে তুই ?
কারে এত করিস্ বড়াই ?
সত্য বটে তুই বলবান্;
রতন ভাণ্ডার পূর্ণ, তুই ধনবান্।

সত্য ভারতীয় রাজগণ
লইয়াছে তোমার শরণ;
সত্য বটে, তোর সেনাদল—
চলিলে ধরণী ভরে করে টলমল।

পূর্ব্বসীমা স্থিত মণিপুরী
উত্তর সীমায় হিম গিরি
প্রসারিত পশ্চিমে দ্বারিকা
দক্ষিণ সীমায় স্থিত কুমারিকা।

এই সীমা স্থিত হিন্দুস্থান
পদানত তোর ; তাই অভিমান ?
এসকলি তোর মিছে খেলাঘর !
আঁখি মুদি অন্ধকার দ্যাখরে বর্ব্বর !

শুন শুন অজ্ঞান যবন,
এই হের যত ধন জন,
সবি অল্প দিনের কারণ !
কিসে অহঙ্কার তবে অধম যখন ?

প্রবল রাজার রাজছত্র,
গোরুরাখালের আতপত্র,
এক দিন হবে এক স্থান !
তবে কেন মিছে কর এত অভিমান ?

অনাদি অনন্ত জগদীশ
যেই জন ভজে অহর্নিশ
তার কিরে তোরে হয় ভয় ?
অধম যবন, তার কোথা পরাজয় ?

আদেশিলে আমায় বধিতে,
কি শকতি আমায় নাশিতে ?
এই দেহ মাটী ভাণ্ড প্রায়
ভাঙলে ভাঙবে, গড়বেন তিনি ক্ষতি কিবা তায় ?

পঞ্চভূতে এদেহ নির্ম্মিত,
পঞ্চভূতে হইবে নিহিত ;
নিশ্চয় একদা হইবে বিলয়
কিবা চিন্তা বল যদি আজি হয় ক্ষয় ?

আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতিগণ
করিয়াছ সম্মুখে নিধন ।
প্রাণের অধিক প্রিয়জন,
প্রিয়তম প্রণয়িনী, নন্দিনী, নন্দন—
করিয়াছে সম্মুখে নিধন
তোমার রাক্ষস সেনাগণ ;
এই প্রাণ সে সব সহিল
বিন্দুমাত্র নেত্র নীর তাহে না পড়িল ।

এবে তুই এই দেহ পিণ্ড
খড়্গধারে কর খণ্ড খণ্ড
দাহকর জলন্ত অনলে,
অথবা ডুবাও নিয়ে জলধির জলে ।

তোর হেয় ধর্ম্ম না লইব ।
নিজ ধর্ম্মে থাকি পরাণ ত্যজিব ।
যারে বল পবিত্র কোরাণ ।
তাহা ত দেখিরে মহা পাপের নিদান ;

যাহাতে আছেরে প্রাণিহিংসা
তা কি ধর্ম্ম ? তা ত কসাই ব্যবসা !
নির্ম্মল পবিত্র যে ধরম
তাহাতে কেমনে থাকে হিংসার করম ?

অনাদি অনন্ত ভগবান্
যাঁর এই জগত সংস্থান ;
ধরণীতে যত প্রাণিগণ
তিনি সবে সমভাবে করেন দর্শন ;

সকলেরই সম অধিকার
লভিবারে প্রসাদ তাঁহার,
করিবারে তাঁহারে ভজন ;
মহম্মদ সুপারিসে কোন্ প্রয়োজন ?

যাহা ইচ্ছা তোর কররে যবন,
কভু ছাড়িব না ধর্ম্ম সনাতন ।”
পামর সম্রাট ইঙ্গিতে তখন
সত্যরামিশিরে অসির পতন ।

দাক্ষিণাত্যের কোন সম্ভ্রান্ত রাজপরিবার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজা নিঃসন্তান। দত্তকগ্রহণ করা তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু চিরাগত প্রথানুসারে বহু দেবতার পূজা ও হোমাদি করিয়া দত্তকগ্রহণে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে একটী দত্তকগ্রহণের পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উপলক্ষ্যে যেরূপ পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া উক্ত রাজাকে প্রেরণ করেন এস্থলে তাহাই মুদ্রিত হইল।

দত্তক গ্রহণ পদ্ধতি।

অনুষ্ঠাতা পূর্ব্বদিনে সংযত থাকিয়া পর দিনে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক কর্ম্মারম্ভ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।

আচার্য্য প্রতিবচনে কহিবেন।

ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।

পরে অনুষ্ঠাতা কহিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং স্বস্তিঞ্চ ভবন্তো ব্রুবন্তু।

আচার্য্য প্রতিবচনে ঋদ্ধ্যতাং বলিয়া পরে কহিবেন স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রে এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মের সান্নিধ্য অনুভব করিবেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকল দর্শন করে সেইরূপ ধীরেরা বিষ্ণুর পরম পদকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

পরে ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া সংকল্প করিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুকঃ অপ্রজাত্বপ্রযুক্ত পৈতৃকঋণাপাকরণার্থং শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং আত্মবংশরক্ষার্থং চ পুত্রপ্রতিগ্রহমহং করিষ্যে।

পরে এই সূক্ত পাঠ করিবেন।

যজ্জাগ্রতোঽদূরমুদেতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবেত্যদূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

যেহেতু ব্রহ্ম জাগ্রত লোকের অদূরে আছেন এবং সুষুপ্ত লোকের অদূরে আছেন তিনি জ্যোতির জ্যোতি এবং একমাত্র অতএব আমার মনের সঙ্কল্প শুভ হউক।

পরে কহিবেন।

সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা আচার্য্যকে বরণ করিবেন।

ওঁ সাধু ভবানাস্তাং।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ সাধ্বহমাসে।

পরে অনুষ্ঠাতা কহিবেন।

ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ অর্চ্চয়।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা আচার্য্যকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার দক্ষিণ জানু গ্রহণ পূর্ব্বক কহিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ মৎসঙ্কল্পিতপুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি আচার্য্যকর্ম্মকরণায় অমুক গোত্রং অমুকং ভবন্তমহং বৃণে।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ বৃতোস্মি।

পরে অনুষ্ঠাতা কহিবেন।

যথাজ্ঞানং আচার্য্যকর্ম্ম কুরু।

আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা বা পুত্রগৃহীতা পুত্রদাতার সমক্ষে গিয়া এই বলিয়া পুত্র ভিক্ষা করিবেন।

ওঁ পুত্রং মে দেহি।

আমাকে পুত্র দেও।

পরে পুত্রদাতা ওঁতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রদানকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোব্রুবন্তু।

প্রতিবচনে আচার্য্য কহিবেন।

ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।

পরে পুত্রদাতা কহিবেন।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন পুত্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং স্বস্তিঞ্চ ভবন্তো ব্রুবন্তু।

প্রতিবচনে আচার্য্য ঋদ্ধ্যতাং বলিয়া কহিবেন।

স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

অনন্তর পুত্রদাতা সঙ্কল্প করিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং পুত্রদানকর্ম্মাহং করিষ্যে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিবেন।

যৎজাগ্রতোঽদূরমুদেতি দৈবং তদুস্বপ্তস্য তথৈবেত্যদূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

পরে কহিবেন।

সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অনন্তর, যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ যওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া পুত্রদান করিবেক।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ইমং পুত্রং তব পৈতৃকঋণাপাকরণার্থং বংশরক্ষাসিদ্ধ্যর্থং আত্মনশ্চ পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

এই বলিয়া বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিবেন।

মম প্রতিগৃহ্নাতু পুত্রং ভবান।

আপনি আমার পুত্রকে প্রতিগ্রহ করুন। পরে পুত্রদাতা স্বর্ণ লইয়া কহিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীপরমেশ্বরপ্রীতিকামনয়া যাচতে পুত্রদান সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রী অমুকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

এই বলিয়া পুত্রগৃহীতার হস্তে দক্ষিণা দিবেন।

পরে পুত্রগৃহীতা স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন।

অনন্তর দাতা বালককে গৃহীতার হস্তে দিবেন।

গৃহীতা স্বস্তি বলিয়া বালককে গ্রহণ করিবেন।

অনন্তর গৃহীতা বালককে উভয় হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার ক্রোড়ে বশাইয়া কহিবেন।

ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধি জায়সে আত্মাবৈ পুত্রনামাসি সঞ্জীব শরদঃ শতং।

তুমি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে জন্মিতেছ হৃদয় হইতে জন্মিতেছ তুমি পুত্র নামক আত্মা, শত বৎসর জীবিত থাক।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের মস্তকাঘ্রাণ করিবে।

ত্বয়ি ভূর্লোক মাদধামি। ওঁ ভুবস্ত্বয়ি দধামি। স্বর্লোকমাদধামি। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বয়ি দধামি। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরেতল্লোকত্রয়োপলক্ষিতমেতদাশ্রিতং সর্ব্বং প্রমেয়জাতং ত্বয়ি দধামি। ত্বমনেন ত্রৈলোক্যগতপ্রমেয়জাতাধানকর্ম্মণা মেধাযুক্তো ভব।

তোমাতে ভূর্লোক আধান করিতেছি। তোমাতে ভুবলোক আধান করিতেছি।

স্বর্লোক তোমাতে আধান করিতেছি। ভুর্ভুব ও স্বর্লোক তোমাতে আধান করিতেছি। ভুর্ভুব ও স্বর এই ত্রিলোকোপলক্ষিত এতদাশ্রিত সমস্ত প্রমিত বস্তু তোমাতে আধান করিতেছি। তুমি এই ত্রিলোকগত প্রমিত বস্তুর আধান কর্ম্ম দ্বারা মেধাযুক্ত হও।

ওঁ অশ্মাভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্রুতং ভব আত্মা বৈ পুত্র নামাসি সঞ্জীব শরদঃ শতং।

তুমি প্রস্তরের ন্যায় কঠিনদেহ হও পরশুর ন্যায় কঠিনদেহ হও এবং স্বুবর্ণের ন্যায় অক্ষয় হও। তুমি পুত্র নামক আত্মা। শত বৎসর জীবিত থাক।

এই বলিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করিবে। আশীর্ব্বাদ করিবার পর কহিবে।

ওঁ ধর্ম্মায় ত্বা পরিগৃহ্নামি ওঁ সন্তানায় ত্বা পরিগৃহ্নামি।

আমি ধর্ম্মের নিমিত্ত তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি। সন্তানের নিমিত্ত তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি।

ওঁ বস্ত্রাণি পরিধৎস্ব।

তুমি বস্ত্র পরিধান কর।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে বস্ত্র পরিধান করাইয়া মস্তকে উষ্ণীষ দিয়া কুঙ্কুমাদি দ্বারা তিলক করিয়া দিবে।

ওঁ হিরণ্যরূপমবসে হৃণুধ্বং।

শোভার নিমিত্ত স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ কর।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে কুণ্ডল পরাইয়া দিবে। পরে তাহার মস্তকে ছত্র ধারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদি দ্বারা মহোৎসব করিবে। পরে আপনার দক্ষিণ দিয়া বালককে পত্নীর ক্রোড়ে রাখিয়া স্বয়ং উপবেশন করিবে।

অনন্তর আচার্য্য চন্দন লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।

কশ্যপের যে তিন আয়ু অর্থাৎ বাল্য যৌবন জরা তাহা তোমার হউক।

এই বলিয়া বালকের ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।

দেবতাদিগের যে তিন আয়ু অর্থাৎ বাল্য যৌবন জরা তাহা তোমার হউক।

এই বলিয়া বালকের কণ্ঠে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

ওঁ তন্তে অস্তু ত্র্যায়ুষং।

সেই আয়ু তোমার হউক। এই বলিয়া হৃদয়ে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

ওঁ তন্তে অস্তু ত্র্যায়ুষং।

সেই আয়ু তোমার হউক, এই বলিয়া দুই বাহুতে চন্দনের ফোঁটা দিবে।

অনন্তর অনুষ্ঠাতা আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবেন।

ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ মৎসঙ্কল্পিতপুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গআচার্য্যকর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপনার্থং ইমাং সবস্ত্রাং ধেনুং স্বুবর্ণং (তন্মূল্যং বা) অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুকায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

সমাপ্ত।

প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ।

প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ কি ?

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

[প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ নির্দেশ করিতে হইলে তাহার সহজ উপায় এই যে, প্রথমতঃ জগতের মুখ্য শ্রেণী-গুলির বিভিন্ন প্রকৃতি কিরূপ, তাহা ভাগ ভাগ করিয়া দেখা ;—মুখ্য-শ্রেণী কি ? না (১) অপ্রাণ জড় বস্তু—যেমন পঞ্চভূত ;

(২) সপ্রাণ জড় বস্তু—যেমন বৃক্ষ লতা গুল্ম; (৩) সংকীর্ণ চেতন-পদার্থ—যেমন পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ; (৪) ব্যাপক চেতন-পদার্থ—যেমন মনুষ্য। প্রথমতঃ এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা;—দ্বিতীয়তঃ সমস্তের সাধারণ প্রকৃতি কিরূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা;—ইহাই সহজ উপায়। অপ্রাণ ভৌতিক বস্তু-সকলের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি; কি? না আকর্ষণ বিকর্ষণ। ইহাকেই আমরা বলি—ভৌতিক প্রকৃতি। এখন জৈবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্।

উদ্ভিদ্-রাজ্যেই জৈবিক প্রকৃতির প্রথম সূত্র-পাত। অতএব, বৃক্ষের উৎপাদন-কার্য্য প্রকৃতি দ্বারা কিরূপে সংঘটিত হয় তাহাই সর্ব্বপ্রথমে আলোচিতব্য। "বৃক্ষ-উৎপাদন" এই যে একটি ক্রিয়া—ইহার মূলে, বীজের প্রকৃতি, জলের প্রকৃতি, বায়ুর প্রকৃতি, মৃত্তিকার প্রকৃতি, এইরূপ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রকৃতি একত্র যোটবদ্ধ হইয়া কার্য্য করে; আর সেই যে বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য্য—তাহা একই কার্য্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। কেননা, মুখ্য কার্য্য যাহা—তাহা এক বই দুই নহে—কি? না বৃক্ষের উৎপাদন; সেই একটি মুখ্য-কার্য্যের অভ্যন্তরে অনেক-গুলি শাখা-কার্য্য অন্তর্ভূত;—(১) প্রয়োজনীয় ধাতু-সকলের বাহকতা-কার্য্য—ইহা প্রধানতঃ জলের কার্য্য; (২) ঐ সকল ধাতুর সংশোধন বা সংস্করণ—ইহা প্রধানতঃ আলোক উত্তাপ এবং বায়ুর কার্য্য; (৩) ঐ সকল ধাতুর উপকরণ-সংস্থান—ইহা প্রধানতঃ মৃত্তিকার কার্য্য; (৪) সমস্তের সামঞ্জস্য সাধন—ইহাই প্রধানতঃ বীজের কার্য্য। এখানে মুখ্য কার্য্য যেমন এক বই দুই নহে—কি? না বৃক্ষের উৎপাদন কার্য্য; আর, সেই একটি-মাত্র মুখ্য-কার্য্যের যেমন অনেক-গুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—(১) জলের কার্য্য, (২) বায়ু প্রভৃতির কার্য্য, (৩) মৃত্তিকার কার্য্য, ইত্যাদি—তেমনি, সেই মুখ্য-কার্য্যটির মৌলিক কারণ এক বই দুই নহে—কি? না বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি; বৃক্ষোৎপাদনের আর আর যত প্রকার আনুষঙ্গিক কারণ আছে—যেমন, জলের ধাতু-বাহকতা-শক্তি—বায়ু-প্রভৃতির ধাতু-শোধন-শক্তি—মৃত্তিকার ধাতু-পোষণ শক্তি—সমস্তই এক-সেই বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিরই অন্তর্ভূত। অঙ্কুরিত হইবার শক্তি যাহা বীজে আছে এবং বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জল-বায়ু মৃত্তিকা-প্রভৃতিতে আছে,—এই দুই বিভিন্ন শক্তি একই বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তির দুইটি বিভিন্ন অবয়ব। বাচনিক সুবিধার জন্য—অঙ্কুরিত হইবার শক্তি যাহা বীজে আছে—তাহা কৈন্দ্রিক শক্তি বলিয়া সংজ্ঞিত হউক্; আর, বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জল-বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতিতে আছে—তাহা পারিধ শক্তি বলিয়া সংজ্ঞিত হউক্; তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, কৈন্দ্রিক এবং পারিধ এই দুইটি শক্তি একই বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তির দুইটি পৃষ্ঠ—বা দুইটি অপরিহার্য্য অবয়ব; কেননা, বৃক্ষ উৎপাদন করিতে হইলে ঐ দুইটি শক্তির একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী কোনো কার্য্যেরই নহে। কৈন্দ্রিক এবং পারিধ এই দুই প্রকার শক্তি যাহা দেখা গেল—দুয়ের মধ্যে বিশেষ একটি প্রভেদ এই যে, বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকা প্রভৃতিতে আছে তাহা সাধা-

রণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষ-উৎপাদনেই সহায়তা করে, কিন্তু অঙ্কুরিত হইবার শক্তি যাহা বীজে আছে তাহা সেরূপ নহে—সাধারণত সকল-জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনে আদবেই তাহার কোনো হস্ত নাই—বিশেষ কোনো-এক-জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করাই তাহার একমাত্র কার্য্য। শাল তাল তমাল প্রভৃতি সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনেই জল-বায়ু-মৃত্তিকার হস্ত রহিয়াছে, কিন্তু তালের বীজ শুদ্ধ কেবল তাল-বৃক্ষের উৎপাদনেই পটু, শালের বীজ শাল-বৃক্ষের উৎপাদনেই তৎপর—সাধারণতঃ সকল-জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনে নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে (১) কৈন্দ্রিক বৃক্ষোৎপাদন-শক্তি বিশেষ কোনো এক-জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদনেই তৎপর; (২) পারিধ বৃক্ষোৎপাদন শক্তি সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষোৎপাদনেই তৎপর। কাজেই বলিতে হয় যে, জল-বায়ু-মৃত্তিকাতে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি যাহা আছে তাহা সাধারণতঃ সকল বৃক্ষেরই উৎপাদিকা-শক্তি; কিন্তু আম্র-বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি কেবল আম্র-বৃক্ষেরই উৎপাদিকা-শক্তি—কাঁটাল বৃক্ষের বা আর কোনো বৃক্ষের নহে। বিশেষ বিশেষ বীজ হইতে অবশ্য বিশেষ-বিশেষ-জাতীয় বৃক্ষই উৎপন্ন হয়; কিন্তু ডারউইন্ হেকেল্ প্রভৃতির ক্রমাভিব্যক্তির সিদ্ধান্ত মানিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, একই আদিম-জাতীয় উদ্ভিদ্ ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাল-ক্রমে নানা জাতীয় বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং সকল জাতীয় বৃক্ষই একই আদিম-জাতীয় বৃক্ষের সন্তান-সন্ততি। জল-বায়ু-মৃত্তিকা প্রভৃতির সহিত সেই আদিম-জাতীয় ঔদ্ভিদ বীজের সাদৃশ্য এই যে, সাধারণতঃ সকল-জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনেই যেমন জল-বায়ু-মৃত্তিকার হস্ত রহিয়াছে—তেমনি, সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষই আদিম জাতীয় ঔদ্ভিদ বীজ হইতে উত্তরোত্তর ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব, বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) মৌলিক বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি (অর্থাৎ আদিম-জাতীয় বৃক্ষ-উৎপাদনের শক্তি); (২) কৈন্দ্রিক বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদিকা-শক্তি যাহা বিশেষ বিশেষ বীজে বর্ত্তমান); (৩) পারিধ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি (অর্থাৎ বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকায় বিদ্যমান আছে); প্রত্যেক বৃক্ষের উৎপাদনেই এই তিন প্রকার বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তির সমবেত সহকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমাভিব্যক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিশেষ বিশেষ বীজের বিশেষ বিশেষ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি সেই আদিম-জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিরই বিশেষ-বিশেষ পরিণাম; শুধু তা নয়—আদিম জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি (এক কথায়—মৌলিক বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি) আজিও সকল জাতীয় বৃক্ষের অভ্যন্তরেই কার্য্য করিতেছে। এমন কি—বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা মনুষ্যের ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া এইরূপ দেখিয়াছেন যে, জননী-গর্ব্ভে আদিম জীব-হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক জৈবিক ক্রম-পরম্পরা অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়—কাজেই বলিতে হইতেছে যে, বিশেষ বিশেষ জীবোৎপাদিকা-শক্তি মৌলিক জীবোৎপাদিকা-শক্তিরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম—মৌলিক জীবোৎপাদিকা শক্তিরই প্রকার-ভেদ; তবেই হইতেছে যে, যত প্রকার জীবোৎপাদিকা-শক্তি আছে সমস্তেরই

অভ্যন্তরে মৌলিক জীবোৎপাদিকা-শক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে—এবং সেই মৌলিক জীবোৎপাদিকা-শক্তিই ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন জীবে পরিণত হইতেছে। স্থাবর এবং জঙ্গম জীবের মধ্যে (অর্থাৎ অচেতন বৃক্ষাদির এবং সচেতন পশ্বাদির মধ্যে) যত কিছু সাজাত্য এবং বৈজাত্য (অর্থাৎ সমজাতীয় ভাব এবং ভিন্ন জাতীয় ভাব) দৃষ্টিগোচর হয়—সমস্তই ক্রমাভিব্যক্তির ফল। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) সন্ততির নিয়ম (law of heredity)—ইহাই সাজাত্যের মূল প্রবর্ত্তক; এবং (২) সঙ্গতির নিয়ম (Law of adaptation) —ইহাই বৈজাত্যের মূল প্রবর্ত্তক। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, "বাপ-কা বেটা সেপাই-কা ঘোড়া" ইহাই সন্ততির নিয়ম (law of herdity); এবং শাস্ত্রে আছে "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" অথবা "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" ইহাই সঙ্গতির নিয়ম (law of adaptation)। সন্ততির নিয়ম এই যে, যেমন পিতামাতা তেমনি সন্তান-সন্ততি; সঙ্গতির নিয়ম এই যে, যেমন সঙ্গ তেমনি পাত্র। সন্ততি এবং সঙ্গতির নিয়মের উপর সাজাত্য এবং বৈজাত্য কিরূপ নির্ভর করে, তাহার একটি উদাহরণ;—মনে কর একজন বাঙ্গালির জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; তাহার পরে পিতামাতা কতিপয় বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থিতি-কালীন সেই স্থানে তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল;—প্রথমতঃ দুই পুত্রই এক পিতা-মাতার সন্তান সুতরাং দুই পুত্রেরই এরূপ কতকগুলি গুণ অবশ্যই আছে—যাহা পৈতৃক-লক্ষণাক্রান্ত; ইহাতেই সন্ততির নিয়ম সূচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, খুবই সম্ভব যে, দ্বিতীয় পুত্রে এরূপ কতক-গুলি লক্ষণ বর্ত্তিয়াছে—যাহা ইংলণ্ডের জল-বায়ু মৃত্তিকার ফল; যেমন—কটা চুল—ধব্‌ধোবে শ্বেত বর্ণ—ইত্যাদি। এ গুলি পৈতৃক গুণ নহে—এমন কি, এই গুণ-গুলি দেখিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে লোকে সহসা ইংরাজ ঠাওরাইতে পারে। ইহাতেই সঙ্গতির নিয়ম সূচিত হয়। সন্ততির নিয়মে সাজাত্য সংঘটিত হয়—বাঙ্গালির পুত্র বাঙ্গালি লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইংরাজের পুত্র ইংরাজি লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইত্যাদি; সঙ্গতির নিয়মে বৈজাত্য সংঘটিত হয়—বাঙ্গালির পুত্র ইংরাজি লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইংরাজের পুত্র আমেরিকীয় লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইত্যাদি। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে একই পিতামাতার কোনো দুই পুত্রই সর্ব্বাংশে সমান নহে; কিন্তু আবার এটাও ঠিক্ যে, কোনো না কোনো অংশে একই পিতামাতার সকল পুত্রই সমান, কেননা পৈতৃকগুণ সকল পুত্রেই কোনো না কোনো অংশে বর্ত্তিতেছে। আধুনিক জীবতত্ত্বজ্ঞদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, নানা জাতীয় জীবগণের মধ্যে যেখানে যত সাজাত্য দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই সন্ততির নিয়মাধীন; আর, যেখানে যত বৈজাত্য দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্তই সঙ্গতির নিয়মাধীন।

ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, একই মৌলিক বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি (অর্থাৎ আদিম জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি) কাল ক্রমে বিশেষ বিশেষ নানা জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এবং এযাহা হইয়াছে—তাহা শুদ্ধ কেবল দুইটি নিয়মের প্রসাদাৎ (১) সন্ততির নিয়ম এবং (২) সঙ্গতির নিয়ম;—সন্ততির নিয়ম সাজাত্যের ভিত্তি-মূল; সঙ্গতির নিয়ম বৈজা-

ত্যের ভিত্তি-মূল। পূর্ব্বে আমরা দেখাই-ইয়াছি যে, বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি (সাধারণতঃ ধরিতে গেলে—জীবোৎপাদিকা-শক্তি) দুই অংশে বিভক্ত—(১) কৈন্দ্রিক শক্তি এবং (২) পারিধ শক্তি। প্রথমতঃ, যে বীজ যে-জাতীয় বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—সে বীজ শুদ্ধ কেবল সেই জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদনেই তৎপর—ইহাই কৈন্দ্রিক শক্তির পরিচায়ক; দ্বিতীয়তঃ জল-বায়ু-মৃত্তিকা—যাহার সহিত পূর্ব্বে ঐ-বীজটির কোনো সম্পর্কই ছিল না—এক্ষণে সেই জল-বায়ু-মৃত্তিকাই উৎপদ্যমান বৃক্ষের পুষ্টি সাধনে অহর্নিশি নিযুক্ত রহিয়াছে;—ইহাই পারিধ শক্তির পরিচায়ক। আম্র-বীজ চতুর্দ্দিকস্থ জল-বায়ু মৃত্তিকাকে আম্র-বৃক্ষে পরিণত করে—ইহা একপ্রকার ঐন্দ্রজালিক শক্তি; পর-বস্তুকে আত্মসাৎ করিবার এই যে শক্তি—ইহাই আম্র-বৃক্ষের কৈন্দ্রিক শক্তি; আর, আম্র-বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিণত হইবার শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকাতে বর্ত্তমান আছে—তাহাই আম্র-বৃক্ষের পারিধ শক্তি। কৈন্দ্রিক শক্তি সন্ততির নিয়মানুসারে বৃক্ষের সাজাত্য সমর্থনে প্রবৃত্ত হয়, এবং পারিধ শক্তি সঙ্গতির নিয়মানুসারে বৃক্ষের বৈজাত্য সংঘটনে প্রবৃত্ত হয়। কৈন্দ্রিক শক্তি দ্বারা বৃক্ষ বহির্বস্তু-সকলেতে আপনার গুণ সঞ্চার করে এবং পারিধ শক্তি দ্বারা বহির্বস্তু সকলের গুণে আক্রান্ত হয়। বৈজাত্য শব্দের অর্থ অনেকে ভুল বুঝিতে পারেন—মনে করিতে পারেন যে, সঙ্গতির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আম্র-বৃক্ষের জাতি একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া অবশেষে হয় তো এমনও হইতে পারে যে, আম্র-বীজ কোন্ দিন বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া কাঁটাল বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া বসিল। যদি সঙ্গতির নিয়ম একাকী সর্ব্বেসর্ব্বা হইত, তাহা হইলে এরূপ হইবার কোনো বাধা ছিল না; কিন্তু সঙ্গতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে সন্ততির নিয়ম অবিচ্ছেদে লাগিয়া থাকাতে ওরূপ অব্যবস্থিত জাত্যন্তর-সংঘটনের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। এই জন্য, বৈজাত্য যাহা ঘটিবার—তাহা আম্র-বৃক্ষের স্বজাতির গণ্ডি'র অভ্যন্তরেই ঘটে; সে গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া বৈজাত্য ঘটিতে পারে না। বিস্বাদু বন্য আম্রের জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কাল-ক্রমে তাহা যে সুস্বাদু ঔদ্যানিক আম্রে পরিণত হয়—তাহাই তাহার যথেষ্ট বৈজাত্য-সংঘটন; কেননা, বৈজাত্য-সংঘটন এবং সাজাত্য-সমর্থন, দুইই সমান আবশ্যক; কৈন্দ্রিক শক্তি এবং পারিধ শক্তি দুয়েরই সমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া; সন্ততির নিয়ম এবং সঙ্গতির নিয়ম দুয়েরই সমান-বলবত্তা। এইরূপে বৃক্ষের উৎপাদন-ক্রিয়ার অভ্যন্তরে আমরা তিনটি যুগলাঙ্গের সন্ধান পাইতেছি যথা—

শক্তি	নিয়ম	ফল
(১) কৈন্দ্রিক	(১) সন্ততি-প্রবণতা	(১) সাজাত্য
(২) পারিধ	(২) সঙ্গতি-প্রবণতা	(২) বৈজাত্য

এখন বক্তব্য এই যে, কৈন্দ্রিক এবং পারিধ শক্তি যাহা উল্লিখিত হইল তাহা দুই শক্তি নহে কিন্তু একই শক্তির দুই পৃষ্ঠ বা দুই অবিচ্ছেদ্য অবয়ব। এই উপলক্ষে দাক্তার সাল্জার্ তাঁহার একটি অতীব সারবান্ প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না;—

The modern exponents of evolution, represent their theory in such a manner, as if the eventual progressive variation of plants and animals, were simply the work of chance. Their theory is this: that inheritance is the standing law in the organic world; that consequently like should invariably beget like; that, as far as the inner economy of organisms

is concerned, there should be no deviation whatever from the parental form; that organisms are, however, invariably influenced, in their growth and development by their surroundings; while they are, on the other hand, possessed of the faculty of adapting themselves to the requirements of different surroundings; and that it is in virtue of the faculty of adaptation that deviations from the parent stock occur. Those deviations or varieties may either have less fitness to live and procreate, than the individuals of the original species, in which case, they would sooner or later be exterminated for want of food supply; as they could not sustain for long the struggle for existence against superior organisms: or, they—the new varieties—may be endowed with a greater fitness for existence, in which case, the original stock have to make room for them, according to the principle of the survival of the fittest. Whether a given species is to progress in its form and structure or not, would accordingly entirely depend upon the nature of the variety that happens to be produced under the pressure of altered environment. On the whole, it is conceded that the records of Geology unmistakeably show systematic progress; but it is alleged that this proves only, that the chance-productions of the fit varieties, have by far outlived those of less fiitness for life; but it does not prove as yet, that there is a natural, inner tendency, towards the invariable production of superior varieties.

Now I have argued this point at some other occasion and have shown that there is good reason to believe that the tendency towards variation is by no means solely the outcome of the influence of surroundings, but is innate in every organism. The correct view on the subject of organic evolution, I have shown to be, that the phenomena of inheritence and variation, as characteristic of vital activity, are not the expressions of two, somewhat opposite, laws; but of one law, which might best be named, 'the law of diverging inheritance.' It is a law, according to which a living organism tends to propagate, not its exact likeness, but its similar. As proof of the correctness of my contention, I have pointed to the fact mentioned as a matter of curiosity by Darwin, that both animals and plants deteriorate when kept for generations under the same influence of soil and climate. In the case of animals, the advantage to be derived from crossing is well known to every breeder. This then goes to show that the tendency towards variation, far from being impressed upon living beings by some foreign, unfavourable condition, is innate in them, and that the outward conditions help only to realise an instinct that is essential; so essential, indeed, that the species of plants or animals placed beyond the reach of its realisation, degeneatates, and in the long run, perishes.

অতএব সন্ততি-প্রবণতা এবং সঙ্গতি-প্রবণতা এই যে দুইটি জৈবিক নিয়ম তাহা একই নিয়মের দুইটি পৃষ্ঠ—সে নিয়ম আর কিছু নয়—"বিক্রিয়মান সন্ততির নিয়ম" (Law of diverging inheritence) বিক্রিয়মান অর্থাৎ ক্রমশই বিকারোন্মুখ; বিকার শব্দে সচরাচর ক্ষয়ের দিকে পরিণতি বুঝায়—কিন্তু বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ তাহা নহে,—বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ বিভিন্ন আকারে পরিণতি—বৈচিত্র্যে পরিণতি; এই অর্থে—সমস্ত জগৎই একই মূল প্রকৃতির বিকৃতি। নানাবিধ বীজের কৈন্দ্রিক জীবোৎপাদিকা শক্তি একই মৌলিক জীবোৎপাদিকা শক্তির বিভিন্ন পরিণাম; আর, মৌলিক জীবোৎপাদিকা শক্তি যাহা বিশেষতঃ আদিম জীবে বর্ত্তমান ছিল এবং সাধারণতঃ সকল জীবেই অদ্যাপি বর্ত্তমান, ও পারিধ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান—এই যে দুই শক্তি (মৌলিক এবং পারিধ শক্তি) এ দুই শক্তি একই শক্তির এ-পিট ও-পিট। অণ্ডের প্রথম অবস্থায় তাহার অভ্যন্তরে একই প্রকার সদৃশাকার উপাদান সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকে—ক্রমে তাহার একস্থানে একটি ক্ষুদ্র জীবাঙ্কুর (Nucleus) পরিস্ফুট

হয়; সেই জীবাঙ্কুরটিই অবশিষ্ট অণ্ড-দ্রব্যের ভোক্তা, এবং অবশিষ্ট অণ্ড-দ্রব্য সেই জীবাঙ্কুরটির ভোজ্য সামগ্রী। এ যেমন একটি ব্যাপার—তেমনি, জল-বায়ু মৃত্তিকার একাকার অবস্থা ভিন্নাকারে পরিণত হইয়া বীজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—ইহাই উপমা সঙ্গত। বীজের সহিত জল-বায়ু মৃত্তিকার যে একটি পোষ্যপোষক সম্বন্ধ আছে—তাহা অবশ্য জল-বায়ু মৃত্তিকা এবং বীজ উভয়ের গোড়ার বৃত্তান্ত-হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সেই মূল-স্থানে অবশ্য কৈন্দ্রিক এবং পারিধ দুই শক্তিই একীভূত—অণ্ডের অভ্যন্তরে ভোক্তা এবং ভোজ্য-সামগ্রী দুইই একত্রে অবস্থিতি করে—দুইই গোড়ায় এক। বিশাল ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গম প্রদেশে এপার-হইতে ওপার দেখা যায় না—কিন্তু গোমুখীর মুখরন্ধ্রে দুই পার একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তেমনি, ভাবিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয় যে, একই মূল-শক্তি প্রথমত, বীজকে আর আর ভৌতিক পদার্থ হইতে বিশেষিত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, বীজের অভ্যন্তরে তাহা কৈন্দ্রিক বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত হইয়াছে—এবং জল-বায়ু-মৃত্তিকার অভ্যন্তরে পারিধ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। গোড়া'র সেই যে জীবোৎপাদিকা-শক্তি—যাহা সাধারণতঃ সর্ব্বজগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে—কোন স্থানেই যাহার কার্য্যের বিরাম নাই—তাহাই জৈবিক প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। ভৌতিক প্রকৃতি কি—তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি (আকর্ষণ-বিকর্ষণ); জৈবিক প্রকৃতি কি তাহা আমরা এক্ষণে দেখিলাম—সন্ততি-প্রবণতা এবং সঙ্গতি-প্রবণতা; অতঃপর মানসিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখা যাউক্; এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন লক্ষণের অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা মূল-প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ সর্ব্বশেষে স্থিরীকৃত হইবে। শ্রীদ্বি]

সমাজ সংস্কার ও জাতীয়ভাব।

আজ কাল যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষার আলোক লাভ করিয়াছেন এবং শিক্ষোপার্জ্জিত জ্ঞানকে যাঁহারা জীবনে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই সংস্কারেচ্ছুক। বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি অতি গুরুতর বিষয়ে আজ কাল আমরা যাকে তাকেই বাদ প্রতিবাদ করিতে দেখি। এই সংস্কারের ভাব এক-প্রকার দেশব্যাপ্ত দেখিতে পাই। এক দল নূতন শিক্ষা, নূতন জ্ঞান ও নূতন আলোক লাভ করিয়া প্রাচীনকালের চিরপূজ্য প্রথা সকলকে সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজে অশান্তি কোলাহল আনয়ন করেন। আর একদল চিরসেবিত প্রথার মোহে মুগ্ধ হইয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনাকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করিয়া প্রাণপণে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। মনুষ্য জীবনে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত, দোষের সংশোধন না থাকে, তবে তাহা মনুষ্য জীবন নহে। উন্নতি পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে, পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে উন্নতি অসম্ভব। মনুষ্য প্রকৃতি নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। যত দিন নদী স্রোতস্বতী তত দিনই তাহার জীবন, তত দিনই তাহা মানবের স্বাস্থ্যের নিদান। কি ব্যক্তিগত

চরিত্রে, কি সামাজিক চরিত্রে, যতদিন জ্ঞান ও উন্নতিস্রোত প্রবাহিত থাকে, যতদিন তাহার আত্ম সংশোধনের স্পৃহা ও ক্ষমতা থাকে, তত দিনই তাহা নিরন্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। যাঁহাদের কিছুমাত্র বিবেচনাশক্তি ও উন্নতিলাভের ইচ্ছা আছে তাঁহারা একথার স্বার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু যাঁহারা য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণে সমাজ সংস্কার করিতে চান, বিলাতে ইহা আছে, অতএব এখানেও না হইবে কেন, এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি। অনুকরণ প্রিয়তা সর্ব্বথা দূষণীয় নহে—কিন্তু অনুকরণ মাত্রেই প্রার্থনীয় নহে। দেশ কালের প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া অনুকরণ করিলেই উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর আলোকে পড়িয়া অনেক সময় আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তখন যাহা কিছু পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, যাহা কিছু বিলাতী ধরণের, তাহাই আমরা আদর্শ মনে করি, এবং তদ্বিপরীত যাহা কিছু দেশীয়, তাহা আমাদের জীবনের মঙ্গলজনক ও নির্দ্দোষ হইলেও আমাদের নিকট উপেক্ষিত হয়। ফলতঃ, একটি কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে গিয়া আর একটি কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া প্রার্থনীয় নহে। একটি কথা আছে "In order to do what is right, we must know what is right. অর্থাৎ কুসংস্কার দূর করিবার পূর্ব্বে কোন্‌টা কুসংস্কার জানা আবশ্যক। অনেক সময় বিদেশীয় সভ্যতার বাহ্য শোভা ও চাকচিক্যময় উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমরা দেশীয় স্নিগ্ধ মনোরম আমাদের প্রকৃতির যথোপযুক্ত অথচ দোষশূন্য সামাজিক প্রথা-গুলিকে পদদলিত করিয়া সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হই। ইহা আমাদের ভয়ানক ভ্রম সন্দেহ নাই। যাহা কিছু দেশীয়, তাহাই অপকৃষ্ট নহে, এবং যাহা কিছু বিলাতী আমদানী তাহাই উৎকৃষ্ট নহে। দূষণীয় প্রথা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ হিতকর প্রথা প্রবর্ত্তিত করাই সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য। কিন্তু হঠকারিতা দোষে এই উদ্দেশ্য অনেক সময় সিদ্ধ হয় না।

আমরা সংস্কারের বিরোধী নহি, কিন্তু নির্দ্দোষ জাতীয়ভাব—যাহা আমরা রক্ষা করিয়া ভারতীয় সভ্যতা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে পারি, সেগুলিকে পরিত্যাগ করা আমরা স্বদেশবৎসলতার লক্ষণ মনে করি না। ভারতের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, ভারতীয় ঋষিদিগের বংশধর হইয়া যদি আমরা জাতীয় ভাব স্মরণ ও রক্ষা না করি, জাতীয় গৌরব, জাতীয় মহত্ত্ব চিন্তা না করি, তবে এ অসার সভ্যতাতে আমাদের আত্মার কি কল্যাণ হইবে? যে সভ্যতা কেবল বেশ ভূষার পারিপাট্য সাধনে তৎপর, যে সভ্যতা মানব চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল শারীরিক সুখ লালসার সুবিধা প্রদান করে, আমরা সে সভ্যতা প্রার্থনা করি না। বাহিরের শোভা সৌন্দর্য্যের সভ্যতাতে ভারতের উন্নতি হইবে, ইহা মনে করি না। শরীর আমাদের যাবৎ নহে, আত্মার কল্যাণই আমাদের লক্ষ্য।

একশ্রেণীর সংস্কারক আছেন, যাঁহারা "জাতীয়" "দেশীয়" এই সকল কথা শুনিলেই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। তাঁহারা বৈদেশিক ভাবে এতই অন্ধ, যে দেশীয় কিছুই ভাল দেখিতে পান না। ভাষা, পরিচ্ছদ আহার ব্যবহারাদি বিষয়ে ইহাঁ-

দের স্বদেশের প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁরা বৈলাতিক অনুকরণেই তৎপর। কিন্তু অনুকরণ মাত্রই উন্নতি নহে—একথা ইঁহারা বুঝিতে পারেন না।

বিশুদ্ধ জাতীয়ভাব গুলি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কারের স্রোতে ভাসিয়া যায়, এই আমাদের আশঙ্কা। আমাদের আশঙ্কা অমূলক নহে। আমরা অনেক সময় সংস্কারোৎসাহী ব্যক্তিগণকে উত্তেজিত ভাবে কার্য্য করিতে দেখি। কোন জিনিস একবার মন্দ বলিয়া জানিলে, এবং মন্দ জানিয়া পরিত্যাগ করিলে, উত্তরোত্তর তাহা বিদ্বিষ্টই হইয়া থাকে। তাহার ভিতরে কোন ভাল ভাব আছে কি না, তাহা আমরা আর ফিরিয়া দেখিতেই ইচ্ছা করি না। নূতনের উজ্জ্বলতায় তখন এতদূর মুগ্ধ হইয়া যাই, যে পুরাতন মাত্রই মন্দ বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে যুবকেরা যখন সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দু সমাজের প্রাচীন রীতি নীতির উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; শুনিতে পাই তখন তাঁহারা উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে, সংস্কারের নামে অনেক হাস্যকর ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই প্রকার সংস্কার আমরা অন্যায় মনে করি। যে শিক্ষা ও সভ্যতাতে আমাদের অন্তর্নিহিত সদ্ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয় ও দোষগুলি নির্ম্মূল হয়, সেই শিক্ষা ও সভ্যতা প্রবর্ত্তনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে সকল সামাজিক রীতি পদ্ধতির দোষে আমাদের অনিষ্ট হইতেছে তাহা দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু সংস্কারের নামে বিকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে সমাজ গঠন করিতে গিয়া আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী হইও না। প্রাচীন ভারতের গুণ গৌরবে, আমরা বঞ্চিত হইয়াছি বটে, কিন্তু ভারতীয় হৃদয় আমরা বিসর্জ্জন দিই নাই। দয়া, স্নেহ, মমতা শ্রদ্ধাভক্তি প্রভৃতি কোমল গুণগুলি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বিশেষতঃ হিন্দু মহিলার স্নেহপ্রবণ হৃদয় জগৎপ্রসিদ্ধ। আমরা যেন পরিবর্ত্তন স্রোতে এই সকল সদ্‌গুণ হারাইয়া না ফেলি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে স্বদেশ বিদেশের জ্ঞানালোচনা করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনেই যেন আমরা যত্ন করি। বিলাতে এই প্রথা আছে, আমাদের দেশে কেন থাকিবে না, ইহার পরিবর্ত্তে উক্ত প্রথা রীতি নীতি আমাদের জাতীয় প্রকৃতির যতদূর অনুকূল ইহাই যেন সকলে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

জীবন্মুক্তি।

কুলার্ণব তন্ত্রোক্ত।

ধীমান ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস পূর্ব্বক তত্ত্ব জানিয়া ধ্যান্যার্থী যেমন পলাল (খড়) পরিত্যাগ করে সেইরূপ সকল শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অমৃতে পরিতৃপ্ত তাহার আহারে প্রয়োজন হয় না; যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ তাহার শাস্ত্রে আর প্রয়োজন থাকে না। বেদাধ্যয়নে মুক্তি নাই শাস্ত্র পাঠেও মুক্তি নাই কেবল জ্ঞানেই মুক্তি হয়। আশ্রম সকল মুক্তির কারণ নয় দর্শন শাস্ত্র সকল মুক্তির কারণ নয় জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ, তদ্ভিন্ন ইহা অন্যরূপ কোন উপায়ে হয় না। অদ্বৈত জ্ঞানই মঙ্গলজনক, ইহাতে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কোন সংশ্রব নাই। সেই অদ্বৈত জ্ঞান গুরুমুখ হইতে গ্রহণ করিবে, ইহা

কোটি কোটি শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান দুই প্রকার শাস্ত্র জনিত ও বিবেক জনিত, শাস্ত্র জনিত জ্ঞানে শব্দ ব্রহ্ম আর বিবেকজনিত জ্ঞানে পর ব্রহ্ম লব্ধ হইয়া থাকেন। কেহ কেহ অদ্বৈত কেহ কেহ বা দ্বৈত ইচ্ছা করেন কিন্তু হে দেবি আমার তত্ত্ব যে দ্বৈত ও অদ্বৈত বর্জ্জিত তাহা তাহারা জানে না। বন্ধন ও মোক্ষের নিমিত্ত দুইটী পদ আছে মম আর নির্ম্মম। তন্মধ্যে মম হইতে জীব বদ্ধ হয় এবং নির্ম্মম হইতে মুক্ত হয়। তাহাই কর্ম্ম যাহা বন্ধের নিমিত্ত নয় এবং তাহাই বিদ্যা যাহা মুক্তির নিমিত্ত হয়। যাবৎ কামাদি রিপু প্রবল থাকে তাবৎ মনুষ্যের সংসার বাসনা জাগরূক। যাবৎ ইন্দ্রিয় চাপল্য থাকে তাবৎ তত্ত্ব কথা আর কোথায় স্থান পাইবে। যাবৎ প্রযত্নবেগ থাকে তাবৎ নানা রূপ সংকল্প হয় আর যাবৎ মনের স্থৈর্য্য না হয় তাবৎ তত্ত্ব কথা আর কিরূপে স্থান পাইবে। যাবৎ দেহাভিমান তাবৎ মমতা আর যাবৎ গুরুর করুণা উদয় না হয় তাবৎ তত্ত্ব কথা কিরূপে লব্ধ হইবে। ফলত যাবৎ তত্ত্ব না জানিতে পারে তাবৎ পর্য্যন্তই তপস্যা ব্রত তীর্থ জপ ও হোমাদির অনুষ্ঠান জানিবে। অতএব যদি আপনার সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সকল অবস্থায় সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তত্ত্বনিষ্ঠ হইবে। ধর্ম্মজ্ঞান যার পুষ্প, ব্রহ্মলোক যার ফল, ত্রিতাপ সংতপ্ত ব্যক্তি সেই মোক্ষতরুর ছায়াকে আশ্রয় করিবে। প্রিয়ে, অধিক আর কি বলিব, আমি সত্যই কহিতেছি, জ্ঞান ব্যতীত মনুষ্যের মুক্তি প্রাপ্তির অন্য পথ নাই অতএব সেই জ্ঞান উপার্জ্জনে জীবের সর্ব্বদা যত্ন করা কর্ত্তব্য।

প্রার্থনা।

হে শান্তিদাতা প্রেমদাতা পরম করুণাময় পিতা! তুমি আমাদিগের সমস্ত পাপ তাপ জ্বালা পরিশমিত করিয়া আমাদিগকে পরম শান্তি দিবার নিমিত্ত উন্মুখ রহিয়াছ, তোমার প্রেম অজস্রধারে আমাদিগের উপর বর্ষণ করিতেছ, আমাদিগকে তোমার দিকে নিয়তই আকর্ষণ করিতেছ। কিন্তু আমরা বিষয়-মোহে এমনই বিমূঢ় ও হত-চেতন যে পাপ মলিনতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তির প্রার্থী হইয়া তোমার নিকট যাই না; তোমার সহিত জীবন সংবদ্ধ করিতে চাহি না, তোমার সহবাস-সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হই না, তোমার অনুপম দয়া দেখিয়াও দেখি না। আমরা আপনাদিগের দোষেই জীবনে কলঙ্ক ও বিষাদ-ভার বহন করিতেছি। তুমি সকলের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তি-সুধা সর্ব্বদা বিকীর্ণ করিতেছ কিন্তু আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য আমরা তাহা ভোগ করিতে পারি না! যেমন নিদাঘ কালীন অশ্বত্থ বা বট বৃক্ষের ছায়া স্বভাবতঃ সকল জনগণের সন্তাপ-হারিণী ও আরাম-প্রদায়িনী হইলেও,যে ব্যক্তি নিদারুণ শোকগ্রস্ত বা বিকার রোগ যাতনায় নিরতিশয় অস্থির সে সেই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া আপনার অন্তস্তাপের কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি স্বীয় পাপ জন্য অনুতপ্তচিত্তে তোমার নিকট ক্রন্দন করে নাই, তুমি যাহার পাপ মার্জ্জনা করিয়া যাহার আত্মাতে স্বীয় প্রসাদামৃত বিতরণ কর নাই, যাহার চিত্ত বিষয় জন্য প্রধাবিত, প্রবৃত্তি বিশেষ দ্বারা দাসীকৃত, যে অমূল্য জীবন আলস্যে বা বৃথা কর্ম্মে ব্যয়িত করে, যে

অকিঞ্চিৎকর কাচ মূল্যে আপনার সময় ধন বা ক্ষমতার বিনিময় করিতেছে, যাহার একান্তে তোমাতে গতি মতি হয় নাই, সে কি প্রকারে তোমার শান্তি-সুধা আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে? যে সাধক তোমার সুমধুর প্রেম ও ভক্তি যোগে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করে, যাহার অন্তঃকরণে তোমার স্মৃতির কদাপি অপলাপ হয় না, যে তোমাকে আপনার জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, ও তোমাকে লাভ করাই আপনার পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানে, যে তোমার অনুমোদিত কর্ম্ম আপনার কর্ত্তব্য বোধে তদ্বিষয়ক সিদ্ধি অসিদ্ধি, ফলাফল, লাভালাভ জয় পরাজয় গণনা না করিয়া একান্তমনে তাহাতে প্রবৃত্ত থাকে, তোমাতেই মনঃপ্রাণ সন্নিবেশিত করে, ও তাহার ফলস্বরূপ তোমাতেই অবস্থিতি করে—সে ভিন্ন আর কে তোমার পথের পথিক হইতে পারে—সে ভিন্ন আর কে তোমার শীতল সহবাস অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে?

হে স্বপ্রকাশ! হে সুলভ-দর্শন! যেমন প্রাতঃকালে গৃহের বাতায়ন সকল খুলিয়া দিলে তদ্দ্বারা সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া গৃহ আলোকিত হয়, সেইরূপ আত্মার গবাক্ষ—তোমার প্রতি পিপাসা স্পৃহা, তোমার সহবাসের আশা ইচ্ছা প্রভৃতি—উন্মোচন করিলে তোমার অনুপম প্রেমমুখ দেখিতে পাই—তোমার সুধাময় আবির্ভাব দ্বারা আত্মা পরিপ্লুত হয়। হে হৃদয়েশ্বর! তোমার সত্তা, তোমার আবির্ভাব, তোমার অপরূপ অরূপ রূপমাধুরী যেন আমরা হৃদয়ে নিয়ত প্রত্যক্ষ করি। তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার উৎসাহ জনন প্রেমানন সন্দর্শন করিয়া তোমার কার্য্য যেন দ্বিগুণতর উদ্যম সহকারে সম্পন্ন করি। তুমি আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনের কার্য্য বলিয়া দাও। জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় শরীরকে কবলিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, জীবন সচ্ছিদ্র কলসের জলের ন্যায় ব্যয়িত হইতেছে। অতএব আর আলস্য ও বিলম্ব না করিয়া তুমি যে কার্য্যের ভার আমাদিগের প্রত্যেককে দিয়াছ তাহা যেন সহিষ্ণু ও সানন্দচিত্তে বহন করি। যখন সংসারচক্রে ঘূর্ণমান হইয়া সুখ দুঃখে, সম্পদে বিপদে পরীক্ষা প্রলোভনে নিপতিত হই, তখন সেই সেই অবস্থায় মুহ্যমান হইয়া তোমার প্রতি ও লোকের প্রতি কর্ত্তব্য যেন ভুলিয়া না যাই। আমরা যেন তোমার জন্য লোকের জন্য সাধ্যানুসারে স্বার্থত্যাগ করিতে পারি এমত প্রেমবল আমাদিগের হৃদয়ে প্রেরণ কর।

হে নাথ! তুমি আমাদিগের প্রত্যেককে তোমার দিকে অগ্রসর হইবার—জ্ঞান পুণ্য বিবেক পবিত্রতা উপার্জ্জন করিবার উপায় বলিয়া দাও। তুমি যে মুক্তির ইচ্ছা দিয়াছ, তাহার চরিতার্থতা যেন এই খানেই কিয়দংশ সম্পন্ন করিতে পারি। তুমি আমাদিগের ইহকালের ও অনন্ত জীবনের উপজীব্য জানিয়া তোমাকে লাভ করিবার জন্য যেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উদ্যুক্ত থাকি।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ পরমহংস দেবের জীবন চরিত্র বাল্য গৃহ ত্যাগ।

এই সুখ-দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবনারায়ণ দেবের বয়ঃক্রম যখন ৫ বৎসর হইল তখন হইতে তাঁহার মনে

সর্ব্বদা এই ভাব উদয় হইতে লাগিল যে আমি কে? আমার স্বরূপ কি? এবং— শুনিতে পাই সকলে বলেন পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আছেন—তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়; তাঁহার স্বরূপ কি? আমি কি স্বরূপ হইয়া তাঁর কি স্বরূপের ভাবনা এবং উপাসনা করিব? তাঁর উপাসনা করিলে কি হয় এবং না করিলেই বা কি হয়? আমি এতদিন কোথা ছিলাম কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথা যাইতে হইবে? আমার কি করা কর্ত্তব্য? এবং যাঁহার গৃহে আমি শরীর ধারণ করিয়াছি সেই মাতা পিতা আমার এই শরীর (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি) নির্ম্মাণ করিয়াছেন না অন্য কেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কিম্বা আমি নিজে আপনার শরীরকে নির্ম্মাণ করিয়া শরীর ধারণ করিয়াছি? যদি আমি নিজে এই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিকে রচনা করিয়া থাকিতাম তাহা হইলে আমার মনে থাকিত কিন্তু আমার তো মনে নাই যে আমি রচিয়াছি। যদ্যপি আমি এই সকল রচিতাম তাহা হইলে আমিই নষ্ট করিতে পারিতাম। তবে আমার ভ্রম হয় কেন? তিনি এই ভাবিতে ভাবিতে যে মাতার উদরে শরীর ধারণ করিয়াছেন, সেই মাতা—যাঁহার নাম গঙ্গাদেবি—তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে মাতঃ আপনি আমার এই শরীর ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া উদরে ধারণ করিয়াছেন না অপর কেহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার উদরে রাখিয়া দিয়াছেন? যদি অপর কেহ রাখিয়া থাকেন তবে সে ব্যক্তি কোথায়? আমি আপনার নিকট আমার মনের কোন কপটতা প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি না। কেন যে আমার মনের ভাব এরূপ হইতেছে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। কোন্ ব্যক্তি যে আমার অন্তর হইতে এরূপ ভাব উদয় করাইয়াছেন, হে মাতঃ তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। মাতা বিচার না করিয়া বলিলেন যে আমার কুলে এই বয়সে পাগল পুত্র জন্মাইল। তখন তাঁহার নিকট তাঁহার মধ্যম পুত্র বসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁহাকে মাতা বলিলেন যে, "হে পুত্র তুমি তোমার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আন। তিনি আসিয়া দেখুন যে তাঁহার পুত্রের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। পিতার নাম ব্যাসদেব। তিনি বাটীতে আসিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন ও গঙ্গাদেবী তাঁহাকে সকল অবস্থা বলিয়া দিলেন। পিতা ব্যাসদেব ভাবিলেন যে, পুত্রের অবস্থা বড় ভালও দেখিতেছি না বড় মন্দও দেখিতেছি না"—এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণকে ধমকাইয়া দুই এক চড় দিয়া বলিলেন যে, "এখন হইতে তুমি কি পাগলামি আরম্ভ করিয়াছ? এখন হইতে তোমাকে প্রত্যহ পাঠশালায় পড়িতে যাইতে হইবে এবং ওঁ সৎ গুরু এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং অগ্নিতে নিত্য আহুতি দিতে হইবে। এবং প্রাতে ও সায়ং কালে উঠিয়া চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে ও হাত জুড়িয়া নম্রভাবে জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে বলিবে যে হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা আমার সকল অজ্ঞানতা দুঃখ মোচন করিয়া জ্ঞান প্রদান করুন যাহাতে আমি সর্ব্বদা আত্মা পরমাত্মাতে অভেদ জ্ঞান করিয়া সদা পরমানন্দে থাকি। এই সকল কথা শিবনারায়ণ পিতার কাছে শুনিয়া পিতার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। ওঁঙ্কার জপিতে এবং আহুতি দিতে ও জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে

নমস্কার করিতে স্বামি-জি'র যত প্রীতি হ-ইত বিদ্যাভ্যাসে তত প্রীতি হইত না এবং ক্রমে ক্রমে ভিতর হইতে তেজ এবং জ্ঞান প্রকাশ হইতে লাগিল এবং আনন্দ উদয় হইতে লাগিল। বিদ্যাভ্যাস না করাতে শিক্ষক মধ্যে মধ্যে মারিতেন এবং বলি-তেন যে বড় মূর্খ ছেলে। শিবনারায়ণ দেব মনে মনে বলিতেন যে, "বিদ্যাভ্যা-সের তো এই ফল প্রত্যক্ষ দেখা যাই-তেছে যে তিনি আমার মনের ভাব না বুঝিয়া আমাকে মারিতেছেন ও মূর্খ বলি-তেছেন। কেবল বিদ্যাভ্যাসের তো এই ফল দেখিতে পাইতেছি সকলে পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেছেন এবং ব্যবহার কার্য্যে কিসে দশ টাকা উপার্জ্জন হইবে তাহার চেষ্টা করিতেছেন এবং অহংকার প্রযুক্ত আমি পণ্ডিত আমি ধনী বলিয়া আপন আপন মহত্ত্ব দেখাইতেছেন কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে কি চেষ্টা করিতেছেন? এই তো দেখিতে পাইতেছি যে যিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তিনিও আহারাদি করিতেছেন এবং প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস না করিতেছেন তিনিও আহারাদি করিতেছেন এবং তাঁ-হারও প্রাণত্যাগ হইতেছে কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা করি-তেছেন তিনি সৎ অসতের বিচার করিয়া ব্যাবহার কার্য্য উত্তম রূপে চালাইতে-ছেন। ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিষয় বুঝা যায় এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা না করে তাহার সৎ অসতের বিচার না থা-কাতে কষ্ট ক্লেশে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক, নতুবা যাঁহার অন্তর হইতে বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার আর বিদ্যা শিক্ষার আব-শ্যক করে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে আদি মধ্য এবং শেষে বিদ্বান এবং মূর্খের স্বরূপে একই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তির যেমন আদি জন্মের অবস্থার স্মরণ নাই যে আমি কে ছিলাম এবং শেষের মৃত্যুর অবস্থারও কোনো জ্ঞান নাই যে কখন মৃত্যু হইবে এবং যখন প্রত্যহ গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন, তখনও তাঁহার স্মরণ থাকে না যে আমি মূর্খ কি পণ্ডিত এবং পণ্ডিতেরও কোনো খবর নাই যে আমি কে ছিলাম এবং শেষে যে আমার মৃত্যু কোন্ মুহূর্ত্তে হইবে এবং কোন্ ঘরে জন্ম হইবে তাহারও বোধ নাই এবং গাঢ় নিদ্রাতেও তাঁহার এ বোধ থাকে না যে আমি পণ্ডিত ছিলাম কি মূর্খ ছিলাম। ফলতঃ দুই ব্যক্তিরই একই ভাব ঘটে। শিবনারায়ণ দেবের মনে এইরূপ ভাব সর্ব্বদা উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার যজ্ঞো-পবীত দিলেন। শিবনারায়ণ আপনার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে "কি যন্ত্রণা! পিতা মাতা কেন আমাকে পশুর মতন গলায় সুতা লাগাইয়া বন্ধন করি-লেন। মল মূত্র পরিত্যাগের সময় স-র্ব্বদা তাহা কর্ণে তুলিতে হইত এবং তাহাতে বিরক্তি জন্মাইত। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তিনি তো এই যজ্ঞোপবীত দেন নাই। তিনি যদ্যপি যজ্ঞোপবীত দি-তেন এবং যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইত তবে তিনি আমার যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানাইয়াছেন সেইরূপ যজ্ঞোপবীত ও আমার শরীর একত্রে গঠন করিয়া জন্ম দিতেন তবে তিনি গড়েন নাই। এবং কেহ কোনো জ্ঞানবান পুরুষকেও এরূপ জালে আবদ্ধ করিতে পারিবেন না। এ

সকল ব্যাপার কেবল সামাজিক নিয়মের একটি চিহ্নমাত্র। যেমন এক একটী সাধু আপন আপন সমাজের এক একটী চিহ্ন রাখে যাহাতে জানা যায় যে এই সমাজের এই সাধু। কিন্তু যদি উপরের নানা সাজ ফেলিয়া স্বরূপতঃ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে একই দাঁড়ায়।" এই সমস্ত বিষয় শিবনারায়ণ মনে মনে বুঝিয়া আপন অন্তরেতেই গোপন রাখিলেন কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না, কেন না অবোধ ব্যক্তিদের নিকট বলিলে তাহারা না বুঝিয়া উপহাস করিবে এবং মনে মনে কষ্ট অনুভব করিবে।

শিবনারায়ণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, "এখন যজ্ঞোপবীত থাকুক না কেন, পরে দেখা যাইবে; আসল সার যে পরমার্থ বিষয়ের কার্য্য তাহা করা যাউক। এই ভাবিয়া তিনি সদা সর্ব্বদা পরমার্থ বিষয়ক কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং যখন এদিক ওদিক কোন স্থানে শুনিতেন যে সে স্থানে এক মহাত্মা বা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তখন মনে মনে বিচার করিতেন যে "বড় মহাত্মা সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ কি?" যে স্থানে সাধু মহাত্মার কথা শুনিতেন সেই স্থানেই তিনি যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতেন যে, "মহাত্মা সাধুটা কি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সমস্ত সাধুদের দেখা যায় সে সকল ত গৃহস্থদেরও আছে। যদ্যপি শরীরের নাম বা ইন্দ্রিয়ের নাম সাধু মহাত্মা হয় তাহা হইলে সে সকলও গৃহস্থদের আছে; তাহারাও কেন সাধু না হয়? কিম্বা যদি হাড় মাংস রক্ত সাধু হয় তাহা হইলে তাহাও তো গৃহস্থদের মধ্যে আছে কিম্বা যদি বাক্য সাধু হয় তাহা হইলে গৃহস্থেরাও তো বাক্য বলিতেছে। যদ্যপি বিভূতি (অর্থাৎ ছাই) গায়ে মাখিলে সাধু হয় তাহা হইলে তো শূকর মহিষ সকল কত ছাই কাদা মাখিয়া থাকে, তাহা হইলে তো উহারাও সাধু সন্ন্যাসী হইতে পারে। কিম্বা যদি মস্তকে জটা থাকিলে সাধু হয় তাহা হইলে তো বট বৃক্ষের বড় বড় জটা বাড়িতেছে—সেও তবে মহাত্মা সন্ন্যাসী। তবে যাহাকে যে বলে মহাত্মা সাধু তাহা কি লাল, কালো, পীত, না সাদা?" ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কোন এক সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মা সাধুর নিকট চুপ করিয়া কেবল বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যখন সকলে সাধুর নিকট হইতে আপন আপন বাটি চলিয়া যাইত তখন শিবনারায়ণ প্রীতিপূর্ব্বক করযোড়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, "হে মহাত্মা আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার মনের যে নানা প্রকার ভ্রম ও সংশয় উঠিতেছে তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। আপনাকে সকলেই সন্ন্যাসী মহাত্মা বলে, কিন্তু কেন বলে এবং মহাত্মা কি বস্তু?" মহাত্মা ক্রোধ-প্রযুক্ত বালক শিবনারায়ণকে লাঠি লইয়া মারিতে উঠিলেন এবং গালি দিয়া ২।১ চড় মারিয়া বলিলেন যে, তিন দিনের বালক গৃহস্থ হইয়া আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছিস্? শিবনারায়ণ তাঁহাকে কত বুঝাইলেন তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণকে ২।১ কিল মারিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং শিবনারায়ণের পিতার কাছে মহাত্মা যাইয়া বলিলেন যে আমাকে আপনার পুত্র শিবনারায়ণ বড়ই অন্যায় কথা বলিয়াছে। পিতাও শিবনারায়ণকে ২।১ কিল মারিয়া বলিলেন, "তুমি এমন মহাত্মাকে অন্যায় কথা বলিয়াছ তুমি দূর হইয়া যাও তোমার মরণ ভাল। শিবনারায়ণ এইরূপ অবস্থা

পন্ন মহাত্মার কাছে যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেখানেই তাঁহারা তাঁহাকে ভৎ-সনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন কিন্তু যথার্থ মহাত্মা এক একজন—যিনি শান্ত ধীর গম্ভীর নিষ্ঠাবান্ ভক্তিমান ন্যায়পর দয়া ও সন্তোষযুক্ত ও মিষ্টভাষী—এমন অবস্থাপন্ন পুরুষের কাছে গিয়া শিবনারায়ণ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় ঐ সকল যথার্থ মহাত্মারা মিষ্টবাক্যে আদর করিয়া শিব-নারায়ণকে বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন করিতে তোমাকে কে শিখাইয়া দিয়াছে, তাহা আমাকে বল, তাহা হইলে তোমাকে আমি বুঝাইয়া দিব; তুমি কি কার্য্য করিতেছ? শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আপনাকে যথার্থ বলিতেছি আমাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই—আমার অন্তর হইতে এই সকল ভাব উদয় হইতেছে। কে যে আমার অন্তর হইতে এই সকল ভাব উদয় করিতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না কিন্তু আমি নিত্য কর্ম্ম এই করি—নিত্য অগ্নিতে আহুতি দেই এবং চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে আত্মা মাতা পিতা গুরু ভাবিয়া অন্তরেতে তাঁহাকে নমস্কার করি এবং ওঁ সৎগুরু এই মন্ত্র উ-চ্চারণ করিয়া উপাসনা করি ইহা ব্যতীত আর কোন প্রপঞ্চ অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা আমি করি না। তখন সাধু মহাত্মা বলি-লেন যে, "হে শিবনারায়ণ যখন তোমাকে এই সকল কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে বলে নাই তোমার অন্তর হইতে উঠিতেছে তখন তোমাকে আমি বুঝাইতে পারিব না—তুমি স্বয়ং আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে; তোমাকে হাজার হাজার বার আমার নমস্কার—যে কুলে তুমি শরীর ধারণ করিয়াছ সে কুলে আমার নমস্কার।" শিবনারায়ণও মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া বাটীতে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া কিছু দিন পরে আপনার মাতা পিতাকে নম্র-ভাবে করযোড়ে বলিলেন যে, হে মাতা পিতা তোমাদের চারি পুত্র—তাহার মধ্যে আমাকে জান যে এক পুত্র মরিয়া গিয়াছে; আমাকে আজ্ঞা দেও। এই সৃষ্টি চরাচর রাজা প্রজা বড় কষ্ট পাইতেছে; আমাকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে—যাহাতে চরাচর সুখে থাকিতে পারে।

ক্রমশঃ।

THEISM IN INDIA.

SIR,—A little book has come into my hands, which ought to excite the profound interest of all who have watched the progress of enlightened religious thought in India. It is called "The Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore," and contains what he wishes to be his farewell words to the Brahmo Churches. His sands of life are running low, and his venerable voice will soon be hushed in the sweet rest which, by his faithful work, he has so well earned.

The Adi-Brahmo Somaj of which he has been for over fifty years the leading spirit and official president, was the pioneer of all the Brahmo Churches in India. Babu Keshub Chunder Sen was at one time working under Devendranath Tagore, but separated himself from the Adi-Brahmo Church on a questian of ceremonial, which he deemed one of principle. Subsequent events have shown how deplorable that separation was, for Babu Keshub, as we all know, suffered himself to be led away into all kinds of mysticism and dangerous forms of hero-worship.

Devendranath Tagore is distinguished for inflexibility of purpose and singleness of mind. He has but one ruling idea, so to speek, which is devotion of heart and life to God, and absolute fidelity to Him. His words of farewell breathe a holy and devout spirit, and are wisely filled with counsels of charity and peace and brotherly love. The work has been translated into English by Mr. Mohini M. Chatterji, of Calcutta.

Charles Voysey.
Ingurir May 18th, 1889.

আয় ব্যয়।

পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৪৯৬।৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৫৮১। ১০
সমষ্টি	৪০৭৭॥৶০
ব্যয় ...	১৫৫০॥৵১৫
স্থিত	২৫২৭ ৻৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৩২৪ ৶ ৫

মাসিক দান।

মহর্ষি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য মহাশয়
ব্রহ্ম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য ১৮০৯ শকের পৌষ হইতে ১৮১০ শকের মাঘ পর্য্যন্ত ৭০৲

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮০৯ শকের ফাল্গুন হইতে ১৮১০ শকের পৌষ পর্য্যন্ত ২২৲

সাম্বৎসরিক দান।

মহর্ষি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১০০৲

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া) ৮৲
শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী ৫৲
" ত্রৈলোক্যমণি দাসী ৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব (কোন্নগর) ৫৲
উক্ত বাবুর বনিতা ৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৲
" " মণিলাল মল্লিক ৪৲
" " দিননাথ অধ্যেতা ২৲
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ (চুঁচড়া) ২৲
" " লালবিহারি বড়াল ২৲
" " ক্ষেত্রমোহন ধর ১৲
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী ১৲
" " মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৲
" " রামলাল ঘোষাল ১৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ বর্ম্মণ ৫০৲
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৩৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র
(গড় খণ্ডরুই) ৫৲
দানাধারে প্রাপ্ত ২৮৶৫

৩২৪৶৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২০৪ ৻১৫
পুস্তকালয় ...	২৬৬৸৶ ৫
যন্ত্রালয় ..	৪৪৪॥৫
গচ্ছিত ...	১৮৪।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মুলধন	৩৬।৶০
দাতব্য ...	৩৬৲
সমষ্টি	১৪৯৬।৵১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৮৯৸৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫৯ ⁄৫
পুস্তকালয়	৭৩৸৶১০
যন্ত্রালয়	৪৭৯॥⁄৫
গচ্ছিত	৩৩৬ ⁄০
দাতব্য	১২৲
সমষ্টি	১৫৫০॥৵১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩রা ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রীলালবেহারি দে।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

৫৫৪ সংখ্যা ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মনুষ্যের স্বাধীনতা।

ঈশ্বর যেমন জড়জগতের রাজা, তেমনি তিনি আবার ধর্ম্মজগতের একমাত্র অধীশ্বর। দেব মনুষ্য, পশুপক্ষী সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলে তাঁহার শাসনে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করিতেছে। তাঁহার রাজদণ্ডভয়ে ব্যাকুল হইয়া অগ্নি সূর্য্য বায়ু মেঘ নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর রহিয়াছে ও মৃত্যু প্রধাবিত হইতেছে। মনুষ্য দুইটি উপাদানে জড়িত, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। ভৌতিক দেহ কঠোর ভৌতিক নিয়মের অধীন; জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, শ্রান্তি, ক্লান্তি, পীড়া ভৌতিক দেহের সহচর। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের শাসন সেরূপ নহে, মনুষ্যের আত্মা প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ঈশ্বরের শাসন আত্মার পক্ষে যার পর নাই মধুময়। এখানে বাধ্যতা নাই, কঠোর নিয়ম প্রণালীর অস্তিত্ব নাই। পিতামাতা দুর্ব্বল শিশু সন্তানের হস্ত ধারণ করিয়া যেরূপ পদচারণা শিক্ষা দেন, স্নেহের মধুর আহ্বানে তাহাকে আকর্ষণ করেন, তেমনি আত্মাকে ধর্ম্মপথে কল্যাণ পথে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাতে বিচরণ করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য বিধান করিবার জন্য পরম পিতা পরমেশ্বর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে ক্রমে ক্রমে বিকশিত করিতে থাকেন। বিমল আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিয়া আত্মার বল আত্মার শান্তি ক্রমশই বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

জড়জগত ঈশ্বরের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ, ইতর প্রাণীজগত তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট সংস্কারের অধীন। এতদুভয়ের সঙ্গেই তাঁহার অব্যবহিত যোগ। কিন্তু মনুষ্য এক অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত। মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও, ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের এক প্রকার ব্যবহিত যোগ। অপরাপর সকলেই আপনার প্রকৃতি প্রবৃত্তির অধীন, কিন্তু মনুষ্য স্বাধীন, মনুষ্য ইতর প্রাণীসামান্য সংস্কারেরও অধীন নহে, ভৌতিক জগতের কঠোর নিয়ম প্রণালীরও বশবর্ত্তী নহে। মনুষ্য আপনার স্বাধীনতা বলে, আপনার ইচ্ছার বলে

নিজ নিজ কার্য্যকলাপ নিয়মিত করিতে পারে, আপনার চেষ্টা উদ্যম ও সাধনার গুণে দেবপদবীতে আরোহণ করিতে পারে, আবার নিশ্চেষ্টতা ও নিরুদ্যমের দোষে দুষ্প্রবৃত্তির দুর্দ্দম্য তেজ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে পাপের স্রোত বহমান করিতে পারে। একদিকে ঈশ্বরের আদেশ, তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী, অন্যদিকে ভৌতিক বা ইতর প্রাণী জগতের একমাত্র ঐ সকল নিয়মেরই অধীনতা। ইহার মধ্যে স্বাতন্ত্রের ভাব নাই। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সেরূপ নহে। যদিও ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যদিও তিনি পুণ্যের সমান পুরস্কার, পাপের সমান দণ্ড বিধান করিতেছেন, যদিও তিনি পাপীকে নরক-যন্ত্রণায় বিদগ্ধ করিয়া পরিশেষে তাহাকে আপনার উদার ও পবিত্র ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে সংসারাতপের বহির্দেশে—অপার শান্তিসলিলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতেছেন, তথাপি তিনি বাধ্য করিয়া কাহাকেও কোন সময়ে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না, বা পাপের কুটিল হ্রদে নিক্ষিপ্ত করেন না। তিনি চান, তাঁহার সৃষ্টির ভূষণ প্রত্যেক নরনারী স্বীয় ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার পদতলে শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি পবিত্রতার বিমল কুসুম বিক্ষিপ্ত করে, তাঁহার পূজার্চ্চনা করে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করে। ঈশ্বর তাঁহাকে প্রীতি করা, তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই মনুষ্যের প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন, তাহার বিকৃতিতে অনুতাপ ও অশান্তির নিদারুণ যন্ত্রণা মনুষ্যকে বুঝিতে দিবার অবসর দিয়াছেন, কার্য্যাকার্য্য অনুষ্ঠান মনুষ্যের ইচ্ছার অনুগত করিয়া দিয়াছেন। অমিত-তেজা রাজা শত্রুকে পরাভবান্তে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিয়া যেমন তাহাকে চক্ষের সম্মুখে রক্ষা করেন, আপনার বিশ্বস্ত অনুচরে তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন, সামান্য বন্দীর ন্যায় তাহাকে নিগড়বদ্ধ না করিয়াও তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, ভোজন ভ্রমণ বিলাস বা তৃপ্তিসাধনে স্বাধীনতা দেন, তবে বন্দীর সে স্বাধীনতা ও মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বাধীনতায় বড় অধিক ইতর বিশেষ লক্ষিত হয় না। মনুষ্যকে ধর্ম্মভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া, সুদৃঢ় কর্ত্তব্য জ্ঞানে দীপ্তিমান করিয়া এবং আপনার চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তবে তিনি তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। তিনি চান যে তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যা সংসারের মোহ আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার সত্যসুন্দর মঙ্গলমূর্ত্তি দর্শন করে, আত্মার অভ্যন্তরে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে। তাঁহাকে জানিবার তাঁহাকে পূজার্চ্চনা করিবার অধিকার আর কাহারও নাই, এই উচ্চ অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে, ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। ইহারই জন্য মনুষ্য সৃষ্টির ভূষণ, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীন ভাবে, নিজ নিজ বলবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে সংসারে বিচরণ করিতে দিলেন। অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, অবসর ক্রমে আত্মায় শান্তিবারি সেচন করিতে লাগিলেন, অনুতাপের তুষানলে পাপ তাপকে ভস্মীভূত করিতে থাকিলেন। মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের পরিচয় আর অধিক কি হইতে পারে।

মনুষ্য যখন স্বাধীন ভাবে সংসারে বিচরণ করে, তখন "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ

মনুষ্যমেতঃ” শ্রেয় ও প্রেয় আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। উভয়েই আপনার দিকে মনুষ্যকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মনুষ্য কোন্ পথের পথিক হইবেন, শ্রেয় অপেক্ষা প্রেয় বা অকল্যাণ সামান্যত মনুষ্যের পক্ষে আপাতমধুর। মনুষ্য নিজে দুর্ব্বল, তাহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি প্রখর নহে, ভবিষ্যৎনিহিত শান্তিকল্যাণের জন্য স্থির ভাবে অপেক্ষা করা সাধারণ মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে না। মনুষ্য কোন্ দিকে যাইবেন, একদিকে পাপের আপাতমধুরতা অন্যদিকে পুণ্যের পরিণামমধুরতা ও স্বর্গীয় সুষমা। যত্ন চেষ্টা বলে চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদিত না হইলে কার সাধ্য মনুষ্যকে পুণ্যপথে ধরিয়া রাখিতে পারে। চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন কঠোর সাধন সাপেক্ষ, ইহাতে এক দিকে মনুষ্যের সাধনা চাই, অপরদিকে দেবপ্রসাদ চাই। চিত্তস্থৈর্য্য শিক্ষা সময়ে স্বর্গীয় আত্মপ্রসাদ হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে, এ শিক্ষা মনুষ্যের অসাধ্য হইয়া পড়িত। নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের ঘোর আবর্ত্তনে পতিত হইয়া সকলকেই বিনাশের পর বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইত। কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।

পাপ পুণ্য এই দুই কথার মধ্যে অনেক অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পাপের অর্থ আত্মার অশান্তি জড়তা বা অবনতি, অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং উহা হইতে পারিবারিক বা সাধারণের অমঙ্গল। পুণ্যের অর্থ আত্মার সুখ ও উন্নতি, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহা হইতে সাধারণের মঙ্গল। পাপে নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সুখের চরিতার্থতা, পুণ্যে আন্তরিক সাধু ভাবের স্ফুরণ ও সৎপ্রবৃত্তি নিচয়ের অব্যাহত ভাবে চরিতার্থতা। পুণ্যে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, পাপে মনুষ্যের পশুত্ব।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মপ্রবণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াও কেন তাহাকে অসৎ প্রবৃত্তির দ্বারা নীয়মান হইতে দেন, পাপানুষ্ঠানে সাধারণের অমঙ্গল কেন সংঘটিত হইতে দেন, কেন বা তাহাকে দুর্গতির শেষ সীমায় আনয়ন করেন। ইহার কি কোন মীমাংসা নাই। ইহাতে তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? কেমন করিয়াই বা আমরা তাঁহাকে পূর্ণমঙ্গলময় পিতা বলিতে পারি? নাস্তিকগণ যে সকল তর্কতরঙ্গ লইয়া ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এই প্রশ্ন তাহার অন্যতম।

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলেন যে মনুষ্য অপূর্ণ জীব, অপূর্ণ জীবের অপূর্ণতা চিরকালই থাকিবে, তাহার কার্য্যে ত্রুটি চিরকালই পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু ইহাই এ প্রশ্নের সদুত্তর নহে। মনুষ্য দুর্ব্বল ও অপূর্ণ এই দুইটি ফলত একই কথা। মনুষ্য অপূর্ণ বা দুর্ব্বল কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, যে দুর্ব্বল বা অপূর্ণজীব ভিন্ন কিছুই সৃষ্ট হইতে পারে না। তিনিই একমাত্র পূর্ণ, তাঁহার সৃষ্টপদার্থগুলি অল্প বা অধিক পরিমাণে অপূর্ণ, ফলত তিনি যে কি উদ্দেশ্যে কাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্টির মর্ম্মভেদ করা আমারদের ক্ষুদ্রশক্তির সাধ্য নহে। আমারদের অন্তরে সৎ ও অসৎ উভয় প্রবৃত্তিই বর্ত্তমান, আমারদের ইচ্ছাও স্বাধীন। মনুষ্যের সৎ ও অসৎ কার্য্য এই স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূত। যখন এই স্বাধীনতা ঈশ্বরের অধীনতার ছায়ায় থাকে তখন ইহা নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ উদ্গীরণ করে। ফলত ঈশ্বরের অধীনতাতে

স্বাধীনতাকে আনয়ন করাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

কেহ বলিবেন ঈশ্বর কি ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের অসদিচ্ছাপ্রসূত নরহত্যা, যুদ্ধ বিগ্রহ, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি দেশব্যাপী ও কালব্যাপী ঘোরতর অমঙ্গল হইতে তাঁহার সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তিনি ত সকলেরই অন্তরের ভাব সুস্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় সন্দর্শন করিতেছেন; যখন মনুষ্য পাপানুষ্ঠানে অগ্রসর হয়, তিনি ত ইচ্ছা করিলে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেন। তাহা হইলে ত অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারিত না। ইহা আপাতত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু আমারদের স্মরণ রাখা উচিত যে মনুষ্য স্বাধীন জীব, এই স্বাধীনতাই মনুষ্য সৃষ্টির বিচিত্রতা। সে আপনার ইচ্ছার বলে, সাধনার গুণে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া সাধুভাবের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করে। যদি মনুষ্য এরূপে প্রতিষ্ঠাবান হইতে না পারিল তবে তাহার উন্নততম মনুষ্য জন্ম ধারণের সার্থকতা কি? ঈশ্বর অন্যান্য জীবকে সংস্কারের অধীন করিয়া দিয়া কেবল মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিলেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার অন্তরে চিরমুদ্রিত করিলেন, আপনার দিকে কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য হিতাহিতজ্ঞানকে তাহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধর্ম্মের দিকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার শত শত অবসর তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিলেন, পুণ্যকর্ম্মের স্বর্গীয় আনন্দের স্বাদ তাহাকে গ্রহণ করাইলেন, পাপের নরকাগ্নির ভীষণ জ্বালার পরিচয় তাহাকে প্রদান করিলেন, সদনুষ্ঠানের ও আত্মোন্নতি সাধনের যাহা কিছু সম্বল তাহার সঙ্গে দিলেন, পাপের কুটিল হ্রদে পতিত হইলেও ভবিষ্যতে তাহার উদ্ধারের উপায় করিয়া রাখিলেন। এরূপ শত সহস্র উপায় বিধান করিয়া, অভেদ্য কবচে তাহার হৃদয়কে বেষ্টিত করিয়া পরে মনুষ্যের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। অন্য জীব জন্তুকে স্বীয় প্রকৃতি প্রবৃত্তির অধীন করিয়া দিয়া কেন যে তিনি মনুষ্যকে স্বাধীন করিলেন এ রহস্য কে আমাদিগকে বুঝাইবে।

প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ ॥

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[ঔদ্ভিদ প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখা গেল; এখন জৈবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা যা'ক্।

অচেতন প্রাণরাজ্য হইতে আমরা সচেতন প্রাণ-রাজ্যের (অর্থাৎ মনোরাজ্যের) চৌকাটে পদার্পন করিবামাত্রই অদৃষ্টপূর্ব্ব কতকগুলি নূতন ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি-পথে নিপতিত হয়; তাহা আর-কিছু নয়—অনুভব, স্মরণ, বাসনা, সংস্কার, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, এইরূপ কতকগুলি আন্তরিক ব্যাপার। অন্তর বাহিরের মধ্যে, মন এবং দেহের মধ্যে, আশয় (subject) এবং বিষয়ের (object) মধ্যে, ভেদাভেদ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে-একটি ব্যাপার—জীবরাজ্যেই তাহার প্রথম সূত্রপাত। বৃক্ষও জল পান করে—জীবও জল পান করে; কিন্তু পিপাসা অনুভব করিতে জীবই করে—বৃক্ষ পিপাসা'র কোনো ধার ধারে না; পরিপাক-শক্তি (অর্থাৎ বহির্বস্তু আত্মসাৎ করিবার শক্তি) বৃক্ষেরও আছে—জীবেরও আছে, কিন্তু ক্ষুধা অনুভব করিতে

জীবই করে—বৃক্ষ সে রসে বঞ্চিত; বৃক্ষেরও প্রাণ আছে—জীবেরও প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণের প্রতি আসক্তি (অর্থাৎ প্রাণের প্রতি মনের টান) জীবেরই আছে—বৃক্ষের নাই। শুধু কেবল প্রাণ থাকিলেই জীব হয় না—বৃক্ষেরও প্রাণ আছে; জীব হইতে গেলে—প্রাণ এবং প্রাণের প্রতি টান—দুইই পরস্পরের সহিত মাখামাখি ভাবে বর্ত্তমান থাকা চাই; কেননা, জীবের জীবত্ব = প্রাণ × প্রাণের প্রতি টান। দৃশ্যমান বিষয়ের সহিত দর্শন ক্রিয়া—ভোজ্যমান অন্নের সহিত ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিতোষ—ক্রিয়মান কার্য্যের সহিত স্ফূর্ত্তির সুখ অথবা শ্রমের কষ্ট, এক কথায়—বৈষয়িক (objective) ব্যাপারের সহিত আশয়িক (subjective) ব্যাপার, যাহা যখন লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়, তাহা কেবল জীবরাজ্যেই দেখা যায়—উদ্ভিদ্-রাজ্যে নহে। আশয়িক ব্যাপার-গুলি কোনো প্রকার ভৌতিক ব্যাপার নহে—কোনো প্রকার গতি নহে, স্পন্দন বা কম্পন বা নড়ন-চড়ন নহে; নড়ন-চড়ন বা কম্পন বৃক্ষের পরমাণুগণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে—কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-প্রভৃতি আশয়িক ব্যাপার-গুলি জীব-রাজ্য ভিন্ন আর কোনো রাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনো ব্যক্তি যখন আনন্দে নৃত্য করে, তখন শুদ্ধ কেবল নৃত্যের সম্বন্ধেই বলিতে পার যে, তাহা এক প্রকার গতি-ব্যাপার—তাহা দৈহিক অঙ্গ-চালনা; কিন্তু আনন্দটির সম্বন্ধে ওরূপ কথা বলিতে পার না;—এমন বলিতে পার না যে, আনন্দ একপ্রকার শারীরিক অঙ্গ-চালনা। আনন্দ যদি নৃত্যের ন্যায় অঙ্গ-চালনা হইত, তবে নৃত্যের যেমন তাল আছে আনন্দেরও তেমনি তাল থাকিত; তাহা হইলে—আমরা যেমন বলি "অমুক তালের নৃত্য," তেমনি আমরা বলিতাম "অমুক তালের আনন্দ!" কাব্যের অলঙ্কার প্রসঙ্গে কেহ যদি বলে যে, "চৌতাল আনন্দ" বা "আড়াঠেকা আনন্দ" তবে সে কথা স্বতন্ত্র; লোকে বলে "কি মিষ্ট কণ্ঠস্বর" কিন্তু তাহা বলিয়া কণ্ঠ-স্বর সত্য সত্যই কিছু আর চিনি বা গুড় বা মধু ইত্যাকার সামগ্রী-সকলের দল-ভুক্ত নহে। নৃত্যকেও আনন্দ বলিতে পারা যায় না, চাক্ষুষ-স্নায়ুর নৃত্যকেও দর্শন-ক্রিয়া বলিতে পারা যায় না। আনন্দ এক ব্যাপার,—আনন্দের নৃত্য আর-এক ব্যাপার; দর্শন এক ব্যাপার—দর্শন-কালীন স্নায়ু-নৃত্য আর-এক ব্যাপার; একটি—মানসিক ব্যাপার, আর-একটি—ভৌতিক ব্যাপার। উপরি-উক্ত স্থলে এরূপ কথা বলিতে পার যে, ভৌতিক ব্যাপার এবং মানসিক ব্যাপার দোঁহে দোঁহার সহিত মাখামাখি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু এরূপ কথা বলিতে পার না যে, ও-দুই ব্যাপার একই ব্যাপার। ফলে, ও দুয়ের—মাখামাখি ভাবে অবস্থিতি করিবারই কথা; কেন না, প্রকৃতি সর্ব্বত্রই নীচের সোপান মাড়াইয়া—নীচের সোপানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া—উপরের সোপানে পদ নিক্ষেপ করে; পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে এক লম্ফে পর্ব্বতের চূড়ায় উত্থান করে না;—গায়ক গম্ভীর খাদের স্বর হইতে এক লম্ফে তীব্র জিলের সুরে উত্থান করে না। প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারই যোগের ব্যাপার। আমরা যদি কিঞ্চিন্মাত্র প্রণিধান করিয়া দেখি, তবে ভৌতিক রাজ্য হইতে মানসিক রাজ্য পর্য্যন্ত স্পষ্ট একটি উন্নতির সোপন ধারাবাহিক ক্রম-পরম্পরায় প্রসারিত দেখিতে পাই।

প্রথম সোপান-পংক্তি;—ভৌতিক

রাজ্যে শুধু কেবল বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ এই দুই শক্তির কার্য্যই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়; আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটির অভাবে আর একটি চলে না—অথচ দুয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে; কাজেই বলিতে হয় যে, সে প্রতিদ্বন্দিতা প্রকৃত-পক্ষে প্রতিদ্বন্দিতা নহে—তাহা এক প্রকার প্রেমের কলহ; কেন না, আকর্ষণও বিকর্ষণকে চায় এবং বিকর্ষণও আকর্ষণকে চায়। যদি একটি জড় পিণ্ড হইতে বিকর্ষণ সমূলে উন্মূলিত হয়, তবে সে জড়-পিণ্ড নিতান্তই একটি নিরবয়ব জ্যামিতিক বিন্দুতে পর্য্যবসিত হয়—কাজেই বিকর্ষণ উন্মূলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণও উন্মূলিত হইয়া যায়; আবার যদি কোন একটি জড় পিণ্ড হইতে আকর্ষণ সমূলে উন্মূলিত হয়—তবে তাহার পরমাণু-সকল বহুধা—অসংখ্যধা—বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্য আকাশ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, কাজেই, আকর্ষণ উন্মূলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিকর্ষণও উন্মূলিত হইয়া যায়—কেননা শূন্যকে শূন্য বিকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ উভয়ই পরস্পরকে চায়—একটির বিহনে আর-একটি বাঁচে না, এইজন্য রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, দুয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা যাহা দৃষ্টি-গোচর হয় তাহা এক প্রকার প্রেমের কলহ। প্রাণ-শূন্য ভৌতিক বস্তু, যাহা শুদ্ধ কেবল আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির ক্রীড়া ক্ষেত্র, তাহা প্রকৃতির কার্য্য-সোপানের সবে-মাত্র প্রথম পংক্তি; এই প্রথম পংক্তিটিকে অনেকে মূল প্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির—স্থলাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া কেহ বা সেই প্রথম পংক্তিটিকে স্বয়ং ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাঁরা জগতের মূল-কারণকে ভৌতিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হ'ন না অথচ ইহাঁরাই আবার এই বলিয়া শ্লাঘা করেন যে, "আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে লজ্জা-বোধ করি!" ঈশ্বরকে ইহাঁরা মনুষ্যের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতেই লজ্জা বোধ করেন কিন্তু মৃত্তিকার মতো করিয়া অথবা অন্ধ শক্তির মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে ঘুণাক্ষরেও লজ্জা বোধ করেন না! এ কথাটি ইহাঁরা একেবারেই বিস্মৃত যে, ভৌতিক বস্তু প্রকৃতির প্রথম সোপান—মনুষ্য প্রকৃতির চতুর্থ সোপান; এই চতুর্থ-সোপানে এমন অনেক-গুলি ব্যাপার আছে যাহা প্রথম সোপানের ধ্যানেরও অগোচর। আকর্ষণ-বিকর্ষণের উপর সন্ততি-বাহিনী এবং সঙ্গতি পন্থিনী শক্তি—তাহার উপর সংস্কার-শক্তি এবং বিষয়-গ্রহণী শক্তি—তাহার উপর সংযম শক্তি এবং প্রবৃত্তি-অনুশীলনী শক্তি—এতগুলি শক্তিকে চতুর্থ-সোপানে কার্য্য করিতে দেখা যায়; কাজেই প্রথম সোপান অপেক্ষা চতুর্থ-সোপান সত্তা-ধনে চতুর্গুণ ধনী। এই জন্য, যদিচ আমরা বলি যে, জড়ীকরণ এবং মানবীকরণ দুইই দূষণীয় তথাপি জড়ীকরণ অপেক্ষা মানবীকরণকে আমরা সমগ্র সত্যের চতুর্গুণ নিকটবর্ত্তী মনে করি—জড়ত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্বকে আমরা চতুর্গুণ সারবান্ বস্তু মনে করি। কিন্তু হাজার হো'ক্—মনুষ্যও খণ্ড সত্য, পরব্রহ্ম অনন্ত সত্য,—কাজেই দুয়ের মধ্যে ছায়াতপের প্রভেদ। "ছায়াতপের প্রভেদ"—এই কথাটির সহজ অর্থ উল্টাইয়া দিয়া অনেকে তাহার পরিবর্ত্তে একটা কিম্ভূত কিমাকার সৃষ্টি-ছাড়া অর্থের অবতারণা করেন;—ইহাঁরা বলেন যে,

মনুষ্যে সর্ব্বসাধারণ-রূপেও যাহা কিছু আছে ঈশ্বরে তাহাও থাকিতে পারে না; মনুষ্যে অস্তিত্ব আছে—অতএব—ঈশ্বরে অস্তিত্ব নাই; মনুষ্যে জ্ঞান আছে—অতএব—ঈশ্বরে জ্ঞান নাই; ইত্যাদি। ইঁহারা যদি বলিতেন যে, ঈশ্বরেতে মনুষ্যের অস্তিত্বের মতো অপূর্ণ অস্তিত্ব নাই বা মনুষ্যের জ্ঞানের মতো অপূর্ণ-জ্ঞান নাই—তবে আমরা তাহাতে মুক্তকণ্ঠে সায় দিতে পারিতাম—কিন্তু তাহা নহে; ইহাঁদের যুক্তি এই;—

(১) ঈশ্বরেতে মনুষ্যেতে ছায়াতপের প্রভেদ।

(২) মনুষ্যের অস্তিত্ব আছে।

(৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই; কেন না, যাহা কিছু মনুষ্যেতে আছে তাহা ঈশ্বরেতে থাকিতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে আমরা এই বলি যে অস্তিত্ব সৃষ্ট জীবের বিশেষ ধর্ম্ম নহে—অপূর্ণ বা আপেক্ষিক অস্তিত্বই সৃষ্ট জীবের বিশেষ ধর্ম্ম; ঈশ্বরেতে অপূর্ণ-অস্তিত্ব আরোপ করিলেই তাঁহাতে জীবের ধর্ম্ম আরোপ করা হয়—ঈশ্বরেতে অস্তিত্ব আরোপ করিলে তাঁহাতে জীবের ধর্ম্ম আরোপ করা হয় না। তেমনি, ঈশ্বরেতে জ্ঞান আরোপ করিলে তাঁহাতে মনুষ্যত্ব আরোপ করা হয় না, তবে কি? না—তাঁহাতে অপূর্ণ জ্ঞান আরোপ করিলেই তাঁহাতে মনুষ্যত্ব আরোপ করা হয়।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি সোপানের প্রথম পংক্তিস্থিত ভৌতিক বস্তুকে শুধু যে কেবল ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করা দূষণীয় তাহা নহে—ঐ প্রথম পংক্তিটি মূল প্রকৃতির স্থলাভিষিক্ত হইবারও যোগ্য নহে। কিসে তাহা মূল-প্রকৃতি-পদের অযোগ্য—নিম্নে আমরা তাহা ভাঙিয়া বলিতেছি।

অপ্রাণ ভৌতিক বস্তু তিন-রূপ দৃষ্টিতে তিনরূপে প্রকাশ পায়, লৌকিক দৃষ্টিতে স্থূলরূপে প্রকাশ পায়; ভৌতিক বিজ্ঞানের (Physics) দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বল-কেন্দ্ররূপে প্রকাশ পায়; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানের অধীনস্থ শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। যথা,—লৌকিক দৃষ্টিতে ইঁট্ কাট পাথর যাহা চক্ষে দেখা যায় তাহাই জড় বস্তু; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, "সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে" ইহার অর্থ—সূর্য্যের ভার কেন্দ্র পৃথিবীর ভার কেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভার কেন্দ্র সমস্ত পার্থিব পরমাণুকে আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতেছে; অতএব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পৃথিবী—কিনা পৃথিবীর ভার কেন্দ্র; সূর্য্য—কিনা সূর্য্যের ভার কেন্দ্র; সৌর জগৎ—কিনা সৌর জগতের ভার কেন্দ্র—ইহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ভার—বলেরই প্রকার-ভেদ, এই জন্য সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, ভৌতিক বিজ্ঞানের চক্ষে বল-কেন্দ্রই জড়-বস্তু, আর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বলের ডা'ন হাত বাঁ হাত।

এখন বক্তব্য এই যে, কোনো বলকেন্দ্রই একাকী কোনো কার্য্য করিতে পারে না; তা শুধু নয় একাকী তাহা কিছুই নহে; কেননা (১) বল-কেন্দ্র হইতে যদি কোনও প্রকার বল-স্ফূর্ত্তি না হয় তবে তাহা জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় "কিছুই না" হইয়া দাঁড়ায়; (২) এক হাতে তালি বাজে না—এক বল-কেন্দ্র আর এক বল-কেন্দ্রকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিলে তবেই তাহার ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়; কোনো বল-কেন্দ্রই আপনাকে আপনি আকর্ষণ বিক-

র্ষণ করে না—অন্যান্য বল-কেন্দ্রকেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে; অতএব যে কোন বল-কেন্দ্র হউক্‌ না কেন—তাহার বল-স্ফূর্ত্তি অন্যান্য বলকেন্দ্রের প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ। (৩) প্রথমে দেখা গেল যে, বল-স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে বল-কেন্দ্র জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় অপদার্থ; পরে দেখা গেল যে, প্রত্যেক বল-কেন্দ্রের বল-স্ফূর্ত্তি অন্যান্য বলকেন্দ্রের প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ; অতএব প্রমাণ হইল যে—আপনা হইতে ভিন্ন অন্যান্য বলকেন্দ্রের প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে বলকেন্দ্র কিছুই নহে। বল-কেন্দ্র এইরূপ আপেক্ষিক পদার্থ—অর্থাৎ তাহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা বাহিরের অন্যান্য বল-কেন্দ্রের প্রতিযোগিতাকে অপেক্ষা করে। এখন, এইটি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক যে, (১) যে-কোন বস্তু বাহিরের অন্যান্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে, তাহা কখনই সর্ব্ব-জগতের মূলস্থিত হইতে পারে না; কেন না, যাহা সমস্ত জগতের মূলস্থিত—সমস্ত জগৎই তাহার অন্তর্ভূত; তাহার বাহিরে কোন বস্তুই থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহা বাহিরের কোন বস্তুরই প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ হইতে পারে না; (২) কিন্তু বল-কেন্দ্র মাত্রই বাহিরের আর আর বল-কেন্দ্রের প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ; (৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, কোন বল-কেন্দ্রই সর্ব্বজগতের মূলস্থিত নহে। এই গেল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে—আপেক্ষিক যাহা, তাহা ছোট হইলেও আপেক্ষিক, বড় হইলেও আপেক্ষিক; পরমাণুর ভার কেন্দ্রও যেমন-আপেক্ষিক—সৌর জগতের ভারকেন্দ্র ও তেমনি-আপেক্ষিক। আপেক্ষিক পদার্থ সকলের মধ্যে মূলগত ঐক্য রহিয়াছে বলিয়াই তাহারা পরস্পর পরস্পরকে মান্য করে; যদি আপেক্ষিক পদার্থ-সকলের মূলে কোন প্রকার ঐক্য না থাকিত, তবে কেহ কাহারো তক্কা রাখিত না; সূর্য্য যদি পৃথিবীর নিতান্তই পর হয়—তবে পৃথিবীর কি-এত দায় পড়িয়াছে যে, সূর্য্যের অদৃশ্য আকর্ষণে নিরন্তর তাহাকে বাঁধা থাকিতে হইবে? অতএব ইহা স্পষ্ট যে, সমস্ত আপেক্ষিক সত্য একই অদ্বিতীয় সত্যের মূল বন্ধনে আবদ্ধ। যে এক অদ্বিতীয় মূল বন্ধন সমস্ত বল-কেন্দ্রের আশ্রয় স্থান, সে মূল বন্ধন আবার কোন্‌ বল-কেন্দ্রকে আশ্রয় করিবে? ইহা তো হইতেই পারে না! এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কোনো বলকেন্দ্রই—কোনো ভৌতিক বস্তুই—মূল প্রকৃতির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না।

আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রকৃতির প্রথম সোপান; সন্ততি এবং সঙ্গতির নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রকৃতির দ্বিতীয় সোপান। বল-রাজ্যে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণ, প্রাণ-রাজ্যে সেইরূপ সঙ্গতি-প্রবণতা এবং সন্ততি-প্রবণতা; সঙ্গতি এবং সন্ততির এই যে দুইটি ব্যাপার, ইহার অভ্যন্তরে দুই-জাতীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করে—ভৌতিক (physical) আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং রাসায়নিক (chemical) আকর্ষণ বিকর্ষণ। ঔদ্ভিদ প্রাণীরা রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা দাহ্য-প্রধান পদার্থ-সকল (carbon প্রভৃতি) আত্মসাৎ করে এবং রাসায়নিক বিকর্ষণ দ্বারা দাহক-প্রধান বাষ্প (oxygen) বিসর্জ্জন করে। কিন্তু এইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণের ক্রীড়া উদ্ভিদের বহিরঙ্গ মাত্র;—অন্তরঙ্গ কি? না সেই সমস্ত আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাপারকে জীবন-রক্ষায় নিয়মিত করা। জীবন্ত উদ্ভিদ্‌ পদার্থ রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা বহি-

বস্তু সকলকে ভিতরে লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বিশেষ-বিশেষ পরিমাণে বণ্টন করিয়া দেয়; তা শুধু নয়—যে অঙ্গ যে দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, সে অঙ্গ সে দ্রব্যকে আপনার মতো করিয়া গড়িয়া লয়—সে দ্রব্যের আকার-পরিবর্ত্তন করিয়া বা গুণ-পরিবর্ত্তন করিয়া বা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার প্রকৃতির উপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়! এই ব্যাপারটি শুদ্ধ কেবল রাসায়নিক ব্যাপার নহে—কেননা রাসায়নিক ব্যাপার-সকল ক্রমাগতই বাঁধা নিয়মে চলে; বিশুদ্ধ রাসায়নিক ব্যাপার এক প্রদেশে একরূপ—অন্য প্রদেশে অন্যরূপ—হইতে পারে না। দাহকতা-গুণ ইংলণ্ডের অম্লজন বায়ুতেও যেমন—এদেশের অম্লজন বায়ুতেও তেমনি—কোথাও তাহার ইতর-বিশেষ হয় না; কিন্তু জীবরাজ্যে শরীর-ভেদে একই বস্তুর গুণ-ভেদ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যাদির শোণিত শীতল—পশ্বাদির শোণিত উষ্ণ, অথচ উভয়ই শোণিত; এমন কি—ভৌতিক হিসাবে মনুষ্যের এবং নিকৃষ্ট জীবের রেতের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু জৈবিক হিসাবে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জৈবিক ব্যাপার যদি শুদ্ধ কেবল রাসায়নিক ব্যাপার হইত, তবে সকল জীবেরই রেত সর্ব্বত্রই একই প্রকার জীব উৎপাদন করিত—কেননা রেতের ভৌতিক উপাদান সর্ব্বত্রই একই প্রকার। পুনশ্চ, রাসায়নিক রাজ্যে অম্লজন সর্ব্বকালেই অম্লজন; কিন্তু জীব-রাজ্যে বিষ সর্ব্বকালেই বিষ নহে; অভ্যাস-গুণে বিষও অনেক সময়ে নির্ব্বিষ হইয়া পড়ে। অতএব কি উদ্ভিদ্‌রাজ্য—কি জীব-রাজ্য—যাহারই মধ্যে যতকিছু প্রাণের ব্যাপার দেখা যায় তাহা শুদ্ধ কেবল রাসায়নিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ব্যাপার নহে; জীবরাজ্যে এবং উদ্ভিদ্ রাজ্যে—রাসায়নিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি আর এক উচ্চতর শক্তির অধীনে নিয়মিত হয়, কি ? না জীবনী শক্তি; আর, সন্ততি-প্রবর্ত্তিনী শক্তি এবং সঙ্গতি-পক্ষিনী শক্তি যাহা কৈন্দ্রিক এবং পারিধ শক্তি বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা জীবনী-শক্তিরই দুইটি অবিচ্ছেদ্য অবয়ব।

প্রসঙ্গাধীন আমরা এই একটি কথা বলিতে চাই যে, বিজ্ঞানের আলোচনা কালে মন-হইতে দুইরূপ পক্ষপাতের ভাব উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক;—(১) "কিছুই মানিব না" এই একরূপ পক্ষপাত; (২) "সবই মানিব" এই আর একরূপ পক্ষপাত। এ উপলক্ষে আমরা অধিক বাক্য-বাহুল্য শ্রেয় বোধ করি না—সাঁটে সোঁটে দুই একটি কথা বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব—কেননা আমাদের গন্তব্য পথ এখনো ঢের বাকি।

নেই-মান্‌তা'র উদাহরণ;— জীবনী-শক্তি মূলেই নাই—জীবের সমস্ত ব্যাপারই আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে।

সব্-মান্‌তা'র উদাহরণ;—পরিপাক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি—দক্ষিণ চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য—বাম চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, ইত্যাদি।

এই দুই ভাব—নেই-মান্‌তা ভাব এবং সব্‌মান্‌তা ভাব—দুইই সমান পরিবর্জনীয়। সব্-মান্‌তা ভাবের দোষের প্রতি নব্য-সম্প্রদায়ের চক্ষু যে পরিমাণে বিস্ফারিত—নেই-মান্‌তা ভাবের দোষের প্রতি তাহা

সেই পরিমাণে অন্ধ; সব্‌মান্‌তা দোষের প্রতি তাঁহাদের চক্ষু ফুটাইতে যাওয়া তেলা মাথায় তেল দেওয়া মাত্র; এই জন্য এখানে আমরা শুদ্ধ কেবল নেই মান্‌তা ভাবের দুই একটি দোষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

ক। বিজ্ঞান যদি জীবনী-শক্তি না মানে, তবে তাহাতে বিজ্ঞানের কি ক্ষতি হয়?

খ। বিজ্ঞান যদি আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি না মানে তবে তাহাতে তাহার কি ক্ষতি হয়?

ক। তাহা হইলে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি কোনো প্রকারে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারা যায় না।

খ। জীবনী-শক্তি না মানিলে উদ্ভিদ্ এবং জীবের জৈবনিক প্রক্রিয়া-সকল জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারা যায় না। তুমি কি শুদ্ধ কেবল ভৌতিক বা রাসায়নিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের উপর ভর করিয়া জৈবনিক প্রক্রিয়া সকল আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার? কখনই পার না। কাজেই জৈবনিক প্রক্রিয়া-সকলের মূলে অন্য-কোনো বিধ শক্তির কার্য্য-কারিতা না মানিলে কোনো প্রকারেই চলিতে পারে না; না মানিলে চলিতে পারে না—অথচ আমি মানিব না—ইহারই নাম নেই মান্‌তা দোষ।

এ সম্বন্ধে কাণ্ট বলিয়াছেন "we may in a sense say without temerity: Give me matter and I will build a world out of it, I will show how a world comes to be evolved. But can we truly claim such a vantage ground in speaking of the least plant or insect? are we in a position to say: give me matter, and I will show you how a caterpillar can be generated. কি ভৌতিক—কি রাসায়নিক—কোনো আকর্ষণ-বিকর্ষণই এখানে হালে পানি পায় না। কাজেই জৈবনিক প্রক্রিয়ার মূলে আকর্ষণ-বিকর্ষণ ছাড়া অতিরিক্ত আর-এক প্রকার শক্তি না মানিলে কোন প্রকারেই চলিতে পারে না। কেন যে আমরা জীবনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহা আমরা বলিলাম,—ভৌতিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে কারণে আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন আমরা সেই কারণে জীবনী-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করি—স্বীকার না করিলেই নয় বলিয়া স্বীকার করি। যদি বিনা-কারণে শুধু শুধু আমরা শক্তি-বাহুল্যের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতাম—তবে আমরা সব্‌মান্‌তাদিগের প্রথানুযায়ী (এবং বিজ্ঞানের প্রথা-বহির্ভূত) কার্য্য করিতাম; বিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ একটি মহৎ দোষ; কিন্তু তাহা যখন আমরা করি নাই, তখন তাহার দোষও আমাদের স্কন্ধে অর্শিতে পারে না। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

উদ্ভিদ্‌রাজ্যে দুইরূপ শক্তি একযোগে কার্য্য করে; সন্ততি-রক্ষিণী শক্তি এবং সঙ্গতি-রক্ষিণী শক্তি; আপনার সাজাত্য অব্যাহত রাখিয়া তাহা সন্তান-সন্ততি ক্রমে প্রবাহিত করিবার শক্তিই সন্ততি-রক্ষিণী শক্তি; এবং চতুর্দিকৃস্থ বিজাতীয় সংসর্গের উপযুক্ত করিয়া আপনাকে বিনয়ন করিবার শক্তিই সঙ্গতি-রক্ষিণী শক্তি; এই দুই শক্তি একই জীবনী-শক্তির দুইটি পৃষ্ঠ; তাই আকর্ষণ-বিকর্ষণের ন্যায়, ও-দুইটি শক্তির মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ। ঐ দুই শক্তি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী অথচ একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র অভ্যন্তরে তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়

যে, তাহার এক-পক্ষে জীবনী-শক্তি এবং আর এক পক্ষে ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তি—এই দুই শক্তিই এখানকার যোদ্ধৃ-পক্ষ। যেখানকার ভৌতিক এবং রাসায়নিক ভাব-গতি যেরূপ—সেখানকার উদ্ভিদের জীবনী-শক্তি সেইরূপ দেশ-কাল অবস্থোচিত নিয়মে নিয়মিত হয়। এক-দেশের উদ্ভিদ্ যদি ঘটনা-ক্রমে নিতান্তই ভিন্ন দেশে নিপতিত হয়, তবে কাল-ক্রমে সেই উদ্ভিদ্‌টির কিয়ৎ পরিমাণে জাত্যন্তর ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। জীবনী-শক্তি পারৎ-পক্ষে উদ্ভিদের বা জীবের সাজাত্য রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না; কিন্তু হইলে হইবে কি—জগৎ ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সাজাত্যকে অপরিবর্ত্তিত এবং অবিচলিত ভাবে একই স্থানে বাঁধিয়া রাখা জীবের সাধ্যায়ত্তও নহে প্রার্থনীয়ও নহে; বদ্ধ-বায়ু, বদ্ধ-জল, এবং নবোদ্যম-শূন্যতা জীবনের নিতান্তই শত্রুপক্ষ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরেই সমস্ত জগৎ দণ্ডায়মান—প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জগতের প্রাণ। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জীবনের উৎস। শৈত্য উত্তাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে বায়ুর চলাচলি বন্ধ হইয়া গিয়া জীবের শ্বাস-রোধ হইত;—রাত্রি-দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে পৃথিবীতে শৈত্য ঔষ্ণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক পরিমাণে লোপ পাইত;—সৌর আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে রাত্রি-দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিতে পারিত না;—এইরূপ, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার তরঙ্গ নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে—এবং তাহারই উপরে সমস্ত জগতের জীবন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব যদি জিজ্ঞাসা কর যে, জীবন কি? তবে তাহার উত্তর এই যে, ভৌতিক শক্তির সহিত নিরন্তর দ্বন্দযুদ্ধে জীবনী শক্তির নিরন্তর জয় প্রাপ্তিই জীবন শব্দের বাচ্য—এবং ঐ সংগ্রামে জীবনী-শক্তির পরাজয়-প্রাপ্তিই মরণ-শব্দের বাচ্য। অপ্রাণ ভৌতিক জগতে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সপ্রাণ ঔদ্ভিদ জগতে সন্ততি-রক্ষিণী এবং সঙ্গতি-রক্ষিণী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা—আগাগোড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা; অতঃপর, প্রকৃতি—চেতন-জগতে কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া বর্ত্তিয়া রহিয়াছে তাহার প্রতি প্রণিধান করা যাইবে।—শ্রীদ্বি]

ক্রমশঃ।

বেদান্তের মত।

যে ব্যক্তি অনিত্য যাগ যজ্ঞাদি সাধন ত্যাগ করিয়াছে, যে ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুতে বিরক্ত হইয়াছে, যাহার বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগৃহীত এবং অন্তঃকরণ অনাত্ম বহির্বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত, যে দয়াবান ও শুদ্ধস্বভাব, যে জাতি চরিত্র বিদ্যা ও আভিজাত্যে পরীক্ষিত, যাহার পুত্রও বিত্তৈষণা নাই, এইরূপ ও অন্যান্য রূপ গুণসম্পন্ন শিষ্য বিধিবৎ উপস্থিত হইলে গুরু তাহাকে মোক্ষসাধন জ্ঞান উপদেশ করিবেন। যাবৎ বিশেষ রূপ ধারণা না হয় তাবৎ পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিবেন। যদি শিষ্যকে কোনও রূপ বাহ্য চিহ্নে ধারণায় অসক্ত বোধ হয় তবে তাহার হেতু নিরাসে যত্ন করিবেন। প্রথমত শিষ্যের কোনও রূপ সঞ্চিত অধর্ম্ম যদি কিছু থাকে যাহাতে তাহা দূর হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পরে লৌকিক প্রমাদ অর্থাৎ ত্যজ্য ও অত্যাজ্য বিষয়ে বুদ্ধিভ্রম যাহাতে নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পরে যুক্তিবিশেষ দ্বারা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক যাহাতে সুদৃঢ় হয়

তদ্বিষয়ে যত্ন করা আবশ্যক। পরে পূজা সম্মানাদির অপেক্ষায় লোকসংসর্গ যাহাতে না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ শাসন করা আবশ্যক। আর জাতি কুল ও বিদ্যাদির অভিমান যাহাতে মন হইতে উন্মূলিত হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। গুরু এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উপায় স্বরূপ অমানিত্ব অদম্ভিত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ সকল শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন। আচার্য্যেরও বেদবিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা চাই, উপদেশকালে শিষ্যের বোধসুলভ যুক্তি প্রয়োগের এবং বিপরীত বোধ নিরাসের শক্তি থাকা চাই। তিনি শিষ্যকৃত প্রশ্নের ঝটিতি অর্থাবধারণ করিয়া সেইগুলি স্মরণে রাখিবেন। তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিরাগ বা যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগ ও বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক। তিনি ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মে স্থিত হইবেন। দয়া ও অনুগ্রহ এই দুইটী তাঁহার বিশেষ গুণ। তিনি অর্থে নিস্পৃহ শিখা ও উপবীতাদিশূন্য এবং আচারনিষ্ঠ হইবেন। দম্ভ অর্থাৎ জনসমাজে আপনার ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন তাঁহার একান্ত পরিহার্য্য। তিনি কুহক শঠতা মায়া মাৎসর্য্য মিথ্যা বাক্য অহঙ্কার ও অভিমান এই সমস্ত দোষ শূন্য হইবেন। যে ব্যক্তি বিষয়বিরক্ত তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন। ফলত এইরূপ আচার্য্যের নিকটই শিষ্য উপস্থিত হইবে। আচার্য্য ঐ সমাগত শিষ্যকে সর্ব্বাগ্রে আত্মার একত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি সকল উপদেশ করিবেন। পরে যখন দেখিবেন শিষ্যের ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান হইয়াছে তখন জিজ্ঞাসিবেন, সৌম্য, তুমি কে? যদি এই প্রশ্নে শিষ্য এইরূপ কহেন, গুরো, আমি ব্রাহ্মণপুত্র অমুকবংশীয় ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ ছিলাম এক্ষণে সংন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক জন্মমরণরূপ গ্রাহসঙ্কুল সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী হইয়াছি। তখন আচার্য্য কহিবেন, সৌম্য, মৃত্যু হইলে তোমার শরীর এখানেই পশু পক্ষী সকল ভক্ষণ করিবে অথবা মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইবে। তুমি এই শরীরে কিরূপে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিয়াছ। নদীর কূলে দগ্ধ হইলে কি নদীর পারে গমন করা যায়? এই কথা শুনিয়া শিষ্য যদি বলে আমি শরীর হইতে ভিন্ন, শরীর জন্মে, মরে, পশু পক্ষীরা খায়, মৃত্তিকায় পরিণত হয়, শস্ত্র ও অগ্নিপ্রয়োগে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পক্ষী যেমন স্বীয় নীড়ে প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ আমি স্বকৃত কর্ম্মবলে এই শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আবার পক্ষী যেমন পূর্ব্বনীড় ত্যাগ করিয়া নীড়ান্তর গ্রহণ করে সেইরূপ আমিও শরীরনাশে শরীরান্তর গ্রহণ করিব। এইরূপে আমি অনাদি সংসারে পূর্ব্বদেহ ত্যাগ ও নূতন নূতন দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘটী যন্ত্রের ন্যায় জন্মমরণচক্রে কর্ম্মবশাৎ ভ্রাম্যমাণ হইয়াছি এবং ক্রমে এই বর্ত্তমান দেহলাভ করিয়া ও এই সংসার-চক্র-ভ্রমণে নিতান্ত নির্বেদযুক্ত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। সংসার-চক্র হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াই আমার লক্ষ্য। আমি শরীর হইতে ভিন্ন। মনুষ্য যেমন বস্ত্র গ্রহণ ও ত্যাগ করে সেইরূপ সে এই শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে।

তখন আচার্য্য কহিবেন, সৌম্য, তুমি অতি সাধুদর্শী, ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণপুত্র অমুক বংশীয় ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ ছিলাম, ইদানীং সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছি তুমি আত্মপরিচয়ে অগ্রে কেন এইরূপ মিথ্যা কথা কহিলে। আচার্য্যের এই

কথায় যদি শিষ্য এইরূপ বলে, ভগবন্ আমি কিরূপে মিথ্যা কহিলাম। তখন আচার্য্য কহিবেন, সৌম্য, এইমাত্র তুমি কহিলে আমি ব্রাহ্মণপুত্র অমুক বংশীয়; এই কথায় একটু দোষ ঘটিয়াছে। জন্ম, বংশ ও উপনয়নাদি সংস্কার এইগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শরীরেরই হইয়া থাকে, আত্মার সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু তুমি আত্মপরিচয়ে ব্রাহ্মণ-পুত্রাদি কথা প্রয়োগ করিয়া মুখ্যত এই শরীরকেই জন্মসংস্কারাদি-বর্জিত কূটস্থ আত্মার স্বরূপবৎ কহিয়াছ, অর্থাৎ তুমি শরীরকেই আত্মা বোধ করিয়াছ সুতরাং তুমি বিপরীতদর্শী, এই জন্যই আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া শিষ্য যদি কহে, গুরো, এই শরীরই বা কেন জন্মসংস্কারাদি বিশিষ্ট আর আত্মাই বা কেন জন্মসংস্কারাদি বর্জিত, আপনি ইহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিন।

তখন আচার্য্য কহিবেন, হে সৌম্য শুন। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে শ্রুতি-বাক্যে আত্মৈকত্বপ্রতিপাদক অনেক উপদেশ দিয়াছি, তুমি সে সমস্ত স্মরণ করিয়া দেখ। এক্ষণে এই শরীরের উৎপত্তি প্রকারের কথা তোমাকে বলি শুন। পরমাত্মা অশরীরি, স্থূল কৃশত্বাদি জড়ধর্ম্ম তাঁহাতে কিছুমাত্র নাই। তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরশূন্য বিজ্ঞানঘন ও পরিপূর্ণ। তাঁহার শক্তির পরিচ্ছেদ নাই। তাঁহা হইতে এই আকাশ ও নামরূপ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন স্বচ্ছ জল হইতে অস্বচ্ছ ফেনের উৎপত্তি হয় এই স্থূলসূক্ষ্মসৃষ্টিও সেইরূপ বুঝিও। দেখ ফেন কিছু জল নয় আবার জল ব্যতীত স্বরূপত তাহার পৃথক উপলব্ধি হয় না, কিন্তু স্বচ্ছ জল অস্বচ্ছ ফেন হইতে ভিন্ন। সেইরূপ দেখ এই নামরূপ ফেনস্থানীয়, ইহা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন, তিনি স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, আর নামরূপ তদ্বিপরীত অর্থাৎ অস্বচ্ছ ও অপ্রসন্ন। এই নামরূপ অব্যক্ত দশা হইতে ব্যক্ত হইয়াছে ইহাই সৃষ্টি। বস্তুত পরমাত্মা স্বয়ং নামরূপে পরিণত হন নাই। এই নামরূপ আকাশ স্বরূপে অবস্থিত ছিল। যখন আকাশ অপেক্ষা স্থূল ভাব অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয় তখন প্রথমে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের পর পর মহাভূতে অনুপ্রবেশ আছে, সুতরাং পৃথিবী পঞ্চভূতাত্মক। এই পৃথিবী হইতে পঞ্চভূতাত্মক ব্রীহিযবাদি ফল সশ্য উৎপন্ন হইতেছে। আবার এই ভুক্ত ফলসশ্য হইতে স্ত্রী পুরুষের শুক্র শোণিত জন্মিতেছে। এই শুক্র শোণিত স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে শরীররূপে পরিণত ও দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। পরে এই শরীর জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ও উপনয়ন সংস্কার-যোগে ব্রহ্মচারি সংজ্ঞা লাভ করে। পরে এই শরীর পত্নীযোগ ও সংস্কারযোগে গৃহস্থ সংজ্ঞা পায়, আবার তাহাই বনস্থ সংস্কারে তাপস এবং ক্রিয়ানিবর্ত্তক সংস্কারে পরিব্রাজক হয়। সুতরাং দেখ শরীরই জন্মসংস্কারাদি সম্পন্ন। আর মন ও ইন্দ্রিয় সকল অন্নময় সুতরাং ইহাও এই নামরূপ হইতে ভিন্ন হইতেছে না। বৎস, এই তো শরীরের কথা হইল। এখন আত্মা বা আমি কেন যে জন্মসংস্কারাদি বর্জ্জিত, শুন, তাহাও কহিতেছি। যিনি নামরূপের স্রষ্টা অথচ যিনি নামরূপ হইতে পৃথক তিনি এই নামরূপ—এই শরীর সৃষ্টি

করিয়া এই নামরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং সংস্কারধর্ম্মবর্জ্জিত। তিনি এই শরীরে কিন্তু স্বয়ং অশরীর। এখন অবশ্যই বুঝিলে এই জন্মাদি সংস্কার, ইহা, আত্মা যে তুমি তোমার নয়, কেবল এই শরীরের।

পরে শিষ্য যদি বলে, দেখুন, আমি অজ্ঞ সুখী দুঃখী বদ্ধ ও সংসারী, আমি এক পদার্থ আর পরমাত্মা অসংসারী এবং আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং তিনি অন্য পদার্থ। আমি কেবল তাঁহাকে উপহার নমস্কার ও বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিয়া সংসারসাগর পার হইবার ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে তিনিই যে আমি ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়।

তখন আচার্য্য কহিবেন,সৌম্য, না এরূপ বুঝিও না। ভেদজ্ঞানে প্রত্যবায় ঘটে। শ্রুতিতে কেবল যে ভেদদর্শন মাত্র নিষেধ করিতেছে এমন নয় কিন্তু ভেদদর্শীর অনর্থ প্রাপ্তির কথাও পুনঃপুনঃ কহিয়াছে। যে আত্মৈকত্বে বিশ্বাস না করে সে মৃত্যু হইতেও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। ফলত ভেদদর্শীর তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এইরূপ লোককে শ্রুতি দেবপশু বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। অতএব বৎস, তুমি ব্রাহ্মণপুত্র অমুকবংশীয় প্রভৃতি আত্মপরিচয়ে যাহা কিছু কহিয়াছ তোমার সেই অভিমান মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়া জানিও। আর তুমি বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মাদি দ্বারা আরাধনার কথা যাহা উল্লেখ করিলে তাহাও ভেদদর্শন হইতে উত্থিত, সুতরাং তাহাও সম্যক্‌দৃষ্টি নয়। আমি ইহা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শুন। দেখ, ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদের আশ্রয় এই তিন ব্যতীত কর্ম্মের স্বরূপসিদ্ধি হয় না। কর্ম্মের এই তিনটি উপাদান ভেদজ্ঞান হইতে প্রসূত হইয়াছে। যাহা ভেদজ্ঞানমূলক তাহার অনুষ্ঠানে কোনও ফল নাই। আর উপবীত ধারণ না করিলে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, সুতরাং উপবীত ধারণ অবশ্যই কর্ম্মসাধন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এখন কথা এই, সাধ্য কর্ম্মই যখন নিস্ফল তখন তৎসাধন উপবীতাদি ধারণও নিরর্থক হইয়া পড়িল। ফলত এই জন্য পরমাত্মার অভেদজ্ঞানে এই কর্ম্ম ও তৎসাধন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ কর্ম্ম ও তৎসাধন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ অভেদ-জ্ঞান-বিরোধী। ইহা সংসারীর পক্ষেই অর্থাৎ জাত্যাদ্যভিমানীর পক্ষেই ব্যবস্থেয়। আর যিনি অভেদদর্শী তাঁহার কর্ম্ম ও উপবীতাদিতে কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ অভেদ জ্ঞানে স্বাতন্ত্র ও কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি থাকে না। আত্মলোপের সহিত কর্ত্তৃত্ব কিরূপে অন্বিত হইবে। এখন যদি বল সংসারী—জাত্যভিমানীও তো পরমাত্মা হইতে অস্বতন্ত্র, তবে তাহার পক্ষেই বা কিরূপে কর্ম্মবিধি ব্যবস্থেয় হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, ঐ জাত্যভিমানী সংসারীর যত দিন ভেদবুদ্ধি থাকিবে তাবৎ কাল সে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। ভেদজ্ঞানে কর্ত্তৃত্ব থাকে। সুতরাং কর্ত্তা যে, সে, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ইহাতে আর বক্তব্য কি। কিন্তু দেখ, যদি কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য ও অনুষ্ঠেয় হইত তাহা হইলে শ্রুতি কর্ম্মসাধনের সহিত সম্বন্ধশূন্য এবং এই কর্ম্মের হেতু জাতি ও আশ্রমাদির সহিত সম্বন্ধশূন্য পরমাত্মার সহিত আত্মার তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যে অভেদ জ্ঞানের উপদেশ কখন করিত না এবং তাহাতে ভেদজ্ঞানের নিন্দাও থাকিত না। অতএব যিনি মুমুক্ষু সর্ব্বতোভাবে তাঁহার জাতি ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

এস্থলে যদি শিষ্য কহে, ভগবন্, দেখুন এই দেহ দাহ বা ছেদন করিলে আমার বেদনা প্রত্যক্ষ হয়, ক্ষুৎপিপাসায় আমার দুঃখ ক্লেশ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু শ্রুতি কহিতেছে পরমাত্মার পাপ নাই, জরামৃত্যু নাই, শোক দুঃখ নাই, ক্ষুৎপিপাসা নাই। তিনি সমস্ত সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত। শীত ও উত্তাপ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী সেইরূপ জীব ও পরমাত্মা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী, সুতরাং উভয়ে যে অভিন্ন ইহা আমি কিরূপে বুঝিব। আর আমি সংসারী এবং অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধনে অধিকারী, সুতরাং অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধন কর্ম্ম এবং কর্ম্মসাধন উপবীতাদি কিরূপে পরিত্যাগ করিব।

এইরূপ প্রশ্নে আচার্য্য শিষ্যকে বলিবেন, সৌম্য, তুমি যে কহিলে দেহ দাহ বা ছেদন করিলে বেদনা আমার প্রত্যক্ষ হয় ইহা ঠিক্ নয়। যখন দেহ বৃক্ষবৎ দহ্যমান বা ছিদ্যমান হয় তখন এই দাহ ছেদজন্য বেদনা দেহেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই হেতু আমি বলিব দাহাদি জন্য বেদনা দাহাদির সহিত তুল্য আশ্রয়ে আছে, অর্থাৎ যে দেহে দাহাদি ঘটিতেছে বেদনা সেই দেহেরই। এই দাহছেদ একটি কার্য্যবিশেষ। এই কার্য্যবিশেষ যাহা দেহে ঘটিতেছে আত্মা কেবল তাহার উপলব্ধা, এই হেতু দাহাদি জন্য বেদনা আমার বলিতে পার না, উহা দেহেরই। এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বেশ বিষদ হইবে। দেখ, যথায় দাহ বা ছেদাদি কৃত হয় লোকে সেই খানেই তৎজন্য বেদনা নির্দ্দেশ করে, কিন্তু বেদনা দাহাদির উপলব্ধা যে আত্মা, তাহাতে কদাচ তাহা নির্দ্দেশ করে না। কেহ যদি জিজ্ঞাসিত হয় কোথায় তোমার বেদনা। সে তখন অবশ্যই বলে আমার মস্তকে বক্ষে বা উদরে। যে যে স্থানে দাহছেদাদি হইতেছে তৎতৎ স্থানেই বেদনা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যদি বেদনাদির উপলব্ধা আত্মাতে বেদনার নির্দ্দেশ হইত তাহা হইলে বেদনার আশ্রয় বলিয়া দেহের ন্যায় আত্মাতেও বেদনার হেতু দাহাদি উদ্দিষ্ট হইত। কিন্তু আমার আত্মা দগ্ধ বা ছিন্ন হইতেছে এরূপ বলিতে তো কৈ তাহাকেও কখন শুনি না। অতএব ইহাই স্থির যে, দাহাদি জন্য বেদনা দাহাদির সহিত এক আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ দাহাদি কার্য্য দেহে এবং দেহেরই বেদনা। চক্ষুর্গত রূপকে যেমন চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে না সেইরূপ আত্মগত বেদনাকে আত্মা গ্রহণ করিতে পারে না। এস্থলে এই উপলব্ধি ক্রিয়ার কর্ত্তা কে হয় ইহাই বিরোধ। এই বেদনাও আবার দাহাদির ন্যায় একটা কার্য্য। যদি বল বেদনা কিনা দুঃখ। সেই বেদনা বা দুঃখ অচেতন দেহে সম্ভব নয়, কারণ সুখদঃখাদি ধর্ম্ম কেবল চেতনেই আছে। যদি আত্মা স্বয়ং চেতন হইয়াও বেদনার আশ্রয় না হন তবে অচেতন যে দেহ সে কিরূপে তাহার আশ্রয় হইবে? সুতরাং বেদনা বস্তুটি নিরাশ্রয় হইয়া যাক্? না, এরূপ আপত্তি করিতে পার না। বেদনা যখন একটি কার্য্য তখন তণ্ডুলপাকাদির ন্যায় অবশ্যই আশ্রয় অপেক্ষা করে। আরও বুঝিয়া দেখ, দাহাদির সহিত বেদনা এক আশ্রয়ে থাকে এই জন্য ইহার সংস্কার থাকিয়া যায়। যদিচ তুমি বেদনাকে নিরাশ্রয় বল তবে ইহার নাশে অর্থাৎ যখন ইহা না থাকে তখন ইহার সংস্কারও থাকিতে পারে না। এই সংস্কার না থাকিলে কালান্তরে ইহার স্মরণও হইতে পারে না। সুতরাং ইহা সাশ্রয়। আর যদি তুমি বেদনাকে কার্য্য না বল তবে ইহার সংস্কার ও স্মৃতি কৈ থাকে। এই সংস্কার ও স্মৃতির অ-

ভাবে আমার বক্ষে কি উদরে বেদনা হইয়াছিল ইত্যাকার লোকব্যবহারই বা কিরূপে দাঁড়ায়। যদি বল, স্বীকার করিলাম বেদনা সাশ্রয়। কিন্তু সেই আশ্রয় আত্মা হউক, কারণ আত্মাতেই তো বেদনার সংস্কার ও স্মৃতির উপলব্ধি হইয়া থাকে? না, একথাও ঠিক নয়। বেদনা তৎসংস্কার ও স্মৃতি এক আশ্রয়েই থাকে। সুতরাং যেস্থানে বেদনা উপলব্ধি হয় সেই স্থানেই তজ্জন্য সংস্কার ও স্মৃতি থাকিবে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা স্মৃতির কাল। এই উভয় অবস্থাতেই বেদনার উপলব্ধি হয় কিন্তু সুষুপ্তিতে উপলব্ধি হয় না। যখন সুষুপ্তিতে ইহার উপলব্ধি হইতেছে না তখন তুমি ইহাকে আত্মাশ্রয়ী বলিতে পার না। দেহকার্য্যাদির ন্যায় অনাত্মা অর্থাৎ দেহপ্রত্যয় কালেই বেদনার উপলব্ধি হইয়া থাকে। আরও দেখ, যখন দেহ ছিন্ন ও দগ্ধ হয় তখন যে ব্যক্তি দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝে সে আমি দগ্ধ ও ছিন্ন হইলাম এইরূপ প্রতীতি করিয়া সন্তপ্ত হয়। অতএব দেখিতেছি দাহছেদাদি জন্য বেদনা, সংস্কার, স্মৃতি এবং দ্বেষও দেহাভিন্ন আত্মায় উপলব্ধি হয় কিন্তু দেহাভিমান নষ্ট হইলে সে অবস্থায় এ সকল উপলব্ধি হয় না, অতএব ইহাই স্থির, দাহছেদাদি দেহের, বেদনাও দেহের।

পরমহংস শিবনারায়ণদেবের জীবন চরিত্র।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

আমি পৃথিবীর ভার উদ্ধারের জন্য নিমিত্ত মাত্র দাঁড়াইব। মাতা পিতা বলিলেন যে, হে পুত্র, তুমি আমাদের মারিয়া ফেলিয়া যাইতে পার; তুমি এখন ক্ষুদ্র একটা বালক, তোমা হইতে কি প্রকারে এই সৃষ্টির ভার উদ্ধার হইবে? তখন শিবনারায়ণ মাতা পিতাকে বলিলেন যে, "আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে। আমার কি ক্ষমতা যে আমি পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিতে পারি। আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। প্রমাণ; ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে যে ব্যক্তির চক্ষু আছে সে যেমন দেখিতে পায় না (অন্ধ কি প্রকারে দেখিতে পাইবে) এবং অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও পথ দেখাইতে সমর্থ নহে। যখন সূর্য্যদেব প্রকাশ হন তখন নেত্রবান্ ব্যক্তির দৃষ্টি খোলে এবং তখন তাহার ক্ষমতা জন্মে ও তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া ভাল পথে লইয়া যান কিম্বা কোন উত্তম স্থানে বসাইয়া দেন। অন্ধব্যক্তি শব্দে অজ্ঞান এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তি শব্দে জ্ঞান এবং সূর্য্যদেবের প্রকাশ শব্দে আত্মবোধ অর্থাৎ স্বরূপ-নিষ্ঠা আমাকে নিমিত্ত মাত্র দাঁড় করাইয়া তিনি অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া সকল সৃষ্টির ভার উদ্ধার করিয়া দিবেন। হে মাতা পিতা আমার প্রতি আপনারা আর স্নেহ করিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন। তাহাতে মাতা পিতা স্নেহ প্রযুক্ত বলিতে লাগিলেন যে, "হে পুত্র! মাতা পিতা কত কষ্টে কত যত্নে পুত্রকে লালন পালন করিয়াছে—সে পুত্রকে তাহারা কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবে? আরো বলিলেন যে, তুমি তো ভাল করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে না—তুমি মূর্খ রহিলে তবে কি প্রকারে তোমার কার্য্য-নির্ব্বাহ হইবে।" তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে, অন্তর্যামীরূপ বিদ্যা আমার অন্তরে বাস করিতেছেন—সেই বিদ্যাতেই আমার প্রয়োজন, আমার বাহিরের বিদ্যার প্রয়োজন নাই।" শিব-

নারায়ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখি-লেন যে, "এ মাতাপিতা ত আমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা দিবেন না কিন্তু ইহাতে অন্তর্যামী মাতাপিতা পূর্ণ পরব্রহ্মের আজ্ঞা আছে, তাঁহার আজ্ঞায় বাহির হইয়া যাইব তাহা হইলে উভয়েরই আজ্ঞা পালন হইবে।" তখন মাতা পিতাকে নমস্কার করিয়া শিবনারায়ণ নিজের অভিপ্রায় মনে মনে রাখিলেন এবং দুই চারি দিবস পরে গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন। তখন ইহাঁর বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে।

দ্বাদশ বৎসরের বালক গৃহত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, প্রথমে কোন্ দিকে যাইব। কোন্ কোন্ দেশে কোন্ দ্বীপ, কাহার রাজ্যে কোন্ অভাবে প্রজা কষ্ট পাইতেছে এবং কি করিলে তাহার অভাব নিবারণ হইবে ও কষ্ট যা-ইবে। কি করিলে দেশের রাজা পণ্ডিত জ্ঞানী সমদৃষ্টিতে সকলের উপর দয়া করেন এবং কোন্ দেশের পণ্ডিত ও রাজা এরূপ মূর্খ যে আপনার কষ্ট বুঝেন—অপরের কষ্ট বুঝে না। কি করিলে পণ্ডিত রাজা প্রজা সকলে ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ বিষয় বুঝিয়া আনন্দে থাকিতে পারেন। যাহা করিলে এই সকল বিষয় সম্পন্ন হয় তাহাই আমার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সকলের উপকার হয় তাহাই জ্ঞানবান পুরুষের কর্ত্তব্য। শিবনারায়ণ এই ভাবিতে ভাবিতে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে পৃথিবীর উপর পর্য্যটন করিতে লা-গিলেন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার কাছে সর্ব্বদা এই প্রা-র্থনা করিতে লাগিলেন যে, হে অন্তর্য্যামি গুরু! এই মূর্খ অজ্ঞানি ব্যক্তিদিগের অন্তর হইতে অজ্ঞানতা লয় করিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন যাহাতে ইহারা বুঝিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বদা আনন্দরূপ থাকিতে পারে, যাহাতে কাহারও সহিত ইহাদের দ্বেষ এবং বৈরভাব না থাকে। এই শিব-নারায়ণের সহিত কাহারো দেখা-সাক্ষাৎ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে, "তুমি গৃহস্থ না সাধু, তুমি কি জাতি, তুমি কিছু লেখা পড়া জান, তুমি বেদ পড়িয়াছ?" শিবনারায়ণ বলিলেন আমি লেখা পড়া জানি না, বেদও পড়ি নাই; আমি গৃহস্থ কি সাধু তাহা আমি জানি না; গৃহস্থ এবং সাধু কাহাকে বলে তাহাও আমি জানি না; আমি এই মাত্র জানি যে তোমরাও মনুষ্য; আমিও মনুষ্য, তোমাদেরও হাত পা আছে আমারও হাত পা আছে। আমি যে কি জাতি তাহা জানি না; আমি শরীরের মধ্যে অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু হাড় চামড়ার মধ্যে তো কোন জাতির ঠিকানা পাই-তেছি না; আমি অন্বেষণ করিতেছি—যদি হাড় চামড়া মাসের মধ্যে জাতি পাই তাহা হইলে বলিব।" তাহাতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বলিল, "তোমার গলায় তো যজ্ঞোপবীত আছে তবে যে তুমি জাতি বলিতেছ না?" তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিতেন, বটে ভাই তুমি ও ত সুতার কাপড় পরিয়া আছ, আমি না হয় একটা সুতা গলায় দিয়াছি, তাহাতে কি হইল? সুতাই কি জাতি? পরে শিবনারায়ণ যখন আপনার অন্তরে সূক্ষ্ম শরীরে ত্রিগুণময়ী আত্মা বিষ্ণু মহেশ ব্রহ্মা জ্যোতিঃস্বরূপ যজ্ঞোপবীত পাইলেন; নাসিকা দ্বারে প্রাণ স্বরূপ, নেত্র দ্বারে তেজ স্বরূপ, কর্ণ দ্বারে আকাশ স্বরূপ, এবং পঞ্চতত্ত্বরূপী পঞ্চগ্রন্থি শরীরের মধ্যে পাই-লেন, তখন সুতার যজ্ঞোপবীতকে গলা হইতে খুলিয়া গাছে টাঙ্গাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া

দেশের অবস্থা সকল দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ ভ্রমণ ক্রমে শিবনারায়ণ একদিন বঙ্গদেশে আসিয়া কোন ভদ্র বঙ্গ বাবুর নিকট প্রাণ ধারণার্থ কিঞ্চিৎ আহার যাচ্ঞা করায় বাবু বলিলেন, "তোমার শরীর ত হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতেছি, চাক্‌রি করিয়া খাইতে পার না; যাচ্ঞা করিয়া বেড়াও—তোমার লজ্জা হয় না?" তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক বটে—শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া খাওয়া জ্ঞানবান লোকের কাজ কিন্তু আমি এক জনের চাকরি করিতেছি—যাঁহার এই জগৎ। তবুও যদি আপনি চাকরি দেন তাহা আমি করিতে স্বীকার আছি, কিছু দিন আপনাদেরও চাকুরি করিয়া লই। তাহাতে বাবু বলিলেন, "যদি তুই ঈশ্বরের চাকরি করিতেছিস্ তবে বাটী বাটী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিস্ কেন—তিনি কি আহার দিতে পারেন না? শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক বটে, তাঁহার উপর নিষ্ঠা হইলে অপরের নিকট যাইবার আর প্রয়োজন কি? তখন বাবু বলিলেন, তুই খোরাক পোসাক পাইবি আর মাসে দুইটাকা মাহিয়ানা পাইবি দেউড়িতে পড়িয়া থাক্। না থাকিস্ চলিয়া যা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, আমাকে টাকা দিতে হবে না কেবল খোরাক পোসাক দিলেই হবে, আমি থাকিব। বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তুই টাকা লইবি না—তোর কি বাড়িতে বাপ মা নাই?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "থাকুক না থাকুক—যাইবার সময় যাহা আপনার বিচারে হয় করিবেন, এখন তো থাকি।" বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় শিবনারায়ণকে রাখিলেন এবং তাঁহার দ্বারা কার্য্য করাইতে লাগিলেন। শিবনারায়ণকে কি উৎকৃষ্ট এবং কি নিকৃষ্ট যে কার্য্য করিতে বলিতেন শিবনারায়ণ বিনা ওজরে সেই কার্য্যই করিতেন। বাবু কোন কার্য্য করিতে ইঙ্গিত করিবা-মাত্র শিবনারায়ণ সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, পুরাতন চাকরেরা সেরূপ করিতে পারিত না। বাবু মনে-মনে করিতেন যে, বিনা বেতনে উত্তম চাকর পাইয়াছি—যে কার্য্য করিতে হুকুম করিতেছি সেই কার্য্য উত্তম রূপে করিতেছে। শিবনারায়ণ ২।৩ মাস ঐ বাবুর বাটিতে থাকিয়া চুপ করিয়া সেখান হইতে রামপুর বোয়ালিয়াতে চলিয়া গেলেন। রামপুরে যাইয়া কোনো এক মহাজনের বাটীতে পূর্ব্বের মত যাচ্ঞা করাতে তিনিও হরনাথ বাবুর মতো শিবনারায়ণকে চাকর রাখিলেন। শিবনারায়ণের দ্বারা মহাজনেরও উত্তমরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। মহাজন সকল চাকরকেই শালা বলিয়া সম্বোধন করিতেন—কাজে কাজেই শিবনারায়ণকেও শালা বলিতেন। কোনো স্থানে কোনো মাল রওনা করিতে হইলে মহাজন চাকর দ্বারা করাইতেন, তাহাতে পুরাতন চাকরেরা টাকা অধিক খরচ করিত এবং ইহাতে উহাতে খরচ হইয়াছে বলিয়া মহাজনকে হিসাব দিত। কিন্তু যখন তিনি শিবনারায়ণকে ঐ কার্য্যে নির্দ্দেশ করিতেন তখন খরচ কম লাগিত এবং তিনি কোন মিথ্যা হিসাব দিতেন না, এবং যথাযোগ্য ন্যায্য খরচ করিতেন। শিবনারায়ণ কাহারও সহিত অধিক কথা-বার্ত্তা কহিতেন না; তাহাতে মহাজন বলিতেন, "এ বেটা বোকা, কিছু জানে না কিন্তু ইহার মধ্যে এই গুণ দেখা যাইতেছে যে, যেখানে বৈসে সেইখানেই একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারো সহিত

কথাবার্ত্তা কহে না এবং যাহা আমি বলি তাহাই শুনে; যে কার্য্যে আমি পাঠাই সেই কার্য্য করে—কোনো ওজর করে না। বোধ হয় কোনো ভাল লোকের ছেলে কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা বলে না তাহাতে বোকার মতন বোধ হয়।” এই মহাজনের নাম দেবিদাস ছিল। এক দিন দেবিদাস বাবু একজন চাকরকে কটু কাটব্য গালি দিতেছিলেন তাহাতে শিবনারায়ণ তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতি পূর্ব্বক বুঝাইতে লাগিলেন যে, আপনি মনিব মাতা পিতার তুল্য; আমার কথায় রাগ করিবেন না—ক্ষমা করিবেন। কৃপা করিয়া গম্ভীর ভাবে আমার দুই চারিটি কথা শুনুন, আপনি হলেন মনিব ও হোলো আপনার চাকর; ওর বিপদ হইয়াছে—সেই বিপদের দরুণ আপনার আশ্রয়ে চাকরি করিতেছে; ওরাও তো ভদ্র সন্তান; উহাদিগকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা কার্য্য করাইতে হয়। তুচ্ছ তুচ্ছ কথা লইয়া উহাদিগকে গালাগালি দিলে উহাদের মনে বড় কষ্ট হয়; বিচার করিয়া দেখুন যদি উহারা ধনী হইত আর আপনি দরিদ্র হইতেন ও উহাদের কাছে চাকর থাকিতেন এবং উহারা যদি আপনাকে গালি দিত তাহা হইলে আপনার মনে কত কষ্ট হইত। সর্ব্বদা সকলে ধনী থাকে না—সকলেরইত কোন না কোন সময়ে বিপদ পড়ে। বিচার করিয়া দেখুন আপনার জন্মের পূর্ব্বে কি আপনি ধনী ছিলেন এবং ধন কি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং ধন কি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন?” এই কথা শুনিয়াও দেবিদাস বাবুর জ্ঞান না হইয়া অহংকার প্রযুক্ত শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন, “বেটা—তুমি আমার চাকর হইয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছ—বেটা দূরহ আমার সম্মুখ হইতে!” শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে, ইহাঁর কোন দোষ নাই—ইনি আপনার বশে নাই; যেরূপ মাতালেরা মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া প্রমাদ বশতঃ সকলকে গালাগালি দেয় এবং নর্দ্দামায় ও বিষ্ঠাতে পড়িয়া থাকে সেইরূপ অবোধ লোকের বিদ্যা, ধন, রাজ্য, হইলে তাহারা তাহার নেশাতে উন্মত্ত হইয়া জ্ঞানহারা হইয়া থাকে—তাহাদের কোন বাধা বোধ থাকে না, কেবল এই বোধ থাকে যে, আমি রাজা ধনী এবং বড় লোক, আমার মত কেহই নাই; কাহারো উপর দয়া দৃষ্টি করে না, অন্ধ হইয়া থাকে; এ বিচার থাকে না যে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, এবং পূর্ণ পবব্রহ্ম গুরুর স্বরূপ কি? এই জগতে আমি যে আসিয়াছি আমার কি করা কর্ত্তব্য—ফলতঃ কোন বোধই থাকে না; সর্ব্বদা চঞ্চল ভাবে থাকে, কখন মনে সুখ পায় না। কিন্তু যদ্যপি জ্ঞানবান ব্যক্তির বিদ্যা, ধন, রাজ্য, হয় তবে তিনি সর্ব্বদা গম্ভীর, শান্ত, ধীর ও সন্তুষ্ট ভাবে থাকেন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকেন; চরাচর রাজা প্রজা যাহাতে সকলে সুখে থাকে তাহারি চেষ্টা করেন এবং সকলকে মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট রাখেন। শিবনারায়ণ এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া কিছু দিন কালক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে পদ্মা নদীর ধারে আসিয়া বসিলেন ও অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল মাত্র পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৮৩৬॥ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২৫২৭ ৫
সমষ্টি	৪৩৬৩॥১০
ব্যয় ...	১৬৫৪৮১০
স্থিত	২৭০৮৮০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭৩।৵১৫

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়া ঘাটা) ১৮১০ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১০ শকের মাঘ হইতে ১৮১১ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত	১২৲

সাম্বৎসরিক দান।

মহর্ষি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " শিবচন্দ্র নন্দী	১০৲
" " শম্ভুচন্দ্র মিত্র	৫৲
" " কেদারনাথ মিত্র	২৲
" " আশুতোষ ধর	২৲
" " রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২৲
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲
" " নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	১৲
" " বনমালী চন্দ্র	১৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়া ঘাটা)	২৲
" " ভবদেব নাথ (গোয়াড়ী)	২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী	॥৵০
শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (বোলপুর)	২৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৬।১৫
	১৭৩।৵১৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২০১॥৶০
পুস্তকালয় ...	৪৬ ⁄১০
যন্ত্রালয় ..	১০৩১৮৵০
গচ্ছিত ...	২৫৮॥⁄০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৮৮৵০
দাতব্য ...	৯৯৲
সমষ্টি	১৮৩৬॥ ৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫৫০॥⁄১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫৬।৵১০
পুস্তকালয়	৯৩ ৶০
যন্ত্রালয়	৬৪৮॥৵৫
গচ্ছিত	৮১৮৶৫
দাতব্য	২৪৲
সমষ্টি	১৬৫৪৮ ১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৪ শে আশ্বিন বুধবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। ভক্ত ব্রাহ্মগণ যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।
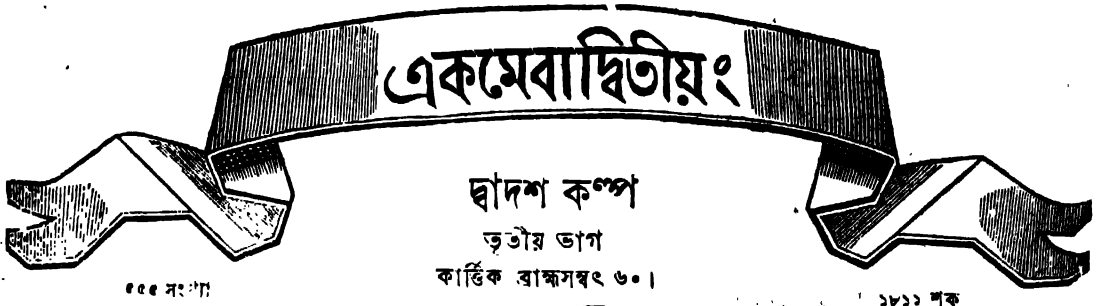
একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

৫৫৫ সংখ্যা ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রকৃতির দুইটি সোপান-পংক্তি আমরা উত্তরোত্তর ক্রমে প্রদর্শন করিলাম;—(১) বল-রাজ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং (২) জীবন-রাজ্যে জীবনী-শক্তির (Life-power) এবং বল-শক্তির (Force-power কি না mere physical power) প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই দুই সোপান অতিক্রম করিয়া, তাহার পরে তবে আমরা চেতন-রাজ্যে উপনীত হই। এক লম্ফে আমরা বল-রাজ্য হইতে চেতন-রাজ্যে উপনীত হইতে পারি না। বল-রাজ্য এবং চেতন-রাজ্য এই দুই রাজ্যের মধ্যস্থলে প্রাণ-রাজ্য অবস্থিতি করিতেছে; প্রাণ রাজ্য ডিঙাইয়া আমরা বল-রাজ্য হইতে চেতন-রাজ্যে উপনীত হইতে পারি না। উত্তাপাদির ন্যায় প্রাণ শুধু কেবল ভৌতিক পদার্থ-সকলের—উপরে উপরে কার্য্য করে না; প্রাণ—ভৌতিক বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া একেবারেই তাহার পারমাণব ধাতুর (atomic constitution) উপরে কার্য্য করে; শুদ্ধ কেবল ভৌতিক্-প্রণালীতে কার্য্য করে না, কিন্তু তদপেক্ষা আর-এক ধাপ উচ্চ প্রণালীতে কার্য্য করে—রাসায়নিক প্রণালীতে কার্য্য করে; জড়-বস্তু-সকলের মর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করে; এমন কি আবশ্যক হইলে অধিকারস্থ জড়বস্তুর রাসায়ণিক প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনার কার্য্যোপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়। প্রাণ এলোমেলো ভাবে কার্য্য করে না, কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য-সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে; গর্ত্তস্থ শিশু ভবিষ্যতে খা'বে কি—প্রাণ পূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন করিতে থাকে। তরু অঙ্কুরিত হইয়া সহস্র পত্রের সহস্র মুখরন্ধ্র দিয়া কি রূপে আলোক-রঞ্জিত বায়ু পান করিবে—মৃত্তিকা-গর্ত্তস্থিত বীজের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন হইতে থাকে। জীবনের ব্যাপার এইরূপ একটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সাধনের ব্যাপার। কিন্তু উদ্ভিদ্ রাজ্যে প্রাণ অন্ধ-ভাবেই স্বীয় লক্ষ্য সাধন করে; বৃক্ষ যে কি জন্য কি করিতেছে—বৃক্ষ নিজে তাহার কিছুই জানে না; অথচ

যাহার জন্য যাহা করিতে হয়, তাহার জন্য তাহাই করে—বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করে; কখনো যদি এরূপ ঘটে যে, একটি বৃক্ষের আশ-পাশের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু তাহার কিয়দ্দূর অন্তরে সরস মৃত্তিকা অবস্থিতি করিতেছে,তবে যত সোজা রাস্তা দিয়া সেই সরস মৃত্তিকায় শিকড় বাড়ানো যাইতে পারে—বৃক্ষটি পারৎপক্ষে তাহার চেষ্টার ক্রটি করে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃক্ষের সে চেষ্টা অন্ধ চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই না—তাহা সজ্ঞান চেষ্টা নহে। কোনো তার্কিক এখানে বলিতে পারেন—"কেমন করিয়া জানিলে তাহা সজ্ঞান চেষ্টা নহে?" ইহার সহজ প্রত্যুত্তর এই যে, মনুষ্য ঔদ্ভিদ প্রাণ রাজ্য মাড়াইয়া—পাশবিক সংস্কার-রাজ্য মাড়াইয়া—জ্ঞান-রাজ্যে উঠিয়াছে; এই জন্য, প্রাণের ব্যাপারই বা কাহাকে বলে, অন্ধ সংস্কারের ব্যাপারই বা কাহাকে বলে, আর, জাগ্রত জ্ঞানের ব্যাপারই বা কাহাকে বলে—ইহার কিছুই তাহার নিকটে অবিদিত নাই। মনুষ্য আপনার মধ্যেই অচেতন প্রাণের ব্যাপার অনেক গুলি দেখিতে পায়—যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ধমনী স্পন্দন, ইত্যাদি; অন্ধ সংস্কারের ব্যাপারও অনেকগুলি দেখিতে পায়, যেমন, সহাস্য প্রফুল্ল বদন দেখিলে তাহার দিকে নির্ব্বিচারে অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি এবং ক্রূর মুখভঙ্গি দেখিলে তাহা হইতে নির্ব্বিচারে পিছাইয়া আসিবার প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। একদিকে প্রাণ এবং অন্ধ সংস্কার, আর একদিকে জাগ্রত জ্ঞান, এ দুয়ের বিভিন্নতা মনুষ্য প্রথমতঃ আপনার অভ্যন্তরে সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, অন্যের বাহ্য-লক্ষণ দৃষ্টে তাহার কোন্ কার্য্যটি কোন্ শ্রেণীস্থ—প্রাণ-শ্রেণীস্থ সংস্কার-শ্রেণীস্থ অথবা জ্ঞান-শ্রেণীস্থ—তাহা বুঝিতে পারে। এইরূপ প্রণালী অনুসারেই আমরা বুঝিতে পারি—যে,লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা যাহা উদ্ভিদ্ রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা অন্ধ-চেষ্টা মাত্র; তেতালার উপর-হইতে কোনো মনুষ্য ভূতলে পড়িয়া যাইবার সময়, সে এরূপ-ভাবে হস্ত প্রসারণ করে যাহাতে তাহার মস্তক আঘাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে; এরূপ কার্য্য বিশেষ-একটি লক্ষ্যের সাধন তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা সজ্ঞান কার্য্য নহে, কেন না তাহা কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে কৃত হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এরূপ কার্য্যকে প্রাতিক্ষেপিক কার্য্য (reflex action) বলে। অর্দ্ধ সুপ্ত ব্যক্তির পায়ে সুড়্সুড়ি দিলে, সে যেমন অজ্ঞাতসারে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে—সেই রকমের অন্ধ চেষ্টাই বিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রাতিক্ষেপিক কার্য্য বলিয়া উক্ত হয়। উদ্ভিদের মূল-প্রসারণ কার্য্য এইরূপ প্রাতিক্ষেপিক রকমের কার্য্য; সুতরাং তাহা লক্ষ্য বিশেষের সাধন-স্বরূপ হইলেও, তাহা সজ্ঞান-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। উদ্ভিদ্-রাজ্য হইতে একধাপ উচ্চে পা বাড়াইয়া যখন আমরা জীব-রাজ্যে উপনীত হই, তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণের অচেতন লক্ষ্য-সাধন-প্রবৃত্তির চক্ষু ফুটিয়া তাহা সচেতন ভাব ধারণ করিয়াছে; কার্য্য পূর্ব্বেও যে প্রণালীতে চলিতেছিল এখনো সেই প্রণালীতে চলিতেছে—কেবল পূর্ব্বে যেখানে জ্ঞান-চক্ষু ছিল না এখন সেইখানে জ্ঞান-চক্ষু পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাণই মুখ্য-রূপে জ্ঞান-দ্বারা চেতিত হয় এবং প্রাণের মধ্য দিয়াই শরীর ও বহির্বস্তু-সকল জ্ঞানের আয়ত্তাভ্যন্তরে আনীত হয়। এই

জন্যই জ্ঞান-পরিস্ফুটনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণ-পরিস্ফুটনের প্রয়োজন। এখন আমরা অচেতনের অন্ধকার হইতে চেতনের আলোকে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি;—এই জন্য এখন আর আমাদিগকে বেশী অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না; আমাদের অন্বেষ্য তত্ত্ব-গুলি আমরা আমাদের আপনার আপনার অভ্যন্তরেই জ্ঞানালোকে অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিব।

উপরে এই যে একটি কথা বলিলাম যে, জ্ঞান-পরিস্ফুটনের পূর্ব্বে প্রাণ পরিস্ফুটনের প্রয়োজন, এ কথাটি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? অনভিজ্ঞ লোকে মনে করিতে পারে যে, এ তত্ত্বটি আমরা বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়াছি; উদ্ভিদ্‌গণকে আমরা জীব অপেক্ষা অনেকাংশে অসহায় দেখিতে পাই, এবং সচেতন জীবদিগকে আমরা তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে স্ববশ দেখিতে পাই, এই জন্যই আমরা বলি যে, নীচের ধাপ হইতে উপরের ধাপে পদার্পণ যদি প্রকৃতির সকল কার্য্যেরই প্রচলিত পদ্ধতি হয় তবে অগ্রে উদ্ভিদের অভিব্যক্তি, পরে জীবের অভিব্যক্তি, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে, প্রাণের প্রকাশ্য কার্য্য সকল যত না স্পষ্ট রূপে আমরা বাহিরে প্রত্যক্ষ করি, সাক্ষাৎ প্রাণকে আমরা আপন আপন অন্তঃকরণের মধ্যে তদপেক্ষা আরো নিগূঢ় রূপে অনুভব করি। প্রাণ চেতনের আভাসে রঞ্জিত হইয়া সংস্কার-রূপ ধারণ করে এবং মনুষ্যের সংস্কার চেতনের নিয়মে নিয়মিত হইয়া সুসংযত প্রবৃত্তি-রূপ ধারণ করে। প্রথমে আমরা সংস্কার অনুসারে কার্য্য করি, তাহার পরে আমরা সেই সংস্কারকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি। ইহার উদাহরণ;—প্রথমে আমরা সহজ সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া মাতৃভাষা শিক্ষা করি, তাহার পরে সেই সহজায়ত্ত ভাষার উপরে জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া তাহার মধ্য হইতে ব্যাকরণের নিয়ম সকল টানিয়া বাহির করি এবং সেই সকল নিয়মকে জ্ঞাতসারে ভাষার উপরে প্রয়োগ করিয়া বিশুদ্ধ রূপে ভাষা ব্যবহার করি; পূর্ব্বেও আমরা কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ার স্থানভেদাদির নিয়ম ভাষার উপরে প্রয়োগ করিতাম—কিন্তু তখন তাহা অজ্ঞাতসারে করিতাম; ব্যাকরণ শিক্ষার পূর্ব্বে যাহা আমরা অজ্ঞাতসারে করিতাম, ব্যাকরণ শিক্ষার সময় তাহাই আমরা জ্ঞাতসারে করি—এই যা প্রভেদ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ প্রভেদটি সামান্য প্রভেদ নহে—কেননা এই প্রভেদটিই মনুষ্য এবং ইতর জীবদিগের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে।

সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া প্রকৃতির কার্য্য-প্রণালীর চারি-টি সোপান-পংক্তি—(১) আকর্ষণ-শক্তি, (২) জীবনী-শক্তি, (৩) সংস্কার-শক্তি, (৪) সংযম-শক্তি (যাহা মনুষ্য ভিন্ন ইতর কোনো জীবে নাই)। তাহার মধ্যে প্রথম দুইটি পংক্তি অচেতন শ্রেণীভুক্ত; শেষের দুইটি পংক্তি সচেতন শ্রেণী-ভুক্ত। চেতন-ব্যাপার দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) অনুভবাত্মক চেতন এবং (২) বিবেকাত্মক চেতন; অনুভবাত্মক চেতন ইতর জীব-দিগেরও আছে—ইতর জীবেরাও ক্ষুৎপিপাসাদি অনুভব করে; কিন্তু বিবেকাত্মক চেতন শুদ্ধ কেবল মনুষ্যেতেই দৃষ্ট হয়—ইতর জীবে তাহার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। আত্মানাত্ম-বিবেক, সত্যাসত্য বিবেক, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক, ইহার কোনোটিই জীবে সম্ভবে না; একটা কুকুর

মনুষ্যের ভাষা ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে ;— কিন্তু ভাষার বহিরাবরণ হইতে ভাষার নিয়ম-পদ্ধতি গুলিকে বিবিক্ত করিয়া সে-গুলি জ্ঞানায়ত্ত করা শুদ্ধ কেবল মনুষ্যেরই কার্য্য—তাহা কোনো ইতর জীবেরই কার্য্য নহে। ইতর জীবের এবং মনুষ্যের চেতনকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; আর, প্রভেদ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা শুধু-কেবল মাত্রা-গত প্রভেদ নহে কিন্তু জাতিগত প্রভেদ। অতঃপর আমরা সেই প্রভেদ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রকৃতির প্রথম দুইটি সোপান-পংক্তিতে আমরা যে রূপ দুই দুই বিরোধী পক্ষের প্রতিদ্বন্দিতা-অথচ-আবশ্যকতা দেখিয়াছি—চেতন রাজ্যের অভ্যন্তরেও আমরা আর-এক উচ্চতর প্রকারে সেই ভাব-টিই দেখিতে পাইব—এবং তাহার পরে প্রকৃতির উচ্চ-নীচ সমস্ত সোপান-পংক্তি আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া—সমগ্র প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ কি তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

মনুষ্যের বিবেকাত্মক জ্ঞান এবং পশুদিগের অনুভবাত্মক জ্ঞান এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে দুয়েরই কেন্দ্র স্থলে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। অনুভবাত্মক জ্ঞানের কেন্দ্র কি ? না সংস্কার; পশুরা নৈসর্গিক সংস্কার অনুসারেই ইন্দ্রিয়গত উপরাগ-সকল এবং সুখ দুঃখ ভয়-লোভাদির উত্তেজনা সকল অনুভব করে। বিবেকাত্মক জ্ঞানের কেন্দ্র কি ? না সংযম-শক্তি। সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজনা হইতে উপরে উঠিয়া উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান না হইলে সত্যাসত্য, ভালমন্দ, প্রভৃতির বিবেক রীতিমত স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। সংযম শক্তিই মনুষ্যের অন্তরতম শক্তি—সংস্কার-শক্তিই নিকৃষ্ট জীবের অন্তরতম-শক্তি। ইহার পরেই প্রকাশ পাইবে যে, সংযম-শক্তির আশয় অর্থাৎ আধার-বস্তু আত্মা এবং সংযম-শক্তির চরম লক্ষ্য অনন্ত পরব্রহ্ম ; সংস্কার-শক্তির আশয় মন এবং তাহার চরম-লক্ষ্য পরিমিত বাহ্যবস্তু সকল। ইতর জীবদিগের অভ্যন্তরে যত প্রকার কার্য্য-সাধিকা শক্তি আছে, তাহার মধ্যে নৈসর্গিক সংস্কারই সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়। কিন্তু মনুষ্যের অভ্যন্তরে সংস্কার-শক্তি তো আছেই ; তা ছাড়া—সমস্ত মানসিক বৃত্তির নিয়ামক-স্বরূপ সংযম শক্তি বর্ত্তমান। মনুষ্যেতে সংস্কার শক্তি এবং সংযম শক্তি দুইই যদিচ বর্ত্তমান, কিন্তু মনুষ্যের সংস্কার-শক্তি সংযম শক্তির অধীনে থাকিয়া থাকিয়া তাহার তেজ অনেকটা নরম পড়িয়া আসিয়াছে। মনুষ্য কুক্কুরের ন্যায় নৈসর্গিক সংস্কারের উত্তেজনায় চোর ডাকাত চিনিতে পারে না ; মাকড়সা'র ন্যায় আকাশের ভাব-গতিক পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারে না ; বস্ত্রাবৃত চক্ষে অপরিচিত দূর দেশে নীত হইলে বিড়ালের ন্যায় পথ চিনিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে না। আফ্রিকা দেশের কাফ্রিরা বিজন প্রান্তর দিয়া গমনাগমনের সময় কোনো প্রকার অপরিচিত উদ্ভিদ্ দেখিলে অগ্রে তাহার ফল বা মূল বানরকে দিয়া পরখ করে ; বানর যদি তাহা না খায়—তবে তাহারা বিষাক্ত বোধে তাহা ফেলিয়া দেয় ; কিন্তু বানর যদি তাহা ভক্ষণ করে তবে তাহারা নির্ভয়ে তাহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে—"মহাজনো(?)যেন গতঃ স পন্থা !" ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সংস্কার-শক্তির পরিস্ফুটনই যদি জীবের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় হয়, তবে মনুষ্য অপেক্ষা

বানর শ্রেষ্ঠ জীব তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নিকৃষ্ট জীবের তেজস্বী সংস্কার-শক্তির সঙ্গে মনুষ্যের মৃদু সংস্কার শক্তির তুলনাই হয় না। মনুষ্যের সংস্কার শক্তি যে, একেবারেই নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা সংযম শক্তির প্রভাবের অধীনে থাকিয়া থাকিয়া এক-রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে—আজন্ম কাল পিঞ্জরে কারাবদ্ধ থাকিলে পক্ষীর দশা যেরূপ হয় তাহারও দশা সেইরূপ হইয়াছে। সংস্কার শক্তি এবং সংযম-শক্তি এ দুয়ের মধ্যে প্রধান প্রভেদ লক্ষণ দুইটি ;

(১) সংস্কার-শক্তি অনুভবাত্মক ; সংযম শক্তি বিবেকাত্মক।

(২) সংস্কার শক্তির চরম লক্ষ্য পরিমিত; সংযম-শক্তির চরম লক্ষ্য অপরিমিত।

প্রথম প্রভেদ চিহ্ন ;—মৌমাছিরা অতীব সুকৌশলে চাক নির্ম্মাণ করে ; কিন্তু তাহাদের চাক-নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিবেকের কোনো লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হয় না। মধুকোষের জ্যামিতিক আকার কিরূপ হইলে অল্প আয়তনের মধ্যে অধিক মধু ধরিতে পারে—মৌমাছি তাহার বাষ্পও জানে না, অথচ শুদ্ধ কেবল একপ্রকার আন্তরিক অনুভবের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ আশ্চর্য্য বিজ্ঞান-সঙ্গত আকারে মধুকোষ নির্ম্মাণ করে যে, এক জন যন্ত্রবিদ্যা-বিশারদ কারিকর তেমন পারে কি না সন্দেহ। শুদ্ধ কেবল নৈসর্গিক সংস্কারের প্রভাবে কুকুর অনেক সময় একজন আগন্তুক সাধু ব্যক্তিকে কিছু বলে না—কিন্তু চোরকে তাড়াইয়া ধরে, কিন্তু কিসে যে ও-ব্যক্তি সাধু, আর, এ ব্যক্তি চোর—তাহার সে বিন্দুবিসর্গও জানে না ; কাজেই বলিতে হইতেছে যে, শুদ্ধ কেবল-এক অহেতুক অনুভবই তাহার মূল ; তাহা সত্যাসত্য-বিবেকের অথবা ভাল-মন্দ বিবেকের কোন ধারই ধারে না।

দ্বিতীয় প্রভেদ লক্ষণ ; সংস্কার-শক্তির লক্ষ্য পরিমিত বিষয়" এ কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, মৌমাছির যত কিছু নির্ম্মাণ শক্তি সমস্তই মৌচাক নির্ম্মাণেই ব্যয়িত হয় ; বাবুই পাখীর যত কিছু নির্ম্মাণ-শক্তি সমস্তই বাবুই-বাসা নির্ম্মাণেই ব্যয়িত হয়; তা ছাড়া—মৌমাছি বোল্‌তা'র চাকের মতো চাক নির্ম্মাণ করিতে পারে না; বাবুই পাখী কাঠ-বিড়ালীর বাসার মতো বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারে না ;—সংস্কারের পরিধি ক্ষেত্র এইরূপ পরিমিত। মনুষ্যের নির্ম্মাণ কার্য্য শুধু কেবল সংস্কার-মূলক নহে—অধিকন্তু তাহা জ্ঞান-মূলক ; এজন্য এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, নৌকার নির্ম্মাতা শকট নির্ম্মাণ করিতেও প্রস্তুত—কুটীরের নির্ম্মাতা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেও প্রস্তুত। অর্থাৎ এমন কোনো কথা বার্ত্তা নাই যে,মনুষ্যের নির্ম্মাণ-শক্তি বিশেষ একটি-কোনো ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিবে—তা ছাড়া তাহা আর কোনো ব্যাপারেই হস্ত-ক্ষেপ করিতে পারিবে না। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, পশ্বাদির সংস্কার-শক্তি পরিমিত ক্ষেত্রেই আবদ্ধ।

উপরে দুইটি তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইল—(১) সংস্কার বিবেকাত্মক নহে এবং (২) সংস্কার পরিমিত বিষয়-ক্ষেত্রেই আবদ্ধ।

কিন্তু মনুষ্য-জ্ঞানের প্রকৃতি এরূপ নহে যে, তাহা কোনো পরিমিত বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে পারে। এস্থলে কেহ যেন ভুল না বোঝেন, এরূপ না বোঝেন যে, নির্দ্দিষ্ট কোনো বিষয়ে বদ্ধ না থাকিয়া শুধু কেবল অনির্দ্দেশ্য বিষয় (গণিতের x) হাতড়িয়া বেড়ানোই মনুষ্য-জ্ঞানের একমাত্র কার্য্য।

তাহা নহে ;—কথাটি শুধু এই যে, মনুষ্য যখন যে কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত হয়, তখন সে কেবল সেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তজ্জাতীয় আর আর কার্য্যেও পটুতা লাভ করে। বাবুই পাখী বাসা নির্ম্মাণ করে—বাসাই নির্ম্মাণ করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো কার্য্যেই পটুতা লাভ করে না ; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি ভাল করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ শিক্ষা করে, সে ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে ; যে ব্যক্তি ভাল করিয়া জেলে ডিঙ্গি নির্ম্মাণ করে, সে ব্যক্তি জাহাজ-নির্ম্মাণের সামর্থ্য-লাভে এক ধাপ অগ্রসর হয়। ইহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, কোনো পরিমিত কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ মনুষ্যের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না—সিদ্ধির উপরেও সিদ্ধি আছে—তাহার উপরেও সিদ্ধি আছে। সেই অনন্ত সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত রাখিয়া—এবং সেই অনন্ত সিদ্ধির সহিত উপস্থিত সিদ্ধির যোগ রক্ষা করিয়া —মনুষ্য যে কোনো কার্য্য সাধন করে, তাহাতে শুদ্ধ কেবল সেই কার্য্যেই পটুতা লাভ করে না, কিন্তু অনন্ত উন্নতির জন্য যোগ্যতা লাভ করে। পরিমিত বিষয়ের প্রতি এবং পরিমিত সিদ্ধির প্রতি অযোগ্য পরিমাণে আসক্তিই অনন্ত উন্নতি-পথের প্রতিবন্ধক। কিন্তু মনুষ্য যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রম না করিবে—তবে তাহার সংযম-শক্তি কিসের জন্য ? অতঃপর মনুষ্যের সংযম শক্তি এবং ইতর জীবের সংস্কার শক্তি এতুয়ের মধ্যে কতখানি প্রভেদ তাহা সবিস্তরে পর্য্যালোচিত হইবে। [শ্রীদ্বি]

ক্রমশঃ

ব্রহ্মপূজা।

যদিও আমাদের দেশ এখন নানা প্রকার কুসংস্কারজালে জড়িত, জ্ঞানের স্বাধীন চর্চ্চা নাই, নীতির পূর্ণ বিকাশ নাই, এবং জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য নাই, তথাপি একদিন এমন গিয়াছে যে দিন আমাদের দেশের ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিরা জ্ঞানের অগম্য, ভাবের অতীত অনন্ত ঈশ্বরকে হস্তামলকবৎ দর্শন করিয়াছেন। সে দিন অনেক দিনের কথা, সুতরাং সে কথা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদিগকে আবার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে।

অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইল, তমসাচ্ছন্ন ভারতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচারার্থ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ শাস্ত্র সমালোচনা করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া যান। তৎপর পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাক্যে, জীবনে ও অনুষ্ঠানে ব্রহ্ম-উপাসনার জ্বলন্ত চিত্র ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকেই মনে করিতে পারেন, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপাসনা, এই দুইটী বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইল কেন ? বাস্তব পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপাসনা, দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক ছিলেন। এক শ্রেণীর লোকেরা ব্রহ্মজ্ঞানী, অপর শ্রেণী ব্রহ্ম-উপাসক। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তাঁহারা বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদি করিতেন, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান বলিয়া, ব্রহ্ম-বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করি-

তেন। আর যাঁহারা ব্রহ্ম-উপাসক ছিলেন, তাঁহারা যাগ যজ্ঞকে অসার মনে করিয়া এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাতেই কৃতকৃতার্থ হইতেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মজ্ঞান,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা অপরা চ।"

দুইটি জ্ঞাতব্য বিদ্যা আছে, একটি পরা অপরটী অপরা। অপরা ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ ইত্যাদি। যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় সেই পরা বিদ্যা অথবা ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মনির্ণয়ের দুইটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ এই—অস্থূলমনম্বহ্রস্ব ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি স্থূল ন'ন, তিনি হ্রস্ব ন'ন, তিনি সূক্ষ্ম ন'ন, ইত্যাদি নেতি নেতি অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নয়, ইহা ব্রহ্ম নয়, এই জ্ঞান বা এই লক্ষণকে তটস্থ লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। এই তটস্থ লক্ষণকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে। কোন সমুদ্রের তটে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান যেমন সমুদ্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম, অর্থাৎ সমুদ্র শীতল কি না, সমুদ্র লবণাক্ত কি না, ইত্যাদির অনুভূতি অসম্ভব, সেইরূপ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের অনুভূতিও অসম্ভব। 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলিতে গেলে শুদ্ধ যে পূর্ব্বোক্ত কয়টী কথা বুঝাইবে, তাহাও নয়। ব্রহ্মবাদীরা বলেন—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"

যাঁহা হইতে ভূত সকল অর্থাৎ প্রাণী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে স্থিতি করিতেছে, ও যাঁহাতে প্রবেশ করিবে, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিবার জন্য চেষ্টা কর।

"স তপোতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।"

তিনি ইচ্ছা করিলেন, ইচ্ছা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিলেন, যাহা কিছু তোমরা দেখিতেছ।

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

এই জগৎ পূর্ব্বে ছিল না। হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র সত্যই ছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

উপনিষদের এই সকল শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন ব্রহ্মবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঈশ্বরকে সর্ব্বমূলাধার, সৃষ্টিকর্ত্তা, অদ্বিতীয় এবং নিত্য-আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি জড় পদার্থ নহেন, নিত্য ও চেতন, ইহাতেও তাঁহাদের একান্ত প্রতীতি ছিল। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে যজ্ঞাদি করিতেন, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ অনেক আছে। তাহার মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"জনকোবৈ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে তত্রহ কুরু পাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণাঅভিসমেতাঃ বভূবুঃ।"

বিদেহাধিপতি জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে কুরু পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনক একজন ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তথাপি তিনি যজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাংই আমরা বলিতে বাধ্য হইব, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপাসনা স্বতন্ত্র পদার্থ। জনকাদি ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম-উপাসক ছিলেন না।

নেতি নেতি করিয়া আমরা ইতিতে উপস্থিত হইতে পারি। 'নেতি' এই কথার মূলে বিশ্বাস আছে। বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিয়া নেতি নেতি ভাবের উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন ব্রহ্ম-

পরায়ণ সাধুরা ব্রহ্মের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করিয়া 'ব্রহ্ম কি?' 'তিনি কোথায়?' ইহা জানিবার জন্য আকুল হৃদয়ে ব্রহ্ম-নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যাহা অসত্য যাহা অসার, যাহা কাল্পনিক, আর যাহা জড় বা জড়ীয় গুণসম্পন্ন, তাহাকে নেতি নেতি বলিয়া দূরে বিদায় করিয়া দিতেন, এবং সার-সত্য ও সার-তত্ত্বে উপনীত হইতেন। নেতির মূল-ভূমি আস্থা। এই আস্থার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর আছেন।' ইহা ঈশ্বর নয়, ইহা ঈশ্বর নয়, এইরূপ চিন্তা, আলোচনা, পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা 'ইহা ঈশ্বর' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নাম ব্রহ্মজ্ঞান। নেতি নেতি করিয়া ইতিতে উপস্থিত হওয়া যায়, অর্থাৎ অনীশ্বরত্ব গুণের শেষ ও ঈশ্বরত্ব গুণের প্রারম্ভে উপনীত হওয়া যায়। ঈশ্বরত্ব গুণের প্রারম্ভে উপস্থিত হইলেই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। ঈশ্বর ইহা নয়, ঈশ্বর উহা নয়, ঈশ্বর তাহা নয়, তবে ঈশ্বর কি? এই প্রশ্নের উত্তরই স্বরূপ-লক্ষণের লক্ষ্য। সুতরাং প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের পরেই স্বরূপ লক্ষণের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি"। এই স্বরূপ-লক্ষণে উপনীত হইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। জলে অবতরণ না করিলে যেমন সন্তরণ শিক্ষা করা যায় না, ব্রহ্ম-স্বরূপে নিষ্ঠাবান না হইলে সেইরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য ব্রহ্ম-উপাসনার প্রয়োজন। প্রাচীন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মোপাসকেরা ব্রহ্ম-স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মকে সার ও তদিতর বস্তুকে অসার মনে করিয়া 'সত্যং' এই মহা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। জল সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির জ্ঞান না থাকিলে সেই ব্যক্তি যেমন জলে নিমগ্ন হইয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলে "জল শীতল, জল শীতল" সেইরূপ প্রাচীন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্ম-স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "সত্যং"। পিপাসু ব্যক্তি পিপাসার প্রবল আক্রমণে অধীর হইয়া জলের অন্বেষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি জল পাইয়া পিপাসা নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন "ওগো! জলে পিপাসা নিবারণ হয়, জল পানকর, জল পানকর।" ব্রহ্মপরায়ণ সাধুও একাকী অরণ্যে বাস করিয়া নির্জ্জনতার মধ্যে নানা প্রকার ভয় ও বিভীষিকা দেখিতেছিলেন, প্রাণের ব্যথা বলিবার জন্য হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল, মন বিষণ্ণ হইতেছিল, ত্রিজগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, হৃদয়ের হৃদ্যবস্তু পাইবার জন্য হৃদয় হাহাকার করিতেছিল, তখন আত্মার মধ্যে সেই জ্ঞানের আলোক পাইলেন, আঁধারে আলোক দেখিলেন, নির্জ্জনে বন্ধু পাইলেন। প্রাণের ব্যথা জানাইতে, মনের কথা বলিতে; প্রাণের মধ্যে জ্ঞানময় পুরুষকে দেখিয়া বলিলেন "জ্ঞানং।" তার পর একে একে জল স্থল অন্তরীক্ষ পর্ব্বত গিরি নদী ও সমুদ্র, ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতি ব্রহ্মের সত্তা ও জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া গেল, তখন অমনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন:—

"অনন্তম ব্রহ্ম"

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি।

অনেকের মুখেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে অগম্য অপার ও অসীম মনে করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন কিন্তু ব্রহ্ম-উপাসনা করিতেন না। এই কথাটী সম্পূর্ণ ভ্রম।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে নহাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।"

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে সাধক পরমাত্মাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনই বিনাশ হইবে না।

আর এক স্থানে লিখিত আছেঃ—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

পরমাত্মা দর্শনীয়, শ্রবণীয়, মননীয় ও নিদিধ্যাসনীয়। পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দেখা যায়, শুনা যায়, মনন ও ধ্যান করা যায়।

"তদেৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

সেই এই যে পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয় এবং অপরাপর সমস্ত বস্তু হইতেও প্রিয়তম।

এই কয়টী শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, ঋষিরা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাকে দর্শন করা যায়; তাঁহার কথা শ্রবণ করা যায়, তিনি ধ্যানগম্য এবং মননীয়। শুদ্ধ এই বলিয়াই যে তাঁহারা নিরস্ত হইয়াছিলেন, তাহাও নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। "যদয়মাত্মা" এই যে আত্মা—এই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আমার পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয় এবং অপরাপর বস্তু হইতেও প্রিয়। ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রমাণ আর কি দেওয়া যাইতে পারে?

জগত গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন। মানুষ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, শক্তি থাকিতেও আতুর, চেতনা থাকিতেও চেতনাহীন। পূর্ব্ব দিক হইতে সূর্য্য উঠিয়া অন্ধকার অপহরণ করতঃ বিশাল অন্ধকারের গভীর গর্ভ হইতে সুশোভনা পৃথিবীকে মানবের চক্ষের উপর ধরিল, এখন মানব চক্ষুষ্মান, কর্ম্মঠ ও সচেতন। এই ঘটনাটী সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, কারণ ইহা নিত্য নৈমিত্তিক। ইহা জড়জগতের ঘটনা, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। আধ্যাত্মিক জগৎ একটী পৃথক্ রাজ্য। অবিশ্বাস অন্ধকারে জগৎ আবৃত। বিশ্বাসের সূর্য্য উদিত হইয়া মানবের জ্ঞান-চক্ষুর উপর আধ্যাত্মিক রাজ্যকে প্রকাশ করিল। মানব আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিয়া সেই রাজ্যের শোভা, সেই রাজ্যের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কে বলিতে পারে? আমরা বলি, নিশ্চয় পারে। তাহার জন্যই প্রাচীন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্ম-উপাসকেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে নানাবিধ ঘটনা সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিতেন। তাহার জন্যই সংসার যাহাকে সুখ বলে, তাঁহারা তাহাকে দুঃখ বলিতেন, সংসার যাহাকে আনন্দ বলে, তাঁহারা তাহাকে নিরানন্দ বলিতেন। সাংসারিক এক রাজার রাজ্য, তাঁহারা অপর রাজার রাজ্যে বাস করিতেন।

উপনিষদের সাধনপ্রণালী যদি আমরা আলোচনা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের চক্ষের উপর কতকগুলি উজ্জ্বল সত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে আমরা একটী সত্য অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, সেইটী এইঃ—ঈশ্বরকে আত্মস্থ হইয়া দেখা।

"তমাত্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।"

তাঁহাকে আত্মস্থ হইয়া যে দর্শন করে, তাহারই নিত্য সুখ হয় অন্যের নহে।

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, আত্মস্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা; এই কয়টী আমাদের আত্মার প্রধান বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলি সততই নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কখন সাধুতাতে, কখন ভাবুকতার মধ্যে, কখন স্বদেশের হিত-চিন্তায়, কখন বা বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকে! সাধুতাতে মনোবৃত্তি নির্ম্মল হইতে পারে, ভাবুকতাতে ধর্ম্মভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, স্বদেশের হিত-চিন্তাতে হৃদয় প্রশস্ত ও উদার হইতে পারে, এবং বহির্বিষয়ক জ্ঞান চিন্তায় জ্ঞান-বৃত্তি বিকাশের সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু ইহার কিছুতেই ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে না। মনোবৃত্তি আত্মস্থ না হইলে মন স্থির হয় না। তুমি যতই কেন ভক্তি শাস্ত্র পাঠ কর না, জ্ঞানের উচ্চ সীমায় উঠনা, প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা কর না, ভাবের উচ্ছ্বাসে মত্ত হও না, কিছুতেই তোমার মন স্থির হইবে না, বরং উত্তরোত্তর তোমার মনকে অস্থিরতার মধ্যে নিরন্তর ভ্রমণ করাইবে। অবশেষে কখন হাসাইবে, কখন কাঁদাইবে, কখনও বা প্রমত্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত করিবে। ইহাতে কি হয়? ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম-দর্শন, যদি ব্রহ্ম-দর্শন হইতেই বঞ্চিত হইতে হইল, তবে জীবনকে ধিক্ শত ধিক্! অবশ্যই এই কথা বলিতে হইবে যে, ভাবাদির আলোচনার উপকারিতা আছে। তাহা দ্বারা আত্মবৃত্তি বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, হৃদয় উদার হয়। কিন্তু উদারতা ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য নয়, নির্ম্মলতা অথবা বিশুদ্ধিতাও লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হইলে আত্মস্থ হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছা এই তিনটী বৃত্তিকে আত্মস্থ করিতে হইলে একনিষ্ঠার প্রয়োজন। জ্ঞান একনিষ্ঠ হইবে, প্রীতি একনিষ্ঠ হইবে, ইচ্ছা একনিষ্ঠ হইবে, জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছা আত্মনিষ্ঠ হইবে, আত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে। জ্ঞান অনেক সময় আত্মা হইতে বাহির হইয়া নীড়-ভ্রষ্ট বিহঙ্গমের ন্যায় আকাশে আকাশে ভ্রমণ করে। প্রীতিও আত্মা হইতে বাহির হইয়া মাতৃহীন বালকের ন্যায় অপরের প্রীতি ও দয়া ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইচ্ছা আত্মা হইতে বাহির হইয়া দলভ্রষ্ট হস্তীর ন্যায় স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, ইহারা আর সহজে ফিরিতে চাহে না। ইহার প্রধান কারণ এই, আমাদের একনিষ্ঠ জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা ও আত্মাদরের অভাব। মানবাত্মার স্বভাব এই যে, একের জ্ঞান অপরের জ্ঞান চায়, একের প্রীতি অপরের প্রীতি চায়, একের ইচ্ছা অপরের ইচ্ছা চায়। একের জ্ঞান অপরের জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই একককে চায়; একের প্রীতি অপরের প্রীতি দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই প্রীতির দিকে ধাবিত হয়, একের ইচ্ছা অপরের ইচ্ছা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই যুক্ত হইতে চায়। তাহার জন্যই জ্ঞানীর আদর, প্রেমিকের সম্মান, ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রশংসা। কিন্তু এইটী সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আমার জ্ঞান যেন অপরের জ্ঞানে মিশিয়া না যায়, আমার প্রীতি যেন অপরের প্রীতিতে মিশিয়া না যায়, আমার ইচ্ছা যেন অপরের ইচ্ছাতে মিশিয়া না যায়। আমার জ্ঞান অপরের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিয়া আত্মাতে ফিরিয়া আসিবে, আমার প্রীতি অপরের নিকট প্রীতি সঞ্চয় করিয়া আত্মাতে ফিরিয়া আসিবে, আমার

ইচ্ছা অপরের স্বাধীন ইচ্ছার নিকট পবিত্র স্বাধীনতা শিক্ষা করিয়া আত্মাতে ফিরিয়া আসিবে। কারণ জ্ঞান জ্ঞানেতে পরিবর্দ্ধিত হয়, প্রীতি প্রীতিতে পরিবর্দ্ধিত হয়, ইচ্ছা ইচ্ছাতে পরিবর্দ্ধিত হয়। জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা আত্মস্থ হইলে ইহাদের অমিত শক্তি, অমিয় সুধা ও অসীম বলের সঞ্চয় হইয়া থাকে। অমিত শক্তি-সম্পন্ন, অমিয় প্রীতি যুক্ত ও অসীম ইচ্ছাপূর্ণ আত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হয়। তাই ঋষিরা বলিয়াছেন—

"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।"

ক্রমশঃ।

—•⊙•—
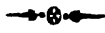
ঈশ্বরের পথ।

সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুপম সৌন্দর্য্যের একমাত্র লীলাভূমি। যেখানে যে অলঙ্কার প্রদান করিলে সৌন্দর্য্য একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, জগৎ রচনায় তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। সমুদ্রের বীচি-বিক্ষোভিত বক্ষে যে গাম্ভীর্য্য প্রতিফলিত রহিয়াছে, অভ্রভেদী পর্ব্বতশিখরে যে মহান শান্তভাব বিকশিত রহিয়াছে, পুষ্পের সুনিপুণ রচনার মধ্যে যে লালিত্য উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে, বৃক্ষের নববিকশিত পত্রে যে মধুরতা ঝরিতেছে, পক্ষীর পতত্রের যে বিচিত্রতা সকলের নয়নমন বিমোহিত করিতেছে, তাহা অপেক্ষা উন্নততর শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্য্যের আদর্শ কি আমরা কল্পনার চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিতে পারি? সৃষ্টি রাজ্যের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়, মন অসাড় হইয়া পড়ে, কল্পনা কি বলিবে!

যে অপ্রতিম পরমেশ্বরের সত্তার ভাব আমারদের হৃদয়ে চির মুদ্রিত রহিয়াছে, বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্যের আলোচনা তাহাকে আরও জাগ্রত করিয়া দেয়। ঈশ্বর আমারদের অন্তরের ধন, তাঁহাকে বাহিরে সহজে অনুভব করা যায় না। কি বাহ্য জগতে কি অন্তর্জগতে তাঁহাকে জাজ্বল্যতর রূপে অনুভব করিতে হইলে উভয়েরই মর্ম্মস্থানে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হয়। চন্দ্র সূর্য্যের নিয়মিত আবর্ত্তন, গ্রহ নক্ষত্রের নির্দ্দিষ্ট আগমন প্রত্যাগমন, ভৌতিক নিয়মের অব্যাহত ভাব আমরা জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়া আসিতেছি, ইহারদের প্রত্যেক ব্যাপারই যারপর নাই বিস্ময়জনক হইলেও আশৈশব পরিচয় বিস্ময়ের ভাবকে তিরোহিত করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে সেই বিস্ময়ের ভাব অন্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিজ্ঞানের আলোচনা চাই, আবিষ্কৃত বস্তুতত্ত্বের রহস্যের মূলদেশে গমন করা চাই। সকলে তাঁহাকে সহজে সৃষ্টির মধ্য হইতে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে বলিয়া তিনি সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন; হৃদয়ের অভ্যন্তরে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বর্ত্তমান দেখিয়া তাঁহাকে সকলে শ্রদ্ধা ভক্তির বিমল উপচারে পূজা করিবেক বলিয়া যিনি অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন, কিন্তু জড়জগতের অখণ্ডনিয়মবদ্ধ একই রূপ কার্য্যপ্রণালী বিস্ময় উদ্দীপনে অসমর্থ হইয়া সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শ্রদ্ধা ভক্তি মায়া মমতা, স্নেহ বাৎসল্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে যিনি আমারদের অন্তর্দ্দেশ সুসজ্জিত করিয়া দিলেন, যেহেতু আমরা সহজে তাঁহাকে পূজা করিতে পারিব, তাঁহার পবিত্র নাম জগৎময় বিতরণ করিব, তাঁহার

প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর রহিব, কিন্তু আমরা নিকৃষ্ট নশ্বর সুখে নশ্বর আমোদে লিপ্ত থাকিয়া তাহাতেই ঐ সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির সার্থকতা সম্পাদনে প্রয়াসী হই, মায়া মমতার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আপনাকে বিজড়িত করিয়া ফেলি।

আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমারদের আশা, ভরসা, আমোদ প্রমোদ, সুখ সম্পত্তি সকলকেই আমরা ক্ষুদ্র করিতে চাই; আমরা যে অনন্ত ধামের যাত্রী, আমরা যে অপার অনন্ত শাশ্বত সুখ উপভোগ করিবার অধিকারী তাহা সম্যক ধারণা করিবার সময় আমারদের ক্ষুদ্রতা আসিয়া বাধা দিতে থাকে। এই দীন হীন ক্ষীণ মলিন দেহের মধ্যে শমীতরুর ন্যায় যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না।

ব্রহ্মজ্ঞানকে হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিতে হইলে যেমন জড় জগতের রচনা-চাতুরীর মধ্যে তাঁহার হস্ত সন্দর্শন করা আবশ্যক, তেমনি আবার আত্মার মধ্যে সকল আবরণ ভেদ করিয়া, পার্থিব সুখ সম্পত্তির অসারতা অনুভব করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করা যার পর নাই প্রয়োজনীয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এই ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার প্রথম সূচনা হইলেও এই যে ক্রন্দন ইহা আমারদের বাহিরের অভাবের—বাহির হইতে সাহায্য লাভের ইচ্ছার পরিচায়ক। যতদিন না শিশু আপনার অভাব আপনি কতক পরিমাণে মোচন করিতে শিক্ষা করে, ক্রন্দন ততদিন তাহার স্বাভাবিক সঙ্গী। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে কিছুকাল শুদ্ধ বাহিরের বস্তুর সঙ্গে তাহার যোগ, কেবল মাত্র বাহিরের বস্তু দিয়া নিজ অভাব মোচন করিবার জন্য সে বিব্রত। ক্রমে জ্ঞান স্ফূর্ত্তি না পাইলে অন্তরের মধ্যে যে একটী সুগভীর অভাব আছে, তাহা সে বুঝে না। যতদিন শিশু পরের মুখাপেক্ষী, আপনার হস্ত পদ সত্বেও নিজে যারপর নাই দুর্ব্বল, ক্রন্দনের বলে সে আপনার অভাব বিমোচন করিয়া লয়। ক্রমে শরীরে বলাধান হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ম্মিষ্ঠ হইলে পরকীয় সাহায্য তাহার আর আবশ্যক হয় না, নিজ যত্ন চেষ্টা উদ্যম ও পরিশ্রমে ক্রমে সে স্বাধীন হইয়া উঠে। ক্রমে অন্তরের উন্নত ভাব মনে জাগরূক হইতে থাকে, যে অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সাধনে তাহার এখানে আগমন, কথঞ্চিৎ তাহা তাহার সম্মুখে দীপ্তি পায়। অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভাব অঙ্কিত দেখে, কিন্তু তাহাও মলিন, বাহ্যজগতে চাহিয়া অপরিবর্ত্তনশীল নৈসর্গিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, চন্দ্র সূর্য্যের একই রূপ উদয়াস্ত দেখিয়া নিত্য পরিচয় বশত মধ্যে ঈশ্বরকে ধরিতে পারে না। সৃষ্টি তাহার কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত, প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে চির নিহিত অপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক নিয়মই তাহার চিন্তার বিষয় হয়। নিয়ম হইতে নেতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে মন সহজে স্বীকৃত হয় না। সুতরাং ঈশ্বরকে দর্শন করিবার পক্ষে বাহ্য জগত তাহার নিকটে মলিন দর্পণ বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের পথের পথিক হইতে হইলে, হৃদয়ের জড়তা অপসারিত করিতে গেলে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত উপায় পরম্পরায় অগ্রসর হইতে হইবে।

১। অধ্যয়ন। অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের ভাবকে উজ্জ্বল করিতে হইলে, অধ্যয়ন আবশ্যক। অধ্যয়ন দুই প্রকার, শাস্ত্র পাঠ ও বিজ্ঞান পাঠ। শাস্ত্রে পুণ্যাত্মা সাধুদিগের হৃদয়ের ভাব বিকশিত রহিয়াছে। শ্রদ্ধাভক্তি পরিপূরিত তাঁহারদের আন্তরিক কম-

নীয় ভাব অঙ্কিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের সংমোহন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া যে স্বর্গীয় সুখে সুখী হইয়াছিলেন, তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে শাস্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ যতই কেন কল্পনাজড়িত বৃথা জল্পনাতে পূর্ণ হউক না, তাহার মধ্যে তথাপি এত অমৃত রস নিহিত রহিয়াছে, যে তাহাতে দীপ্ত শীর সুশীতল হইতে পারে; হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে পারে। এই যে শাস্ত্র পাঠ ইহাতে মনোযোগ সহকারে একান্তমনে অগ্রসর হইতে পারিলে, হৃদয়গ্রন্থি উন্মুক্ত হইয়া যায়, সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম গ্রন্থ নির্ম্মল হৃদয়ের ছবি, আপনার হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করিলে, উহাতেই শাস্ত্রের কঠিন বিষয়ের মীমাংসা দেখি। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর কিছুই নহে এই মনে করিয়া শাস্ত্রের ও ধর্ম্ম গ্রন্থের উপর প্রথম হইতে বীতরাগ হইলে হৃদয় উত্তরোত্তর লৌহসম কঠিন হইয়া উঠে। শাস্ত্র পাঠে ধার্ম্মিকগণের আন্তরিক সাধুভাব নিঃশব্দে আমারদের মনে সংক্রমিত হয়। ঈশ্বরকে দর্শন করিবার দুইটি দর্পণ, এক অন্তর্দ্দেশ, অন্য বহির্জ্জগত। অন্তরে যাঁহাকে দেখি বাহ্য জগতে তাঁহার উজ্জ্বলতম সত্তার বিকাশ দেখি, শাস্ত্র বা সাধুজীবন পাঠে ধার্ম্মিকগণের অন্তরের ছবি দেখি, ঈশ্বর যে আমারদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধন তাহা বুঝিতে পারি। বিজ্ঞান পাঠে প্রকৃতিপটে ঈশ্বরের ভূয়সী ক্ষমতা অনুপম রচনা চাতুরী, তাঁহার মঙ্গল ভাবের সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হই। বিজ্ঞান প্রকৃতির মর্ম্মভেদ্র করিয়া পদার্থ নিচয়ের গঠন প্রণালী, রচনা কৌশল, উহারদের উপকারিতা, কাহা হইতে ঈশ্বরের কি সুমহান লক্ষ্য সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহার পরিচয় দেয়। বিজ্ঞান পাঠে এক নরশরীরের অনুপম রচনা চাতুর্য্য দেখিয়া ঘোর পাপীরও হৃদয়কে দ্রবীভূত হইতে দেখা গিয়াছে। শাস্ত্র পাঠ আন্তরিক ধর্ম্মভাব সকলকে জাগ্রত করে, ঈশ্বরের দিকে উন্নমিত করে, বিজ্ঞান পাঠ অনন্ত অনাদি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদিগের সকল সংশয় তিরোহিত করিয়া দেয়। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞান যেরূপ কঠিন ও যন্ত্রসাপেক্ষ তাহাতে ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যিনি সহজে ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কি শাস্ত্র কি বিজ্ঞান কিছুরই আবশ্যক নাই।

২। আলোচনা ও অধ্যাপন। ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বসমূহের আলোচনায় এত প্রীতি জন্মে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জটিল বিষয় সকলের এমন সুন্দর অচিন্তিতপূর্ব্ব মীমাংসা আপনা হইতেই মনে স্থান পায়, ঈশ্বরের মঙ্গলভাব সম্বন্ধে এমন শত সহস্র জাজ্বল্যতর প্রমাণ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, যে এ রসের রসাস্বাদক ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে তাহা বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের আলোচনায় এত নূতন সত্য উপার্জ্জিত হয়, যে যখন আমরা তাহা আমারদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধির সহিত তুলনা করি তখন আমরা নিজেই স্তম্ভিত হইয়া যাই। ঐশ্বরিক তত্ত্ব আলোচনায় হৃদয় প্রশস্ত হয়, ও ভক্তিপ্রবণ হইয়া উঠে। উপসন্ন ও প্রশান্তচিত্ত শিষ্যকে ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিবার কালে বা তাহার সহিত আলোচনা সময়ে অথবা নিজজীবনে ঈশ্বরের করুণার পরিচয় দিবার সময়ে মন এরূপ উদার ও উদাস ভাব ধারণ করে যে

তাহার আর অন্যত্র তুলনা নাই। ঘোর অজ্ঞানান্ধ সময়ে নিরক্ষর সাধু ধর্ম্মাত্মা বা ধর্ম্ম সংস্থাপকগণ ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল সত্য আলোচনায় লাভ করিয়াছিলেন, বা শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন সময়ে নিজে অর্জ্জন করিয়াছিলেন এ জ্ঞানোন্নত সময়েও আমরা তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। সূর্য্যকিরণের ন্যায় ঈশ্বর ধনী দরিদ্র সকলেরই নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনুষ্য সাধন তপস্যাবলে সমধিক অগ্রসর হইলে তাঁহার বিষয়ে একই জ্ঞান উপার্জ্জন করে, বিভিন্ন দেশীয় হইলেও তাহারদের মধ্যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সবিশেষ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না।

৩। ভ্রমণ। চিরজীবন একস্থানে অবস্থান, প্রকৃতির একই রূপ সন্দর্শন মনে জড়তা আনয়ন করে। সৃষ্টির মধ্যে যে তিনি ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দেয় না। ভ্রমণই ইহার প্রকৃত ঔষধ। ভ্রমণে সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখিয়া মনের অসাড়তা চূর্ণ হয়। সৃষ্টির অনন্তরূপ দেখিয়া আপনার ক্ষুদ্রতা ও হীনতা অনুভূত হয়। সাধুসজ্জনগণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহারদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপনে, তাঁহারদের নিঃস্বার্থ ভাব ও সংযম দর্শনে আপনার মনে বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হয় ও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ভ্রমণে দুইটি ফল, ১ম মনের অসাড়তা অপগমন, ২য় সাধুগণের সহিত সহবাস লাভ। ইহা অপেক্ষা সাধারণ মনুষ্যহৃদয়ের সাধুভাবের উদ্দীপক আর কি হইতে পারে?

৪। শ্রবণ। যেখানে ঈশ্বরের সুমধুর নাম পরিকীর্ত্তিত হয়, যেখানে ভক্ত সাধুগণ তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হন, যেখানে প্রেমের তরঙ্গ ভক্তির স্রোত সতেজে বহমান হয়, সেখানে তাঁহার নাম গান শ্রবণ করিতে গেলে আপনার পাষণ্ডতা বিচূর্ণিত হইয়া যায়। উপরোক্ত কয়েকটি উপায়ের মধ্যে ইহাতে সহজেই আমরা সিদ্ধকাম হইতে পারি। এইরূপ সাধারণ উপাসনায় বা নাম কীর্ত্তনে যোগদানে আমরা অনেকগুলি ফললাভ করি। প্রথমতঃ ইহাতে আমারদের হৃদয়ের জড়তা অপসারিত হয়, ধর্ম্মভাব দীপ্তি পায়। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সাধুবিষয়ে উৎসাহ দেখিয়া আমারদের বন্ধুবান্ধবগণের মনে কৌতূহল বৃত্তি জাগরূক হয়, তাঁহারাও আমারদের সদ্দৃষ্টান্তে পরিচালিত হন। ধর্ম্মের আবার এমন এক মোহিনী ক্ষমতা যে ইহার সংস্পর্শে আগমন করিয়া হৃদয় একটু আর্দ্র হইলেই, আর কার সাধ্য উহাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করে। তখন মনের এই ভাব হয় "ধনমান চাহি না তোমা হতে, দাও এই অধিকার যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি"। তৃতীয়তঃ আমাদিগকে সাধারণ উপাসনায় যোগদানের পক্ষপাতী দেখিলে আমারদের স্নেহ ও প্রেম অধিকতররূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য সন্তান সন্ততি বা অবশ্যপোষ্য অন্যান্য পরিজনবর্গ ধর্ম্মশীল হইতে চেষ্টা করেন, অবসর পাইলেই তাঁহার প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে সচেষ্টিত হন, ও তাঁহার নামগান শ্রবণের কোন অবসর বিফলে যাইতে দেন না। পৃথিবীর সকল নর নারী এইরূপে আপনার দৃষ্টান্তে নিঃশব্দে ধর্ম্মপ্রচার করিলে আর নাস্তিকতার রাজ্য এখানে স্থান পায় না। চারিদিক হইতেই প্রেমানন্দ ও যোগানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম-প্রচারের আর সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা তাঁহাকে পাইবার সুগম পথ

আর পরিলক্ষিত হয় না। ইহা হইতে যে ফল লাভ হয় সে ফল অন্তঃস্পর্শী। ধর্ম্ম প্রচারকের বক্তৃতার স্রোত বা তর্ক-তরঙ্গ তাহার শতাংশের একাংশ ফল দিতে পারে না। যে ধর্ম্ম আমরা পরিবারের মধ্যগত হইয়া শিক্ষা করি, তাহতে আমরা সহজে অনুপ্রাণিত হই। এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারে প্রত্যেক অভিভাবকই ধর্ম্মপ্রচারক, প্রত্যেক পরিবারই তাঁহার পক্ষে এক একটি ক্ষুদ্র সমাজ হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত কয়েকটি পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে আমারদের মনে ঈশ্বরের ভাব দীপ্তি পাইতে থাকে, এইরূপ উপায়ে অন্তরের মলিনতা বিদূরিত হইলে সাধুভাব উজ্জ্বলতার সহিত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। ইহাই ঈশ্বরকে অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান দেখিবার পথ। এই পথের পথিক হও, তবে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ-মন্য হইবে, ও পরে তাঁহার সহিত যোগ যুক্ত হইয়া মনুষ্যজন্ম সকল করিয়া দেব-পদবীতে আরোহণ করিতে পারিবে।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত্র।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

এই ঘটনার ১০।১২ দিন পরে ক্রমে ক্রমে অনেক লোক শুনিলেন যে, শিবনারায়ণ আহার করেন না, কেবল জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন ; যে বাবুর নিকট শিবনারায়ণ চাকর ছিলেন সেই দেবিদাস বাবু এবং কয়েকজন পণ্ডিত আসিয়া শিব-নারায়ণকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, অন্ন পরিত্যাগ করিয়া এমন ঘোর তপস্যার প্রয়োজন কি ? শাস্ত্রে তো এমন কিছুই লেখা নাই। অন্নত্যাগ করিয়া জলপান করিতেছ, মরিয়া যাইবে, বাঁচিবে না; তুমি আহার কর তো আমরা অন্ন আনিয়া দিই কিম্বা আমাদের বাটীতে চল। শিবনারায়ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই দেবিদাস বাবুর মৃত্যু হওয়াতে সকলে মনে করিতে লাগিল শিবনারায়ণ অভিচার করিযা দে-বিদাস বাবুকে মারিয়াছে। শিবনারায়ণ দেব তখন দেখিলেন এই স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় এবং আপনার মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে গ্রামে গ্রামে ঘুরিলে ও সামান্য ব্যক্তির কাছে গেলে রাজা প্রজাদের আধ্যাত্মিক অথবা ব্যবহার কা-র্য্যের বিষয় কোন উপকার হবে না। কোন সমর্থ রাজা অথবা পণ্ডিত ব্যক্তিকে সৎ-উপদেশ দিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু আজকালকার রাজা পণ্ডিত ও মূর্খ সকলের মত একই রকম হইয়াছে। সত্য কথা ও সৎপথ বলিলে উহাদের অসৎ বিবেচনা হয়। সতের দিকে প্রবৃত্তি যায় না। যাহা হউক যখন অন্তর্যামী আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন তখন প্রথমে আমি কাশির রাজাকে উত্তমরূপে বুঝাই। তাঁহার বংশেতে অনেক পণ্ডিতগণ আছেন। তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য মনে মনে স্থির করিয়া শিবনারায়ণ কাশির রাজার কাছে রামনগরে রাজবাটির দ্বারেতে গেলেন। তাঁহার গায়েতে একটী মাত্র ছেঁড়া চাদর ছিল ও তিনি ধূলায় পড়িয়া থাকি-তেন বলিয়া তাঁহার গায়ে ধূলি ও চাদর জীর্ণ ও মলিন ছিল। তাঁহার পাগলের মতন বেশ হইয়াছিল। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন যে রাজাকে খপর দাও এবং বলিও একজন মনুষ্য আসিয়াছেন তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও পর-

মার্থ সম্বন্ধে কিছু কথা বার্ত্তা কহিবেন। আরও বলিও রাজা যেন কোন চিন্তা না করেন তাঁহার কোন ভয় নাই আমি কিছু যাচ্ঞা করিতে আসি নাই কেবল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার প্রয়োজন আছে। দ্বারবান বলিল তোর মতন কাঙ্গাল কত জন আসিতেছে যাইতেছে, কতজনের খপর আমি লইয়া যাইব। যে ব্যক্তি খপর লইয়া যায় সে ব্যক্তি এখানে নাই। আমি খপর লইয়া যাই না। সে আসিলে খপর দিতে পারে। তখন সকাল হইতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত সেখানে শিবনারায়ণ বসিয়া রহিলেন,কেহ রাজাকে খপর দিল না ও শিবনারায়ণকেও কিছু খপর দিল না। তখন রাজার একজন খানসামা আসিল। তাহাকে শিবনারায়ণ এই সকল কথা বলিলেন ও রাজাকে সংবাদ দিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন রাজা যাহা বলেন তাহা আমাকে আসিয়া বলিও। রাজার নিকট খানসামা যাইয়া সংবাদ দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সে ব্যক্তি গৃহস্থ, পণ্ডিত না সাধু। ভৃত্য কহিল ইহার কোন চিহ্ন তাহার দেখা যায় না, সে অতি দরিদ্রের ন্যায়, তাহার গায়ে এক ছেঁড়া চাদর আছে। রাজা বলিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে তুমি কে এবং তুমি কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছ এবং রাজার কাছে তোমার প্রয়োজন কি। খানসামা আসিয়া শিবনারায়ণকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল। শিবনারায়ণ বলিলেন দেখিতেছ আমি মনুষ্য, আমি শাস্ত্র পড়িয়াছি কি না পড়িয়াছি তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে। রাজার কাছে যাইলে তিনি জানিতে পারিবেন এবং আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই কেবল সৃষ্টির কল্যাণ নিমিত্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কথা বার্ত্তা আছে। খানসামা যাইয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলে রাজা বলিলেন আমার একজন পণ্ডিত যাইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবেন। যদি তিনি শাস্ত্রে পারগ হন ও আমার পণ্ডিত যদি তাঁহাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করেন তাহা হইলে আসিতে পারিবেন নচেৎ নহে। সেই কথা খানসামা আসিয়া শিবনারায়ণকে কহিল এবং একটু পরে পণ্ডিত আসিয়া শিবনারায়ণের কাছে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। শিবনারায়ণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, পৃথিবীতে কয়টা ধর্ম্ম আছে। পণ্ডিত বলিলেন গৃহস্থ ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি ধর্ম্ম আছে। এই সকল ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। শিবনারায়ণ বলিলেন এই চারি ধর্ম্মের ক্রিয়া কি। পণ্ডিত এই চারি ধর্ম্মের ক্রিয়া বলিয়া শুনাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ বলিলেন এই তো চারি ধর্ম্ম তুমি মুখস্থ করিয়া বলিয়া দিলে আমি ও চারি ধর্ম্মের কথা শিখিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। যদ্যপি আমি সেই ধর্ম্ম করি আর নাই করি আপনি কিরূপে জানিবেন। যদি আমি গেরুয়া বসন পরিয়া বলি যে আমি এই ধর্ম্ম করি আমার গায়েতে তো কোন ধর্ম্মের চিহ্ন লেখা নাই। আমি যদি বলি যে আমার হাড় চামড়ার নাম সন্ন্যাসী তাহা হইলে তো সকল গৃহস্থের শরীরে হাড় চামড়া আছে আর যদি ইন্দ্রিয়ের নাম সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে তো সকল মনুষ্যের ইন্দ্রিয় আছে আর যদি বাক্যের নাম সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে সকলেই তো বাক্য বলিতেছে তবে সন্ন্যাসী কাহাকে বলে। পণ্ডিত বলিলেন সন্ন্যাসী

মহাত্মাদের লক্ষণ সকল শাস্ত্রে লেখা আছে সেই লক্ষণ দ্বারা জানা যায়। শিবনারায়ণ বলিলেন আপনি যে চারি ধর্ম্মের কথা বলিলেন তাহার লক্ষণ যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্রানুযায়ী অভ্যাস করিয়া বহির্মুখে দেখায় তাহা হইলে তাহার অন্তরের ভাব যে কি রূপ আছে তাহা আপনি কিরূপে বুঝিবেন। পণ্ডিত বলিলেন যে তাহা বটে কিন্তু কোন একটা ভাব কোন না কোন প্রকারে বোধ হইতে পারে। পণ্ডিত শিবনারায়ণকে বলিলেন আপনি সংস্কৃত পড়িয়াছেন এবং কোন্ কোন্ শাস্ত্র আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি সংস্কৃত পড়ি নাই তবে যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়াছি এবং নানা শাস্ত্রও ভাল রূপ দেখি নাই তবে অল্প অল্প দেখিয়াছি। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার চক্ষেতে শীত লাগে কি না লাগে। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে মহান্ পণ্ডিত এখন আমার পরীক্ষা লইতে লাগিলেন। পরে বলিলেন যে স্থূল ভাবে যত ইন্দ্রিয়গণ আছে এবং নেত্র তাহার শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ হয় কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গণেতে এবং নেত্রতে যে জ্যোতি তেজরূপ থাকেন অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহার শীত উষ্ণ দুঃখ সুখ হয় না এবং লাগে না। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি দেবতা দেবী কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু ভগবান ইত্যাদিকে মানেন কি না। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি মানি কি না মানি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কারণটা কি? আমি মানি অথবা না মানি আমি সকলকেই মানি অথবা নাও মানি। এখানে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে দেবতা দেবী শিব দুর্গা কালী বিষ্ণু ভগবান কাহাকে বলে এবং তাঁহাদের স্বরূপ কি ও তাঁহারা কোথায় থাকেন, তাঁহারা নিরাকার না সাকার। যদ্যপি নিরাকার হন তাহা হইলে তো নিরাকারের রূপ নাই। দেখা যাইবে না। সকলেই বলে নিরাকার তো পরব্রহ্ম। যদ্যপি সাকার হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন। যেমন সূর্য্যনারায়ণ দেখা যাইতেছেন। সাকার মধ্যে শাস্ত্রেতেও তো এই বস্তু আছেন ও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এই তো সাকার ব্রহ্ম। ইহাঁরা ব্যতীত কেহ হয় নাই হইতেও পারিবে না। যদ্যপি ইহাঁরা ভিন্ন কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু তোমাদের দেবতা দেবী হন তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন তাহা আমাকে দেখাইয়া দিন ও কাহাকে বলে তাহাও আমাকে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমি মানিব। আর যিনি সাকার ব্রহ্ম তাঁহাকে তো আমি মানি। পণ্ডিত বলিলেন বিষ্ণু ভগবান বৈকুণ্ঠে আছেন এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে আছেন এবং দুর্গা শিব কৈলাসে ও কাশীতে আছেন, তোমাকে কি প্রকারে দেখাইব। শিবনারায়ণ বলিলেন যদি তাঁহারা আপন আপন বাটিতে থাকেন তাহা হইলে এই সৃষ্টি চরাচরের কাজ কি রূপে চলিতেছে, উৎপত্তি পালন ও লয় অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া কে কার্য্য করাইতেছেন। যদ্যপি তোমার মধ্যে তিনি না থাকেন তাহা হইলে তুমি যে পাপ পুণ্য করিতেছ কে বুঝিবে এবং তিনি যদি তোমার মধ্যে না থাকেন তাহা হইলে তোমার দুঃখ মোচন করিয়া কে সুখ প্রদান করিবেন। পণ্ডিত বলিলেন তাহা বটে কিন্তু আমাদের কাছে গুপ্ত ভাবেতে তিনি

আছেন কিন্তু কাশীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। শিবনারায়ণ বলিলেন যে কাশী কাহাকে বলে এবং কাশী বস্তুত কি এবং স্বরূপ কি এবং কি রূপে কাশীতে শিব বিরাজমান আছেন। মনুষ্য রূপে কিম্বা মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর রূপে বিরাজমান আছেন। যদ্যপি মনুষ্য রূপে থাকেন তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দাও নতুবা বুঝাইয়া দাও। কিম্বা যদি বল যে মৃত্তিকা কাষ্ঠ ও প্রস্তর রূপে বিরাজমান আছেন তাহা হইলে তো পৃথিবীতে নানা দেশে নানা স্থানে মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর পড়িয়া আছে তাহা হইলে তো সকল স্থানেই শিব বিরাজমান আছেন। যদ্যপি তোমরা মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর ইত্যাদি ধাতুকে শিব বল তাহা হইলে তো তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে, তবে শিবের কি নাশ আছে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন। শিব দেবতা দেবী কি বস্তু কি বস্তু হইয়া বিরাজমান আছেন, জল রূপে কিম্বা অগ্নি রূপে, বায়ু রূপে কি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে, কি রূপে বিরাজমান আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও। যদি এইরূপে বিরাজমান থাকেন তাহা হইলে তো সকল স্থানেই তাঁহারা বিরাজমান আছেন তবে এখানে ওখানে যাইবার প্রয়োজন কি। শিবনারায়ণ আরও বলিলেন যে হে পণ্ডিত তর্ক বিতর্ক এবং মান অপমান জয় পরাজয় পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে বিচার পূর্ব্বক আপনার ইষ্ট পরমাত্মা অন্তর্যামীকে চিন অথবা ত্রিগুণ আত্মা সাকার ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে চেন যাঁহার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিলে ভ্রমেতে পতিত হইতে হইবে না। ইনি তোমাদের সকল ভ্রম এবং কষ্ট নিবারণ করিয়া আনন্দরূপ থাকিবেন। আর ভ্রমে পতিত হইও না ও রাজা প্রজাকে ভ্রমেতে পাতিত করিও না। বিচার করিয়া আপনার ইষ্টকে চেন। পণ্ডিত আপনার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এ লোকটা কেরে যে সকলকে উড়াইয়া দিতেছে। যদ্যপি এ লোকটাকে রাজার কাছে লইয়া যাই তাহা হইলে এ সকল বিষয় খুলিয়া বলিবে ও তাহাতে আমরা যেরূপে রাজা প্রজাদিগকে বুঝাইয়া রাখিয়াছি তাহাতে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিলে আমাদের অন্ন মারা যাইবে এবং মানও থাকিবে না। পণ্ডিত মনে মনে এই বিচার করিলেন এলোকটাকে কোন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইলে ভাল হয়। পণ্ডিত এই বুঝিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন তুমি এখন এখানে বসিয়া থাক আমি রাজাকে জানাই। তিনি হুকুম দিলে তবে তুমি সেখানে যাইতে পাইবে। শিবনারায়ণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন। সেই সময় দ্বারের দ্বারবানেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে মহারাজ এক দিবস বলিতেছিলেন যে আমার কাশী রাজ্য মধ্যে এমন কোন মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ জন্মাইলেন না যে এই সৃষ্টির রাজা প্রজার কষ্ট নিবারণ করেন। পণ্ডিত রাজার কাছে যাইয়া যাহা বলিলেন তাহা পণ্ডিত জানেন আর রাজা জানেন। কিন্তু একজন দ্বারবান আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন এখানে অপর ব্যক্তির থাকিবার রাজার হুকুম নাই, তুমি উঠিয়া যাও। শিবনারায়ণ বলিলেন যে এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাত্রিকাল এখানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে চলিয়া যাইব। দ্বারবান বলিল উঠিয়া যাও নতুবা পুলিষে দিব। শিবনারায়ণ দেখিলেন যে আজ কাল রাজা প্রজা পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হই-

য়াছে এখান হইতে উঠিয়া যাওয়া ভাল। যদি পণ্ডিতগণের বুদ্ধি ভাল হয় তাহা হইলে রাজাদের বুদ্ধি ভাল হয় তাহা হইলে প্রজাদেরও বুদ্ধি ভাল হইতে পারে। এই বলিয়া শিবনারায়ণ সেখান হইতে উঠিয়া রামনগরে যেখানে রামলীলা হয় সেই পুষ্করণীর ঘাটে আসিয়া বসিলেন কিন্তু দুই দিন শিবনারায়ণের আহার হয় নাই। রাজার দ্বারে দিনভোর বসিয়া রহিলেন কিন্তু পণ্ডিত একটু জল খাইয়াছ কি না জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং খাবে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং কোন বিষয়ে রাজাও খপর নিলেন না যে পণ্ডিত আমার নিকট মিথ্যা বলিল কি সত্য বলিল। রাজারা কোন বিষয় যথার্থ বিচার করিয়া কার্য্য করেন না কেবল অপরের দ্বারা চালিত হয়েন এই নিমিত্ত রাজ্যের নাশ হয় এবং লোকে কষ্ট পান।

ক্রমশঃ।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

ষড়্‌বিংশ ব্যাখ্যান।

যিনি স্পর্শমণি, অমৃতের খনি, বিশ্বেতে প্রকাশ যাঁর।
হৃদয়ে যতনে, রাখ সেই ধনে, তাঁরে জীব কর সার॥

অমৃতের সেতু যিনি অমৃত ভবন।
অমৃত যাঁহার নাম জানে ভক্ত জন।
তাঁর প্রেম দিবাকরে, তারকাতে সুধাকরে,
বরষার বারিধারে হতেছে বর্ষণ॥

অনন্ত আকাশ সেই অমৃতে পূরিছে।
দ্যুলোক ভূলোক হ'তে অমৃত ক্ষরিছে।
যথা যাই যথা চাই, তাঁরে দেখিবারে পাই,
বিশ্ব তাঁর সুধা নাম নিয়ত ঘোষিছে॥

আত্মাতে অমৃত তিনি করিছেন দান।
চাহ সে অমৃত হয়ে কাতর পরাণ।
অমৃতের বিন্দু দিয়া, জুড়াবেন তব হিয়া,
বিষয়ের জ্বালা সব হইবে নির্ব্বাণ॥

অমৃত ময়ের স্নেহ তোমার জীবনে।
রাখিছেন সদা তোমা প্রেম আলিঙ্গনে।
হউক তোমার সুখ, কিম্বা রোগ শোক দুখ,
দেখা দেন প্রেম-মুখ প্রত্যেক ঘটনে॥

কি জানে অবোধ শিশু মাতা তার তরে।
প্রাণের গভীরে কত প্রেম স্নেহ ধরে।
যাঁর স্নেহ নাহি পার, কি বুঝিবে তুমি তার,
জেনো সুমঙ্গল তব সদা তাহা করে॥

বলিছেন মাতা তোমা অমিয় বচন।
রাখিছেন ক্রোড়ে তোমা তিনি সর্ব্বক্ষণ।
সে স্নেহের প্রতিদান, কণা মাত্র তিনি চান,
পারিবে কি দিতে তাহা প্রবীণ সন্তান!

যিনি খুলিলেন আগে নয়ন তোমার।
শরণ লইয়া থাক একান্তে তাঁহার।
কি সম্পদ্ কি বিপদে, রাখ মন তাঁর পদে,
তাঁর কাছে বলি দাও, "আমি" "আপনার"॥

হৃদি মলিনতা আর না রেখো পুষিয়া।
অনুতাপ অশ্রু-জলে ফেল তা ধুইয়া।
তাঁর কাছে এবে যাও, নূতন জীবন চাও,
যে জীবন সুধা-ময় তাঁহারে লইয়া॥

সে জীবন পেলে হবে পরাণ উদাস।
হেথাকার ধন মানে না রহিবে আশ।
তাঁর রূপ অনুক্ষণ, হৃদি পাবে দরশন,
করিবে তাঁহার কর্ম্ম হ'য়ে তাঁর দাস॥

তাঁর পথে যেতে তিনি হবেন সহায়।
অগ্রসর হ'য়ে তিনি ল'বেন তোমায়।
দুঃখ কষ্ট প্রলোভনে, থাকি তিনি তোমা সনে,
দিবেন তোমারে বল তাঁর পদছায়॥

কি আনন্দ' প্রেমময়ে সদাই দেখিতে।
তাঁর জন্য দুঃখ কষ্ট সকলি সহিতে।
কবে সে অমৃত সিন্ধু, দিবেন অমৃত বিন্দু,
চাতকের মত তাহা প্রতীক্ষা করিতে॥

সে অমৃত কর জীব! এখানে অর্জ্জন।
প্রেমময়ে প্রেমভরে কর আলিঙ্গন।
সে অমৃত বিনা সার, আছে কি এখানে আর?
তাহার বিহনে বৃথা জীবন ধারণ॥

যাঁর জ্যোতি কণা করিয়া ধারণ।
রবি শশী করে কর বিতরণ।
সে গভীর জ্যোতি হয় শূন্য ছায়।
যাহাতে প্রকাশ এ জগৎ পায়॥
ইন্ধনে অনল প্রবেশি যেমন।
অন্তর তাহার করিয়া দহন।
চারু শিখা লয়ে উঠে তদুপরে।
সে রূপ ঈশ্বর জগৎ ভিতরে॥
সবার অন্তরে তিনি অধিষ্ঠিত।
করিছেন সবে প্রাণেতে পূর্ণিত।
সবে অতিক্রম করিয়া বেষ্টন।
জ্বলিতেছে তাঁর রূপ সম্মোহন॥
প্রত্যক্ষ যেমন দেখ রবি করে।
সে রূপ তাঁহারে দেখহ অন্তরে॥
সে প্রেম-রবিরে যদি না দেখিলে।
তাঁর প্রেম-মুখ যদি না হেরিলে॥
ধিক্ শত ধিক্ জীবনে তোমার।
ধন মান খ্যাতি তার কাছে ছার॥
ছাড় ছাড় পাপ' ছাড় কুমন্ত্রণা।
তাঁর পথে যাও, যাইবে যাতনা॥
দেখ তাঁর কৃপা—পাষাণ হৃদয়।
পুষ্পবৎ কিবা সুকোমল হয়॥
যবে তাঁরে আমি প্রেম আলিঙ্গনে।
রাখিব হৃদয়ে শয়নে স্বপনে॥
যবে ক্ষণমাত্র বিরহে তাহার।
দেখিব জগৎ যেন অন্ধকার॥
তাঁর প্রতি প্রেম হইবে উজ্জ্বল।
তখন লভিব অমৃত সম্বল॥
সে সম্বল লয়ে অনন্ত জীবনে।
থাকিব সখার অমৃত সদনে॥
এক লোক হ'তে অন্য লোক যা'ব।
মধুর মধুর সে অমৃত পা'ব।
এ আশা নিশ্চিৎ হইবে সুসার।
বলিছেন তিনি হৃদি অনিবার।
তিনিই এ আশা করিয়া রোপণ।
করিছেন তাহা নিয়ত বর্দ্ধন।
এ জীবন্ত আশা প্রাণেতে জড়িত।
হ'ব না হ'ব না ইহাতে বঞ্চিত॥

প্রার্থনা।

তুমি নাথ! পিতা মাতা সুহৃদ্ সহায়।
কত যে করিছ প্রেম বলা নাহি যায়॥
তোমাকে দেখি হে যেন প্রেমের নয়নে।
করি যেন সব কায রাখি তোমা মনে॥
তোমা হ'তে পাইয়াছি দেহ বুদ্ধি বল।
তোমার কাযেতে যেন নিয়োগী সকল॥
অনিমেষ আঁখি যেন তোমা প্রতি রাখি।
তোমা অনুগত যেন সদা হয়ে থাকি॥
সৎপথে লইয়া যাও তুমি দয়া করি।
আছে কি শকতি নিজে পাপ পরিহরি॥
তোমাকে দেখিলে নাথ! জুড়ায় জীবন।
কৃপাকরি দীন জনে দাও দরশন॥

ইতি ষড়্বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ইতি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের
প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

দ্বাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

৫৫৬ সংখ্যা　　　　১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
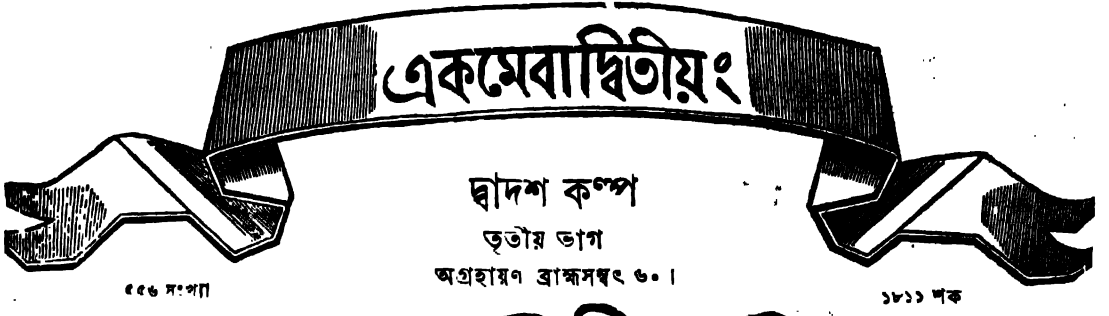
প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতি পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্যের কৈন্দ্রিক শক্তি স্বতন্ত্র এবং ইতর জীবদিগের কৈন্দ্রিক শক্তি স্বতন্ত্র;—ইতর জীবদিগের কৈন্দ্রিক শক্তি কি? না সংস্কার-শক্তি; মনুষ্যের কৈন্দ্রিক শক্তি কি? না সংযম-শক্তি। সংস্কার-শক্তিতে জ্ঞানের ভান যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে—তাহা জ্ঞানের আভাস মাত্র; সংযম-শক্তিই সাক্ষাৎ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত। পূর্ব্বে সংযম-শক্তি এবং সংস্কার-শক্তির মধ্যে দুইটি প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছি; দেখাইয়াছি যে, (১) সংস্কার শক্তির দৌড় পরিমিত বিষয়-ক্ষেত্রে আবদ্ধ; সংযম শক্তির দৌড় অপরিসীম; (২) সংস্কার শক্তি অন্ধ, সংযম-শক্তি চক্ষুষ্মান্। এখন সংযম শক্তি এবং সংস্কার-শক্তি এ দুয়ের মধ্যে কতখানি সাদৃশ্য—কতখানিই বা বৈসাদৃশ্য, দুইই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সংযম-শক্তি এবং সংস্কার-শক্তির মধ্যে সাদৃশ্য শুদ্ধ কেবল এইটুকু যে, উভয়ই সচেতন জীবের অধিকার-মধ্যে অবস্থিতি করে। দীপ এবং দীপালোকিত গৃহ দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, দুইই উজ্জ্বল; বৈসাদৃশ্য এই যে, দীপ স্বয়ং উজ্জ্বল—দীপালোকিত গৃহ স্বয়ং উজ্জ্বল নহে—দীপ অপসারিত হইলেই গৃহ অন্ধকার; এ যেমন, তেমনি—সংযম শক্তি স্বয়ং জ্ঞানাত্মক, সংস্কার-শক্তি স্বয়ং অন্ধ, উভয়ের মধ্যে এইরূপ বৈসাদৃশ্য। যদি বলো যে, কেমন করিয়া জানিলে যে, সংস্কার-শক্তি স্বয়ং অন্ধ, তবে তাহার উত্তর এই যে, আমাদের আপনাদের মধ্যে দুইই বর্ত্তমান—সংস্কার-শক্তিও বর্ত্তমান—সংযম-শক্তিও বর্ত্তমান; এই জন্য দুয়ের প্রভেদ আমাদের নিকট অবিদিত থাকিতে পারে না। আমাদের আপনাদের মধ্যেই আমরা দুইরূপ সংস্কার-শক্তি দেখিতে পাই—(১) নৈসর্গিক সংস্কার শক্তি যেমন আত্ম-রক্ষিণী শক্তি(২) কৃত্রিম সংস্কার-শক্তি যেমন স্বদেশীয় ভাষায় কথা কহিবার শক্তি। দুয়েতেই আমরা শুদ্ধ কেবল

চেতনের আভাস-মাত্র দেখিতে পাই— দুয়ের কোনোটিতেই আমরা আদত চেতন দেখিতে পাই না। হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে শুদ্ধ কেবল আত্ম-রক্ষিণী শক্তির উত্তেজনায় লোকে অজ্ঞাতসারে আপনার ভার-কেন্দ্রকে ঠিক্ করে—এটা স্বাভাবিক সংস্কার-শক্তির কার্য্য; কৃতবিদ্য লোকে পুস্তক পড়িবার সময় অজ্ঞাত-সারে অক্ষর বানান করে—এটা কৃত্রিম সংস্কার-শক্তির কার্য্য। দুয়েতেই চেতনের আভাস বর্ত্তমান আছে, অথচ দুইই অজ্ঞাত-সারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা বলিলাম "আত্ম-রক্ষিণী শক্তি," কিন্তু প্রভাত বাবু হয় তো বলিবেন যে, তাহা "প্রাতিক্ষেপিক শক্তি" (reflex energy) ভিন্ন আর কিছুই নহে—অর্থাৎ যেন তাহা যান্ত্রিক (Mechanical) প্রতিক্রিয়া-শক্তিরই (reactional force) প্রকার-ভেদ। তাঁহার এ কথা যদি সত্যও হয় তথাপি তাহাতে আপাততঃ আমাদের কিছুই আইসে যায় না, কেননা প্রাতিক্ষেপিক শক্তিও অন্ধ-শক্তি, আত্ম-রক্ষিণী শক্তিও অন্ধ-শক্তি,অন্ধতাবিষয়ে দুইই সমান। কিন্তু বাস্তবিক সত্য এই যে, আত্ম-রক্ষিণী-শক্তি অন্ধ-সংস্কার-হইলেও তাহা যান্ত্রিক প্রতি-ক্রিয়া-শক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চ-সোপানে অবস্থিতি করে। একটা বানর সাপের দিকে এগো'বে না, কিন্তু একগাছি দড়ি দেখিলে স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইবে; কেন? যেহেতু সর্পের বিষ-আছে! কিন্তু সর্পের বিষ আছে বলিয়া সর্প যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রজ্জু অপেক্ষা বেশী-মাত্রায় কার্য্য করিবে—স্নায়ুর প্রাতিক্ষেপিকা শক্তিকে বেশী মাত্রায় উত্তেজিত করিবে, তাহা তো কোনো শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না;—বিষ তো আর দূর-হইতে চক্ষের উপরে কার্য্য করে না!—চর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তবেই তাহা রক্তের মধ্যে কার্য্য করিতে পারে। চক্ষুর উপরে বিষ যদি কার্য্য-করিতেই না পাইল তবে তাহা কেমন করিয়া দূর-হইতে স্নায়ু-গ্রন্থির প্রাতিক্ষেপিকা শক্তি উত্তেজিত করিবে? অতএব বানরকে বিষ দাঁতের আঘাত হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া শুধু কেবল প্রাতিক্ষেপিকা শক্তির কর্ম্ম নহে! নিছক প্রাতিক্ষেপিকা শক্তির নিকট পাত্রাপাত্রের বিচার নাই;—আঙুল দিয়া পায়ে সুড়সুড়ি দিলেও প্রাতিক্ষেপিক শক্তি উত্তেজিত হয়, পালখ্ দিয়া পায়ে সুড়সুড়ি দিলেও তাহাই হয়; কাজেই বলিতে হইতেছে যে, যে-শক্তি দড়ি-দ্বারা উত্তেজিত হয় না অথচ সর্প-দ্বারা উত্তেজিত হয়, তাহা শুধু কেবল প্রাতিক্ষেপিকা শক্তি নহে—তাহা আরো কিছু;—তাহা আত্ম-রক্ষিণী শক্তি;——আত্ম-রক্ষিণী শক্তিই এখানকার মূল শক্তি, স্নায়ু-গ্রন্থি সকলের প্রাতিক্ষেপিকা শক্তি তাহারই শাখা-প্রশাখা। এই আত্ম-রক্ষিণী শক্তি জীবের স্বভাব-সিদ্ধ; তাই তাহাকে আমরা নৈসর্গিক সংস্কার-শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। পুস্তক পড়িবার শক্তি মনুষ্যের স্বোপার্জ্জিত শক্তি—তাই তাহাকে আমরা বলিলাম—কৃত্রিম সংস্কার শক্তি। এইরূপ যেখানে যত প্রকার সংস্কার-শক্তি আছে সমস্তেরই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় অজ্ঞাত-সারেই তৎ তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সংযম-শক্তি কোনো কালেই অজ্ঞাতসারে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সম্পূর্ণ সজ্ঞান-ভাবে (প্রবৃত্তির প্রতিকূলেই হউক্, আর অনুকূলেই হউক্) কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা—যাহা সংস্কার-শক্তি দ্বারা কোনো

মতেই সম্ভবে না—তাহাই সংযম-শক্তির মুখ্য পরিচয়-লক্ষণ। আর একটি কথা এই যে, সংস্কার-শক্তি পশুদিগের কেন্দ্র-স্থানীয়, কিন্তু মনুষ্যের তাহা পরিধি-স্থানীয়; সংযম-শক্তিই মনুষ্যের কেন্দ্র-স্থানীয়। সংযম-শক্তি দ্বারা সংস্কার-শক্তিকে নিয়মিত করিবার অধিকার শুদ্ধ কেবল মনুষ্যেতেই দেখিতে পাওয়া যায়! আত্ম-রক্ষিণী-শক্তি—সন্তান রক্ষিণী শক্তি—সমাজ রক্ষিণী শক্তি—এইরূপ নানা প্রকার সংস্কার শক্তি পশু এবং মনুষ্য উভয়েতেই বর্ত্তমান; তবে কি? না মনুষ্যেরই বেলায় কেবল—সেই সকল সংস্কার-শক্তির কেন্দ্র-স্থানে সংযমশক্তির জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত। পূর্ব্বে যেমন আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাণ—জীবেরও আছে উদ্ভিদেরও আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—ঔদ্ভিদ প্রাণ হইতে জৈবিক প্রাণ আর-এক স্বতন্ত্র ব্যাপার;—লৌহ যেমন চুম্বকের সংস্পর্শে চুম্বক হইয়া দাঁড়ায় সেইরূপ জীবের প্রাণ মনের সংস্পর্শে আর-এক রকমের প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়—প্রাণ × প্রাণের প্রতি টান—এইরূপ একটা যত্নের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। এ যেমন, তেমনি—মনুষ্যের দুর্ব্বিনীত পশু-প্রবৃত্তি সকল সংযম শক্তির অধীনে নিয়মিত হইয়া সুবিনীত মনুষ্য-প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়—লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়—বিষ অমৃতে পরিণত হয়—অন্ধকার আলোকে পরিণত হয়; ইহাতে করিয়াই মনুষ্যের সংস্কার-শক্তির শ্রী ফিরিয়া গিয়া তাহার মূর্ত্তি সভ্য ভব্য আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জীবনের জন্য লাঠালাঠি (Struggle for life) প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে অন্ধভাবে কার্য্য করে—মনুষ্য সমাজে বিবেকের সংস্পর্শে তাহাদের মূর্ত্তি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তখন তাহাদিগকে চেনা ভার। জীবনের জন্য লাঠালাঠি এখানে আর-এক বেশ পরিধান করে—কি? না গগন-ভেদী উন্নতি-চেষ্টা! পরের সঙ্গেই লাঠালাঠি—কিন্তু জ্ঞানালোকের প্রভাবে মানব-মণ্ডলীর মধ্যে ক্রমশই আপনাতে পরেতে প্রভেদ কমিয়া আসিতে থাকে—"পর" ক্রমে "আপনার" হইতে থাকে; কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষ-দাঁত ক্রমশই ক্ষয় পাইতে থাকে। কোনো ব্যক্তি যদি এত উচ্চে আরোহণ করে যে, পৃথিবীশুদ্ধ সমস্তই তাহার "আপনার"—কেহ তাহার "পর" নহে—তবে সে কাহার সঙ্গে লাঠালাঠি করিবে? এ অবস্থার লাঠালাঠি আরেক ধরণের লাঠালাঠি—কি? না পশু-প্রবৃত্তির সহিত দেব-প্রবৃত্তির লাঠালাঠি—জড়তা এবং মূঢ়তার সহিত জ্ঞানের লাঠালাঠি—অমঙ্গলের সহিত মঙ্গলের লাঠালাঠি—ইত্যাদি।

মনুষ্যের সংস্কার এবং প্রবৃত্তি-সমূহ নিজে অন্ধ—কিন্তু সে-সমস্তের মূলে জ্ঞান বিদ্যমান থাকাতে সেই জ্ঞানের আলোকে তাহাদের আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী নূতন একতরো হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাঘ্রাদি জন্তুর দ্বেষ হিংসা যেমন নিছক দ্বেষ-হিংসা, মনুষ্যের কদাপি সেরূপ সম্ভবে না;—মনুষ্যের দ্বেষ হিংসা সহস্র উত্তেজিত হইলেও তাহা জ্ঞানের রাস কশ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিপাণে মান্য করে—নিতান্ত দুর্দ্দান্ত মনুষ্যও ব্যাঘ্রাদির ন্যায় ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌-শূন্য হয় না;—তাহার ক্রোধের পিছনে জ্ঞান রাস ধরিয়া কতক পরিমাণে জাগ্রত থাকে। এই জন্য মনুষ্যের সংস্কার এবং প্রবৃত্তি সমূহ অন্ধ হইয়াও চক্ষুষ্মানের মতো ভাণ করে;—জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন মনে হয় যে জলের অভ্যন্তরে চন্দ্র ভাসিতেছে—যেন সে চন্দ্র জলেরই চন্দ্র;

তেমনি মনুষ্যের প্রবৃত্তি এবং অন্ধ সংস্কারের উপরে জ্ঞান-চক্ষুর প্রতিবিম্ব পড়াতে মনে হয় যেন, জ্ঞান-চক্ষু সেই সকল প্রবৃত্তিরই চক্ষু—প্রবৃত্তি-সকল যেন অন্ধ নহে কিন্তু চক্ষুষ্মান্; এই জন্য কখনো কখনো লোকে ক্রোধান্ধ হইয়া কোনো কার্য্য করিবার সময়েও মনে করে যে, আমি খুব বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি। কিন্তু প্রবৃত্তি এবং অন্ধ-সংস্কার যখন নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করে তখন তাহাদের মুখপানে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা অন্ধ এবং মূঢ়—তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না; বরং জ্ঞানের উল্টা লক্ষণই প্রকাশ পায়—মূঢ়তাই প্রকাশ পায়—অন্ধতাই প্রকাশ পায়; শাস্ত্র মতে ইহারই নাম অবিদ্যা।

এইরূপ আমরা আপনার আপনার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই সংস্কার শক্তি এবং সংযম শক্তির ভেদাভেদ সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই; দেখিতে পাই যে—উভয়ই জ্ঞানালোকে আলোকিত; কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল সংযম শক্তিতেই অধিষ্ঠিত আছে; সংস্কার-শক্তিতে জ্ঞানের ভাণ মাত্র—আভাস মাত্র—ছায়া মাত্র প্রতিভাত হয়। ইহার একটা মোটা-মুটি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে আমরা যাহা দিয়াছি তাহা দৃষ্টে আমাদের কথার মর্ম্ম পাঠকের নিকট সুব্যক্ত হইতে পারিবে;—আমরা বলিয়াছি যে, দীপও উজ্জ্বল—দীপালোকিত গৃহও উজ্জ্বল—দুইই উজ্জ্বল, এইখানে দুয়ের সাদৃশ্য; কিন্তু দীপ স্বয়ং উজ্জ্বল—গৃহ স্বয়ং উজ্জ্বল নহে—দীপ স্থানান্তরিত হইলেই গৃহ অন্ধকার, এইখানে উভয়ের মধ্যে প্রভেদের পরাকাষ্ঠা। এ যেমন, তেমনি—মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও সংস্কার স্বয়ং অন্ধ—সংযম শক্তি স্বয়ং চক্ষুষ্মান্; কিন্তু মনুষ্যের প্রবৃত্তি সমূহ যখন সংযম-শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইয়া সুসংযত-ভাব ধারণ করে, তখন তাহাদিগকে দেখিতে দেখায় যেন চক্ষুষ্মান্;—সারথী যখন পথ চিনিয়া অশ্বকে ঠিক্ পথে চালায় তখন দেখিতে দেখায় যেন অশ্ব নিজে পথ চিনিয়া চলিতেছে। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ধর্ম্ম-পরায়ণ মনুষ্যের অন্ধ প্রবৃত্তি-সকলের পরিচালক যে, জ্ঞান, তাহা অবশ্য মনুষ্যের নিজেরই জ্ঞান; সুতরাং মনুষ্যের অন্ধ সংস্কারের উপরে জ্ঞানের আভাস যাহা নিপতিত হয়, তাহা তাহার নিজেরই জ্ঞান হইতে নিপতিত হয়;—এটা বেস্ বুঝিলাম;—কিন্তু পশুদিগের অন্ধ সংস্কারের উপরে জ্ঞানের আভাস যাহা নিপতিত হয় তাহা কোথা হইতে নিপতিত হয়? ইহার উত্তর এই যে, সমস্ত প্রকৃতিতে জ্ঞানের ছায়া যেখান হইতে নিপতিত হয়, এখানেও সেইখান হইতেই নিপতিত হয়; সমস্ত জগতের মূলে সর্ব্বজ্ঞান অটল-রূপে অধিষ্ঠিত বলিয়াই দেখিতে দেখায় যেন—সূর্য্য জানিয়া শুনিয়া পৃথিবীতে দীপালোক বর্ষণ করিতেছে—চন্দ্র জানিয়া শুনিয়া নিস্তব্ধ রজনীতে মাধুর্য্য রস সিঞ্চন করিতেছে—মৌমাছিরা জানিয়া শুনিয়া ভবিষ্যতের উপজীবিকা বর্ত্তমান কালেই ভাণ্ডারস্থ করিতেছে। মৌমাছির অন্ধ-সংস্কারের মধ্যে চেতনের ছায়া যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে তাহার নিজের জ্ঞান হইতে আসিতেছে না—এ বিষয়ে কাহারো সংশয় হইতে পারে না; কেন না, তাহা যদি হইত, তবে মৌমাছি অধুনাতন বিখ্যাত কারিকরদিগের মধ্যে প্রধান আসন পাইবার যোগ্য হইত। ইতর জীবদিগের সকল বিদ্যাই অশিক্ষিত বিদ্যা—তাহারা "না পড়িয়া পণ্ডিত;"

তাহাদের যত কিছু নির্ম্মাণ-কৌশল সমস্তই অন্ধ সংস্কার শক্তিরই বিজৃম্ভন; মনুষ্যের নির্ম্মাণ-কৌশল যেমন জ্ঞান-চর্চ্চা হইতে প্রসূত হয়—ইতর-জীবদিগের মধ্যে সেরূপ ঘটনার দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ। মধ্যাহ্ন দিবসে পৃথিবী আলোকিত বটে—কিন্তু পার্থিব অগ্নি দ্বারা নহে;—কাজেই অপার্থিব কোনো বস্তুর আলোকেই তাহা আলোকিত; তেমনি নিকৃষ্ট জীবদিগের অন্ধ-সংস্কারে জ্ঞানের আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে কিন্তু সে আভাস তাহাদের নিজের জ্ঞানের আভাস নহে; কাজেই বলিতে হয় যে, তাহা সর্ব্বময় মূল জ্ঞানেরই আভাস। কিন্তু মনুষ্যের বেলায় এইরূপ দেখা যায় যে, মনুষ্যের অন্ধ-প্রবৃত্তি সমূহের উপর মূল জ্ঞানের প্রতিবিম্ব তো আছেই—তা ছাড়া তাহার উপর মনুষ্যের নিজেরও জ্ঞান কতক পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হয়; কেননা মনুষ্যের সংযমশক্তি নিজেই জ্ঞানাত্মক। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মনুষ্যের সংযমশক্তি কোনো পরিমিত বিষয়-ক্ষেত্রে বা পরিমিত লক্ষ্য-সাধনে চরম পর্য্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না; তাহা বিস্তীর্ণ হইতে বিস্তীর্ণ-তর ক্ষেত্রে এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যসাধনে ক্রমশই অগ্রসর হইতে থাকে; পরিপূর্ণ পরব্রহ্মই তাহার চরম পর্য্যাপ্তিস্থল।

দেখিতে দেখিতে আমাদের এই প্রস্তাবটির ডালপালা বিপর্য্যয় বাড়িয়া উঠিল, ইহাকে আর বেশী বাড়াইলে অবশেষে মহা-এক জটিল অরণ্য আমাদের পথ-রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইবে। অতএব আর নয়—এখন সমস্ত কুড়াইয়া আমাদের প্রকৃত মন্তব্য কথাটি যত সংক্ষেপে পারি ব্যক্ত করিয়া এইখানেই আমরা প্রস্তাব সাঙ্গ করিতে—এই অকূল প্রতিবাদের রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিতে—ইচ্ছা করি।

প্রভাত বাবু আমাদিগকে প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা তাহার উত্তর এই দিই যে, জগতের সর্ব্বত্রই কি হইতেছে তাহা দৃষ্টি কর, তাহা হইলেই প্রকৃতির পরিচয়-লক্ষণ জানিতে পারিবে। আমরা সাধ্যমতে দেখাইয়াছি যে, জগতের সর্ব্বত্রই কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছে;—

প্রথম, ভৌতিক বলের সহিত ভৌতিক বলের প্রতিদ্বন্দিতা; দ্বিতীয়, ভৌতিক বলের সহিত ঔদ্ভিদ প্রাণের প্রতিদ্বন্দিতা; তৃতীয়, একদিকে ভৌতিক বল এবং ঔদ্ভিদ প্রাণ উভয় সম্বলিত একটা ব্যাপার, আর এক দিকে জৈবিক মন, এই দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দিতা; চতুর্থ, এক দিকে ভৌতিক বল ঔদ্ভিদ প্রাণ জৈবিক মন এই সমস্তের একটা মিশ্রতন্ত্র,আর একদিকে মানব জ্ঞান—এই দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দিতা। প্রতিদ্বন্দিতা বৈপরীত্য সূচকও বটে—ঐক্য-সূচকও বটে; বৈপরীত্য উপরে উপরে—ঐক্য ভিতরে ভিতরে। দুই পক্ষের যেখানে কোনো অংশেই ঐক্য নাই সেখানে প্রতিদ্বন্দিতাও নাই। কালো—সাদা'র খুবই প্রতিদ্বন্দী; কিন্তু গোড়ায় উভয়ের মধ্যে মিল আছে—সে মিল এই যে, তাহারা উভয়েই বর্ণ; সাদা রঙে'র এবং কর্কশ স্বরের মধ্যে তেমন কোনো ঐক্য নাই বলিয়া এ দুয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিতে পারে না। দুই যোদ্ধার মধ্যে অথবা দুই কবির মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা সম্ভবে, কিন্তু কবির সহিত যোদ্ধার প্রতিদ্বন্দিতা সম্ভবে না। প্রথমেই তাই আমরা ভৌতিক বলের সঙ্গে ভৌতিক বলেরই

প্রতিদ্বন্দিতা দেখিতে পাই; ভৌতিক বলের সঙ্গে ভৌতিক বলের যতটা মিল—জীবনের সঙ্গে ভৌতিক বলের ততটা মিল নাই—কিন্তু মিল আছে; যদি দুয়ের মধ্যে আদবেই মিল না থাকিত, তবে উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতাও থাকিতে পারিত না। সমস্ত প্রতিদ্বন্দিতার মূলে যে এক ঐক্য ভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই মূল প্রকৃতি। সাংখ্যশাস্ত্রে সেই ঐক্য-ভূমিটি সাম্যাবস্থা নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে; ফলে—সাম্যও যা—ঐক্যও তা—একই; কিসের সাম্যাবস্থা? না প্রতিদ্বন্দী শক্তি-ত্রয়ের সাম্যাবস্থা। কি সে শক্তিত্রয়? না সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ। সত্ত্ব রজস্তমোগুণের সবিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিবার এ স্থানও নহে—এ সময়ও নহে; সুতরাং এখানে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা এক প্রকার "ধান ভানিতে শিবের গীত।" তবে মোটা মোটি দৃষ্টান্ত চ্ছলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মনে কর ভৌতিক বল তমোগুণ, প্রাণ রজোগুণ, মন সত্ত্বগুণ; এই তিনের প্রত্যেকের সহিত অপর দুয়ের প্রতিদ্বন্দিতা স্পষ্টই দেদীপ্যমান। প্রাণের সহিত একদিকে ভৌতিক বলের—আর এক দিকে মনের—কোস্তাকুস্তি, মনের সহিত এক দিকে প্রাণের আর একদিকে ভৌতিক বলের কোস্তাকুস্তি, ভৌতিক বলের সহিত একদিকে প্রাণের আর এক দিকে মনের কোস্তাকুস্তি, এ তো আমাদের চক্ষের সমক্ষে প্রত্যহই ঘটিতেছে। এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দী শক্তির সাম্যাবস্থাই শাস্ত্রানুসারে (যুক্তি-অনুসারেও বটে) মূল প্রকৃতি।

প্রভাত বাবু এইস্থানে বলিবেন—সন্দেহ নাই যে, সমস্তই তো দেখিতেছি প্রকৃতির কার্য্য—ঈশ্বরের কার্য্য তবে কি? সংক্ষেপে ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতির কার্য্য জগৎ চালানো—ঈশ্বরের কার্য্য স্বীয় প্রভাব দ্বারা প্রকৃতিকে বাঁচাইয়া রাখা। প্রকৃতি আপেক্ষিক সত্য—সুতরাং আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে; কাজেই প্রকৃতি আপনাকে আপনি বাঁচাইয়া রাখিতে অসমর্থ। প্রকৃতি আপেক্ষিক সত্য—ইহা কে বলিল? সমস্ত প্রকৃতিই বলিতেছে! সমস্ত প্রকৃতিই প্রতিদ্বন্দী শক্তি-ত্রয়ের নামান্তর। আমরা দেখাইয়াছি যে, সমস্ত প্রকৃতি প্রতিদ্বন্দিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনে কর ক এবং খ এই দুই শক্তি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী; এমত স্থলে তুমি যদি বল যে, ক-ই সমস্তের মূল; তবে আমি বলিব যে, খ তবে কি অপরাধ করিল? তুমি যদি বলো যে, খ-ই সমস্তের মূল তবে আমি বলিব যে, ক তবে কি অপরাধ করিল? অতএব প্রতিদ্বন্দী শক্তি-দ্বয়ের বা শক্তি-ত্রয়ের কোন-টিই সমস্তের মূল হইতে পারে না; তবে কি উভয়ের সাম্যাবস্থা সমস্তের মূল? সাম্যাবস্থা একটা অবস্থা মাত্র—অবস্থা কিছু আর শূন্যে লট্‌কানো থাকিতে পারে না,—আপনাতে আপনি ভর করিয়াও স্থিতি করিতে পারে না, বস্তু অবলম্বন করিয়াই অবস্থা সংঘটিত হয়। সত্ত্ব রজ স্তমো গুণের সাম্যাবস্থা সত্ত্ব রজ স্তমো গুণকে অপেক্ষা করে—সুতরাং তাহা আপেক্ষিক সত্য; কাজেই মূল প্রকৃতিও আপেক্ষিক সত্য। পরিপূর্ণ সত্য মূলে না থাকিলে আপেক্ষিক সত্য থাকিতে পারে না—ইহা আমরা এতবার এত রকমে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখের কোনো প্রয়োজনই দেখা যাইতেছে না। তা শুধু নয়, সে কথাটি এমনি সহজ যে—তাহা বলিবামাত্রই অপক্ষপাতী পাঠক মাত্রেরই তাঁহা ধ্রুব-

রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, যথা ;—গোড়াকে অবলম্বন না করিয়া আগা থাকিতে পারে না—স্বাধীনকে অবলম্বন না করিয়া পরাধীন থাকিতে পারে না—নিরালম্বকে অবলম্বন না করিয়া সাবলম্ব থাকিতে পারে না—ইত্যাদি। আমরা বলিতেছিলাম এই যে, সত্ত্ব রজ স্তমোগুণের সাম্যাবস্থা সত্ত্ব রজ স্তমোগুণকে অপেক্ষা করে স্নতরাং তাহা আপেক্ষিক সত্য ; এ কথাটি আর-একটু খুলিয়া না বলিলে হয় তো প্রভাত বাবু মনে করিবেন যে, আমরা শুধু কেবল সংক্ষেপে সারিবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিতেছি। জীবের জীবনে প্রথম জাগ্রদবস্থা ; জাগ্রদবস্থার মাত্রা পূরণ হইলে তাহা নিদ্রাবস্থাকে আকাঙ্ক্ষা করে এবং নিদ্রাবস্থার মাত্রা-পূরণ হইলে তাহা জাগ্রদবস্থাকে আকাঙ্ক্ষা করে ; এইরূপ দোঁহে দোঁহাকে চায়—দোঁহা ভিন্ন দোঁহে থাকিতে পারে না—দোঁহে দোঁহাকে অপেক্ষা করে ; আবার, জীবের জীবন উভয়কেই অপেক্ষা করে—জাগ্রদবস্থা এবং নিদ্রাবস্থা দুইই পর্য্যায়-ক্রমে উদয়াস্ত না হইলে জীবন থাকিতে পারে না ; জাগ্রৎ এবং সুপ্তি দুয়ের মাঝখানে স্বপ্নের একটা সাঁকো রহিয়াছে—এটাও যেন মনে থাকে ;—অতএব ইহা অতীব সুস্পষ্ট যে, জাগ্রৎ—স্বপ্ন-সুষুপ্তিকে অপেক্ষা করে ; স্বপ্ন—জাগ্রৎ এবং সুপ্তিকে অপেক্ষা করে ; সুপ্তি—জাগ্রৎ এবং স্বপ্নকে অপেক্ষা করে; আবার, জীবের জীবন তিনকেই অপেক্ষা করে ; জীবের জীবনকে বলা যাইতে পারে যে তাহা স্বপ্ন জাগ্রৎ এবং সুপ্তির সাম্যাবস্থা ; কেননা তিনের সামঞ্জস্য ভগ্ন হইলে জীবন টেঁকিয়া থাকিতে পারে না; জীবনের উপরে যদি নিদ্রা বা অনিদ্রা বা স্বপ্ন, তিনের কোন-টি অতিরিক্ত মাত্রায় আধিপত্য করে তবে তখনি বুঝিয়াছি যে, জীবনের শেষ দশা উপস্থিত। এখন বক্তব্য এই যে, জীবদেহে জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুপ্তি এবং জীবন, এই চারিটি ব্যাপার যেমন পরস্পর-সাপেক্ষ, তেমনি, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সত্ত্ব রজ তমো এবং মূল-প্রকৃতি—এই চারিটি ব্যাপার পরস্পর সাপেক্ষ ; দিনের উদয়াস্ত যেমন বৎসরের শীত গ্রীষ্মের সহিত উপমেয়, সেইরূপ জীবের জীবন ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতির সহিত উপমেয়। ইহাতে অগত্যা এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মূল প্রকৃতি আপেক্ষিক—তাহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে ; সুতরাং তাহার মূলে পরিপূর্ণ স্বাধীন স্বয়ম্ভূ পুরুষ অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতি স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। তবুও যদি প্রভাত বাবু বলেন যে, "প্রকৃতি দ্বারাই যখন জগতের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে—তখন ঈশ্বরের থাকা কেবল বিড়ম্বনা-মাত্র" তবে তাহার সহজ উত্তর এই যে, পটের এ-পিটেই ছবি আঁকা—ওপিট তো ক্রমাগতই ঢাকা থাকে—ওপিট্ কেবল একটা বিড়ম্বনা-মাত্র, অতএব ওপিঠে আগুণ জ্বালাইয়া দেও ! ওপিট না থাকিলে যে, এ পিট্ থাকিতে পারে না, এ কথাটা তাঁহার মন হইতে একেবারেই অন্তর্ধান করিয়াছে ! প্রকৃতি দ্বারা জগতের সব কাজই চলিতেছে—প্রকৃতি জগতের সাক্ষাৎ কারণ ইহা আমরা অস্বীকার করি না। প্রকৃতি-দ্বারা যেন জগৎ চলিতেছে—কিন্তু প্রকৃতি নিজে কিসের দ্বারা চলিতেছে ? প্রকৃতি কি আপনা-দ্বারা আপনি চলিতেছে ? প্রকৃতি কি আর কিছুকে অপেক্ষা করে না—প্রকৃতি কি স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত ? যাহা

তিন নৌকায় পা দিয়া অবস্থিতি করে—তাহাকে কিরূপে স্বাধীন বলা যাইবে? সত্ত্ব রজ তমোগুণ তিনই পরস্পরকে অপেক্ষা করে এবং তাহাদের সাম্যাবস্থা তিনকেই অপেক্ষা করে—সমস্তই আপেক্ষিক কাণ্ড! প্রকৃতি জগৎ চালাইতেছে বটে কিন্তু প্রকৃতিকে চালায় কে? প্রকৃতি আপেক্ষিক—সুতরাং আপনাকে আপনি চালাইতে অসমর্থ; আপনাকে আপনি চালাইবার ভাব কেবল জ্ঞানাত্মক শক্তিতেই সম্ভবে—পূর্ণ জ্ঞানাত্মক শক্তিতে পূর্ণমাত্রায় সম্ভবে—মনুষ্যের সংযম শক্তিতে কতক পরিমাণে সম্ভবে। মনুষ্যের সংযম-শক্তি ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া (সংস্কার-শক্তি যেমন পরিমিত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সংযম-শক্তি তেমনি ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া) ঈশ্বর হইতে ভাব লইয়া—প্রকৃতিকে ক্রমশই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে থাকে। মনুষ্যের সংযম শক্তির হস্তে পড়িয়া প্রকৃতি ক্রমশ পরমাত্মার দর্পণ-রূপে (স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর দর্পণ-রূপে) পরিণত হইতে থাকে। পটের এপিট না থাকিলে যেমন ছবি আঁকা চলে না, তেমনি মূলে প্রকৃতি না থাকিলে জগতের কোনো কার্য্যই চলে না, আবার, ওপিট না থাকিলে যেমন এপিট থাকে না, তেমনি স্বয়ম্ভু ঈশ্বর না থাকিলে পরাধীন প্রকৃতি থাকিতে পারে না। তিনের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাঠক তাহা আপনিই মনোমধ্যে তোলাপাড়া করিয়া দেখিবেন—বর্ত্তমান প্রতিবাদকে আর অধিক দূর টানিয়া লইয়া যাওয়া আমার শ্রেয় বিবেচনা হয় না। পাঠক যদি এখানে ওখানে আমার বাক্যের ছল ধরিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহার জন্য বর্ত্তমান প্রস্তাবে ছিদ্রের অপ্রতুল নাই; কিন্তু যদি সযত্নে সমস্তের মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন তবে তিনি তৎসম্বন্ধে ভাল মন্দ যাহা কিছু স্থির করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য—তাহার উপর আর কোনও প্রকার বাদানুবাদ চালাইতে এক্ষণে আমার স্পৃহাও নাই অবসরও নাই। [শ্রীদ্বি]

ব্রহ্মপূজা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আত্মস্থ হইয়া ব্রহ্মকে দর্শন করিলেই যে ধর্ম্মজীবনের চরমাবস্থায় উন্নত হওয়া যায়, তাহাও নহে। ইহার পরও আছে। তাহা ব্রহ্ম-লাভের অবস্থা। কিন্তু ইহা জানা একান্ত কর্ত্তব্য যে, একবার মাত্র সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিলে

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।"

হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ভগ্ন হইয়া যায় এবং সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। মায়া, মোহ, অসরলতা প্রভৃতি গ্রন্থি দ্বারা হৃদয় আবদ্ধ। যতদিন এই গ্রন্থি ছিন্ন না হইবে, ততদিন কিছুতেই আত্মা নির্ম্মল শান্তির অধিকারী হইবে না। আর ব্রহ্মদর্শন ভিন্নও হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় না। সংশয় ধর্ম্ম-জীবনের মহা শত্রু। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিলে হৃদয়জ সংশয় চিরদিনই হৃদয়ে থাকিবে। আর ব্রহ্মদর্শন হইবা মাত্র সেই সংশয়ও হৃদয় হইতে পলায়ন করিবে। ব্রহ্মদর্শন করিয়া চিত্ত আসক্তিরহিত ও সংশয়রহিত হইলে সেই চিত্তক্ষেত্র ভগবানের ক্রীড়াভূমি হইয়া থাকে। তখনি সাধক আত্ম-ক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ব্রহ্ম লাভ করিতে সক্ষম হন। একটী বস্তু আমার লাভ হইবে, তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে, সেই বস্তুতে আমার

সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিল। তাহা বলিয়া এইরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে, আমার নিজের বলে—নিজের চেষ্টায় আমি লাভবান হইলাম। কিন্তু ব্রহ্ম লাভের মূলে ব্রহ্মকৃপা বর্ত্তমান। তাঁহার কৃপা না হইলে আমরা ব্রহ্ম লাভ করিতে পারি না। আর ব্রহ্মকে লাভ করিলে অপর কোন লাভকেই লাভ বলিয়া মনে হইবে না। এই ব্রহ্মলাভের অবস্থাকে সমাধির অবস্থা বলিলেও বলা যায়। ঋষিরা ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ উপনিষদাদি গ্রন্থে আছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপাসনাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে ব্রহ্ম-উপাসক হইতে পারেন নাই বা পারেন না, তাহা নহে। প্রত্যুত ইহা দেখা যায় যে, অনেক সময় ব্রহ্মজ্ঞানীরা জ্ঞান-মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন ও ব্রহ্মকে লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। আবার ইহাও দেখা যায় যে, উপাসকদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস-বলে ব্রহ্মদর্শন করিয়া অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছেন। সার কথা এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীও ব্রহ্ম-উপাসক হইতে পারেন এবং ব্রহ্মউপাসকও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারেন। তবে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্ম-উপাসনা নহে এবং ব্রহ্ম-উপাসনা ব্রহ্ম-জ্ঞান নহে। ইহার জন্যই আমরা প্রাচীন ঋষিদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি।

এইত গেল প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপাসনা। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম সমাজ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপাসনার বিষয় আলোচনা করিতেছেন। ইহাঁদের উপাসনা-প্রণালী যদিও প্রাচীন ঋষিদের উপাসনা-প্রণালীর অনুরূপ নহে, ইহাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান যদিও প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় গভীর ও গবেষণাপূর্ণ নহে, তথাপি প্রাচীন ঋষিদিগের উপাসনা-প্রণালীর মূল লইয়া ইহাঁদের উপাসনা-প্রণালী, ও প্রাচীন ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের ছায়া লইয়া ইহাঁদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের মূলভিত্তি পত্তন হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে যে বৈদেশিক ভাব নাই, তাহাও মনে করি না। সে যাহা হউক, আমরা প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজেই দেখিতে পাই যে, সামাজিক উপাসনার দিন প্রত্যেক সভ্যই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্ম-উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্ম! তুমি যখন 'সত্যং' এই মহাবাক্য উচ্চারণ কর, তখন কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়স্থ করিয়া দেখ? না সামান্য বাক্যের ন্যায় এই মহা-বাক্য উচ্চারণ কর? যদি 'সত্যং' বলিতে বলিতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভূত না হয়, তাহা হইলে আর এই মহা বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করিও না। ধীর হও, শান্ত হও, শ্রবণ কর! বাক্য ব্রহ্ম নয়। বাক্যের উপাসনা ব্রহ্মের উপাসনা নয়। বাক্যনিষ্পাদিত সত্যই ব্রহ্ম। হৃদয়ে ব্রহ্মানুভূতিই ব্রহ্ম-উপাসনা।

প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়, তাঁহাদের উপাস্য দেবতার একটী মূল-মন্ত্র বা বীজ-মন্ত্র আছে। তাঁহারা শান্ত ও সমাহিত-চিত্ত হইয়া সেই মন্ত্র সহকারে স্বকীয় ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মন্ত্র গোপনীয় ও অতি আদরের বস্তু। আমরা ব্রাহ্ম, আমরাও একটী উপাসক সম্প্রদায়। আ-

মাদেরও মূল-মন্ত্র আছে, কিন্তু মন্ত্র গোপনীয় নহে। সেই মন্ত্র এইঃ—

"সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।"

এই মূল মন্ত্র সহকারে আমাদের উপাস্য দেবতা ব্রহ্মের পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু দেখিতে হইবে, যখন আমরা মন্ত্রোক্ত মহাবাক্যগুলি উচ্চারণ করি, তখন মন্ত্রপ্রতিপাদ্য সত্তাতে উপনীত হইতে পারি কি না? এবং সেই সত্তাতে জীবন ঢালিয়া দিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাত লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারি কি না? যদি না পারি, তবে এই মন্ত্র সাধন করিতে হইবে। সত্যং—'ঈশ্বর আছেন' এইটীকে হৃদয়স্থ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যদিও জড় পদার্থের ন্যায় ঈশ্বরের আকার নাই, তথাপি তাঁহার স্বরূপ আছে। সত্যই তাঁহার স্বরূপ। তিনি সত্য-স্বরূপ। এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা সত্য নহে। যাহার বিনাশ আছে, যাহার উৎপত্তি আছে, যাহার বিকৃতি আছে, অথবা যাহার ক্রমবিকাশ আছে, তাহা সত্য পদের বাচ্য নহে। এই সংসার পরিবর্ত্তনশীল, চন্দ্র সূর্য্য পরিবর্ত্তনশীল, ইহা অসার। মানব-দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর, তাহা অসারের অসার। মানব-আত্মা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাও অসার। এই অসারতা পূর্ণ পৃথিবীতে একমাত্র সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরই সার। তিনিই সত্যং, যিনি সার, অপরিবর্ত্তনীয়, অনাদি। জ্ঞানং—মনের কথা, প্রাণের ব্যথা কেহই জানে না, কেহই বোঝে না। আমি একা থাকিতে ইচ্ছা করি না, তাহার জন্য সর্ব্বদা জনাকীর্ণ নগরীতে বাস করি, কিন্তু জনকোলাহল পূর্ণ নগরীও আমার একাকীত্ব দূর করিতে পারে না, কারণ আমার হৃদয় শূন্য। হৃদয়ের এই শূন্যতা পূর্ণ না হইলে সঙ্গের সঙ্গী মেলে না। ঈশ্বরের জ্ঞান স্বরূপই সেই সঙ্গের সঙ্গী। "সজন নগরে, বিজন গহনে, যথায় যাই, তথায় তুমি কর বসতি।" ঈশ্বরের জ্ঞান স্বরূপ সাধন হইলে, তাঁহাকে অন্তর্যামীরূপে অনুভব করিয়া হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত অভাব দূরীভূত হয়। সুমহা পণ্ডিত হইলেও সে অচেতন, নীতি-বিশারদ, দেশ-হিতৈষী হইলেও সে জড়, দেশের জন্য আকুলিত প্রাণ হইলেও সে অপদার্থ, কারণ তাহার চেতনা নাই, সে জাগ্রত নহে। জাগ্রত কে? যে গভীর অন্ধকারেও পাপ করিতে পারে না, যে গিরিগুহায় বা সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করিয়াও কুচিন্তা করিতে অক্ষম, আর যে সকল অবস্থাতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, সেই চেতনা। এই চেতনা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সেই চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞানময় পুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং 'জ্ঞানম্' ঈশ্বরের এই স্বরূপ সাধনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনন্তম্—ঈশ্বরের সত্তা ও জ্ঞান সকল জগতে পরিপূর্ণ। হিমালয়ে কুজ্‌ঝটিকা হইলে যেমন সমস্ত পর্ব্বত একে একে কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে ডুবিয়া যায়, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, সকলই কুজ্‌ঝটিকাময়; আকাশ নাই, পাতাল নাই, কোন বস্তুর চিহ্নমাত্র নাই, সকলই কুজ্‌ঝটিকাময়; কুজ্‌ঝটিকার অনন্ত প্রসারণে সমস্ত হিমাচল কুজ্‌ঝটিকাময়; অনন্ত কুজ্‌ঝটিকার ক্রীড়া ভূমিমাত্র; আদি নাই, অন্ত নাই, কেবল কুজ্‌ঝটিকা, সেইরূপ যখন উপাসক ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ, সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলেন, তখন দেখিলেন, সমস্ত জগত তাঁহার সত্তার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে,

সমস্ত জগত তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে; চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, আকাশ নাই, পাতাল নাই, কেবল তাঁহার সত্তা, তাঁহার জ্ঞান; পর্ব্বত নাই, সমুদ্র নাই, পৃথিবী নাই, শূন্য নাই, কেবল তাঁহার সত্তা ও জ্ঞানের অনন্ত বিস্তৃতি; তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, তিনি অনন্তম্। এইরূপ আমাদের মন্ত্রস্থ স্বরূপগুলি সাধন না করিলে প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে না। যতদিন ব্রহ্ম-স্বরূপে ব্রাহ্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন ব্রাহ্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। তিনিই উপাসকের প্রাণ প্রতিষ্ঠার স্থান। আর সত্যং জ্ঞানমনন্তং ইত্যাদি মন্ত্রই ব্রাহ্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র। এই মূলমন্ত্র ভিন্ন ব্রহ্ম-উপাসনার একটী বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে। সেই প্রণালীটী চারি ভাগে বিভক্ত। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। উদ্বোধন—নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রত করা, অচেতন আত্মাকে সচেতনে আনা, অস্থির চিত্তবৃত্তিকে আত্মস্থ করার নাম উদ্বোধন। আরাধনা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। অনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। এই মন্ত্রস্থ অথবা মহাবাক্যস্থ প্রত্যেক স্বরূপকে আত্মস্থ হইয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার নাম আরাধনা। ধ্যান—পূর্ব্বোক্ত মহাবাক্যস্থ সমস্ত স্বরূপের একীকৃত স্বরূপে আত্মবিসর্জ্জনের নাম ধ্যান। অর্থাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতে আত্মবিসর্জ্জন। প্রার্থনা—ঈশ্বরকে সত্যং জ্ঞানংরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ের অভাব জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিবিধান ভিক্ষার নাম প্রার্থনা। যথা—"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অসত্য হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও, হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। আমি অসত্যেতে ডুবিয়া আছি, অসারের দাস হইয়া সর্ব্বদা দিন কাটাইতেছি, আমার স্বরূপ অসত্য, তোমার স্বরূপ সত্য, হে সত্য স্বরূপ! আমাকে তোমার স্বরূপে লইয়া যাও। আমি নিজে অন্ধকার, অহংজ্ঞান আমাকে আরও অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে, অবিশ্বাস সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অমারজনী করিয়া রাখিয়াছে, তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, এই অন্ধকারকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হউক। আমি মৃত্যুর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি, মায়া মোহ ও পাপ আমাকে চেতন হইতে দেয় না, আমি অচেতন, আমি মৃত, হে অমৃত স্বরূপ! আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও, তোমাতে লইয়া যাও। আমার তপস্যা আমার নিয়ম আমার সাধন ভজন তোমাকে প্রকাশ করিতে পারিল না, হে স্বপ্রকাশ! তুমি আপনি প্রকাশিত না হইলে কেহই কিছুতেই তোমাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, তুমি প্রকাশিত হও। হে রুদ্র! আমি দুর্ব্বল, তোমার কঠোর দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিব না, তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে চাই, তোমার প্রসন্ন মুখ দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। এইত গেল বিধিবদ্ধ উপাসনা প্রণালী। তার পর সাধক নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে তাঁহার স্বরূপ অবলম্বন করিয়া প্রণালী বহির্ভূত সাধনও অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু

সাবধান! মূল মন্ত্র কেহই ভুলিবেন না। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” আমাদের মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আর একটী কথা। ঈশ্বর ও আত্মা লইয়া উপাসনা। আত্মার দীনতা, আর ভগবানের কৃপা এই তুইটী না হইলে উপাসনা আরম্ভ হইতে পারে না। ব্রহ্ম-কৃপাই উপাসকের প্রধান সম্বল ও গুরু। পরব্রহ্মের কৃপা-সঞ্চারই উপাসকের শক্তি-সঞ্চার। এই কৃপা সঞ্চারিত হইলে মূল মন্ত্র অর্থাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

“এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরম আনন্দঃ।”

এই আমাদের পরম গতি, এই আমাদের পরম সম্পদ, এই ব্রহ্ম-উপাসনাই আমাদের পরম লোক, এই উপাসনাই আমাদের পরম আনন্দ।

ক্রমশঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত্র।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

সেই পুষ্করিণীর ধারে এক জন সন্ন্যাসী কয়েক জন শিষ্য লইয়া বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক প্রতিদিন সেবা করিতেন। শিবনারায়ণ সেই ঘাটে বসিয়া দেখিলেন যে এক জন মহাত্মা বসিয়া আছেন এবং ভাবিলেন যে ইহাঁর কাছে যাইয়া দেখি যে ইহাঁর ভাব কি। শিবনারায়ণ সেখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াবা মাত্র তাঁহার চেলা বলিল (তোম্ কোন্ হ্যায় হিঁয়া কেঁও আয়া) অর্থাৎ তুই কে, এখানে কেন আইলি? শিবনারায়ণ বলিলেন আমি মনুষ্য আপনাকে মনুষ্য জানিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। এক জন চেলা বলিল (বেটা, দেখতা তো হ্যায় যে তোম আদমি হ্যায়, তু গৃহস্থ হ্যায় না তু সাধু) অর্থাৎ আমি তোকে দেখিতেছি যে তুই মনুষ্য, তবে তুই গৃহস্থ না সাধু। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন যে গৃহস্থ আর সাধু তো শুনিতেছি, কিন্তু কাহাকে বলে তাহা জানি না। তখন সেই স্থানের যিনি মহাত্মা, তিনি বলিলেন যে উহাকে এখানে ধরিয়া আন, গৃহস্থ এবং সাধু কাহাকে বলে দেখাইতেছি। শিবনারায়ণকে চেলা ধরিয়া তাঁহার গুরুর কাছে লইয়া গেল, শিবনারায়ণ সেখানে সেই মহন্তের কাছে যাইয়া বসিলেন। মহন্ত সন্ন্যাসী বলিলেন যে, তুই গৃহস্থ আর সাধু মহাত্মা জানিস না? এত মহাপুরুষ বসিয়া আছে দেখিতে পাইতেছিস না? আমরা দশনামী, গিরি, পুরি, ভারতী, শৃঙ্গারি মঠ; আমরা সন্ন্যাসী, দণ্ডী; আমাদের মধ্যে মাড়াই, মট, চুলা, চাকি আছে তুই জানিস না। শ্রীবিষ্ণুতে রামাওত, নিমাওত, মধোয়াচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, উহাঁর মধ্যে পঞ্চ সংস্কার ধাম ছত্র ও ইষ্ট এই সব আছে তুই জানিস না? তখন শিবনারায়ণ বলিলেন যে গৃহস্থ ধর্ম্মেতে তো লেজ ছিল, কিন্তু আপনি মহাত্মা হইয়াও এত লেজ বাহির করিয়া রাখিয়াছেন? অর্থাৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে যখন আপনি ছিলেন তখন আপনি তো বলিতেন যে আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষেত্রি, আমার এই গোত্র, আমি এই সম্প্রদায়, আমি কান্যকুব্জ, আমার এই শাখা, আমার এই সূত্র। এই সকল উপাধি যখন আপনি ত্যাগ করিয়া সৎ পথের জন্য মাথা মুড়াইলেন তখন আবার এই নানা উপাধি জড়াইয়া কেন লইলেন, যাহা গৃহস্থ ধর্ম্ম অপেক্ষা

বেশি ? আপনি বলিলেন আমি সন্ন্যাসী, শৃঙ্গারি মঠের আমি গিরি, পুরি, আমার এই মাড়াই মট ইত্যাদি, ইনি আমার গুরু, উনি আমার গুরু-ভাই, ইহা অপেক্ষা তো গৃহস্থ ধর্ম্ম ভাল। তখন সন্ন্যাসী রাগ করিয়া বলিলেন যে, বেটা ! গৃহস্থ কেমন করিয়া ভাল হইল? গৃহস্থ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ভাল, ব্রহ্মচর্য্য হইতে বান্প্রস্থ, বান্প্রস্থ হইতে সন্ন্যাস, সন্ন্যাস হইতে পরমহংস শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যখন আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া বান্প্রস্থ লইলাম, বান্প্রস্থ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইলাম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইলাম, তখন গৃহস্থ অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে মহাত্মা! আপনি আমার কথাতে রাগ করিবেন না। গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে আপনি যখন গৃহস্থ ধর্ম্মে ছিলেন, এখন আপনি যা আছেন তখন ও তো তাহাই ছিলেন। তখন আপনার এই স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। তখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেছিলেন এখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেছেন। আপনি যেখানে যাইতেছেন সেইখানেই তো পঞ্চতত্ত্ব আপনার শরীরে লগ্ন আছে, তবে গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন্ বস্তু আপনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং ব্রহ্মচর্য্যের বা কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া বান্প্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং বান্প্রস্থের বা কি বস্তু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মের বা কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইলেন? পরমহংস কি বস্তু? আপনার পূর্ব্বে যে স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি ছিল, এখন ও তো তাহাই আছে এবং আপনি যে বস্তু গৃহস্থ ধর্ম্মে ছিলেন সেই বস্তু আপনি এখনও আছেন। তবে কোন্ বস্তুকে আপনি ত্যাগ করিয়া কোন্ বস্তুকে আপনি গ্রহণ করিলেন? কেবল নানা নাম মাত্র আপনি গ্রহণ করিলেন। সে বস্তুটা কি কেবল মনের নানা ভ্রম মাত্র? আপনি তো গৃহস্থ ধর্ম্মে যাহা ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। কেবল গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি মার্গে ছিলেন, এখন নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করিয়াছেন, যদি নিবৃত্ত হইতে পারেন। স্বরূপেতে তো গৃহস্থ সন্ন্যাসী পরমহংস নাই। স্বরূপেতে যাহা তাহাই থাকে। কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয়তে সমভাবে থাকেন তিনি বীর পুরুষ। কাপুরুষ ব্যক্তি প্রবৃত্তি দেখিয়া পলায়ন করে, প্রবৃত্তি সহ্য করিতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কেবল অবস্থা গুণ ক্রিয়া পরিবর্ত্তন হয়, যেরূপ স্বপ্ন অবস্থা লয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয়। পুরুষ তিন অবস্থাতে একই থাকে, তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদ্যপি আমি আপনাকে ইহার মধ্যে কোন অন্যায় অযথা বাক্য বলিয়া থাকি তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভাল করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন। সন্ন্যাসী মহাত্মা বলিলেন যে তুই অনেক ভুল কথা বলিয়াছিস্। যদি তুই আমার চেলা হইস্ তো তোকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। বড় বড় মহান্ পণ্ডিত ও বড় বড় রাজা আমার চেলা। শিবনারায়ণ বলিলেন হে মহাত্মা পুরুষ! গুরু এবং চেলা কাহাকে বলে? তখন মহাত্মা রাগিয়া বলিলেন বেটা তুই আমায় চিনিতে পারিতেছিস না? আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছিস? তোকে আমি ভস্ম করিয়া ফেলিব। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আপনাকে তো জা-

নিতে পারিতেছি আপনি কি না করিতে পারেন, কিন্তু আমি আমার গাত্রের লোম একটা আপনাকে উৎপাটন করিয়া দিতেছি অগ্রে তাহাকে ভস্ম করুন, তবে পশ্চাতে আমাকে ভস্ম করিবেন। আপনি এতদিন পর্য্যন্ত কি কাহাকেও ভস্ম করিয়াছেন? হে মহাত্মন্! ভস্ম হইবার পুরুষ কি কেহ আছেন? ভস্ম কি কেহ কাহাকে করিতে পারেন? তবে কেন মিছা ভ্রমে পতিত হইয়া আছেন। অগ্নি কি কখন অগ্নিকে ভস্ম করিতে পারেন। হে মহাত্মন! শাস্ত্রের পঠিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার শরণাপন্ন হউন, যাহাতে অহঙ্কার নিবৃত্তি হইয়া সদা আনন্দরূপ থাকিবেন। সৎ পথে যাইলে সকল ভ্রম কষ্ট নিবারণ হয়। তখন সেই সন্ন্যাসী মহাত্মা বলিলেন যে, মহাশয় আপনি কে? আপনি যে এত জ্ঞানের কথা বলিলেন আপনি কে? আপনি সাধু না পরমহংস, আপনার তো কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আমি কে এবং তুমি যে কে আমি কি বলিব, যাহা আছি তাহাই। কেবল বলিতে গেলে, আমিও মনুষ্য তুমিও মনুষ্য। তখন সেই মহাত্মা শিবনারায়ণকে বলিলেন যে, আপনাকে চিনিতে না পারিয়া অনেক কটু কাটব্য বলিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে ওঁ নমঃ নারায়ণায় নমঃ বলিয়া প্রণাম করিতেছি। তখন শিবনারায়ণ আপনার মনে মনে বলিলেন যে যত রাজা প্রজা পণ্ডিত এবং সাধুদিগের তো এই গতি হইয়াছে। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কেহ কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন না। যে যে স্থানে যাই সেই সেই স্থানেতে যদ্যপি কোন পণ্ডিতের সহিত দেখা হয় তাহা হইলে সেই পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেন তুমি শাস্ত্র পড়িয়াছ, এই কথার শব্দ অর্থ জান? যদি বলি জানি, তাহা হইলে সেই পণ্ডিত যাহাতে আমি পরাজয় হই তাহার জন্য ও যাহাতে আপনার মান বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু যদি বলি যে পড়ি নাই, তাহা হইলে সেই পণ্ডিত বলেন যে তুই মূর্খ, এই বলিয়া তাড়াইয়া দেন। কোন সাধুর নিকট যদি যাই, তাহা হইলে সেই সাধু জিজ্ঞাসা করেন যে তুই কোন্ মঠের এবং কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু? তুই কি কি জানিস, তুই কিছু ভস্ম টস্ম করিতে পারিস, সোনা, রূপা, কিমিয়া? যদ্যপি বলি আমি কিছু জানিনা, আমি কোন সম্প্রদায়ের সাধু নহি। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলে যে এ তো আমার সম্প্রদায়ের সাধু নয়, বেটাকে তাড়াইয়া দেও। যদ্যপি রাজার নিকট সৎ-উপদেশ দিবার জন্য যাই তাহা হইলে কোন রাজা তো আমার সম্মুখে আসেন না, পাছে কিছু যাচ্ঞা করি। যদ্যপি কেহ আসেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কোন্ বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছ? সিদ্ধ হইয়া থাক তো আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে আমার পুত্র হয় ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়। কেহ শিবনারায়ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন আমি কি আগে অসিদ্ধ ছিলাম যে এখন সিদ্ধ হইব, যাহা আগে ছিলাম তাহা এখন ও আছি, সিদ্ধও হই নাই, অসিদ্ধও হই নাই, যাহা তাহাই আছি। সিদ্ধ অসিদ্ধ হইবারও কোন প্রয়োজন নাই। রাজারা ইহা শুনিয়া তাড়াইয়া দেয়, যে তুমি কিছু জাননা, যাও। যদি প্রজার নিকট যাই তাহা হইলে প্রজারা তো দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতে দেয় না। যদ্যপি কেহ কেহ

দাঁড়াইতে দেয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করে তুই কি গৃহস্থ না সাধু? যদি বলি যে আমি সাধু তাহা হইলে সেই গৃহস্থ বলে তুমি কোন ঔষধ জান? অথবা আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমার পুত্র হয় ও ধন হয়। ধন হইলে তোমাকে সেবা করিব। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিতেন যে সকলের বুদ্ধি একবারে অসৎ পদার্থে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকলেই ধন, রাজ্য, পুত্র ইত্যাদি সুখ আকাঙ্ক্ষা করে এবং চাহে। কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতাকে কেহ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না ও চাহে না। সুর নর মুনির এই রীতি। স্বার্থ লাভের জন্য করেন প্রীতি। শিবনারায়ণ মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন যাহা হউক এখন যেখানে যাইতেছি সেই খানেই তো এইরূপ ঘটিতেছে এখন ক্ষত্রিয় কুলে যাই দেখি ইহাঁরা কি করেন। কেন না ইহাঁরাই চিরকাল সত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। শিবনারায়ণ এই ভাবিয়া কাশী হইতে পূর্ব্ব মুখে ডুম্‌রাওর নিকট চৌগাঁই গ্রামের বাবুর নিকট গেলেন। চৌগাঁয়ের বাবুর কন্যার সেই দিবস বিবাহ ছিল। পশ্চিম হইতে এক বাবু অত্যন্ত ধুম্‌ধামে হাতি ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। এক বাগান তাহারা আশ্রয় করিল। শিবনারায়ণ দ্বারেতে যাইয়া দেখিলেন বাবুরা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, যে আপনারা বিবাহের জন্য এখন ব্যস্ত আছেন, তাহার জন্য সত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। কিন্তু আমি বাগানের অমুক স্থানে যাইয়া বসিতেছি যখন তোমাদের সাবকাশ হয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। দুই চারি কথা বলিয়া আমি শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমি অধিক দিন এখানে থাকিব না। চৌগাঁয়ের বাবু বলিলেন বেটা, যাব কি না যাব জানি না, তুই যা। তোর মতন পাগল এখানে অনেক আছে। শিবনারায়ণ সেই বাগানে যে সকল বরযাত্রিগণ আছে সেই সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বরের পিতা যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে দুই চারি জন মহাত্মা লোক কাশী হইতে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মহাত্মা শিবনারায়ণকে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে দেখিয়া বরকর্ত্তা বাবুকে বলিলেন যে ও বেটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও বেটা চোর, কিছু সোনা রুপার দ্রব্য গহনা কিম্বা আর কিছু লইয়া পলাইয়া যাইবে। উহাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। তখন মহাত্মার কথা শুনিয়া বাবু দুই জন দ্বারবানকে হুকুম দিল যে ঐ ব্যক্তি ঘুরিতেছে, উহাকে ধরিয়া এখানে আন। দুইজন দ্বারবান তখনি শিবনারায়ণের দুই হাত ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বাবুর নিকট লইয়া গেল। বাবু বলিলেন যে তুই কে? শিবনারায়ণ বলিলেন আমি মনুষ্য—আদমি। বাবু বলিল বেটা তুই সত্য সত্য বল্, নতুবা তোর হাড় চূর্ণ করিব। দ্বারবানকে হুকুম দিলেন যে বেটা যদি না বলে তাহা হইলে তরবাল আনিয়া ইহার হাত পা কাটিয়া লও। তখন একজন মহাত্মা বলিলেন যে বাবু চোরকে আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেটাকে দুই চারি থাবড়া মারিয়া বাহির করিয়া দেন। সেই কথা শুনিয়া বাবু দ্বারবানদের হুকুম দিলেন। দ্বারবানরা সেই হুকুম শুনিয়া শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দিতে দিতে আধ ক্রোশ দূরে তাড়াইয়া দিল।

ক্রমশঃ।

——

কোজাগর পূর্ণিমার দিন দেবগৃহে ব্রহ্মোপাসনা।

উপদেশ।

"অদ্য ভ্রম বশতঃ আমাদিগের দেশের লোকেরা কল্পিত লক্ষ্মী দেবীর উপাসনা করিতেছেন; আমরা সেই প্রকৃত লক্ষ্মী দেবী পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছি। তিনিই ঐশ্বর্য্যের স্বামী, তিনিই ঐশ্বর্য্যের প্রদাতা, তিনিই ঐশ্বর্য্যের নিয়ন্তা। তিনিই বসুন্ধরাকে ধনধান্য দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। ধনধান্যভরা রমণীয় ধরা তাঁহারই দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। গৃহস্থ ব্রাহ্ম যদি বলেন ধনকে তুচ্ছ করি তাহা হইলে তিনি মিথ্যা বলেন, তাঁহার কার্য্য পদে পদে তাঁহার কথার অযথার্থতা প্রদর্শন করে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন "বিনা ধনেন সংসারঃ নয়নেন বিনা বপুঃ। যেমন শারীরিক কার্য্য নয়ন বিনা চলে না তেমনি সংসার ধন বিনা কোন রকমে চলে না কিন্তু ধনোপার্জ্জন জন্য বৈধ চেষ্টা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোন অবৈধ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। বৈধ উপায় দ্বারা সম্যক চেষ্টা করিয়া যদি ধনোপার্জ্জন না করিতে পারা যায় তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু যিনি তোমাকে ধনী করেন নাই তিনি তোমার কুশল তোমা হইতে ভাল জানেন। যখন ধর্ম্মের সহিত বিষয়ের বিরোধ হয় তখন অসঙ্কুচিত চিত্তে বিষয় ত্যাগ করা উচিত। উত্তরোত্তর যত ধন বৃদ্ধি হয় লোকে উত্তরোত্তর তত গর্ব্বিত হয় কিন্তু ধার্ম্মিকের সে প্রকার হওয়া উচিত হয় না। যেমন ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় তেমনি তাঁহার নম্রতাগুণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া উচিত। ধন সম্বন্ধে আপনাকে ঈশ্বরের খাতাঞ্জ মনে করা কর্ত্তব্য। পরিবার প্রতিবেশী স্বদেশীয় লোক পৃথিবীস্থ লোকের উপকারের জন্য ধন ব্যয় করা কর্ত্তব্য; আপনার সুখ সাধনের জন্য করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ভাবে ধনের ব্যবহার করিলে ধনের সার্থকতা হয়। ঈশ্বর যেমন পার্থিব ধনের নিয়ন্তা তেমনি পারত্রিক ধনের নিয়ন্তা। আধ্যাত্মিক ধনের সহিত কি পার্থিব ধনের তুলনা হইতে পারে? পবিত্রতা, শান্তি, প্রেম ও ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক ধন। যেমন কিছু ধন উপার্জ্জন করিলে তাহা অধিকতর ধন উপার্জ্জনের সহকারী হয় তেমনি এক আধ্যাত্মিক ধন উপার্জ্জিত হইলে তাহা আর এক আধ্যাত্মিক ধন লাভের উপায় হয়। পবিত্রতা লাভ শান্তি লাভের উপায় হয়, শান্তিলাভ ঈশ্বরপ্রেমলাভের উপায় হয়, ঈশ্বরপ্রেম ব্রহ্মানন্দ লাভের উপায় হয়। রিপু দমন না করিলে, চিত্তকে পবিত্র না করিলে, হৃদয়ের অভদ্র জিনিব সকল বিনষ্ট না করিলে, শান্তি লাভ করা যায় না। যেমন স্থির ও নির্ম্মল আকাশেই সূর্য্যকিরণ দীপ্তি পায় তেমনি স্থির ও নির্ম্মল চিত্তেই প্রেমসূর্য্য প্রকাশ পায়, মোহমেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, রিপুরূপ ঝটিকা দ্বারা আন্দোলিত আত্মাতে ঈশ্বর প্রকাশ পায়েন না। ঈশ্বরপ্রেম না হইলে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না।"

প্রার্থনা।

"অদ্যকার জ্যোৎস্নাময় রজনী কি সুন্দর। কি নির্ম্মল! কি প্রশান্ত! কি সুধাময়! হে পরমাত্মন! চন্দ্রের যেমন নিজের আলোক কিছুই নাই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয় তেমনি আমাদিগের আত্মার নিজের কোন আলোক নাই কেবল তোমার আলোকে আলোকিত, কেবল তোমার ভাতির অনুভাতি মাত্র। যখন সংসার তোমার ও আমাদিগের আত্মার মধ্যে আইসে তখন আত্মার গ্রহণ উপস্থিত হয়। তোমার নিকট প্রার্থনা যে আমাদিগের আত্মা সংসাররূপ রাহু দ্বারা কখন গ্রস্ত না হয়। অদ্যকার রজনী যেমন সংসারের লোকের আনন্দদায়ক তোমার নিকট প্রার্থনা যে আমাদিগের আত্মা তোমার সুধাময় কিরণে উজ্জ্বল হইয়া জগতের আনন্দদায়ক হয়"।

তৎপরে সকলে বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র স্থিত চবুতরার উপরে গোলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মের জয়" উচ্চৈঃস্বরে গান করিলেন। ফুল ঈশ্বরের পৃথিবীস্থ সকল ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শোভনতম, কোমলতম, মধুরতম। এই বোধে ব্রাহ্মেরা তৎপরে বাটীর পুষ্পোদ্যানে সেই চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া নিম্নে লিখিত গানটি গাহিলেন।

"ফুটন্ত ফুলের মাঝে
দেখরে মায়ের হাসি।
কিবা মৃদু মন্দ সুধাগন্ধ
ঝরে তাহে রাশি রাশি!
অরূপ রূপের ছটা
বিচিত্র বরণ ঘটা,
রসালো ঘোরালো,
করে দিক্ আলো,
শোভা হেরে মন উদাসী।
কুসুমে প্রাণ পাগল করে,
পরশে ত্রিতাপ হরে,
মা হাসে ফুলের ভিতরে,
তাই ফুল এত ভাল বাসি।
তরু কুঞ্জ পুষ্পবনে,
নিরখিয়ে নিরঞ্জনে,
ভাসে যোগানন্দে,
হাসে প্রেমানন্দে,
যোগী ঋষি তপোবন বাসী"।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর সারস্বত আশ্রমে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

৫৫৭ সংখ্যা — ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শান্তিনিকেতনে প্রার্থনা।

হে করুণাময় প্রভো! এই অধমদিগের প্রতি তোমার কত করুণা কত প্রেম। প্রতি নিশ্বাসে আমরা তোমার কৃপা উপভোগ করিতেছি, তোমার কৃপাই আমাদের ভরসা ও সম্বল। তোমারই নামে আজ আমরা বন্ধুবান্ধবে এই পবিত্র আশ্রমে মিলিত হইয়াছি, তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আজ আমরা ধন্য হইলাম। তোমার প্রেমে আমাদের সকলের হৃদয় তুমি এক কর, আমাদের অন্তরের সমুদায় বিদ্বেষ অসদ্ভাব দূর কর এবং আমাদের প্রাণ পূর্ণ করিয়া তুমি প্রকাশিত থাক। হে শান্তিদাতা! সংসার ঘৃণা বিদ্বেষ পাপের কোলাহলে পরিপূর্ণ, কোথাও শান্তি নাই আরাম নাই, তুমিই একমাত্র শান্তিনিকেতন, তোমাতেই প্রকৃত শান্তি ও আরাম। তুমি যখন হৃদয়ে আবির্ভূত হও, সকল অশান্তি জ্বালা কোথায় পলায়ন করে। আমরা শোক সন্তাপে বিষণ্ণ মনে শান্তির ভিখারী হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। তোমার শান্তি নিকেতনে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। আমরা পাপ তাপে মৃত, হে অমৃতস্বরূপ! তোমার অমৃতভাব সঞ্চারিত করিয়া আমাদিগকে জাগ্রত কর। হে সৌন্দর্য্যসার! সংসারের ধূলিতে আমরা কদর্য্য হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর কর। তোমার স্পর্শে সকল অপবিত্রতা মলিনতা দূর হউক। আমাদের শোকভারভগ্ন মলিন প্রাণে তুমি চির জাগ্রত থাক। তোমার পবিত্র সহবাসে আমরা চিরশান্তি লাভ করি। হে দীনশরণ! দীন দুঃখী সন্তানের এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণকর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হিমালয়ে ব্রহ্ম-পূজা।

প্রেমে উচ্ছ্বাস নাই, ভাবে তরঙ্গ নাই, ব্যাকুলতায় নিরাশা নাই, ভক্তিতে ভাবুকতা নাই, বিশ্বাসে অজ্ঞানতা নাই, জ্ঞানে অভিমান নাই, স্থির, ধীর ও গম্ভীর ভাবে গভীর অতলস্পর্শ সাগর-বক্ষ-বিহারী মীনের ন্যায় প্রাচীন-ভারতের ব্রহ্ম-উপাসক "যোবৈ ভূমা তৎ সুখম্" বলিয়া মহান্ ঈশ্বরের,

সত্তা-সাগরে ডুবিতেছেন। ডাকিলে সাড়া নাই, মুখে কথাটী নাই, ভাব ভঙ্গীতে চিত্ত-বিকারের চিহ্ন মাত্র নাই, মুখমণ্ডলে শান্তির প্রতিকৃতি, দৃষ্টিতে প্রেম ভক্তির জীবন্ত চিত্র, পদবিক্ষেপে বিশ্বাস বিনয় ও ব্যাকুলতা-মিশ্রিত অমিয় সুধা ঢালিতে ঢালিতে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের স্বরূপ-সাগরে ডুবিলেন, আর উঠিলেন না। কিন্তু জীবন-বৃন্তের কোরকে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" অর্দ্ধবিকশিতাবস্থায় একাত্ম-প্রত্যয়-সারম্ প্রপঞ্চোপশমম্ শান্তং শিবমদ্বৈতের প্রস্ফুটিত অবস্থার প্রাণস্য প্রাণের সৌরভ ঢালিতে ঢালিতে তাঁহারা নীরব হইয়াছেন। সেই জীবন-ফুল এখনও জীবন্ত শোভার আধার, সৌরভের ভাণ্ড, দেখ আনন্দিত হইবে, ঘ্রাণ কর তৃপ্ত হইবে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"

এই প্রশ্নটী যেমন আর্য্য জীবনের জীবন বৃন্তের অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবন-ফুলকে ফুটাইয়া দিত, এমন আর কুত্রাপিও দৃষ্টি-গোচর হয় না। ব্রহ্ম উপাসনাই বল আর ব্রহ্মপূজাই বল, যোগ তপস্যা বা ধ্যানই বল, এই সকলেরই ভিত্তিভূমি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। আর্য্য-হৃদয়ে আদৌ যদি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা অভ্যুদিত না হইত, তবে আর শান্ত দান্ত উপরত, শান্তিময়, প্রেমময় ও ভক্তিপূর্ণ আর্য্য জীবন দেখিয়া আমরা মোহিত হইতে পারিতাম না। অবশ্যই সকলের হৃদয়ে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত নাও হইতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসা মানব-মনের মূল প্রকৃতি। বালক বল, বৃদ্ধ বল আর যুবাই বল, সকলেরই প্রাণ জিজ্ঞাসা-ময়। বালকের প্রশ্নের চোটে পিতা মাতা অস্থির, যুবকের প্রশ্নতরঙ্গে শিক্ষক আকুল, বৃদ্ধের হৃদয়-ভেদী প্রশ্ন-বাণে নিজে অনুবিদ্ধ। কি পাপী কি পুণ্যবান্, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, কি আস্তিক কি নাস্তিক, সকলেরই প্রাণরূপ ধমনীতে জিজ্ঞাসা-শোণিত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। মানবের গুরু জিজ্ঞাসা, উপগুরু জগৎ; উন্নতির আদিমূল জিজ্ঞাসা, উপমূল জ্ঞান বিজ্ঞানাদি; পথ জিজ্ঞাসা, উপপথ ধার্ম্মিক জ্ঞানী মহাজন প্রভৃতি। কাহার হৃদয় কি চায়, তাহা তাহাদিগের জিজ্ঞাসা দ্বারাই বোঝা যাইতে পারে। কেহ জ্ঞান চায়, কেহ ভক্তি চায়, কেহ নীতি চায়, কেহ ধর্ম্ম চায়, কেহ প্রেম চায়, কেহ পবিত্রতা চায়, পৃথিবীর মধ্যে এইরূপ চাওয়ার ভাব প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম-সমাজে, প্রত্যেক লোক সমাজে বিদ্যমান আছে। আবার ইহার মধ্যে এক একটী চাওয়া এক একটী জাতির বিশেষ ভাব। সে যাহা হউক, আমাদের আর্য্য ঋষিদের বিশেষ ভাব ব্রহ্মকে চাওয়া। তাহার জন্যই আর্য্যেরা জ্ঞান জিজ্ঞাসা ভক্তি বা প্রেম জিজ্ঞাসা না করিয়া মুখপত্তনেই আরম্ভ করিলেন, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। একমাত্র ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সঞ্জীবনী শক্তিতে রাজা সিদ্ধার্থ ভিক্ষুক বুদ্ধ হইলেন, নবদ্বীপের নিমাই প্রেমিক চৈতন্য হইলেন, রূপ ও সনাতন উচ্চপদ ও বিষয়-বাসনা তুচ্ছ করিয়া ফকির হইলেন। যাঁহার হৃদয়ের জিজ্ঞাসা যত গভীর ও ওজস্বী, তাঁহার হৃদয়ের বেগ তত প্রখর ও সজীব। মনের-প্রকৃতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, এক এক শ্রেণীর হৃদয়ে এক একটী জিজ্ঞাসা প্রবল। কিন্তু তাহা বলিয়া এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, ইহার হৃদয় কেবল মাত্র জ্ঞানজিজ্ঞাসার আধার আর উহার হৃদয় এক মাত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার আশ্রয়-ভূমি। বিশেষ ভাবে দেখিতে গেলে অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেক হৃদয়

হইতেই জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইতেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের মনই ধর্ম্মজিজ্ঞাসার বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। 'ধর্ম্ম কি? ঈশ্বর কি?' এই জিজ্ঞাসা লইয়াই মানব-প্রাণ আকুল। এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যাহাদের হৃদয়কে অনুবিদ্ধ করে, তাহাদের আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই, কিছুতেই আরাম নাই। বিষয় তাহাদের নিকট বিষ, সংসার কারাগার, পৃথিবী শূন্য। যাহাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা গভীর ও ওজস্বী তাহারা প্রত্যক্ষ-বাদী। ভাবুকতায় মন গলেনা, শাস্ত্রের সারগর্ভ উপদেশে প্রাণ স্পর্শ করে না, বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বরে তৃপ্তি হয় না, ধর্ম্মানু-মোদিত কার্য্যেও প্রীতি হয় না। তাহারা চায় ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে, প্রাণের মূলে অনুভব করিতে। এই ভাবটী প্রাচীন ব্রহ্ম-উপাসকদিগের জীবনে উজ্জ্বলরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, আর তাঁহাদের অব-লম্বিত সাধনপ্রণালীও পূর্ব্বোক্ত কথার সাক্ষ্য প্রদান করে।

যখন মানব মনে গভীর ও ওজস্বী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারে না। স্বার্থপরতার শৃঙ্খল বা সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরে আর তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, ভাবের আবিল অথবা প্ররোচনার সৌন্দর্য্যে আর সে মুগ্ধ হয় না, তাহার আত্মার গভীর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা তা-হাকে ব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে নানা বিঘ্ন ও বিপদ আছে। মনুষ্য স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-জি-জ্ঞাসুদিগের ত কথাই নাই। ধর্ম্ম-জিজ্ঞা-সার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই ভাব ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসাকে অধিক-তর তেজস্বীও প্রখর করিয়া জিজ্ঞাসুকে নিরন্তর ব্রহ্ম-সদ্ভাবের দিকে যাইবার জন্য কঠোর রূপে তাড়না করত জিজ্ঞাসাকে পরিপুষ্টও সতেজ করিয়া থাকে। এইরূপ সতেজ জিজ্ঞাসাপূর্ণ ও ভাবানুবিদ্ধ আত্মা—ব্রহ্ম লাভের অধিকারী।

আমার হৃদয় শূন্য, এই শূন্যতা পূর্ণ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতেই প্রকৃতি আমার প্রিয় দেবতা। প্রকৃতির মধ্যে নানা শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শন ক-রিয়া হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতাম। ক্রমে দিন চলিয়া গেল, শৈ-শব যৌবনে লীন হইল, যৌবন প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হইল; আমি এখন প্রৌঢ়, এই অবস্থায়ও আমার হৃদয় শূন্য! এই শূন্যতা পূর্ণ করিতে আবার প্রকৃতির আশ্রয় লইলাম। প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্য হইতে এক বিচিত্রতা আসিয়া আমার মনকে বিদ্ধ করিল। ঈশ্বর-পিপাসা আমার প্রাণে প্রবল হইল। আর কিছুই ভাল লাগে না। আমি ধা-র্ম্মিক নই, আমি প্রেমিক নই, আমি ভক্ত নই, এই বলিয়া আমার বন্ধু বান্ধবেরা আমাকে ভৎর্সনা করিতেন। আমি বন্ধু বান্ধবদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া আমার বাল্য-সখী প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্র-মণ করিতে লাগিলাম। অনেকদিন পর প্রকৃতিও আমাকে ভৎর্সনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদিন রজনীতে চন্দ্রালোকে নদীতটে ভ্রমণ করিতেছিলাম, চন্দ্রালোক যেন আমাকে বলিয়া উঠিল, তুই অবি-শ্বাসী, তুই আমার স্রষ্টিকর্ত্তাকে বিশ্বাস করিস্ না, আমার আলোকে ভ্রমণ করি-বার তোর অধিকার নাই। তারপর হইতে সুমিষ্ট ফল যখন রসনাতে প্রদান করিতাম,

তখন ফলও বলিত, তুই অবিশ্বাসী, তুই আমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিশ্বাস করিস্ না, তোর এই রস গ্রহণে অধিকার নাই। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া আলোকে বাহির হইতাম, সূর্য্যালোক বলিত, তুই অবিশ্বাসী, তুই আমার আলোকে উদ্ভাসিত এই বসুন্ধরাকে দেখিবার অনধিকারী, তুই নিমীলিত নেত্রে অন্ধকার দেখ্। নিশাতে বিশ্রাম করিতে যাইতাম, নিদ্রা আসিয়া বলিত, তুই অবিশ্বাসী, তোর সেবা আমি করিব না। পিপাসার সময় জল পান করিতে যাইতাম, জল বলিত, রে অবিশ্বাসী! তুই কোন্ লজ্জায় আমাকে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আসিয়াছিস্? ক্ষুধার সময় আকুল প্রাণে আহারীয় গ্রহণ করিতে যাইতাম, আহারীয় বস্তু বলিত, তুই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিস্ না, কোন্ লজ্জায় তাঁহার প্রদত্ত আহারীয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিস্? পুষ্প সন্দর্শনে আমি মোহিত হইতাম, এক দিবস নানা ক্লেশ ও যন্ত্রণাতে অধীর হইয়া আকুল হৃদয়ে পুষ্পোদ্যানে গমন করিলাম, পুষ্প আমাকে দেখিয়া ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিল, রে অবিশ্বাসী! তোর কি অধিকার আছে আমার প্রভুকে বিশ্বাস না করিয়া আমাকে গ্রহণ করিস্? দূর হ! সকলেই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, পশু পক্ষীও সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে; বসুন্ধরা সর্ব্বংসহা, সে সকলেরই ভার সহ্য করিতে পারে এবং চিরকাল সহ্য করিয়া আসিতেছে। কত অত্যাচার, কত আঘাত, কত প্রপীড়ন এই বসুন্ধরা সহ্য করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, ভীষণ বজ্রাঘাত, কত যুদ্ধ বিগ্রহেতেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, আজ সেও আমাকে পরমাণুরূপ অগণ্য মুখে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিতেছে, রে অবিশ্বাসী! তুই আর আমার অঙ্গে পাদনিক্ষেপ করিতে পারিবি না, দূর হ! আমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিশ্বাস না করিলে, তাঁর ভার হৃদয়ে বহন না করিলে আমি আর তোর ভার বহন করিব না, দূর হ! এমন কি আমার শরীর, আমার মন, আমার প্রাণ পর্য্যন্তও প্রকৃতির কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া আমাকে ভৎ‍র্সনা করিতে আরম্ভ করিল। আমি আর কোথাও সান্ত্বনা পাইলাম না। তাহাতে আমার প্রাণ শূন্য, সেই প্রাণের মধ্যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রধূমিত। মনে করিলাম ঋষিদিগের আশ্রয় শীতল হিমালয়ে যাই। অবিলম্বেই হিমালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মানুষ তত দিনই লোকালয় ভালবাসে, যত দিন লোকালয়স্থ বন্ধু বান্ধবদিগের সহানুভূতি পায়, আদর যত্ন ও প্রশংসা পায়। যখন লোকালয়ে সহানুভূতি নাই, আদরের পরিবর্ত্তে ঘৃণা, যত্নের পরিবর্ত্তে নিন্দা, প্রশংসার পরিবর্ত্তে নির্য্যাতন ও সহানুভূতির পরিবর্ত্তে গ্লানি করিয়া মানুষ মানুষকে ত্যক্ত বিরক্ত করে, তখন সে নির্জ্জনে যায়, প্রকৃতির ক্রোড়ে ভ্রমণ করিয়া আরাম অন্বেষণ করে। যখন প্রকৃতিতেও আরাম পায় না, প্রকৃতিও উপেক্ষা করিয়া আরামের আশা হইতে বঞ্চিত করে, তখন সে আপনার মধ্যেই আপনি থাকিতে ভাল বাসে। কিন্তু আপনার মধ্যেও যদি কোন প্রকার আরামের ছায়া, সুখের রেখা বা আশার আলোক না দেখে, তখন সে প্রকৃতরূপে নিরাশ্রয় হইয়া আপনাকে অসহায় মনে করিয়া অতি দীন ও মলিন ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এই অবস্থাই দীনতার অবস্থা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অবস্থা। যখন বন্ধু বান্ধবেরা আমাকে অভক্ত অপ্রেমিক

ও অধার্ম্মিক বলিয়া ভৎ‍র্সনা করিতেন, তখন আমি বড় বিরক্ত হইতাম, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়া যাইতাম। জনস্থান ভাল লাগিত না, অরণ্যে বনে উদ্যানে প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। যখন দেখিলাম প্রকৃতিও আমাকে ভৎ‍র্সনা করিতেছে, পৃথিবী আমাকে স্থান দিতে চায় না, নিরন্তর ভৎ‍র্সনা করে, তখন আরামের আশায় আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায়ও আরাম পাইলাম না। তখন বন্ধুদিগের কথা আমার মনে পড়িল। দেখিলাম বন্ধুরা যথার্থই বলিয়াছিলেন। আমি অপদার্থ, আমি অসার, প্রেম ভক্তি বিশ্বাসের ত কথাই নাই। এই সময়ে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া সেই আশ্রয়কে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এখন পর্ব্বত আমার বাসস্থান।

বৈরাগ্য ও সংসার।

কেবল বৈরাগ্য, সংসারকে বর্জ্জন—ধর্ম্ম নহে। বৈরাগ্য অভাবাত্মক সাধন। ধর্ম্ম কেবল না মূলক নহে—ধর্ম্ম হাঁমূলক ভাবাত্মক (Positive) বিষয় বিরাগ মানবাত্মার চরমোন্নতি নহে, সেই সঙ্গে ঈশ্বরানুরাগ প্রবর্দ্ধিত হওয়া চাই। সংসারের অনিত্যতা ও পাপ তাপের হৃদয়ভেদী যাতনা অনুভব করিয়া অনেক সময় আমাদের সংসারের প্রতি আন্তরিক বিরাগ উপস্থিত হয়। এবং কুটিল সংসারের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেই আত্মার শান্তি হইবে এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু এ অবস্থায় ঈশ্বরপ্রেম অপেক্ষা সংসারের ক্লেশময় প্রকৃতিই আমাদের আত্মাকে অধিকতর অধিকার করিয়া থাকে। ইহা বিরক্তি। বৈরাগ্য নহে।

ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাঁহারও প্রাণে বিষয়বিরাগ উপস্থিত হয়। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি সংসারের ধন জনের এবং মান সম্ভ্রমের প্রতি আর দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, লোকলজ্জা কি লোকানুরাগ স্পৃহাও তাঁহার থাকে না, পার্থিব আমোদ প্রমোদ তাঁহার প্রাণকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, তিনি আত্মার অন্তরতম প্রদেশে প্রেমময় পিতার জলন্ত আবির্ভাব সর্ব্বদা অনুভব করেন, এবং সেই অমৃতানন্দ উপভোগ করিয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করেন। সংসারের প্রতি তাঁহার আর চাহিবার অবকাশ থাকে না। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য, নচেৎ বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য উচ্চ ধর্ম্ম জীবনের চিহ্ন নহে। ঈশ্বর এরূপ অনায়াসলভ্য পদার্থ নহেন যে স্ত্রী পুত্রের সুখ দুঃখে সহানুভূতি শূন্য হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে অবিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই ধার্ম্মিক হইত। পরমেশ্বরে যাঁহার গভীর বিশ্বাস অটল অনুরাগ ও অবিচলিত নিষ্ঠা, বিষয়কোলাহল সংসারের সংকীর্ণতা তাঁহার যে বিষবৎ বোধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ প্রকার ঈশ্বরপ্রেমিক সাধু সংসারে অবস্থিত হইয়াও যথার্থতঃ ব্রহ্মলোকে বাস করেন। তাঁহার শরীর পৃথিবীর ধূলিতে, কিন্তু আত্মা সততই ব্রহ্মে নিমগ্ন। ইহাঁর পক্ষে সংসার ও অরণ্য উভয়ই সমান। সংসার ও সন্ন্যাস কিছুই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য নহে—তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ঈশ্বরসহবাস লাভ করা। এই ঈশ্বরসহবাসের আনন্দে তিনি এমনি বিভোর হইয়া থাকেন যে কোন প্রকার

প্রলোভন কি বিপদ ও যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার প্রাণ এমন এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত যে অতি গুরু দুঃখেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। "যস্মিন্ স্থিতোন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সকল প্রিয়তর বস্তু হইতে প্রিয়তম জানিয়া তিনি তাঁহাতেই জীবন সমর্পণ করেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিলে যদি পুত্র পরিবার ত্যাগ করিতে হয়, সংসারে অতিহীন ভাবে বাস করিতে হয়, তাহাতে তিনি কিছু মাত্র দুঃখিত হয়েন না। তাঁহার আত্মার নির্ম্মল আনন্দ ও শান্তি সংসার কিছুতেই হরণ করিতে পারে না। "সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা," তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি বিনীত ও শান্ত। সকল মানবের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আপনার মতবিরুদ্ধ কথা শুনিলে তিনি শত্রুর ন্যায় কাহাকেও আক্রমণ করেন না। কাহারও প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়া, কাহারও নিন্দা ঘোষণা করিয়া তাঁহার আনন্দ বোধ হয় না, তিনি আপনার হৃদয়ের সদ্ভাবে সকলকে আকৃষ্ট করেন। তাঁহার প্রাণে এমন এক বিশ্বব্যাপী প্রেম আছে, যাহাতে তিনি মানবসংসারকে আপনার জ্ঞান করিয়া জগতের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টান্বিত হন। এরূপ লোক নির্জ্জনে স্বার্থপরের ন্যায় আলস্যে দিন কাটান না, জীবনের জলন্ত ধর্ম্মশক্তিতে সংসারের পাপ তাপ দূর করেন।

ঈশ্বরপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনই ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরের প্রীতি যাঁহার হৃদ্গত প্রীতি হইয়াছে, তিনি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি যখন আমাদের হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর উপস্থিত হয়, যখন মানসপটে তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাব আমরা অবলোকন করি, তখন সৃষ্টির প্রত্যেক কার্য্যেই আমরা তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিয়া অতুল আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যাই। এই নির্ভর ও আনন্দের অবস্থায় সংসারের প্রতি আর আত্মার কিছুমাত্র আসক্তি থাকে না। প্রাণ বিষয়াকর্ষণ ছিন্ন করিয়া, মোহমায়া কাটাইয়া নিরন্তর পরমেশ্বরের সহবাসে বাস করিতে ইচ্ছা করে। ইহাই প্রকৃত সংসারবৈরাগ্যের অবস্থা। এই বৈরাগ্যে ও ভগবৎপ্রেমে প্রাণ মন পূর্ণ না হইলে, সংসারের সুখাসক্তি ও যশোলালসার শান্তি না হইলে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, ধর্ম্মনীতির সংস্কার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার নিবারণ, মানবকুলের মঙ্গলজনক সৎকার্য্য, যাহা কিছু আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য মনে করি, কিছুই সম্পন্ন করা যায় না। যাঁহার প্রাণ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতাতে, রিপুর অত্যাচারে, বাহ্য সভ্যতার স্রোতে ঘূর্ণমান, তাঁহার পক্ষে স্বার্থ ভুলিয়া ঈশ্বরের নামে পরার্থে জীবন বিসর্জ্জন করা অসার কল্পনা মাত্র, তাঁহার পক্ষে কোন উচ্চতর বিষয়ের চিন্তা করাও একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

প্রেমাস্পদের প্রিয় কার্য্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জনই প্রীতির লক্ষণ। ঈশ্বরকে পিতা বলিলেই মানবকে ভ্রাতা বলিতে হয়, এবং

ভাই বলিলেই ভাইয়ের প্রতি কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কর্ত্তব্য বোধে নিজের সুখ দুঃখ স্বার্থ গণনা না করিয়া সংসারের সেবাকরা আমরা তাঁহার প্রিয়-কার্য্য মনে করি। প্রিয়কার্য্য ভিন্ন প্রীতির কোন মূল্য নাই। পরমেশ্বর আমাদিগকে কার্য্যসাধনোপযোগী ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবল দান করিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি আত্মাকে অজেয় ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। তিনি আমাদের ক্ষুদ্র আত্মাতে এমন এক শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, যাহার বলে আমরা সমুদায় বাধাবিঘ্ন বিপত্তি বিষাদ অতিক্রম করিয়া তাঁহার ধর্ম্মনিয়মকে জয়যুক্ত করিতে পারি। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়মনের সমুদায় শক্তিকে যথোপযুক্ত রূপে কার্য্যে নিয়োগ করাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম এক কঠোর পরীক্ষা, জীবন-ব্যাপী আধ্যাত্মিক সংগ্রাম।

হে মানব! চিরকালের আশ্রয়দাতা প্রেমময় পিতাকে যদি সংসারে দেখিতে চাও, তবে সরল ব্যাকুল ও প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে দেখ, সর্ব্বত্রই দেবাদিদেবের মহিমা ও কৃপা জীবন্তভাবে দেখিতে পাইবে। সেই করুণাময় মঙ্গলময় প্রাণের প্রিয়তম পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে সংসার নরক, পাপের আলয়, আর তাঁহাকে প্রাণে রাখিয়া তাঁহার প্রেরিত শুভবুদ্ধি অনুসারে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেই সংসার স্বর্গের সোপান। "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" তিনি এই লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার কৃপা ভোগ করিবার সময় তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। স্ত্রী পুত্র পরিবারে বেষ্টিত হইয়া পবিত্রান্তঃকরণে প্রতিদিন দয়াময়ের চরণ প্রান্তে বসিয়া তাঁহার আরাধনা কর, শোকসন্তাপ দূরীভূত হইবে, বিমলানন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে, সংসারেই স্বর্গের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবে, সংসারই তোমার ব্রহ্মলোক হইবে।

বেদান্তমত।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

রূপাদি সংস্কার কি আশ্রয় করিয়া থাকে? ইহা কামাদির ন্যায় সমান-আশ্রয়। কামাদিই বা কোথায় থাকে? কাম সংকল্প ও সংশয় বুদ্ধিতেই থাকে। এই বুদ্ধিতেই রূপাদি সংস্কার থাকে। আত্মা অসঙ্গ ও অবিকারী। ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি যা কিছু সমস্তই ক্ষেত্রের—বিষয়েরই ধর্ম্ম; অশুদ্ধি-সম্বন্ধ মাত্রই বুদ্ধিস্থ কখন আত্মস্থ হয় না। অতএব বৎস! রূপাদি সংস্কার প্রভৃতি অশুদ্ধি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলিয়া তুমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।

এখন শিষ্য যদি জিজ্ঞাসা করে, ভগবন্! বাস্তবিকই এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই ইহাই যদি ঠিক হয় তবে সাধ্য সাধন ও সাধক এই তিনটির গতি কি। দেখা যাইতেছে লোকে অর্থাদির নিমিত্ত যুদ্ধ বিগ্রহাদির আশ্রয় লইয়া থাকে, স্বর্গাদি সুখের নিমিত্ত যাগ যজ্ঞাদি উপায় সকল অবলম্বন করিয়া থাকে। লোকে এইরূপ কত শত সাধ্য সাধনাদি ব্যবহার চলিতেছে যদি এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই তবে এই যে ত্রিক—সাধ্য সাধন ও সাধক—যাহা আবহমান কাল শত শত বাদির বিবাদের বিষয় হইয়া আছে এবং শ্রুতি স্মৃতি ও লোকে যাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ ইহার গতি কি হইবে।

শিষ্যের এই বাক্যে আচার্য্য কহিবেন, বৎস, এই যা কিছু দৃষ্ট ও শ্রুত হইতেছে

ইহা অবিদ্যাকৃত। বস্তুত এক আত্মা ব্যতীত অপর কোন কিছুই নাই। দৃষ্টি-দোষে যেমন এক চন্দ্র বহুরূপে দৃষ্ট হয় সেইরূপ অবিদ্যা দৃষ্টিতে এই একমাত্র আত্মা অনেকবৎ অবভাসিত হইয়া থাকেন। বাস্তব পক্ষে দ্বৈত কেবল অবিদ্যাকৃত। এক ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই। বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থাতে এই অদ্বৈত প্রতিপত্তি হয়। আর অবিদ্যার অবস্থাতে যখন দ্বৈত—দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন এই অবান্তর ভেদের প্রতীতি হয় তখন দ্রষ্টা চক্ষু দ্বারা দৃশ্য দেখে। ফলত যাহা ভেদ দৃষ্টিতে পাওয়া যায় তাহা পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা মরণশীল। যাহা মরণশীল তাহা সৎ—সত্য নহে। অসতের আবার সত্তা কি? ফলত দ্বৈত একটা কথা মাত্র। বেদে এই ভেদদৃষ্টির বহুতর নিন্দাবাদ আছে।

এস্থলে শিষ্য যদি কহে, ভগবন্, যদি দ্বৈত মিথ্যা হইল তবে বেদের কর্ম্মকাণ্ড অপ্রমাণ, কারণ তাহাতে সাধ্য সাধনাদির ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর জ্ঞানকাণ্ডও অপ্রমাণ, কারণ তাহাতে উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা আছে। দ্বৈত মিথ্যা হইলে সেই উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয়—আশ্রয় আর কি থাকে। সুতরাং আপনার বাক্যে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই আর প্রামাণ্য থাকিল না।

এই আপত্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত গুরু কহিবেন, বৎস, শুন, অবিদ্যার অবস্থায় বেদের সার্থকতা আছে। জীবের স্বভাব অনাদি অবিদ্যায় আবৃত। সে শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে আত্মভাব আরোপ করিয়া আছে এবং আপনাকে এতৎসংক্রান্ত সমস্ত ইষ্টানিষ্টভাগী বুঝিয়া আছে। তাহার পুরুষার্থ অনাত্ম-বিষয়-সংসৃষ্ট। সেই পুরুষার্থ লাভের জন্য সে যত্নবান, তাহার উপায়ান্বেষণে সে বিব্রত। আত্ম-তত্ত্ব যে সাক্ষাৎ পুরুষার্থ ইহা বুঝিবার শক্তি আদৌ তাহার নাই। এরূপ স্থলে শাস্ত্র তাহার কি সাহায্য করে বলি শুন। যাগযজ্ঞ যে স্বর্গাদি সুখসাধন যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা অজ্ঞাত ছিল শাস্ত্র উহাকে তন্মাত্র বুঝাইয়া দেয় এবং বিধি নিষেধ পালনে তৎপর করিয়া তুলে। পরে বিধির অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ পরিহার দ্বারা ক্রমশ যখন আত্মশুদ্ধি হইয়া উঠে, যখন পাপ আর আশ্রয় না পায়, এই অশুচি দুঃখরূপ সংসার ভোগ কেবল কাম্য কর্ম্ম দ্বারাই হইয়া থাকে এই বুঝিয়া যখন কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, অত্যাবশ্যক ব্রহ্মারাধনাতে যখন বলবতী নিষ্ঠা হয়, এবং অন্তঃকরণ অতিমাত্র পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া উঠে, সেই সময় তাহার সূক্ষ্ম বস্তুতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি জন্মে। তখন পরম পুরষার্থসাধন আত্মতত্ত্ব যাহা এত দিন তাহার অজ্ঞাত ছিল শাস্ত্র উক্তরূপ প্রণালী দ্বারা তাহাই বুঝাইয়া দেয়। ফলত জ্ঞানের উদ্বোধন দ্বারা জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি করিবার জন্যই শাস্ত্র। কিন্তু এরূপ বুঝিও না যে শাস্ত্র সাধ্য সাধনাদির একটা ভেদ বিধান করিয়া দিতেছে। এই সংসার অনিষ্টরূপ। অজ্ঞাতার্থের অববোধন দ্বারা এই সংসার-নিবৃত্তিতেই তাহার তাৎপর্য্য, কদাচ ভেদের বাস্তবতা বোধনে নহে। সুতরাং তুমি কর্ম্মকাণ্ড অপ্রমাণ বলিও না। আর তুমি দ্বৈত মিথ্যা হইলে উৎপত্তিও প্রলয় নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে এই যে একটি আপত্তি তুলিয়াছ তদ্বিষয়েও বক্তব্য আছে শুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধ্য সাধনাদি ভেদ-দৃষ্টি অবিদ্যাকৃত। অবিদ্যাই হইল সংসারের মূল। উৎপত্তি ও প্রলয়ের একত্বে—অদ্বৈতে যুক্তি

প্রদর্শন দ্বারা সেই অবিদ্যাকে নাশ করিবার জন্য বেদে সৃষ্ট্যাদি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন এক আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই তখন আর উৎপত্তি ও প্রলয়ের অধিকার কোথায়? যা কিছু দেখিতেছ সমস্তই অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত। অবিদ্যার নাশে ইহারও নাশ। এক আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই এই অদ্বৈত জ্ঞানে উৎপত্তি ও প্রলয়ের নাম গন্ধও আসিতে পারে না। দ্বৈত প্রতিপত্তি অবিদ্যানিষ্ঠ। সংসারমূল সেই অবিদ্যা নিরাসের জন্য সৃষ্টি প্রলয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। সৃষ্টি প্রলয়ের অবতারণা করিয়া বলা হইয়াছে এই যা কিছু দেখিতেছ ইহা অবিদ্যার ঘোর, বাস্তব কিছুই নয়। সুতরাং বৎস এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্ত্বে তুমি জ্ঞানকাণ্ডকেও অপ্রমাণ বলিতে পার না। শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায় দ্বারা এই অবিদ্যা উন্মূলিত হইলে অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে একমাত্র প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ ও পরমার্থদর্শী তাহার পক্ষে সাধ্য সাধন ও উৎপত্তি প্রলয় প্রভৃতি বিশেষ বুদ্ধি আর জন্মাইতে পারে না। এ স্থলে কর্ম্মকাণ্ড যে এরূপ লোকের পক্ষে অপ্রমাণ ইঙ্গিতে ইহাও বুঝিবে। যিনি পরমার্থ দর্শন লাভের ইচ্ছুক তিনি বর্ণাশ্রমাদি অভিমানকৃত পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদি লোকৈষণাতে নিস্পৃহ হইবেন। অভেদবুদ্ধিই সম্যক জ্ঞান। যিনি তল্লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি তদ্বিরুদ্ধ অভিমানের আস্পদ যা কিছু তৎ সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। আত্মা অসংসারী এই বুদ্ধি শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা উৎপন্ন হইলে তদ্বিপরীত বুদ্ধি কদাচ জন্মিতে পারে না। অগ্নিতে শীতত্ব বুদ্ধি হয় না। শরীরে অজরামরণ বুদ্ধি হয় না। অতএব বৎস যাগ যজ্ঞাদি ও তৎসাধন যজ্ঞোপবীতাদি অবিদ্যারই কার্য্য। যিনি পরমার্থদর্শী হইবেন এই সমস্ত তাঁহার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

চিন্তা কণিকা।

(১)

কোন মানুষই যে নাস্তিক নহে তাহার প্রমাণ এই যে সকলেই জগতে আপনা অপেক্ষা একটী অধিকতর ও মহত্তর অদৃশ্য ক্ষমতাশালী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। হিন্দু অহিন্দুকে নাস্তিক বলিয়া থাকে, খ্রীষ্টীয়ান অখ্রীষ্টীয়ানকে নাস্তিক বলিয়া থাকে, মুসলমান অমুসলমানকে নাস্তিক বলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক সেই ব্যক্তি যে এক অদৃশ্য মহত্তর ক্ষমতাশালী শক্তিতে বিশ্বাস না করে। এই বিশ্বাস ঈশ্বরজ্ঞানের অঙ্কুর, সেই জন্য ঈশ্বরের সুন্দর নিয়মানুসারে মানুষের হৃদয় হইতে ঐ বিশ্বাস টুকু বিচ্ছেদ্য নহে।

(২)

ঈশ্বরকে আমরা অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি ইহা বুঝিবার জন্য ইহাই বুঝা আবশ্যক যে ঈশ্বর সকল বস্তুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। আমাদিগের অস্তিত্বের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সকলই ঈশ্বরকৃত, সুতরাং তাঁহার অবলম্বন ভিন্ন আমাদের স্থিতির সম্ভাবনা কোথায়?

(৩)

বিবেক বৃত্তি সংসারের ধূলিতে বড় শীঘ্র অপরিষ্কার হইয়া যায়। প্রতিক্ষণে উহাতে ধূলি পড়িবার সম্ভাবনা। সর্ব্বদা যদি আমরা উহা পরিষ্কার রাখিবার জন্য যত্নবান না থাকি তাহা হইলে উহা ধূলি

রাশিতে আবৃত হইয়া অদৃশ্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

(৪)

আমাদের প্রত্যেক কার্য্য বিবেকানুযায়ী হয় কি না, ইহা যদি আমরা বিচার করিয়া না দেখি, তাহা হইলে বিবেকের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

(৫)

বিবেক বৃত্তিকে কিছুকাল এইরূপে সযত্নে রক্ষা করিলে, আমরা ক্রমে বিবেক-বিরোধী কার্য্য করিতে একবারে অক্ষম হই।

(৬)

অসহ্য কষ্ট ও অসহ্য যন্ত্রণা মানুষকে কখন সহ্য করিতে হয় না। যাহার পক্ষে যতটা শারীরিক বা মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণা অসহ্য তাহা হইবার পূর্ব্বেই সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। এই নিয়মে ঈশ্বরের দয়া কেমন সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।

(৭)

যে ব্যক্তি পাপ ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সে স্বীয় আত্মাতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। স্বর্গের উপযুক্ত হইলে দেখা যায় যে এই খানেই স্বর্গ।

(৮)

মানব জীবন কিরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য তাহা যেমন আমরা মাতৃগর্ভে বাসকালে কিছুই ধারণা করিতে পারি না, তেমনি ইহ জীবনে আমরা আমাদিগের পারলৌকিক জীবনের ঐশ্বর্য্যের কল্পনা করিতে কিছুমাত্র সক্ষম হই না।

(৯)

যিনি পবিত্র হইবার জন্য পবিত্র হইতে সমুৎসুক হয়েন, তিনিই পবিত্র হইতে পারেন। যিনি অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য পবিত্রতা লাভে ইচ্ছুক হয়েন তিনি সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হয়েন না।

(১০)

যাঁহারা মানব জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতাই একমাত্র সার ধন। যাঁহার ঐ অভিজ্ঞতা হইয়াছে তিনি অন্য সকল বস্তু তুচ্ছ করিয়া ঐ সার ধন লাভে লালায়িত হয়েন।

(১১)

আমাদের অনেক পাপ কার্য্যের ফল আমরা ইহজীবনেই ভোগ করিয়া থাকি। কোন্ পাপের জন্য কোন্ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা যদি আমরা বুঝিয়া দেখি তাহা হইলে পাপ হইতে বিরতির জন্য আমাদের চেষ্টা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্য পাপফল-জ্ঞান আবশ্যক।

(১২)

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার অর্থ অনেকে আত্ম-নির্ভরের বিপরীত মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যতটুকু আমাদিগের শক্তি ও ক্ষমতা তাহার সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে কিন্তু তাহার অতীত যাহা তজ্জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। যাঁহারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া আত্মপ্রভাবকে বিনাশ করেন তাঁহারা বিপথে গমন করিয়া থাকেন।

(১৩)

যে মধুরতা তিক্ততায় পরিণত হইবে জানিতেছ, তাহার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইও না।

(১৪)

অন্যের দোষ ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু

নিজের দোষ ক্ষমা করা কুত্রাপি কর্ত্তব্য নহে।

(১৫)

যদি তোমার রাজত্ব করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তোমার রিপুগণের উপর রাজত্ব কর, সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে শাসন কর।

রায় রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাধ্য সাধন বিষয়ে কথোপকথন।

ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাস প্রণীত চৈতন্য মঙ্গলও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত অতি সুন্দর গ্রন্থ। রূপ রস লীলা এই তিন গ্রন্থের প্রধান বর্ণিত বিষয়। চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য লীলা, চৈতন্য মঙ্গলে রূপ এবং চৈতন্য চরিতামৃত রস অর্থাৎ প্রেমভক্তির গূঢ়তত্ত্ব ও চৈতন্যের ধর্ম্মজীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় বাহুল্যরূপে লিখিত হইয়াছে। আমরা "চৈতন্য চরিতামৃত" অবলম্বন করিয়া রামানন্দের সহিত চৈতন্যের সাধ্যসাধন বিষযে কথোপকথন বিবৃত করিতেছি।

শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া চৈতন্য নীলাচলে বাস করিতেছিলেন, একদিন বলিলেন আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশে এবং তীর্থ ভ্রমণে দাক্ষিণাত্যে গমন করিব। অতঃপর তিনি শিষ্যদিগকে প্রবোধিত করিয়া দক্ষিণদেশ গমন করিতে উদ্যত হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, গোদাবরী নদী তীরে মহাজ্ঞানী ও ভক্ত রামানন্দ আছেন, তিনি শূদ্র ও বিষয়ী লোক, তাঁহার বৈষয়িক বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিও না।

"তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিহোঁ বিদ্যা নগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে অপেক্ষা করিবে।
আমার বচনে তাঁর অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহোঁ একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহের তিহোঁ সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা॥"

রামানন্দ তৎপ্রদেশের একজন ধনাঢ্য, পণ্ডিত এবং প্রধান ভক্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জীবনে গভীর জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি একাধারে মিলিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্যের মুখে রামানন্দের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চৈতন্য আনন্দিত হইলেন; এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া গোদাবরীতটে উপস্থিত হইলেন। নদীতে স্নান করিয়া নির্জ্জনে নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, বাদ্যধ্বনি ও লোকসমারোহ সহকারে দোলারোহণে রামানন্দ আসিতেছেন। রামানন্দ যুবা সন্ন্যাসীর প্রদীপ্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়া ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সন্ন্যাসী নিমাইকে প্রণাম করিলেন। দর্শনমাত্রে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন। তথাপি চৈতন্য বলিলেন,—

"তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিহোঁ কহে হঙ মুঞি দাস শূদ্র মন্দ॥"

রামানন্দের বিনয় মধুর বচন শ্রবণ করিয়া চৈতন্য প্রেমভরে রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের অশ্রু পুলক কম্প ও ভক্তি গদগদ ভাব দর্শন করিয়া নদীতীরস্থ ব্রাহ্মণেরা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, অগ্নির ন্যায় এই সন্ন্যাসীর তেজ, শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া এ

কেন ক্রন্দন করিতেছে? এবং মহারাজ মহাপণ্ডিত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক, ইনিই বা সন্ন্যাসীর স্পর্শে অস্থির হইয়া পড়িলেন কেন? ব্রাহ্মণেরা ইহাঁদের আন্তরিক ভক্তিভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আপনাদের সংস্কার অনুরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রামানন্দ ও চৈতন্য পরস্পরের প্রশংসা করিয়া বিদায় হইলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীচৈতন্য এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বিনীত দীনবেশে রামানন্দ আসিয়া মিলিত হইলেন। এই সময় রামানন্দের সহিত চৈতন্যের ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অতি উচ্চ উচ্চ কথা হয়। চৈতন্য বলিলেন, হে রামানন্দ! ভক্তি প্রেম এবং সাধন বিষয়ে কিছু বল, আমি শ্রবণ করি।

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণু ভক্তি হয়।"

রামানন্দ কহিলেন, বিষ্ণুভক্তিই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট ব্যক্তিই পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, বিষ্ণুপ্রীতির অন্য পথ নাই। চৈতন্য বলিলেন, ইহা বাহিরের কথা, আরও আগে বল।

"প্রভু কহে এই বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্যসার॥"

রামানন্দ বলিলেন, ঈশ্বরে সমুদায় সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥"

"হে অর্জ্জুন! তুমি যা কিছু অনুষ্ঠান কর এবং যা কিছু আহার, হোম, দান এবং তপস্যা করিয়া থাক, তৎসমুদায় ঈশ্বরেতে অর্পণ কর।"

চৈতন্য বলিলেন, ইহাও বাহিরের কথা, আরও শ্রেষ্ঠ সাধন বল।

রামানন্দ। শাস্ত্রবিহিত সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি সাধন করাই সার। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন,

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি বিহিত ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব।

চৈতন্য। ইহাও বাহ্য, আরও আগে বল।

রামানন্দ। জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। গীতাতে কথিত হইয়াছে,

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥"

সর্ব্বভূতে যাহার সমজ্ঞান এবং যে স্পৃহাশূন্য ও অনুশোচনাশূন্য সেই প্রসন্নাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই ঈশ্বরেতে পরাভক্তি লাভ করেন।

চৈতন্য। ইহাও বাহ্য, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন বল।

রামানন্দ। তবে জ্ঞানশূন্য ভক্তিই উত্তম। ভাগবতে আছে,

"জ্ঞানচর্চ্চা না করিয়া যাহারা কেবল তোমার গুণ কীর্ত্তনে রত থাকে তাহারা ত্রিলোক বিজয়ী হয়।" স্বধর্ম্মাচরণ, স্বধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ইত্যাদি সমুদায় সাধন বাহিরের কথা, চৈতন্যের ভক্তিময় প্রাণ তাহাতে শান্ত হইল না। শুষ্ক জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিগুণ কীর্ত্তনের কথা শুনিবা মাত্র বলিলেন,

"প্রভু কহে, এই হয় আগে কহ আর।"

ইহাও হয়, কিন্তু আরও উচ্চ সাধনবল।*

* চৈতন্য নিজে মহাজ্ঞানী ছিলেন. জ্ঞানের অ-

রামানন্দ বলিলেন, প্রেমভক্তি উত্তম সাধন।

"রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার।"

ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে আহার পানে যেমন আনন্দ হয় না, সেইরূপ হৃদয়ে প্রেমভক্তি না থাকিলে নানা উপচারে পূজা করিলেও হৃদয় সুখ-বিদ্রুত হয় না। "ভক্তিরসভাবিতা মতি" অর্থাৎ ভক্তি রস-সিক্ত চিত্ত যদি কোথাও পাও ক্রয় কর, একমাত্র লালসাই তাহার মূল্য। কোটি জন্মের সুকৃতির দ্বারাও তাহা পাওয়া যায় না। শ্রবণ করিয়া চৈতন্য বলিলেন, ইহাও হয়, আরও উপরের সাধন বল। রায় বলিলেন, দাস্য প্রেম উত্তম। শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষের প্রতি দুর্ব্বসার উক্তি. এই, যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রেতে জীব নির্ম্মল পবিত্র হয়, তাঁহার দাসদিগের আর কি অবশেষ থাকে? চৈতন্য বলিলেন, আর একটু আগে বল। তবে সখ্য প্রেম সাধনার সার। ইহাও উত্তম, আর একটু উচ্চ সাধন বল। বাৎসল্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ। ইহাও উত্তম, আরও একটু আগে বল। রায় কহিলেন, কান্তভাব সাধনার সার।

"রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্যসার।"

ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় অনেক, যার পক্ষে যে উপায় উপযুক্ত তার পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রস অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য রসের গুণ কান্তভাব মাধুর্য্য রসে মিলিত হইয়াছে। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতের গুণ যেমন পরস্পর মিলনের দ্বারা মৃত্তিকাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচগুণ ক্ষিতিতে একাধারে মিলিত হইয়াছে, সেইপ্রকার শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চারি রস কান্তভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহা মাধুর্য্য রস নামে অভিহিত হইয়াছে। সতী যেমন প্রাণপতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, মানব হৃদয় যখন সেই প্রকার একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের ভজনা করে, তখন তার জীবন সার্থক হয়। এইভাবের উপাসনাকেই বৈষ্ণবগণ মাধুর্য্যভাব বলিয়াছেন।

"কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম্য॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্য মাধুর্য্যাধিক্য বাড়ে সর্ব্বরসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হইতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

চৈতন্য বলিলেন, হে রামানন্দ! ইহা শ্রেষ্ঠ সাধন নিশ্চয় বুঝিলাম, যদি ইহা হইতে উচ্চ সাধন থাকে, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বল। রায় বলিলেন, ইহা অপেক্ষা উচ্চ সাধন জানিতে ইচ্ছা করে, এপ্রকার লোক পৃথিবীতে আছে জানিতাম না।

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥"

ভাবে সাধকের কি দুর্গতি হয়, তিনি নিজে তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিমার্গ অনুসরণ করাতে তাঁহার নিজের ক্ষতি না হইলেও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের বিশেষ অপকার হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে জ্ঞানালোচনার তত আদর দেখা যায় না। জ্ঞানভক্তির সামঞ্জস্যই পূর্ণধর্ম্ম। নির্ম্মল জ্ঞানের অবস্থাই মুক্তির অবস্থা। জ্ঞানশূন্য অন্ধভক্তিতে যে ধর্ম্মজীবনে নানা বিকৃতি ঘটিয়া অনর্থ উপস্থিত হয়, আমাদের দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহার প্রমাণস্থল। এমন কি চৈতন্যের জীবনেও ধর্ম্মোন্মত্ততা উপস্থিত না হইয়াছিল এমন নহে।

রায় বলিলেন, মহাভাব প্রেমলীলা সাধনার চরম। ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ সাধন নাই। চৈতন্য বলিলেন, তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃত স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমি যে নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল, আরও কিছু বল আমি শুনি। রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ কি, এবং কাহাকে কোন্ রস কোন্ প্রেম বলে, এই সব তত্ত্ব তুমি বিস্তারিত রূপে বল আমি শুনিয়া সুখী হই।

"প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
... ...
প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব তত্ত্ব বস্তু হইল মোর জ্ঞানে॥
এবে জানিল সেব্য সাধন নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥"

রায় বলিলেন, সৎ চিৎ আনন্দ ইহাই কৃষ্ণের স্বরূপ। তিনি সকল কারণের মূল কারণ, অনাদি পুরুষ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, এবং সর্ব্বরসস্বরূপ।

"সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব রসপূর্ণ॥
.. ..
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ॥"

সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপশক্তিও তিন প্রকার। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

যে শক্তিতে ভক্তচিত্তে আনন্দবিধান করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনীর নাম প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব, এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ।

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেইশক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

এই মহাভাবময়ী রাধিকার প্রতি ভগবানের স্নেহ সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায়। এই ভগবৎ স্নেহরূপ সুগন্ধি দ্রব্যের সুঘ্রাণ রাধিকার অঙ্গের উজ্জ্বল বর্ণ। এই সুগন্ধিপূর্ণ উজ্জ্বল-দেহ ভগবৎকৃপারূপ অমৃতরসে স্নাত হয়, পরে হরির লাবণ্যামৃত রস তদুপরি বর্ষিত হয়। এই প্রকারে মহাভাবরূপা রাধিকা সচ্চিদানন্দময় রূপ রসে যখন অভিষিক্ত হইল, অর্থাৎ পরস্পরের দর্শনে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইলে লজ্জা আসিয়া মহাভাবকে আচ্ছাদিত করিল, এই লজ্জাই রাধিকার পট্টবসন। সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম চন্দনাদি প্রণয়, স্মিতকান্তি অঙ্গের বিলেপন, হরিপ্রেমরস মৃগমদ, প্রচ্ছন্ন মান ধম্মিল্ল, প্রণয়মান বক্ষ আচ্ছাদিনী কঞ্চুলিকা। অনুরাগ অধরের তাম্বুলরাগ, হর্ষ পুলকাদি সাত্বিক ও সঞ্চারী গুণ সকল দেহের ভূষণ। এই ভাবভূষণে ভূষিতা, গুণশ্রেণিরূপ পুষ্পমালা ও সৌভাগ্যরূপ তিলক ধারিণী প্রেমের সার মহাভাবরূপা রাধিকা হরিলীলার অনুকূল মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ অঙ্গের সৌরভালয়ে গর্ব্বের পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা হরিসঙ্গ লাভ চিন্তাতে মগ্ন আছেন। প্রাণনাথের নাম গুণ যশ মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনই তাঁহার কার্য্য। তিনি বিশুদ্ধ প্রেম রত্নাকর হৃদয়েশ্বরকে প্রেমরূপ সোমরস পান করাইয়া তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করেন।

"মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
... ...
লাবণ্যামৃত রাধার তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টসাটি পরিধান॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥
... ...
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
... ...
গুণ শ্রেণি পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্র রত্ন হৃদয় তরল॥
... ...
কৃষ্ণ লীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড।

রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ ও প্রেমরসাদির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য বলিলেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব অবগত হইলাম, এখন ইঁহাদের বিলাস মহত্ত্ব বর্ণনা কর। রামানন্দের বাক্যাবসানে চৈতন্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রভু কহে এই হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে এই বই বুদ্ধি নাই আর॥
যেবা প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥"

রায় বলিলেন, আরত আমার বুদ্ধি নাই, আর যে এক প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত আছে তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার সুখ হয় কিনা বলিতে পারি না। এই বলিয়া রামানন্দ প্রেমভক্তিরসপূর্ণ স্বরচিত এক গান করিতে লাগিলেন, গানের ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া চৈতন্য স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, সাধ্য বস্তু সমুদায়ত জানিলাম, সাধন বিনা ইহা লাভ হয় না, লাভ করিবার উপায় বলিয়া দাও। রামানন্দ বলিলেন, সখীভাবই সাধনার সার। সখীভাব ভিন্ন আর কোন উপায়েই ইহা লাভ হয় না। সখীভাব চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, সখীগণের প্রেম নিঃস্বার্থ, সখীগণ রাধিকাকে কৃষ্ণসঙ্গ করাইয়া সন্তুষ্ট হয়। অর্থাৎ মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ প্রেমাধার হৃদয়কে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সহবাস করিতে দিয়া আপনারা পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমে পরিপুষ্ট হয়। ঈশ্বরপ্রেম কল্পলতা সদৃশ, দয়া শ্রদ্ধা অনুরাগাদি মনোবৃত্তি সকল পল্লব পুষ্পলতা স্বরূপ। লতার মূলে জলসিঞ্চন করিলে যেমন পুষ্পপত্র প্রফুল্লিত হয়, সেই প্রকার প্রাণ যখন বিশুদ্ধ প্রেমযোগে প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরে মিলিত হয়, তখন বুদ্ধি জ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সকল অধ্যাত্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই প্রকারে নিস্পৃহ স্বার্থশূন্য হইয়া স্বাভাবিক অনুরাগ ভরে ভাবরসে মগ্ন হইয়া যে পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহার মনোবৃত্তি সকল ধর্ম্মের অনুকূল হয়, সমুদায় ইন্দ্রিয় মধুময় ও পবিত্র হইয়া যায়। পবিত্র স্বরূপ ভগবানের সংস্পর্শে মনোবৃত্তি সকল পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমে পরমাত্মাতে রমণ করে। ইহাই সখী-

ভাবের তাৎপর্য্য। যাহা ইন্দ্রিয়বিকার-জনক সে বিশুদ্ধভাব নহে। চৈতন্য-চরিতামৃত স্পষ্ট কহিয়াছে,

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।"

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়। আধুনিক বৈষ্ণব সমাজে এই ভাবের আর লেশমাত্র নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের এই আধ্যাত্মিক রূপকময় প্রেমসাধনার উপদেশ অর্ব্বাচীন বৈষ্ণবগণ বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণব দলে নানা প্রকার কুৎসিত ব্যাপার আনয়ন করিয়া প্রেমভক্তিপূর্ণ পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলুষিত করিয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণবের বিশ্বাস এই যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মানবীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পরদারাভিমর্ষণাদি দুষ্ক্রিয়াতে রত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রলিখিত কৃষ্ণের কীর্ত্তি সকল ভগবানের প্রকৃত লীলা মনে করিয়া কতলোকে জীবন্ত কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। রূপকভাবে কাল্পনিক গল্পের আকারে সত্য-বিশেষ প্রকাশের জন্য পুরাণের সৃষ্টি, কিন্তু পুরাণকে ইতিহাসের চক্ষে দেখিতে গিয়াই যত কুসংস্কার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক রাধাকৃষ্ণের প্রেম এমনিই প্রাকৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে সাধারণ জনগণ রূপকের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যে পৌঁছিতে না পারিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে হৃদয়স্বামী রূপে প্রেমভক্তি দ্বারায় উপাসনা করাই মাধুর্য্যভাবে উপাসনা। রাধিকা সাধক, কৃষ্ণ উপাস্য, ইহাই রাধাকৃষ্ণের মূলভাব। কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের বর্ণনা বাহুল্যে ও গোস্বামীদিগের ভ্রান্ত উপদেশে সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহা বিকৃতি ঘটিয়াছে। "চৈতন্য চরিতামৃত" বৈষ্ণব সাধারণের প্রামাণ্য গ্রন্থ, অথচ তল্লিখিত উপরোক্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতেছি না। সে সকল আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া রামানন্দ ও চৈতন্যের শাস্ত্রপ্রসঙ্গে কৃষ্ণ শব্দ ঈশ্বর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই ধরিয়া আমরা লিখিলাম। চৈতন্য মহাজ্ঞানী ছিলেন, তিনি যে গোপনন্দন বংশীধারী কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন না, রামানন্দের সহিত কথোপকথনেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। যিনি হৃদয়কে কর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের একটি শ্লোকের জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্লোকটির উৎপত্তি এইরূপ, পার্ব্বতি মহাদেবকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি অনন্তই হইলেন, তবে আবার দেবকীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইল, এ কি প্রকার? মহাদেব বলিলেন,

বসুদেব শব্দে অন্তঃকরণ। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন অপাবৃত পুরুষ অর্থাৎ যাঁহাকে কেহ আবরণ করিতে পারে না, তাঁহার প্রকাশ হয়। এইত বাসুদেবের অর্থ। কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাস, এ কথারও ব্যাখ্যা অন্য প্রকার।

গায়ত্রী-চিন্তা।

"সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণ মঙ্গল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।"

যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি মহতো মহীয়ান্, রাজাধিরাজ, সকলের প্রভু নিয়ন্তা ও অধিপতি, তাঁহার জ্ঞান শক্তি অনুধ্যান করি। পৃথিবী আকাশ ও উচ্চতর গগনে যেখানে সুদূর তারকা

নক্ষত্রাদি বিচরণ করে—সর্ব্বত্র তাঁহার জ্ঞান শক্তির জাজ্জ্বল্যতর নিদর্শন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান শক্তি করুণার কণামাত্রও কি আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি? একটী বৃক্ষ পত্রের রচনাতে যে আশ্চর্য্য কৌশল নিহিত আছে তাহার লেশও অনুধাবন করিতে গিয়া মনুষ্যের বুদ্ধি পরাস্ত হয়। উপরে অযুত অযুত অগণ্য লোক। কত সূর্য্য কত চন্দ্র কত গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু প্রচণ্ডবেগে স্ব স্ব কক্ষে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। অত্যধিক অপরিমেয় দূরে অবস্থিত বলিয়া তারকাবলীকে হীরকখণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখায়, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকে আমাদিগের সূর্য্যের ন্যায় বা তদপেক্ষা বৃহৎ। দুরবীক্ষণ সহযোগে তাহাদিগের যে সংখ্যা অনুমিত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা তাহাদিগের বাস্তবিক সংখ্যা যে কত অধিক তাহা অবধারণ করা মানব বুদ্ধির অতীত। যদি আমরা দৃশ্যমান দূরতম তারকাতে উঠিতে পারি, তাহা হইলে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া মস্তকোপরি নূতন আকাশ দেখিতে পাইব, সে আকাশে নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্রাদি অবলোকন করিব, সে আকাশের উপরে আবার উচ্চতর আকাশ, সে আকাশে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব গ্রহ নক্ষত্রাদি বিরাজমান। "জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে, কীর্ত্তিভাতি অতুল ভুবনে।" কত অযুত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৃথিবী হইতে এত অধিক দূরে অবস্থিত, যে তাহাদিগের আলোক তথা হইতে সৃষ্টিকাল হইতে বিকীর্ণমান হইয়াও এখনও পৃথিবীতে আসিয়া নিপতিত হয় নাই। ছায়া-পথ—যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হীরক চূর্ণ বা মুক্তাকলাপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়—তাহা যে কত তারার সমষ্টি তাহা কে বলিতে পারে? তবে এ ব্রহ্মাণ্ডের সীমা কোথায়? যথার্থই এক মহা কবি বলিয়াছেন যে বিরাটরূপী ভগবানের দেহের রোম বিবর সমূহরূপ গবাক্ষ দ্বার দিয়া কত অগণিত জগৎ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করে কাহার সাধ্য? জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন যেমন সমুদ্র-তীর হইতে একটীমাত্র বালুকা-কণা অন্তর্হিত হইলে সেই তীরস্থিত বালুকা-রাশির কিছুমাত্র অপচয় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায় না, সেইরূপ আমাদিগের পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহাদি সমন্বিত সসূর্য্য এই সৌর জগৎ যদি এককালে অস্তমিত হয়, তাহা হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটী সূক্ষ্ম অণু প্রমাণ অংশ মাত্রের বিলোপ হইল বলিয়া প্রতীতি হইবে। এই প্রকাণ্ডায়তন গ্রহ তারকাদি কি জীব শূন্য? অনেক কারণে উহারা জীবের আবাস-স্থল বলিয়াই অনুমিত হয়। এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান ভূচর খেচরাদি ও অণুবীক্ষণ যোগে একটী বৃক্ষ পত্র জলবিন্দু প্রভৃতি স্বল্প পরিমাণ স্থানে কত শত প্রাণী দৃষ্ট হয়, এখানে কত জীব তাহার সংখ্যা করিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়, তবে এ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব সকল গণনা বা ধারণা করা কি সম্ভব হয়? এই অগণন জীব সংখ্যা মনেতেও কল্পনা করা যায় না, বাক্যেতে প্রকাশ করিবার জন্য ভাষাতে শব্দের সংকুলান হয় না। এখানে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ একটী সূক্ষ্মতম কীটাণু পর্য্যন্ত প্রত্যেকের দেহ যন্ত্র জগদীশ্বর অত্যাশ্চর্য্য সুকৌশল সম্পন্ন যন্ত্র বিশেষের ন্যায় করিয়া সৃজন করিয়াছেন—তাহার অবস্থার উপযোগী করিয়া যতদূর উৎকৃষ্ট হইবার তাহা করিয়া আপনার নির্ম্মাণ দক্ষতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সকল জীবের অন্নপান

বিধান ও সুখ সম্পাদন জন্য কত আয়োজন করিয়াছেন, সন্তান শাবক প্রভৃতির রক্ষার জন্য জনক জননীর মনে অদ্ভুত স্নেহের সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বকালে সকলের প্রয়োজনীয় অর্থ সকল প্রদান করিতেছেন। তিনি জীবদিগকে আকস্মিক উৎপাত দ্বারা কখন কখন বিনাশ করেন বটে কিন্তু সেই বিনাশ হইতে ও আপন গূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য কি প্রকারে সংসাধন করেন তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর। এই পৃথিবীতে তাঁহার জীব সৃজন পালন প্রণালী দেখিলে অবশ্যই বোধ হয় যে তিনি অন্যান্য লোকে তত্তৎবাসী জীবগণের অনির্দ্দেশ্যরূপে কল্যাণ বিধান করিতেছেন। তাঁহার মহিমা দুরবগাহ্য, অগম্য, অপার। তাঁহার জ্ঞান প্রেম শক্তি মঙ্গল ভাবের শেষ নাই। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে যদিও কোন কালে পৃথিবীর ধূলি শিশিরকণা বা সূর্য্য চন্দ্র তারকাদির কিরণাবলীর গণনা বা পরিমাণ করাও সম্ভব হয়, তথাপি ঈশ্বরের অনন্ত গুণের পরিমাণ বা ধারণা করা কদাপি সম্ভব নহে।

যাঁহার এই মহিমা ভূলোকে ও দ্যুলোকে, প্রথমতঃ তাঁহার মহিমাময় বিরাট রূপ একবার ভাবনা করি। তিনি কোথায়? তিনি আপনার মহিমাতেই স্থিতি করিতেছেন। এই সৃষ্টিই তাঁহার বিরাট রূপ। এই সৃষ্টিতে তিনি ওতপ্রোত রূপে বর্ত্তমান। চন্দ্র তারকার জ্যোতিতে তাঁহার মঙ্গল জ্যোতি। তিনি "চন্দ্র তারকে থাকিয়া চন্দ্র তারককে নিয়মে রাখিতেছেন, চন্দ্র তারক তাঁহাকে জানে না, চন্দ্র তারক যাঁহার শরীর।" নবরাগে কুসুমিত কাননে তাঁহার প্রীতি। পুষ্প সকল বায়ুকে সুবাসিত করিয়া কেবল আমাদিগের ঘ্রাণের তৃপ্তিসাধন করে এমত নহে। ঈশ্বর যে কত অযাচিত সুখ আমাদিগকে প্রদান করেন, পুষ্প সকল তাহার সাক্ষী। মনুষ্যের শারীর জীবনের জন্য পুষ্পের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক জীবনে পুষ্পের উপযোগিতা আছে যে হেতু সে পুষ্পের সৌন্দর্য্য পান করিতে করিতে যিনি শিব সুন্দর, পুষ্পের কান্তি, তাঁহার দিকে তাহার চিত্ত ধাবিত হয়। শুধু পুষ্পেতে কেন—পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য, নদীর লহরীলীলা (উষার কমনীয়তা) সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্য, জগতের প্রত্যেক শোভাতেই আমরা তাঁহার প্রেমরূপ দেখিতে পাই। শিশুর হাস্যে নরনারীর কণ্ঠ সঙ্গীতে, পক্ষীদিগের কাকলীতে সেই প্রেমের পরিচয় পাই। তিনি সুন্দর প্রেমময়, তাই কত নরনারী পশু পক্ষী সুন্দররূপ ধারণ করিয়াছে। যে ভাবুক তাঁহার সুষমা পরিপূরিত এই সৃষ্টিকে প্রাণ ভরিয়া দেখে, সে যথা তথা তাঁর প্রেম সুন্দররূপ দেখিয়া কৃতার্থ হয়। তিনি আপনার এই সৃষ্টিতে কেমন সম্মোহনরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

ক্রমশঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত্র।

কিন্তু এমনি ঈশ্বরের দৈব ঘটনা যে তৎকালে একটা ভয়ানক ঝড় উঠিয়া সেই বিবাহের বাগানের ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদি ও খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত হইতেছিল সে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল এবং গাছের ডাল পালা ভাঙ্গিতে লাগিল ও বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইল। শিবনারায়ণ সেখান হইতে এক ক্রোশ তফাতে এক

আমের গাছের নীচে বসিয়া রহিলেন। ঝড়েতে গাছের ডাল পালা ও আম্র সেখানে অনেক পড়িয়াছিল। গ্রামের মনুষ্য-গণ আম কুড়াইবার জন্য রাত্রিতে সেই খানে আসিল। শিবনারায়ণ মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে ইহারা তো এখানে আসি-তেছে। যদ্যপি ইহারা দেখে যে আমি এখানে বসিয়া আছি ইহারা তো অবোধ, মনে করিবে ভূত বসিয়া আছে,নতুবা চোর আম কুড়াইতেছে এই বলিয়া উহারা চিৎকার করিবে। কিন্তু আমি অগ্রে বলিয়া দিই যে তোমরা ভয় করিও না আমি মনুষ্য (আদমি), এখানে বসিয়া আছি। এই ভাবিয়া শিবনারায়ণ তাহা-দিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। তৎ-কালে শিবনারায়ণের কথা তাহারা শু-নিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কেহ কেহ ভূত বলিয়া, কেহ কেহ চোর বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া গ্রামের হাজার দেড় হাজার লোক লাঠি লইয়া আসিল। মার বেটাকে মার বেটাকে ব-লিতে লাগিল। শিবনারায়ণ মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে ইহারা তো পশুতুল্য, সাধু না বলিলে বুঝিতে পারিবেনা। এই ভাবিয়া শিবনারায়ণ তাহাদিগকে বলিলেন তো-মরা ভয় করিও না আমি সাধু। এই কথা শুনিয়া তাহারা শিবনারায়ণের নিকটে আসিল। শিবনারায়ণ তাহাদিগকে উত্তম উত্তম জ্ঞান উপদেশ দ্বারা সন্তোষ করিলেন। তাহারা শিবনারায়ণকে প্র-ণাম করিয়া আম্ কুড়াইয়া বাড়ি চ-লিয়া গেল। কিন্তু একজন গৃহী গোস্বা-মীর পুত্র বয়ঃক্রম তাহার ৮। ৯ বৎসর হইবে, সেই বালক শিবনারায়ণের নিকট করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল যে মহারাজ আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন,আপ-নার আহার হইয়াছে কি না? শিবনারা-য়ণ বলিলেন আমি চৌগাই গ্রাম হইতে আসিতেছি, আমার আহার হয় নাই কিন্তু রাত্রি অনেক হইয়াছে, তুমি এখন কি করিবে? সেই বালক বলিল আপনি কৃপা করিয়া আমার বাটিতে চলুন, আমার বা-টিতে খাদ্য দ্রব্য আছে, আপনাকে আহার করাইব। যদি কিছু না থাকে তাহা হইলে দুগ্ধ আছে তাহা আপনাকে আহার করা-ইব। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি রাত্রিতে কোন গ্রামে যাই না বাবা! তুমি যাও দিবস হইলে আমি কোন খানে গিয়া আ-হার করিব, তুমি কোন চিন্তা করিও না। ঐ বালক চুপ করিয়া সেইখান হইতে চ-লিয়া গিয়া আপনার মাতাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল। মাতা তৎকালে ব্যস্ত সমস্ত হ-ইয়া কিছু দুগ্ধ ও ফল লইয়া আপনার এক কন্যাকে ও ঐ বালককে সঙ্গে লইয়া লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাটি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে যেখানে সেই সাধু বসিয়া আছেন তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং অতি যত্ন সহকারে সেই দুগ্ধ ও ফল সাধুকে আহার করাইলেন। আহার করাইয়া সেই বাল-কের মাতা করযোড়ে বলিলেন যে আপনি কৃপা করিয়া আমার বাটিতে চলুন, এখানে ধূলায় কাদায় শুইতে আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইবে। শিবনারায়ণ বলিলেন মাতঃ তুমি বাটিতে যাও, আমি গ্রামের মধ্যে যাইব না, আমার এই স্থান ভাল মা! তুমি কোন বিষয় চিন্তা করিও না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখ, তিনি তোমার সকল দুঃখ কষ্ট নিবারণ করি-বেন। মাতা আপনার কন্যা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাটিতে চলিয়া গেলেন। শিবনারায়ণ সেইখানে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া সকালে উঠিয়া ডুমরাওর রাজার

দ্বারের নিকট চলিয়া গেলেন। শিবনারায়ণ দ্বারেতে উপস্থিত হইলে তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা পিতা পুত্রে পাল্‌কি চড়িয়া বাগানে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। পুত্র অগ্রে বাহির হইয়া গেলেন। রাজা পশ্চাতে থাকিলেন। তখন শিবনারায়ণ রাজাকে বলিলেন যে হে মহারাজ গম্ভীর ভাবে আমার একটি কথা শ্রবণ করুন? তৎকালে রাজা সিপাহিদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে অবোধ কাঙ্গালিদিগকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিতে পার না। তৎকালে সিপহী হুকুম শুনিয়া শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দিল। গলাধাক্কা দেওয়াতে সিপাহীর মাথার পাক্‌ড়ি মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন সেই সিপাহী পাক্‌ড়ি পড়ার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া শিবনারায়ণকে ল্যাথি কিল্ মারিতে লাগিল। রাজা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, যে আমার সিপাহী বড় উপযুক্ত কিন্তু মাথার পাক্‌ড়ি খুলিয়া পড়িয়া গেল ভাল করিয়া পাক্‌ড়ি বাঁধে না। শিবনারায়ণকে মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া বাগানে তাহারা চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে এবেচারা রাজাদিগের কোন দোষ নাই। যেমন ইহাদের ইষ্ট গুরু জড় পদার্থ পাথর কাঠ তেমনি তো ইহাদের বুদ্ধি হইবে ও তেজ হইবে। যেমন গুরু হয় তেমনি তো শিষ্যের বুদ্ধি হয়। যদ্যপি ইহাদিগের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা থাকিত তাহা হইলে জড় বুদ্ধি হইত না এবং তেজ বল শক্তি জ্ঞান হইত তাহা হইলে আমাকে চিনিতে পারিত অথবা আপনাকে চিনিতে পারিত এই জন্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে বৈমুখ হইয়া ক্ষত্রিয় নিক্ষত্রিয় হইয়াছে। ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর সারস্বত আশ্রমে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।
৫৫৮ সংখ্যা
১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

উপদেশ।

(শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৮ই পৌষ বিশেষ ব্রহ্মোপাসনাতে অভিব্যক্ত হয়।)

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নচিকেতাকে যম বলিলেন,

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি।
তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"

সকল বেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করিতেছে, যাঁহার প্রাপ্তির জন্য সকল তপস্যা, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিতেছে, সেই পরব্রহ্মের বিষয় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

মহতোমহীয়ান পরব্রহ্মই আমাদের উপাস্য। ব্রহ্মোপাসনাই এই ভারতের মুখ্য ধর্ম্ম। প্রাচীন বৈদিক কালে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীতীরে পুণ্যাশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া আর্য্য মহর্ষিরা যে ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, আমরা সেই ঋষিগণপরিসেব্য সত্য সনাতন ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেছি। ব্রহ্মোপাসনাতেই আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ। ব্রহ্মের উপাসনাতেই মানবের

মুক্তি। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।" একমাত্র তাঁহাকে জানিয়াই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তির আর পথ নাই। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের জয়ঘোষণাতেই সকল বেদ সকল শাস্ত্র পরিপূর্ণ। বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করিতেন, কিন্তু সকল পদার্থে তাঁহারা ব্রহ্মকেই দেখিতেন। উপনিষৎকালে ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিরা বিশুদ্ধজ্ঞানযোগে অবগত হইলেন একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।" সেই যিনি এই পুরুষে, সেই যিনি এই আদিত্যে তিনি এক। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ" ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। এই একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। এই ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত দুরূহ মনে করিয়া অনেকে নানা রূপ তর্ক করেন। কিন্তু "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" তর্কেতে এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হয় না। ঋষিরা বলিয়াছেন, তিনি একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা লভ্য,

"একমাত্মপ্রত্যয়সারং।"

"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"

যে সাধকেরা বলেন তিনি আছেন তদ্ভিন্ন অন্যের দ্বারা অর্থাৎ সংশয়বাদীর দ্বারা তিনি কিরূপে উপলব্ধ হইবেন। পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁহাতে আত্মনির্ভরের ভাব মানবাত্মার স্বাভাবিক।

"অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।"

যাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান আপনা হইতেই প্রস্ফুটিত হয়। ক্ষুদ্র মানব অনন্ত অপার বাক্যমনের অতীত পরমেশ্বরকে কি প্রকারে বুদ্ধির আয়ত্ত করিবে? মানুষ নিজের শক্তিতে সাধন বলে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারকামণ্ডলী যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধ্য সেই পূর্ণ পুরুষকে প্রকাশ করিবে। তিনি স্বপ্রকাশ।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্"

যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে, তাহার নিকটে পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। আমরা যদি যথার্থ ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতাম, তবে অবশ্যই এতদিন তাঁহাকে লাভ করিতে পারিতাম। ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন

"কোঽত্র প্রয়াসোঽসুরবালকা হরে রূপাসনে স্বে হৃদিচ্ছিদ্রবৎসতঃ"

হে অসুর বালকগণ! হরি সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় আপনি হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহার উপাসনাতে আর প্রয়াস কি? ভক্তের হৃদয়েই তিনি চির প্রকাশিত। আমরা যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি করি, আমাদের পাপ দুর্ব্বলতা মলিনভাব আলোচনা করি তখন মনে হয় আমার এমন কি সৌভাগ্য যে নরকের কীট হইয়া শুদ্ধমপাপবিদ্ধ পরম প্রভুকে প্রাণে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। তবে যে কখনও কখনও এই মলিন হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব

অনুভব করি সে কেবল তাঁহারই কৃপাতে। ধর্ম্মোন্নতি ধর্ম্মচেষ্টা সকলের মূলে তাঁহার করুণা। এই ঘৃণাবিদ্বেষময় কুটিল সংসারে আমরা সর্ব্বদাই বিপদগ্রস্ত মোহমায়ার তাড়নাতে নিরন্তর জ্বালাতন। তিনি ভিন্ন আর আমাদের জুড়াইবার স্থান কোথায়! সুখেও তাঁহার করুণা দুঃখেও তাঁহারই করুণা। আমরা যদি সকল সময়ে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকি তবে আর কিছুতেই আমাদের প্রাণ আনন্দ শূন্য হয় না। আমরা সংসারের সেবাতেই মগ্ন, প্রবৃত্তিসুখেই অভিভূত, যথার্থ আরাম-নিকেতন শান্তির আশ্রয়কে আমরা প্রার্থনা করি না। হে প্রভো! সংসারে আর আমার শান্তি নাই তোমা ভিন্ন বাঁচি না, দেখা দিয়া প্রাণ শীতল কর। এই প্রকার হৃদ্গত ব্যাকুলতার সহিত ডাকিলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারি। পাপচিন্তা, পাপালাপ পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ না করিলে আমরা তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকারী হই না। "অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপং" অশ্বের কৃষ্ণবর্ণ রোম সকল উৎপাটিত হইয়া অশ্ব শ্বেতকায় না হইলে একটি মাত্র কৃষ্ণ রোম থাকিলে সেই অশ্ব অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত না। একবিন্দু অপবিত্র চিন্তা-কলুষিত ভাব থাকিলে আমরা কখনই ব্রহ্মলাভের যোগ্য হইব না। "চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য" সংসারের প্রলোভনে আমরা মলিন হইয়া পড়িয়াছি, মোহমেঘে আমরা আচ্ছন্ন, রাহুমুক্ত পূর্ণকল চন্দ্রমা যেমন শুভ্র কিরণে প্রকাশ পাইতে থাকে, আমরা যখন সেইরূপ পাপরাহুর করালবদন হইতে মুক্তিলাভ করি, তখনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হই, তিনি তখন এই দীন দুঃখী সন্তানের হৃদয়-কুটির আলো করিয়া প্রকাশিত থাকেন।

"পৃথিবীর ধূলি, বৃক্ষলতার প্রাণ ও পশুপক্ষীর মন অপেক্ষা মনুষ্যের আত্মা উৎকৃষ্ট পদার্থ।" এই জন্য কি জড়জগৎ কি চেতন জগৎ সকলেরই সহিত মনুষ্যের সংগ্রাম। মানুষকে চেষ্টা করিয়া শীতাতপ ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণ দূর করিতে হয়। বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা মনুষ্যের কুটিলচক্র ভেদ করিতে হয় এবং সর্ব্বোপরি পাপ প্রলোভনের মোহ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে হয়। তরুলতা উদ্ভিদাদি প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণ ধারণ করে। জীবন ধারণের জন্য তাহাদিগকে কোন চেষ্টাই করিতে হয় না, কেবল প্রকৃতির উপরেই ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ইতর প্রাণীরা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আহারান্বেষণ করিয়া জীবিত থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পাপপুণ্য তাহাদিগকে বিচার করিতে হয় না, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব তাই মানুষের উপর গভীর দায়িত্ব। মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়, জীবজন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়, স্বজাতি মনুষ্যের তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে হয়, আপনার রিপুকুলের সঙ্গে যুদ্ধ করত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া আত্মাকে পবিত্র রাখিতে হয়। পরমেশ্বর মানবের উপর এতই গভীর দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই গুরুভার অর্পণ করিয়া তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি আমাদের "সযুজা সখা" হইয়া আমাদের আত্মাতে বাস করিতেছেন এবং জীবনের আলোক হইয়া প্রতিক্ষণে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেছেন। কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য আমাদের শোকভার-ভগ্ন ক্ষুদ্র মলিন আত্মাতে তিনিই অজেয় ধর্ম্মবল অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন। আমরা এত করুণা লাভ করিয়াও যদি তাঁহাতে

আত্ম সমর্পণ না করি তবে আমাদের ন্যায় নরাধম আর কে? পৃথিবীবাসী নগণ্য জীব হইয়া মহান পরমেশ্বরকে উপাসনা করিবার আমরা অধিকারী, তিনি আমাদিগকে এই অধিকার দিয়া শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াই আমাদের মনুষ্যত্ব, তাঁহাকে লইয়াই আমাদের দেবত্ব। আর তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেই আমরা পশু হইতেও নিকৃষ্ট হই। আসুন সকলে সেই পাপী তাপীর একমাত্র গতি, অনাথ আতুরের একমাত্র আশ্রয় করুণাময় পরম পিতার প্রেমক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করি। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে ভয় ভাবনা বিপত্তি বিঘ্ন দূর হইবে, মনপ্রাণ শান্তিসাগরে ভাসিতে থাকিবে।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।"

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

হে পরমাত্মন্! সংসার সাগরের একমাত্র কর্ণধার, এই দীন হীন বঙ্গদেশে আমাদের উদ্ধারের জন্যই তুমি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকাশ করিয়াছ। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদেই আমরা তোমাকে আত্মস্বরূপে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। আমাদের উদ্ধারের জন্য তুমি কত আয়োজনই করিয়াছ। সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ সকলি তোমার করুণা। এই ব্রহ্মপরায়ণ সাধুমণ্ডলীকে তুমিই এখানে আনয়ন করিলে, আমাদের কল্যাণের জন্য এই পবিত্র আশ্রম কানন তুমিই স্থাপিত করিয়াছ। হে অন্তর্যামী দেবতা! আমাদের প্রাণ তবু তোমাকে চায় না। আমাদের হৃদয়মন সবই তুমি দেখিতেছ। পুণ্য প্রেম কত যত্নে সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে, অবোধ বালকের ন্যায় সংসার খেলাতে আমরা সব হারাইয়াছি। তোমাকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। যে তোমার জন্য কাতর হয়, ব্যাকুল হয় সেই তোমাকে লাভ করে। হে প্রভো! আমাদের প্রাণে সেই ব্যাকুলতার সঞ্চার কর। বিষয় গরলপানে আমরা হতচেতন আমাদিগকে সচেতন কর। যাহারা তোমার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত তাহারাই ধন্য। তোমার নিকট আমরা আর কি প্রার্থনা করিব, "আবিরাবীর্ম্মএধি" হে স্বপ্রকাশ! আমাদের মলিন হৃদয়ে তুমি প্রকাশিত থাক। হে আনন্দস্বরূপ! তোমার নামে তোমার গানে তোমার ধ্যানে কতই আনন্দ! এই পবিত্র কাননে কলকণ্ঠ বিহঙ্গেরা আনন্দ ভরে সঙ্গীত নিনাদে তোমারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। সর্ব্বত্রই তোমার মহিমা। আমাদের হৃদয়ে সেই ভাব দাও যেন অন্তরে বাহিরে তোমাকে উপলব্ধি করিয়া সংসার তাপের শান্তি হয়। আর কতকাল—আর কতকাল হে দীনবন্ধু! তোমাকে ভুলিয়া এই ভাবে দিন কাটাইব। তুমিই আমাদের বলবুদ্ধি, তুমিই আমাদের সহায় সম্বল। সংসারতরঙ্গে প্রবৃত্তি তুফানে আর আমাদের কোন ভরসা নাই। হে পতিতপাবন! আমার ন্যায় তোমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত সন্তানদিগকে তোমার শান্তিপ্রদ চরণে স্থান দাও। আমরা নিরন্তর তোমার সহবাসে বিমলানন্দ উপভোগ করি। সংসার যেন আমাদিগকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন না করে, তুমি আমাদের সকলের মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

"অনাদিমত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।"

হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই

সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বলুহাটী সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১০ শক ৫ পৌষ বুধবার।

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥"

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

মনুষ্য যেমন শরীর মন আত্মা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি তাহার শরীর মন আত্মার উপযোগী সুখের বহুবিধ উপকরণ সকল সুখ-স্বরূপ ভূমা পরমেশ্বর অন্তর বাহিরে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। শারীরিক সুখ, মানসিক সুখ এবং আধ্যাত্মিক সুখ এই ত্রিবিধ সুখের অধিকারী যেমন মনুষ্য, এমন আর কেহই নহে। যে মনুষ্যের শরীর সুস্থ ও সবল হইয়া কর্ম্মক্ষম, মন বিদ্যালোকসম্পন্ন হইয়া অবিকৃত ও প্রকৃতিস্থ, আত্মা জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত ও পবিত্র হইয়া একাগ্র ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই যথার্থ সুখী। শরীর হইতে মন, মন হইতে আত্মা যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি শারীরিক সুখের উপকরণ হইতে মানসিক সুখের উপকরণ, মানসিক সুখের উপকরণ হইতে আধ্যাত্মিক সুখের উপকরণ শ্রেষ্ঠ। শরীর মন আত্মা পরস্পরের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুখের উপকরণ সকলের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধ সুখের উপকরণ সকলের মধ্যে কোনও উপকরণই মনুষ্যের পরিত্যাজ্য নহে। যদিও শারীরিক ও মানসিক সুখের উপকরণ সকল পার্থিব বস্তু, যদিও তৎসমুদয় উপকরণ অস্থায়ী ও ক্ষুদ্র, যদিও তাহাদের সঙ্গে কেবল ইহ জীবনেরই সম্বন্ধ, তত্রাচ মানব আত্মা যতদিন শরীরপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিবে, ততদিন সেই সমস্ত উপকরণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহার কোনও প্রকার সুখ লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। শরীর রক্ষার জন্য শারীরিক সুখের উপকরণ, মনোবৃত্তিগণকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য মানসিক সুখের উপকরণ, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক সুখের উপকরণ নিতান্ত প্রয়োজন। এই শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে, মনোবৃত্তি সকলের সঙ্গে এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সঙ্গে সমুদয় বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উপকরণের সংযোগ ব্যতীত মনুষ্য কোনও প্রকার সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের এই যোগাকর্ষণ শক্তি অতীব বিচিত্র। এই যোগাকর্ষণ শক্তি দ্বারা মানব প্রকৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে বাহ্য উপকরণের অধিকতর যোগাকর্ষণ, কোনও কোনও মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকলের সঙ্গে তত্তৎবৃত্তির উপকরণের অধিকতর যোগাকর্ষণ, কোনও কোনও মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সঙ্গে আত্মা এবং পরমাত্মার অধিকতর যোগাকর্ষণ। এই যোগাকর্ষণ শক্তির মূলে মনুষ্যের সুখ-দুঃখ উভয়ই নিহিত রহিয়াছে। একদিকে মনুষ্যের শরীরস্থিত প্রবল ইন্দ্রিয়গণ, আর একদিকে ইন্দ্রিয় সুখের উপকরণ সকল, মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তি। একদিকে তেজস্বী মনোবৃত্তি সকল, আর একদিকে মনোবৃত্তি সকলের সুখের বহুল উপকরণ, মধ্যে যোগাকর্ষণ-শক্তি।

একদিকে শরীর মনের অধিপতি জ্ঞানধর্ম্ম সমন্বিত আত্মা, আর একদিকে আত্মার অধিপতি সর্ব্ব শক্তিমান পরমাত্মা, মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তি। এই ত্রিবিধ যোগাকর্ষণ-শক্তি দ্বারা মনুষ্য সুখের জন্য নিয়তই ভ্রাম্যমান হইতেছে সত্যবটে কিন্তু সেই যোগাকর্ষণ-শক্তির সাম্যভাব রক্ষা করিতে না পারিলে মনুষ্য প্রকৃত সুখলাভ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। এইজন্য ভ্রান্ত মনুষ্য সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকেই আলিঙ্গন করিতে যায়। এই যোগাকর্ষণ শক্তির সাম্যভাব রক্ষা করিতে হইলে বুদ্ধি ও বিবেকের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা এই যোগাকর্ষণ-শক্তি নিয়মিত হইলেই সেই মহান্ পুরুষ ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার সুখ অবাধে সম্ভোগ করা যায়। রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সংযোগ হইয়া যখন শারীরিক সুখ বিধান করে, কাম্য বস্তু সকল মনোবৃত্তিগণের সঙ্গে সংযোগ হইয়া যখন মনস্কামনা সকল সিদ্ধ করে, জ্ঞেয় বিষয়ীভূত পদার্থ সকল জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ হইয়া এবং কর্ত্তব্য কার্য্য সকল ন্যায় সত্য দয়া প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ হইয়া যখন আধ্যাত্মিক সুখ প্রদান করে, তখন বুদ্ধি ও বিবেকের কর্ত্তৃত্ব যদি প্রকাশ করা না হয়, তবে উল্লিখিত ত্রিবিধ সুখ ভোগের মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া শরীর মন আত্মাকে কোনও রূপেই প্রকৃতিস্থ ও পবিত্র রাখিতে পারা যায় না। এইজন্য সূক্ষ্মবুদ্ধি ধীর ব্যক্তিরা এই যোগাকর্ষণ-শক্তির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা শরীরকে মনের অধীন, মনকে আত্মার অধীন, আত্মাকে পরমাত্মার অধীন রাখিয়া সুখ হইতে উচ্চতর সুখের প্রতি, ঐহিক ক্ষুদ্র-সুখ হইতে শাশ্বত স্বর্গীয় সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। এই জন্য সেই মহান পুরুষ ঈশ্বরকে সুখ-স্বরূপ জানিয়া তাঁহাকেই অনুসন্ধান করেন।

বর্ত্তমান কালে যে একদল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই যোগাকর্ষণ-শক্তির সাম্যভাব নাই বলিয়া তাঁহারা আধ্যাত্মিক সুখভোগে বঞ্চিত। ইন্দ্রিয়গণের ও মনোবৃত্তি সকলের সঙ্গে সুখের উপকরণের সংযোগ যেমন তাঁহারা স্বীকার করেন, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সেরূপ সংযোগ স্বীকার না করায় তাঁহারা এই অসংগত যুক্তি প্রদর্শন করেন, যে মনুষ্য পরমাত্মাকে জানিতে একেবারেই অসমর্থ; কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে ও মনোবৃত্তি সকলের সঙ্গে তাহাদের সুখের উপকরণের সংযোগ যেমন স্বাভাবিক, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগও তেমনি স্বাভাবিক। একদিকে শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ এবং মনোবৃত্তি সকল, আর একদিকে তাহাদের সুখের উপকরণ সকল, মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তি যেমন প্রবল, তেমনি একদিকে আত্মা, আর একদিকে পরমাত্মা মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তিও তদপেক্ষা অধিকতর প্রবল। ইন্দ্রিয়গণ ও মনোবৃত্তি সকল সম্বন্ধে যোগাকর্ষণ-শক্তি যেমন অপরিহার্য্য, আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে যোগাকর্ষণ-শক্তি তদপেক্ষা অধিকতর অপরিহার্য্য। ইন্দ্রিয়গণ ও মনোবৃত্তি সকল সম্বন্ধে যোগাকর্ষণ-শক্তি যেমন বুদ্ধিবলে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে নূতন নূতন শারীরিক ও মানসিক সুখের উৎপত্তি হয়, আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে যোগাকর্ষণ-শক্তি সাধন প্রভাবে যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই শাশ্বত স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক সুখভোগে আত্মা উন্নত হয়। উল্লিখিত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যে বিজ্ঞান কৌশল প্রদর্শন করিয়া আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার স্বাভাবিক যোগাকর্ষণ-শক্তি

নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতদিগের বিজ্ঞান-চক্ষে তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগাকর্ষণ-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ সাধনসম্পন্ন, উল্লিখিত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যদি সেইরূপ সাধনসম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই ভ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আধ্যাত্মিক সুখভোগে কখনই বঞ্চিত হইতেন না। শরীর মন সম্বন্ধে এই যে যোগাকর্ষণ-শক্তি, তাহা আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যস্থিত যোগাকর্ষণ-শক্তির আশ্রিত রাখিয়া কোথায় ঐ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান গৌরব রক্ষা করিবেন, না তাঁহাদের রচিত বিজ্ঞানের মূলে এই কুঠারাঘাত প্রদান করিয়াছেন, যে পরমাত্মাকে জানা একেবারেই অসাধ্য বলিয়া তাঁহার সাধন অপ্রয়োজন। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মধ্যস্থিত যোগাকর্ষণ-শক্তি যদি অপ্রয়োজন হইল তবে ইন্দ্রিয়গণের এবং মনোবৃত্তি সকলের সম্বন্ধে যোগাকর্ষণ-শক্তি কি তদপেক্ষা অধিকতর অপ্রয়োজন নয়? কেন না শরীর মন বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ সম্বন্ধীয় যোগাকর্ষণ-শক্তি ত একেবারে নষ্ট হইবে। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে যোগাকর্ষণ শক্তি তাহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই। মনুষ্য যতই সাধন সম্পন্ন হইবে, ততই তাহার উন্নতি। পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার ভোগ করিয়া মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য যদি কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়, তবে মৃত্যুর পরবর্ত্তী কাল ভিন্ন আর কোন্ কাল অবধারিত হইতে পারে? আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে স্বাভাবিক যোগাকর্ষণ-শক্তি আছে, তপস্যা প্রভাবে সেই যোগাকর্ষণ-শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া যদি চির যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়, তবে মৃত্যুর পরবর্ত্তী কাল ব্যতীত আর কোন্ কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? সত্য সকল জানিবার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে হয়, সুখ-শান্তি বিস্তারের জন্য সমুদয় নরনারীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু যে বিজ্ঞানময় পরমাত্মা পরম সত্য ধ্রুব সত্য, যিনি সুখ-শান্তির অনন্ত উৎস, যাঁহার এক বিন্দু জ্ঞান ও প্রেম পাইয়া মনুষ্য মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই পরম সত্য, সেই প্রেমাস্পদ সুখ-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ ঈশ্বরকে সর্ব্বক্ষণ আত্মস্থ করিয়া রাখিবার জন্য যদি কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়, তবে মৃত্যুর পরবর্ত্তী কাল ব্যতীত আর কোন্ কাল অবধারিত হইতে পারে? জ্ঞানধর্ম্মসমন্বিত অবিনশ্বর আত্মা পার্থিব ক্ষুদ্র সুখের অনিত্য উপকরণ সকলে কখনই প্রকৃতরূপে সুখী হইতে পারে না। অতএব মোক্ষলাভার্থী হইবার জন্য এই ত্রিবিধ যোগাকর্ষণ-শক্তির সাম্যভাব রক্ষা করিয়া সুখ অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে, যে একমাত্র পরমাত্মাই সুখ-স্বরূপ। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখ অন্বেষণ করিলে এই শরীর মন আত্মা সম্বন্ধে ত্রিবিধ যোগাকর্ষণ-শক্তির বৈষম্যভাব উপস্থিত হইয়া মনুষ্য কখনই প্রকৃতরূপে সুখী হইতে পারে না। এই জন্যই মহর্ষির উল্লিখিত জ্ঞানগর্ব্ভ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

"যিনি ভূমা, যিনি মহান, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।"

এই পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতে—এবং জ্ঞানগোচর আধ্যাত্মিক জগতে সুখের উপকরণ সকলের অভাব নাই। মঙ্গলময় সুখস্বরূপ ঈশ্বর বহুবিধ উপকরণ দ্বারা তাঁহার অসীম সুখ-ভাণ্ডার এমনি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে মনুষ্য শরীর-মন-আত্মা

দ্বারা ক্রমাগতই তাহা হইতে সুখ আহরণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে, তত্রাচ তাহা কোনও কালেই নিঃশেষিত হইবার নহে। মনুষ্যের সুখের আশা যেমন বলবতী, এমন আর কিছুই নহে। মনুষ্য সুখ লাভের প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কষ্ট ক্লেশ সহ্য করে, এমন আর কিছুতেই করে না। সেই অসীম সুখ-ভাণ্ডারে মনুষ্যের জন্য কি প্রকার সুখ সংস্থিত রহিয়াছে, তাহা যদি একবার বিজ্ঞান-চক্ষে পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে দেখিতে পাই, যে পার্থিব সুখে সে ভাণ্ডারের এক কোণ মাত্র পরিপূর্ণ। সে ভাণ্ডারের এক কোণে অর্থ ও কাম্য বস্তু সঞ্চিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম ও মোক্ষজনিত সুখ দ্বারা সেই সুখ-স্বরূপ ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, যে অসীম সুখ ভাণ্ডারের এক কোণে যে অর্থ-কাম-জনিত ক্ষুদ্র অনিত্য সুখ সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহারই প্রতি অধিক অংশ মনুষ্যের অত্যন্ত আসক্তি। ধর্ম্ম ও মোক্ষজনিত অমূল্য শাশ্বত সুখ দ্বারা যে সুখ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, যে সুখভাণ্ডার আত্ম-প্রসাদ প্রদান করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছে, যে সুখ-ভাণ্ডার অক্ষয় ব্রহ্মানন্দের আলয়, যাহা আত্মার উপজীবিকা হইয়া অনন্ত কাল তাহাকে পোষণ করিবে, তাহার প্রতি তাহাদের তাদৃশ অনুরাগ নাই। আমাদের সুমহান্ আর্য্যশাস্ত্রে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফলের বিষয় যাহা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুখ। এই চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্ত হওয়া অথবা শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগ করা একই বস্তু। যিনি সামঞ্জস্যরূপে এই ত্রিবিধ সুখ উপভোগ করিতে পারেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ সুখই মনুষ্যের নিতান্ত প্রার্থনীয়। এইরূপ সুখই সুখ-স্বরূপ ঈশ্বরের অসীম সুখভাণ্ডার হইতে হস্তগত হইয়া থাকে। যদি সৌভাগ্য ক্রমে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই সুখ উপভোগ করিতে পাই, তবে তাহাই করিব, যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা উপভোগ করিতে না পাই, তবে সুখ দাতা ঈশ্বরের নিকট তাহা নিয়তই প্রার্থনা করিব। কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইলে এবং মোক্ষার্থী হইয়া ধর্ম্মসাধন করিলে যদি এই চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য। নতুবা কামনার বশীভূত হইয়া অর্থবান্ হইতে হইলে দরিদ্রতা ও দুঃখ কখনই ঘুচিবে না। এই পৃথিবী রূপ প্রকাণ্ড নাট্যশালায় প্রতিনিয়ত যে সুখ-দুঃখের অভিনয় হইতেছে, তাহা যেমন আশ্চর্য্য এমন আর কিছুই নহে। সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর সুখ এইরূপ উপর্য্যুপরি এই নাট্যশালায় ক্রমাগতই অভিনয় হইতে দৃষ্ট হইতেছে। আজ যাঁহাকে মহা ঐশ্বর্য্যবান দেখি, কাল তিনি দরিদ্র, আজ যাঁহাকে পৃথিবীর অধীশ্বর দেখি, কাল তিনি নিরাশ্রয়, আজ যাঁহাকে সুস্থ ও সবল দেখি, কাল তিনি রোগ-শয্যায় শয়ান। আজ যাঁহাকে জীবিত দেখি, কাল তিনি শ্মশানে ভস্ম হইতেছেন। অতএব তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইয়া এই সুখ দুঃখের অত্যাশ্চর্য্য অভিনয়ের মর্ম্মভেদ কর। যাহারা কেবল অর্থ-কামের সাধন করিয়া এই সুখ দুঃখের অভিনয় দেখে, তাহারা ইহার মর্ম্মভেদ করিতে নিতান্ত অসমর্থ। কেননা যখন সুখের অভিনয় হয়, তখন তাহারা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সকলই বিস্মৃত হয়, তখন হাস্য পরিহাসের এমনি কোলাহল উত্থিত হয় যে তাহাতেই তাহারা উন্মত্ত।

যখন দুঃখের অভিনয় হয়, তখন তাহাদের মধ্যে শোক ক্রন্দনের সীমা পরিসীমা নাই। সুখের সময় তাহাদের মনে হয় যে এ সুখের দিন কখনই অবসান হইবে না। দুঃখের সময় তাহারা এমনি অধীর ও অবসন্ন হয়, যে চতুর্দ্দিক কেবলই বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখে। সুখভোগের জন্য সকল মনুষ্যই লালায়িত। দুঃখকে দূরে পরিহার করিবার নিমিত্তে তাবৎ মনুষ্যই শশব্যস্ত ; কিন্তু সুখ দুঃখের মর্ম্ম ভেদ করিয়া যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধন করিতে পারেন, এইরূপ ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্প। এই সুখ দুঃখের মর্ম্ম ভেদ করিয়া কোনও এক মহর্ষি বলিয়াছেন,

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি।"

"ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।" জীবনের পশ্চাতে যেমন ভুত কাল, তাহার সম্মুখে যেমন ভবিষ্যৎ কাল, বর্ত্তমান কাল যেমন ভুত ভবিষ্যৎ কালের মধ্যবর্ত্তী, তেমনি সুখ-সৌভাগ্য-জনিত হর্ষের অবস্থা, দুঃখ-দুর্ভাগ্য-জনিত শোকের অবস্থা, এই দুই অবস্থার অন্তর্ব্বর্ত্তী মনুষ্যের যে একটি অবস্থা আছে, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য জ্ঞানী মোক্ষার্থী ব্যক্তিরা বহু তপস্যা করেন। তাঁহারা পার্থিব সুখে উন্মত্ত হইয়া সুখ-স্বরূপ ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন না। মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হন না। তাঁহাদের শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে বটে, মন বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা পরমাত্মাতেই সংস্থিত থাকে। তাঁহাদের সুখের আশা সেই পরমাত্মার দর্শনেই পর্য্যাপ্ত হয়। তাঁহারা সুখের সময় তাঁহার প্রতি নির্ভর করেন। দুঃখের সময় সান্ত্বনা পাইয়া দুঃখকে অতিক্রম করেন। সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে অমৃতের সোপান হয়। সুখ তাঁহাদের আত্মাতে নিয়তই অমৃত বর্ষণ করে। অতএব অর্থ কামকে ধর্ম্মের অনুগত কর। শরীর মনকে রক্ষা করিবার জন্য যদি কিছু অর্থ-কামের সাধন করিতে হয়, তবে তাহা ধর্ম্মনিয়মানুসারে মোক্ষার্থী হইয়া সাধন কর। অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করিয়া শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কর, মনকে বীর্য্যবান্ কর, আত্মাকে পবিত্র করিয়া পরমাত্মার উজ্জ্বল প্রকাশ প্রতীতি কর। অর্থ কাম চরিতার্থ করা কেবল ঐহিক সুখের জন্য, ধর্ম্ম ও মোক্ষ সাধন করা উভয় ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য। পতিপ্রাণা সাধ্বী-পত্নী যখন তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী পতিকে দেবতুল্য জানিতে পারেন, তখন যেমন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক প্রেম প্রকাশ পায়, স্নেহের পুত্তলী কুলপাবন সৎ পুত্র যখন তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী পিতাকে দেবতুল্য জানিতে পারে, তখন যেমন সেই পুত্রের পিতৃভক্তি উজ্জ্বল হয়, তেমনি আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ সংস্থাপন করিলে যখন আমরা জানিতে পারি যে তিনিই আমাদের একমাত্র সুখদাতা মুক্তিদাতা, তখন তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রেম স্বভাবতই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। মনুষ্যের জন্য যদি কিছু উচ্চতর পবিত্রতর সুখ থাকে, তবে তাহাই আধ্যাত্মিক সুখ, তাহাই ধর্ম্ম ও মোক্ষজনিত সুখ, তাহাই ঈশ্বরের সহবাস-জনিত স্বর্গীয় সুখ। ধীর জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই উচ্চতর পবিত্রতর স্বর্গীয় সুখ আত্মার মধ্যেই অনুসন্ধান করেন। মানব আত্মাই প্রকৃত সুখ-ভাণ্ডার। সুখ-সিন্ধু ঈশ্বর মনু-

ষোর জন্য সুখ দূরে রাখেন নাই। তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেই সুখ-ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আত্মার মধ্যেই জ্ঞান-ধর্ম্ম-জনিত পবিত্রতর সুখ, আত্মার মধ্যেই মোক্ষ-জনিত উচ্চতর সুখ, আত্মার মধ্যেই সেই সুখ-স্বরূপ ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ নিবন্ধন তাঁহার সহবাস-জনিত স্বর্গীয় নিত্য সুখ। এসুখের ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, রূপান্তর নাই, ভাবান্তর নাই। রোগ শোক এসুখ অপহরণ করিতে পারে না, জরা মৃত্যু এসুখ বিধ্বংস করিতে পারে না। এই জন্যই মহর্ষি বলিয়াছেন

"ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।"

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে শরীর-মন-আত্মার সমষ্টি করিয়া যেমন সৃষ্টি করিয়াছ, তেমনি তাহাদের জন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের বিধান করিয়া আমাদিগকে নানা প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ। এই জন্যই ঋষিরা তোমাকে সুখ-স্বরূপ ভূমা ঈশ্বর বলিয়া গিয়াছেন, এই জন্য তাঁহারা তোমাকেই জানিবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই মহাত্মাদিগের জ্ঞান-গর্ভ রত্ন-গর্ভ উপদেশ পালন করিয়া, আমরা যেন তোমাকেই জানিতে চেষ্টা করি। তোমাকেই একমাত্র সুখদাতা মুক্তিদাতা ঈশ্বর জানিয়া তোমার প্রদত্ত সমুদয় সুখ যেন কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে উপভোগ করি। ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ করিতে করিতে যেন এলোক হইতে অবসৃত হইতে পারি। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-পূজা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু বসিয়া আছেন। প্রাণে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রধূমিত। কিন্তু সেদিকে তাঁহার তত মনোযোগ নাই। তিনি সম্মুখস্থ পর্ব্বত-শিখরে মেঘের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, আমি যদি মেঘ হইতাম, তবে ঐ মেঘের মতন আমার পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয়তম পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলিকে আলিঙ্গন করিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু আর ভাবিতে পারিলেন না। দেখিলেন, মেঘের মলিন ক্রোড় আলোকিত করিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়াই কোথায় লুকাইল। মেঘ যেন বিদ্যুতের অদর্শনে অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত গভীর ধ্বনিতে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল—হে হৃদয়-বিহারী বিদ্যুৎ! হে আঁধারের আলোক! হে মেঘের শোভা! তুমি কোথায়? ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার হৃদয়স্থ প্রধূমিত জিজ্ঞাসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিল—আমার ঈশ্বর, আমার হৃদয়ের আলোক কোথায়? জিজ্ঞাসা তাহার মুখ ফুটাইল। যে এক দিন পিতার নিকট সামান্য কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইত, সে আজ মনের আবেগে অস্থির হইয়া বলিল—ব্রহ্ম কোথায়? উত্তর আসিল—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তপস্যা অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মকে জান, ব্রহ্মজ্ঞানীরা পরম ফল প্রাপ্ত হয়। জিজ্ঞাসু চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিন্তা ঘন বিষাদের মর্ম্মভেদী চিন্তা বা বিষয়াসক্তের মলিন চিন্তা নহে। এই চিন্তা বৈজ্ঞানিকের কুটিল-তর্ক-চিন্তা বা দরিদ্রের রক্ত-শোষক অর্থ-চিন্তা নহে। এই চিন্তা উদাসীনের নিরাশময় আত্ম-চিন্তা অথবা প্রবাসীর প্রবাস-চিন্তা নহে, কিন্তু এই চিন্তা সতী স্ত্রীর স্বামীচিন্তার

ন্যায় একনিষ্ঠ, সন্তানের মাতৃচিন্তার ন্যায় অমিয়, কবির প্রকৃতিচিন্তার ন্যায় আরাম ও উত্তেজনাপূর্ণ। ঐ পর্ব্বত কন্দরের সুন্দর ও মনোহর মুখ-পানে চাহিলে না? সে অস্ফুটধ্বনিতে কি যেন বলিয়া কল কল রবে চলিয়া গেল। আমি কর্ণ পাতিয়া শুনিলাম, তাহার রব বড় মধুর, কিন্তু অর্থগ্রহ হইল না; কি করি, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া দেখি, সে বড় শীতল, আরও অগ্রসর হইলাম, যাইয়া দেখি সে বড় দয়ালু, মনে করিলাম, ইনি বুঝি সেই, স্পর্শ করিয়া দেখি নেদম্। কিন্তু বুঝিলাম, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার শক্তি এই প্রস্রবণের অনুরূপ হওয়া চাই, নতুবা এই মোহ, কাম ক্রোধাদি পাষাণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া সেই অনন্ত সত্তা-সাগরে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিব না। তবে, প্রস্রবণ দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গী হইব। হৃদয়-পর্ব্বতজাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসারূপ প্রস্রবণ বেগে মোহ ও কাম ক্রোধাদি পাষাণের সঙ্গে তোমার ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে লোষ্ট্রবৎ দূরে নিক্ষেপ করিব ও আমার নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া যাইব। ধরাধাম নিদ্রিত, আশা নাই, ভরসা নাই, এমন কি জীবনের চিহ্ন মাত্রও নাই। তরু-রাজি নিস্তব্ধ, আকাশ গম্ভীর, বায়ু স্পন্দহীন, তবে বায়ু মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িয়া সজীবতার পরিচয় দিতেছে, আর তাহার ছির শত্রু বৃক্ষ-রাজিকে সুখে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া তাহাদিগকে ভীত করিতেছে। তরু রাজিও তাচ্ছল্য ভাবে একবার মাথা উঠাইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া আবার ঘুমের ঘোরে অচেতন হইতেছে। বিহগগণ আশ্রয় তরুর বিপদাশঙ্কায় একবার ডানা নাড়িয়া উঠিল, তাহার পরক্ষণেই আবার পূর্ব্ববৎ অচেতন হইয়া পড়িল। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি এই দৃশ্য দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন আমার ব্রহ্ম কোথায়? তাঁহার জিজ্ঞাসা শেষ হইতে না হইতেই তরু-রাজি নড়িয়া উঠিল, বিহগগণ কুলায়ও তরুকোটর হইতে সুমধুর সঙ্গীতে জগৎ পুলকিত করিল, সেই আনন্দ ধ্বনিতে ফুল হাসি-মুখে গন্ধ বাহির করিল, সমীরণ সুগন্ধ লইয়া গৃহে গৃহে উপহার দিতে চলিল, মানবও চেতনা পাইয়া সজীবতার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। জিজ্ঞাসু প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। দণ্ডায়মান হইয়া দেখেন, পূর্ব্বদিকে কি উঠিতেছে। যাহার একবারমাত্র সঞ্জীবনী-নিশ্বাসে অন্ধকার পলাইল, প্রকাশ দেখা দিল, যাহার একবার মাত্র সঞ্জীবনী-নিশ্বাসে পশু পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গিল, মনুষ্য সজীবতার পরিচয় দিল, যাহার একবার মাত্র সঞ্জীবনী-নিশ্বাসে সরোবরে পদ্ম ফুটিয়া সরোবরকে হাসাইল, অরণ্যে অরণ্য ফুল ফুটিয়া অরণ্যকে শোভার ভাণ্ডার করিল, এক কথায় বলিতে গেলে বোধ হইল যে, কে যেন বিশাল অন্ধকার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া শোভার ভাণ্ডার, বিস্ময়ের আকর, চিন্তার খনি, কল্পনার প্রসূন ও প্রেমের নিদর্শন বিশ্বকে আমার চক্ষের উপর ধরিল। তবে কি সূর্য্য তুমি আমার হৃদয়ের ফুল ফুটাইতে পার? মনের আঁধার দূর করিতে পার ও শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে পার? তবে দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গী হই। এইরূপ চিন্তা করিয়া সূর্য্যকে স্পর্শ করিলাম, হৃদয় "নেদম্" বলিয়া উপেক্ষার সহিত ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কে যেন এক তুড়িতে সূর্য্যকে উঠাইয়া ধরাকে বাঁচাইল, ফুলকে হাসাইল, মানুষকে জাগাইল, আর আমাকে কাঁদাইয়া সেই দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিল। বুঝিলাম কে যেন এক তুড়িতে বলিয়া দিল, সংসার অসার পৃথিবী অসারের অসার। আরও বুঝিলাম

বিশ্বাস-সূর্য্যের উদয় না হইলে, আধ্যাত্মিক রাজ্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। প্রকৃতির শোভা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, আল্গা আল্গা। ইহার মধ্যে আমার কিছু থাকিতে পারে, থাকিলেও তাহা প্রাণস্পর্শী নয়। প্রকৃতির নিপুণতা আধ আধ ও অমিয় সুধা জড়িত, কিন্তু তাহা হইলেও আমার প্রাণারাম নহে। তবে আমি নিরুদ্দেশ হইয়াছি, আর কে যেন সেই পথে যাইবার জন্য পথে পথে তাহার নিদর্শন চিহ্ন ছড়াইয়া রাখিয়াছে। অনন্ত আকাশে তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের নিদর্শন গ্রহ নক্ষত্র আদি, প্রেম ও জীবনী শক্তির নিদর্শন চন্দ্র সূর্য্য, এই ফল ফুল পূর্ণ বসুন্ধরার কোথাও প্রেমের নিদর্শন কোথাও দয়ার নিদর্শন কোথাও জ্ঞান ও ভালবাসার নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বের নিদর্শন সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই নিদর্শন চিহ্ন গুলি এখন এমন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত যে, সহসা স্থির করা দুষ্কর। তবে প্রভুভক্ত কুক্কুর যেমন প্রভুকে হারাইলে আঘ্রাণ করিয়া প্রভু যে পথ দিয়া গিয়াছেন সেই পথ অনুসন্ধান করতঃ প্রভু যথায় আছেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয়, আমিও প্রকৃতির পথে তাঁহার বিক্ষিপ্ত নিদর্শন চিহ্ন দেখিতে দেখিতে প্রভু যথায় আছেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইব। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু দেখিলাম বুঝিলাম ও পাইলাম, তাহা আমার প্রাণস্পর্শী আত্মারাম বা অট-লাশ্রয় নহে। তবে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ ও মনের সঙ্গে পরামর্শ করি, আর হৃদয় রাজ্যে গমন করি, তথায় কিছু পাই কি না? তথায় কিছু দেখি কি না? তথায় কিছু স্পর্শ করিতে পারি কি না? আমার হৃদয় মলিন, তথায় বিশুদ্ধ প্রেমের বিকাশ নাই, পবিত্রতার সুবাস নাই, সর্ব্বদা অমা নিশা আলোকের সংস্পর্শ নাই, আনন্দের রেখা নাই, উৎসাহের উত্তেজনা নাই। আমার প্রাণ অতলস্পর্শ বিষাদ সাগরে ডুব্ ডুবু, যন্ত্রণার ছট ফটানিতে প্রাণ-রাজ্য যাতনাময়। আমার মন সুন্দর বস্তুগুলি বাছিয়া বাছিয়া ঘরে আনে, কিন্তু তাহা আমার প্রাণস্পর্শী না হইয়া দগ্ধাঙ্গারবৎ প্রাণ দগ্ধ করে। এই ত আমি, অথচ আমি ভিন্ন আমার কাছে কিছুরই সত্তা নাই, কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই আমি আছি বলিয়াই ত আমার জিজ্ঞাসা আমাকে অরণ্যের নিস্তব্ধতায়, উপবনের পুষ্পে পুষ্পে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করাইতেছে! এই আমি আছি বলিয়াই ত জিজ্ঞাসা আমাকে প্রস্রবণের রজতনিভ নির্ঝরের প্রতি জলকণাতে, হিমালয়ের চির-তুষার-মণ্ডিত উচ্চশিখরের আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয়তায় বিস্মিত করিয়াছে। এই আমি আছি বলিয়াই জিজ্ঞাসা আমাকে আকাশের অনন্ত শোভায় চির তরঙ্গায়িত শোভমান্ সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির বিচিত্র ক্রীড়ায় ও প্রান্তরের চির-স্থৈর্য্যে মুগ্ধ করিয়াছে। তবে আমি কি? ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা? না, পৃথিবীর ন্যায় তোলরস? আমি কি? তাহা আমি বুঝিলাম না। কিন্তু আমার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। সে আমাকে অনেক স্থলে লইয়া ঘুরাইল, অনেক শোভা সৌন্দর্য্য দেখাইল, অনন্ত আকাশে অনন্ত চিন্তাশীলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটাইল, কিন্তু কিছুতেই আশা মিটিল না। প্রাণস্পর্শী আরাম পাইলাম না। পৃথিবীর মূলে রস, মধ্যে মাটি, উপরে শোভা, ও জীবন-যুক্ত ফল পুষ্প বৃক্ষ লতা প্রভৃতি। পৃথিবীর মূলের রস বাদ দাও, বৃক্ষ লতা ফল শস্যাদির অস্তিত্ব লোপ হইবে, অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার পৃথিবী অনন্ত মরু হইয়া দাঁড়াইবে। আমি পৃথিবীর ন্যায় মাটি,

নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ শেম্রা বালা হইতে পাশ লইয়া অন্তর্যামির কৃপা দ্বারা নেপালে গেলেন। সেইখানে রাজধানীতে গিয়া রাজবাটির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে একজন রাজা বাটি হইতে বাহির হইলেন। রাজা শিবনারায়ণকে দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে কোন দরিদ্র এখানে দাঁড়াইয়া আছে। শিবনারায়ণ বলিলেন যে হে রাজন্ আমার একটি প্রার্থনা আছে যদি আপনি গম্ভীর ভাবে শুনেন তাহা হইলে বলিব। রাজা তখন একজন চাকরকে বলিলেন যে এই দরিদ্রকে তুই চারিটি পয়সা দিয়া তাড়াইয়া দাও, এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। শিবনারায়ণের কথা শুনিলেন না। শিবনারায়ন ভাবিয়া দেখিলেন যে সকল রাজার তো এইরূপ ভ্রান্তি হইয়াছে। এই ভাবিয়া পুনরায় সেখান হইতে পশ্চিমমুখে একদণ্ডা, শিসাগড়ি হইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে হরিদ্বারে গিয়া পৌঁছিলেন এবং জলামুখি হইয়া জম্বু রাজ্যেতে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন যে রাজা সেখানে নাই, কাশ্মীরে গিয়াছেন। শিবনারায়ণ শুনিয়া অমনি পাহাড়ে পাহাড়ে চলিয়া মটনগ্রাম হইয়া কাশ্মীর রাজ্যে গেলেন। যাইয়া রাজার বাটিতে যেস্থানে কাঙ্গালি এবং সাধুদিগকে অম্বর নাথে যাইবার জন্য খরচা দেয় সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ছোট দেওয়ান সাধুদিগকে অম্বরনাথে যাইবার খরচা দিয়া বিদায় করিতে ছিলেন। যখন দেওয়ান সাধুদিগকে বিদায় করিয়া অবসর পাইলেন তখন শিবনারায়ণ দেওয়ানকে বলিলেন যে, হে দেওয়ানজি মহাশয়, আপনি রাজার সহিত কি একবার অল্প সময়ের জন্য দেখা করাইয়া দিতে পারিবেন? দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তোমাকে দেখা করাইয়া দিব। তুমি কে, সাধু সন্ন্যাসী না পণ্ডিত যে তোমার সহিত দেখা করাইয়া দিব। যদাপি তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইতে তাহা হইলে তোমার গেরুয়া কাপড় কিম্বা রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত, তোমার তো কোন লক্ষণ নাই। যদ্যপি তুমি পণ্ডিত হও, কোন শাস্ত্র পড়িয়া থাক তো কোন শাস্ত্রের দুই একটা শ্লোক বল তাহা হইলে রাজার সহিত দেখা করাইয়া দিব। সংস্কৃত না পড়িলে কি রাজার সহিত দেখা হইতে পারে। যদ্যপি কিছু শাস্ত্র না পড়িয়া থাক তাহা হইলে রাজার সহিত দেখা হইবে না। তোমার মতন অনেক দরিদ্র কাঙ্গালি সাধু আসিতেছে যাইতেছে। যদ্যপি অম্বরনাথ তীর্থ দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে যেরূপ সাধুদিগকে বিদায় করিয়াছি সেইরূপে তোমাকেও দুই টাকা ও চাউল ডাউল দিয়া বিদায় করিব। যদ্যপি না লও তো এখানে রাজার সহিত দেখা হইবে না। শিবনারায়ণ বলিলেন যে,হে দেওয়ানজি আমি সাধু কি আর কেহ, বিদ্যা পড়িয়াছি অথবা না, এখন পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? রাজার কাছে আমার দেখা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু কেবল সৃষ্টিচরাচরের কষ্ট জানাইতে এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে সৎউপদেশ দিবার ইচ্ছা ছিল। যদ্যপি রাজা ও পণ্ডিতগণ আমার সহিত না দেখা করেন তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন হানি বা লাভ নাই, তাঁহাদেরই হানি লাভ। দেওয়ান বলিলেন যে তুমি এখন যাও, দুই চারি দিবস পরে তুমি কোন সময় আসিও আমি দেখা করাইয়া দিব। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি দুই চারি দিবস থাকিব না, শীঘ্র চলিয়া যাইব। তাহা শুনিয়া দেওয়ান বলিলেন যে, চলিয়া যাবে যাও তোমার খুসি। শিবনারায়ণ সেখান হইতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগি-

লেন যে অম্বরনাথে ইহারা যায়। যাইয়া কি দর্শন করে। অম্বরনাথ নাম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের। তাঁহার কখন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ আছেন। সেই অম্বরনাথ জ্যোতিঃস্বরূপকে দর্শন করিলে জীব অমর হয়, মৃত্যু ভয় থাকে না। আপনি সদা আনন্দরূপ থাকে। সেই সার অম্বরনাথ তীর্থ। তাঁহাকেই দর্শন করা জীবের সার্থক। শিবনারায়ণ এই রূপ ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, যখন এই সকল সাধু এবং গৃহস্থ অম্বরনাথ দর্শন করিতে যাইতেছে, আমিও যখন এখানে আসিয়াছি, উহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি উহারা কি দর্শন করে ও কি অবস্থা ঘটে। এবং ইহাও পরব্রহ্ম মাতা পিতার লীলা, দেখিয়া যাওয়া চাই। সকলে যখন চলিল শিবনারায়ণও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। মটন গ্রামে আসিয়া যাত্রীরা বাসা করিয়া সেইখান হইতে ছয় সাত দিনের জন্য খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইল এবং সকলে অম্বরনাথের রাস্তা ধরিয়া চলিল। যেখানে রাত্রি হইত সেইখানে বিশ্রামের জন্য জঙ্গলের মধ্যে আড্ডা করিত। পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে দর্শন করাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং অগ্রে যাইয়া স্থানে স্থানে জলের ঝরনার নিকট একটা কুণ্ড খুলিয়া পুষ্প দিয়া সাজাইয়া রাখিত এবং যাত্রিদিগকে বলিত যে এই কুণ্ডে যে ব্যক্তি আড়াই আনা হইতে পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দিবেন তাঁহার ফলের কোন সীমা নাই। তাহার কৈলাস বৈকুণ্ঠ শীঘ্র প্রাপ্তি হইবে। এইরূপ অনেক অনেক স্থানে পাণ্ডারা করিত। যাত্রিদিগকে পশু বানাইয়া পাণ্ডারা পয়সা উপায় করিত। এবং একস্থানে পাহাড়ে যাইয়া পাণ্ডারা একটা প্রস্তর তুলিয়া অন্য একটী প্রস্তরের উপর চাপাইয়া বলিত যে, যে ব্যক্তি এইরূপ প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রস্তর খণ্ড তুলিয়া এই-স্থানে ইহাতে পয়সা টাকা দিবে তাহার কৈলাস বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে। এমন দানের ফল আর কোন স্থানে নাই। এই ফলের কথা শুনিয়া গৃহস্থ এবং সাধু যাত্রীরা দুই আড়াই হাজার মনুষ্য পাথরের উপর পাথর তুলিয়া এবং টাকা পয়সা দিয়া যাহার যেরূপ শক্তি পাণ্ডাদিগকে সেইরূপ দান করিতে লাগিল। দান করিয়া সেখান হইতে অগ্রসর হইল। পাণ্ডারা মনে মনে এই বলিয়া খুসি হইল যে যাত্রিদিগকে বেশ পশু পাইয়াছি। কাশ্মীর হইতে দুই চারি জন ইংরাজ ঘোড়া চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। যাত্রিরা গিয়া কি দেখে ইংরাজদের ইহাই দেখিবার ইচ্ছা। অম্বরনাথে কতকগুলি মুসলমানও যাত্রিদের সঙ্গে ছিল। তাহারা দেখিয়া দেখিয়া হাসিত ও পরস্পর বলাবলি করিত যে হিন্দুর ন্যায় অবোধ আর কোন দেশেতে নাই। কেন না পাণ্ডারা ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া ঠকাইয়া টাকা পয়সা লইতেছে। ইহারা বুঝিতেছে না, ইহারা সরল লোক, ইহাদের ছল কপট নাই। পরে যাত্রিরা এক পাহাড়ের উপর আসিল। সে স্থানে একটা পুষ্করিণীর ন্যায় একটু স্থান আছে। সেইখানে চারিদিকে পাহাড়, মধ্যে জল। জঙ্গলেতে ঢোঁড়া চেমনা সাপ অনেক থাকে। পড়িয়া থাকিতেও দুই একটা দেখা যায়। ঐ পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে বলে যে এখানে শিব আছেন। ঐ দেখ মাথা বাহির করিয়া আছেন। শীঘ্র টাকা পয়সা এখানে দিয়া দর্শন কর। এখানকার তুল্য ফল কোন খানে নাই। সাপ যেখানে মাথা বাহির করিয়া আছে সেই খানে দেখাইয়া দেয়। শিব সাপের রূপ ধরিয়া মাথা তুলিয়া আছেন, শীঘ্র দর্শন কর, নতুবা জলে মাথা ডুবাইয়া লইবেন। সাধু গৃহস্থ যাত্রিরা তৎ-কালে সেই কথা শুনিয়া সাপ দেখিয়া

আমার মূলে রস আছে, তাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ফলফুল ও শস্যেতে আমার ও অপরাপর জিজ্ঞাসুর হৃদয়ের বাহ্যিক অবয়ব শোভাপূর্ণ। তাহার জন্যই জ্ঞানী গম্ভীর, প্রেমিক উন্নত, যোগী শান্ত, আর ভক্ত বিনীত। তাহার জন্যই বিশ্বাসী স্থির ও নিরাপদ, অনুরাগী কর্ম্মঠ, পিপাসু ব্যতিব্যস্ত। সে যাহা হউক, এখন বুঝিলাম, আমি মাটি, ছাই আর ভস্ম। মৃত্তিকার সোহাগ রস, ছাই আর ভস্মের সোহাগ ঈশ্বর, সেই রস-স্বরূপ তৃপ্তি হেতু। আমি অসত্যের মধ্যে ডুবিয়া আছি, সেই সোহাগ পাই কি করিয়া? আমি মৃত্যুর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি, অমৃতের দ্বারে যাইবার উপায় কি? আমি ঘোর অমারজনীর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছি, আলোক রাজ্যের সন্ধান কে বলিয়া দেয়? যাঁহার স্পর্শের জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, কে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে? আর কেহ না, আর কেহ না!

"অসতোমা সদ্গময়
তমসোমা জ্যোতির্গময়।"

অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলাম। আশা হইল, পাইব, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া হৃদয় শীতল হইল।

ধর্ম্ম জগৎ প্রহেলিকাময় স্থান। কিসেতে যে কি হয়, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। সাধন ভজন, জপ তপস্যা, ইহা দ্বারা আত্মার নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাও এই প্রহেলিকার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারে না। একমাত্র সরল প্রার্থনাই এই প্রহেলিকার দ্বার উদ্ঘাটন করিবার প্রকৃষ্ট যন্ত্র। সরল প্রার্থনার অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করেন। কিন্তু আমি এই জানি আমার শক্তিতে যখন কুলায় না, অথচ তাঁহাকে না পাইলে দিনপাত হওয়া দুঃসাধ্য, সুখের মুখ দেখা অসম্ভব, জীবন মৃত্যুতে পরিণত, তখন প্রাণ হইতে যে আত্মনিবেদন বাহির হয়, তাহার নামই প্রার্থনা।

যাহা কিছু দেখিবার ছিল, দেখিলাম, আশা মিটিল না। যাঁহা স্পর্শ করিয়া সুখ পাইবার আশা ছিল, তাহা গ্রহণ করিলাম, স্পর্শ করিলাম, আত্ম-স্পর্শী হইল না। জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মের যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিলাম, লক্ষণ আমাকে লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতে কৃপণতা করিল। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, চিন্তা ঠাঁই না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর আপনার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকূপ হইতে উঠিয়া অপরের জ্ঞানসাগরের উপরে ভাসিতে লাগিলাম। তথায় যাইয়া দেখি, যে পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিয়াছিলাম, তাহা একটী পূর্ণ অভঙ্গ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কবিতা। এ কবিতার মধ্যে মহাকবির জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গলভাবের জীবন্ত স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত। ক্ষুদ্র পরমাণু সুবৃহৎ সূর্য্যের জন্য বদ্ধ রহিয়াছে। রস পৃথিবীর জন্য, পৃথিবী রসের জন্য। উদ্ভিদ, রসও পৃথিবীর জন্য, পৃথিবীও রস উদ্ভিদের জন্য। পরস্পর ইহারা সকলেই পরস্পরের জন্য। ক্ষুদ্র মহতের জন্য, মহৎ ক্ষুদ্রের জন্য। ছোট বড়র জন্য, বড় ছোটর জন্য। ইহা দেখিলাম, বুঝিলাম ও আনন্দিত হইলাম। কিন্তু সেই দেখা, সেই বোঝা ও সেই আনন্দ আমার প্রাণস্পর্শী হইল না।

প্রকৃতি জড়ময় হইলেও তাহার মধ্যে চেতনের উচ্ছ্বাস, জ্ঞানের আভা, প্রেমের জীবনী ও মঙ্গলের জীবন্ত উৎস দেখিতে.

পাওয়া যায়। এই জড়-প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান ও দর্শনাদি রচিত হইয়াছে। কত কবি জড়-প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া হাসাইয়াছেন, কাঁদাইয়াছেন ও গাম্ভীর্য্যের সাগরে ডুবাইয়াছেন। এই দৃশ্যমান জড়-প্রকৃতি মহাকবি মহান্ ঈশ্বরের কবিতার ভূমিকা মাত্র, আর এক একটী মানবাত্মা তাঁহার কবিতার এক একটী অক্ষর বিশেষ। এই অক্ষরগুলি অনন্ত উন্নতিশীল। সেই আদি কবির সঙ্গে পরিচয় করিতে হইলে, তাঁহার বিষয় কিছু জানিতে হইলে প্রথমতঃ প্রকৃতি আলোচনা করিয়া প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার অভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। আবার এই প্রকৃতি আলোচনা করিতে হইলে জ্ঞানীদিগের মস্তিষ্ক, কবিদিগের হৃদয় ও ধার্ম্মিকদিগের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক, কবিদিগের কবিতা পুস্তক ও ধার্ম্মিকদিগের রচিত ধর্ম্ম পুস্তক ও তাঁহাদের জীবনী একান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিয়া চলিলে দুইটী উপকার হইবে। প্রথমতঃ—এই জগতের মধ্যে ভগবানের আশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও মঙ্গল ভাবের সুশৃঙ্খলা দেখা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ—মানব আত্মার মধ্যে তাঁহার প্রেম, দয়া, জ্ঞান ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাদির সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগতকবির কবিতা গ্রন্থের ভূমিকা জড় জগত, মানবাত্মা এক একটী অক্ষর। ইহার এক একটী অক্ষর হইতে অনন্ত শোভার বীজ, অসীম প্রীতির উৎস, গভীর জ্ঞানের জ্যোতি উদ্গীরিত হইয়া জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেছে। লোকমণ্ডলী অসংখ্য। এই অসংখ্য অক্ষরে ভগবানের ভাষা। এই ভাষা শিক্ষা না করিতে পারিলে, ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করা বহু আয়াসসাধ্য। তবে এই পৃথিবীতে যাঁহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম ও পবিত্রতা চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পাঠে তাঁহাদের জীবনগত ও উপার্জ্জিত সত্য সমূহ আয়ত্ত করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত ভাষার দুই একটী অক্ষর বুঝিয়াই আমরা অনন্তের পথে প্রবেশ করিবার সহায়তা পাইতে পারি। চৈতন্যের প্রেমে বঙ্গদেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। চৈতন্য কি? না, ভগবানের অনন্ত ভাষার একটী অক্ষর। বুদ্ধের ত্যাগস্বীকার, ধর্ম্মানুরাগ, একনিষ্ঠা ও গভীর জ্ঞানের তেজ ও শক্তিতে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। বুদ্ধ কি? না, ভগবানের অনন্ত ভাষার একটী অক্ষর। কবিরের জ্ঞান ও প্রেম, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও তেজ, নানকের ভক্তি ও ব্যাকুলতা, মহম্মদ ও খ্রীষ্টের বিশ্বাসের বলে নিদ্রিত জগৎ জাগরিত, অচেতন জগৎ চেতনা পাইয়া জীবনের চিহ্ন দেখাইয়াছে, ইহারাও অনন্ত কবির অনন্ত ভাষার এক একটী অক্ষর মাত্র। এখন ভাবিয়া দেখ যাঁহার ভাষার একটী অক্ষরের তেজ, শক্তি ও প্রতিভাতে জগৎ কম্পিত, তিনি কত মহৎ, তিনি কত প্রতিভাসম্পন্ন; এখন ভাবিয়া দেখ, যাঁহার একটী মাত্র অক্ষরের শোভায় জগৎ আকৃষ্ট, তাঁহার কত শোভা! কত সৌন্দর্য্য!

ক্রমশঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত্র।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

শিবনারায়ণ মনে মনে এই বলিয়া ঐ স্থান হইতে নেপাল রাজ্যে চলিয়া গেলেন। নেপালে যাইতে নেপালের লোকেরা শিবনারায়ণকে বলিল যে বিনা পাশে তোমাকে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া টাকা পয়সা দান করিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, যে, হে সাপ শিব ভগবান, আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়সা দান করিতে লাগিল। দান করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়া অম্বরনাথ হইতে তিন ক্রোশ দূরে পাহাড়ের নিকটে ভৈরোঁগড্ডির নিচে যাইয়া আড্ডা করিল। সেখানে যাত্রিদিগের সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া অম্বরনাথ দর্শন করিতে যাইতে হয়। রাত্রিতে ভৈরোঁ-গড্ডি পাহাড়ে যাত্রিদিগকে উঠিতে হয়। প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্যনারায়ণ না প্রকাশ হইতে হইতে অম্বরলিঙ্গকে দর্শন করিতে হয়। নতুবা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে বরফের লিঙ্গ সূর্য্যনারায়ণের তেজেতে গলিয়া জল হইয়া যায় এই জন্য পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে প্রাতে দর্শন করায়। রাত্রিতে ভৈরোঁ-গড্ডি পাহাড়ে যাত্রিরা উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে দুই চারি জন বরফের ভিতরে ডুবিয়া গেল এবং দুই চারি জনকে মরা পাওয়া গেল। প্রাতঃকাল হইলে ভৈ-রোঁগড্ডি পাহাড়ে উঠিয়া গেল। ঐ পাহা-ড়ের উপর একটা পাথরের টুক্‌রা দাঁড় করান আছে, আন্দাজ ৪।৫ হাত হইবে। সেই পা-থরকে দেখাইয়া পাণ্ডারা বলে যে এই ভৈরোঁ-জি দাঁড়াইয়া আছেন। তোমরা ইহাঁকে দর্শন কর এবং টাকা পয়সা দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় কর। এই দানের বড় মাহাত্ম্যও ফল আছে। যাত্রিরা এই কথা শুনিয়া দান করিয়া পাহাড় হইতে চলিল। যাইবার সময় পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে দেখাইয়া দিল যে দেখ ঐ অম্বরনাথ গুহার মধ্য হইতে দুইটা কপোত (পায়রা) উড়িয়া যাইতেছে। যে পুণ্যবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি পাপী হইবে সে দর্শন করিতে পাইবে না। এই কথা শুনিয়া গৃহস্থ এবং সাধু সকল বলিতে লাগিল যে আমি দর্শন পাইয়াছি। মনে ইচ্ছা যে কেহ পাপী না বলে। আর কেহ বলিল যে উহা সাদা এবং কেহ বলিল উহা কাল। পাণ্ডারা তখন যাত্রি-দিগকে বলিল যে দর্শন করাইবার পয়সা দাও। যাত্রিরা দর্শন করাইবার পয়সা দিয়া পাহাড় হইতে নিচে নামিতে লাগিল। অম্বরনাথ গুহার মধ্য হইতে যে দুইটা পায়রা উড়িতেছে ইহার সার অর্থ এই যে অম্বরনাথ শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্ম। তাহা হইতে দুইটা পায়রা অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি এই আকাশ গুহা হইতে উদয় অস্ত হইতেছেন অর্থাৎ দিন রাত্রি প্রকাশমান আছেন। চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ ঈশ্বরকে পায়রা শব্দ জানিবেন। পায়রাকে পুণ্যবান্ ব্যক্তি যে দেখিতে পায় আর পাপী ব্যক্তি যে দেখিতে পায় না ইহার সার অর্থ এই যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপের প্রিয় ভক্তজন অর্থাৎ পুণ্যবান্ অ-র্থাৎ জ্ঞানবান পুরুষ এই পায়রা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে চিনিতে পারেন এবং জানেন যে তিনি সকল পাপ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সদা আনন্দরূপ থাকেন। আর পাপী শব্দে অজ্ঞানী ব্যক্তি। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু হইতে যে বিমুখ সেই ব্যক্তি। ইহারা জ্যোতিঃস্বরূপকে দেখিতে পায় না অর্থাৎ চিনিতে পারে না। অম্বর-নাথ দর্শন করিবার পথের মধ্যে পাহাড়ের পাথর ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া একজন মনুষ্য আসিতে যাইতে পারে এরূপ পথ আছে। তাহার নাম পাণ্ডারা কল্পনা ক-রিয়াছে গর্ব্ভযোনি। যে এই গর্ব্ভযোনিতে দান পুণ্য করিয়া পার হইয়া অম্বরনাথ যাইবে তাহার আর জন্ম মৃত্যু হইবে না। সেই কথা শুনিয়া যাত্রিরা এই গর্ব্ভযোনি মধ্যে দান পুণ্য করিতে লাগিল এবং করিয়া সেই গর্ব্ভ-

যোনির পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। একটা মুসলমান গর্ব্বযোনির দ্বারের আগে থাকে ও আরএকজন পিছনে থাকে। আগে পয়সা দান লইয়া তবে গর্ব্বযোনি হইতে বাহির হইতে দেয় এবং এক এক মুষ্টি বিভূতি দেয়। যাত্রিরা—স্ত্রী পুরুষ এবং সাধু মহাত্মা লোক সেই বিভূতি গায়ে মাখিয়া অম্বরনাথকে দর্শন করে। কিন্তু যে ব্যক্তির কাছে পয়সা না থাকে তাহাকে গর্ব্বযোনির পথ হইতে বাহির হইতে দেয় না, তাড়াইয়া দেয়। এক পয়সা মাত্র দিলে গর্ব্বযোনি হইতে মনুষ্য মুক্তি পায় কিন্তু শিবনারায়ণের কাছে পয়সা ছিল না সেই কারণে মুসলমান এবং পাণ্ডারা শিবনারায়ণকে গর্ব্বযোনির পথ দিয়া যাইতে দিল না। শিবনারায়ণ অন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কল্পিত গর্ব্বযোনি দিয়া যাইবার কোন আবশ্যক ছিল না। তিনি কেবল পরমাত্মার লীলা এবং সৃষ্টির কষ্ট দেখিয়া বেড়াইতেন। গর্ব্বযোনি কাহাকে বলে। ইহার সার অর্থ এই যে এই মায়াপ্রপঞ্চ অহংকার আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ রূপই গর্ব্বযোনি। এবং এই গর্ব্বযোনি হইতে যিনি উত্তীর্ণ হন তিনি গর্ব্বযোনি পার হইয়া যান অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে যাঁহার নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে এবং অসৎ পদার্থে যাঁহার চিত্তের আসক্তি জন্মে না তিনিই লোভ মোহরূপ গর্ব্বযোনি হইতে মুক্ত হইয়া সদা অনাদিকাল আনন্দরূপ থাকেন এবং যে ব্যক্তি অহংকার ইত্যাদি অজ্ঞানেতে অন্ধ হইয়া আত্মা পরমাত্মাকে না চিনে তিনি অন্ধকাররূপ অজ্ঞান গর্ব্বযোনিতে পতিত হইয়া থাকেন, এইরূপ বুঝিয়া লইবে। পরে সেখান হইতে সকল যাত্রি অম্বরনাথ গুহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গুহার নিকটে পাহাড়ের উপর হইতে বরফ গলিয়া জল পতিত হইতেছে। তাহাকে পাণ্ডারা অমরগঙ্গা নামে কল্পনা করিয়াছে। উহারা যাত্রিদিগকে বলিল যে তোমরা স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি সকলে উলঙ্গ হইয়া এই অমরগঙ্গাতে স্নান করিয়া মুসলমান যে বিভূতি গর্ব্বযোনির নিকট দিয়াছে তাহা অঙ্গে লেপন করিয়া এখানে টাকা পয়সা দান কর। ইহার বড় মাহাত্ম্য আছে এবং এখানে শিবের আজ্ঞা আছে যে এখানে উলঙ্গ হইয়া তাঁহাকে গুহাতে যাইয়া দর্শন করিতে হয়। তাহাতে বড় মাহাত্ম্য এবং ফল আছে। এই কথা শুনিয়া যাত্রিরা স্ত্রী পুরুষ সাধু মহাত্মা উলঙ্গ হইয়া অমরগঙ্গাতে স্নান করিয়া বিভূতি মাখিয়া দান পুণ্য করিয়া অম্বরনাথ গুহাতে যাইয়া অম্বরনাথকে দর্শন করিতে লাগিল এবং পাণ্ডারা দান পুণ্য করাইতে লাগিল। সেই গুহার চারিদিকে মুসলমানগণ বসিবার জন্য গর্ত্ত করিয়া গুহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে এবং পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে বলিয়া দেয় যে এই মুসলমানদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া বিভূতি কিনিয়া লও। ইহার বড় মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু সেই বিভূতি ব্যবসায়ের পয়সার মধ্য হইতে পাণ্ডারা অংশ পায়। পাণ্ডাদের মুসলমানদের সহিত এই সর্ত্ত আছে যে, যত টাকা পয়সা অম্বরনাথে যাত্রিরা দিবে তাহা চারি অংশ করিয়া দুই অংশ মুসলমানেরা লইবে, এবং এক অংশ হইতে যাইবার পথ পরিষ্কার করাইয়া দিবে। আর এক অংশ পাণ্ডাদের প্রাপ্য। এইরূপ সিন্ধু দেশে হিংলাজ নামে এক তীর্থ আছে। সেখানেও মুসলমানেরা এইরূপ পয়সা লয় এবং এক এক জন স্ত্রীলোক যাহারা বুদ্ধিমতী, যাহারা উলঙ্গ হইতে পারে না, তাহারা লজ্জা নিবারণার্থ এক একটা ভূর্জপত্র কোমরে জড়াইয়া লইয়া থাকে। কিম্বা যদি কোন

স্ত্রীলোক লজ্জাবশতঃ কাপড় ছাড়িতে না পারে তাহাকে সকলে সাধু গৃহস্থ ইত্যাদি যাত্রিরা পাপী বলে। এই স্ত্রী উলঙ্গ হইয়া দর্শন করে না। এ বড় মহাপাতকী। অম্বরনাথে যে মুসলমানরা থাকিত তাহারা এবং যে দুই জন ইংরাজ কাশ্মীর হইতে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা, পরস্পর গল্প করিয়া তালি দিয়া হাঁসিত। বলিত ইহারা কি করিতেছে। এইরূপ তীর্থযাত্রা দেখিয়া শিবনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন শুন। অম্বরনাথ গুহার মধ্যে যাইয়া যাত্রিরা কি দর্শন করিত? ঐ সকল পাহাড়ের উপর কেবল বার মাস বরফ জমিয়া থাকে। সেই অম্বরনাথ গুহার সম্মুখে পাহাড়ের ভিতর কয়েক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটা পথের উপর হইতে বরফ গলিয়া গলিয়া ঐ পাহাড়ের ছিদ্র দিয়া ঐগুহার মধ্যে কয়েক স্থানেতে পড়িয়া বরফের জল জমিয়া যায়। কোন স্থানে ছোট কোন স্থানে বড় কোন স্থানে নিচু কোন স্থানে উঁচু কিন্তু দুইটা বরফের লিঙ্গাকার ওখানে জমিয়া যায়। তাহার একটাকে পার্ব্বতী ও একটাকে শিবলিঙ্গ বলে। পাণ্ডারা সেই বরফকে সেই দিবস উত্তমরূপে পালিস করিয়া লিঙ্গাকারে পরিণত করিয়া অর্থাৎ অম্বরনাথ এবং পার্ব্বতী-কল্পনা করিয়া রাখে এবং যাত্রিদিগকে বলিয়া দেয় যে, তোমরা ইহাঁকে দর্শন কর। যাত্রিরা সেই কথা শুনিয়া সেই বরফের পার্ব্বতী এবং শিবলিঙ্গের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার চরণের ধূলা লয়। পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে বলে যে, আমি কেমন তোমাদের ইষ্টগুরু শিব ও পার্ব্বতী ঈশ্বরকে তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলাম। যাত্রিরা ও প্রসন্ন হইয়া ধন্যবাদ দেয় এবং টাকা পয়সা দেয়। ক্রমশঃ।

গায়ত্রী-চিন্তা।

(গত পৌষ মাসের পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

যিনি এই সৃষ্টিতে প্রেমরূপে বিরাজিত, যাঁহার প্রেম কি তৃণ কি পর্ব্বত জগতের প্রত্যেক পদার্থে দেদীপ্যমান—তাঁহাকে কি সৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়? কখনই না। সূর্য্য চন্দ্র তারক তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি সৃষ্টির অতীত। তিনি সৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া আমাদিগকে প্রীতি করেন—যেন মাতা সন্তানের জন্য সাতিশয় স্নেহ সহকারে সোপকরণ বহুবিধ আহারীয় দ্রব্য গৃহে প্রস্তুত রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। জড়জগৎ, পশু পক্ষ্যাদি তাঁহাকে জানে না, মানবাত্মাও বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পায় না। শ্রুতি স্মৃতি মন ও বাক্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আইসে। তবে তিনি আমাদিগের আত্মাতে দেখা দেন, তাই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ। যেমন সূর্য্যমণ্ডল প্রখর জ্যোতিঃপুঞ্জ আকারে উদিত হইয়া আমাদিগের চক্ষুতে আলোক প্রেরণ করে তবে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই, সেইরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং প্রেম সত্য আশ্রয় কারণ প্রভৃতিরূপে আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের আত্মার চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিবার উপযুক্ত আলোক অর্থাৎ ক্ষমতা প্রদান করেন তবে আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করি। ইন্দ্রিয় প্রশান্ত, চিত্ত নির্ম্মল এবং রাগদ্বেষাদি রজোগুণ ও প্রমাদ আলস্যাদি তমোগুণ বিবর্জ্জিত হইলে তাঁহার দর্শন তাঁহার সহবাস করিবার জন্য স্পৃহা সহজেই সমুদিত হয়। তখন তিনি আমাদিগের সমক্ষে অপার শান্তি-সমুদ্র পিতা মাতা সুহৃৎ জ্ঞান-প্রেম-দাতা রূপে আবির্ভূত

হয়েন। যখন আমরা হৃদয়ের দ্বার তাঁর দিকে খুলি, তখন তাঁহার অপরূপ অরূপ রূপ-মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হই। কি তাঁর করুণা। তিনি মহান্ হইয়া কীটাণুকীট যে আমরা আমাদিগের হৃদয়কুটীরে দেখা দেন। কেবল দেখা দেন এমত নহে তিনি মুক্তিবিষয়িণী সদ্‌বুদ্ধি সকল আমাদিগকে প্রেরণ করেন। তিনিই কুটিল সংসারের পথ হইতে আমাদিগকে তাঁহার অমৃতময় পথে নিয়ত আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু তিনি যেমন গ্রহকে নিয়মিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করান্ সেরূপ বল পূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁর পথে প্রচালিত করেন না। তাঁর ইচ্ছা যে আমরা স্বাধীন ভাবে পাপ-প্রলোভন অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ নিজানন্দে তাঁর পথে গমন করি। দেখ, শরীর রক্ষা জন্য তিনি আমাদিগকে ক্ষুধা দিয়া আহার বিষয়ে বল পূর্ব্বক নিয়োজন করিতেছেন—যেহেতু আহার করা আমাদিগের বিবেচনা বা স্বেচ্ছার উপর নির্ভর থাকিলে আমরা যথাকালে আহার না করিয়া পীড়িত বা মৃত হইতে পারি, এজন্য আমাদিগের প্রাণ ধারণের ব্যাপার তিনি নিজ হস্তে রাখিয়া আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষা ও পুষ্টি-সাধন বিষয়ে আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। চাই আমরা আত্মার যে স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে তাহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার কাছে যাইয়া সেই ক্ষুধার অন্নগ্রহণ করি—আত্মাকে তাঁর প্রেমে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করি—চাই সে ক্ষুধার উত্তেজনা না শুনিয়া আত্মাকে অভুক্ত রাখিয়া জীর্ণ শীর্ণ ও মৃত প্রায় করিয়া রাখি। তিনি যে শুভ বুদ্ধি আমাদিগকে দিয়াছেন যদি আমরা তদনুসারে চলি—তাঁহাতে মনঃ প্রাণ নিবেশিত রাখিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধি লাভালাভ জয় পরাজয় গণনা না করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে রত থাকি, তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া সকল কর্ম্ম তাঁহাতেই সমর্পণ করি তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে সংসাররূপ মৃত্যু হইতে সমুদ্ধরণ করিয়া তাহার পর পারে অমৃত ধামে লইয়া যান। তাঁহাতে নিত্য যুক্ত হইলে জীবন মধুময় হয়। যেহেতু তিনি রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু। তিনি ব্যতীত যা কিছু সকলি ঘন বিষাদের আলয়। তিনিই আত্মার আরাম ও আনন্দধাম। যেমন পথিক বিদেশ পর্য্যটনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া নিজ বাস গৃহে আসিয়া শরীরের নির্বৃতি লাভ করে, সেইরূপ যখন আমরা সংসারারণ্যে কুটিল পথে ভ্রাম্যমাণ ও তদীয় কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত চরণ হইয়া অবশেষে তাঁহার পরম তৃপ্তিকর আশ্রয় পাই—তখন সকল দুঃখের অবসান হয়—আমাদিগের সুখ শান্তির আর সীমা থাকে না।

অতএব যেন আমরা তাঁহাকে জীবনের সার জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকি। সাধু জনেরা ভগবানের এই আশ্বাসময়ী বাণী স্বীয় হৃদয়ে শুনিয়াছেন যে ভক্তকে ভগবান্ কখনই বিনাশ করেন না—অর্থাৎ ঈশ্বর-বিস্মৃতিরূপ মৃত্যুতে তাহাকে পাতিত করেন না, তাহার আত্মাকে স্বর্গীয়ভাব ও নবজীবনরূপ অমৃত দ্বারা পূর্ণ করেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভক্তি ও প্রেম রজ্জু দ্বারা আপন হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে পারে, তিনি তাহার হৃদয়ে নিয়ত অবস্থিত করেন। তিনি আপনাকে দান করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন—তিনি এইখানেই ভক্তকে ব্রহ্মলোকনিবাসী করেন। আমরা যেন ভক্তগণের পদানুসরণ করিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হই। যেন এখানে তাঁহাকে উপার্জ্জন করিতে পারি; তাহা হইলে চরমে তিনি আমাদিগের সম্বল ও অনন্ত কালের উপজীব্য হইবেন।

সমালোচনা।

স্বর্গের চাবি—ইহা একখানি উপাদেয় পুস্তক। গল্প ছলে ইহাতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুখপাঠ্য।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫৫৯ সংখ্যা

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।

১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

প্রাতঃকাল।

প্রাতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ব্রহ্মোপাসনা হয়। ঐ সুসজ্জিত স্থান যথা সময়ে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন।

"প্রাতঃকালের রমণীয়তা সকলেরই হৃদ্য ও উপসেব্য। পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি নাই যে প্রাতঃকালকে সুখের আকর ও আনন্দের উৎস রূপে উপভোগ না করেন। রোগী প্রাতঃকালে সুস্থ, বৃদ্ধ প্রাতঃকালে কর্ম্মঠ, গৃহী প্রাতঃকালে শান্ত, জ্ঞানী প্রাতঃকালে গম্ভীর, কবি প্রাতঃকালে মধুময়, দরিদ্র প্রাতঃকালে আশান্বিত ও ধার্ম্মিক প্রাতঃকালে ভাবময় হইয়া স্বীয় স্বীয় জীবন-পথে চলিতেছে। প্রাতঃকাল এত সুন্দর কেন, এত মনোহর কেন? প্রাতঃকালের জীবন-উৎস কোথায়? প্রাতঃকালের জীবন-নিশ্বাস কোন্ দিক হইতে প্রবাহিত? উষার আবরণ ভেদ করিয়া ঐ দেখ প্রাতঃকালের জীবন-উৎস; আনন্দের আকর, শোভার ভাণ্ডার, অনির্ব্বচনীয়তার খনি এই বিশ্বকে আমাদের চক্ষের উপর ধরিল। ঐ দেখ বিশাল অন্ধকারের অতলস্পর্শ গর্ভ ভেদ করিয়া প্রাতঃকালের জীবনী-নিশ্বাস সূর্য্য এই মনোহর বিশ্বকে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত করিল। এখন বুঝিলাম প্রাতঃকালের স্বভাব সূর্য্য। সূর্য্যেই পৃথিবীর বাঁচনকাঠী ও মরণকাঠী। এই সুমধুর প্রাতঃকালে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণমালায় শোভান্বিত এই প্রশান্ত স্থানে আমরা একত্রিত হইয়াছি। স্থানটী পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত, সকলেরই মুখে আনন্দের ছবি, আশার চিহ্ন। চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ, চারিদিক উৎসব-সাজে সজ্জিত। আজ কিসের উৎসব? অদ্য মাঘের একাদশ দিবস, আজ আমাদের ব্রহ্মোৎসব। তাই এত সাজসজ্জা, তাই এত আমোদ আহ্লাদ, তাই এত আশা ভরসাতে আজ আমরা প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি। তাই জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকগণ সমবেত হইয়া এই উৎসবকে আরও উজ্জ্বল

করিয়াছেন। তাই বালক বৃদ্ধ যুবক শান্ত-হৃদয়ে গম্ভীর ভাবে বসিয়া বিশ্বপতির অর্চ্চনার আয়োজন করিতেছেন। মাঘের একাদশ দিবসের এত সম্মান কেন? এই দিবস আমাদের এত প্রিয়তম কেন? এই দিবস আমাদের প্রাণ প্রীতিপ্রদ কেন? না, এই দিবসের মধ্য দিয়া প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতে পদার্পণ করেন। প্রাতঃকাল—সময়, ঐ সময়ের মধ্য দিয়া প্রথম সূর্য্যের প্রকাশ হয় বলিয়া প্রাতঃকাল প্রীতিপ্রদ ও মনোহর। সেইরূপ মাঘের একাদশ দিবসের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাহার জন্য এই দিবস আমাদের প্রীতিপ্রদ। ভারত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ভারতের পূর্ব্বজ্ঞান গৌরব অজ্ঞানতার কুজ্ঝটিকায় ঢাকা ছিল। ভারতের সুখ সৌভাগ্য অধীনতার লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। ভারতের ব্রহ্ম উপেক্ষিত পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাণ ছিল না। মাঘের একাদশ দিবসে এই প্রাণের সঞ্চার হয়। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষিত হয়, জ্ঞানধর্ম্মের প্রেম পবিত্রতার দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ পুনঃসঞ্চারিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে সূর্য্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মানবগণ তখন চক্ষুষ্মান হইয়া সমস্ত শোভা দেখিবার অধিকারী হন; সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া ভারত গগনে উদিত হইলে পর ভারতবাসীগণ তাহাদের পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতে যত্নবান হন এবং পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম্ম প্রেম পবিত্রতা দেখিতে পাইয়া সেই দিকে ছুটিতে থাকেন। বেদ ছিল, উপনিষদ ছিল, পুরাণ ছিল, যোগী ছিলেন, ঋষি ছিলেন, নীতিবিজ্ঞান ধর্ম্মবিজ্ঞান সকলি বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বেদের আদর করিত কে? দর্শনের তত্ত্ব কয়জন লইতেন? বিজ্ঞানের মর্ম্ম কয়জন বুঝিতেন? নীতি ও ধর্ম্ম বলিয়া যে একটা জিনিস আছে এই বিষয় কয়টী ভারতবাসী স্বীকার করিতেন? কিন্তু যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইল অমনি শাস্ত্রের আদর বাড়িল। সাধুদিগের সম্মান-প্রতিষ্ঠা হইল। জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তই উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া ভারতবাসীর মন প্রাণ অধিকার করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এক সূত্রে গ্রথিত হইল। তাই আজ আমরা মাঘের একাদশ দিবসে এই উৎসব করিতেছি।

ব্রহ্ম আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। যোগী, ঋষি, ভক্ত, প্রেমিকদিগের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। একমাত্র এই সম্পত্তি উপার্জ্জন করিবার জন্য প্রাচীন যোগী ঋষি সাধু মহাত্মারা ঐহিক সুখকে তুচ্ছ ও অপদার্থ মনে করিয়া পার্থিব অর্থকে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া একমাত্র অনন্ত মহান ঈশ্বরকে হস্তামলকবৎ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইতেন। যত দিন ব্রহ্ম লাভ না হইত ততদিন তাঁহারা নিরস্ত থাকিতেন না। চিন্তার পর চিন্তা, গবেষণার পর গবেষণা, ধ্যানের পর ধ্যান, প্রার্থনার পর প্রার্থনা করিয়া নিত্য নিরাকার পূর্ণব্রহ্মকে লাভ করিতেন। হৃদয় মাঝে, প্রাণ-সিংহাসনে বসাইতেন। প্রাণস্য প্রাণম্ বলিয়া পূজা করিতেন, তার পর তাঁহারা নিরস্ত হইতেন। আমরা তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী, আমরা তাঁহাদের সেই ব্রহ্মধনের উত্তরাধিকারী। ঋষিদিগের স্বোপার্জ্জিত অনেক বিত্ত আছে কিন্তু ব্রাহ্মগণ ভাগে আর কিছু চান না। সেই ব্রহ্মকে চান, এই

পৈতৃক বিত্ত দখল করিতে চান। সৌভাগ্যক্রমে তাহাই হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মধনে অধিকারী হইয়াছেন। তাহাদের ভাগে ব্রহ্ম পড়িয়াছেন। অনেকের মুখে শুনা যায় রত্নপ্রসূ ভারতভূমির প্রধান ও উৎকৃষ্ট রত্ন কহিনুর আর ভারতে নাই। ভারত নির্ধন, দরিদ্র, রত্নহীন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহাদের বড়ই ভ্রম। ভারত রত্নহীন হয় নাই। ভারতের কহিনুর ভারতেই আছে। ভারতের রত্নে আজও ভারত গৌরবান্বিত। সেই কহিনুর কি না ব্রহ্ম। এই কহিনুর উপার্জ্জন করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া পার্থিব বিত্তকে অসার মনে করিতেন এবং সারতত্ত্ব সাররত্ন সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে কহিনুর বলিয়া গলায় পরিতেন। সেই কহিনুর আমাদের আছে। আমরা হারাই নাই। শত দরিদ্রতায় নিষ্পেষণ করুক, চারিদিকে বিঘ্ন বিপত্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হউক, অত্যাচার, অনাদরের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই, তবু দুঃখ করিব না। কারণ আমাদের কহিনুর আমাদের আছে। আমাদের ব্রহ্ম আমাদেরই আছেন। ব্রহ্মকে লইয়া আমরা উৎসব করিব, তিনি আমাদের কণ্ঠের হার হইবেন।

তাই বলিতেছি মাঘের একাদশ দিবসে এই রত্নের উত্তরাধিকার সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে দিন আমরা ব্রহ্মরূপ কহিনুর হস্তগত করিয়াছি সেই দিন আমাদের আজ, এই মাঘের একাদশ দিবস। তাই আমাদের এত আনন্দ এত সুখ। এই দিবস যে কেবল আমাদের উৎসব তাহা নহে। এমন দিন আসিবে সমস্ত ভারতবাসী এই এগারই মাঘে উৎসবে মত্ত হইয়া রত্নোৎসব করিবেন, ব্রহ্মকহিনুর পুনঃপ্রাপ্তির উৎসব ঘরে ঘরে হইবে। ঈশ্বর করুন এই কহিনুর ভারতের প্রত্যেক নরনারীর শিরোভূষণ হউক। ঈশ্বর করুন তিনি আমাদের হৃদ্য ও পূজনীয় হউন, তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।”

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া মধুর গম্ভীর স্বরে বেদি হইতে এই উপদেশ দিলেন।

আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজ পরম মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার আদেশ মস্তকে করিয়া আর এক বৎসর পৃথিবীতে মঙ্গল-রশ্মি বিতরণ করিয়া সেই মহান্ প্রভুর পদতলে প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা সমর্পণ করিবার জন্য আবার আজ তাঁহার দ্বারে আসিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তাঁহারই অমৃত ভাণ্ডার হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে—তাহারই আজ আয়োজন হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজেরই মঙ্গলের উপর আমাদের দেশের মঙ্গল—প্রতি পরিবারের মঙ্গল এবং আমাদের প্রতি জনের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সমস্তই নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর আমাদের অমঙ্গল দেখিতে পারেন না—তিনি আমাদের মঙ্গল দেখিতে চা'ন—তাই তিনি আমাদের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যাহা আমাদিগকে ভাল বাসিয়া প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমরা কোন্ প্রাণে বিমুখ হইব? প্রকৃতির মূলস্থিত সর্ব্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর আমাদের পরম পিতা, প্রকৃতির অভ্যন্তরে তিনি আমাদের পরম-মাতা এবং তাঁহার স্নেহের দান ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের প্রাণের বন্ধু—এ ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিরূপে আমরা

পরিত্যাগ করিব? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তো আমাদের পর নহেন; পৃথিবীতে এত এত বড় বড় দেশ থাকিতে তিনি আমাদের এই দীন দরিদ্র সহায় সম্পত্তি-হীন বঙ্গদেশেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; আমাদেরই মঙ্গলের জন্য আমাদের দুঃখ-রজনীর প্রাতঃসূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তবুও যদি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে পর ভাবিয়া—বাহিরের একটা জঞ্জাল ভাবিয়া—আমাদের সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিই, তবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে কোনো—বস্তু আছে—সার আছে—প্রাণ আছে—তাহার নিদর্শন কি? তাহা হইলে তো আমাদের হৃদয় অসাড় অচেতন মৃৎপিণ্ড! ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমাদের দেশের সকল মঙ্গলের নিদান—সাক্ষাৎ প্রাণ-সদৃশ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, আমাদের পর? এরূপ কথা মুখে আনিতে নাই! হিমালয়ের শিখর প্রদেশ হইতে বঙ্গভূমির চরম প্রান্ত পর্য্যন্ত পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী যেমন একাদিক্রমে অবি-রামে চলিয়া আসিতেছে—পথের মাঝখানে কোথাও থামিতেছে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিদিগের প্রাণ-ভরা হৃদয় হইতে উদ্গীরিত হইয়া অধুনাতন এই অব্দের এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রস্তর পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া অবিশ্রাম চলিয়া আ-সিতেছে; পরম মঙ্গলালয় বিশ্বপাতার এমন পাষাণভেদী করুণার প্রসাদবিন্দু গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়-ভাণ্ডারে তিল পরি-মাণও স্থান-সঙ্কুলন হয় না—ইহা দেখিয়া দেবতারা কি না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন? এখনি যদি আমরা বক্ষ-প্রসারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে স্থান দিই—তবে এখনি আমাদের দেশের সমস্ত দুর্গতি দূর হইয়া যায়—এমন সহজ সত্যটির প্রতি এতদিনেও কি আমাদের চক্ষু ফুটিল না! এত দেশ থাকিতে কেন তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ আমা-দেরই এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে বপিত হইল? দেখিতে দেখিতে তাহার শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কিছু দিন পরে তাহার শস্য সমস্ত পৃথিবী-ময় উথলিয়া পড়িবে,—তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই! তবুও কেন আমাদের চক্ষু অন্ধ—হৃদয় অসাড় এবং অচেতন! এত বড় গৌরবান্বিত ধর্ম্ম যাহা আকাশে ধরে না—কালে ধরে না—তাহা কি আমাদের এই দীন হীন পরাধীন অধম দেশের উপ-যুক্ত? জ্ঞান-শূন্য অন্ধ অপভক্তি যে দেশের কণ্ঠের হার, সে দেশে কি জ্ঞানোজ্জ্বল প্রীতি-ভক্তির বিকাশ লোকসমাজে সমাদৃত হইতে পারে? যে দেশে স্বজাতীয় আত্ম-নির্ভর ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে সে দেশে কি স্বজাতির গৌরব-স্বরূপ স্বদেশ-জাত কোনো মূল্যবান্ বস্তু লোকসমাজে আদর-ভাজন হইতে পারে? যে দেশের মস্তক চিরকালই ক্ষমতাবানের পদানত—সে দেশে কি সত্যের জন্য সত্য—ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম—ঈশ্বরের জন্য প্রাণ—এরূপ মহত্ত্বাব-সকল হৃদয়ের এক কোণেও স্থান পাইতে পারে? যে দেশ অর্দ্ধ মৃত নির্জীব এবং অসাড় সে দেশ কি জীবনের জীবন আত্মসাৎ করিতে পারে? অন্ন পরিপাক করিতে হইলে জঠ-রানলের প্রজ্বলন চাই—রক্তের তেজ চাই! আমাদের এই নির্জীব দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্ম-সাৎ করিবার সামর্থ্য কই—বল কই—তেজ কই,—প্রাণ কই! ভয় নাই—ঈশ্বরের করুণা অনন্ত! পরম প্রভু দীনতারণ পর-মেশ্বরের মহান্ প্রাণ আমাদের উপরে প-ড়িয়া রহিয়াছে—আমাদের পিঞ্জর-বদ্ধ ক্ষুদ্র প্রাণ তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে তাঁহার বিশ্বায়ত জ্ঞান-চক্ষু আমাদের চতুর্দ্দিকে পা-হারা দিতেছে—আমাদের জ্ঞানের খদ্যোত-জ্যোতি তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? বঙ্গ-দেশ

বলিয়া যে একটা দেশ আছে—তাহার মধ্যে যে আবার মনুষ্য আছে—আর সেই সব মনুষ্যের ভাণ্ডারে যে পুরুষপরম্পরাগত অমূল্য জ্ঞানরত্ন আছে—অধুনাতন প্রবল জাতিরা তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরেন না। এমন এই যে পৃথিবী মাতার ত্যজ্য পুত্র হতভাগ্য বঙ্গভূমি—এই শুষ্ক মরুভূমির অভ্যন্তরে—নানা প্রকার বিভ্রান্তি-জনক মরীচিকার অভ্যন্তরে—পতিতপাবন বিশ্ববিধাতা অনুপম স্নেহ বর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের শান্তি-প্রদ ছায়াতরু অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন; কিছুই ছিল না—অঙ্কুর দেখা দিল; শাখা প্রশাখা ছিল না—শাখা প্রশাখা দেখা দিল; ফল পুষ্প কি যথা সময়ে দেখা দিবে না? অরুণ যখন দেখা দিয়াছে—তখন কি সূর্য্য দেখা দিবে না? সূর্য্য কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন থাকিলেও তাহা সূর্য্য—ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্ষুদ্র প্রাণী বঙ্গ হৃদয়ের মোহ-মেঘে কলুষিত হইলেও তাহা বিশ্ববিধাতা মহান্ পুরুষের প্রেরিত মহান্ ধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের ছায়াতরু তলে—কোলাহল সমুদ্রের মধ্যস্থিত শান্তির দ্বীপে—আমরা আজ সবান্ধবে মিলিত হইয়া পতিতপাবন পরমেশ্বরের অমোঘ প্রসাদবারি যাচ্ঞা করিতেছি।

হে পরম মঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতা নিখিল চরাচরের জনক জননী! তোমার প্রেম-পীযূষ পান করিয়া কঠোর সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা এখানে অদ্য সবান্ধবে মিলিত হইয়াছি। তোমার অভয় ক্রোড় সর্ব্ব জগতে প্রসারিত রহিয়াছে—তোমার এই দীন হীন বঙ্গ সন্তানগণের প্রতি তুমি কি উদাসীন থাকিতে পার? আমরা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়া শত সহস্র অপরাধী হইলেও তুমি আমাদের প্রতি বিমুখ হইও না; কখন্ তোমার পথে ফিরিয়া আসিব—কখন্ তুমি আমাদের অশ্রুজল মার্জ্জন করিয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে লইবে—সেইরূপ পন্থান্বেষী তোমার বিশ্বব্যাপী মঙ্গল-চক্ষু আমাদের উপর চিরদিন নিপতিত রহিয়াছে; সে চক্ষু যদি আমরা ক্ষণ-মাত্রও দেখিতে পাইতাম, তবে তোমা ভিন্ন আর আমরা কিছুই চাহিতাম না। পাছে আমরা সে তোমার প্রেম-দৃষ্টির আকর্ষণ সামলাইতে না পারিয়া সংসারের সমস্ত কর্ম্ম কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারেই তোমাতে বিলীন হইয়া যাই—এই জন্য তুমি আমাদিগকে তাহা স্পষ্ট ভাবে দেখিতে দেও না—ধীরে ধীরে তুমি তোমার সর্ব্বসন্তাপহারী অমৃত আমাদের তৃষিত আত্মাতে বর্ষণ কর। আমাদিগকে অন্ধকার সংসারে অসহায় ফেলিয়া দিয়া লুকাইয়া থাকিও না—আমাদের অন্তশ্চক্ষে তোমার প্রেমপূর্ণ অভয় মূর্ত্তি প্রকাশিত কর এই আমাদের প্রার্থনা। তোমার প্রীতি তোমার স্নেহ তোমার করুণাই অদ্য আমাদের পরম মহোৎসব।

রাত্রিকাল।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহ পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত ও আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এবার বঙ্গদেশের সর্ব্ব-প্রধান এমন অনেক লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রশস্ত গৃহ লোকে লোকারণ্য। যথাসময়ে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ বক্তৃতা করিলেন।

"অদ্যকার এই শুভ মাসে—শুভ দিবসে—ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিনব সূর্য্য উদয়াচলে সমুত্থান করিয়াছেন। অদ্যকার সূর্য্যের অভ্যুত্থানে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, সকল মঙ্গ-

লের আকর পরম মঙ্গলময় বিশ্বের জনক-জননীকে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ধন্যবাদ দিয়া—কিছুতেই হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি মানিতেছে না। পৃথিবীর সূর্য্য অস্ত হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সূর্য্য উদয়াচল হইতে এক পদও টলিবার নহে, মঙ্গলময়ের প্রেরিত মঙ্গলের সূর্য্য জগতে একবার উদয় হইলে কোন কালেই তাহা অস্ত হয় না। পূর্ব্বদিকের মুখ-জ্যোতি এখনো কুজ্ঝটিকায় ম্লান—ভারতের মুখ-জ্যোতি এখনো মোহাবরণে অবগুণ্ঠিত। নবোদিত মঙ্গল-সূর্য্য সেই কুজ্ঝটিকার আড়ালে সহস্র কোটি কিরণ-জাল ধীরে ধীরে প্রসারণ করিতেছে—কুজ্ঝটিকা তাহা জানে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মোহ-কোলাহলের মধ্য হইতে প্রেমভরা গম্ভীর আহ্বান-ধ্বনি উচ্চে উদ্‌ঘোষণ করিতেছেন—এখনো তাহা জনসাধারণের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলেই মোহ-কুজ্ঝটিকার দল-বল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দশদিকে বিদ্রাবিত হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সূর্য্যের মধ্য দিয়া অনন্ত মহান্ পুরুষের শুভ্র মুখজ্যোতি দশদিকে বিকীর্ণ হইবে—কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। সেই তাঁহার সর্ব্বসন্তাপ-নাশন মুখ-জ্যোতির কণামাত্র কিরণের প্রত্যাশায় বিমল প্রীতি-ভক্তির সাগরসঙ্গম হইয়া তাহার অভ্যন্তরে শত সহস্র হৃদয়-কমল অদ্য বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। অদ্যকার এই সুমঙ্গল দিবসে আমাদের পরম পিতা পরম মাতা পরম সুহৃৎ আমাদের প্রাণের শান্তির জন্য—ক্ষুধিত আত্মার ক্ষুধা নিবারণের জন্য—আমাদিগকে অমৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন; তাই আমরা তাঁহার চরণে আমাদের প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিবার জন্য অদ্য এখানে একত্র সমাগত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম বস্তুটা কি—তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! তাহা পরম পিতার কল্যাণের দান—পরম মাতার স্নেহের দান—পরম বন্ধুর প্রীতির দান—তাহার মূল্য কিরূপে মুখে ব্যক্ত করিব? তাহার মূল্য এক হৃদয়ে ধরে না—তাই শত সহস্র হৃদয় হইতে আজ প্রীতি ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; পৃথিবীতে ধরে না—তাই ভূর্ভুবঃ স্বঃ সমস্ত জগতে মঙ্গল-ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে; যাঁহার কর্ণ আছে তিনিই তাহা প্রাণের অভ্যন্তরে শুনিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি অমূল্য বস্তু এখনো আমরা তাহা চিনিতে পারি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরন্তন অথচ নূতন। ব্রাহ্মধর্ম্মেতেই আমাদের এই আর্য্যভূমির জন্ম; ব্রাহ্মধর্ম্মেতেই আর্য্যজাতির মূল প্রতিষ্ঠিত; ব্রাহ্মধর্ম্মই সমস্ত পৃথিবীর পুষ্পবিকাশ এবং ফল-পরিণতি। আজিকের এই উজ্জ্বল শতাব্দীতে এ কথা কাহারো নিকটে গোপন থাকিতে পারে না যে, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আমাদের দেশে গোড়া হইতেই আছে; মাঝে কেবল খণ্ড খণ্ড হইয়া এখানে ওখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। করুণাময় জগৎপিতার পরমাশ্চর্য্য মৃতসঞ্জীবনী কৃপায় সেই খণ্ডাংশগুলি একত্র সমানীত হইবামাত্র, তাহাতে নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অভিনব শ্রীতে সমুত্থান করিল। আর্য্যধর্ম্মের নানা অঙ্গ আর কিছু নয়—আত্মার তিনটি মুখ্য অবয়ব—জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্ম; প্রাণ-শব্দে এখানে শারীরিক প্রাণ নহে;—চাই প্রাণ বলো—চাই হৃদয় বলো—চাই প্রীতি বলো—চাই ভক্তি বলো,—কাণে শুনিলে নানা শব্দ—মনে বুঝিলে একই অর্থ।

এ যাবৎকাল আর্য্য-ধর্ম্মের তিন অঙ্গ—জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্ম এই তিন অঙ্গ—তিন

দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া, একদিকে শুষ্ক জ্ঞান, আর এক দিকে অন্ধ ভক্তি, এবং আর-এক দিকে জ্ঞান-শূন্য প্রাণ-শূন্য অনর্থক বাহ্যাড়ম্বর—এই তিন বিরোধী স্রোত তিনদিকে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এক সম্প্রদায় জ্ঞানের পক্ষপাতী—ভক্তির বিরোধী; আর-এক সম্প্রদায় ভক্তির পক্ষপাতী—জ্ঞানের বিরোধী; আর এক সম্প্রদায় শূন্যগর্ত্ত যাগ যজ্ঞাদির পক্ষপাতী—জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই তাঁহাদের মৌখিক আড়ম্বর-মাত্র। কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে আর্য্য-ধর্ম্মের কোন্ এক অলক্ষিত কোণে বিচ্ছেদানলের ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইয়াছে—কালক্রমে সেই এক বিন্দু অগ্নি-কণা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত ভারতভূমি ছারখার করিয়া দিল—তবুও তাহার উদর-পূর্ত্তি হইতেছে না; সর্ব্বনাশের বাকি রাখে নাই—তবুও তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না—আরো সর্ব্বনাশ চায়। নিজের বলে আর্য্যভূমিকে যতদূর দগ্ধ করিবার তাহা করিয়াছে—এখন দেশ-বিদেশ হইতে আহুতি যাচিয়া আনিতেছে। ধর্ম্মের মূলগত বিচ্ছেদ কাজে কিরূপ ফলিয়া উঠিয়াছে তাহার যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তবে ভারতবর্ষের অধুনাতন শোচনীয় অবস্থাটি একবার সজল-নয়নে নিরীক্ষণ কর; হত্যাগৃহে অবরুদ্ধ গাভীবৃন্দকে বৎসেরা যেরূপ-নয়নে নিরীক্ষণ করে সেই রূপ নয়নে নিরীক্ষন কর; দেখিবে যে, জ্ঞানবল খুবই দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু সে জ্ঞান প্রাণশূন্য এবং অকর্ম্মণ্য; দেখিবে যে, প্রেম-ভক্তি খুবই মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছে—কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞানশূন্য অন্ধ ভক্তি; দেখিবে যে, বাহুবল খুবই ছাতি ফুলাইয়া বেড়াইতেছে—কিন্তু তাহার ভিতরে না আছে অনুরাগ না আছে জ্ঞান; বাণিজ্য ব্যবসায় কাজ কর্ম্ম অবিশ্রাম চলিতেছে—রাশি রাশি অর্থের পুঁজি হইতেছে—কিন্তু তাহার মধ্যে জ্ঞানও নাই—প্রাণও নাই; দেখিবে যে, ক্ষুদ্র-প্রাণ কর্ম্ম-কার্য্যের মূর্ত্তিই স্বতন্ত্র; তাহার হৃদয় শুষ্ক কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত, মস্তিষ্ক কর্দ্দম পিণ্ডে বিনির্ম্মিত। জ্ঞান সকলেরই পূজার সামগ্রী—কিন্তু শুষ্ক জ্ঞান কিছুই নহে। পুষ্পকে সকলেই মাথায় করিয়া পূজা করে, বক্ষে করিয়া যত্ন করে; কিন্তু শুষ্ক পুষ্পকে গৃহ হইতে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু সেই আদরের সামগ্রী প্রীতি-ভক্তি সর্ব্বজগতেরই আদরের সামগ্রী; যখন অজ্ঞানের অন্ধকারময় গহ্বরে বাস করিয়া অন্ধ ভক্তি হইয়া বাহির হয়, তখন তাহা ভয়ের সামগ্রী! পুষ্প সূর্য্যালোকে নৃত্য করে বলিয়া তাহার বক্ষ সুধার ভাণ্ডার; সর্প অন্ধকারে বাস করে বলিয়া তাহার আপাদ-মস্তক বিষে পরিপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে জ্ঞান-শূন্য অন্ধভক্তি, এবং প্রাণ-শূন্য নীরস জ্ঞান, পুরাকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ক্রমাগতই চলিয়া আসিয়াছে, আর, তাহার ফল হইয়াছে এই যে, কর্ম্ম, যাহা জ্ঞান এবং প্রাণ-রূপী পিতামাতার পুত্র, সে কাহার কথা শুনিবে, তাহা ঠিক্ করিতে না পারিয়া তাহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে যদি বিরোধ না থাকে, তবে একের কথা শুনিলেই দুয়ের কথা শোনা হয়; পিতার অথবা মাতার কথা শুনিলে পিতা এবং মাতা উভয়েরই কথা শোনা হয়; কিন্তু জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে যেখানে মর্ম্মান্তিক বিরোধ, সেখানে একের কথা শুনিতে গেলে অন্যের কথা অমান্য করিতে হয়। এই জন্য জ্ঞান এবং প্রাণের পরস্পর বিরোধের অবস্থায় কর্ম্ম—কি আর করিবে, কর্ম্ম-বেচারী জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়েরই নিকট হইতে সরিয়া

দাঁড়াইয়া জ্ঞান-শূন্য প্রাণ-শূন্য বাহ্যাড়ম্বরেরই শরণাপন্ন হয়। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে তিনের এই প্রকার বিরোধ যেমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ আর কোনো দেশেই নহে; আর, আমাদের সমস্ত দুর্গতি—অতলস্পর্শ অধোগতির—কারণই ঐ।

জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের মধ্যে সৌহার্দ্দবন্ধন যে, কেমন বাঞ্ছনীয়, তাহা অন্ধ প্রকৃতিও আমাদের চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতেছে; বসন্ত কালের লতা পল্লব কুসুমে তিন ভাব আমরা একাধারে মূর্ত্তিমান দেখি—সমুজ্জ্বল ভাব, সরস ভাব এবং সতেজ ভাব; তেমনি মনুষ্যের আত্মা যখন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়, তখন তাহাতেও ঐ তিন সুলক্ষণ একাধারে স্ফূর্ত্তি পায়—জ্ঞানের সমুজ্জ্বল ভাব, প্রেমের সরস ভাব এবং পুণ্যের সতেজ ভাব। এতকাল ভারত-ভূমিতে জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের যে তিন স্রোতস্বতী তিন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই ত্রিবেণী সঙ্গম। কি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল গ্রন্থ, কি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, কি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি—সর্ব্বত্রই জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গম স্পষ্টাক্ষরে দেদীপ্যমান। ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানেরই সঙ্গে লোকে জাগ্রত-নয়নে সজ্ঞান-ভাবে যোগ দিতে পারে, তাহা কেবল নয়—প্রাণের সহিত যোগ দিতে পারে। উপনিষদ্ যে-ধর্ম্মের বীজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের শস্য; উপনিষদে যাহা গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। বীজ যেমন নানা শাখা-উপশাখার মধ্য দিয়া শস্য-রাশি হইয়া উথলিয়া উঠে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই সূর্য্যালোকে সহস্রধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; আর্য্য-ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন বীজ সেইরূপ নানা ধর্ম্ম এবং উপধর্ম্মের মধ্যদিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে—এবং সমস্ত পৃথিবীময় শতধা হইয়া উথলিয়া পড়িতেছে।

জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মের বিরোধ-প্রসূত তুমুল অশান্তির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি স্বর্গীয় শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না! বিরোধ বিচ্ছেদ এবং অমিল আমাদের দেশের অস্থি-মজ্জায় এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুপ্রবিষ্ট যে, তাহা মরিয়াও মরিতেছে না। বিরোধের ভঞ্জনের মধ্যেও—শান্তির অভ্যুদয়ের মধ্যেও—আবার সেই পুরাতন বিরোধ থাকিয়া থাকিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে; ইহা দেখিয়া অনেক শান্তি-প্রিয় ভদ্রজন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু এই সকল ভদ্রজনেরা যাহাকে মনে করিতেছেন—নিরাপদ উপকূল, প্রকৃত পক্ষে তাহা পুরাতন বিভীষিকা; তাঁহারা তরঙ্গ দেখিয়াই অমনি নৌকা হইতে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন—কেহ বা শুষ্ক জ্ঞানের চোরা বালিতে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন, কেহ বা অন্ধভক্তির বাদা বনে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন, কেহ বা জ্ঞান-শূন্য প্রাণ-শূন্য ক্রিয়া-কর্ম্ম এবং বাহ্যাড়ম্বরের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝম্পপ্রদান করিয়াছেন;—তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, যিনি সমস্ত জগতের কাণ্ডারী তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ণধার; তাহা যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত তবে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মতরী হইতে কখনই পশ্চাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন না—তাহা হইলে তাঁহারা কোনো বাধাতেই ভগ্নোদ্যম না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দাঁড় টানিতেন—এত দিনে নৌকা নিরাপদে কূলে উপনীত হইত—এবং সেখান-হইতে যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করিয়া নূতন উদ্যমের সহিত নবনব কল্যাণ-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিত। যাঁহারা মনে করেন যে, বিরোধ

এবং বিশৃঙ্খলা কেবল ব্রাহ্মমণ্ডলীর অভ্যন্তরেই আবদ্ধ, তাহার বাহিরে সকলই শান্তির আলয়—সকলই শোভার ভাণ্ডার—সকলই জ্ঞানের জ্যোতি, তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। তাঁহারা কি জানেন না যে, সমগ্র ভারত-ভূমি বিচ্ছেদ বিরোধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাদলির উত্তপ্ত মরুভূমি? তাঁহারা জানুন্ বা না জানুন্—আমাদের ইহা চক্ষে দেখা কথা যে, চতুর্দ্দিক্স্থ জ্বলন্ত দাবানলের মধ্যে (শুষ্ক জ্ঞান অন্ধভক্তি এবং শূন্য আড়ম্বরের কঠোর সংঘর্ষ-জাত সুবিস্তীর্ণ দাবানলের মধ্যে) ব্রাহ্মধর্ম্ম সরস উপদ্বীপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় উপদ্বীপটির গাত্রে হুতাসনের একবিন্দুও আঁচ লাগিবে না এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়। এ তো জানাই আছে যে, জ্বলন্ত হুতাশনের শত সহস্র ভুজঙ্গ-ফণা তাহাকে শত সহস্র দিক্ হইতে তাড়াইয়া আসিয়া আক্রমণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু আর তুলারাশি নহে যে, তাহা অগ্নিকে ভয় করিবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুজ্জ্বল সুবর্ণ—অগ্নিতেই তাহার বিশিষ্টরূপে গুণ-পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার মুখ কত না উজ্জ্বল হইবে।

মহান্ প্রভু পরমেশ্বর আমাদের ধ্রুবতারা ইহা না দেখিয়া অনেকে এই ভাবিয়া সারা হন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের কুল-কিনারা কোথায়! কেবলি ঘূর্ণার ঘোর! সম্মুখে নূতন অপরিচিত পথ! এক আবর্ত্ত ছাড়াইলে আর এক আবর্ত্ত! নিম্নে রসাতল মুখ ব্যাদান করিতেছে! উত্তুঙ্গ তরঙ্গ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে এবং সম্মুখ হইতে পশ্চাতে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে—কোথায় যাইতেছি তাহার কিছুই ঠিকানা নাই!" এইরূপ মনে করিয়া যাঁহারা হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজেরই কার্য্য তাঁহাদের নিজের বিরুদ্ধে এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অটল মুখ-জ্যোতি জ্ঞানেও নিরীক্ষণ করেন না এবং তাঁহার অমৃত প্রসাদ-বারি প্রাণেও অনুভব করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে লাভালাভ গণনা এবং প্রাণাভ্যন্তরে লোকভয় এই দুই প্রভাপান্বিত প্রভু সর্ব্বোচ্চ দেবসিংহাসনে উপবিষ্ট। এইটি তাঁহাদের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য যে, সুখশান্তির সুবাতাস ঈশ্বরের হস্তে—কর্ত্তব্য সাধনের হাল এবং দাঁড় আমাদের প্রতিজনের নিজের হস্তে। বায়ু যেমনই বহুক্ না কেন—যে দিকেই বহুক্ না কেন, কাণ্ডারীগণকে কূলের দিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া দৃঢ় রূপে হাল ধরিয়া থাকিতেই হইবে, এবং দাঁড়িদিগকে দাঁড় টানিতেই হইবে—তাহাতে একটুও শৈথিল্য করিলে চলিবে না। একই সময়ে আমাদিগকে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে—ঈশ্বরের দান এবং আমাদের নিজের নিজের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের দান ঈশ্বরের হস্তে এবং আমাদের নিজের কর্ত্তব্য আমাদের নিজের হস্তে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সকল প্রকার কার্য্যের অভ্যন্তরেই দুই হস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে—এক হস্ত আমাদের নিজের এবং আর এক হস্ত ঈশ্বরের। চক্ষু দ্বারা বস্তু-দর্শন যাহা আমরা প্রতি নিয়তই করিতেছি—তাহারো অভ্যন্তরে দুই হাত যুগপৎ কার্য্য করিতেছে; চক্ষুরুন্মীলন করা আমাদের আপনাদের হাত এবং সূর্য্যালোক প্রেরণ করা ঈশ্বরের হাত। আমরা সাধক, ঈশ্বর সিদ্ধিদাতা বিধাতা; সাধন আমাদের হস্তে—সিদ্ধি ঈশ্বরের হস্তে,—এই কথাটি যেন আমাদের মনোমধ্যে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।

কর্ত্তব্য সাধনের মধ্যেও দুই হাত—বালকের হাত এবং ধাত্রীর হাত। বালক কে?

না আমাদের প্রতি-জনের নিজের স্বাধীন চেষ্টা; ধাত্রী কে? না আমাদের দেশের সামাজিক এবং গার্হস্থ্য পৈতৃক সংস্কার। মাতা যেমন বালকের সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীকে প্রেরণ করেন—ঈশ্বর তেমনি সাধকের স্বাধীন চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-পরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বাধীন চেষ্টা-টি জ্ঞান-মূলক এবং পৈতৃক সংস্কার-টি প্রাণ-মূলক, ইহা বলা বাহুল্য। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করা আর কিছু নয়—বুঝিয়া সুঝিয়া কার্য্য করা—সচেতন-ভাবে কার্য্য করা—জ্ঞানের সহিত কার্য্য করা। প্রাণের সহিত কার্য্য করা কি? না পুরুষপরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার যাহা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে বদ্ধমুল রহিয়াছে এবং বাহির হইতে উপলক্ষ উপস্থিত হইলেই যাহা ভিতর হইতে উথলিয়া উঠে, সেই চিরাগত পৈতৃক সংস্কার অনুসারে কার্য্য করা'র নামই প্রাণের সহিত কার্য্য করা। পৈতৃক সংস্কারকে উচ্ছেদ করা কোনোগতেই বিধেয় নহে; বিধেয় কি? না স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানের অনুগত হইয়া কু হইতে সু বাছিয়া লওয়া। ভারতবর্ষের মর্ম্মগত অস্থিগত মজ্জাগত একটি সুমঙ্গল ভাবসূত্র যাহা পুরাতন কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত নানা দেশের নানা আচার ব্যবহারে মাটিচাপা পড়িয়াও অখণ্ডিত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে—সেই প্রীতি-ভক্তি-স্নেহের কুসুমবিকাশ—সেই পুণ্যের প্রশান্ত তেজস্বিতা—সেই অমায়িক সর্ব্বলোক-হিতৈষিতা—যাহা অন্তঃশিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অস্থি মজ্জার অভ্যন্তরে অদৃশ্য ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই আমাদের দেশের প্রাণ—তাহাই আমাদের দেশের পৈতৃক সংস্কার। দেশের মর্ম্ম-নিহিত প্রাণকে—পৈতৃক সংস্কারকে উচ্ছেদ করিলে, যে শাখায় আমরা উপবিষ্ট সেই শাখার মূলোচ্ছেদ করা হয়; কখনই তাহা বিধেয় নহে। বিধেয় কি? না প্রাণের অন্ধ স্ফূর্ত্তিকে—পৈতৃক সংস্কারের মূঢ় উত্তেজনাকে—স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানের নিয়মে নিয়মিত করা। স্ফূর্ত্তিকে সুনিয়মে নিয়মিত করা স্বতন্ত্র এবং উচ্ছেদ করা স্বতন্ত্র। অশ্বকে রাস-রজ্জু দ্বারা নিয়মিত করিলে তাহাকে মারিয়া ফেলা হয় না—বরং তাহা না করিলে সারথী অচিরে বিপদ্গ্রস্ত হয়। আমাদের দেশের সেই যে মর্ম্মনিহিত প্রাণ, কিনা পুরুষপরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার, তাহা আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য-কার্য্যের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধাত্রী এবং এই ধাত্রীর হাত ধরিয়াই আমাদের স্বাধীন চেষ্টা নবোন্মেষিত জ্ঞানের আলোকে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হয়। এই ধাত্রীর হাত ছাড়িয়া দিলে আমাদের কিরূপ দুর্গতি হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে কর একটি নবপ্রসূত বালককে জন-শূন্য অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া আসা গেল। আর, মনে কর একটা বন-মানুষী তাহাকে স্বীয় স্তন্য দুগ্ধে লালন পালন করিয়া তাহাকে বিধিমত হৃষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ যুবা করিয়া দাঁড় করাইল। ক্রমে সেই মনুষ্য-টি তাহার অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে বনমানুষদিগের দলপতি হইল; ইতি মধ্যে একজন মস্তিষ্কতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহার মাথা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাহার ধীশক্তি মেধা ভক্তি শ্রদ্ধা ধর্ম্মনিষ্ঠা অসাধারণ তেজস্বী; এরূপ সত্ত্বেও আমাদের দেশের একজন কৃষি-বালক যাহা জানে তাহাও সে জানে না, ও তাহার সমস্ত আচার ব্যবহার বন-মানুষের মতো। পুরুষপরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার হইতে—ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ধাত্রী হইতে—বিচ্ছিন্ন হইলে, স্বাধীন-চেষ্টার দশা এইরূপই হয়। ঘোড়া বা গাধা ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই ঘোড়া বা গাধা হয়, কিন্তু মনুষ্যকে ধাত্রী মানুষ না করিলে মনুষ্য

মানুষ হয় না ; সে ধাত্রী কে ? না পুরুষ-পরম্পরাগত পৈতৃক সংস্কার। নিকৃষ্ট জীব-দিগের যত কিছু সংস্কার আছে সমস্তই নৈসর্গিক সংস্কার। মনুষ্যেরই মধ্যে কেবল এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যেমন কার্য্য করে তাহার তেমনি সংস্কার জন্মে—আর, সেই সংস্কার ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের প্রাণের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল হইয়া দ্বিতীয় প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কার শব্দের অর্থ আর কিছু নয়—অভ্যাসের গুণে কার্য্যের প্রবৃত্তি প্রাণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া গেলে তাহাকেই আমরা বলি—সংস্কার। চিরাভ্যস্ত সংস্কারকে ছাড়িয়া থাকা আর প্রাণকে ছাড়িয়া থাকা—একই। নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন মনুষ্যের প্রাণেরই ব্যাপার—অভ্যস্ত সংস্কার অনুসারে চলাও তেমনি মনুষ্যের প্রাণেরই ব্যাপার। শরীরের প্রাণ কি ? না জীবন ;—মনের প্রাণ কি ? না সংস্কার ; দুইই প্রাণ। মনুষ্যের সেই যে মনের প্রাণ (শরীরের প্রাণ নহে) মনের প্রাণ —কিনা অভ্যস্ত সংস্কার, তাহা দুইটি অব-য়বের সংঘাত ; একটি অবয়ব পৈতৃক সং-স্কার, আর একটি অবয়ব স্বোপার্জ্জিত সং-স্কার। পৈতৃক সংস্কারটিই মূল ধন ;—স্বোপার্জ্জিত সংস্কারটি সেই মূল ধনের উপস্বত্ব ; তাহার মধ্যে প্রধান একটি বিবেচ্য এই যে, মূলধনটি অমনি পাওয়া যায়, উপ-স্বত্বটি ফলাইয়া তুলিতে হয়—কাজেই ইহাতে স্বাধীন চেষ্টা অপেক্ষিত হয়। কেবল-মাত্র স্বাধীন-চেষ্টাতে কিছুই হয় না—মূল ধনের উপর স্বাধীন-চেষ্টা খাটাইলে তবেই তা-হাতে ফলোৎপত্তি হয়। বন-মানুষদিগের মধ্যে আজন্ম-কাল বাস করিলে, মনুষ্যের স্বাধীন-চেষ্টা ব্যর্থ হয় কেন ? না যেহেতু জন্মিয়া অবধি সে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির মুখাবলোকন করিতে পায় নাই—পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত সংস্কার তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে মূল গাড়িতে পায় নাই—তাই তাহার স্বাধীন চেষ্টার এরূপ শোচনীয় অবস্থা। অতএব ইহাতে আর সংশয়-মাত্র নাই যে, মনুষ্যের চিরাগত পৈতৃক সংস্কার তাহার স্বোপার্জ্জিত সংস্কারের ভিত্তি-ভূমি। মনুষ্য সেই চিরাগত পৈতৃক সংস্কারের হাত ধরিয়াই ধর্ম্ম-পথে চলিতে আরম্ভ করে—প্রাণের হাত ধরিয়াই জ্ঞানের পথে চলিতে আরম্ভ করে ;—পৈতৃক সংস্কারই মনুষ্যের প্রাণের অভ্যন্তরে মিশিয়া প্রাণ হইয়া দাঁ-ড়ায় ; এবং সেই সংস্কার-রূপী প্রাণই নব-প্রসূত জ্ঞানের ধাত্রী। মনুষ্য যদি প্রথমে ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া চলিতে না শেখে, তবে সে ক্রমাগতই হামাগুড়ি দেয়। পৈতৃক সংস্কার মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের ভিত্তিমূল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ; কিন্তু শুধু ভিত্তিমূলে কিছুই হয় না। পৈতৃক সংস্কা-রের ভিত্তি-মূলের উপরে স্বোপার্জ্জিত সং-স্কারের গৃহ-প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। পৈতৃক সম্পত্তিও এককালে কাহারো না কাহারো স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ছিল ;—তাহা আমার স্বোপার্জ্জিত না হউক, আমার পিতার স্বো-পার্জ্জিত—পিতার স্বোপার্জ্জিত না হউক্ পিতামহের স্বোপার্জ্জিত—কাহারো না কা-হারো স্বোপার্জ্জিত তাহাতে আর ভুল নাই ; সর্ব্বাংশে না হউক—অন্ততঃ কতক অংশে স্বোপার্জ্জিত। ধাত্রী যখন বালককে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, তখনও কি সে ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলিবে ? তাহা হইতেই পারে না। ধাত্রীর কার্য্য ধাত্রী করিয়া চুকিয়াছে—এখন নিজের কার্য্য নিজে করিতে হইবে। বালক কোকিলের ন্যায় পরভৃত ; তাহাকে অন্যে মানুষ করে। কিন্তু তাহার বয়স পাকিয়া উঠিলে ধাত্রীর কার্য্যটি তাহাকে নিজের হাতে টানিয়া লইতে হইবে—আপ-

নাকে আপনি মানুষ করিতে হইবে—তা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই প্রসঙ্গে অতীব একটি গুরুতর কথা সবিশেষ বিবেচ্য—সেটি এই যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য চিরকালই শিশু। এই জন্য ঈশ্বর চিরকালই মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে এক না এক ধাত্রী সংযুক্ত করিয়া রাখেন—কোনো কালেই মনুষ্যকে একা ছাড়িয়া দে'ন না। প্রথম ধাত্রী মাতা, দ্বিতীয় ধাত্রী পিতা, তৃতীয় ধাত্রী আচার্য্য, চতুর্থ ধাত্রী সমাজ, পঞ্চম ধাত্রী ঈশ্বর স্বয়ং। যখন আমরা মাতার হস্ত হইতে পিতার হস্তে সমর্পিত হই, তখন আমরা স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরের প্রথম ধাপে আরোহণ করি; যখন আমরা পিতার হস্ত হইতে আচার্য্যের হস্তে সমর্পিত হই, তখন আমরা আত্ম-নির্ভরের দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করি; যখন আমরা আচার্য্যের হস্ত হইতে সমাজের হস্তে সমর্পিত হই, তখন আমরা আত্মনির্ভরের তৃতীয় ধাপে আরোহণ করি; যখন সমাজের হস্ত হইতে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পিত হই তখন আমরা স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরের আর-এক উচ্চতর সোপানে (প্রথম ধাপের মুক্তিতে) উপনীত হই। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য চিরকালই শিশু;—চিরকালই মনুষ্যকে ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলিতে হয়—এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-নির্ভর শিখিতে হয়। চিরকালই মনুষ্যকে প্রাণের হস্ত ধরিয়া জ্ঞান এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, চিরকালই ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া চলা উচিত হয় না; এখন বলিতেছি—চিরকালই ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া না চলিলে, মানুষের গত্যন্তর নাই; দুই কথার তাৎপর্য্য দুই রূপ; প্রথম কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, এখন যে ধাপে আছ সেই ধাপের ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলা চিরকালই শোভা পায় না—স্বাধীন-চেষ্টা সহকারে উচ্চ ধাপে আরোহণ করা কর্ত্তব্য; দ্বিতীয় কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, সেই উচ্চতর ধাপে ঈশ্বর তোমার জন্য উচ্চতর ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন;—কোনো ধাপেই ঈশ্বর তোমাকে একাকী অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবেন না। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, তুমি যে কোনো ধাপে যে কোনো ধাত্রীর হস্তে থাকো না কেন—প্রত্যেক ধাপেই, ধাত্রীর হাত না ধরিয়া আপনি চলা শিক্ষা করিতে হইবে এবং নীচের ধাপে স্বাধীন ভাবে চলিতে না শিখিলে উপরের ধাপে উঠিবার অধিকার তোমাতে বর্ত্তিবে না। প্রত্যেক ধাপেই মনুষ্যকে এক দিকে যেমন প্রাণের এবং প্রেমের হাত ধরিয়া চলা চাই, আর একদিকে তেমনি জ্ঞানের নিয়মানুসারে স্বাধীনভাবে চলিতে শেখা চাই; জ্ঞান এবং প্রাণ দুইই আবশ্যক। পরমাত্মা যেমন জ্ঞান-স্বরূপ, তেমনি তিনি প্রাণ-স্বরূপ; জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে বাস্তবিক কোনো অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নাই;—একবারকার যাহা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি আর একবারকার তাহাই পৈতৃক সম্পত্তি; একবারকার যাহা জ্ঞান আর একবারকার তাহাই প্রাণ;—উপসত্ত্ব যেমন মূলধনের সহিত সংযুক্ত হইয়া মূলধনেরই অন্তর্ভূত হয়, তেমনি জ্ঞানের নিয়মানুযায়ী স্বাধীন কার্য্য অভ্যাস-গুণে প্রাণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দ্বিতীয় প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রাণ—এক, জ্ঞান দুই, এবং জ্ঞানে প্রাণে মিলিয়া মিশিয়া উচ্চতর প্রাণ—তিন। এইরূপ সোপান-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞান এবং প্রাণের তরঙ্গমালা উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে থাকে। এক হইতে যেমন করিয়া দুই তিন হয়, তিন হইতে তেমনি করিয়া চার পাঁচ হয়, পাঁচ হইতে তেমনি

করিয়া ছয় সাত হয়—ইহা বলা বাহুল্য। এক হইতে কেমন করিয়া দুই তিন হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, তাহা হইলেই এক হইতে কেমন করিয়া শত সহস্র হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পৃথিবীতে প্রথম আগমনের সময় শিশু-বালক যখন জ্ঞানেও কিছু জানে না এবং স্বাধীন চেষ্টাতেও কোনো-রূপ কার্য্য করে না, তখন সে শুদ্ধ কেবল প্রাণের হাত ধরিয়া চলিয়া ভাষা শিক্ষা করে। মাতা পিতা ধাত্রী প্রভৃতির কথাবার্ত্তা আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গী তাহার কোমল মনে চিরকালের মতো বদ্ধমূল হইয়া যায়—এইরূপ করিয়া তাহার মনোমধ্যে মাতৃভাষার একটা দুরপণেয় সংস্কার দাঁড়াইয়া যায়; আর, এই আজন্ম-সংস্কারটিই মাতৃভাষার প্রাণ-স্বরূপ। পরে সেই বালক বাড়িয়া উঠিয়া উপযুক্ত বয়সে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়িয়া সহস্র পণ্ডিত হউন্ না কেন—ভাষার সেই গোড়ার সংস্কারটিকে ছাড়িয়া, প্রাণটিকে ছাড়িয়া, তিনি একপদও সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালির মনের অভ্যন্তরে বাঙ্গলা ভাষার সেই মর্ম্মগত প্রাণ সর্ব্বক্ষণ জাগিতেছে বলিয়া সেই প্রাণের সঙ্গে যখন ব্যাকরণ-জ্ঞানের সংযোগ হয়, তখন সেই জ্ঞান এবং প্রাণ দুয়ের সমবেত সাহায্যে বঙ্গভাষার ব্যবহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া উঠে। একজন বিদেশী ব্যক্তি বঙ্গভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধান খুবই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু তবুও সে বঙ্গভাষার প্রাণটিকে—পৈতৃক সংস্কারটিকে—নাগাল না পাওয়াতে, একছত্র বাঙ্গলা লিখিতে দশগণ্ডা ভুল করিয়া বসে। শিশু ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া যেমন করিয়া চলিতে শেখে—তেমনি করিয়া সংস্কারের হস্ত ধরিয়া ইতর ভাষা অবলীলা ক্রমে শিখিয়া ফেলে; এই বৃত্তান্তটিকে "এক" বলিয়া ধর; দুই কি? না শিশু যখন পঠদ্দশায় উপনীত হয় তখন সেই প্রাণের শিক্ষাকে জ্ঞানের নিয়মানুসারে নূতন করিয়া শিক্ষা করে; নূতন ভাষা শিক্ষা করে না, কিন্তু শিক্ষিত ভাষাকে নূতন করিয়া শিক্ষা করে। ইতিপূর্ব্বে সে কথা কহিতে শিখিয়াছে এখন সে কথা কহিবার নিয়ম শিখিতেছে। এই দ্বিতীয় বৃত্তান্তটিকে দুই বলিয়া ধর। তিন কি? না কৃতবিদ্য ছাত্র পূর্ব্ব-শিক্ষিত প্রাণের ভাষাকে নূতন-শিক্ষিত জ্ঞানের নিয়মে নিয়মিত করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে; এই তৃতীয় বৃত্তান্তটিকে তিন বলিয়া ধর। প্রথম, মাতৃক্রোড়ে ইতর ভাষার শিক্ষা লাভ—ইহাতেই ভাষার প্রাণ-স্ফূর্ত্তি হয়; দ্বিতীয়, বিদ্যালয়ে ব্যাকরণাদি শিক্ষা—ইহাতে ভাষার জ্ঞান জন্মে; তৃতীয়, সেই জ্ঞান এবং প্রাণের সমবেত সাহায্যে সাধু-ভাষার ব্যবহার—ইহাতে ভাষার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এইরূপে আমরা এক দুই তিন পাইলাম। চার পাঁচ ছয় ইহারই ধারাবাহিক অনুবৃত্তি। সাধুভাষা যখন আপামর সাধারণের প্রাণে মিশিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে—তখন, এখনকার যাহা সাধু-ভাষা তখনকার তাহা ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে; এখন যাহা জ্ঞানের ফল, তখন তাহা প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে; এখন যাহা স্বোপার্জ্জিত তখন তাহা পৈতৃক হইয়া দাঁড়াইবে। তিনের পরে চার কি? না এখনকার সাধু ভাষা তিন; এবং এখনকার সাধুভাষা যখন ভবিষ্যতের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া ভবিষ্যতের ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে—তখনকার সেই বৃত্তান্ত-টিকে চার বলিয়া ধরা যাইতে পারে; তাহার পরে যখন উচ্চতর ব্যাকরণের নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে—তাহাই পাঁচ; এবং তাহার সাহায্যে যখন উচ্চতর সাধু-ভাষা পরিগঠিত হইবে—তাহাই

ছয়; চার পাঁচ ছয় এক দুই তিনেরই অনুবৃত্তি। প্রথমে প্রাণ, তাহার পরে জ্ঞান, তাহার পরে জ্ঞান এবং প্রাণের সংঘাত-জনিত উচ্চ অঙ্গের প্রাণ; আবার উচ্চতর জ্ঞান, আবার উচ্চতর প্রাণ; এইরূপে জ্ঞান-প্রাণের তরঙ্গমালা ক্রমাগতই উচ্চে হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে থাকে।

বীজের অভ্যন্তরে যেমন শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প সমস্তই একীভূত হইয়া অবস্থান করে, মনুষ্যের আত্মার অভ্যন্তরে তেমনি জ্ঞান এবং প্রাণ মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া অবস্থান করে। আবার, বীজ হইতে যেমন প্রথমে কোমল অঙ্কুর এবং পত্র পরিস্ফুট হয় ও তাহার পরে কোমল-কোমল পত্রের বৃন্ত-মূল হইতে শাখা প্রশাখা উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত হয়; মনুষ্য-জীবনেও তেমনি প্রথমে সুকোমল প্রাণ পরিস্ফুট হয়, তাহার পরে উত্তরোত্তর-ক্রমে জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়। মাতৃ-দুগ্ধে যেমন-করিয়া বালকের শারীরিক প্রাণ পরিগঠিত হয়, মাতৃভাষা হইতে তেমনি-করিয়া বালকের মানসিক প্রাণ পরিগঠিত হয়, সে মানসিক প্রাণ আর কিছুই নহে—স্বদেশীয় সংস্কার। স্বদেশীয় সংস্কারের মধ্যে অনেক অসার বস্তু থাকিতে পারে; পৃথিবীতে যেখানে যত সার বস্তু আছে তাহাই অসার বস্তুতে পরিবৃত; এমন যে উপাদেয় বস্তু—ধান্য, তাহাও তুষে পরিবৃত; এমন যে স্বর্গীয় সুধা মাতৃ-দুগ্ধ তাহারও অসার হেয় অংশ আছে; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, তুষের দোষে ধান্যের প্রতি বিমুখ হয়—মাতৃ-দুগ্ধের হেয়-ভাগের দোষে মাতৃস্তনে বিমুখ হয়—স্বদেশীয় সংস্কারের কু-অংশের দোষে স্বদেশীয় সংস্কারের প্রতি সমূলে বিমুখ হয়। সকল দেশেরই স্বদেশীয় সংস্কার সুয়ে কুয়ে জড়িত—আমাদের দেশেরও স্বদেশীয় সংস্কার সুয়ে কুয়ে জড়িত; কিন্তু তাহাতে কি? তুমি একজন পরম কৃতবিদ্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি—তুমি যদি স্বদেশীয় সংস্কারের সুকে কু হইতে পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লইতে না পার, তবে তোমার জ্ঞান কিসের জন্য? আপনাদের কু হইতে যদি আপনাদের সু বাছিয়া লইতে না পার—তবে অন্যের কু হইতে কেমন করিয়া অন্যের সু বাছিয়া লইবে? তাহা তো হইতেই পারে না! ইংরাজ জর্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য লোকেরা আমাদের দেশের শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যত সু আছে তাহার অমৃত-রস এতকালের পরে—এখন—আস্বাদন করিতেছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহারা তাঁহাদের আপনাদের কু হইতে সুকে বাছিয়া তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন—এবং তাহারই গুণে তাঁহারা আমাদের দেশের সু'য়ের রসাস্বাদনে অধিকারী হইয়াছেন। যাহার বক্ষে আমরা শৈশব কাল হইতে লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি—সেই সকল স্বদেশীয় গার্হস্থ্য এবং সামাজিক সংস্কারের রসাস্বাদন করা এবং মাতার স্তন্য দুগ্ধের রসাস্বাদন করা—একই কথা। স্বদেশীয় সংস্কারের রসাস্বাদন করা প্রাণের কার্য্য;—জ্ঞানের কার্য্য কি? না জঠরানল যেমন স্তন্য দুগ্ধের সারভাগ আত্মসাৎ করে, অসার ভাগ পরিত্যাগ করে, জ্ঞানানল তেমনি সংস্কারের সু-ভাগ আত্মসাৎ করে এবং কু-ভাগ পরিত্যাগ করে;—কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না—অন্ন উদরস্থ না হইলে জঠরানল কিছুই করিতে পারে না; স্বদেশীয় সংস্কার প্রাণে রীতিমত বদ্ধ-মূল না হইলে জ্ঞান একাকী কিছুই করিতে পারে না। প্রাণের তৃপ্তি-সাধক অন্ন হইতে সার মন্থন করিয়া লইয়াই জ্ঞান উচ্চতর প্রাণের মূল-পত্তন করে। প্রাণকে ছাড়িয়া জ্ঞান কিছুই করিতে পারে না;

চিরাগত পৈতৃক সংস্কারকে ছাড়িয়া স্বাধীনতা কিছুই করিতে পারে না। আবার, জ্ঞানকে ছাড়িয়াও প্রাণ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারে না; জাগ্রত জ্ঞান এবং স্বাধীন চেষ্টা ব্যতিরেকে—পৈতৃক সম্পত্তিরও উন্নতি হইতে পারে না—পৈতৃক সংস্কারেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞানও চাই, প্রাণও চাই,—দুয়ের কেহই কাহারো ছোটো নহে কেহই কাহারো বড় নহে—দুইই সমান।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে বিরোধই আমাদের দেশের সমস্ত বিরোধের মূল, আর, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই বিরোধ ভঞ্জন করিবার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভাষার দৃষ্টান্তে এই কথাটি আরো স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইতর-ভাষাই ভাষার প্রাণ। ব্যাকরণাদির জ্ঞান সেই প্রাণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া একপ্রকার কৃত্রিম সাধুভাষা গড়িয়া তুলিতে পারে, কিন্তু সে সাধু-ভাষা আর কিছু নয়—নির্জীব নিস্তেজ নীরস ভট্টাচার্য্য ভাষা; তাহার ভিতরে প্রাণ নাই। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, ইতর ভাষা ব্যাকরণাদিজ্ঞানের সহিত বিরোধ করিয়া সাহিত্যসমাজে আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে;—কিন্তু সেরূপ ইতর-ভাষা অতীব নীচ-শ্রেণীর গ্রাম্য ভাষা। জ্ঞান এবং প্রাণের বিরোধ হইতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা প্রসূত হয়—প্রাণ-শূন্য ভট্টাচার্য্য ভাষা এবং জ্ঞান-শূন্য গ্রাম্য-ভাষা; দুয়ের কোনোটিই বিশুদ্ধ সাধুভাষা নহে। ইতর-ভাষার প্রাণ স্ফূর্ত্তি—ব্যাকরণাদির জ্ঞানমূলক নিয়মে নিয়মিত হইয়া যে এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা প্রসব করে সেই জ্ঞান-প্রাণের সংযোগাত্মক ভাষাই বিশুদ্ধ সাধু ভাষা। এই দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এইটি দেখানো যে, জ্ঞান এবং প্রাণ দুয়ের যোগ ব্যতীত কোনো কর্ত্তব্য কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে তিনরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল; (১) অবিশুদ্ধ গ্রাম্য ইতর ভাষা; ইহাই প্রাণের ভাষা ছিল। (২) নীরস ভট্টাচার্য্য ভাষা; ইহাই জ্ঞানের ভাষা ছিল। (৩) এবং জ্ঞানশূন্য প্রাণশূন্য আদালতি ভাষা; ইহাই কার্য্যের ভাষা ছিল। ভাষার এ যেমন দেখা গেল—ধর্ম্মেরও অবিকল সেইরূপ দশা ঘটিয়াছিল; একদিকে অন্ধ ভক্তি, আর এক দিকে শুষ্ক জ্ঞান, আর-এক দিকে ক্রিয়াকাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বর, এইরূপ তিন সহোদর—জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্ম—পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া তিন-দিকে ছট্‌কিয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাবের পর হইতে ভাষার তিন অবয়ব একত্র ঘনীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে বঙ্গভাষার শ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সাধু-ভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে;—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানাদির ভাষাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তরের লক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে দেদীপ্যমান—কি? না জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গম।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মন্তব্য কথা দুইটি;—প্রথম মন্তব্য কথা এই যে জ্ঞান এবং প্রাণ দুয়ের সমবেত সাহায্য ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। জ্ঞানকে ছাড়িয়া প্রাণ অর্থাৎ প্রীতি-ভক্তি—অন্ধ; প্রীতি ভক্তিকে ছাড়িয়া জ্ঞান—পঙ্গু। জ্ঞানের নিয়ম এবং প্রেমের আদর্শ এই দুয়ের যুগল আধিপত্যেই কর্ত্তব্য-সাধনে বল পৌঁছে। জ্ঞান এবং প্রাণ এ দুই পদার্থ মূলে একই বস্তু; প্রাণের চক্ষু ফুটিলেই তাহা জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়—জ্ঞানে বল পৌঁছিলেই তাহা প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। নবোন্মেষিত জ্ঞানের

নিয়ম সকল যখন অভ্যাস-গুণে তোমার প্রাণের মধ্যে বসিয়া যাইবে, তখন দেখিতে পাইবে যে, এখনকার জ্ঞান তখনকার প্রাণ; দেখিতে পাইবে যে, এখন যাহা তুমি দূর হইতে জ্ঞান-নেত্রে অবলোকন করিতেছ তখন তুমি তাহা হাত বাড়াইয়া মুষ্টির মধ্যে পাইয়াছ। এই জন্য, প্রথম মন্তব্য কথা এই যে, জ্ঞান এবং প্রাণকে একতানে মিলিত করিয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বিতীয় মন্তব্য কথা এই যে, সাধন আমাদের নিজের হস্তে, সিদ্ধি ঈশ্বরের হস্তে। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সাধন করিলে ঈশ্বরের দান ঈশ্বর দিবেন—ইহা একটি যৎপরোনাস্তি ধ্রুব তত্ত্ব। ঈশ্বরের মতো ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা আর কাহারো নাই—সমস্ত জগৎই ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ; ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ; ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে—সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। তিনি জগতের মঙ্গল চা'ন বলিয়া জগৎ তাঁহাকে ভয় করে; পাছে প্রাণের প্রাণ মঙ্গলময় পরম পিতা এবং পরম সুহৃৎ কোনো কিছুর ত্রুটি দেখেন—এই ভয়;—এ ভয় শাসনের ভয় নহে—ভক্তির ভয়। সাধনের সঙ্গে সিদ্ধি যোগ করিয়া দিবার জন্য—তাঁহারই আজ্ঞায় সমস্ত জগৎ ব্যস্ত রহিয়াছে। যেমন সাধন তেমনি সিদ্ধি—এ কথাটি শুধু কেবল পরীক্ষার কথা নহে—ইহা পরীক্ষার মূলের কথা; সহস্র পরীক্ষা এ কথার তিলমাত্রও অন্যথা করিতে পারে না। আমরা যদি স্বচক্ষেও দেখি যে, এক ব্যক্তি কাজ করিল অতীব উত্তম—ফল হইল অতীব মন্দ, তবুও আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে, ভাল কাজের ফল কখনই মন্দ হইতে পারে না; আমরা বলিব যে, হয় অনুষ্ঠিত কার্য্যটির গোড়ায় এরূপ কোনো দোষ প্রচ্ছন্ন আছে, যাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না; নয় তাহার ফল ফলিবার সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই—দুয়ের এক। জগতের সর্ব্বত্রই আমরা এই যে একটি অব্যভিচারী ধ্রুব নিয়ম দেখিতে পাই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া—যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত, এ নিয়মটি কেমন সুবিচার-সঙ্গত—কেমন সুযুক্তি-সংগত—কেমন জ্ঞান-সঙ্গত! নির্ব্বোধ মনুষ্যের বিচারে কত শত স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, একগুণ আঘাত—দশগুণ প্রতিঘাত, ইহাতে কেবল এইটিই প্রকাশ পায় যে, মনুষ্য-জ্ঞানের খদ্যোত-জ্যোতি মোহ-তিমিরে আচ্ছন্ন! সর্ব্বজগতের মূলে একই অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ নিয়ন্তা অবিচলিতরূপে বর্ত্তমান—মোহ-অন্ধকার তাঁহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না; তাই অন্ধ জড় জগৎও জ্ঞান-সঙ্গত যুক্তি-সঙ্গত বিচার-সঙ্গত নিয়মে নিরন্তর নিয়মিত হইতেছে। সমস্ত জড়জগৎ একবাক্যে এই নিয়মটি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া—যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত, তাহার এক চুলও বেশী নহে—এক চুলও কম নহে। জড় পদার্থেরাই কি কেবল জ্ঞান-সঙ্গত যুক্তি-সঙ্গত এবং বিচার-সঙ্গত নিয়মে নিয়মিত হইবে; আর, জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরাই কি কেবল অযুক্তি-সঙ্গত এবং অবিচার-সঙ্গত নিয়মে নিয়মিত হইবে—তাহা হইতেই পারে না। নিয়মের অর্থই হ'চ্চে জ্ঞান-সঙ্গত নিয়ম—যুক্তি-সঙ্গত নিয়ম। যে নিয়ম অজ্ঞান-সঙ্গত অযুক্তি-সঙ্গত অবিচার-সঙ্গত, তাহা তো নিয়ম নহে—তাহা ঘোরতর অনিয়ম! যদি এরূপ নিয়ম করা যায় যে, একগুণ আঘাত—তাহার শতগুণ বা সহস্র-গুণ প্রতিঘাত, তবে সেরূপ নিয়ম কখনই নিয়ম-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; তাহা অনিয়ম অপেক্ষাও অনিয়ম—তাহা নিয়মবদ্ধ অনিয়ম। জ্ঞান-

সঙ্গত ন্যায়ের নিয়মই নিয়ম—অজ্ঞান-সঙ্গত অন্যায়ের নিয়ম নিয়মই নহে—তাহা অনিয়মেরই নামান্তর। একই অদ্বিতীয় জ্ঞান-সঙ্গত মূল নিয়মে সমস্ত জগতের আদ্যোপান্ত নিয়মিত হইতেছে—সে নিয়ম এই যে, যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত। জ্ঞান-সঙ্গত নিয়মের মূলে জ্ঞান নাই—আর সূর্য্যালোকের মূলে সূর্য্য নাই—দুইই অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য। অজ্ঞান-সঙ্গত নিয়ম বলিলে অনিয়ম ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না; সুতরাং নিয়ম বলিতে জ্ঞান-সঙ্গত নিয়মই বুঝায়; অতএব সমস্ত জগতের মূলে যদি একই অদ্বিতীয় কোনো প্রকার মূল নিয়ম থাকে—তবে সে নিয়ম অবশ্যই জ্ঞান-সঙ্গত, যুক্তি-সঙ্গত, বিচার-সঙ্গত, তাহাতে আর তিল-মাত্রও সংশয় নাই; আর সেই একই অদ্বিতীয় জ্ঞান-সঙ্গত নিয়মের মূলে একই অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান। একই সূর্য্যালোক যেমন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ, তেমনি একই অদ্বিতীয় মূল নিয়ম সমস্ত জগতের প্রাণ; এবং একই অদ্বিতীয় সূর্য্য যেমন সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু, তেমনি একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা সমস্ত জগতের চক্ষু। সমস্ত জগতের একই অদ্বিতীয় মূল নিয়ম এই যে, যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া—যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত। একজন অনভিজ্ঞ লোক মনে করিতে পারে যে, ঐ যে জ্ঞান-সঙ্গত মূল নিয়ম উহা জড়-জগতেরই নিয়ম—জ্ঞান-জগতে উহা খাটে না; ইহাঁদের মনের ভাব এই যে, অনিয়ম এবং স্বেচ্ছাচারই জ্ঞান-জগতের একমাত্র নিয়ম। ইহাঁরা আপনাদের মনোগত ভাব জগতের মূলে আরোপ করিয়া জগতের এক অদ্বিতীয় চক্ষুকে অন্ধ মনে করেন—এবং এক অদ্বিতীয় হস্তকে বলহীন মনে করেন। মনে কর, মাঝগঙ্গা দিয়া ধূম-পতাকা উড়াইয়া একটা বাষ্পীয় নৌকা চলিয়া যাইতেছে ও একজন নূতন আনাড়ি কিনারায় কিনারায় ডিঙি চালাইতেছে; নিকটস্থ আর আর নৌকার মাঝিরা আগমিষ্যৎ তরঙ্গের ধাক্কা সামলাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতেছে, কিন্তু আনাড়ি-টা মনে করিতেছে যে, এত সাবধানতা কিসের জন্য? মাঝ-গঙ্গার তরঙ্গ মাঝ-গঙ্গাতেই উঠিতেছে—মাঝ-গঙ্গাতেই মিলাইয়া যাইতেছে; কিনারার সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক? এই ভাবিয়া সে যখন অন্যান্য মাঝিদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মনের সুখে হাস্য করিতেছে—তখন অকস্মাৎ প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গ হু হুঃ শব্দে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ডিঙিখানি, জলমগ্ন করিয়া দিল। এ যেমন দেখা গেল তেমনি—যাঁহারা মনে করেন যে, "ঘাত প্রতিঘাতের নিয়ম জড়-জগতেরই নিয়ম—জড় জগৎই বুঝুক;—জ্ঞান-জগতের সহিত তাহার কি সম্পর্ক? জ্ঞান-জগতে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিতে পারে—জ্ঞান-জগতে ফলাফলের কোনো নিয়ম নাই," তাঁহারদেরও পরিণামে ঐরূপ দশা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাই লিখিত আছে অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি, ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি। লোকে অধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত হস্তগত করে, পরে চতুর্দ্দিকে মঙ্গল দর্শন করে, পরে শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করে,—কিন্তু সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন সে, শত্রু জয় করিতেছে, তখন হয় তো সমস্ত জগৎ তাহার শ্রীবৃদ্ধি অবলোকন করিতেছে—যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে তখন কেহই হয় তো তাহার দুর্দ্দশা দেখিতেছে না; কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; যতক্ষণ সে অধর্ম্মকে স্বীয় বক্ষে পোষণ করিতেছে ততক্ষণই তাহার গতি বিনাশের দিকে হইতেছে এবং যতক্ষণ সে

ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে ততক্ষণই তাহার গতি উর্দ্ধ দিকে হইতেছে—এ বিষয়ে তিল মাত্রও সংশয় নাই। সমস্ত প্রকৃতি-রাজ্যের যেমন এক অদ্বিতীয় মূল নিয়ম এই যে, যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত, সমস্ত ধর্ম্ম-রাজ্যের তেমনি এক অদ্বিতীয় মূল নিয়ম এই যে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; উভয়-রাজ্যেই ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়ম অব্যর্থ এবং অব্যভিচারী; তবুও যে লোকে অনেক সময়ে তাহার প্রতি সংশয়ান্বিত হয়, তাহার কারণ আর কিছু না—নদীর কিনারা অঞ্চলে বাষ্প-নৌকার প্রতিঘাত যেমন বিলম্বে উপস্থিত হয়, ধর্ম্মরাজ্যে অনেক সময়ে স্বকৃত কর্ম্মের প্রতিঘাত তাহা অপেক্ষাও অনেক বিলম্বে উপস্থিত হয়। এই জন্য সাধক প্রবল অনুতাপ-সহকৃত ধর্ম্মসাধন দ্বারা পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফল প্রতিহত করিবার জন্য অনেক-টা অবসর হস্তে পাইতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্ম-দ্বারা অধর্ম্মের ফল এইরূপ যে প্রতিহত হয়, তাহাও ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়মানুসারেই হয়—তাহার জন্য নূতন কোনো নিয়ম আবশ্যক হয় না। যেমন ঘাত তেমনি প্রতিঘাত—এই নিয়মটি—কি জড় জগৎ, কি জ্ঞান-জগৎ, সর্ব্ব জগতেরই একাধিপতি; কোথাও ইহার এক চুলও অন্যথা সম্ভবে না। মনে কর একজন রাজা একগুণ অপরাধের দশগুণ দণ্ড দিলেন; এমত স্থলে, সেই দশগুণ দণ্ডের মধ্যে এক-গুণ দণ্ডই ন্যায়সঙ্গত, অবশিষ্ট নয়গুণ দণ্ড ন্যায়-বিরুদ্ধ। ন্যায়ের অতিরিক্ত সেই যে নয়গুণ দণ্ড তাহা অপরাধী ব্যক্তির সহ্য হইতে পারে, কিন্তু ন্যায়বান্ ঈশ্বরের তাহা সহ্য হইতে পারে না—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাহা সহ্য হইতে পারে না;—সেই অতিরিক্ত নয়গুণ দণ্ডের ভার অপরাধী ব্যক্তির স্কন্ধ হইতে হরণ করিয়া দণ্ডদাতা'র স্কন্ধে ফেলিবার জন্য সমস্ত প্রকৃতিই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতে থাকে;—সে চেষ্টা কেহই চক্ষে দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহার ফল এক না এক সময়ে ফলিবেই ফলিবে—ইহা অভ্রান্ত বেদ-বাক্য। আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, বুঝিতে পারি বা না পারি, ঈশ্বরের অব্যর্থ নিয়ম কোন স্থানেই তিল-মাত্রও নিষ্ফল হইবার নহে।

অনেকে মনে করেন যে, ঈশ্বর যেমন ন্যায়বান্ রাজা, তেমনি করুণাময় পিতা, অতএব করুণার নিয়ম ন্যায়ের নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু বাস্তবিক দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। সাধারণতঃ সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের করুণার পাত্র—তাহার মধ্যে যাঁহা-দের হৃদয় ঈশ্বরের চরণে অনুতাপাশ্রু বর্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, তাঁহারা বিশেষতঃ তাঁহার করুণার পাত্র। সাধারণতঃ আমরা লোককে উপদেশ দিবার সময় বলিতে পারি যে, বর্ষার বারিধারা ভিন্ন পৃথিবীর গতি নাই, ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন মনুষ্যের গতি নাই; কিন্তু তাহার সঙ্গে এই বিশেষ বৃত্তান্তটিও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, মেদিনী যখন গ্রীষ্ম-তাপে উত্তপ্ত হয়, তখনই বর্ষার বারি-ধারা নিপতিত হয়; পাপী ব্যক্তি যখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-পথে ফিরিয়া আইসে, তখনই তাহার সান্ত্বনার জন্য ঈশ্ব-রের অব্যর্থ করুণাবারি নিপতিত হয়;—এইরূপে করুণার পাত্র-নির্ব্বাচন ন্যায়ের নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। সমানে সমানে সদ্ভাবের বিনিময়, দীনের প্রতি ক্ষম-তাবানের করুণা, উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা, সমস্তই ন্যায়ের অন্তর্গত। মৈত্রীর নিয়ম (কি না সদ্ভাব-বিনিময়ের নিয়ম), করুণার নিয়ম, এবং কৃতজ্ঞতার নিয়ম—সম-স্তই একই ন্যায়ের নিয়ম; সে নিয়ম এই যে, ছোটো'র নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্র-

ত্যাশা কর, বড়'র সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে; বড়'র নিকট হইতে যেরূপ প্রত্যাশা কর, ছোটো'র সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে; সমানের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, সমানের সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিবে। মৈত্রী করুণা এবং শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা সমস্তেরই পাত্রাপাত্র বিবেচনা ন্যায়ের উপরে নির্ভর করে; এই জন্য সে সমস্ত সদ্‌গুণ ন্যায়েরই অভিব্যক্তি। ন্যায়কে অতিক্রম করিয়া মৈত্রীও ভাল নহে, করুণাও ভাল নহে, শ্রদ্ধা-ভক্তিও ভাল নহে। ন্যায়ের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে মৈত্রী অসৎসঙ্গে পরিণত হয়, করুণা অপাত্রে দান হইয়া দাঁড়ায়, আর, শ্রদ্ধা-ভক্তি এমন যে উৎকৃষ্ট সামগ্রী তাহাও গোঁড়ামি এবং অন্ধ ভক্তি হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত করুণা ন্যায়েরই প্রকার-ভেদ! পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কোনো অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই। এখন এইটি বুঝিয়া দেখা আবশ্যক যে, ন্যায় জ্ঞানেরই উচ্ছ্বাস এবং করুণা প্রাণেরই উচ্ছ্বাস; সুতরাং দুয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোনো অলঙ্ঘনায় প্রাচার স্থান পাইতে পারে না।

ঈশ্বরের ন্যায় এবং করুণার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যদি কর্ত্তব্য-সাধনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হই, তবে সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষ অবশ্যই আমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিবেন; তাহাতে আর সংশয়-মাত্র নাই। কিন্তু সে সিদ্ধি যে কিরূপ তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে অধিকারীও নহি—অনুমান করিতে ইচ্ছাও করি না। কেহ হয় তো মনে করিতেছেন ঈশ্বর তাঁহাকে হীরক দিবেন—ঈশ্বর তাঁহাকে সুবর্ণ দিলেন; কিসে যে, তিনি সুবর্ণ পাইবারই উপযুক্ত ও হীরক পাইবার অনুপযুক্ত, ক্রমে যত তাঁহার চক্ষু ফুটিবে ততই তিনি তাহা জানিতে পারিবেন। তাহার বিপরীতও হইতে পারে, এমনও হইতে পারে যে, তিনি মনে করিতেছেন ঈশ্বর তাঁহাকে সুবর্ণ দিবেন—ঈশ্বর তাঁহাকে হীরক দিলেন। কোন্ ব্যক্তি যে কখন্ কিরূপ দানের উপযুক্ত, তাহা সে ব্যক্তি নিজে জানিতে না পারে—ঈশ্বর তাহা ধ্রুব-রূপে জানিতেছেন। আবার এমনও হইতে পারে যে, আমরা ভাবিতেছি ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃত দিবেন—তিনি আমাদিগকে হলাহল দিলেন; রোগীর পক্ষে বিষবড়ি যে কিরূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা তাহা রোগী না জানিতে পারে কিন্তু চিকিৎসকের তাহা অবিদিত নাই। আমরা শুধু এইটি জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সাধন করিলে, ঈশ্বর যাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করিবেন তাহাই আমাদের পরম মঙ্গল—ও তাহাই আমাদের একমাত্র মঙ্গল। ঈশ্বরের দান বলিয়াই সম্পদের যত কিছু মূল্য—নহিলে সম্পদের মূল্য কি? আমার একজন প্রিয়তম বন্ধু যদি আমাকে এত অধিক মণিরত্ন দান করেন যে, সেই বন্ধুর প্রেম অপেক্ষা তাঁহার দান আমার নিকটে অধিকতর মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়ায় তবে তাঁহার দান কি সমূলে ব্যর্থ হয় না? ঈশ্বরের নিজের মূল্য তাঁহার দানের মূল্য অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক—এ কথাটি যেন সর্ব্বদাই আমাদের মনে জাগরূক থাকে। তিনি—দিতেছেন বলিয়াই তাঁহার প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র বালু-কণার মূল্য সসাগরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও অনন্তগুণ অধিক। তিনি দিতেছেন না—আমরা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে চুরি করিয়া লইতেছি—এরূপ স্বোপার্জ্জিত সুখ আগাগোড়াই দুঃখ। বাস্তবিকই

দেখা যায় যে, অযাচিত সুখ যাহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে আইসে—তাহার আস্বাদ যেমন সুমধুর এমন আর কোনো সুখেরই নহে; আর, ইহাও একটি কঠোর পরীক্ষার সিদ্ধান্ত যে, আত্ম-সুখের জন্য যে যত বেশী লালায়িত সে তত‌ই সুখে বঞ্চিত হয়। অতএব যদি সুখী হইতে ইচ্ছা কর তবে সুখের জন্য লালায়িত হইও না; কর্ত্তব্য কার্য্য প্রাণপণে সাধন কর—উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর তোমার মস্তকে এরূপ পরমাশ্চর্য্য সুখশান্তি বর্ষণ করিবেন যে, তোমার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠিবে।

ঈশ্বর আমাদের দেশে, জ্ঞান প্রাণ এবং কর্ম্মকে সৌহার্দ্দ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া আমাদের দেশের সকল দুর্গতি নিবারণের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ স্বর্গীয় পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—সেই পথ অবলম্বন কর—সুখ দুঃখের জন্য চিন্তা করিও না। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রেমময় করুণাময় মাতা পিতা এবং সুহৃদের হস্তে তোমার চিরন্তন সুখ-সমৃদ্ধি গচ্ছিত রহিয়াছে—তাহার জন্য কোনো চিন্তা নাই—কোন ভাবনা নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ অবলম্বন করাই তোমার একমাত্র কার্য্য; তাহাতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে, জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইবে, এবং কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে;—পরম পিতা এবং পরম মাতার অমৃত ক্রোড় তোমার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে।”

পরে অতি শ্রদ্ধেয় উপাচার্য্য শ্রীমৎ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদী হইতে এই উপদেশ দিলেন।

“মাঘোৎসবে সমাগত এই সকল সজ্জনগণের অনুরাগ ও আনন্দ পূর্ণ মুখশ্রীর মধ্যে এবং পত্র পুষ্প দীপোদ্গীর্ণ শুভ্র আলোক মালার মধ্যে এখন আমরা কাহার শ্রীসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি? কাহার আনন্দ-জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া এই উৎসব-ক্ষেত্র হাস্য ভরে ঢলিয়া পড়িতেছে এবং কাহার প্রেম-রস ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া এই প্রাচীর মধ্যগত আকাশ টলমল করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে? তিনিই সেই জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ যাঁহার জ্যোতিতে সমুদয় গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতির্ম্ময় এবং তিনিই সেই দেবতা যাঁহার প্রেম-রসে আর্দ্র হইয়া অনন্ত আকাশ ভারাক্রান্ত। ১১ মাঘের এই হাস্যময়ী রজনী সেই দেবতারই আরতির জন্য ধরণীতলে অবতীর্ণা। ইহার মহিমা যেমন দিগন্তব্যাপী ইহার আরাধ্য দেবতা তেমনিই অনন্ত বিশ্বের অধিপতি অনন্ত ব্রহ্ম। এই পৃথিবী সৃষ্টির আদি যুগে যখন অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত মহিমার বার্ত্তা এখানে বিঘোষিত হয়, তখন পক্ষী ডাকিয়া উঠিল, নদী প্রবাহিতা হইল, পুষ্প, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষু মেলিল এবং যজ্ঞের অগ্নি গগন আচ্ছাদন করিল কিন্তু কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তবে তাঁহাকে দেখিল কে? তাঁহাকে দেখিতে পাইল জ্ঞান প্রসাদে পরিশুদ্ধ সেই আরণ্যক ঋষিদিগের জাগ্রৎ আত্মা। এই ঋষিরা যখন হোম যজ্ঞাদি বাহ্য ক্রিয়াকলাপে আত্মার তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; যখন লোকপ্রদ দান ব্রতাদি ইষ্ট কর্ম্মের ফল অস্থায়ী বলিয়া তাঁহারা অনুভব করিতে পারিলেন; যখন অগ্নি, বায়ু বরুণদেবতাকে এই অচেতন সৃষ্টির এক একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন; তখন সকল শক্তির মূল শক্তি, সকল কারণের মূল কারণ, এবং সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের অন্বেষণ পড়িয়া গেল। তাঁহাদের চিন্তাস্রোত গভীরতর অধ্যাত্ম প্রদেশে প্রধাবিত হইল। ধীবর যেমন গভীর সমুদ্র গর্ভে

আপনাকে নিমজ্জন করিয়া তাহার তলদেশ হইতে রত্ন আহরণ করে, সেইরূপ ঋষিরা আপনার আত্মার গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জন করিয়া যে রত্নকে সন্দর্শন ও লাভ করিলেন তাহাতে তাঁহাদের অনন্ত মঙ্গলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহারা বিষয় হইতে বিষয়ীকে—অচেতন হইতে চৈতন্য স্বরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব পুরুষকে পৃথক করিয়া দেখিতে পাইলেন! ইদং জ্ঞানের বিষয় স্থূল সৃষ্ট পদার্থ এবং অহং জ্ঞানের বিষয় অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষুতে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, ছায়া ও আতপের ন্যায় দুই পৃথক পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইল। শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু এবং সমাহিত না হইলে মনুষ্যের অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় না, জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় না। নির্ম্মল জ্ঞানেরই এই প্রভাব, ধ্যান সাধনের ফলই ব্রহ্ম দর্শন। ঋষিরা পরিশুদ্ধ জ্ঞানে দেখিতে পাইলেন যে, এই যে মহাকাল কোথায় যার আদি, কোথায় যার অন্ত, তাহা ঈশ্বর নহেন, শব্দ ঈশ্বর নহেন, এই বাহিরের আকাশ ঈশ্বর নহেন, চরাচর বিশ্বকার্য্যের বীজভূতা স্বধা নাম্নী প্রকৃতি ঈশ্বর নহেন এবং এই সুখ দুঃখ মায়া মোহের অধীন জীব—মানবাত্মা ইহাও ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বরান্বেষণে ব্যাকুলপ্রাণ, জ্ঞানপ্রভাবে পরিশুদ্ধ ঋষিরা ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন যে, সকল কারণের মূল কারণ, সকল শক্তির মূল শক্তি এবং সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞান স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ ও ইচ্ছাময় আত্মশক্তিবিশিষ্ট দেবতা স্বীয় গুণ সকলের সহিত নিগূঢ় হইয়া জাগ্রৎ রহিয়াছেন, তিনি মহাপ্রাণ ব্রহ্ম। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভূত সকল; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র এবং এই পৃথিবী প্রভৃতি লোক সকল ও এই লোকনিবাসী দেব মনুষ্য ও তাহাদিগের মন, প্রাণ, আত্মা এবং মেধা দৃষ্টি ধৃতি, মতি, মনীষা, চিত্ত, স্মৃতি, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, কামনা প্রভৃতি প্রজ্ঞাঙ্গ সকল এবং স্বয়ং প্রজ্ঞা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। যখন কেবল নিজের নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বলে নহে, কল্পনার বলে নহে, কিন্তু জ্ঞানপ্রসাদে, পরিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে, ঋষিরা এই মহান্ পুরুষকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদের হৃদয়-আকাশ হইতে সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া তাহাতে সত্য সূর্য্যের উদয় হইল তখন তাঁহাদের বাণী শব্দায়মান হইল—

> স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
> কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
> দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
> যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং॥

কতকগুলি পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, স্বভাবই সৃষ্টির আদি কারণ, অন্য মুগ্ধ ব্যক্তিরা কালকেই ইহার কারণ স্থির করেন, কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। সেই দেবতারই এই মহিমা, যাঁহা হইতে এই বিশ্বচক্র প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমান হইতেছে।

> ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
> ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং
> সকারণং করণাধিপাধিপো
> ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।

এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহার কেহ পতি নাই, তাঁহার কেহ নিয়ন্তা নাই এবং তাঁহার কোন স্থূল শরীর নাই। তিনি সকলের কারণ। ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি যে মন তাহারও তিনি অধিপতি। ইহ সংসারে তাঁহার কেহ জনিতা নাই, তাঁহার কেহ অধিপতি নাই।

> এষ দেবোবিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
> সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
> হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
> যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা, ইনি

লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যকরূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদ্গত সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

প্রাচীন কালের ঋষিদিগের ইহাই সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞানেরই আমরা উত্তরাধিকারী। যেমন গঙ্গানদী উত্তর হিমাদ্রি হইতে বহমানা হইয়া তটস্থ ক্ষেত্রসকলকে সকল সময়ে উর্ব্বরা করিতেছে, যেমন প্রদীপ্ত সূর্য্য পৃথিবীর জন্মকাল অবধি সৌর জগতান্তর্গত সকল পদার্থকে সমভাবে কিরণ প্রদান করিতেছে,সেইরূপ সেই ঋষিসেবিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রাচীন কাল হইতে এই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অমৃত মুর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকিয়া সকল মনুষ্যকে মোক্ষের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে যিনি মণ্ডিত, তিনি সংসারী হইলে তাঁহার সংসার পুণ্যজ্যোতিতে শ্রীসম্পন্ন হয়, যিনি সন্ন্যাসী তাঁহার হৃদয়-কমল ব্রহ্মানন্দ সরোবরে বিকসিত হইয়া অনন্তকাল তাহাতে ভাসিতে ও দুলিতে থাকে। যোগীই হউন আর ভোগীই হউন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় আলোকে যিনি মণ্ডিত হইতে পারিয়াছেন তিনি রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নিষ্পাপ ও পবিত্র হইতে পারিয়াছেন; রোগে আর তিনি কাতর নহেন, শোকে ভীত নহেন, দুঃখে বিষাদিত নহেন। তাঁহার যোগাগ্নিময় আত্মাকে এই সকল ব্যাধি বিকার স্পর্শ করিতে গিয়া আপনারাই দগ্ধ হইয়া যায়। তিনি এই মর্ত্ত্যে থাকিয়াই ব্রহ্মধামের সুখানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া কোটি কোটি স্বর্গলোক দীপ্তি পাইতে থাকে। মুক্তি মার্গের যথার্থ রহস্য তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া বন্ধনজনিত ভয় তাঁহা হইতে অপনীত করিয়া দেয়।

ব্রহ্মজ্ঞান চর্চ্চা, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্ম সন্দর্শন লাভই মানব জীবনে মোক্ষের হেতু। ইহাই মানবাত্মার পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ইহাই তখনকার বৃদ্ধ ঋষিদিগের সেব্য ও বক্তব্য ধর্ম্ম ছিল। এখনকার ব্রাহ্মসমাজ সেই গুরুভার স্কন্ধে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন যাহা আরণ্যক ঋষিদিগের স্কন্ধে সমর্পিত ছিল। তখন যে কারণে যাজ্ঞিক ঋষিগণ হইতে পৃথক হইয়া আরণ্যক ঋষিগণ অরণ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন, এখন ঠিক সেই কারণেই সাকার দেবতার উপাসক দল হইত ব্রাহ্মেরা পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। যে ধর্ম্ম তখন গিরি গুহা অরণ্যে ব্যাখ্যাত হইত তাহা এখন ব্রহ্মমন্দিরে বা ব্রাহ্মের গৃহে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাহা তখন বেদ উপনিষদের মধ্যে নিহিত ছিল তাহা এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠে প্রকাশিত রহিয়াছে যাহা তখন খনির গর্ভে আচ্ছাদিত ছিল, তাহা এখন গৃহের প্রাঙ্গণে নর নারীর কণ্ঠাভরণরূপে শোভিত হইয়াছে। এই যে অমৃতময় শ্রীসৌন্দর্য্যসম্পন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাকে যেন কেহ মলিন ও অবসাদগ্রস্ত মনে না করেন, কেননা ইহার গতি অতি ধীর, অতি গম্ভীর। সত্যের গতি সহজেই ধীর ও গম্ভীর। তরুণ সূর্য্যের স্নিগ্ধ কোমল কিরণ সন্দর্শন করিয়া ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে মধ্যাহ্ন সময়ে ইহার অতিশয় প্রখর প্রভাবে দশদিক না অতিশয় সমুজ্জ্বলিত হইবে,অতি নিবিড় অন্ধকারাবৃত গুহা অরণ্যশায়ী জীবেরও শরীর না তাহার উত্তাপে উত্তপ্ত হইবে। ইহাও যেন সকলের স্মরণ হয় যে, নিশাবসানে যাহার উদয় দেখিয়া তাহাকে অতি কোমল ও তরুণ বলিয়া প্রতীত হয়, প্রকৃত পক্ষে তখনও সেই সূর্য্য কত যুগযুগান্তব্যাপী পুরাতন, প্রকাণ্ড ও প্রদীপ্ত পদার্থ। যাহা যত সত্য, যাহা যত

বৃহৎ, তাহার ব্যাপ্তি তত দীর্ঘ কালে সাধিত হয়। কত লক্ষ, লক্ষ, কোটি, কোটি বৎসরে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত একটি ভূস্তরের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ কতকাল ধরিয়া কেবল বাষ্পাকারে আকাশ-গর্ভে পতিত ছিল তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় পরাস্ত মানে। জড় জগতেরই উৎ-পত্তি গতি ও স্থিতি যদি এত বৃহৎ তবে কি মানবাত্মার সকল কল্যাণের নিদান এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মই কেবল এক দিনে কদলী বৃক্ষের ন্যায় অযথা বৃদ্ধি পাইয়া অন্যান্য উপধর্ম্মের ন্যায় পরদিনেই ভূমিসাৎ হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে? কখনই নহে। অনন্ত যাহার উৎ-পত্তি, অনন্ত তাহার বিস্তৃতি এবং অনন্ত তাহার স্থিতি। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম অমৃতধাম ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে দেবতাদিগের আত্মাতে প্রবেশ করেন। তখন এই পৃথিবীর নাম গন্ধ কিছুই ছিল না। পরে পৃথিবী সৃষ্টি হইলে তিনি ঋষিদিগের আত্মাতে আবির্ভূত হন। পরে আমাদিগের ক্ষুদ্র আত্মাতে প্রকাশিত হইয়াছেন। আমরা এখন তাঁহার প্রসাদে স্বীয় আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দেখিতেছি এবং তাঁহাকে প্রীতিপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া মানব জীব-নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছি। এই ধর্ম্ম ক্রমে সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিবে এবং এখন যাহা কেবল চিন্তাশীল লোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে কালে তাহা লোক সাধারণের মধ্যে অন্নের ন্যায় সাধারণ হইয়া অতুল শ্রীসৌন্দর্য্য সম্পন্ন শান্তি ও সাম্যকে উৎপাদন করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মহান্ কল্প বৃক্ষস্বরূপ। ইহার ছায়া অমৃত, ইহার পুষ্প আনন্দ ও ইহার ফল শান্তি। যিনি এই মহাবৃক্ষ তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন তিনি এই উত্তপ্ত সংসারে ছায়া, আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়া অমর হইতে পারি-বেন।

হে চিরন্তন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শাশ্বত পর-মেশ্বর? তুমি আমাদিগের চিরন্তন সুখানন্দ ভোগের জন্য এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ, এখন যাহাতে আমরা এই ধর্ম্ম পালনের উপযুক্ত হইতে পারি আমাদিগের আত্মাতে এইরূপ শক্তি প্রেরণ কর। তোমার শক্তি সঞ্চারিত না হইলে একটি তৃণও প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। তুমি সকল শক্তির সার ও সকল প্রাণের প্রাণ এবং সকল মঙ্গলের কারণ। আমরা তোমাকে বার বার নম-স্কার করিয়া তোমার চরণতলে দণ্ডায়মান হইতেছি আমাদের প্রতি তোমার যাহা মঙ্গল ইচ্ছা তাহা প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

মহীশূরী ভজন—তাল কের্‌ভা।

হায় একি হেরি শোভা অতুলন!
হাসিছে জোছনা হাসি বিশদ গগন।
দূরে গেল ভয়, বিগত সংশয়, তব প্রেম-মুখ হেরি।
দূরে গেল ভয়, বিগত সংশয়
তব প্রেমময় হেরি নিখিল ভুবন;
সুধাময় গিরি নদী নগর কানন।
সুখ-উৎস নব, নব, করুণা স্মরি তব
চিরদিন সমভাবে কাটুক জীবন।

সমালোচনা।

হরিলীলা। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে আন্তরিক অনুতাপ ও সাধন প্রস্তাবে কিরূপে পাপীর "সাংসারিক জীবন বিনষ্ট হইয়া স্বর্গীয় জীবন আরম্ভ হয়," "হরিনামের বলে জীব ইচ্ছা মাত্রেই স্বর্গে যাইতে পারে." "পরম মাতা বিশ্বজননী সন্তান যখনই 'মা' বলিয়া ডাকে তখনই উত্তর দেন" ইত্যাদি ভক্তিতত্ত্বের সার কথা গুলি লইয়া গ্রন্থকার একটী সুচারু উপন্যাস রচনা করিয়া তাহা

সুন্দর রূপে বিবৃত করিয়াছেন। "হরিধন চিরকাল স্পর্শমণি হইয়া অনন্ত শান্তিসুখে জীবকে কৃতার্থ করে। রাজার সিংহাসন টলিয়া যাইবে, ধনীর ধন নিঃশেষিত হইবে কিন্তু হরিভক্তি রূপ ধন অটল অব্যয় হইয়া অনন্তকাল সঞ্চিত থাকিবে" ইত্যাদি মধুর অধ্যাত্ম উপদেশ গ্রন্থখানি মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। ইহা পাঠ করিলে ভক্তিরসের তরঙ্গ চিত্তে প্রবাহিত হয়, হরিনামে রুচি হয়, চিত্ত সাংসারিক আকর্ষণ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ক্ষণকালের জন্য পরমার্থ রসপানে উন্মুখ হয়। গ্রন্থকার কহেন ভগবান ভক্তকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন ও ইহা প্রাচীন ভক্তজীবনের উল্লেখ করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

বন ফুল। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত।

পরমার্থ বিষয়ক ভাবকণিকা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি গ্রথিত হইয়াছে। ভাবগুলি বিশুদ্ধ মনোরম ও উপাদেয় হইয়াছে। আমরা নবীন গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিপ্রেম প্রবণতা দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। পাঠকগণের বিনোদনার্থ তাঁহার রচিত পুস্তক হইতে কয়েকটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে উপাচার্য্যপদে আমি নিযুক্ত করিলাম।

২৫ মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০ } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রধান আচার্য্য।

আগামী ১৯ শে ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৩৫৬।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭০৮৮০
সমষ্টি	৫০৬৫।৶০
ব্যয় ...	১৯৬৮৮০
স্থিত	৩০৯৬।৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫৮॥৫
মাসিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১১ শকের শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত	৮৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মিত্র ১৮০৮ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	১॥০
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
" " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " শ্রীনাথ মিত্র	৫৲
" " অনঙ্গমোহন চৌধুরী (তুষভাণ্ডার)	১০৲
" " ভুমেশচন্দ্র বসু	২৲
" " রাধামোহন বসু (আন্দুল)	১৲
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু ভবদেব নাথ (গোয়াড়ী)	২৲
দানাধারে প্রাপ্ত	১৻৫
	৫৮॥৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৯৩৸০
পুস্তকালয় ...	২১॥৴১০
যন্ত্রালয় ..	৭৯০ ৶০
গচ্ছিত ...	১৭৭।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১০০৪ ৻৫
দাতব্য ...	৯৲
সমষ্টি	২৩৫৬।৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪৭৸ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১৬।৴০
পুস্তকালয়	৭৮॥১৫
যন্ত্রালয়	৬৫০।৶১৫
গচ্ছিত	৬১।৶৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৫০৭৲
দাতব্য	৭৲
সমষ্টি	১৯৬৮৸০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬০।
৫৬০ সংখ্যা ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও উপাচার্য্যের লক্ষণ এবং বেদীতে আসন গ্রহণের অধিকার।

১। যাঁহাদের উপনয়ন হইয়াছে এবং যাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তদনুসারে সমুদয় গৃহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত হইয়া কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আসন গ্রহণ করিবার তাঁহাদের প্রশস্ত অধিকার। নিপুণ রূপে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিতে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সমর্থ হন, তাঁহারাই আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য এবং উপাচার্য্য পদের উপযুক্ত পাত্র।

২। যাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা যদি সাধু ও সচ্চরিত্র হন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব যথার্থ রূপে উপদেশ দিতে পারেন তবে আচার্য্যের সম্মতিক্রমে তাঁহারাও আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আসন গ্রহণ করিতে পারেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রধান আচার্য্য।

তারকে দেবতা।*

সুদূর অম্বরে জ্বলে ওই শুভ্র তারা,
হে দেবতা! ও তোমার অমর নিবাস,
আলো করি ওই তব জ্যোতিষ্ক-নিলয়
কি সুন্দর পবিত্রতা করিছ বিকাশ!

সুধাময় স্বপ্রকাশ একটি হৃদয়
শীতল মরীচি তার দিয়াছে পাতিয়া
অক্ষুব্ধ শান্তির হোথা দেবদ্রুম তলে,
লভিছ আরাম তাহে সুখেতে বসিয়া।

উঠিছে উল্লাসময়ী সত্যের বারতা
অনন্ত গম্ভীর হতে, শুনিতেছ তুমি।
অন্তর উজ্জ্বলকারী অতীন্দ্রিয় জ্যোতি
দুহিয়া প্লাবিছ তাহে দেব-জন্ম-ভূমি।

আহা, কি অমৃত গান গাহিছ ওখানে!
যে শুনে এ মর্ত্ত্যে আর ফিরে না সে জন,
আনন্দের অনাহত অশব্দ বাজনা
শুনিলে অনন্তে মিশে মানবের মন।

শুধুই কি ওই তারা এত শুভ্র জ্বলে,
শুধুই কি ওই তারা উচ্চে লভে ঠাঁই?
ব্রহ্মানন্দে ধৌত হোথা পবিত্র জীবন,
তাই এত উচ্চে তারা, এত শুভ্র তাই।

* লৌকিক দেবতা।

হিমালয়ে ব্রহ্মপূজা।

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা ও ধ্যান করিলে মন স্থির, ধীর ও গম্ভীর হইয়া সেই অনন্তের দিকেই যাইতে চায়। তাই আমি ভাবিতেছি, ঈশ্বর আর কত দিন পরে তাঁহার অনন্ত সভার মধ্যে আমাকে ডুবাইবেন।

ধর্ম্মের আশ্চর্য্য শক্তি ও বিমোহন প্রকৃতি, ধার্ম্মিকের গভীর শোভা ও সুমিষ্ট জীবনী কি মধুময়। প্রেমিক প্রেমে বিভোর ও আত্মহারা, আপনাকে যেন তিনি ভাগ ভাগ, খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহকাল, পরকাল, ভূলোক, দ্যুলোকের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন, তাই তাঁহার আত্ম ও পর পার্থক্য নাই, পাপী ও পুণ্যবান ভেদ নাই, জড়ে ও চেতনে ভিন্নতা নাই, যাহা দেখেন, তাহাই আপনার বলিয়া মনে করেন, যাহাকে দেখেন, তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হন, তাই পরদুঃখে অতি কাতর ও পরপাপে অধীর। প্রেমিক চক্ষের জলে বক্ষ ভাসান ও সময়ে সময়ে কাতরোক্তি করিয়া নিজে কাঁদেন ও অপরকে কাঁদান। বিশ্বাসী সংসাররূপ বিশাল মরুর মধ্যে আশ্রয়হীন বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে একটী অলড় ও আশাপ্রদ বৃক্ষ পাইয়া প্রফুল্লতার সহিত ক্লান্তি দূর করিতেছেন, ব্যাকুল মাতৃহারা শিশুর ন্যায় বাজ-তাড়িত উড্ডীন শুক পক্ষীর ন্যায় সত্রাসে ও প্রাণের দায়ে আশ্রয় বৃথা অন্বেষণ করিতেছেন। যোগী গভীর জলবিহারী মীনের ন্যায়, পৃথিবী-বিহারী রসের ন্যায় নীরবে মহান্ ঈশ্বরের অনন্ত সত্তায় ডুবিয়া নিরাপদ হইতেছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি ক্ষুদ্র শুক হইতেও শিশু, তাহাতে আবার আমার প্রাণবিনাশের জন্য অবিশ্বাসবাদ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, কখনও কখনও কল্পনার বৃক্ষে বসিতে যাই, জিজ্ঞাসা আমাকে তথায় এক তিলও তিষ্ঠিতে দেয় না, আবার সংসার মরুর ভাবময় আকাশে উড্ডীন হই, বহুদিন হইতে এ আকাশে উড়িতে উড়িতে ডানা দুইটী শিথিল হইয়াছে, আর উড়িতে পারি না, কিন্তু নিম্নে সংসার-মরু দিন রাত অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে ঐ স্থানটুকু যাতনাময় করিয়া রাখিয়াছেন, একবার পড়িলেই মারা পড়িব, এখন কি করি? ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি ধার্ম্মিকদিগের হৃদয়ে নাকি গভীর শোভা, প্রেমিকেরা নাকি অতীব সুমিষ্ট, বিশ্বাসীরা নাকি নিরাপদ, তবে যাই একবার তাহাদের হৃদয়াকাশে ভ্রমণ করিয়া আসি, এই মনে করিয়া তাহাদের হৃদয়াকাশে যাইয়া উড়িতে লাগিলাম, কিন্তু বসিবার স্থান পাইলাম না, উড়িবার শক্তি বাড়িল, কিন্তু আড়ম্বরের ঢকাতে কর্ণ বধির হইয়া গেল, সার কথা, কিছুই কর্ণে প্রবেশ করিল না! ইহারা বসিবার জন্য ধর্ম্মমতের আসন পাতিয়া দিল, আমি পক্ষী জাতি, ব্রহ্ম-রূপ বৃক্ষকোটরে জন্ম, বৃক্ষে লালিত ও পালিত, বৃক্ষের সঙ্গে আমার প্রাণের টান, সেই প্রাণের বৃক্ষ মহাসত্তা সত্য স্বরূপ ঈশ্বর ভিন্ন কোথাও বসিতে প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু দেখিলাম ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরাপদ বৃক্ষ পাইয়াছেন, কিন্তু কাহারই পাওয়াইবার শক্তি নাই। তারপর উড়িতে উড়িতে উড়িতে একটি পরম সম্পদ ঋষিকল্প আড়ম্বরশূন্য তাপস হৃদয়ে যাইয়া উড়িতে লাগিলাম, তিনি আমার কাতরতা ও নিরাশ্রয়তা পরিদর্শন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, আসিয়াছ, বেশ ভালই! তাঁহার সস্নেহ সম্ভাষণে আমার চক্ষে জল আসিল, তাঁহার অমায়িক ভাব দর্শনে আমি

মোহিত হইলাম, তাঁহার বিশ্বাস, অনুরাগ ও প্রেমের চিহ্নে আমি আশ্বস্ত হইলাম, মনে করিলাম, এখানেই বসি। এই ভাবিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় প্রাণ বলিয়া উঠিল, না এখানে না। আর তিনিও বলিলেন, আত্মাতে আত্মাকে দেখ, সেই প্রাণের প্রাণ আত্মার মূলে অবস্থিতি করিতেছেন, একমাত্র তাঁহাকেই অন্বেষণ কর। তবে এই ধর্ম্মরাজ্য ও ধার্ম্মিকদিগের হৃদয়ধামে তোমার উপযোগী ও পরম উপাদেয় বিশ্বাস, জ্ঞান, প্রেম ব্যাকুলতা ও ভক্তি প্রভৃতি মহামূল্য রত্নগুলি ছিন্ন বিছিন্ন ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে, যদি পার এই মহামূল্য বস্তু গুলি সংগ্রহ করিয়া লও, কিন্তু দেখিও সাবধান! অপরের বস্তু নিজের বলিয়া মনে করিও না, অপরের ভাব আপনার বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিওনা, অপর সাধকের ভাবে নিজে ভাসিয়া যাইও না। বিশ্বাস প্রভৃতি প্রত্যেক গুণগুলিই অল্পাধিক পরিমাণে সকলের মধ্যেই আছে, আর তোমার মধ্যেও আছে, যখন আত্মার মধ্যে সেই আত্মাকে দেখিতে পাইবে, তখনই বিশ্বাসাদি প্রবল হইয়া উঠিবে, যে সম্পদপূর্ণ রাজ্যে তুমি যাইতেছ সে রাজ্যের পথ অনেকেই বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যাওয়াইতে কেহই পারেন না, তাঁহার কৃপাই তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইবে, তুমি একমাত্র তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর কর, অনুসন্ধান কর, প্রার্থনা কর, নিরাপদ স্থান পাইবেঃ—

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।
পাশনাশহেতুরেষ নতু বিচারবাগ্বলম্।"

তবে এখন তুমি যাও, আত্মাতে আত্মা অনুসন্ধান কর। আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর আমার শত্রুদিগের আশঙ্কায় বড় ভীত হইয়াছি, কিন্তু করি কি? আশ্রয়বৃক্ষ ভিন্ন ভাবের আকাশে কত কাল উড়িয়া বেড়াই? তাই আবার আমার পুরাতন গৃহে আসিয়া উপনীত হইলাম, আর আত্মার মূলে আত্মাকে দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

জড়-রাজ্য আধ আধ অমিয় সুধা জড়িত সাড়া নাই, শব্দ নাই, কার ভাবে যেন সে বিভোর, প্রস্ফুটিত হই হই করিতেছে, কার অনুরাগের টানে যেন ফুটিয়াও ফুটিতে পাইল না, প্রাণের কথা খুলিয়া বিস্ময়ময় জগতের প্রকৃত অর্থ বলিতে প্রয়াস পাইতেছে, আর কে যেন মুখ চাপিয়া ধরিতেছে, কার ডাকে যেন যাই যাই করিয়াই ছুটিতেছে, আর কে যেন পশ্চাৎদিক হইতে তাহার গতিরোধ করিতেছে, এই রূপ আকাঙ্ক্ষাবিহীন ভাব, স্বাধীন-চিন্তাবিহীন জ্ঞান, উচ্ছ্বাসবিহীন প্রেম, আর ইচ্ছা-বিহীন শোভার আধার হইয়া অনন্ত অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জড় জগৎ পরমাণুতে পরমাণুতে জ্ঞান, শোভায় শোভায় অনির্ব্বচনীয়তা, সৌরভে প্রীতি, বিচিত্রতায় নিপুণতা, শৃঙ্খলায় উপযোগিতা এবং উপযোগিতায় দয়া, মঙ্গল ও ন্যায়ের চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলময় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে। জড়-জগতের বিশেষ চিহ্ন সে অপরের অভিপ্রায়। সে যেন কার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়াছে আর কার অভিপ্রায়ের মধ্যে এমন ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে যে, সে নিজের জন্য অণুমাত্রও রাখে নাই, তাই জড়-জগতের বিশেষ চিহ্ন সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়।

মানবের জীবন আকাঙ্ক্ষাময় জিজ্ঞাসাপূর্ণ। সুখ থাকুক আর না থাকুক, সুখের বাৎসল্য আছে। জ্ঞান থাকুক আর না,

থাকুক, জ্ঞানী হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। প্রকৃত ধর্ম্ম পাউক আর নাই পাউক,ধর্ম্মের জন্য টান আছে। ঈশ্বর-আশ্রয়ে নিরাপদ হউক আর নাই হউক, কিন্তু নিরাপদ হইবার ভাবটী প্রাণগত, জীবনগত। এই ভাবটী মানব-হৃদয়ে এত প্রবল যে, বোধ হয় আত্মার প্রত্যেক বৃত্তিরই জীবন-শোণিত এই আকাঙ্ক্ষা। আবার এই আকাঙ্ক্ষা জিজ্ঞাসাময়। মানব প্রাণ যেন দুঃখ বিষাদ, আকাঙ্ক্ষা,অভিমান,দম্ভ,কাম, ক্রোধ,লোভ, মোহের প্রশস্ত অস্ত্রাগার। তাহাতে আবার যখন আকাঙ্ক্ষার বারুদে বাসনার আগুন লাগে তখন অস্ত্রাগারের অস্ত্রের তেজে প্রত্যেক মনুষ্য হা হতোস্মি করিতে করিতে অস্থির হইয়া উঠে। ইহাতে যোগীরও মন টলে, প্রেমিকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, বিশ্বাসীর অন্তরে নিরাশা আসে, আর যথার্থ ব্যাকুলিত আত্মাও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে না, তবে রক্ষা এই যে, এই অস্ত্রাগারটী দ্বিতল, প্রথম তল হইতে দ্বিতীয় তলটী ক্ষুদ্র ও অল্পায়তন। তুলনায় সাগরের নিকট জলবিন্দু যতক্ষুদ্র তাহার অপেক্ষাও প্রথমতল হইতে দ্বিতীয়তল ক্ষুদ্রতম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্প লোকই ঐ সুবৃহৎ অস্ত্রাগারের সংবাদ রাখে। তাহার জন্যই সাধু বলিয়াছেন,—

> "নিজ নবতন মহলমে সদা সুখ রাশ।
> আপ্‌ঘর চিন্‌হো শান্ত কাটো যম কি ফাস।"

আপনার নবতন মহলে গমন কর, তথায় নিত্য শান্তি বিরাজিত; আপনার ঘর আপনিই চেন, যমের বন্ধন ছেদন কর। মানবাত্মা বাস্তবিকই অস্ত্রাগার। দ্বিতীয় অস্ত্রাগারের চোটে জগৎ অস্থির। জনসমাজে সর্ব্বদাই তাহার ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির গোলা গুলিতে মানুষ তটস্থ। এই দৃশ্য জনসমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তবে প্রথম তলে যখন আগুন লাগে, তখন আর দ্বিতীয় তলটী টিকিতেই পারে না। মানবের হৃদয়ে যখন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তখন প্রাণের বৃত্তিরই জড়তা দুর হইয়া যায়। বারুদ যতদিন আর্দ্র বা সিক্ত থাকে, ততদিন তাহাতে অগ্নিস্পর্শ হইতে পারে না। আর যখনই বারুদ শুষ্ক হইয়া উঠে, অমনি অগ্নিস্পর্শমাত্র এক প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করিয়া তুলে। মানবের প্রাণ যত দিন ভাব-রসে রসিক থাকে, ভাবের আবিলে অচেতন থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস কথার কথা মাত্র, সিক্ত বারুদে অগ্নিসংযোগের ন্যায় হাস্যাস্পদ। আর যখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রবল তেজে ভাবের আবিলতা উড়িয়া যায়, তখনই আত্মার বৃত্তিনিচয়ে ব্রহ্ম-কৃপায় জ্বলন্ত হুতাশন লাগিয়া প্রথমতঃ দ্বিতীয় তলটীকে হৃদয় হইতে উড়াইয়া দেয়, তার পর বিশ্বাস, প্রীতি, জ্ঞান, পবিত্রতার ব্রহ্মাস্ত্রে জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া তুলে। ইহার নামই মনুষ্যত্ব, আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য। আর নিজের প্রাণে এইরূপ আগুন না লাগিলে ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে না। বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট ও মহম্মদের হৃদয়ের প্রথম স্তরে আগুন লাগিয়াছিল, তাই তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, নিজে শান্তি পাইয়াছিলেন, অপরকে সুখী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হৃদয়ে যখন শোক ও দুঃখের শেল বিদ্ধ হইয়া থাকে, প্রাণ যখন মোহের প্রখর বাণে অধীর, মন যখন কাম ক্রোধাদি রিপু ও হিংসা নীচতার মর্ম্মভেদী অস্ত্রে আহত, তখন মনে হয় এই যাতনা রাখি কোথায়? এই অস্ত্র বাছিয়া ফেলি কো-

থায়? এই বিষাক্ত অস্ত্র মোক্ষণের অস্ত্রাগার কোথায়? কেহ কেহ সাধু-হৃদয়কে শোক দুঃখ ও বিষাদের অস্ত্রমোক্ষণের অস্ত্রাগার বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রথম অস্ত্রাগারে আগুন না লাগিলে অস্ত্রমোক্ষণের আর অন্য স্থান নাই। সে যাহা হউক, মনুষ্য হৃদয়ের যে স্তরে যাই, প্রত্যেক স্তরই আকাঙ্ক্ষা-উন্মুখ ও জিজ্ঞাসাময়। জড়ের বিশেষ চিহ্ন, বিশেষ লক্ষ্য ও বিশেষ আবরণ অভিপ্রায়, আর চেতনের বিশেষ চিহ্ন, বিশেষ লক্ষ্য ও বিশেষ আবরণ আকাঙ্ক্ষা। এখন আমি করি কি? আমার এক দিকে অভিপ্রায় আচরণ ও অভিপ্রায় প্রাণ প্রকৃতি, অপর দিকে আকাঙ্ক্ষা আবরণে আবৃত আকাঙ্ক্ষাময় প্রাণ-মানব। প্রকৃতির শোভা আছে, সৌন্দর্য্য আছে, আর তাহার মধ্যে মনোমুগ্ধকারী রমণীয়তা আছে। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমার মন টানে ও রমণীয়তায় আমাকে তাহার দিকে যাইতে ইঙ্গিত করে, কিন্তু ধরা ছোঁয়া দেয় না। যতই ধরিতে যাই, ততই যেন সে পশ্চাৎ দিকে ছুটিয়া পলায়, ডাকিয়া অদৃশ্য হয়, সে যেন আমার সঙ্গে বালকের মত ক্রীড়া করে। কিন্তু আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়াও জানি না। শোভা! তুমি কার দূর? তুমি আমার কাছে আসিয়া উকি ঝুকি মার, আমি ছুঁইতে যাই আর তুমি পলায়ন কর। বিচিত্রতা! তুমি কোন্ রাজার জয়-পতাকা? এত চেষ্টা করিলাম, তোমার আদরনিহিত সন্দর্ভ পরিষ্কাররূপে পড়িতে পারিলাম না, যতই তোমার নিকটে যাই, ততই তুমি তোমার বিচিত্রতার মধ্যে বিলীন হও। অভিপ্রায়! তুমি কার্? তুমি অতি নিপুণতার সহিত বিচিত্রতার আদি সৌন্দর্য্য মসীতে নিস্তব্ধতার ভাষায় শিব-সঙ্কল্প অখণ্ড ছন্দোবন্ধে কি বলিতেছ? কার সংবাদ আমার নিকট প্রচার করিতেছ? আর কোন্ রাজভবনের তুমি? আমি যাহা চাই, তাহাকে তুমি দিতে পার? আর সাধ্য নাই। তুমি যে তোমার মধ্যেই ডুবিলে! তবে ডুব, আমিও যাই। আমি তোমার মধ্যে ডুবিয়া অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে যাই, তোমার গর্ভনিহিত স্পর্শমণি স্পর্শ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে চাই, কিন্তু তুমি আমাকে তথায় যাইতে দেওনা। বিচিত্রতার চিরচঞ্চল বিচিত্র-মালায় আমার প্রাণ কাড়িয়া লয়, আমি আত্মহারা হইয়া যাই, তুমি আমাকে ভাগ ভাগ, খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার সৌন্দর্য্য মধ্যে মিশাইয়া ফেল, আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া ফেল, আমি দিশাহারা হইয়া যাই। সংসার আমাকে অকুল পাথারে ডুবাতে চায়। সে আমার মনুষ্যত্ব কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করে, তুমি আমাকে তোমার সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইতে চাও। এবার তোমাকেও ছাড়িব, সাংসারিকতাকেও ছাড়িব, তোমরা উভয়েই আমার পরম শত্রু। সে চায় আমাকে তোমার পোষা পাখী করিয়া রাখিতে। আমি সাংসারিকতারও বলের উপকরণ নই, তোমারও পোষাপাখী নই, আমি সেই শোভার ভাণ্ডার পরম শোভায় যাইব, আমি আত্মস্থ হইয়া সেই বিশ্বময়কে দেখিব।

ভাবিতে ভাবিতে দিন চলিয়া গেল, জ্ঞানালোচনাতে অনেক মস্তিষ্ক ব্যয় করিয়াছি। সাধুদিগের অনুসরণে অনেক সময় যাপন করিয়াছি, প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া অনেক দিন কাটাইয়াছি, আর না। এখন আত্মস্থ

হইতে চেষ্টা করিব। এই সময়ে আমি নির্জ্জনে বসিয়া অনন্ত আকাশের অনন্ত ক্রীড়া, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ও হিমালয়ের অতুল সম্পদের বিষয় চিন্তা করিতে-ছিলাম। ইহারা সকলেই আমাকে মুদ্রিত নয়নে প্রাণপথে কি যেন দেখিতে বলিয়াছিল। আর তাহারা যেন বিরক্ত হইয়া অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতেছিল, কি ছাই দেখিয়াছ ? যদি দেখিবে, তবে ঐ দেখ অন্তরে। এই বলিয়া সমগ্র প্রকৃতি অনন্ত নয়ন বিস্তার করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আমার অন্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। আর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঐ ঐ বলিয়া দেখাইয়া দিল। এই যে প্রকৃতির অস্ফুট ধ্বনি, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় মাত্র। এদিকে আমার আকাঙ্ক্ষা আমাকে আমার ঘরে লইয়া আসিল, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আত্মার গভীরতর প্রদেশ হইতে গভীরতম প্রদেশে লইয়া চলিল, সুতরাংই আমি বাধ্য হইয়া আমার গৃহে আসিয়া পৌঁছিলাম ও নিমীলিত নেত্রে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, আমার আত্মাতে যাহা দেখিলাম, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে।

মন্ত্র সাধন।

মন্ত্র উচ্চারণ আমাদিগের পরম উপকারী। স্নান করিবার সময় যদি এই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি যে "জলেতে অমৃত, জলেতে ভেষজ" তাহা হইলে সেই মন্ত্র মনের উপর প্রভাব নিয়োগ করিয়া স্নানের উপকারিত্ব বৃদ্ধি করে। অন্ন আহারের সময় যদি আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি যে "অন্ন কি শুভ্র ও পবিত্র বস্তু। উহা ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রেরিত" তাহা হইলে ঐ মন্ত্র মনের উপর প্রভাব নিয়োগ করিয়া ক্ষুধা ও অন্নাহারের উপকারিত্ব বৃদ্ধি করে। যদি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের সময় আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি "কি সুনিপুণ তোমার লেখনী" তাহা হইলে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের সুখ বৃদ্ধি করে।

দুইটি মন্ত্র দ্বারা আমরা সকল দুঃখ ও ক্লেশ পরাজয় করিতে পারি কিন্তু প্রথম একবার মাত্র উচ্চারণ করিবার সময় আমরা উক্ত মন্ত্রদ্বয় হইতে উপকার পাই না। ঐ মন্ত্র ক্রমাগত সাধন না করিলে উহা হইতে উপকার পাই না। অনেক দিন ক্রমাগত সাধন করিলে তাহার পর যখনই আমরা তাহা উচ্চারণ করিব তখনই তাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হইব। সে মন্ত্রদ্বয় এই "ঝেড়ে ফেল,ঝেড়ে ফেল, শীঘ্র ঝেড়ে ফেল" আর "উঠ, উঠ, শীঘ্র উঠ।"

যখন মনে দুঃখ উপস্থিত হয় তখন স্পষ্টই বোধ হয় যেন একটি ভার মনের উপর নামিয়াছে। যদি আমরা ঐ সময়ে "ঝেড়ে ফেল, ঝেড়ে ফেল, শীঘ্র ঝেড়ে ফেল" এই মন্ত্র উচ্চারণ করি তাহা হইলে ঐ দুঃখভার উন্মোচিত হয়—কিন্তু প্রথম বার উচ্চারণ মাত্র উহার ফল আমরা প্রাপ্ত হই না। অনেক দিন ঐরূপ বলা ও সেই অনুসারে কার্য্য অভ্যাস করিতে হয় অর্থাৎ ঐ মন্ত্রের সাধন করিতে হয় তাহা হইলে উহার ফল স্পষ্ট অনুভূত হয়। তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট অনুভব করি যে মন যথার্থই দুঃখ ঝেড়ে ফেলিল ও লঘু হইল ও আরোগ্য লাভ করিল। দুঃখ ক্লেশ মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিলে তাহার পর যদি আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি যে "উঠ, উঠ, শীঘ্র উঠ" তাহা হইলে আমাদিগের মন যেখানে উঠা উচিত সেই খানে উঠিতে সমর্থ হয় কিন্তু প্রথমবার এই মন্ত্র

উচ্চারণ করিলে আমরা ফল প্রাপ্ত হই না। অনেক দিন ঐরূপ বলা ও তদনুসারে কার্য্য অভ্যাস করিতে হয় অর্থাৎ ঐ মন্ত্রের সাধন করিতে হয় তাহা হইলে উহার ফল স্পষ্ট অনুভূত হয়।

দুঃখ ক্লেশ ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রেমরূপ নিকেতনে উত্থিত হইতে হয় তাহা হইলে আমরা বাক্‌পথাতীত আনন্দ প্রাপ্ত হই। ঐ প্রেমরূপ নিকেতন স্বর্গলোকে নিত্যকাল অবস্থিত। উহা মনুষ্য-হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত নহে। ঐ প্রেমরূপ নিকেতন চৌতালা। সর্ব্বোচ্চ অর্থাৎ চতুর্থ তল ঈশ্বরপ্রেম, তৃতীয়তল পরলোকপ্রেম, দ্বিতীয় তল প্রকৃতিপ্রেম, ও প্রথম তল মনুষ্যপ্রেম। সামান্য চারিতালা বাটীতে আরোহণ করিবার সময় যেমন ক্রমে ক্রমে উঠিতে হয় সেইরূপ প্রণালী বর্ত্তমান কার্য্যে অবলম্বন করিলে হইবে না। আত্মার এমন ক্ষমতা আছে যে সে একেবারে চতুর্থ তলে উঠিতে পারে। চতুর্থ তলে উঠিয়া তথাকার বর্ণনাতীত ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে তৃতীয় দ্বিতীয় ও প্রথম তলে নামিলে যাহার পর নাই আনন্দ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিষয়ে এই পত্রিকায় অনেক লেখা হইয়াছে অতএব এই স্থলে সে বিষয়ে লিখিবার প্রয়োজন রাখে না। আর দুইটি প্রীতির কথা আবশ্যক। এই দুঃখময় সংসারে পারলৌকিক সুখের আশা আত্মার নঙ্গর স্বরূপ। ধর্ম্মের এক অঙ্গ ঈশ্বরে বিশ্বাস, আর এক অঙ্গ পরকালে বিশ্বাস। অমৃত লাভের নিশ্চয়তা মনকে যেমন সুখী করে এমন অন্য কিছু নহে। প্রকৃতি দেবী আপনার মুখশ্রী পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিতেছেন কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই বিশেষ সৌন্দর্য্য ধারণ করে। মনুষ্যের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কখনই হইতে পারে না। প্রথমতঃ ঈশ্বরে মনকে উঠাইয়া যদি পরলোকের শোভা ও সৌন্দর্য্যের ছবি মনে চিত্রিত করি, তৎপরে চতুর্দিকস্থ প্রকৃতির বর্ত্তমান শোভা কবিত্বোজ্জ্বল নয়নে নিরীক্ষণ করি এবং তৎপরে সকল মনুষ্যের প্রতি প্রীতি ভাবের উদ্রেক করিয়া সকল মনুষ্যকে প্রীতির নয়নে দেখি ও তাহাদিগের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আনন্দের আর অবধি থাকে না। অভ্যাস দ্বারা অতি শীঘ্র শীঘ্র এই আরোহণ অবরোহণ কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। শেষ কালে অভ্যাস দ্বারা এমন হইয়া যায় যে উক্ত আরোহণ ও অবরোহণ কার্য্য এক কালে সম্পাদিত হয়। ইহার নাম সর্ব্বযোগ। ধন্য সেই ব্যক্তি যাঁহার এই কয়টি মন্ত্রসাধন ও এই অতুল্য সর্ব্বযোগ অভ্যস্ত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারিণী মুক্তি ও তৎসাধন।

মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা। জীব পরমেশ্বরে ভক্তিযুক্ত হইয়া জ্ঞানযোগে তাঁহাকে দর্শন করিলে সংসার-পাশ (মায়ার বন্ধন) হইতে মুক্ত হয়। গীতার টীকা সমাপন কালে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন।

"ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতিগীতার্থসংগ্রহঃ।"

"গীতার সংক্ষেপ অর্থ এই যে ভগবদ্ভক্তিযুক্ত জীব তাঁহার প্রসাদজাত আত্ম

বোধ হইতে সুখে বন্ধন বিমুক্ত হয়” এই শ্লোকের অর্থের দ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, জীব ভগবানে ভক্তিযুক্ত হইলে তাঁহার প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভে মায়ার বন্ধন হইতে সুখে মুক্ত হয়। যতকাল জীব ঈশ্বরকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করিয়া জ্ঞানযোগে তাঁহাকে দর্শন করিতে না পারিবে, ততকাল তাহার মুক্তি নাই। অতএব মুক্তির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যক তদ্ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই। এই সম্বন্ধে পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ বলিয়াছেন,

“সংসারোত্তরণে জন্তোরুপায়ো জ্ঞানমেব হি।
তপোদানং তথা তীর্থমনুপায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
(যোগবাসিষ্ঠ।)

“একমাত্র জ্ঞানই (ব্রহ্মজ্ঞান) জীবের সংসার হইতে মুক্তি প্রাপ্তির মহোপায়। তপস্যা, দান, তীর্থাদি পর্য্যটন ইহার প্রকৃত পথ নহে।”

মুক্তির কথা বলিতে গিয়া শ্রুতি এই রূপ বলিয়াছেন

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।”

“এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।”

গীতায় আছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।

“যাহারা নিত্য যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক আমায় (ঈশ্বরকে) ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি (ঈশ্বর) সেইরূপ বুদ্ধি যোগ দান করি যাহা দ্বারা আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়।”

মুক্তি সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতিমূলক এইরূপ অনেক উপদেশ আছে। যাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য আর্য্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে, তদ্রূপ উপদেশ অন্য কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেতে নাই।

ফলত ভগবানকে নিত্য প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করিলে সাধক ভগবৎকৃপায় সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। সেই জন্য মনুষ্যের নিত্য ঈশ্বরোপাসনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। বেদে কথিত আছে যে “উপাসনা ব্যতীত মুক্তির আর অন্য পথ নাই।” এই উপাসনা পরাৎপর পরমেশ্বরকেই করিতে হইবে।

“আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত”।

শ্রুতি বলিতেছেন যে, পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। এই যে ঈশ্বরোপাসনা তাহা কেবল মুখের কথা নহে। অন্তরে প্রেম ভক্তির টান না থাকিলে ঈশ্বরোপাসনা হয় না। এবং তদ্দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভক্তির লক্ষণ এই “অত্যন্তানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিঃ” অর্থাৎ যদ্দ্বারা পরমাত্মাতে মনের একাগ্রতা জন্মে তাহার নাম ভক্তিযোগ।

“যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু।”

হে ঈশ্বর! অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়ে যেরূপ অনপায়িনী প্রীতি জন্মে, তোমাকে স্মরণ করিতেছি যে আমি, আমার যেন তোমার প্রতি সেইরূপ অচলা প্রীতি থাকে, কখনও যেন অন্তঃ-

করণ হইতে তোমার প্রতি আমার প্রীতি তিরোহিত না হয়।

ঈশ্বরপ্রীতির এইটি অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সাধক মাত্রেরই এই দৃষ্টান্তানুযায়ী ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

অজ্ঞানকে দূর করিয়া জ্ঞানযোগে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে না পারিলেও ভক্তিযোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে না পারিলে তাঁহার উপাসনা হয় না। অজ্ঞানকে দূর করা ও ভক্তি প্রীতি উপার্জ্জন করা মনুষ্যের নিজ সাধনের আয়ত্ত।

যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহার উপায় ও চেষ্টা করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় অবলম্বন করিতে হইলে অগ্রে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হইবে। বুদ্ধি যদি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ঈশ্বরজ্ঞানের আলোক প্রতিভাত হইবে না। অতএব অগ্রে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হইবে। তৎপরে তদ্দ্বারা মনকে বশে রাখিতে হইবে। মন যদি বুদ্ধিবৃত্তির বশে থাকে, তাহা হইলে সহজে মোহ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। মন যদি বুদ্ধিবৃত্তির অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত না হয়, তাহা হইলে মানুষ আর হতচেতন হয় না। মনকে সংযত করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন করিতে হইবে, তবে তাঁহাতে যুক্ত হইতে পারিবে।

> যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মন-
> স্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্।
> নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানা-
> মাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা॥
>
> বিবেকচূড়ামণি।

"মন যে যে পরিমাণে ব্রহ্মে অবস্থিত হইবে সেই সেই পরিমাণে সে বাহ্য বাসনা বর্জ্জন করিবে। এইরূপে বাহ্য বাসনা সমূহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইলে আত্মাকে অনুভব করিবার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক থাকে না।"

মনকে বাহিরের ব্যাপার হইতে আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধিতে যুক্ত করিয়া তাহাকে আত্মাতে যোগ করিলে তাহা হইতে এক দিব্য আলোকের উদয় হইবে, তদ্দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হইবে। যেমন একখানি আতশি কাচের উপরে সূর্য্যের বিক্ষিপ্ত রশ্মি আসিয়া একত্রিত হইলে সেই একত্রিত রশ্মি যেরূপ প্রখর হয়; তদ্রূপ নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে নানা বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধিতে যুক্ত করিয়া আত্মাতে সংযোগ করিলে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের উদয় হয়। সেই উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়, এবং অজ্ঞান নাশ হইলেই মনুষ্য মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

> বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
> সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

বিজ্ঞান * যাহার সারথী, মন যাহার বশীভূত, সে সংসার-পথের পার সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ সারথী দ্বারা মন-রূপ রজ্জুকে বশে রাখিলে ইন্দ্রিয়-রূপ-অশ্বগণ বিপথগামী হয় না; তাহা হইলেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সাধক কিরূপ প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা

---

* মহাত্মা শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের এবং সপ্তমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পদের মর্ম্ম লিখিয়াছেন; যথা—"জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ।" "জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবঃ।" জ্ঞান শব্দের অর্থ, উপদেশলভ্য অপ্রত্যক্ষ বোধ এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, উপদিষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষ অনুভব।

করিবে, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

"ব্রহ্মণঃ শ্রবণং যত্ত্ব দ্বিতীয়ে মননন্তথা।
নিদিধ্যাসনমেবঞ্চ ব্রহ্মোপাসনমীরিতং॥"

প্রথমে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণাদি শ্রবণ, পরে শ্রুত বিষয় হৃদয়ে ধারণ, অনন্তর নিদিধ্যাসন, ইহাকেই ব্রহ্মোপাসনা বলা যায়।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণাদি শ্রবণ করিবে অর্থাৎ আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক বাক্য সকল শ্রদ্ধার সহিত শ্রাবণ করিয়া অন্তরে তাহা ধারণা করিবে। পরে সাধক নিত্য উপাসনাকালে শান্ত-সমাহিতচিত্তে নির্জ্জন ও পবিত্র স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মস্বরূপবোধক বাক্য সকল চিন্তা করিবে ও নিঃসংশয় হইয়া তাহা অন্তরে ধারণা করিবে।

"ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।"

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয়, তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। বেদোক্ত পরমেশ্বরের এই স্বরূপ সকল অনন্যমনে প্রীতি পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া মনের সহিত তাঁহাতে আত্মার সমাধান করিবে—অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিবে। নিঃসংশয় চিত্তে তাঁহার সত্তাতে মগ্ন হইয়া অখণ্ডাকার অন্তঃকরণে তাঁহাকে ধ্যান করিবে। এইরূপ উপাসনায় যখন ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব হয় তখন সেই ক্ষুদ্রত্ব ও মলিনত্ব ঘুচাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। সাধক ঈশ্বরের নিকটে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিবেন। আর তিনি যে সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিবেন তাহার ফল পরব্রহ্মে অর্পণ করিবেন।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

কেবল কর্ম্মতেই তোমার অধিকার আছে কদাপি তাহার ফলেতে নহে।

এইরূপে সাধনের পথে চলিতে চলিতে সাধকের হৃদয়ে যখন শম দমাদি গুণ সকল বিকশিত হইবে, তখনই তিনি সাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন। শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত আছে যে,—

"শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।"

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনার আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

বাস্তবিক সাধক যখন সাংসারিক অনিত্য সুখের কামনাকে খর্ব্ব করিয়া ঈশ্বর লাভের ইচ্ছাকে বলবতী করেন, তখন তাঁহার মন ও বুদ্ধি স্বতঃই তাঁহার দিকে ধাবিত হয়, নদী সকল যেমন পর্ব্বত, জঙ্গল ও নগরাদিকে অতিক্রম করিয়া সাগরে গিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ সাধকের মন ও বুদ্ধি সংসারের শত বাধাকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরে মিলিত হয়।

এইরূপে মুক্তির সাধন করিলে জীবের অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন হয় এবং মায়া-পাশ ছিন্ন হইলে ও অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচন হইলে জীব ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

শিবনারায়ণ এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিতেন যে পাণ্ডা ও যাত্রী উভয়কেই ধিক্। সনাতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা

হইতে বিমুখ হইয়া ইহাদিগের এই সকল দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ইহারা আপনার অন্তরে বাহিরে যিনি পরিপূর্ণ তীর্থ ও জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন তাঁহাকে না জানিয়া চিনিয়া দেশে দেশে পশুবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, কোন পথ পাইতেছে না। শিবনারায়ণ অমরগঙ্গাতে স্নান করেন নাই, বিভূতি মাখেন নাই ও অম্বরনাথকে প্রণামও করেন নাই। তিনি দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে ছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সকলে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। শিবনারায়ণ বলেন উলাঙ্গ শব্দের অর্থ এই যে আত্মা পরমাত্মা অভেদ হইয়া অর্থাৎ এক হইয়া যান, পরমাত্মাতে অর্থাৎ আপনার স্বরূপেতে দ্বিতীয় কোন বস্তু না ভাষে, পরিপূর্ণ রূপে স্বয়ং আপনি থাকেন সেই অবস্থার নাম উলাঙ্গ এবং দিগম্বর।

পরে সেখান হইতে যাত্রিরা বিদায় হইয়া যেখানে বস্ত্র ইত্যাদি রাখিয়াছিল সেই ভৈরোঁ গড্ডিতে যাইয়া পৌঁছিল। সেখানে রাত্রিতে বিশ্রাম করিল। সেই রাত্রিকালে শিবনারায়ণ একজন সাধুকে বলিতে লাগিলেন যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে আসিয়া যদ্যপি মিথ্যা বলে তাহা হইলে তাহার কোন জন্মে উদ্ধার হয় না, চিরকাল নরকে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে কেহ তীর্থে আসিয়া সত্য কথা বলে তাহা হইলে যদি তাহার দশ যুগের পাপ থাকে তাহা নাশ হইয়া যায় এবং সদা আনন্দ রূপ মুক্ত স্বরূপ থাকে। আমি অম্বরনাথের পায়রা দর্শন করিতে পাই নাই, আমি কেন মিথ্যা বলিয়া নরকেতে পতিত হইব। এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণের নিকট সাধু বলিতে লাগিল যে মহাশয় আমিও দর্শন করিতে পাই নাই। এই কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই বলিতে লাগিল যে আমরাও দর্শন করিতে পাই নাই। এই রূপে সকল তীর্থের ভাব ও দুরবস্থা রাজা প্রজা পাঠকগণ ইত্যাদি গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া লইবেন।

অনন্তর ওখান হইতে যাত্রিরা রওনা হইয়া মটন্ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যাত্রিরা এক রাত্রি বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং সেইখানে একজন গয়লা এক কলস দুগ্ধ লইয়া বিক্রয় করনার্থ উপস্থিত হইল। এক শ্রীবৈষ্ণব সাধু তাহার দুগ্ধের দাম পাঁচ সিকা ঠিক করিল। বলিল যে আমার বাসাতে দুগ্ধ লইয়া চল। সেই সময় আর একজন সন্ন্যাসী মহাত্মা উঠিয়া গয়লাকে বলিল যে দুগ্ধের কত দাম লইবে। গয়লা বলিল যে ২॥০ টাকা লইব। সন্ন্যাসী বলিল যে আমার বাসাতে লইয়া চল, ২॥০ টাকা দিব এবং শ্রীবৈষ্ণব বলিলেন যে আমি ১।০ সিকা দাম স্থির করিয়াছি, তোমাকে দিতে দিব না। সন্ন্যাসী বলিলেন যে চুপ্ কর, নতুবা ভাঙ্গের মতন ঘুঁটিয়া তোকে খাইয়া ফেলিব। শ্রীবৈষ্ণব বলিলেন যে কখন কাহাকে ঘুঁটিয়া খাইয়াছিস্? এই কথা বলিয়া দুই জনে কলস ধরিয়া টানাটানি করাতে দুগ্ধের কলস ভাঙ্গিয়া গেল ও দুগ্ধ সকল নষ্ট হইয়া গেল। তৎকালে সন্ন্যাসী মহাত্মার কাছে একগাছ লাঠি ছিল। সেই লাঠি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবকে ২।৩ ঘা মারিল। তাহাতে একদিকে কতকগুলি শ্রীবৈষ্ণব ও আর দিকে কতকগুলি সন্ন্যাসী জুটিয়া উভয় দলে মারামারি হইতে লাগিল এবং তাহাতে কাহারও হাত কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেল। ২।৩ শত সন্ন্যাসী এইরূপে আঘাত পাইল এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগেরও কয়েক জন আহত হইল। মুসলমানেরা ঐ মটন্ গ্রাম হইতে ঐ স্থানে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণব এবং